রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার সেই 'কবিজায়া'—
যিনি পুনর্জন্ম লাভ করে আমার সঙ্গে সাত পাকে
বাঁধা পড়েছেন, তাঁকে—

কথামুখ

যা ভেবেছিলাম, তা করা গেল না। আসলে শব্দের মধ্যে সাংঘাতিক শক্তি লুকোনো থাকে। তার মধ্যে যদি আবার সেই শব্দ ব্যবহার করেন ঋষিকল্প মহাকবি তা হলে শব্দ এমনই এক অপরিবর্তনীয় মাত্রা বহন করে যে, আমাদের মতো সাধারণ জনের বিপদ ঘটে সেখানেই। কবি-ঋষি 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' রচনা করে এমনই এক মধুরতা বর্ষণ করেছেন আমার শ্রুতিপুটে যে, এই গ্রন্থের অন্তর্গত চরিত্রগুলির অন্বয়ে প্রথমে কুন্তীকে রেখে তারপরেই কর্ণের অবস্থান ঘটাব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা করা গেল না। করা গেল না এই কারণে যে, কর্ণ কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কর্ণ তাঁর অন্যান্য ভাইদের বিপরীত কোটিতে অবস্থান করছিলেন বলে তাঁর স্বভাব-চরিত্র, সংস্কার এবং ভাবনা এতটাই অন্যরকম যে, তাঁকে অন্য তিন কুন্তীপুত্রের অগ্রভাগে রাখতে পারিনি।

অথচ কর্ণের মধ্যে সেই সম্ভাবনা ছিল। তিনি প্রথম কৌন্তেয় হতে পারতেন, তিনি পাঁচ পাণ্ডব-ভাইয়ের জ্যেষ্ঠতম হতে পারতেন, সব চেয়ে বড় কথা, তিনি দ্রৌপদীর প্রথমতম স্বামীও হতে পারতেন। সর্বস্তরে এই 'হতে-পারতেন' মানুষটা যেহেতু কখনই যা হবার ছিল তা হননি, তাই তাঁকে সবার শেষে রাখলাম বীরোচিত একাকিত্বের মর্যাদায়।

গ্রন্থনামের মধ্যে আমি কোথাও পাণ্ডব কথাটা রাখব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু এও ভেবে দেখলাম—পঞ্চ পাণ্ডবের জীবনের মধ্যে এই রাজনাম অথবা বংশ নাম বহন করা ছাড়া পাণ্ডুর আর কোনও তাৎপর্য নেই। বরঞ্চ কুন্তীর প্রভাব এখানে অনেক বেশি। তা ছাড়া গ্রন্থনামের মধ্যে পাণ্ডব কথাটা থাকলে আমরা কোনওভাবেই এখানে কর্ণের প্রবেশ ঘটাতে পারতাম ? অথচ কর্ণ বড় বেশি কৌন্তেয়। কুন্তী মনে মনে তাঁকে চিরকাল কৌন্তেয় বলেই মনে করেছেন কর্ণও সারা জীবন ধরে সেই নেতি নেতি জননীর জন্য হা-হুতাশ করে নেতিবাচক ভাবেই কৌন্তেয়।

আরও একটা কথা এখানে আগেই বলে নেওয়া ভাল। অতি শৈশবে জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিঃসীম হতাশার মধ্যে জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কর্ণ যেভাবে মৃত্যু-বরণ করেছেন, তাতে এই অসাধারণ বীরের জন্য আমাদের হৃদয়ে গভীর সমবেদনা আছে। কর্ণের জীবনের বিভিন্ন কঠিন মুহূর্তগুলি মহাভারতের কবি এমনই সকরুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের এই হাহাকার জাগ্রত হওয়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাট্যকারেরা তথা মধ্যযুগীয় কাশীরাম দাশ এবং আমাদের মধ্যেও অন্য অনেকে কর্ণের প্রতি সমাজের বঞ্চনাটাকেই মাথায় বেশি রেখেছেন বলে করুণ রসটাকেই বড় করে ফেলেছেন।

করুণ-রসটা যে এখানে বড়, সে ব্যাপারে আমারও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বক্তব্য—সেই করুণার ধারাটি শুধু কর্ণের জীবনে নয়, এই ধারার উৎসটি খুঁজতে হবে তাঁর জননী কুন্তীর জীবন থেকে। অন্যদিকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে কর্ণের জীবনে যে সব বিকারগুলি ঘটেছিল, সেগুলি যেহেতু মহাভারতের কবি অত্যন্ত লোকসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন,

তাই সেগুলিকেও আমি না দেখিয়ে পারিনি। তাতে কর্ণের সম্বন্ধে পাঠকের মনে যে চিরাচরিত মহান ধারণা আছে, তাতে কিছু আঘাতও লাগতে পারে হয়তো। কিন্তু মহাভারতের কবির সামগ্রিক দৃষ্টির কথা মনে রেখে সহৃদয় পাঠক সে আঘাত সইতেও পারবেন হয়তো।

মহাভারতের চরিত্র বিশ্লেষণ বড় কঠিন কাজ। একেকটি চরিত্র একেকটি হীরক-খণ্ডের মতো। বিশেষত কর্ণের। বিশেষত কুন্তীর। বিশেষত যুধিষ্ঠিরের। এই হীরক-চরিত্রের কাঠিন্য ভেদ করা আমার সাধ্য ছিল না। আমার পূর্বজন্মা সাধক-মনীষীরা তাঁদের চেতনা-বজ্রাঘাতে এই সব কঠিন চরিত্রের অন্তর ভেদ করেছেন। আমি সেই ছিদ্রপথে সুতোর মতো প্রবেশ করেছি মাত্র—মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।

কুন্তী কিংবা কর্ণচরিত্রের জটিলতা বাদ দিলেও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বোঝা মোটেই সহজ নয়। সাধারণ জনের মধ্যেই শুধু নয়, অনেক পরিপক্ক মানুষের মধ্যেও যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন দেখি—যুধিষ্ঠিরকে তাঁরা ক্লীব, মেরুদণ্ডহীন, ঘটনার স্রোতে গা-ভাসানো এক নমনীয় ধার্মিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আমি হলফ করে বলতে পারি—এঁরা মহাভারতের অন্তর্গত যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কিছু বোঝেন না। যুধিষ্ঠিরকে বুঝতে হলে সেকালের সমাজকে বুঝতে হবে, ভারতবর্ষের দর্শনকে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে নীতি যুক্তি ধর্ম, বুঝতে হবে—আবিল সংসারের মধ্যে থেকেও মানব-নীতির পূর্ণতায় পৌঁছনোর চেষ্টাকে। সেই চেষ্টার নামই যুধিষ্ঠির।

পার্থ-তৃতীয় অর্জুনকে আমরা মহাভারতের নায়ক বলে মনে করি এবং তিনিই পঞ্চপাণ্ডব-প্রিয়া দ্রৌপদীরও প্রিয়তম নায়ক। তাঁকে আমরা তাই দ্রৌপদীর অব্যবহিত পূর্বে রেখেছি। অবশ্য কৌন্তেয়দের অনুক্রমেও তাঁর ওই জায়গাতেই থাকবার কথা।

মহাভারতের সব চেয়ে খাপছাড়া চরিত্র হলেন ভীম। ভীম এমনই একজন মানুষ, যিনি মা, ভাই এবং তাঁর এক-পঞ্চমাংশের স্ত্রীটিকে পাগলের মতো ভালবাসেন। ভাইদের অনুক্রমেও তিনি মাঝখানে আছেন এবং আমাদের অনুক্রমেও তিনি মহাভারতের ছয় চরিত্রের মাঝখানে বসে তাঁর শক্তি এবং ভালবাসা একসঙ্গে বিকিরণ করছেন সবার ওপরে।

আমরা আরম্ভ করেছি কুন্তীকে দিয়েই। কারণ তিনি চার পুত্রের গর্ভধারিণী জননী। গর্ভধারিণীকে আগে জানলে তাঁর পুত্রগুলিকেও বুঝতে সুবিধে হবে, বিশেষত কর্ণকে। জননীর পরিত্যক্ত বলে কর্ণের ওপরে, আমাদের যে মায়া আছে, সে মায়া থাকতে হবে কুন্তীর ওপরেও, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে তিনিও কম দুঃখী নন, কম অভাগা নন। কর্ণ যদি সর্বকালীন পাঠকের করুণার আধার হন, তবে কুন্তীকেও সেই করুণ-রসের মাহাত্ম্যেই দেখতে হবে। সে জন্যও হয়তো দুই করুণ চরিত্রকে আমরা প্রথমে এবং শেষে রেখেছি। যাতে জননী এবং পুত্র দুই মেরুতে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অন্তর্গত চরিত্রের করুণ-রসটির সাজাত্য থাকে।

মহাভারতে স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে যে দীপ্তি আছে, সেই দীপ্তিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল আমার কাছে কুন্তী এবং তাঁর পরেই দ্রৌপদী। পঞ্চস্বামীগর্বিতা দ্রৌপদীর জীবন বিভিন্ন মানবিক বৈচিত্র্যে বিশাল। তাঁর মতো আধুনিক এবং বিদগ্ধা রমণীর কল্পনা মহাভারতের কবি কীভাবে করেছিলেন তা ভাবতে গেলে শুধু অবাক হওয়া ছাড়া অন্য কোনও গতি থাকে না। কিন্তু দ্রৌপদীর এই বিশাল চরিত্রের চেয়েও আমার কাছে কুন্তীর চরিত্র আরও অনেক বেশি বর্ণময়, বৈচিত্র্যময়। একটি স্ত্রীলোকের জীবনে যে সব অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা থাকতে পারে, সেগুলি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ব্যক্তিত্ব লাগে, যে রুচি লাগে এবং যে আত্মসচেতনতা লাগে—সেই ব্যক্তিত্ব, রুচি এবং মর্যাদার প্রতিরূপ হলেন কুন্তী। মহাভারতে কুন্তীর চরিত্র তাই দ্রৌপদীর চেয়েও বেশি মানবিক, অন্তত আমার কাছে তাই।

ভূমিকা শেষ করার আগে আমার ইচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে আগে মার্জনা চেয়ে নিই। উল্লেখ্য,

এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রত্যেকটি চরিত্র পুজোসংখ্যা 'বর্তমানে' এক এক বছরে বেরিয়েছে। বিভিন্ন বছরে লিখবার সময়ে প্রত্যেকটি চরিত্রকে যেহেতু যথাসম্ভব সম্পূর্ণ রূপ দিতে হয়েছে, স্বাভাবিক কারণেই এখানে একত্রে সেই চরিত্রগুলি সংকলিত হওয়ায় কোনও কোনও জায়গায় পুনরুক্তি-দোষ ঘটে থাকবে। পুনরুক্তি না করেও যে প্রত্যেকটি চরিত্রের একক রূপ দেওয়া যেত না, তা নয়। কিন্তু তাতে প্রত্যেক চরিত্র মহাভারতের কবির হাতে আস্তে আস্তে কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, তা দেখানো যেত না। সেই বিবর্তনের ধারাটি ব্যাহত হত। আমার পুনরুক্তি-দোষের সমর্থনে এর থেকে বেশি সাফাই আমি গাইব না, কারণ সুধীজন এই গ্রন্থ পড়বার সময়েই আমার পুনরুক্তিগুলি উদারচিত্তে সমর্থন করবেন বলে আমি মনে করছি।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স-এর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আমি কিছু সাহায্য পেয়েছি সংস্কৃত কলেজের কর্মী শ্রী অলোককুমাব বিশ্বাস এবং আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীপঙ্কজ দত্তর কাছে। এরা আমার আশীর্বাদের পাত্র। এই গ্রন্থ রচনার উৎসাহের সঙ্গে অজস্র গ্রন্থের সাহায্য দিয়ে আমায় ঋণী করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী সুষমা। আমার পুত্র অনির্বাণের প্রেরণাও এখানে কম নয়। গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে আরও যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের সবার নাম করা এখানে সম্ভব নয়। তাঁদের সবার জন্য শুভেচ্ছা রইল। যিনি এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন, তাঁকে আমি আমার অন্যতম বন্ধু বলেই মনে করি। এই প্রসন্ন প্রচ্ছদ সেই বন্ধুত্বেরই ফল। এই গ্রন্থের 'সুসজ্জিত পত্রগুলি' সম্পূর্ণ পড়ে যথাসম্ভব সংশোধন করে দিয়েছেন আমার বন্ধু এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রবালকুমার সেন। আমার জন্য তিনি অনেক কিছুই করেন বলে কোনও কৃতজ্ঞতাই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। এর পরে আমার কাম্য রইল শুধু সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয়।

সূচিপত্র

কুন্তী

সবই কপাল গো দিদি, সবই কপাল। কপাল ভাল থাকলে হাজারো দোষ থাকুক, তবু লোকে সুখ্যাত করবে, আর কপালের জোর না থাকলে তার অবস্থাটা হবে ঠিক আমার মতো।

একাধারে দুঃখ, অভিমান এবং ক্রোধ মেশানো এই কথাগুলি শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন অন্যতরা এক মহিলা। জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কী এমন কপাল পুড়ল যে, সাত সকালেই বকর-বকর আরম্ভ করেছিস ?

আজ থেকে বহুকাল আগে, মহাভারতের যুগ যখন চলে গেছে, শাস্ত্র আর আচারের বিষম বাঁধনে সমগ্র নারী সমাজকে যখন বেঁধে ফেলা হচ্ছে, তখন এই কথোপকথন চলছিল বলে আমরা মনে করি। যে ভদ্রমহিলা কপালের কারসাজি নিয়ে খুব চিন্তিত, তিনি—আর কিছুই নয়, হয়তো দু-একজন পুরুষ-পড়শির সঙ্গে একটু আধটু রসিকতা করে ফেলেছেন, তাতেই পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ রকম গল্প বানিয়ে ফেলল। ভদ্রমহিলার নিন্দে হল যথেষ্ট।

তা এ রকম ঘটনা ঘটলে কার না দুঃখ হয়। মনের দুঃখে তথা সময়মতো ব্যথার ব্যথী আরও এক মহিলাকে সামনে পেয়ে তিনি প্রথমেই পুণ্যবতী পাঁচ কন্যের শিকড় ধরে টান দিলেন। পুণ্যবতী পাঁচ কন্যে মানে—সেই পাতকনাশিনী পাঁচ কন্যে, যাঁদের কথা সকালে উঠেই স্মরণ করতে বলেছেন শাস্ত্রকারেরা—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।

আমাদের এই মহিলাটি অবশ্য রামায়ণ-বিখ্যাতা অহল্যা, তারা এবং মন্দোদরীকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আক্রমণ এবং আক্রোশ প্রধানত দুজনকে লক্ষ করে—কুন্তী এবং দ্রৌপদী। কাজেই অন্যতরা যখন সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল—কী এমন হল যে কপালের দোষ দিচ্ছ—তখন তিনি জিহ্বার বাঁধন খুলে মহাভারতের প্রবীণা এবং নবীনা—দুই নায়িকার মুখে ঝামা ঘষে দিলেন। বললেন—কপাল না তো কী ? পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ মানুষ ওই কুন্তীর সঙ্গে আশনাই করেছে, কামনা করে সঙ্গ দিয়েছে; আর তার ব্যাটার বউ দ্রৌপদী—তাকেও কামনা করেছে পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ—পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী তদ্‌বধূরথ পঞ্চভিঃ। তবু এঁরা হলেন গিয়ে সতী। তা, একে কপাল বলব না তো কী ? পোড়া কপাল আমার ! লোকেও এদের সতী বলে। তাই বলছিলাম—কপাল থাকলে কীই বা না হয়—সতীং বদতি লোকো'য়ং যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে।

বলতে পারেন—এ আমার ভারী অন্যায়। মহাভারতের এক প্রবীণা নায়িকার চরিত-কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই এমনভাবে কথাটা আরম্ভ করলাম যাতে কুন্তীর মর্যাদা লঙ্ঘিত হতে পারে। অন্তত অনেকেই তাই ভাববেন। তবে আমার দিক থেকে সাফাই গাইবার দুটো রাস্তা আছে। এক প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর হয়তো বা উপরিউক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি দেখে উৎসাহিত হয়েই কুন্তীর সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে মহামতি বঙ্কিমচন্দ্রের গালাগাল খেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর 'কবিরত্নপ্রকরণে' লিখেছিলেন— "কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল।

কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই বাটীর কর্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী এবং পুত্রবধূ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন। তিনি, সাতিশয় কুপিত হইয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি।...তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষে উপগতা হইয়াছিলেন ; আমরা তদতিরিক্ত করি নাই।"

বিদ্যাসাগরের এই উপাখ্যান প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল—"এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিকৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।"

দুই বিশাল ব্যক্তিত্বের এই তর্কাতর্কির নিরিখে বলতে পারি যে, চিরকালীন গৌরবের তিলক-আঁকা ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যথা ভাবনা অন্য সজ্জনের কটূক্তির কারণ ঘটায়। কুন্তীর সম্বন্ধে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশাই কিছু অন্যথা লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তবে আমার কথারম্ভে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির পূর্ব-আলোচনা থাকায় আমার চপলতা কিছু কমে। আমার দ্বিতীয় সাফাইটা অন্য। সেটা হল—আমরা এমন একটা চরিত্র সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করেছি, যিনি কোনও এলেবেলে ছিঁচকে সাহিত্যের নায়িকা নন। দ্রৌপদীকে বাদ দিলে মহাভারতের মতো বিরাট কাব্যের প্রথম ভাগের নায়িকা তো কুন্তীই। যিনি মহাকাব্যের নায়িকা হবেন, সঙ্গতভাবেই তাঁর চরিত্রের বিচিত্র দিক থাকবে এবং সেই চরিত্রের এদিক-সেদিক নিয়ে নানা জনে নানা প্রশ্নও তুলবে। সে সব প্রশ্ন ঠিক কি না এবং ঠিক হলে কতটা ঠিক, বেঠিক হলেই বা কতটা বেঠিক—সেটা কুন্তী-চরিত্রের আলোচনার পরিসরে আমাদের ভাবতেই হবে। ভাবতে হবে—আরও এমন কিছু আছে কিনা যাতে করে কুন্তী-চরিত্রের ধূলিমলিন অংশগুলি ধুয়ে মুছে যেতে পারে। দেখুন, মহাকাব্যের নায়িকারা কেউ আকাশ থেকে পড়া কল্পলোকের বাসিন্দা নয়। দোষে-গুণে তাঁরাও আমাদের মতো মানুষই। তবে কিনা তাঁদের চরিত্রে এমন মনোহরণ কতগুলি 'বিশেষ' আছে, যাতে তাঁরা আমাদের দৈনন্দিনতা অতিক্রম করে মহাকাব্যের রসোত্তীর্ণা নায়িকাটি হয়ে উঠেছেন। কুন্তী সেই হাজারো বিশেষ-থাকা এক নায়িকা। অথচ এমনিভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশে কত শত বিধবা পাবেন, যাঁরা বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কোথাও সুখে থাকেননি, স্বামীর সুখ পাননি, ছেলের সুখও পাননি—এখন মরার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এমনিতে কুন্তীও সেই রকম। এতই সাধারণ। কুন্তীর নিজের মুখেই কথাটা শুনুন।

কুন্তী এখন জীবনের চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে। বারো বছর ছেলেরা বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে, এক বছর তাঁদের কাটাতে হয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে, নিজেদের গোপন করে। তেরো বছর পর আবার দুর্যোধন তাঁদের রাজ্যপ্রাপ্তির অধিকার অস্বীকার করেছেন। এবার কৃষ্ণ এসেছেন দুর্যোধনের কাছে পাঁচ পাণ্ডবভাইয়ের জন্য পাঁচখানা গ্রাম যদি অন্তত পাওয়া যায়। কৃষ্ণ এসে বিদুরের সঙ্গে পূর্বেই কথা বলেছেন। এখন বিকেলবেলায় সাঁঝের আঁধার. যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন নিজের পিসি কুন্তীর কাছে—নতমুখ, লজ্জায় ম্লান। এক মুহূর্তে সারা জীবনের সমস্ত ক্ষোভ এক জায়গায় জড়ো করে কুন্তী ছেলেদের কুশল জানতে চাইলেন। ছেলে, ছেলের বৌ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর সবার সম্বন্ধে কথা বলে কুন্তী এবার কৃষ্ণের কাছে নিজের গোপন করুণ কথাটা এক নিঃশ্বাসে বললেন। বললেন নিজের ভাইয়ের ছেলে কৃষ্ণের কাছে ; তিনি ঘরের লোক এবং ঘরের কথা সব জানেন। কৃষ্ণ নইলে, নিজের গভীর অন্তরের কথাটা মহাকাব্যের প্রবীণা নায়িকার মুখ থেকে এমন করে বেরত কিনা সন্দেহ !

কুন্তী বললেন—বাপেরবাড়ি বলো আর শ্বশুরবাড়ি বলো—কোনও জায়গাতেই আমার কপালে সুখ লেখা ছিল না। দু জায়গাতেই আমার জুটেছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা—সাহং পিত্রা চ নিকৃতা' শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ। এই শ্লোকের মধ্যে কুন্তী জন্মদাতা বাবার কথা বলেছেন, যে বাড়িতে এসে তিনি কুন্তী হলেন, সেই বাড়ির কর্তা তাঁর পালকপিতা মহারাজ কুন্তিভোজের কথা বলেননি। আর বলেছেন শ্বশুরদের কথা—অর্থাৎ শ্বশুর এখানে একজন নয়। অনেকগুলি শ্বশুর বা শ্বশুরস্থানীয়

ব্যক্তিরা তাঁর দুঃখের জন্য দায়ী—শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ। যিনি পাণ্ডুর সত্যিকারের বাবা সেই শ্বশুর ব্যাসদেবের সম্বন্ধে কুন্তীর কোনও বক্তব্য নেই। বক্তব্য নেই তাঁর সম্বন্ধেও, যিনি পাণ্ডুর নামে বাবা, সেই বিচিত্রবীর্য শ্বশুর সম্বন্ধেও। কারণ তাঁকে পাণ্ডুই দেখেননি তো কুন্তী! তাহলে যাঁদের ওপরে কুন্তীর অভিমান তাঁদের একজন হয়তো পিতামহ ভীষ্ম, যিনি শ্বশুর না হলেও প্রায় শ্বশুরই, কারণ শ্বশুরের প্রথম সম্বন্ধটা তাঁর সঙ্গেই হতে পারত। আরেক জন হলেন ধৃতরাষ্ট্র, যিনি ভাশুর। ভাশুর কথাটা সংস্কৃতে 'ভ্রাতৃশ্বশুর' শব্দ থেকে আসছে; ধৃতরাষ্ট্র তাই শ্বশুর পর্যায়েরই মানুষ। এই ভ্রাতৃশ্বশুর বা ভাশুরের সম্বন্ধে কুন্তীর ক্ষোভ আছে যথেষ্ট। এবং সে ক্ষোভের কারণও আছে যথেষ্ট।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ি তো হাজার হলেও পরের বাড়ি। তাকে আপন করে নিতে হয় চেষ্টায়, সাধনায়। বলতে পারি পাণ্ডুর অকালমৃত্যুতে এবং শ্বশুরের মতো অন্যান্যদের অনাদর, অবহেলায় শ্বশুরবাড়িকে আর আপন করে নেওয়া সেরকমভাবে সম্ভব হয়নি কুন্তীর পক্ষে। কিন্তু এই শ্বশুরকুলের ওপর যত না রাগ আছে কুন্তীর, তার থেকে অনেক বেশি রাগ আছে তাঁর নিজের বাপের বাড়ির ওপর। এ এক অদ্ভুত মনের জগৎ যেখানে কুন্তী একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর দুঃখ, তাঁর ক্ষোভ—পিতা-মাতার সহৃদয়তা নিয়ে বোঝবার মতো কেউ ছিল না সংসারে, এখনও নেই। আজ পরিণত বয়সে তিনি এমন একজনের কাছে তাঁর মনের ব্যথা ব্যক্ত করছেন, যিনি তাঁর বাপের বাড়ির লোক। অথবা এমন একজনের কাছে, যাঁর কুন্তীর সমতুল্য অভিজ্ঞতা খানিকটা আছে।

অভিজ্ঞতা মানে এই নয় যে, দুজনের বয়স সমান, অতএব একে অপরকে বয়সোচিত জ্ঞান দান করে যাচ্ছেন। এখানে অভিজ্ঞতাটা সমান ঘটনায়, অথবা প্রায় সমান পরিস্থিতিতে। কৃষ্ণকেও কৃষ্ণের বাবা বসুদেব বন্ধু নন্দ গোপের কাছে রেখে এসেছিলেন বৃন্দাবনে। বেশ অনেক বয়স পর্যন্ত কৃষ্ণ নন্দরাজাকেই নিজের বাবা বলে জানতেন। সেই জায়গা থেকে কৃষ্ণ অনেক কষ্টে, অনেক বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যেও আপন ক্ষমতায় নিজের পিতা-মাতার কাছে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু কুন্তীর ব্যাপারটা আরও করুণ। কথাটা একটু খুলে বলি। একটি নিঃসন্তান দম্পতি যখন পিতৃমাতৃহীন একটি শিশুকে পুত্র হিসেবে পালন করেন, সেই শিশু বড় হয়ে নিজের পরিচয় জানলে, তার এক রকম মনের গতি হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত এই শিশুটির চেয়ে তার মনের গতি কিন্তু আরও বিচিত্র হবে, যার বাবা-মা বেঁচে আছেন, অথচ নির্বোধ বয়সে যাকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল অন্যের কাছে। পরিস্থিতি কিন্তু আরও জটিল এবং কঠিন মনস্তত্ত্বের পরিসর হয়ে দাঁড়াবে যদি এমন একজনকে দত্তক দেওয়া হয়—যে তার বাবা-মায়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। খেলাধূলার বয়স যায়নি, কিন্তু বাবা-মাকে যে শিশু নিজের ভালবাসার মাধুর্যে চিনে গেছে, তাকে যদি অন্যের কাছে দত্তক দেওয়া যায়, তবে তার মনের যে জটিল অবস্থা হয় কুন্তীরও তাই হয়েছে।

কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছেন—আমি নিজেকে দোষ দিতে পারি না, এমন কী দোষ দিই না দুর্যোধনকেও। সমস্ত দোষ আমার জন্মদাতা পিতার—পিতরন্ত্বেব গর্হেয়ং নাত্মানং ন সুযোধনম্। আমি যখন বাচ্চাদের খেলনা নিয়ে খেলা করি, তখন আমাকে তোমার ঠাকুরদাদা, অর্থাৎ আমার বাবা তাঁর বন্ধু কুন্তিভোজকে দিয়ে দিলেন।

কুন্তী এইটুকু বলেই থামেননি। আরও কটা কথা বলেছেন। আজকের নারী-স্বাধীনতার প্রবক্তাদের মুখে নতুন কী কথা শুনব? তাঁরা বলেন—স্ত্রীলোককে সেকালে গয়নাগাটি, ধনসম্পত্তির মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের স্বাধীন সত্তার কথা সচেতনভাবে কেউ ভাবেননি। ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে প্রায় দু' হাজার-আড়াই হাজার বছর আগে কুন্তীর মুখ দিয়ে এ কী কথা বেরুচ্ছে? কুন্তী বলছেন—যাঁদের টাকা-পয়সা আছে, তাঁরা যেমন দেদার টাকা-পয়সা দান-ছত্তর করে নাম কিনতে চান, আমার বাবাও তেমনই আমাকে তাঁর বন্ধুর কাছে দত্তক দিয়ে বেশ নাম কিনলেন। আমাকে দিয়ে দিলেন যেন আমি একটা টাকার থলে—ধনং বৃত্তৈরিবার্পিতা।

বাংলায় যা বলেছি, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাই বলেছেন কুন্তীর কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তিনি বলেছেন—দাতা হিসেবে খ্যাতি পাওয়ার জন্য ধনী ব্যক্তি যেমন অক্লেশে ধন দান

করেন, আমার বাবাও তেমনই অক্লেশে বন্ধুর কাছে দত্তক দিয়েছিলেন আমাকে—বৃত্তৈর্বদান্যত্বেন খ্যাতৈর্ধনং যথা অক্লেশেন অর্প্যতে, তদ্‌বৎ যেনাহম্‌ অর্পিতা।

কুন্তী সেকালের পুরুষ-শাসিত সমাজের এক প্রধান প্রতিভূকে, যদুবংশীয় পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতীক নিজের বাবাকে যে ভাবে, যে ভাষায় নিন্দা করেছেন, আজ দু' হাজার বছর পরে আধুনিক নারী প্রগতিবাদীরা এর থেকে বেশি কী বলবেন ? কুন্তী বলেছেন—বাবা এবং শ্বশুর—দুই পক্ষই আমাকে বঞ্চনা করেছে, আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী, দুঃখের চূড়ান্ত হয়েছে আমার—অত্যন্ত দুঃখিতা কৃষ্ণ কিং জীবিতফলং মম।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়—শ্বশুরবাড়িতে বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ক্রমাগত বঞ্চনা পেতে পেতে আজ তাঁর মনের অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে তাঁর ক্ষোভ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে একেবারে তাঁর জন্মদাতা পিতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অন্তত এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে যে, কুন্তী এমন একজন অতিসংবেদনশীল স্পর্শকাতর মহিলা, যাঁকে বাল্যকালের সেই ঘটনাটি এখনও পীড়া দিয়ে চলেছে। তাঁকে যখন কুন্তিভোজের কাছে দত্তক দেওয়া হয়, তখন তাঁর পুতুল-খেলার বয়স হয়ে গিয়েছিল বলেই পিতা বলে চিহ্নিত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতাও যথেষ্টই হয়ে গিয়েছিল। যে শিশু বাবা-মাকে বাবা-মা বলেই ভালবেসে ফেলেছে, তাকে যদি হঠাৎ দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার যে কিছু নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটে—সে কথা বোধকরি খুব কঠিন মনস্তত্ত্বের তত্ত্বকথা নয়, একেবারে সাধারণ কথা ! ছোটবেলায় এই নিরাপত্তাবোধের অভাব কুন্তীর কাছে এতটাই 'শকিং' হয়ে গেছে যে, তাঁর মানসিক গতি-প্রকৃতিও সেইভাবেই গঠিত হয়েছে, জটিলতাও কিছু এসেছে।

বস্তুত দত্তক দেওয়ার সূত্রে এই পিত্রন্তরের ঘটনা যদি না ঘটত, তা হলেও কুন্তীর জীবনের ঘটনাগুলি একইরকম ঘটতে পারত কিংবা ঘটতে পারত অন্য কোনও উৎপাত। দত্তক নেওয়া মেয়ে বলেই মহারাজ কুন্তিভোজ কুন্তীর বিয়ে কিছু খারাপ দেননি। তা ছাড়া এ বিয়ের ব্যাপার-স্যাপার কৃষ্ণের পিতামহ আর্যক শূর অথবা কৃষ্ণপিতা বসুদেব কিছুই জানতেন না এমনও মনে হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা কুন্তী হস্তিনাপুরের অধিপতি পাণ্ডুকে বরণ করেছিলেন স্বয়ম্বরসভায়, স্বেচ্ছায়। পাণ্ডুও ভালই রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যে মারা যাবেন, তাই বা কে জানত ? অথবা কে জানত প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সঙ্গে এত অপব্যবহার করবেন ?

আসলে অবস্থার গতিকে সবই যখন বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে—স্বামী মারা গেছেন, শ্বশুরবাড়িতে নিজের অধিকার নেই, সন্তানেরা বনবাসের কষ্ট ভোগ করলেন এবং এখন সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা স্বরাজ্য উদ্ধার করতে পারছেন না—এমন অবস্থার গতিকে কুন্তীর সমস্ত রাগ গিয়ে জমা হয়েছে জন্মদাতা পিতার ওপরেই। অভিমান হচ্ছে—যার পিতা সেই শৈশব অবস্থায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করে একটি শিশু কন্যাকে অন্যের কাছে দত্তক দিয়েছেন, তার আর জীবনের মূল্য কী—কিং জীবিতফলং মম। অথবা কুন্তী তাঁর পিতার ওপর অভিমানে তাঁর জীবনের ঘটনার শৃঙ্খল অন্যভাবে সাজাতে চান—অর্থাৎ যদি তাঁর পিতা কুন্তিভোজকে দত্তক না দিতেন, তা হলে স্বয়ম্বরসভায় পাণ্ডু আসতেন না, যদি পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হত, তা হলে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা জানি—এসব কথা ঠিক নয়। এসব কথা কুন্তী এইভাবেই ভেবেছিলেন কি না, তাও মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, পিতার ওপর তাঁর এই অসম্ভব আক্রোশ এসেছে তাঁর সারা জীবন ভোগান্তিরই ফলে। বিশেষত পাণ্ডুর জীবনাবসানের পর শ্বশুরকুলে পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাঁকে এতই কষ্ট পেতে হয়েছে যে, তাঁর পিতার সম্বন্ধে এই অভিমান তাঁর মনের অবস্থাকে আরও জটিলতর এবং দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে বলে আমরা মনে করি। কুন্তী-চরিত্র বিশ্লেষণের সময় তাঁর পিতার সম্বন্ধে এই অভিযোগ আর কোনওভাবে কাজ করেছে কি না তাও আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করব।

মথুরা অঞ্চলে আর্যক শূর যেখানে রাজত্ব করতেন, সে রাজত্ব খুব বড় ছিল না বটে কিন্তু সেখানে গণতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন কিছু কিছু চলত। রাজ্যগুলি ছোট ছোট 'রিপাবলিক' বা 'সংঘে' বিভক্ত ছিল। কারণ যদুবংশের অধস্তন বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক পুরুষেরা এই সংঘগুলিকেই নেতৃত্ব দিতেন বলে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পেয়েছি। যাই হোক আর্যক শূর এইরকমই একটা সংঘাধিপতি ছিলেন, আর কুন্তিভোজ ছিলেন অন্য একটি সংঘের অধিপতি। ছোট ছোট রাজা হলেও এঁদের সম্মান কারও কম ছিল না।

বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, কুকুর—এইগুলি একই যদুবংশের একেকজন নামী রাজার নাম। অধস্তন পুরুষেরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই নাম ব্যবহারও করতেন। কুন্তীর পালক পিতা কুন্তিভোজ যেমন ভোজবংশীয়, তেমনই অত্যাচারী কংসও ছিলেন ভোজবংশীয়। কুন্তী হয়তো অভিমান করেই বলেছেন যে, তাঁর পিতা বন্ধুত্বের খাতির রাখতে গিয়ে কুন্তিভোজের কাছে তাঁকে দত্তক দিয়েছিলেন—অদাত্তু কুন্তিভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে। বাস্তবে কিন্তু আর্যক শূর অর্থাৎ কুন্তীর জন্মদাতা পিতার সঙ্গে কুন্তিভোজের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

রাজা শূরের আপন পিসতুতো ভাই হলেন এই কুন্তিভোজ। খিল হরিবংশ থেকে জানতে পারছি—শূরের প্রথম ছেলে নাকি কৃষ্ণপিতা বসুদেব— বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্বম্ আনকদুন্দুভিঃ। তারপর নাকি তাঁর আরও কয়টি ছেলে এবং একেবারে শেষে পাঁচটি মেয়ে জন্মাল—যাঁদের একজন হলেন কুন্তী। সাধারণত মানুষের ঘরে এমন সুশৃঙ্খলভাবে প্রথমে সবচেয়ে গুণশালী পুত্রটি, তারপর কতগুলি এলেবেলে এবং তারও পরে 'লাইন' দিয়ে কতগুলি মেয়ে—এরকম হয় না বলেই সন্দেহ হয় যে, হরিবংশের লেখক-ঠাকুর কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের মাহাত্ম্যে আর্যক শূরের সন্তানদের সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছেন। বাস্তব ছিল অন্যরকম।

হরিবংশের প্রমাণে এটা আমরা প্রথমে স্বীকার করে নেব যে, বৃষ্ণি-সংঘের নেতা-রাজা আর্যক শূর বিয়ে করেছিলেন তাঁদেরই পালটি ঘর ভোজবংশের মেয়েকে। আবার ওই কুন্তিভোজও ছিলেন ভোজদেরই ছেলে। ঠিক এইখানটায় আমাদের মহাভারতের কবিকে স্মরণ করতে হবে। মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুন্তিভোজ ছিলেন রাজা শূরের আপন পিসতুতো ভাই। তাঁর ছেলে-পিলে ছিল না এবং হরিবংশ জানাচ্ছে—তাঁর অনেক বয়সও হয়ে যাচ্ছিল—শূরঃ পূজ্যায় বৃদ্ধায় কুন্তিভোজায় তাং দদৌ।

আর্যক শূরের ভোজদের ব্যাপারে একটু টান বেশি ছিল। নিজের স্ত্রী ভোজ-ঘরের, পিসির বিয়ে হয়েছে ভোজ-বাড়িতে আবার তাঁর প্রিয় পুত্র বসুদেব—ভবিষ্যতে যিনি কৃষ্ণের পিতা হবেন—তিনিও লালিত-পালিত হয়েছেন ভোজদের বাড়িতে। ভোজ-কুলের কলঙ্ক মহারাজ কংস এক সময় বসুদেবকে গালাগালি দিয়ে বলেছিলেন—আমার বাবা তোকে মানুষ করেছে—মম পিত্রা বিবর্ধিতঃ। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ভোজবংশীয় নিঃসন্তান কুন্তিভোজের সঙ্গে আর্যক শূরের যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল বলেই আমাদের অনুমান।

আসলে সাধারণ গেরস্ত-বাড়িতে যা হয় এখানেও তাই হয়েছে। কুন্তিভোজ বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন অথচ এখনও তাঁর ছেলেপিলে কিছুই হল না। হয়তো এই অবস্থায় তিনি শূরকে বলেন—তোমার তো বয়স কম। বাপু হে! আমাকে তোমার একটি সন্তান মানুষ করার সুযোগ দাও। মায়া পরবশ হয়ে আর্যক শূর তাঁকে বলেন—ঠিক আছে, আমার প্রথম যে সন্তানটি হবে, তাকেই দিয়ে দেব তোমার হাতে। হরিবংশ এ ব্যাপারে কিচ্ছুটি জানায়নি, কিন্তু মহাভারত বলেছে—আর্যক শূর রীতিমতো প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন এই কথা—অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায়—অর্থাৎ প্রথমে যে জন্মাবে, তাকেই দেব। আর্যক শূরের প্রথম সন্তান হল একটি মেয়ে—পৃথা। নিঃসন্তান কুন্তিভোজের ওপর মায়ায় আর্যক শূর তাঁর প্রথমা কন্যাটিকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন—'অগ্রজাতেতি তাং কন্যাং শূরো'নুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া। অদদৎ কুন্তিভোজায়... ॥

পরবর্তী সময়ে কুন্তী নিজের মনের জ্বালায় কুন্তিভোজের প্রতি আর্যক শূরের এই অনুকম্পা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বটে, তবে নিজের স্বামী পাণ্ডু এবং নিজের সপত্নী মাদ্রীর পুত্রকামনার নিরিখে নিঃসন্তান পুরুষ বা রমণীর জ্বালা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। সেটাও যে তিনি বোঝেননি, তার কারণ—সন্তান ধারণের উপায় ছিল তাঁর আপন করায়ত্ত। এতই সহজ, প্রায় খেলার মতো। সে কথা আসবে যথাসময়ে।

বোঝা গেল—কৃষ্ণপিতা বসুদেব তাঁর বাবা আর্যক শূরের প্রথম পুত্র হলেও হতে পারেন, কিন্তু প্রথম সন্তান নন। কুন্তীই সবার বড় এবং তাঁকে যেহেতু দত্তক দেওয়া হয়েছে অতএব হরিবংশে বসুদেবই হয়ে গেছেন শূরের প্রথম ছেলে অথবা প্রথম সন্তানও। মহাভারতে কিন্তু তিনি 'অগ্রজাতা' এবং সে কথা কুন্তী যথেষ্টই জানতেন বলে মনে হয়। কেননা, স্বয়ং কুন্তিভোজও একথা লুকোননি। মহারাজ আর্যক শূরের প্রথম সন্তানের গৌরব, বসুদেবের মতো বিশাল পুরুষের ভগিনী হওয়ার গৌরব—কোনওটাই কুন্তিভোজ পৃথা (কুন্তী)-র কাছে লুকোননি। হয়তো সেই কারণেই কুন্তীর অভিমানটাও থেকেই গেছে। আর্যক শূরের প্রথমা কন্যাটিকে দত্তক নিয়েও রাজা কুন্তিভোজ যে তাঁকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেননি বা করতে পারেননি, সেই কারণেই জন্মদাতা পিতা সম্বন্ধে কুন্তীর সচেতনতা এবং অভিমান—দুইই থেকে গেছে।

দত্তক কন্যা হিসেবে পৃথা যেদিন মহারাজ কুন্তিভোজের বাড়িতে এলেন, তখন তিনি নেহাতই শিশু। এই রাজ্যে এসে তাঁর খারাপ লাগার মতো কিছু ছিল না। রাজা কুন্তিভোজ পরম আহ্লাদে তাঁর এই নতুন-পাওয়া মেয়েকে মানুষ করছিলেন। কোনও কিছুরই অভাব নেই এবং আস্তে আস্তে শূর-দুহিতা পৃথা কুন্তীতে পরিণত হলেন। কথাটা বললাম এই জন্য যে, কুন্তিভোজের পালন-পোষণে তাঁর নামটাই শুধু পালটে যায়নি, তিনি কুন্তিভোজের বাড়ির আচার-আচরণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। মেয়েদের যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করতে হয়, তাই নিজেকে পালটানোর বীজটা তাদের মধ্যে বুঝি থেকেই যায়। আর কুন্তী যেহেতু শিশুকালেই চলে-এসেছেন অন্য এক বাড়িতে তাই পরিবর্তন সইয়ে নিতে তাঁর সময় লাগেনি। শৈশব পেরিয়ে কুন্তীর শরীর থেকে কৈশোরের গন্ধও যখন যাই-যাই করছে, সেই সময়ের মধ্যে ভোজবাড়ির গৃহিণীপনার দায়িত্ব প্রায় সবই তাঁর হাতে এসে গেছে। কুন্তিভোজও তাঁর ওপর অনেকটাই নির্ভর করেন।

নির্ভর করার কারণও আছে। মনু মহারাজ যতই বলুন—মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়ে থাকবে, আয়-ব্যয় দেখবে ইত্যাদি,—বুঝলাম, সেসব কথা মেয়েদের খানিকটা ঘরে আটকে রাখার জন্য ; কিন্তু মহাভারতের সমাজ মনুর নিয়ম-মতো চলত না। সেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও কুন্তী যে অল্প বয়সেই একেবারে ভোজবাড়ির গিন্নিটি হয়ে উঠলেন, সে বুঝি কুন্তিভোজের আস্কারায় আর অত্যধিক স্নেহে। একটা ঘটনা এই সূত্রেই বলে নিই।

কুন্তিভোজের বাড়িতে অতিথি এসেছেন দুর্বাসা মুনির। দুর্বাসা বড় কঠিন স্বভাবের মুনি। প্রখর তাঁর তেজ, বিশাল তাঁর ব্যক্তিত্ব। চেহারাটাও বেশ লম্বা-চওড়া, দর্শনীয়। মুখে দাড়ি, মাথায় জটা। তপস্যার দীপ্তি সর্বাঙ্গে। এহেন দুর্বাসা মুনি কুন্তিভোজের বাড়িতে এসে বললেন—তোমার বাড়িতে কিছুদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। তুমি বা তোমার বাড়ির লোকজন, আমার সঙ্গে কোনও অপ্রিয় আচরণ কোরো না—ন মে ব্যলীকং কর্ত্তব্যং ত্বয়া বা তব চানুগৈঃ।

দুর্বাসা নিজেকে চিনতেন। তাই কেমনভাবে তিনি থাকবেন কুন্তিভোজের বাড়িতে—তার একটা আভাস আগেভাগেই দিয়ে রাখলেন। ঋষি বললেন—আমি যেমন ইচ্ছে বাড়ি থেকে বেরব, যেমন ইচ্ছে ফিরে আসব—যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়ম্ আগচ্ছেয়ং তথৈব চ—আমার অশন, আসন, শয়ন, বসন—সব কিছুই চলবে আমারই মতে। কেউ যেন আমাকে বাধা দিয়ে অপরাধী না হয়—নাপরাধ্যেত কশ্চন। অর্থাৎ আমাকে যেন কেউ 'ডিসটার্ব' না করে।

কেউ যেন অপরাধ না করে—মুনির এই সাবধান-বাণীর মধ্যে তাঁর স্বেচ্ছাময়তার ইঙ্গিত যত আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে সেই ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁর ভবিষ্যৎ ক্ষমাহীনতার ইঙ্গিত—যে তাঁকে বাধা দেবে। কুন্তিভোজকে তিনি বলেই দিয়েছিলেন—আমি এইরকম স্বেচ্ছাচারে

থাকব—এতে যদি তোমার অমত না থাকে তবেই এখানে থাকব, নচেৎ নয়—এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতে'নঘ। দুর্বাসা মুনিকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে,—যদি তোমার অমত থাকে অথবা তোমার যদি পছন্দ না হয়—এই কথাগুলির কোনও মূল্য নেই। অর্থাৎ দুর্বাসার কথা শুনে কুন্তিভোজ যদি বলতেন—আপনার যেরকম নিয়ম-কানুন শুনছি, তাতে তো একটু অসুবিধেই হবে। মানে আপনি যদি একটু...।

দুর্বাসার কাছে এসব কথার ফল—অভিশাপ। আবার তাঁর কথা মতো চলে যদি অপরাধ ঘটে তারও ফল ওই অভিশাপই। তবু যদি কোনওক্রমে দুর্বাসা তুষ্ট হন এই আশায় অন্যদের মতোই কুন্তিভোজ বললেন—না, না, আপনি এসব কী বলছেন? আপনি যেভাবে থাকতে চাইবেন, সেইভাবেই থাকবেন—এবমস্তু। কুন্তিভোজ কথাটা বললেন বটে, কিন্তু বলেই এই অদ্ভুত সঙ্কটে প্রথম যাঁর কথা স্মরণ করলেন—তিনি তাঁর প্রিয় কন্যা মনস্বিনী কুন্তী। কুন্তিভোজ আগাম দুর্বাসাকে বলে বসলেন—আমার একটি বুদ্ধিমতী কন্যা আছে। নাম পৃথা। যেমন তার স্বভাব-চরিত্র, তেমনই সৎ তাঁর প্রকৃতি, দেখতেও ভারি মিষ্টি—শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী। কুন্তিভোজ বললেন—আমার এই সর্বগুণময়ী মেয়েটি আপনার দেখাশুনো করবে। আমার ধারণা—সে আপনার অবমাননা না করে তার আপন স্বভাবেই আপনাকে তুষ্ট করতে পারবে। আমার বিশ্বাস—আপনি তুষ্ট হবেন, মুনিবর—তুষ্টিং সমুপযাস্যসি।

হয়তো দুর্বাসা দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার বসলেন। কুন্তিভোজ মুনির সঙ্গে কথা বলে তাঁকে পা ধোয়ার জল আর বসার আসন দিয়েই মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে এলেন ভিতর-বাড়িতে। কৈশোর-গন্ধী বয়সটাকে বিদায় দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সরলতা নিজের চোখের মধ্যে পুঞ্জীভূত করে ডাগর-চোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুন্তী—পৃথাং পৃথুললোচনাম্। কুন্তিভোজ বললেন—দুর্বাসা মুনি আমার ঘরে উপস্থিত। আমাদের এখানে তিনি কিছুদিন থাকতে চান। আমি তাতে হ্যাঁ বলেছি। তাঁর পূজা-আরাধনা এবং তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে তুষ্টির চরম আশ্বাস আমি তাঁকে দিয়েছি তোমারই ভরসায়—ত্বয়ি বৎসে পরাশ্বস্য ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্। এখন আমার কথা যাতে মিথ্যে না হয়, তুমি তার ব্যবস্থা কবো বাছা।

কুন্তিভোজ এইটুকু বলেই শেষ করতে পারতেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি যেভাবে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তার নিরিখে তিনি আরও কটা কথা কুন্তীকে বলার প্রয়োজন বোধ করলেন। সেকালের সমাজে তপস্যা এবং স্বাধ্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্মান ছিল বিশাল, অতএব সেই ব্রাহ্মণের তুষ্টির জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—এমন একটা ইতিবাচক অনুজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তিভোজ কতগুলি মানুষের অপমৃত্যুর কথা বললেন—যাঁরা ব্রাহ্মণের অবমাননা করে ওই ফল লাভ করেছে। কুন্তিভোজ স্বীকার করলেন যে, হ্যাঁ ওই হঠাৎক্রোধী, অভিশাপ-প্রবণ একজন মুনিকে তুষ্ট করার ভার কুন্তীর ওপর তিনিই ন্যস্ত করেছেন—সো'য়ং বৎসে মহাভাগ আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্।

কুন্তিভোজ জানতেন—ব্রাহ্মণ আর দুর্বাসা মুনিতে তফাত আছে। দুর্বাসার স্বেচ্ছাময় ব্যবহার অপিচ তাঁর সাবধানবাণী সত্ত্বেও কুন্তিভোজ যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়ে কুন্তীকে তাঁর তুষ্টি-বিধানের জন্য নিয়োগ করলেন—এর মধ্যে কিছু কিছু সচেতনতা কাজ করেছে, স্বার্থও কিছু কিছু। একেবারে আপন ঔরসজাতা কন্যাকে তিনি এভাবে নিয়োগ করতে পারতেন কিনা—তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। আর সেইজন্যেই কুন্তিভোজকে মেয়ের কাছে সাফাই গাইতে হচ্ছে, ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, এমনকী চাটুকারিতাও করতে হচ্ছে। কুন্তী বোধহয় সে-কথা বুঝতেও পারছেন। তাঁর অশান্তির বীজ এখানেই।

কুন্তিভোজ বললেন—অতিথি ব্রাহ্মণদের সৎকার করার ব্যাপারে তোমার নিষ্ঠার কথা আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ঘরের ভৃত্যরা—যারাই আছে, সবার প্রতি তোমার প্রীতি-ব্যবহার আমি জানি। তারাও প্রত্যেকে তোমার ব্যবহারে তুষ্ট। লোক-ব্যবহারের এইসব ক্ষেত্রে তুমি সর্বত্র তোমার উপস্থিতি প্রমাণ করেছ অর্থাৎ তুমিই সর্বত্র জুড়ে বসে আছ—সর্বম্ আবৃত্য বর্ত্তসে। তবু এখনও তুমি ছোট, এবং তুমি আমার মেয়ে—সেইজন্য ব্রাহ্মণের ক্রোধের

ব্যাপারটা মাথায় রেখে আমি তোমায় শুধু খেয়াল রাখতে বলছি।

কুন্তিভোজ এখানেও শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তা করলেন না। কিন্তু এইবারে তিনি যে কথাগুলি বললেন তার মধ্যে দত্তক পাওয়া কন্যার মধ্যে তাঁর আত্মীকরণের মাধুর্য যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, তার আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে এক ধরনের সংশয় ; সামান্যতম হলেও সে সংশয় কুন্তীর মনে অন্য এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে—যা সচেতন মনে বোঝা যায় না। একটু বুঝিয়ে বলি কথাটা, একটা বোকা-বোকা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি।

ধরুন, একটি গৃহস্থ বাড়িতে পুত্রের কৃতিত্ব এবং অকৃতিত্বের ব্যাপার নিয়ে মা-বাবা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। ধরুন, ছেলেটি ভাল কোনও কাজ করেছে, তখন মা ছেলেটির বাবাকে বলেন—আমার ছেলে বলে কথা, আমি আগেই তোমাকে বলেছিলাম না, ছেলে আমার...ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ মায়ের গলার শিরা ফুলে উঠল, গর্বে মুখ উজ্জ্বল হল। কিন্তু এই ছেলেটি যদি খারাপ কিছু করে আসে, সেদিন তার গর্ভধারিণী স্বামীকে বলবেন—এই যে, তোমার ছেলে কী করেছে শুনেছ ? আগেই আমি সাবধান করেছিলাম, তোমার ছেলেকে তুমি মানুষ করো, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরকম একটা কথোপকথন থেকে—বংশের ধারা যাবে কোথায়, যেমন বাপ তেমনই ছেলে—ইত্যাদি অসংখ্য গার্হস্থ্য এবং দাম্পত্য প্রবাদ আমি বহুত্র শুনেছি। অর্থাৎ এক একটা সময় আসে যখন মা কিংবা বাবা পুত্র-কন্যাকে আপোসে 'disown' করেন। সাধারণ জীবনে দৈনন্দিনতার গড্ডলিকাপ্রবাহে এইসব কথোপকথন বড় বেশি মনস্তাপ ঘটায় না। বাবা-মার মনেও না, পুত্র-কন্যার মনেও না। কিন্তু পুত্র-কন্যার জীবন যদি সরল না হয়, তা যদি বাঁধাধরা গতানুগতিকতার বাইরে হয়, তবে বাবা-মায়ের সাধারণ কথাও অনাত্মীকরণের বীজ বপন করতে পারে পুত্র-কন্যার মনে। আমরা এবার কুন্তিভোজের কথায় ফিরে আসব।

কুন্তিভোজ বললেন—প্রসিদ্ধ বৃষ্ণিদেব বংশে তুমি জন্মেছ। মহারাজ শূরের তুমি প্রথম মেয়ে। মহামতি বসুদেবের ভগিনী তুমি। তোমার জন্মদাতা পিতা শূর প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে, তাঁর অগ্রজাতা প্রথম কন্যাটিকে আমার হাতেই তুলে দেবেন তিনি। তিনি কথা রেখেছেন, তিনি সানন্দে তাঁর কন্যাটিকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্—সেই জন্যই আজ তুমি আমার মেয়ে।

বাবা হয়ে সানন্দে নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছেন অন্যের হাতে ! যত বন্ধুই হন, তবু সানন্দে ? কুন্তীর মনে খট করে বাজল না তো ? কুন্তিভোজ বললেন—যেমন প্রসিদ্ধ কুলে তুমি জন্মেছ, তেমনই প্রসিদ্ধ কুলে তুমি বড় হয়েছ। এক সুখ থেকে আরেক সুখ, এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে পড়েছ— সুখাৎ সুখম্ অনুপ্রাপ্তা হ্রদাৎ হ্রদমিবাগতা। এই উপমাটি একেবারে প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের উপমা। মহাভারতে এটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে— যখন এক রাজবাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে আরেক রাজবাড়িতে। কুন্তিভোজ সেই উপমাটি নিজের অজান্তেই ব্যবহার করে ফেললেন। কিন্তু শৈশবের পরিচিত বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য বাড়িতে, অন্য বাবা-মার কাছে মানুষ হওয়ার কী সুখ—তা কুন্তীই শুধু জানেন। অন্যদিকে কুন্তিভোজ জানেন শুধু রাজবাড়ির সাজাত্য।

সে যাই হোক, এক কুল থেকে আরেক কুলে, এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে কুন্তীর না হয় বড় সুখই হল, কিন্তু কুন্তিভোজ এবার কী বলছেন ? বলছেন—জান তো, মন্দ এবং নীচ বংশের মেয়েদের যদি খানিকটা আচার-নিয়মের মধ্যে রাখা যায় তবে তারা চপলতাবশত যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেলে—দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ। বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে।

হঠাৎ এই কথাটা কেন ? কুন্তিভোজ যা বলেছেন, তার অর্থ যদি একান্তই সরল-সোজা হয় তবে কিছুই বলার নেই। কিন্তু মুশকিল হল, নৈষধের কবি শ্রীহর্ষ লিখেছেন—কাব্য-সাহিত্যে এত যে ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি তার মূল নাকি বিদগ্ধা রমণীদের বাচনভঙ্গী—বিদগ্ধনারীবচনং তদাকরঃ। কাজেই কুন্তিভোজ যতই সোজা-সরলভাবেই কথাটা বলুন না কেন, মহাভারতের অন্যতমা নায়িকা কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত খুঁজে পেতে পারেন। ভাবতে পারেন—হঠাৎ করে এই মন্দ বংশের কথাটা এল কেন ? নিয়ম আচারের শৃঙ্খলের মধ্যে থেকে চপলতা যদি কিছু ঘটে, তা হলে দোষ হবে বংশের, যে

বংশে তিনি জন্মেছেন সেই বংশের দোষ হবে। অর্থাৎ এখন বৃষ্ণিকুলকে যতই ভাল-ভাল বলুন, তেমন তেমন কিছু ঘটলে কুন্তিভোজ অনাত্মীকরণের সুযোগ ছাড়বেন না। অর্থাৎ তিনি 'disown' করবেন।

কুন্তিভোজ দুর্বাসাকে তুষ্ট করার জন্য এক লহমার মধ্যে কুন্তীকে স্মরণ করেছেন বটে, কিন্তু আরও একটা সমস্যা তাঁর ছিল, যে সমস্যার কথা তিনি ঘুরিয়ে বলেছেন কুন্তীকে। বলেছেন—পৃথা! রাজকুলে তোমার জন্ম, দেখতেও তুমি ভারী সুন্দর—পৃথে রাজকুলে জন্ম রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্—তুমি যেন সেই বংশের অভিমান, রূপের অভিমান ত্যাগ করে দুর্বাসার সেবা কোরো। তাতে তোমারও মঙ্গল, আমারও। মুনি যদি ক্রুদ্ধ হন তা হলে আমার বংশ ছারখার হয়ে যাবে—কৃৎস্নং দহ্যেত মে কুলম্।

বোঝা যাচ্ছে, কুন্তিভোজ অনেক দায়িত্ব দিয়ে দিলেন কুন্তীকে, একেবারে শুষ্ক দায়িত্ব। তিনি একবারও বললেন না—অন্যথা কিছু ঘটলে—তুমি আমার মেয়ে, আমার সম্মান যাবে। বললেন—পৃথা! অর্থাৎ সেই শূর বংশের নাম—পৃথা! তোমার জন্ম রাজকুলে অর্থাৎ সেই রাজবংশের মেয়ে হয়েও অন্য কিছু ঘটলে আমার বংশ ছারখার হয়ে যাবে।

কুন্তী সব বোঝেন, সমস্ত ইঙ্গিত বোঝেন। কুন্তিভোজ তাঁকে মহারাজ শূরের মেয়ে, বসুদেবের ভগিনী বলে যতখানি চাটুকারিতা করেছেন, আমি বুঝি—এসব কিছুর থেকেও বড়—তিনি কৃষ্ণের পিসি। নৈষধে-বলা সেই বিদগ্ধা রমণীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা। হায়! কুন্তিভোজ যদি তাঁর কথার ইঙ্গিতগুলি বুঝতে পারতেন? অথবা তিনি সবই বুঝেছেন।

কুন্তী প্রিয়তম সম্বোধনে 'বাবা' বলে কথা আরম্ভ করলেন না। কুন্তিভোজের মুখে শূর-নন্দিনী 'পৃথা' সম্বোধনের উত্তরে কুন্তীর ভিতর থেকে জবাব দিলেন পৃথা। বললেন—রাজেন্দ্র! এই সম্বোধনের মধ্যে পিতার অভীপ্সাপূরণে কন্যার স্নেহ-যন্ত্রণা নেই, আছে—রাজার আদেশে রাজকর্মচারীর কর্ম-তৎপরতা, রাজার ইচ্ছায় প্রজার ইতিকর্তব্য পালন। এখন এই বয়সে বুঝতে পারি মহাকাব্যের কবিদের এই সব শব্দ-ব্যঞ্জনা কত গভীর করে বুঝেছিলেন কালিদাস। লোক-রঞ্জক রামের আদেশে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে রেখে এলেন বাল্মীকির তপোবনে, তখন সীতাও এই সম্বোধনেই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—লক্ষ্মণ! সেই রাজা রামচন্দ্রকে বোলো—বাচ্যস্ত্বয়া মদ্‌বচনাৎ স রাজা—এই গর্ভাবস্থায় অনুরক্তা স্ত্রীকে যে তিনি বিসর্জন দিলেন, সে কী তাঁর যশেরই উপযুক্ত হল, না বংশ মর্যাদার উপযুক্ত হল?

এখানেও সেই বংশ-মর্যাদা আর যশোরক্ষার প্রশ্ন এসেছে সদ্য যৌবনবতী কুন্তীর তথাকথিত কন্যাত্বের মূল্যে। কুন্তী তাই কন্যাজনোচিত মমতায় জবাব দিতে পারছেন না। তিনি বললেন—রাজেন্দ্র! আচার-নিয়ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমি নিশ্চয়ই সৎকার করব। তুমি যেমনটি তাঁকে কথা দিয়েছ রাজা, আমি সেইভাবেই কাজ করব। ব্রাহ্মণ-অতিথি ঘরে এসেছেন, তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদায় সৎকার করা আমাদের চিরকালের 'স্বভাব'। এতে যে তোমার ঈপ্সিত প্রিয় কার্য করা হবে অথবা আমার মঙ্গল হবে, সে আমার বাড়তি পাওনা—তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম। এখানে 'স্বভাব' শব্দটি এবং সংস্কৃতে দুটি 'চ'-এর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

কুন্তী রাজা কুন্তিভোজকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়ে বললেন—অতিথি ঋষি সকাল, বিকেল, মাঝরাতে যখন ইচ্ছে ঘরে ফিরুন, আমার ওপরে তাঁর রাগ করার কোনও কারণ ঘটবে না। তোমার আদেশমতো বামুন-ঠাকুরকে সৎকার করার সুযোগ পাচ্ছি—এতে তো আমারই লাভ, রাজা—লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র। 'আদেশ' এবং 'রাজেন্দ্র' শব্দটি পুনশ্চ লক্ষণীয়। পাঠক, মাথায় রাখবেন—এর পরের কথাগুলোও।

কুন্তী বললেন—তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, 'রাজা'—বিশ্রব্ধো ভব রাজেন্দ্র—তোমার বাড়িতে থেকে বামুন-ঠাকুরের কোনও অসন্তোষ ঘটবে না। আমি আমার যথাসাধ্য করব, রাজা! অন্তত আমার জন্য তুমি অতিথি-ব্রাহ্মণের কাছ থেকে যে কোনও ব্যথা পাবে না—সে-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি—ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ।

কুন্তীর ভাষণ ছিল অনেকটাই। কিন্তু সম্পূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে 'রাজন্', 'রাজেন্দ্র', 'নরোত্তম', 'নরেন্দ্র'—এই সম্বোধনগুলি পিতৃসম্বোধনের প্রতিতুলনায় আমার কাছে বড় বেশি লক্ষণীয় মনে হয়েছে। তা ছাড়া শেষ বাক্যে পরম আশ্বস্ত কুন্তিভোজও এই বিদগ্ধা রমণীকে পিতৃত্বের মাধুর্যে অভিষিক্ত করেননি। কুন্তীকে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর আপন আদেশ সমর্থনের আনন্দে—পরিষ্বজ্য সমর্থ্য চ। বলেছেন—তা হলে এই করতে হবে, ওই করতে হবে ইত্যাদি। সৌজন্যের চূড়ান্ত করে আরও বলেছেন—ভদ্রে! আমার ভালর জন্য, তোমার নিজের ভালর জন্য এবং আমার বংশের ভালর জন্যও এই যেমন কথা হল, তেমনটিই কোরো—এমবেতৎ ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যম্ আবশঙ্কয়া।

কথা শেষ করে কুন্তিভোজ মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলেন দুর্বাসার কাছে। বললেন—ঋষিমশাই! এই আমার মেয়ে। ভুল করে যদি বা অজ্ঞানে কোনও অপরাধ করে ফেলে, তা হলে মনে রাখবেন না সেটা।

দুর্বাসার জন্য আলাদা ঘর ঠিক হল একটা। রাজার দুলালী পৃথা, নাকি কুন্তী, রাজবাড়ির অভিমান ত্যাগ করে, নিদ্রালস্য ত্যাগ করে সেই বাড়িতেই তাঁর স্নান-আহারের যত্ন-আত্তি করতে লাগলেন। নিজেকে বেঁধে ফেললেন কড়া নিয়মে, অবগুণ্ঠন রইল শুচিতার। মুনিকে নিয়ে জ্বালা কম নয়। এই তিনি বলে গেলেন—আমি সকালে ফিরব, কিন্তু ফিরে এলেন সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রে। হয়তো সারা বেলা কুন্তী তাঁর জন্য খাবার-দাবার সাজিয়ে বসে থাকলেন। মনে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, মুখে নেই অপ্রিয় কোনও শব্দ। এর মধ্যে যেটা বেড়েই চলেছিল, সেটা নিত্যনতুন ব্যঞ্জনের বাহার। দুর্বাসা অবশ্য এতেই ছেড়ে দিতেন না। হয়তো তিনি বাড়ি এসে দুর্লভ কোনও উপকরণের নাম করে বললেন—এই খাবারটার ব্যবস্থা করোনি? জোগাড় করো, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো—সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সো'ব্রবীৎ। তারপর সবিস্ময়ে মুনি লক্ষ করতেন তাঁর বলার আগেই সে খাবার তৈরি আছে—কৃতমেব চ তৎ সর্বম্।

নিজের নাটকে এক চরম মুহূর্তে নাটকীয়তা ঘনিয়ে আনার জন্য মহাকবি কালিদাস দুর্বাসা মুনির ক্রোধের অংশটুকু ব্যবহার করেছেন। নাটকের সখী-নায়িকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—এই দুর্বাসার ক্রোধ বড় সুলভ, স্বভাবটাও তাঁর বাঁকা—এষ দুর্বাসাঃ সুলভকোপো মহর্ষিঃ। কিন্তু মহাকাব্যের এই অন্যতমা নায়িকার পরিসরে আমরা দেখলাম—কুন্তীর সেবা-পরিচর্যায় দুর্বাসা মুনি পরম সন্তুষ্ট। কুন্তী এই দুর্মর্ষণ অতিথিকে দেবতার শ্রদ্ধাটুকু দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পরিচর্যা করেছেন—প্রিয়শিষ্যার মতো, পুত্রের মতো, বোনের মতো—শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা। এই পরিচর্যার মধ্যে খোলা হাওয়ার মতো আরও যে এক সুমধুর অথবা স্বেচ্ছা সম্পর্কের অবকাশ ছিল, সেইখানে কুন্তী ছিলেন স্থির। ব্যাসকে তাই লিখতে হয়েছে—স্বসৃবচ্চ সুসংযতা। জীবনের প্রান্তকালে কুন্তী যখন দেবতাকল্প শ্বশুর ব্যাসদেবের কাছে নিজের সমস্ত স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলির স্বীকারোক্তি করছেন, সেদিন আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—সমস্ত শুচিতা আর শুদ্ধতা দিয়ে আমি সেই মহর্ষির সেবা করেছিলাম। আমার দিকে মহর্ষির ওপর রাগ করার মতো বড় বড় অনেক ঘটনা ছিল, কিন্তু আমি রাগ করিনি—কোপস্থানেষ্বপি মহৎস্বকুপ্যন্ন কদাচন।

ভুলে গেলে চলবে না—কুন্তী অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। স্বয়ং কুন্তিভোজ তাঁকে তাঁর রূপ সম্বন্ধে সাবধানও করেছেন, আবার দুর্বাসার জন্য সেই রূপ ব্যবহারও করেছেন—হয়তো নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অথবা ইচ্ছে করেই। কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন কাছাকাছি থাকতে থাকতে, সেবা-পরিচর্যার দান-আদানের মাঝখানে দুর্বাসার শুষ্ক রুক্ষ ঋষি-হৃদয় যদি কখনও কুন্তীর প্রতি সরস হয়ে থাকে, যদি অকারণের আনন্দে কখনও চপলতা কিছু ঘটে গিয়ে থাকে তাঁর দিক থেকে—তবে আপন শুদ্ধতা আর সংযমের তেজে কুন্তী হয়তো মুনির সেই সরসতা এবং চাপল্য সযত্নে পরিহার করেছেন, নিজেকে স্থাপন করেছেন প্রিয়শিষ্যা, পুত্র অথবা ভগিনীর ব্যবহার-ভূমিতে। হয়তো ঋষির দিক থেকে এটাও একরকমের পরীক্ষা ছিল, অথবা নিরীক্ষা। অবশেষে দুর্বাসা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন কুন্তীর চরিত্রবলে এবং ব্যবহারেই—তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ

মুনিসত্তমঃ।

এক বৎসর যখন এই সেবা-পরিচর্যায় কেটে গেল, তখন মুনি খুশি হয়ে বললেন—না, কুন্তীর মধুর পরিচর্যায় সামান্যতম দোষও আমি খুঁজে পাইনি। তুমি বর চাও ভদ্রে, এমন বর, যা মানুষের পক্ষে পাওয়া দুর্লভ। এমন বর, যাতে জগতের সমস্ত সীমন্তিনী বধূদের লজ্জা দেবে তুমি। কুন্তী বললেন—আমি যা করেছি, তা আমার কর্তব্য ছিল। আপনি খুশি হয়েছেন, খুশি হয়েছেন পিতা কুন্তিভোজ, আমার আব বর চাওয়ার প্রয়োজন কী—ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র বরৈর্মম। আজ থেকে এক বছর আগে রাজোচিত নির্মমতায় যে আদেশ নেমে এসেছিল কুন্তীর ওপর, তা সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন করার পরই কুন্তী বোধহয় কুন্তিভোজকে আবার পিতা বলে ডাকলেন। এমনও হতে পারে মহর্ষির সামনে তাঁর পিতৃত্বেব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাননি কুন্তী।

যাই হোক কুন্তীর নিষ্কাম ব্যবহারে দুর্বাসা বোধহয় আরও খুশি হলেন। বললেন—ঠিক আছে। বর না হয় নাই নিলে। আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি, যে মন্ত্রে যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করতে পারবে তুমি। শুধু আহ্বানই নয় এই মন্ত্রের মাধ্যমে যে দেবতাকেই তুমি ডাকবে, সেই দেবতাই তোমাব বশীভূত হবেন। কামনা ছাড়াই হোক অথবা সকামভাবেই হোক এই মন্ত্রবলে যে কোনও দেবতা বাঁধা পড়বেন তোমাব বাঁধনে, তিনি ব্যবহার করবেন তোমার ভৃত্যের মতো—বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদ্ ভৃত্য ইবানতঃ।

দুর্বাসার বব, বড় অদ্ভুত বর। পৃথিবীতে যৌবনবতী কুমারীর প্রাপ্য ছিল আরও কত কিছু, কিন্তু সব ছেড়ে কেন যে দুর্বাসা এই দেব-সঙ্গমের বর দিলেন কুন্তীকে—তা ভেবে পাই না। একটা কথা অবশ্য মনে হয়, যা একেবারেই ব্যক্তিগত। মনে হয়—কুন্তীর রূপ ছিল অলোকসামান্য। তার ওপরে তিনি এখন সদ্য যৌবনবতী। দিনের পর দিন একান্তে এই রূপের সংস্পর্শ ঋষি দুর্বাসাকে হয়তো বা যুগপৎ বিপন্ন এবং বিস্মিত করে তুলত, হয়তো বা তাঁর মনে জাগিয়ে তুলত কোনও অকারণ বিহ্বলতা, যাতে করে কুন্তীকে তিনি স্পর্শও করতে পারতেন না, আবার ফেলেও দিতে পারতেন না—এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

সংবৎসরের শেষ কল্পে দুর্বাসা যখন বিদায় নেবার কথা ভাবছেন, তখনও কুন্তীর সম্বন্ধে সেই বিস্ময়-ব্যাকুল বিপন্নতা তাঁকে কিন্তু মোটেই উদাসীন রাখতে পারেনি। অশব্দ অস্পর্শ এক মানসিক আসঙ্গের প্রত্যুত্তরে দুর্বাসা চেয়েছেন—হয়তো প্রতিহিংসায় নয়, হয়তো অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায় দুর্বাসা চেয়েছেন—কুন্তী যেন কোনও মর্ত্য মানুষেরই সম্পূর্ণ প্রাপণীয় না হন। পরে দেখব, তা তিনি হনওনি। এমন একটা ভাব যদি থেকে থাকে যে—আমি পেলাম না, অতএব অন্য কেউ যেন তাঁকে না পায়, তবেই কুন্তীর প্রতি দুর্বাসার এই বর আমার কাছে সযৌক্তিক হয়ে ওঠে। আরও সযৌক্তিক হয়ে ওঠে মহাভারতের কবির ব্যঞ্জনা। এমন ব্যঞ্জনা যে, শুষ্ক হৃদয় ঋষির বর দেওয়ার সময়েও মনে রাখতে হচ্ছে যে,—এমন একজনকে তিনি বর দিচ্ছেন যিনি রূপে অতুলনীয়া—ততস্তাম্ অনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ। দেবলোকের বিভূতি দিয়ে দুর্বাসা কুন্তীকে দেবভোগ্যা করে রাখলেন। কুন্তীর রূপ-মাধুর্য সম্বন্ধে একেবারে নিজস্ব কোনও সচেতনতা না থাকলে এক নবযুবতীব প্রতি দেব-সঙ্গমের এই প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং বরদান একজন বিরাগী ঋষির দিক থেকে কতখানি যুক্তিযুক্ত?

একেবারে অন্য প্রসঙ্গ হলেও না বলে পারছি না যে, দুর্বাসা মুনির কাছে সংস্কৃত মহাকাব্যের কবি থেকে নাট্যকাব—সবাই যেভাবে ঋণী তাতে অন্যভাবে এই ঋষির আলাদা মর্যাদা হওয়া উচিত ছিল। পরবর্তী কালে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মাঝখানে শুধুমাত্র দুর্বাসার শাপের আমদানি করে কালিদাস যেমন নাটক জমিয়ে দিলেন, তেমনই মহাকাব্যের কবিও দুর্বাসার বরমাত্র ব্যবহার করে কুন্তীর গর্ভে মহাভারতের ভবিষ্যৎ নায়কের সম্ভাবনা তৈরি করে রাখলেন। ভারী আশ্চর্য লাগে ভাবতে—চরম একটা নাটকীয়তার জন্য—অনুকূল অথবা প্রতিকূলভাবে সেই দুর্বাসাকেই কত না ব্যবহার করেছেন মহাকবিরা। এসব কথা বলব এক সময়ে, মুনি-ঋষিদের নিয়ে আলোচনার পরিসরে।

নবীন যৌবনবতী কুন্তীর কানে দেব-সঙ্গমের রহস্য-মন্ত্র উচ্চারণ করে দুর্বাসা যেই চলে গেলেন, আর অমনই কুন্তীর কুমারী-হৃদয়ে শুরু হল নতুন এক অনুভূতি। তাঁর হৃদযন্ত্র কথা কইতে শুরু করল পুরুষ-গ্রহণের স্বাধীনতায়। সামান্যতম সংশয় শুধু মন্ত্রের বলাবল নিয়ে—পাব তো, যাঁকে চাই, তাঁকেই কি পাব ? এ কেমন মন্ত্র যাতে ইচ্ছামাত্র বশীভূত করা যায় যে কোনও অভীপ্সিত পুরুষকে ! আমি পরীক্ষা করব মন্ত্রের শক্তি, দেখব—যাকে চাই সে আমার ডাক শুনতে পায় কি না ? কুমারী হৃদয়ে এই নবসঙ্গমের ভাবনায় তাঁর ঋতুভাব ত্বরান্বিত হল। ঋতুর এই অস্বাভাবিকতা বৈদ্যশাস্ত্রে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ কুন্তী মন্ত্র পরীক্ষার জন্য সব সময় পুরুষের আসঙ্গ ভাবনায় আকুল ছিলেন—এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দদর্শর্তুং যদৃচ্ছয়া।

তারপর একদিন। সেদিন অন্তঃপুরের অট্টালিকায় একলা ঘরে পুষ্পের বিছানায় শুয়েছিলেন পুষ্পবতী কুন্তী। ভোরের সূর্য তাঁর কিরণ-করের স্পর্শে নবযুবতীর গালখানিও যেন লাল করে দিল। কী ভাল যে লাগছিল কুন্তীর ! পূর্ব দিগন্তে আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে রক্তিম সূর্য—তাঁর সুমধুর নান্দনিক পরাক্রমে মুগ্ধা কুন্তীর, মন এবং দৃষ্টি—দুইই নিবদ্ধ হল সূর্যের দিকে। রাত্রি-দিনের সন্ধিলগ্নের এই দেবতাটিকে এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কুন্তী তাঁর মধ্যে দিব্যদর্শন এক পুরুষের সন্ধান পেলেন। দেখতে পেলেন তাঁর কানে সোনার কুণ্ডল, বুক-পিঠ জুড়ে সোনার বর্ম—আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্।

মনে রাখা দরকার—দেবতার রাজ্যে সূর্য এমন এক দেবপুরুষ, যাঁর প্রাধান্য এবং মহিমা অন্য সমস্ত দেবতার চাইতে বেশি। ঋগ্‌বেদে তিনি শুধুই দেবতামাত্র নন, অন্যান্য অনেক দেবতাকে তাঁরই বিভূতি বলে মনে করা হয়। এই তো কিছুদিন আগে দক্ষিণী পণ্ডিত অধ্যাপক সীতারাম শাস্ত্রী সমস্ত ঋঙ্‌মন্ত্রেরই সূর্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করতেন। এমনকী পরবর্তী কালে যে সমস্ত দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে—বেদের সঙ্গে যাঁদের সোজাসুজি কোনও যোগ নেই, তাঁদেরও সৌর-কুলীনতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে মিথলজিস্টরা তাঁদের বেশি মর্যাদা দেন। বেদের পরবর্তী কালে নারায়ণ-বিষ্ণুর যে এত মহত্ত্ব দেখতে পাই, সেই বিষ্ণু-নারায়ণও কিন্তু আসলে সূর্যই। ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী—তাঁরও কানে সোনার দুল, মাথায় মুকুট।

দেব-তত্ত্বের মূল-স্বরূপ ওই সূর্যকেই কুন্তী তাঁর মন্ত্র-পরীক্ষার প্রথম আধার বলে বেছে নিলেন। হৃদয়ে হাত ঠেকিয়ে আচমন-পুরশ্চরণ করে দুর্বাসার মন্ত্রে কুন্তী আহ্বান জানালেন সূর্যকে। সূর্য নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। আকাশ থেকে নিজের তাপ-বিতরণের কাজ যেমন চলার তেমনই চলল, কিন্তু অলৌকিকতার সূত্রে তিনি শরীর পরিগ্রহ করে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ালেন—মুখে হাসি, মাথায় বদ্ধমুকুট, তেজে চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কুন্তীর জীবনের প্রথম অভীপ্সিত পুরুষ, তিনি তাঁকে ডেকেছিলেন সানুরাগে—তস্য দেবস্য ভাবিনী।

অতএব এই অনুরাগের প্রত্যুত্তরের মতো সুন্দর ভাষায় সূর্য বললেন—ভদ্রে। প্রথম আলাপে স্ত্রী-লোককে 'ভদ্রা' সম্বোধনটি অনেকটা ফরাসিদের মাদামের মতো। এই সম্বোধনের মধ্যে প্রথম আলাপের দূরত্বটুকু বজায় রেখেই সূর্য বললেন—ভদ্রে ! আমি এসেছি তোমার মন্ত্রের শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে। এখন আমি সম্পূর্ণ তোমার বশীভূত—বল আমি কী করব—কিং করোমি বশো রাজ্ঞি ? অনুরাগবতী কুন্তীর বুঝি এইবার আপন কুমারীত্বের কথা স্মরণ হল। কুন্তী বললেন—আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান। আমি কৌতুকবশে অর্থাৎ এমনি মজা দেখার জন্য আপনাকে ডেকেছি, অতএব আপনি এখন ফিরে যান—কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি। সংস্কৃতে আছে—প্রসীদ—প্রসন্ন হোন, ফিরে যান ; ইংরেজিতে এই 'প্রসীদ' হল—প্লিজ।

যৌবনবতী কুন্তী সানুরাগে দেব-পুরুষকে ডেকেছেন মজা দেখার জন্য—কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ,—তিনি জানেন না একক পুরুষকে সানুরাগে ঘরে ডাকলে সে আর প্রসন্ন হয়ে ফিরে যায় না ; প্রথম ভদ্র সম্বোধনের পরেই তার নজর পড়ে অনুরাগবতীর শরীরে। উচ্চাবচ প্রেক্ষণের পর

যথাসম্ভব ভদ্র সম্বোধনে সে বলে—কৃশকটি সুন্দরী আমার ! যাব, নিশ্চয় যাব, কিন্তু আমাকে সাদরে ডেকে এনে নিজের ইচ্ছে বৃথা করে এমন করে পাঠিয়ে দেবে আমাকে—ন তু দেবং সমাহূয় ন্যায্যং প্রেষয়িতুং বৃথা ? সূর্য পরিষ্কার বললেন—আমি তোমার ইচ্ছেটুকু জানি। তুমি চাও—সোনার বর্ম-পরা সোনার কুণ্ডল-পরা আমার একটি পুত্র হোক তোমার গর্ভে। কিন্তু তার জন্য যে তোমার শরীরের মূল্যটুকু দিতেই হবে। তুমি নিজেকে আমার কাছে ছেড়ে দাও—স ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনি। তুমি যেমন ভেবেছ তেমন পুত্রই হবে তোমার এবং আমিও যাব তোমার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ করে—অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।

সূর্যের প্রণয়-সম্বোধনের মধ্যে এখন রমণীর অলসগামিতা অথবা মধুর হাসিটিও উল্লিখিত হচ্ছে। অবশ্য এই সপ্রণয় ভাষণের মধ্যে পুরুষের ভয় দেখানোও ছিল। কথা না শুনলে অভিশাপ দিয়ে তোমার বাবা আর সেই ব্রাহ্মণ ঋষিটিকে ধ্বংস করব—এর থেকেও বড় দায় চাপানো হয়েছিল কুন্তীর নিজের চরিত্রের ওপরই। সূর্য বলেছিলেন—তুমি যে আমার মতো একজন দেবপুরুষকে ঘরে ডেকে এনেছ—এই অন্যায় কাজ তোমার বাবা জানেন না। কিন্তু তোমার অপরাধে আমি ধ্বংস করব তাঁকে এবং তাঁর পরিজনকে। এবারে সূর্য কুন্তীর স্বভাব নিয়েই বড় গালাগালি দিয়ে ফেললেন। সূর্য বলতে চাইলেন—বোকা হলেন সেই মুনি যিনি তোমাকে এই মন্ত্র দিয়েছেন। পুরুষের সম্বন্ধে যে রমণীর সংযমটুকু নেই, সেই রমণীকে এই মন্ত্র দেওয়াটাই একটা বাতুলতা। তা সেই ব্রাহ্মণকে গুরুতর দণ্ড দেব আমি, যিনি তোমার স্বভাব-চরিত্র না জেনেই এই পুরুষ-আহ্বানের মন্ত্র তোমায় শিখিয়েছেন—শীলবৃত্তমবিজ্ঞায়...যো'সৌ মন্ত্রমদাত্তব।

সূর্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েই কুন্তীর স্বভাব-চরিত্র নিয়ে গালাগালি দিচ্ছেন, সে-কথা আমরা বেশ বুঝতে পারি। কুন্তীর মন্ত্র-পরীক্ষার মধ্যে কৌতুক ছাড়া অন্য কোনও প্রবৃত্তি ছিল বলে আমরা মনে করি না। একান্ত মানবোচিতভাবে ব্যাপারটা ভেবে দেখুন—অসাধারণ কোনও লাভের অভিসন্ধি মেশানো এমন কোনও মন্ত্র যদি আমরা পেতাম, তবে আমরাও তা পরীক্ষা করেই দেখতাম। মন্ত্রের শক্তি যে আছে, সে সম্বন্ধে মানুষ ইতিবাচক ধারণা পূর্বাহ্নে পোষণ করে না বলেই মণি-মন্ত্র-মহৌষধি—মানুষ তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করতে চায়। তার মধ্যে এই মন্ত্র হল বশীকরণের মন্ত্র ; আধুনিক যুবক-যুবতীর হাতে যদি পুরুষ বা রমণী বশ করার এমন সিদ্ধমন্ত্র থাকত, তবে তা অবশ্যই পরীক্ষিত হত কুন্তীর মতোই কৌতুকে—এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

তবে দেবপুরুষ কুন্তীকে যে গালাগালি দিচ্ছিলেন, সে কুন্তীর স্বভাব-চরিত্রের জন্য যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজের সম্মানের জন্য। সুন্দরী রমণীর কাছে সাদর আমন্ত্রণ লাভ করে কোন পুরুষেরই বা প্রত্যাখ্যাত হতে ভাল লাগে, নিজের বন্ধু-বান্ধব বা সমাজের কাছেই বা তার মুখ থাকে কতটুকু ? সূর্যের আসল কথাটা এবার বেরিয়ে এল। তিনি বললেন—তুমি যে আমাকে অনুরাগ দেখিয়ে এখন বঞ্চিত করছ—এসব আকাশ থেকে আমার বন্ধু দেবতারা দেখছেন আর হাসছেন—পুরন্দরমুখা দিবি। ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি। তোমার তো দিব্যদৃষ্টি আছে, একবার তাকিয়ে দেখো আকাশপানে। কুন্তী সূর্যের কথা শুনে আকাশের দিকে চাইলেন, দেখলেন অন্য দেবতাদের।

কুন্তী নিজের বোকামিতে সত্যিই লজ্জা পেলেন। কৌতুক-লিপ্সু কুমারী এক মুহূর্তে যেন বড় হয়ে গেলেন। বললেন—তবু আপনি চলে যান সূর্যদেব। আমার পিতা-মাতা আমাকে এই শরীর দিয়েছেন, মেয়েদের কাছে এই শরীর-রক্ষার মূল্যই যে সবচেয়ে বেশি, কারণ দ্বিতীয় একটি কুমারীর শরীর তো আমি তৈরি করতে পারব না, অতএব আমার এই কুমারী-শরীরটাই আমাকে রক্ষা করতে হবে—স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা। কুন্তী এবার অনুনয়ের সুরে বললেন—বিশ্বাস করুন, আমি আমার অল্প বয়সের চঞ্চলতায় শুধু কৌতুকের বশে মন্ত্রশক্তি জানার জন্য আপনাকে ডেকেছি। এটা ছেলেমানুষি ভেবেই আপনি ক্ষমা করে দিন।

সূর্য বললেন—বয়স তোমার অল্প বলে আমিও তোমাকে এত সেধে সেধে বলছি। অন্য কেউ কি আমার এত অনুনয় পাওয়ার যোগ্য ? তুমি নিজেকে ছেড়ে দাও আমার কাছে, তাতেই তোমার শান্তি

হবে—আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তি কন্যে শান্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু। সূর্য শুধু একটা কথাই ভাবছেন। ভাবছেন—যে রমণী প্রথম যৌবনের চঞ্চলতায় সাদরে দেবপুরুষকে কাছে ডেকেছে, উপভোগের দ্বারাই তার শান্তি হবে। হয়তো এটাই ঠিক—কুন্তীর প্রথম আহ্বানটুকু মিথ্যে ছিল না, কিন্তু ডাকার পর পুরুষের একান্ত দুরবগ্রহ একমুখী প্রয়াস দেখে এখন তিনি চিন্তিত, ব্যথিত। যে কোনও ভাবেই হোক, সূর্য কুন্তীর শরীর-সম্ভোগ ব্যতিরেকে ফিরে যেতে চান না। স্বর্গের দেবতা হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্য-রমণীর আহ্বানে তিনি মানুষের শরীরে নেমে এসেছেন ভুঁয়ে। এখন এই সামান্যা মানবী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে, এ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তীর কাছে বারংবার দেবসমাজে তাঁর ভাবী অপমানের কথা তিনি বলেওছেন, কারণ সেটাই তাঁর প্রধান লজ্জা—গমিষ্যাম্যনবদ্যাঙ্গি লোকে সমবহাস্যতাম্।

কুন্তী অনেক চিন্তা করলেন। সূর্য সতেজে তাঁর হাত ধরেই রয়েছেন। তবু মুখখানি নিচু করে তিনি কত কিছুই ভেবে নিলেন। বুঝলেন—তাঁর প্রত্যাখ্যানে নিরপরাধ কুন্তিভোজ এবং স্বয়ং দুর্বাসার বিপদ নেমে আসতে পারে। অন্যদিকে স্বর্গের দেবতা উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করছেন, তাঁর হাতখানিও ধরে আছেন নিজের হাতে—এই বিচিত্র অনুভূতি তাঁর মোহও জন্মাচ্ছে বারে বারে। একদিকে তিনি 'শাপ-পরিত্রস্তা' অন্যদিকে 'মোহেনাভিপরীতাঙ্গী'—এই ভয় এবং মোহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুন্তী এবার তাঁর ভয় এবং মোহ দুই-ই প্রকাশ করলেন সূর্যের কাছে।

ভয়াবিষ্টা কুন্তী বললেন—আমার বাবা, মা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন কী বলবে আমাকে? তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, আর আমি সমাজের নিয়ম ভেঙে নিজেকে হারিয়ে ফেলব? যদি সব নিয়ম ভেঙে এমনি করে হারিয়ে ফেলি নিজেকে—ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব যদি স্যাদ্ বিধিবর্জিতঃ—তা হলে আমার বংশের মান-মর্যাদা সব যাবে।

মোহাবিষ্টা কুন্তী বললেন—আর এত কথা শুনেও যদি মনে হয়, আপনি যা বলছেন তাই ধর্ম, তবে আমি আত্মীয়-স্বজনের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আপনার ইচ্ছে পূরণ করব—ঋতে প্রদানাদ্ বন্ধুভ্য স্তব কামং করোম্যহম্। কিন্তু আমার একটাই কথা—আমার এই শরীর দিয়েও আমি সতী থাকতে চাই। কুন্তী এই মুহূর্তে সূর্যকে সম্বোধন করলেন 'দুর্ধর্ষ' বলে—আত্মপ্রদানং দুর্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন—অধিকাংশ ধর্ষণের ক্ষেত্রে রমণীর দিক থেকে প্রাথমিক বাধাদানের ব্যাপার থাকলেও পরবর্তী সময়ে কিছু আত্মসমর্পণের ইচ্ছাও থেকে যায়। কিন্তু কি রমণী, কি পুরুষ, তিন ভুবনের সার কথাটা কুন্তীর মুখ দিয়েই বেরিয়েছে—শরীর দিয়েও আমি সতী থাকতে চাই। প্রথম যৌবনের হাজারো চঞ্চলতার মধ্যেও রমণীর পক্ষে বিধিবহির্ভূত মিলনের এই হাহাকারটুকু বড়ই স্বাভাবিক—আমি আপনাকে শরীর দিয়েও সতী থাকতে চাই—আত্মপ্রদানং দুর্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।

সূর্য সব বোঝেন। কুন্তীকে সামান্য উন্মুখ দেখা মাত্রই তিনি কথা আরম্ভ করলেন একেবারে কামুক পুরুষের স্বার্থপরতায়। বললেন—বরারোহে। বরারোহা মানে জানেন কী? A good mount for a distinguished personality. সূর্য বললেন—বরারোহে! তোমার বাবা-মা বা অন্য কোনও গুরুজন—কেউ তোমার প্রভু নন অর্থাৎ জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তে তাঁদের ইচ্ছামতো চলার কথা নয় তোমার। যাতে তোমার ভাল হবে, সেই কথাই বরং আমার কাছে শোনো। সূর্য এবার পণ্ডিত-জনের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে বললেন—'কম্' ধাতুর অর্থ কামনা করা। কন্যা শব্দটাই এসেছে এই ধাতু থেকে, অতএব কন্যাজন মাত্রই সব পুরুষকেই কামনা করতে পারে, সে স্বতন্ত্রা—সর্বান্ কাময়তে যস্মাৎ কমের্ধাতোশ্চ ভাবিনি। তস্মাৎ কন্যেহ সুশ্রোণি স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি।

সূর্য কন্যা-শব্দের মধ্যেই কামনার উৎস প্রমাণ করে দিয়ে কুন্তীর মনের আশঙ্কা দূর করতে চাইলেন। বোঝাতে চাইলেন সূর্যের প্রতি তাঁর অনুরাগবতী হওয়াটাই যথার্থ হয়েছে। কামনার চূড়ান্ত পর্যায়ে কুন্তীর কাছে সূর্যের যুক্তি হল—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরকে কামনা করবে, এইটাই স্বাভাবিক, এবং অন্যটাই বিকার—স্বভাব এষ লোকানাং বিকারো'ন্য ইতি স্মৃতঃ। সূর্য জানেন—এত

যুক্তি, এত স্বভাব-বোধনের পরেও কুমারী কুন্তীর মনে সামাজিকের সেই ভ্রূকুটি-কুটিল জিজ্ঞাসাটুকু থেকেই যাবে। অতএব প্রথম যৌবনবতী রমণীর রিরংসা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা কুন্তীকে আশ্বাস দিয়ে সূর্য বললেন—আমাদের মিলনের পর তুমি আবারও তোমার কুমারীত্ব ফিরে পাবে—সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি—আর তোমার ছেলেও হবে অনন্ত খ্যাতির আধার এক মহাবীর।

সূর্যের এই আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তী তাঁকে সম্বোধন করেছেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গীতে—হে আমার আঁধার-দূর-করা আলো—সর্বতমোনুদ। এই মুহূর্তে কুন্তী জানেন—যে ছেলে জন্ম নেবে সূর্যের ঔরসে, সেই ছেলের সঙ্গে তাঁর থাকা হবে না, তাকে লালন-পালন করার সামাজিক সাহস তাঁর নেই। থাকলে কুমারীত্বের জন্য লালায়িত হতেন না তিনি। কিন্তু 'দুর্ধর্ষ' এই তেজোনায়ক ফিরে যাবেন না অসঙ্গমের অসন্তোষ নিয়ে। অতএব সেই ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্মলগ্নেই তার স্বয়ম্ভরতার নিরাপত্তা চান তিনি। কুন্তী বললেন—আপনার ঔরসে আমার যে পুত্র হবে সে যেন আপনার অক্ষয় কবচ এবং কুণ্ডল নিয়েই জন্মায়। সূর্য বললেন—তাই হবে ভদ্রে! এই কবচ এবং কুণ্ডল অমৃতময়। তোমার সেই পুত্র অমৃতময় বর্ম এবং কুণ্ডল নিয়েই জন্মাবে।

কুন্তী বললেন—যদি তাই হয়, যদি আমার পুত্রের কুণ্ডল এবং বর্ম দুটিই অমৃতময় হয় অর্থাৎ জীবনে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা যদি তার স্বায়ত্তই থাকে, তবে হোক আপনার ঈপ্সিত সঙ্গম, যেমনটি আপনি বলেছেন আমি তাতেই রাজি—অস্তু মে সঙ্গমো দেব যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া। মনে করি—আমার পুত্র আপনারই মতো শক্তি, রূপ, অধ্যবসায়, তেজ এবং ধর্মের দীপ্তি নিয়ে জন্মাবে।

কুন্তী দেখেছেন—সূর্যের হাত থেকে যখন নিস্তার নেই-ই, সেক্ষেত্রে তাঁর কন্যাসত্তা এবং ভাবী পুত্রের নিরাপত্তা—দুটিই তাঁর একান্ত প্রয়োজন—একটি বাস্তব কারণে, অন্যটি মানবিক। প্রথম যৌবনের কৌতূহলে তিনি যা বোকার মতো করে ফেলেছিলেন, তাকে তিনি শুধরে নিয়েছেন মনস্বিনীর মতো অতি দ্রুত, সূর্যের দ্বারা প্রায় আলিঙ্গিত অবস্থায়। ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণত মাতৃত্বের ব্যাপ্তি প্রথম যৌবনের মাদকতার মধ্যে আশা করা যায় না বলেই, অন্তত পুত্রের নিরাপত্তার ভাবনাই যে তাঁকে এই মুহূর্তে স্বতন্ত্র নারীর মহিমা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ কী ? ভবিষ্যতে কর্ণের শত অভিমানের উত্তরে সূর্যের দুরাগ্রহ এবং তাঁর অসহায়তার জবাবদিহি সম্ভব ছিল না বলেই অন্তত এই নিরাপত্তার চিন্তাও আমার কাছে কুন্তীর বাস্তববোধের পরিচয়।

কুমারীত্ব এবং কুমারীপুত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতেই কুন্তী তাঁর প্রথম মিলনের কৌতুক যেন আবারও ফিরে পেয়েছেন অন্তত দেখাচ্ছেন সেইরকম। সূর্যের কথায় সায় দিয়ে তিনি বলেছেন—হোক সেই পরমেপ্সিত মিলন—সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ—যেমনটি তুমি চাও। আর প্রার্থিতা রমণীর সোচ্চার আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য একাধিক প্রিয় সম্বোধনে ভরিয়ে তুলেছেন কুন্তীকে—আমার রানি, যৌবন শোভার আধার, বামোরু। সূর্য আলিঙ্গন করলেন কুন্তীকে, হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন কুন্তীর নাভিদেশ। দেবভাব থাকা সত্ত্বেও মানুষের শরীরে সূর্যের করস্পর্শের এই ইঙ্গিত পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেননি। বলেছেন—বসনমোচনায় ইত্যাশয়ঃ।

নবীন যৌবনবতী কুন্তী যেদিন সূর্যকে দেখে সকৌতুকে পুরুষ বশীকরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন তিনি ভেবেছিলেন—দেখি তো পুরুষকে কাছে ডাকলে কেমন হয়! দেখি তো পুরুষ ভোলালে কেমন হয়! এই কৌতুক আর কৌতুক রইল না, কঠিন বাস্তব আর সূর্যের 'দুর্ধর্ষতা'য় সে কৌতুক এক মুহূর্তে কুন্তীকে প্রৌঢ়া করে তুলল। আর এখন সেই অভীপ্সিত সঙ্গম-কৌতুকের মুহূর্তে পুরুষের ধর্ষণ-মুখরতায় কুন্তী অচেতন হয়ে গেলেন। মহাভারতের কবি দেবতা পুরুষকে বাঁচানোর জন্য লিখেছেন—কুন্তী সূর্যের তেজে বিহ্বল হলেন, বিছানায় পড়ে গেলেন অচেতনের মতো—পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূঢ়চেতনা—মোহাবিষ্টা, ছিন্ন লতার মতো—ভজ্যমানা লতেব। আমরা জানি—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়ে কুন্তী সংজ্ঞা হারিয়েছেন আর 'দুর্ধর্ষ' সূর্য তাঁর সঙ্গম সম্পন্ন করেছেন কুন্তীর অচেতন অবস্থাতেই, কারণ আমরা দেখেছি, ব্যাসদেবকে অধ্যায় শেষ করতে হয়েছে—একাকী সূর্যের সঙ্গম-সন্তোষের পর কুন্তীর চেতনা ফিরিয়ে দিয়ে—সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ

বালা। ব্যাসের শব্দ প্রয়োগও খেয়াল করবেন—'বালিকা আবারও চেতনা ফিরিয়া পাইল'। এই বালা বা বালিকা শব্দের মধ্যেই কুন্তীর অজ্ঞতা, চঞ্চলতা, কৌতুকপ্রিয়তা ইত্যাদি নির্দোষ গুণগুলি নিহিত করে মহাভারতের কবি তাঁকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

৪

কুন্তী আর সূর্যের প্রথম মিলন কাহিনীটি আমি সবিস্তারে শোনালাম। এর কারণ এই নয় যে কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর সঙ্গম-রসের রগরগে বর্ণনা দিয়ে অল্পস্বল্প পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করায় আমার বড় মোহ আছে। এই বিস্তারটুকু আমার কাছে এই জন্য প্রয়োজনীয় যে, অনেকেই কুন্তীকে খুব দোষারোপ করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ভাগ্যহত কর্ণের যন্ত্রণা যত বাড়তে থাকে এই দোষারোপও ততই বাড়তে থাকে। এই বর্ণনার মাধ্যমে আমি কুন্তীর নাচার অবস্থাটা বোঝাতে চেয়েছি।

আরও কারণ আছে। সেটা মনস্তত্ত্বের পরিসর। পূর্বে কৃষ্ণের কাছে কুন্তী অনুযোগ করেছিলেন—আমি বাপের বাড়িতেও সুখ পাইনি। শ্বশুরবাড়িতেও নয়—সেই অনুযোগের নিরিখে আমরা লক্ষ করেছি মহারাজ কুন্তিভোজ তাঁকে দত্তক নিলেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেননি। কুন্তীও তাঁর মধ্যে সার্থক পিতাটিকে খুঁজে পাননি। কুন্তীর মানসিক জটিলতা আরও বেড়েছে আরও একটা কারণে। আমার ধারণা—ভোজবাড়িতে এসে কুন্তী একটি পালক পিতা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু মা পাননি। সেই দত্তক নেওয়ার মুহূর্ত থেকে এখনও পর্যন্ত মহারাজ কুন্তিভোজের রানির উল্লেখ কোথাও নেই। কুন্তী যেভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ভোজগৃহের সর্বময়ী কর্ত্রীটি হয়ে উঠেছিলেন, তাতে এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। প্রথম যৌবনবতী কন্যাকে দুর্বাসার মতো অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করার সময়েও কুন্তিভোজ প্রৌঢ়া জননীর মতো কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি। এবং আজ এই বিধিবহির্ভূত মিলনের পরেও কুন্তীকে আমরা বিপন্ন হয়ে খুঁজতে দেখিনি জননীর আশ্রয়। ভাবে বুঝি, কুন্তিভোজের স্ত্রী বুঝি পূর্বেই স্বর্গতা হয়েছিলেন।

দশ মাস কেটে গেল, কুন্তীর প্রচ্ছন্ন গর্ভের কথা কেউ টেরই পেল না। যে বাড়িতে জননীর অস্তিত্ব আছে, সে বাড়িতে এই প্রচ্ছন্নতা কি সম্ভব ? কুন্তীর গর্ভের আকার শুধু প্রতিপদের চাঁদের আকার থেকে ক্রমে বিবর্ধিত হল। কিন্তু কেউ টেরটি পেল না। কারণ তিনি থাকতেন মেয়েদের থাকবার জায়গায় এবং গর্ভের আকার লুকিয়ে রাখার অভ্যাস তিনি করেছিলেন নিপুণভাবে। অন্তঃপুরের এক ধাত্রীকন্যা ছাড়া—হয়তো গর্ভমুক্তির জন্য তাকেই রেখেছিলেন কুন্তী—সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ টের পেল না কুন্তীর কুমারী-গর্ভের কথা।

যথা সময়ে কুন্তীর পুত্র জন্মাল। গায়ে সোনার বর্ম, কানে সোনার কুণ্ডল, দেখতে ঠিক সূর্যের মতো—যথাস্য পিতরং তথা। প্রথম পুত্র জন্মের আনন্দে উৎসব করা হল না, মঙ্গল-শঙ্খ বাজল না, চিৎকার করে কেউ ঘোষণা করল না—রাজবাড়িতে ছেলে হয়েছে। সমাজে নিজের সম্মান রাখার তাগিদে কুন্তী ধাত্রীকন্যার সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বেতের পেটিকার মধ্যে ভাল করে মোম লেপে দিলেন যাতে পেটিকা জলের মধ্যে ভাসলেও তাতে জল না ঢোকে। সেই পেটিকার মধ্যে সুন্দর কাপড় পেতে দিয়ে কুন্তী শুইয়ে দিলেন শিশু পুত্রকে। পেটিকার মুখ ঢেকে সদ্য-জননী কুন্তী চললেন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ির উপকণ্ঠে অশ্ব-নদীর দিকে। একদিকে কুমারীত্ব প্রতিষ্ঠার সামাজিক দায়, অন্যদিকে পুত্রস্নেহ—এই দুই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় মাতৃস্নেহই কিন্তু বড় হয়ে উঠল কুন্তীর মনে। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—কুমারী মেয়ে গর্ভধারণ করে পুত্রের জন্য বিলাপ করছে—এটা ঠিক নয় জেনেও কুন্তী তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের ক্রন্দন রুদ্ধ করতে পারেননি। ভীষণ ভীষণ কেঁদেছেন তিনি, কেঁদেছেন পুত্রস্নেহে—পুত্রস্নেহেন রাজেন্দ্র করুণং পর্যদেবয়ৎ।

হ্যাঁ, পুত্রকে তিনি ভাসিয়েই দিয়েছেন অশ্বনদীর জলে। সাধারণে বলতেই পারেন—কেন, এতই যদি পুত্রস্নেহ তবে কেন সব অপমান লজ্জা ঠেলে দিয়ে, কেন তিনি ঘোষণা করলেন না—কুমারীর

লজ্জার থেকেও পুত্রস্নেহ আমার কাছে বড়। আমি বলব—সমালোচনার প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলা যায় অনেক কিছু, কিন্তু কেউ কি কুন্তীর মনস্তত্ত্বের ধার দিয়ে গেছেন ? মনে রাখা দরকার—যে রমণী নিজেই নিজের কাছে করুণার পাত্র, তাঁর করুণার পরিমাপ করতে চাইছি আমরা।

আমি আগেই বলেছি—শৈশবে আপন পিতা-মাতার স্নেহরসে বঞ্চিত হয়ে যে রমণী অন্যের ঘরে প্রতিপালিত হল, যাঁকে যে কোনও বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর পালক পিতা বলেন—তুমি আর্য শূরের মেয়ে, ভুলে যেয়ো না তুমি মহামতি বসুদেবের বোন—সেই রমণীর কাছে মর্মান্তিক পুত্রস্নেহের থেকেও কুমারীত্ব বড়। যাঁরা দত্তক নেন, তাঁদের মনস্তত্ত্ব কি কখনও বিচার করে দেখেছেন ? যে পিতা-মাতা দত্তক নিলেন, সেই ছেলে বা মেয়ে যদি ভবিষ্যতে সুপুত্র বা গুণবতী রমণী হয়, তবে সমস্তটাই সেই পালক পিতা বা মাতার পালনের গুণ, কিন্তু দৈববশে সেই ছেলে বা মেয়ে যদি কুপুত্র বা দুশ্চরিত্রা হয়, তবে সব দোষটাই গিয়ে পড়বে বীজী পিতা অথবা গর্ভধারিণী মায়ের ওপর। পালক পিতা-মাতার অন্তর্দাহ আড়ালে বলতে চাইবে—অমন বাপ-মায়ের মেয়ে, বংশের দোষ যাবে কোথায় ?

বরিষ্ঠ বংশের মেয়ে অন্য বাড়িতে প্রতিপালিত হয়ে কুন্তী পিতা-মাতার নাম ডোবাতে চাননি। তাই কুমারীত্ব এবং কন্যাপুত্রের দ্বৈরথে কুমারীর সুনাম তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে যে পুত্র কঠিন কাব্যময়তায় বলে উঠবে—যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ। তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস—সে পুত্র কি জানে—শৈশবে তার মা কতটুকু মাতৃস্নেহ লাভ করেছে ! কঠিন মনস্তত্ত্বের শিকার হয়েই কুন্তী কুন্তিভোজের বাড়িতে এসেছেন, এখন তিনি আরও কঠিনতর মনস্তত্ত্বের শিকার হয়ে যাবেন, যখন সদ্য-জননীর গর্ভ-ছেঁচা পুত্রটিকে ভাসিয়ে দিতে হল অশ্বনদীর জলে।

কতই না কল্পনা ছিল। সে যেন আপনারই মতো দেখতে হয়। আপনার মতো চেহারা, আপনার মতো শক্তি, আপনার মতো তেজ, আর আপনারই মতো সত্ত্বগুণ—ত্বদ্ বীর্যরূপসত্ত্বৌজা ধর্মযুক্তো ভবেৎ স চ—কুন্তী শুধু এই চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে ভাগ্যের তাড়নায় কুমারীত্বের প্রাধান্যে প্রথম-জাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিতে হল জলে। জননীর আর্দ্রতায় কুন্তীর বুক ভেঙে কান্না এল। নির্জন নদী তীরে আকাশ-বাতাসের উদ্দেশে জানাতে হল জননীর উদ্বেগ—

বাছা আমার ! দ্যুলোক-ভূলোকে যত প্রাণী আছে, তারা যেন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে—স্বস্তি তেঽস্তু অন্তরীক্ষেভ্য পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক। যে জলে তোমায় ঠেলে দিয়েছি, সেই জলচর প্রাণীরা যেন ক্ষতি না করে তোমার। তোমার যাবার পথে মঙ্গল হোক তোমার।

বাছা ! জলের রাজা বরুণ তোমায় রক্ষা করুন জলে, আকাশে রক্ষা করুন সর্বত্রগামী বায়ু।

বাছা ! যিনি দিব্য-বিধানে আমার কোলে দিয়েছিলেন তোমাকে, তোমার সেই তেজস্বী পিতা তোমায় সর্বত্র রক্ষা করুন—পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।

সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ যাচনা করেও কুন্তী জননীর যন্ত্রণা এড়াতে পারলেন না একটুও। কবচ-কুণ্ডলের সুরক্ষায় কর্ণের যে মৃত্যু হবে না, সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু এমন সুন্দর শিশুপুত্রটিকে কোলে চেপে না ধরে, তাকে যে বিসর্জন দিতে হচ্ছে,—এই ব্যথার থেকেও আরও কঠিন এক ঈর্ষাকাতর অনুভূতি তাঁকে পীড়িত করতে লাগল। পুত্র-স্নেহের আরও এক অন্যতর রূপ এই ঈর্ষা। কুন্তী তখনও কাঁদছেন, আর ধরে আছেন তাঁর পরান-পুতলির পেটিকাটি। মুখে বলছেন—বাছা ! বিদেশ-বিভূঁয়ে যেখানেই বেঁচে থাক তুমি, তোমার এই সহজাত বর্ম দেখে তোমায় ঠিক চিনতে পারব আমি। ধন্য তোমার পিতা, যিনি সহস্র কিরণ-চক্ষুতে নদীর মধ্যেও তোমাকে দেখতে পাবেন। বাছা ! ধন্য সেই মা যিনি তোমাকে পুত্র-কল্পনায় কোলে তুলে নেবেন, তোমার মুখে দেবেন স্নেহস্রুত স্তন্যপান। এই শিশু বয়সেই এমন তেজস্বী চেহারা, এই দিব্য বর্ম, এই কুণ্ডল, এই পদ্ম-পাতার মতো চোখ, এই চাঁচর কেশ—যে মা তোমাকে পাবেন, তিনি কি কোনওদিন কোনও সুখস্বপ্নেও এমন একটি পুত্রের মুখচ্ছবি কল্পনা করতে পেরেছিলেন ? বাছা ! তুমি যখন মাটিতে হামাগুড়ি দেবে, ধূলায় ধূসর হবে তোমার শিশু-শরীর, তুমি কথা বলবে কলকল করে, আধো আধো ভাষায়—অব্যক্ত কল-বাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্—সেদিন তোমায় আমি দেখতে পাব না, দেখবেন পুণ্যবতী অন্য কোনও মা। বাছা ! বাছা ! যখন তুমি বড় হবে, বন্য সিংহের তেজ আসবে তোমার

শরীরে সেদিনও আমি তোমায় দেখতে পাব না। দেখবেন অন্য কোনও জননী।

কুন্তী অনেক কাঁদলেন। প্রথম জাত পুত্রের ভবিষ্যৎ মুখচ্ছবি যতই স্পষ্ট হতে থাকল তাঁর মনে, তাঁর কষ্টও তত বাড়তে লাগল। মা হওয়ার পর প্রথম সন্তানের বিয়োগ-দুঃখ একজন মাকে যতখানি যন্ত্রণা দিতে পারে, কুন্তী ঠিক সেই যন্ত্রণাই পেলেন। তবু তাঁকে ভাসিয়ে দিতে হল তাঁর শিশুপুত্রটিকে। হাজারো কান্নাকাটির পর রাতও যখন অর্ধেক হয়ে গেল, তখন কঠিন বাস্তব তাঁকে ফিরিয়ে আনল ঘরে। এত রাত হয়ে গেছে, তবু মেয়ে ঘরে নেই—এ-কথা যদি কোনওভাবে পিতা কুন্তিভোজের কানে যায়, তবে বহুতর অনর্থ ঘটতে পারে। কুন্তী ফিরে এলেন কাঁদতে কাঁদতে। মনে রইল পুত্র-শোকার্তা জননীর কামনা—আবার কবে দেখতে পাব আমার প্রথম সন্তানকে—পুত্রদর্শনলালসা। কুন্তী জানেন—কর্ণের মৃত্যু অসম্ভব ; কিন্তু ছেলে বেঁচে আছে, অথচ তার জন্য জননীর স্নেহ-কর্তব্যগুলি করা হল না, তাকে কোনওদিন বলা যাবে না—ওরে তুই আমারই ছেলে—এই স্বাধিকারহীনতার গ্লানি কুন্তীকে কেবলই কষ্ট দিতে থাকল।

আসলে আমরা কেউই পুত্রের জন্য পুত্রকে ভালবাসি না, নিজেকে ভালোবাসার কারণেই আমরা পুত্রকে ভালবাসি। উপনিষদ তাই বলে—ন বা অরে গার্গি পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার অভিযোগে কুন্তীকে যাঁরা দোষী সাব্যস্ত করতে চান, তাঁদের আমি কয়েকটি কথা হয়তো কষ্টেসৃষ্টে বোঝাতে পেরেছি। এক, শৈশবে পুতুল-খেলার সময় যে বালিকাকে 'সানন্দে' দত্তক দেওয়া হয়েছিল কুন্তিভোজের কাছে, সেই বালিকা পালক-পিতার মধ্যে সাধারণ্যে পরিচিত স্নেহময় পিতাকে খুঁজে পাননি। শৈশবে মায়ের স্নেহ, যা একটি শিশুর মনোভূমি তৈরি করে অনন্ত সরসতায়, সঠিক সাবলীলতায়, সেই স্নেহ কুন্তী জন্মদাতা পিতার গৃহে তো পেলেনই না, কুন্তিভোজের গৃহেও পাননি।

দুই। ভোজগৃহের অন্যতর পরিবেশে বালিকা নিজেকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে যেদিন যৌবনবতী হয়ে উঠলেন, সেই যৌবনের মধ্যে বিকার এনে দিল দুর্বাসার মন্ত্র। যৌবনের প্রথম শিহরণে কুমারীর দূরত্বে থেকে পুরুষকে একটু দেখা, একটু ছোঁয়া, আধেক পাওয়া, আধেক না-পাওয়ার রহস্য উপভোগ করা তাঁর হল না। তিনি পুরুষ বশীকরণের কাম-মন্ত্র শিখে হঠাৎই দেব-পুরুষকে ডেকে বসলেন সদ্যোযুবতীর কৌতুকে ; কিন্তু সেই কৌতুকের শাস্তি হল প্রৌঢ়া রমণীর স্থূলতায়, ভাষায়, সঙ্গমে।

তিন। একটি সন্তান জন্মাল। তাকেও জলে ভাসিয়ে দিতে হল পিতা, পরিবার এবং সমাজের মুখ চেয়ে। জন্মদাতা পিতার সানন্দ দত্তক-দানে তিনি কাঁদতে পারেননি, আজ প্রথম জাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়েও তিনি সোচ্চারে কাঁদতে পারলেন না, নিজের মনোকষ্ট কোনও প্রিয়জনের কাছে বলতে পারলেন না। শৈশব এবং প্রথম যৌবনের দুই ধরনের অবরুদ্ধ শোক কুন্তীর মনোজগৎ তৈরি করেছিল এমনই এক গভীরতর মিশ্রক্রিয়ায়, যাতে মহাকাব্যের কবি তাঁকে আরও বহুতর কষ্টের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কুন্তীকে যদি বুঝতেই হয়, তবে শৈশবে তাঁর পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চনা এবং নবযৌবনের আরম্ভেই তাঁর অনীপ্সিত কৌতুক-সঙ্গমে তথা সন্তান-ত্যাগের নিরুদ্ধ বেদনা—এই তিনের বিচিত্র বিষমান্বয়ের নিরিখেই তাঁকে দেখতে হবে, নচেৎ তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণে ভুল হবে, তাঁর চরিত্রে আসবে অনর্থক আরোপ, যা মহাকাব্যের কবির হৃদয় না বোঝার সামিল।

৫

কুন্তীর রূপগুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রূপগুণের ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গিয়েছিল তাঁর ধর্মাচরণ এবং ব্রতপালনের মাধ্যমে—সত্ত্বরূপগুণোপেতা ধর্মারামা মহাব্রতা। ধর্ম এবং ব্রতকে এই যৌবনবতী সুন্দরী কেন আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তার কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। কন্যাবস্থায় সূর্য-সঙ্গম, পুত্রলাভ এবং পুত্রত্যাগ—এই সব কিছুই তাঁর

যুবতী-হৃদয়ে এমন এক অনুশোচনা তৈরি করেছিল, যার প্রলেপ হিসাবে ধর্ম এবং ব্রতচারণের মধ্যেই তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম-ব্রত নতুন এক শুদ্ধতার তেজে কুন্তীর যৌবন এবং রূপ আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলল এবং সেই উজ্জ্বলতা লোক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না।

তেজস্বিনী যৌবনবতীর মধ্যে লজ্জা এবং মৃদুতার মতো স্ত্রী-সুলভ গুণগুলি কুন্তীকে করে তুলল প্রার্থনীয়তরা। রাজারা অনেকেই আলাদা আলাদা করে প্রস্তাব দিলেন কুন্তীকে বিয়ে করার—ব্যাবৃণ্বন্ পার্থিবা কেচিদ্ অতীব স্ত্রীগুণৈর্যুতাম্। হয়তো কুন্তীও চাইছিলেন বিয়ে করতে। সময় বুঝে মহারাজ কুন্তিভোজ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। ওদিকে কুন্তীর রূপ-গুণ এবং ব্রত-ধর্মের কথা যেহেতু অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাই কৌরবগৃহেও একটা প্রাথমিক কথাবার্তা তাঁকে নিয়ে হয়ে গেছে। স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম বিদুরের কাছে প্রস্তাব করেছেন—শুনেছি যাদবদের একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, কুলে-মানে তারা আমাদের পালটি ঘর—শ্রূয়তে যাদবী কন্যা স্বনুরূপা কুলস্য নঃ।

'যাদবী কন্যা' কথাটা লক্ষ করার মতো। বোঝা যাচ্ছে কুন্তিভোজ যতই দত্তক নিন, কুন্তীর পরিচিতি ছিল যাদবদের মেয়ে হিসেবেই। কুন্তিভোজ যদি ভোজবংশের কেউ হন, তবে তাঁদের মধ্যেও যাদবদের রক্ত আছে এবং সে অর্থে কৃষ্ণের মামা কংসের মধ্যেও যাদবদের রক্ত আছে, কিন্তু তিনিও প্রধানত ভোজ-বাড়ির লোক ছিলেন। কংসকে বলা হত ভোজ-বংশের কুলাঙ্গার—ভোজানাং কুলপাংসনঃ। কিন্তু বংশে বংশে মামাতো—পিসতুতো সম্পর্ক হলেও যাদব আর ভোজদের জ্ঞাতিশত্রুতা ছিল। বিশেষত যাদব বলে যাঁরা গর্ব করতেন, তাঁদের মর্যাদা কিছু বেশিও ছিল। কৃষ্ণপিতা বসুদেব অথবা কুন্তীর পিতা আর্যক শূর ছিলেন যাদবদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। কংসের নিজের স্বজন ভোজেরাও তাঁর অত্যাচারে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং যাদব বসুদেব তথা যাদব কৃষ্ণ সবসময়েই চেষ্টা করেছেন কংসের নিজের স্বজনদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে তাঁদের নিজেদের দলে টানতে। হয়তো কুন্তিভোজের হাতে নিজের মেয়েকে দত্তক দেওয়ার মধ্যেও যাদবদের এই রাজনীতি কিছু থাকতে পারে।

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ নিজেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন যে, ভোজজাতির বৃদ্ধ-পুরুষদের অনুরোধেই তিনি কংসকে বধ করেছেন। অন্যদিকে হরিবংশে দেখছি—কংস নিজেই বলছেন যে, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ—এই সব জাতির শক্তিমান পুরুষেরা কংসের স্বজন হওয়া সত্ত্বেও যাদব কৃষ্ণের পক্ষ নিয়েছেন—শেষাশ্চ মে পরিত্যক্তা যাদবাঃ কৃষ্ণপক্ষিণঃ। আমার ধারণা—কুন্তীকে 'সানন্দে' একটি ভোজবাড়িতে দত্তক দেওয়ার মধ্যে কুন্তীর পিতা আর্যক শূরের কিছু রাজনৈতিক স্বার্থ কাজ করে থাকতে পারে এবং একটি রমণীকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতিক স্বার্থ-চেষ্টা কুন্তীর হয়তো একটুও ভাল লাগেনি। লাগেনি বলেই নিজের বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক অধস্তন কৃষ্ণের কাছে কুন্তী নিজের পিতা আর্যক শূর সম্বন্ধে তিক্ত কথা বলেছেন। অন্যদিকে যাদবদের মান-মর্যাদা অন্য জ্ঞাতিদের থেকে বেশি থাকায় কুন্তিভোজের পক্ষে কুন্তীকে দত্তক নিয়েও তাঁকে আত্মীকরণ করা সম্ভব হয়নি। কুন্তী তাই বিয়ের সময়েও 'যাদবী' কন্যাই রয়ে গেছেন এবং 'যাদবী' বলেই হয়তো পিতা ভীষ্ম তাঁকে নিজের কুলের উপযুক্তা বধূ হিসেবে কল্পনা করেছেন—শ্রূয়তে যাদবী কন্যা স্বনুরূপা কুলস্য নঃ।

যাক এসব কথা। কুন্তিভোজ স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন কুন্তীর বিয়ের জন্য। দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-রাজড়ারা এলেন ভোজবাড়িতে। এলেন পাণ্ডুও। হয়তো ভীষ্মের নির্দেশমতো। মহাভারতের কবি লিখেছেন—রাজসভায় মধ্যস্থানে বসা ভরতবংশের রাজা পাণ্ডুকে দেখতে পেলেন বুদ্ধিমতী কুন্তী, মনস্বিনী কুন্তী। পাণ্ডুকে দেখে তিনি মনে মনে আকুল হলেন—হৃদয়েনাকুলাভবৎ। তাঁর শরীরে দেখা দিল কামনার রোমাঞ্চ। তিনি সখীদের সঙ্গে সলজ্জে পাণ্ডুর কাছে উপস্থিত হয়ে বরমাল্য পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়।

মহাকাব্যের নিয়মে এই বিবাহ-সভার বর্ণনাগুলি প্রায়ই 'স্টক্-ডেসক্রিপশন'। অর্থাৎ যাঁর গলায় মালা দেওয়া হচ্ছে, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক সৌন্দর্যে অন্য রাজাদের অবশ্যই লজ্জা দিচ্ছেন। অপিচ নবীনতম পুরুষকে প্রথমবার চোখে দেখেই স্বয়ম্বর বধূটি তাঁকে পাবার জন্য

'কাম-পরীতাঙ্গী' হয়ে উঠছেন—এই বর্ণনা আমি আরও উদ্ধার করতে পারি।

এখানে খেয়াল করার মতো বিশেষণ আছে একটিই। তা হল বুদ্ধিমতী কুন্তী, মনস্বিনী কুন্তী। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—কুন্তীর বিয়ের মধ্যেও কিছু রাজনীতি ছিল। তখনকার দিনের রাজনৈতিক চিত্রে মগধরাজ জরাসন্ধ ছিলেন ধুরন্ধর পুরুষ। মথুরার কংস ছিলেন তাঁর জামাই এবং 'এজেন্ট'। যাদবরা কংসের অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে রাজনৈতিক বন্ধু বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন একভাবে। এসব কথা আমি অন্যত্র লিখেছি। কুন্তিভোজের কাছে কুন্তীকে দত্তক দিয়ে একদিকে যেমন কংসপক্ষীয় ভোজদের হাত করার চেষ্টা করেছিলেন আর্যক শূর, তেমনই অন্যদিকে ভরতবংশের সঙ্গে একটা বৈবাহিক যোগাযোগ গড়ে তোলাটাও তাঁদের দিক থেকে কাম্য ছিল।

ভরতবংশের কুলপুরুষ মহামতি ভীষ্ম কুন্তিভোজের বাড়িতে থাকা 'যাদবী' কন্যার কথাটা কোত্থেকে শুনেছিলেন—সেটা মহাভারতে বলা না থাকলেও আমার ধারণা—এ খবর এসেছিল যাদবদের কাছ থেকেই, হয়তো খোদ কৃষ্ণপিতা বসুদেবের কাছ থেকেই। এরপর কুন্তীর বিয়ের জন্য যখন স্বয়ম্বর-সভা ডাকা হল, সেখানে কুন্তীর দিক থেকে সবাইকে ফেলে পাণ্ডুকে বরণ করাটা ছিল কন্যাপক্ষের ঈপ্সিত। যাঁকে কুলমর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় কুন্তিভোজকে বলতে হয়—মনে রেখো তুমি আর্য শূরের কন্যা, মহামতি বসুদেবের তুমি ভগিনী—বসুদেবস্য ভগিনী...শূরস্য দয়িতা সুতা—তিনি যে বিয়ের সময় শূর অথবা বসুদেবের ইচ্ছাটি বুঝবেন না, তা আমি মনে করি না। এই জন্যই বরমাল্য দেওয়ার সময় ঠিক পাণ্ডুকেই চিনে নেওয়ার মধ্যে কুন্তীর মনস্বিতা বা বুদ্ধিমত্তা দেখতে পেয়েছেন মহাভারতের কবি।

বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ—দুয়েরই ঈপ্সিত ব্যক্তিটির গলায় স্বয়ম্বরবধূর মালাটি পড়ায় স্বয়ম্বর-সভার অবস্থা হল এখনকার দিনের পূর্ব-নির্ধারিত ব্যক্তির চাকুরি পাওয়ার মতো। বিশেষ এইটুকু যে, তার 'কোয়ালিফিকেশন' যথেষ্ট আছে। ইনটারভিউতে আসা গাদা গাদা কর্মপ্রার্থী ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে লোক ঠিক করাই আছে, তখন তারা যেমন নিষ্প্রভ নিস্তরঙ্গতায় নিজেদের মধ্যে গজগজ করতে করতে ফিরে যায়, তেমনই কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করেছেন দেখেই রাজারা সব যেমন এসেছিলেন, তেমনই হাতি, ঘোড়া, রথের মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন—যথাগতং সমাজগ্মু-র্গজৈরশ্বৈ রথৈস্তথা।

কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হল, যেন শচীর সঙ্গে মিলন হল ইন্দ্রের। পাণ্ডু বউ নিয়ে, কুন্তিভোজের বাড়ি থেকে অনেক সম্মান-উপহার নিয়ে মহর্ষি আর ব্রাহ্মণদের জয়ঘোষের মধ্যে রাজধানীতে ফিরলেন। কুন্তীর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল—কন্যাবস্থায় সেই আকালিক দুর্ঘটনার পর এবার তিনি সুখে সংসার করবেন। কিন্তু সুখ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। কুন্তী কৃষ্ণের কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন—বাপের বাড়িতেও আমি সুখ পাইনি, শ্বশুরবাড়িতেও নয়। শব্দটা ছিল 'নিকৃতা' অর্থাৎ ওখানেও লাঞ্ছনা পেয়েছি, শ্বশুররাও আমাকে লাঞ্ছনা দিয়েছেন। শ্বশুর বা শ্বশুরস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম হলেন ভীষ্ম। কারণ পাণ্ডুর নামমাত্র-বাবা বিচিত্রবীর্য বেঁচে নেই এবং পাণ্ডুর জন্মদাতা ব্যাসদেব কোনওভাবেই কুরুবাড়ির সংসারে প্রবেশ করেননি। কাজেই কুন্তীর শ্বশুরের প্রথম সম্বন্ধটা ভীষ্মের সঙ্গেই।

বিয়ের পর কিছুদিন কাটতেই মহামতি ভীষ্ম পাণ্ডুর আরও একটি বিবাহ দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মদ্রদেশের মেয়ে শল্যের বোন মাদ্রীর কথা তাঁর জানাই ছিল। তাঁকে বাড়ির বউ করে আনার জন্য তিনি নিজেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটলেন সে দেশে। হয়তো পাণ্ডুর এই বিয়েতে বড় বেশি আসক্তি ছিল না। প্রথমা মহিষী কুন্তীর সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি খুব উচ্চ-বাচ্যও করেননি। কিন্তু ভীষ্ম নিজেই আগ্রহ দেখালেন পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য।

ভীষ্মের আগ্রহটা কেন, তার কারণ আমরা বুঝি। নিজে তো বিয়ে করেননি। কিন্তু পিতা শান্তনুর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য মারা যেতে ভরতবংশের সিংহাসন খালি হয়ে গিয়েছিল। ভীষ্ম নিজে রাজা হবেন না অথচ রাজবংশের ভাবনাটা ছিল তাঁরই। এই অবস্থায় রাজমাতা সত্যবতী এবং তাঁর নিজের মতৈক্যে ব্যাসদেবকে স্মরণ করতে হয়। কুরুকুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মের মাধ্যমে। কুরুকুলে বংশ-পরম্পরা রক্ষার একটা

সমস্যা ছিল এবং ভীষ্ম সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুদের বিয়ের আগে বিদুরকে তিনি বলেছিলেন—তোমরা তিনজনই এই প্রসিদ্ধ ভরত-বংশের অঙ্কুর। যে কুল প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল—আমি, সত্যবতী আর ব্যাসদেব মিলে এখন তোমাদের মধ্যেই সেই বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি—সমবস্থাপিতং ভূয়ো যুস্মাসু কুলতন্তুষু। ভীষ্ম বলেছিলেন—তোমাদের চেষ্টা করা উচিত, যাতে সমুদ্রের মতো এই বংশ বৃদ্ধিলাভ করে—কুলং সাগরবদ্ যথা।

এই নিরিখে—আমার ধারণা, এই নিরিখে ভীষ্ম আগে থেকেই নানা বংশের মেয়ে খোঁজ ভাঁজ করছিলেন এবং সেই খোঁজের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের মুখে গান্ধারীর কাহিনী শুনেছিলেন। শুনেছিলেন গান্ধারী মহাদেবকে তুষ্ট করে শতপুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ পেয়েছেন। যিনি ভরতবংশের 'সাগরবৎ' বৃদ্ধি চান, তিনি যে গান্ধারীর মতো মেয়েকেই কুলবধূ করে আনবেন তাতে আশ্চর্য কী। মহাভারতের কবি লিখেছেন—গান্ধারীর শত পুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ-সংবাদ ভীষ্ম পেলেন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে—অথ শুশ্রাব বিপ্রেভ্যঃ। কারণ ব্রাহ্মণরাই এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতেন এবং এ রাজ্যের সঙ্গে ও রাজ্যের সংবাদের সূত্র ছিলেন তাঁরাই।

তো, ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের কাছে গান্ধারীর খবর পেলেন আর কুন্তীর খবর পেলেন না? বিশেষত দুর্বাসা মুনি কারও উপকার করলে সেই উপকার কাউকে না বলে থাকবেন—এটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। নানা পুরাণকাহিনীতে দুর্বাসার চরিত্র লক্ষ করে চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামী এই উক্তিটি করেছেন। কাজেই দেব-পুরুষ আহ্বান করে কুন্তীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার কথাও ভীষ্ম জানতেন বলেই মনে হয়। জানতেন যে, তার একটা প্রমাণ দাখিল করতে পারি মহাভারত থেকেই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে আছেন, রাজারা সবাই যখন একে একে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেছেন, তখন কর্ণ এসে উপস্থিত হলেন ভীষ্মের কাছে—একা, নতশির, অপরাধীর মতো চেহারা। এসেই বললেন—আমি রাধার ছেলে কর্ণ এসেছি—রাধেয়োʼহং কুরুশ্রেষ্ঠ। ভীষ্ম বললেন—এসো, এসো কর্ণ। তুমি যে রাধার ছেলে নও, কুন্তীর ছেলে—সে আমি জানতাম। সূর্যের তেজে কুন্তীর গর্ভে তুমি জন্ম নিয়েছ—এ সব কথা আমি নারদের মুখে শুনেছি। শুনেছি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছেও—সূর্যজস্ত্বং মহাবাহো বিদিতো নারদান্ময়া। কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব তচ্চ সত্যং ন সংশয়ঃ।

ভীষ্ম যেখানে কুন্তীর কানীন পুত্রটির কথাও জানতেন সেখানে তিনি তাঁর পুত্রলাভের ব্যাপারে দুর্বাসার আশীর্বাদের কথা জানতেন না—এটা ভাবা আমার পক্ষে মুশকিল। কাজেই গান্ধারীর কথা তিনি যেভাবে ব্রাহ্মণদের মুখে শুনেছিলেন, তেমনই কুন্তীর দৈবশক্তির কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই—ইতি শুশ্রাব বিপ্রেভ্যঃ।

কুরুকুলের সন্তান-সমস্যা সমাধানের জন্য তথা এই কুল যাতে সন্তান-সন্ততিতে 'সাগরবৎ' ভরে ওঠে, সেজন্যেও যদি তিনি সুবল-সুতা গান্ধারী এবং যাদবী কুন্তীকে বধূ করে এনে থাকেন, তা হলে ভীষ্মের যুক্তিও সেখানে বোঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার কেন তিনি পাণ্ডুর সঙ্গে মাদ্রীর বিয়ে দেওয়ার জন্য এত তৎপর হয়ে উঠলেন—তার মধ্যে একটা হেঁয়ালি থেকে যায়। প্রমাণ এখানে দেওয়া যাবে না, তবে প্রায় অখণ্ডনীয় একটা অনুমান এখানে করা যেতে পারে। বস্তুত মহাভারতের পঙ্ক্তির মতো শব্দ-প্রমাণ আমাদের হাতে নেই বলেই এমন একটা অনুমান আমাদের করতে হচ্ছে।

পাণ্ডুর পুত্র উৎপাদন করার ক্ষমতা ছিল না বলেই মহাভারতের কবিকে হয়তো কিন্দম মুনির অভিশাপের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু সে-কথা বলবার আগেই আমাদের অনুমান-খণ্ডের প্রথম প্রস্তাবটা করে নিই। মহামতি ভীষ্ম কি পাণ্ডুর এই অক্ষমতার কথা জানতেন? তিনি বলেছিলেন—নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছে তিনি কুন্তীর খবর পেয়েছেন, কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির অক্ষমতার কথাও তিনি ব্যাসের কাছেই শোনেননি তো?

আমরা একবারের জন্য পিছন ফিরে তাকাব হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির সেই ঘরটির মধ্যে যেখানে 'অশেষ-যোগ-সংসিদ্ধ' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মায়ের আদেশ মেনে নিয়ে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীর ক্ষেত্রে

পুত্র উৎপাদন করছিলেন। আপনারা জানেন—রাজবধূর বিদগ্ধ রুচিতে অম্বিকা এবং অম্বালিকা—কেউই ব্যাসের সঙ্গে মিলনের ঘটনাটা পছন্দ করেননি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিরুপায়, কারণ সে যুগে এই নিয়োগ প্রথা ছিল সমাজ-সচল। তার মধ্যে রাজমাতা সত্যবতী নিজেই হস্তিনাপুরের অরাজক সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য দুই বধূকে ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হতে উপরোধ করেছিলেন।

সত্যবতীর ইচ্ছায় এই দুই রাজবধূর কোনও সম্মতি ছিল না। কিন্তু তাঁদের জন্য কুরুবংশের লোপ হয়ে যাবে—শুধু এই কারণে তাঁদের কোনওমতে রাজি করাতে পেরেছিলেন সত্যবতী। সত্যবতী বলেছিলেন—কিছুই নয়, তোমাদের ভাশুর আসবেন নিশীথ রাতে, তোমরা দুয়োর খুলে অপেক্ষা কোরো। কিন্তু রাজবধূর বিদগ্ধ-রুচিতে এই নিশীথ-মিলন পরাণ-সখার সঙ্গে অভিসারে পর্যবসিত হয়নি। এ মিলন বস্তুত তাঁদের কাছে ছিল ধর্ষণের মতো।

স্বয়ং ব্যাসও এটা জানতেন। সত্যবতীকেও তিনি বারবার সাবধান করেছেন। বলেছেন—আমার বিকৃত রূপ তাঁদের সহ্য করতে হবে—সে-কথা মনে রেখো—বিরূপতা মে সহতাং তয়োরেতৎ পরং ব্রতম্। কিন্তু বলে-কয়েও কোনও শরীর মিলনে কি রুচি নির্মাণ করা যায়? শত-শত প্রজ্জ্বলিত দীপের আলোয় ব্যাসকে দেখেই অম্বিকা তিক্ত ঔষধ সেবনের মানসিকতায় সেই যে চোখ বুজেছিলেন, আর চোখ খোলেননি। তাঁর পুত্র শত হস্তীর শক্তি সত্ত্বেও অন্ধ হবে—ব্যাসই সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই দুর্ঘটনার ফলে দ্বিতীয়া রানি অম্বালিকার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল, কারণ অন্ধ ব্যক্তি কুরুবংশের রাজা হতে পারে না, অতএব তাঁর চক্ষু মুদে থাকা চলবে না।

চক্ষু মুদে যে অনীপ্সিত সঙ্গমে বড় রানি কোনও রকমে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, অম্বালিকাকে সেই সঙ্গম চোখ খুলে দেখতে হল বলেই তাঁর কাছে এই সঙ্গম সম্পূর্ণ ধর্ষণের বিকারে ধরা দিল। মহর্ষির লালচে কটা দাড়ি, মাথাভর্তি জটা, তপোদীপ্ত চক্ষু এবং গায়ের উৎকট গন্ধ—সব কিছু টান টান চোখে দেখে দ্বিতীয়া রানির শরীর ভয়ে ফ্যাকাসে-হলুদ হয়ে গেল। সত্যবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে ব্যাস বললেন—এই রানির ছেলে পাণ্ডুবর্ণ হবে।

ওপরের কথা এইটুকুই। কোনও ছেলের গায়ের রঙ যদি ফ্যাকাসে-হলুদ হয়, তাতে এমন কিছু আসে যায় না। বরঞ্চ এই গাত্রবর্ণে পাণ্ডুকে যে যথেষ্ট সুন্দর লাগত—তার বর্ণনা আমরা মহাভারতে বহু জায়গায় পেয়েছি। কালিদাসের যক্ষবধূর মুখে এই পাণ্ডুতা ছিল বলে আমরা তাঁকে বেশি পছন্দ করেছি। কিন্তু সঙ্গম-লগ্নে রাজরানির এই পাণ্ডুতার আড়ালে আরও কিছু ছিল, যা ব্যাস স্বকণ্ঠে সোচ্চারে বলেননি। বৈদ্যশাস্ত্রের নিয়মমতো রমণীর কাছে পুরুষের সঙ্গম যদি ধর্ষণের বিকারে ধরা দেয়, তবে সেটা এতই 'শকিং' হতে পারে যাতে বিকৃতাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এর ফলেই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, আর অম্বালিকাকে যেহেতু জোর করে এই ধর্ষণ চোখ মেলে সহ্য করতে হয়েছিল, তাই পাণ্ডু পুত্রোৎপত্তির অক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন। নইলে গাত্রবর্ণের পাণ্ডুত্ব এমন কোনও রোগ নয় যে, সত্যবতী পুনরায় ব্যাসকে আরও একটি সন্তানের জন্য উপরোধ করবেন।

সত্যবতী এই ইঙ্গিত বুঝেছিলেন হয়তো সেই কারণেই আরও একটি পুত্রও তিনি প্রার্থনা করে থাকবেন। কিন্তু কুরুবংশের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্য আর বেশি কিছু তাঁর বলার ছিল না, কেননা মহর্ষি রানিদের গর্ভাধান করার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রের পিতা হবেন এবং পাণ্ডুও পাঁচ সন্তানের পিতা হবেন। কেমন করে হবে, কীভাবে হবে—সে-কথা তখন অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু আমার যা বক্তব্য ছিল—পাণ্ডুর জন্মদাতা পিতা এবং কালজ্ঞ ঋষি হিসাবে ব্যাস হয়তো জানতেন পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির ক্ষমতা ছিল না। এই অক্ষমতার কথা মহামতি ভীষ্মকে তিনি জানিয়ে থাকবেন। কুরুবংশের এই সন্তানটির ওপর জন্মদাতা হিসেবে ঋষির যে মমতা ছিল, সেই মমতাতেই হয়তো ভীষ্মকে তিনি কুন্তীর খবর দিয়েছিলেন, আর সেই মমতাই মহাভারতের কবির হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে কিন্দম মুনির অভিশাপের গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আপন ঔরসজাত প্রিয় পুত্রের প্রজনন-শক্তির অভাব তিনি কিন্দমের অভিশাপের প্রলেপ দিয়ে সকারণ করতে চেয়েছেন।

এখনও প্রশ্ন রইল মাদ্রীর বিবাহ তবে কেন? দেখুন, স্বামীর ব্যক্তিত্ব-বীজ ছাড়াই যে রমণীর

পুত্র-উৎপাদনের শক্তি করায়ত্ত—সে যেভাবেই হোক, দৈববলে অথবা নিয়োগপ্রথায়, পুত্রমুখ সে দেখবেই। সে রমণীকে স্বামী অসাধারণী ভাবতেই পারেন, কিন্তু নিজের তীব্র স্বাধিকারবোধ তাতে পদে পদে মার খায়। মাদ্রীকে ভীষ্ম প্রায় উপযাচকের মতো মদ্র-নগরী থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাও আবার কন্যাপণ দিয়ে। নিয়ে এসেছিলেন শুধু পাণ্ডুর স্বামীজনোচিত স্বাধিকার তৃপ্ত করার জন্য নয়, নিয়ে এসেছিলেন হয়তো কুন্তীকে 'ব্যালান্স' করার জন্য। ভাবটা এই—শুধু পুত্র-ধারণের শক্তি থাকলেই হবে না গো মেয়ে, স্বামীর ভালবাসাটাও পাওয়া চাই। অর্থাৎ স্বামীর দৈহিক অক্ষমতায় তোমার নিজের অহঙ্কার যদি বেড়ে যায়, তবে অন্তত স্বামীর প্রণয়ের জন্য তোমার প্রতিযোগিনী রইলেন একজন। হয়তো মাদ্রীকে ভীষ্ম এই কারণেই কুরুবাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তিনি বোধহয় পাণ্ডুর অক্ষমতার কথাও জানতেন আবার কুন্তীর দৈবী ক্ষমতার কথাও জানতেন।

মূল প্রস্তাবে ফিরে এসে বলি—বিবাহের কয়দিনের মধ্যে, হয়তো বর-বধূর উন্মত্ত-অন্তরঙ্গতা তখনও ভাল করে আরম্ভই হয়নি—তার মধ্যেই এই যে দ্বিতীয়া আরও একটি রমণীকে সযত্নে জুটিয়ে আনলেন ভীষ্ম, সে রমণী যতখানি পাণ্ডুর বউ হয়ে এলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কুন্তীর সতীন হয়ে এলেন। মনে মনে কুন্তী শ্বশুরকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন, দুঃখও পেয়েছেন মনে মনে।

হয়তো দুঃখের কারণ আরও বেশি ছিল এই কারণে যে, পুত্রোৎপত্তিতে অক্ষম জানা সত্ত্বেও পাণ্ডুর সঙ্গে যে তাঁর বিয়ে হল—তার মধ্যে ভীষ্মের অলক্ষ হাত ছিল, কারণ এই যাদবী কন্যাটিকে আগে থেকেই তিনি পাণ্ডুর জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। লক্ষ করে দেখুন, দু-দুটি নববধূকে বাড়িতে রেখে বিবাহের এক মাসের মধ্যে পাণ্ডু রাজধানী থেকে দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছেন। এই এক মাস কুন্তী এবং মাদ্রীর সঙ্গে তিনি বিহার করেছেন যখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে অথবা যখন মনে হয়েছে বিহারে তাঁর সুখ হবে—যথাকামম্ যথাসুখম্। ভাষাটা খেয়াল করার মতো।

বুঝলাম, এটাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু প্রসিদ্ধ ভরত বংশের কোন প্রসিদ্ধ রাজা বিয়ের এক মাসের মধ্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন? ভরতবংশে রাজকার্য বা প্রজার কার্য বোঝার মতো রাজা কম ছিলেন না। সম্বরণ, শান্তনুর মতো প্রেমিক অথবা পাণ্ডুর পিতৃপ্রতিম বিচিত্রবীর্যের মতো ভোগী রাজার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু এমনকী পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠির-অর্জুনও যে বিয়ের এক মাসের মধ্যে কোথাও নড়েননি! পাণ্ডু কি এতই বড় রাজা? ভোগের ইচ্ছে যে তাঁর কম ছিল না—সে-কথাও পরে জানাব।

আসলে স্ত্রীদের কাছে আপন অক্ষমতা লুকিয়ে রাখার জন্য, অথবা ক্ষমতার ধ্বজাটুকু জিইয়ে রাখার জন্যই পাণ্ডুকে দিগ্বিজয়ে বেরতে হল—বিয়ের পর তিরিশ রাত্তিরের অক্ষম বিহার সেরেই—বিহৃত্য ত্রিদশা নিশাঃ। অন্তঃপুরের অন্দরমহলে পড়ে রইলেন কুন্তী—পাণ্ডুকে বরণ করার সময়ে যাঁর অতুল দৈহিক দীপ্তিতে মনে হয়েছিল যেন সূর্যের দীপ্তিতে ম্লান হয়ে গেছে অন্য রাজাদের মুখমণ্ডল—আদিত্যমিব সর্বেষাং রাজ্ঞাং প্রচ্ছাদ্য বৈ প্রভাঃ। যাকে দেখে কুন্তী তাঁর হৃদয়ের ভাব গোপন রাখতে পারেননি, শরীরে জেগেছিল রোমাঞ্চ, সেই পাণ্ডু তিরিশটি বিহার-নিশি দুই রমণীর মধ্যে তাঁরই ইচ্ছামতো ভাগ করে দিয়ে এখন রাজ্য জয় করতে বেরলেন।

রাজ্য-জয়েও অনেক দিন গেল। কম কথা তো নয়। ফিরে আসার পর দান-ধ্যান, সত্যবতী-ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রকে রাশি রাশি ধনরত্ন উপহার, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা—অনেক কিছু করে পাণ্ডু বললেন—আমি বনে যাব, বনেই কিছু দিন কাটাব। তা রাজা-রাজড়াদের এই ধরনের বিলাস হতেই পারে। রাজমহল আর রাজার সুখবিলাস ছেড়ে পাণ্ডু দুই স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেলেন। পাণ্ডু ভেবেছিলেন বুঝি, রাজমহলে যা হচ্ছে না, বনে গিয়ে তাতে সুবিধে হবে। মাঝে মাঝে তাঁকে দুটি হস্তিনীর মধ্যগত ঐরাবতের মতো লাগছিল বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দুই রানিকে ছেড়ে পাণ্ডু মৃগয়ায় মত্ত থাকতেন—অরণ্যনিত্যঃ সততং বভূব মৃগয়াপরঃ।

বনে আসা, আবার বনে এসেও মৃগয়ায় ডুবে থাকা—এই সব কিছুর মধ্যেই পাণ্ডুর দুর্বার হৃদয়-যন্ত্রণা ছিল, কিছু আত্ম-বঞ্চনা ছিল, যার চরম মুহূর্তে মহাভারতের কবি কিন্দম মুনির অভিশাপ

বর্ণনা করেছেন। পাণ্ডু নাকি মৈথুনরত দুটি হরিণ-হরিণীকে মেরে ফেলবার পরেই দেখতে পেলেন হরিণটি ছিল এক ঋষিকুমার। মনুষ্যবসতির মধ্যে মৈথুন চরিতার্থ করার মধ্যে যে লজ্জা আছে, সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যই ঋষিকুমার হরিণের আচ্ছাদন গ্রহণ করেছিলেন। ঋষি পাণ্ডুকে বলেছিলেন—স্ত্রীসম্ভোগের সুখ আপনি জানেন, অথচ সেই অবস্থায় আমাকে মেরে আপনি কী নারকীয় কাজটাই না করলেন ! ঋষিকুমার বলেছিলেন—আমি পুত্রের জন্য মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আপনি সেই আশা বিফল করে দিলেন—পুরুষার্থফলং কর্তুং তত্ ত্বয়া বিফলীকৃতম্।

পাণ্ডু ঋষিকুমারের সঙ্গে নিজের সপক্ষে মৃগবধের কারণ উপস্থিত করে অনেক তর্ক করলেন বটে, কিন্তু মৈথুনরত অবস্থায় প্রাণিবধ মৃগয়ার বিধিতেও সত্যিই লেখে না। পুরাণ ইতিহাসে এমন গল্পও আছে যাতে দেখা যাচ্ছে—মৈথুন-চর পশু পক্ষীকে রাজপুরুষেরা ছেড়ে দিচ্ছেন। রামায়ণের মতো মহাকাব্যে যেখানে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একতরের মৃত্যুতে কবির শোক শ্লোকে পরিণত হয়েছিল, সেখানে মৈথুনরত প্রাণীকে হত্যা করার মধ্যে পাণ্ডুর যে অন্য কোনও আক্রোশ ছিল তা আমরা হলফ করে বলতে পারি। বস্তুত স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মধ্যে পুত্রলাভের যে সুখ-সম্ভাবনা থেকে যায় সেই সম্ভাবনা তাঁর বারংবার প্রতিহত হচ্ছিল বলেই তিনি তাঁর অন্তরেব আক্রোশ মিটিয়েছেন মৈথুনরত একটি মৃগকে হত্যা করে, নইলে মুনি যেমন বলেছেন—সম্ভোগ সুখের মর্মও তিনি জানতেন, শাস্ত্র এবং ধর্মের মর্মকথাও তিনি জানতেন—স্ত্রীভোগানাং বিশেষজ্ঞঃ শাস্ত্রধর্মার্থতত্ত্ববিৎ।

যাই হোক মুনি শাপ দিলেন—মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেই পাণ্ডু মারা যাবেন এবং আমাদের কাছে পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির অক্ষমতা এই মুহূর্তে থেকে যতই সকারণ হয়ে উঠুক, আমরা বেশ জানি—মনস্বিনী কুন্তী তাঁর শত দুঃখ সত্ত্বেও তাঁকে এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেননি। কবি লিখেছেন—ঋষির অভিশাপ শুনে পাণ্ডুর মনে এত আঘাত লেগেছিল যে, দুই স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি কঠোর ব্রত-নিয়ম আশ্রয় করে তপস্যা করবেন বলেই ঠিক করলেন। আমবা জানি—এও সেই আক্রোশ। বাবংবার পুত্র-লাভের সম্ভাবনা ব্যাহত হওয়ায় নিজের ওপরে তাঁর যে আক্রোশ হয়েছিল, সেই আক্রোশই তিনি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন গৃহস্থধর্মের ওপরে রাগ করে। এই অবস্থায় কুন্তী এবং মাদ্রী—দুজনেই তাঁকে অন্তত পত্নীত্যাগে বিরত করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বরঞ্চ নিজেরাও স্বামীর অনুধর্মে কঠোর নিয়ম-আচার পালন করতে রাজি হয়েছিলেন।

এইভাবেই দিন কাটছিল। দিনরাত যজ্ঞ-হোম, তপঃ-স্বাধ্যায়, ঋষিদের সঙ্গ আর ফলমূল আহার—দুই স্ত্রীর সঙ্গে সহধর্মচারী পাণ্ডুর দিন কাটছিল এইভাবেই। কিন্তু গভীর ক্ষত মিলিয়ে গেলেও যেমন তার দাগ থাকে, তেমনই এই শত ব্রত-নিয়ম-আচারের মধ্যেও পুত্রহীনতার যন্ত্রণা তাঁকে পীড়া দিতে লাগল। প্রাথমিকভাবে পাণ্ডু নিয়োগপ্রথারও পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং বিচিত্রবীর্যের পুত্র নন, তাঁর স্ত্রীর গর্ভে তিনি ব্যাসের ঔরসে জন্মেছিলেন। নিজের জন্ম-প্রক্রিয়ার এই অকৌলীন্যে হয়তো প্রাথমিকভাবে তিনি নিয়োগের বিরোধী ছিলেন। কারণটা পরিষ্কার। বাবা বিচিত্রবীর্য বেঁচে ছিলেন না, তাঁর অনধিকৃত ক্ষেত্রে কেউ সন্তান দান করলেন—সে এক কথা। আর পাণ্ডু বেঁচে আছেন, অথচ তাঁর চোখের সামনে বা আড়ালে অন্য কেউ তাঁরই প্রিয়া পত্নীতে উপগত হবে—এমন একটা অনধিকারচর্চা তাঁকে হয়তো ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল।

প্রিয়তমা দুই পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে কাতর দীর্ঘশ্বাসে তিনি বলেছিলেন—সন্ন্যাসী হয়ে যাব আমি। আমার সন্তান উৎপাদন করার শক্তি নেই, কী দরকার আমার ঘর-গেরস্তির—নাহং... স্বধর্মাৎ সততাপেতে চরেয়ং বীর্যবর্জিতঃ। এই অবস্থায় অবশ্যই প্রশ্ন আসে এবং বলা যায়—পাণ্ডু তুমি কোনও ব্রাহ্মণের সাহায্য নিয়ে নিয়োগ-প্রথায় পুত্রলাভ করো। এই রকম আশঙ্কার আগেই পাণ্ডু তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন— কুন্তী-মাদ্রী দু'জনের কাছেই। পাণ্ডু বলেছিলেন—আমি কি কুত্তা নাকি যে, অন্যের কাছে ছেলে দাও, ছেলে দাও করে কাতর চোখে ভিক্ষে করব ; যে ব্যাটা এমন করে, সে কুত্তা—উপৈতি বৃত্তিং কামাত্মা স শুনাং বর্ততে পথি।

কিন্তু হায় ! যিনি এত বাগাড়ম্বর করেছিলেন, তাঁরও চিন্তা-ভাবনা অন্য রকম হয়ে গেল। যজ্ঞ-হোম, তপশ্চরণ অনেক অনেক করেও আবারও সেই কথাই মনে হল—একটি ছেলে থাকলে

বেশ হত। আসলে একটা বয়সে বাৎসল্য মানুষকে কাঙাল করে। পাণ্ডুও তাই কাঙাল হলেন। যেমন করে হোক একটি ছেলে চাই।

এ কাজ সহজ নয়, স্ত্রীদের অভিপ্রেত নাও হতে পারে। কিন্তু পাণ্ডু, পুত্রচিন্তায় পাগল পাণ্ডু একদিন নির্জনে ডাকলেন কুন্তীকে। বললেন—তুমি আমার বিপদটা জান, কুন্তী ! আমার প্রজননী শক্তি নেই—নষ্টং মে জননং—এই বিপদে তুমি আমাকে পুত্রলাভের ব্যাপারে সাহায্য করো কুন্তী। পাণ্ডু আরও বললেন—দেখো ! এই এত বড় হস্তিনাপুর রাজ্যের কোনও উত্তরাধিকারী রইল না। শাস্ত্রে বলে—অন্তত ছ'রকমের ছেলে বাপের সম্পত্তি পায়—নিজের ঔরসজাত পুত্র, অন্যের অনুগ্রহে নিজের স্ত্রীর গর্ভে জাত ক্ষেত্রজ—এই রকম করে পাণ্ডু কানীন পুত্রের কথাও বললেন। অর্থাৎ কন্যা অবস্থায় কুন্তীর যদি কোনও ছেলে থেকে থাকে তবে তার পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতে পাণ্ডুর কোনও দ্বিধা নেই।

কিন্তু কুন্তী ! কুন্তী একবারের তরেও স্বীকার করলেন না তাঁর সূর্য-সম্ভব পুত্রটির কথা। স্বীকার করলেন না, কারণ সে পুত্রের জন্মের মধ্যে জননীর ঈপ্সা ছিল না। ছিল কৌতুক। ছিল লজ্জা। ছিল গ্লানি, সবচেয়ে বেশি ছিল অনিচ্ছা। মনের গভীরে যাকে ইচ্ছের মতো লালন করেন জননী, সেই ইচ্ছে কর্ণের জন্মে ছিল না। আর ছিল না বলেই সে পর্ব তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন। ধর্ম-ব্রতে নিজেকে শুদ্ধ করে ভালবেসেছিলেন হস্তিনাপুরের রাজাকে। নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আজ স্বামীর এই বিপন্ন মুহূর্তে—যখন একটি কানীন পুত্রের জন্যও তিনি লালায়িত—তখনও তিনি তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা বলতে পারেননি। পাণ্ডুকে তিনি ভালবাসতে চেয়েছিলেন, তাঁকে ঠকাতে চাননি। তাই আজ পাণ্ডুর মুখে যখন আস্তে আস্তে সেই প্রস্তাবেরই সূচনা হচ্ছে, তখনও কুন্তী কুণ্ঠিত, লজ্জিত।

পাণ্ডু একটা গল্প বললেন কুন্তীকে। বললেন—কেমন করে এক বীর রমণী স্বামীর আদেশ মতো এক যোগসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে পুত্রলাভ করেছিলেন। গল্প বলার শেষে পাণ্ডুর অনুরোধ—কুন্তী ! আমি মত দিচ্ছি। তুমি কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্র-লাভের চেষ্টা করো।

কুন্তী পাণ্ডুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে জানতেন। প্রজননের শক্তি না থাকায় পাণ্ডুর গ্লানি, তাঁর ঈর্ষা, তাঁর কষ্ট তিনি অনুমান করতে পারেন। সব কিছুর ওপর অন্য পুরুষের নিয়োগে পুত্র-লাভ করার ব্যাপারে পাণ্ডুর পূর্ব মনোভাব—অর্থাৎ সেই আমি কি কুকুর নাকি ?—সেই মনোভাবও কুন্তী জানেন। নিজের জীবনে দুর্নিবার কৌতুক-খেলায় যা ঘটার একবার ঘটে গেছে। নিজের স্বামীর ঔরস পুত্রটি আপন কুক্ষিতে ধারণ করে পূর্বের সমস্ত গ্লানি তিনি ধুয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে বুঝি আর হল না।

তবু কুন্তী বললেন—মহারাজ ! তুমি ধর্মের রীতি-নীতি সব জান। আমিও তোমার ধর্মপত্নী মাত্র নই, তোমাকে আমি ভালবাসি—ধর্মপত্নীম্ অভিরতাং ত্বয়ি রাজীবলোচন। ধর্ম অনুসারে তুমি আমার গর্ভে বীর পুত্রের জন্ম দেবে। সেই বীর পুত্রের জন্য শুধু তোমার সঙ্গেই মিলন হবে আমার। তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার শারীরিক মিলন হচ্ছে—সে যে আমি মনে মনেও ভাবতে পারি না—ন হ্যহং মনসাপ্যন্যং গচ্ছেয়ং ত্বদৃতে নরম্। সত্যি কথা বলতে কি—তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট অন্য কোনও পুরুষ আমার কাছে আর কেউ নেই।

পাণ্ডু গল্প বলেছিলেন। তার উত্তরে কুন্তীও এবার গল্প বললেন পাণ্ডুকে। বললেন পাণ্ডুরই ঊর্ধ্বতন এক বিরাট পুরুষ ব্যুষিতাশ্বের গল্প। ব্যুষিতাশ্ব বহুতর যজ্ঞ এবং ধর্মকার্য করে দেবতাদের তুষ্ট করেছিলেন বটে, তবে নিজের স্ত্রী ভদ্রার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি এবং সম্ভোগের ফলে তাঁর শরীর হল ক্ষীণ এবং তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গেলেন। মারা যাবার পর মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে অশেষে-বিশেষে বিলাপ করলেন ভদ্রা। সেই বিলাপের সুর—কুন্তী যেমন শুনিয়েছেন—সে সুর কালিদাসের রতি-বিলাপ সঙ্গীতের প্রায় পূর্বকল্প বলা যেতে পারে। যাই হোক বিলাপে অস্থির ব্যুষিতাশ্বের প্রেতাত্মা অন্তরীক্ষ-লোক থেকেই জবাব দিল—তুমি ওঠো, সরে যাও, চতুর্দশী আর অষ্টমী তিথিতে তোমার শয্যায় ফিরে আসব আমি। আমারই সন্তান হবে তোমার

গর্ভে—জনয়িষ্যাম্যপত্যানি ত্বয্যহং চারুহাসিনি।

কুন্তী পাণ্ডুকে বললেন—যদি শব-শরীর থেকে তাঁর পুত্র হতে পারে—সা তেন সুষুবে দেবী শবেন ভরতর্ষভ—তা-হলে মহারাজ! তোমার তো যোগ-তপস্যার শক্তি কিছু কম নয়, তুমিই আমাকে পুত্র দেবে—শক্তো জনয়িতুং পুত্রান্। পাণ্ডু এসব কথার ধার দিয়েও গেলেন না। নিজের যোগশক্তি বা তপস্যার শক্তিতেও খুব যে একটা আস্থা দেখালেন তাও নয়। বরঞ্চ পুরাণে ইতিহাসে কবে কে নিয়োগ-প্রথায় আপন স্ত্রীর গর্ভে অন্যের ঔরসে পুত্র লাভ করেছে, সেই সব উদাহরণ একটা একটা করে কুন্তীকে শোনাতে লাগলেন। পাণ্ডু মানসিকভাবে কুন্তীকে অন্য একটি পুরুষের ক্ষণিক-মিলনের জন্য প্রস্তুত করতে চাইছেন। শেষ কথায় পাণ্ডু বললেন—আমাদের জন্মও যে এই নিয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তাও তো তুমি জান—অস্মাকমপি তে জন্ম বিদিতং কমলেক্ষণে।

পাণ্ডু নিজের কথা বলে, নানা গল্প-কাহিনী শুনিয়ে কুন্তীকে শেষে অনেক অনেক অনুনয় করে বললেন—আমার কথা তুমি শোনো কুন্তী, আমি নিজেই তোমাকে বলছি। শুধু একটি ছেলে, চিরটা কাল আমি ভেবেছি সেই ছেলের কথা। এইবারে একেবারে সত্যি কথাটা প্রকাশ হয়ে গেল। পাণ্ডুর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হল এতকালের তথ্য-বচন—আমার প্রজনন শক্তি নেই বলেই সন্তানের আকর্ষণ আমার চিরকালের বেশি—বিশেষতঃ পুত্রগৃদ্ধী হীনঃ প্রজননাৎ স্বয়ম্। পাণ্ডু অনেক আদর করে কুন্তীকে সম্পূর্ণ স্বমতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বামীর সোহাগের সঙ্গে যেন আচার্যের গম্ভীরতা মিশিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন—এই আমি তোমার মাথায় আমার দুই হাত রাখছি, আমি পুত্র চাই কুন্তী, আমাকে পুত্র দাও।

কুন্তীর জীবনে স্বামীর ভালবাসার এই বুঝি চরম মুহূর্ত। পাণ্ডুর আবেগ-মধুর অনুনয়ে কুন্তী বিগলিত হলেন। আস্তে আস্তে শোনাতে আরম্ভ করলেন কুন্তিভোজের বাড়িতে সেই অতিথি-পরিচর্যার কাহিনী। বললেন তাঁর পরম তুষ্টির কথা এবং অবশ্যই বশীকরণ মন্ত্রের কথা। এই বিষণ্ণ গম্ভীর মুহূর্তে, যখন তিনি স্বামী থাকতেও স্বামীর ইচ্ছাতেই অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে চলেছেন, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সেই কৌতুক-সঙ্গমের কথা উল্লেখ করা সম্ভব হল না। স্বামী যা চাইছেন, ঠিক সেই রকম অর্থাৎ তাঁর অতি-অভিলষিত একটি খবর দেওয়ার সময় তাঁর পক্ষে স্থূলভাবে বলা সম্ভব হল না—মহারাজ! আমার একটি ছেলে আছে। কুন্তী এখানে নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। তিনি দেবতা আহ্বানের মন্ত্র জানেন, সেটা তিনি করবেন। কিন্তু কোন দেবতাকে আহ্বান করবেন, কখন করবেন—এই সমস্ত ভার তিনি পাণ্ডুর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামীর সম্মতি, স্বামীর চাওয়া—এই পরম অধীনতার মধ্যেই তিনি যেন পাণ্ডুর পুত্র পেতে চাইছেন, দেবতার আহ্বান তাঁর কাছে যান্ত্রিকতামাত্র।

কুন্তী বললেন—তুমি অনুমতি দাও। দেবতা, ব্রাহ্মণ—যাঁকে তুমি বলবে—যং ত্বং বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ দেবং ব্রাহ্মণেব চ—তাঁকে আমি ডাকতে পারি। তবে কোন দেবতাকে ডাকব, কখন ডাকব—এই সমস্ত ব্যাপারে আমি তোমার আদেশের অপেক্ষা করব, আমি কিছু জানি না। তোমার ঈপ্সিত কর্মে তোমারই আদেশ নেমে আসুক আমার ওপর—ত্বত্ত আজ্ঞাং প্রতীক্ষন্তীং বিদ্ধ্যস্মিন্ কর্মণীপ্সিতে।

পাণ্ডুর কাছে কুন্তীর এই চরম আত্মনিবেদন এবং শরণাগতি একদিকে যেমন তাঁর প্রথম যৌবনের গ্লানিটুকু ধুয়ে মুছে দেয়, অন্যদিকে তেমনই দেবতা-পুরুষকে নিজে নির্বাচন করার স্বাধিকার ত্যাগ করে সমস্ত ভার পাণ্ডুর ওপর দিয়ে স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠাও তিনি দেখাতে পেরেছেন। নিজের অনীপ্সিত সন্তানটির কথাও যে তিনি বলেননি—তাও পাণ্ডুর প্রতি নিষ্ঠাবশতই। পাণ্ডু যদি দুঃখ পান। স্বামীর সম্মতি বা সাহায্য ছাড়া একাই তিনি উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হতে পারেন—এই স্বাধিকার যদি পাণ্ডুকে আহত করে—তাই কন্যাবস্থায় তাঁর পুত্রজন্মের কথাও উল্লেখ করেননি এবং এখনও তিনি নিজের ইচ্ছায় কাজ করছেন না, করছেন পাণ্ডুর ইচ্ছায়, তাঁরই নির্বাচনে।

কিন্তু পাণ্ডু কী করলেন? কন্যাবস্থায় কুন্তীর কৌতুক-সঙ্গম যেমন হঠাৎই হয়ে গিয়েছিল, তেমনই এখনও কোনও মানসিক প্রস্তুতির সময় দেননি পাণ্ডু। কুন্তীর প্রস্তাবের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কেবল একবার—আমি ধন্য হলাম, অনুগৃহীত হলাম, তুমি আমার বংশের ধারা রক্ষা করে বাঁচালে

আমাকে—কেবল এই একবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেছেন—আজই, আর দেরি নয়, আজই তুমি আহ্বান করো ধর্মরাজকে।

প্রথম যৌবনে মন্ত্র পরীক্ষার জন্য যে কৌতূহল কুন্তীর মনে জেগেছিল, হয়তো পাণ্ডুও সেই মন্ত্র পরীক্ষার কৌতূহলেই কুন্তীকে বলেছিলেন—দেরি নয়, আজই ডাকো ধর্মরাজকে, তা হলে আমাদের পুত্রলাভ কোনওভাবেই অধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে না—অধর্মেণ ন নো ধর্মঃ সংযুজ্যেত কথঞ্চন। আসলে ধর্মকে প্রথম আহ্বান জানানোর মধ্যে পাণ্ডুর দুটি যুক্তি থাকতে পারে। প্রথমত এতদিন পাণ্ডু ধর্ম-আচার নিয়েই জীবন কাটাচ্ছিলেন, অতএব তার একটা প্রতিফলন ঘটে থাকবে তাঁর প্রস্তাবে। দ্বিতীয়ত, এইভাবে অন্য পুরুষের দ্বারা, হোক না সে দেবতা, তবুও অন্য একজন পুরুষের দ্বারা নিজের স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদনের ব্যাপারে তাঁর কিছু লজ্জা থেকে থাকবে। কিন্তু সেই পুত্রের জন্মদাতা যদি হন স্বয়ং ধর্মরাজ, তবে তার মধ্যে অধর্মের লজ্জা কিছু থাকে না। অতএব ধর্মকেই তিনি প্রথমে ডাকতে বললেন কুন্তীকে।

কুন্তী সংযত চিত্তে ধর্মের পূজা করে দুর্বাসার মন্ত্রে ধর্মকে আহ্বান জানালেন মিলনের জন্য। ধর্ম এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাই তোমার কুন্তী। কুন্তী বললেন—পুত্র চাই। পুত্র দিন। তারপর শতশৃঙ্গ পর্বতের বনের ভিতর একান্তে ধর্মের সঙ্গে মিলন হল কুন্তীর—শয্যাং জগ্রাহ সুশ্রোণী সহ ধর্মেণ সুব্রতা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পূর্ণিমা তিথিতে কুন্তীর প্রথম ছেলের জন্ম হল। নাম হল যুধিষ্ঠির। প্রথম পাণ্ডব। ধর্মের দান প্রথম পুত্রটি লাভ করেই পাণ্ডুর এবার ক্ষত্রিয় জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা স্মরণ হল। কুন্তীকে বললেন—লোকে বলে ক্ষত্রিয় জাতির শক্তি-বলই হল সব। তুমি মহাশক্তিধর একটি পুত্রের কথা চিন্তা করো। পাণ্ডুর ইচ্ছা জেনে কুন্তী নিজেই এবার বায়ুদেবতাকে স্মরণ করলেন। কারণ দেবতার মধ্যে তিনি মহাশক্তিধর। বায়ু এলেন। কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র লাভ হল—ভীমসেন।

যুধিষ্ঠির এবং ভীম জন্মানোর পর পাণ্ডু যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন নিজেকে। শাস্ত্রে শুনেছেন—উপযুক্ত পুত্রের জন্য মাতা-পিতাকে তপস্যা করতে হয়। যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্মের মধ্যে পাণ্ডুর কৌতূহল ছিল, ফলে পুত্রজন্মের মধ্যে আকস্মিকতার প্রাধান্য ছিল বেশি। কুন্তীর শক্তিতে এখন তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী অতএব জেনে বুঝে রীতিমতো পরিকল্পনা করে একটি অসামান্য পুত্রের পিতা হতে চান তিনি। এমন একটি পুত্র চান যাঁর মধ্যে দেব-মুখ্য ইন্দ্রের তেজ থাকবে। থাকবে দেবরাজের সর্বদমন শক্তি এবং উৎসাহ। এমন একটি বীরপুত্রের জন্য তিনি নিজে তপস্যায় বসলেন আর ঋষি-মুনির পরামর্শে কুন্তীকে নিযুক্ত করলেন সাংবৎসরিক ব্রতে। স্বামী-স্ত্রীর যুগল-তপস্যায় সন্তুষ্ট হলেন দেবরাজ। স্বীকার করলেন—কুন্তীর গর্ভে অলোকসামান্য পুত্রের জন্ম দেবেন তিনি। পাণ্ডুর ইচ্ছায় কুন্তী এবার দেবরাজকে স্মরণ করলেন সঙ্গম-শয্যায়। জন্মালেন মহাবীর অর্জুন।

অর্জুনের জন্মের পর বহুতর দৈববাণী হল। তাঁর ভবিষ্যত পরাক্রম, চরিত্র এবং যশ বারংবার ঘোষিত হল স্বর্গের দেবতা আর ঋষি-মুনিদের মুখে। কুন্তীর এই পুত্রটি যে কুরুবংশের সমস্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে কুরুকুলের রাজলক্ষ্মীকে শ্রীময়ী করে তুলবে—সে-কথা অর্জুনের জন্মলগ্নেই শোনা গেল বারবার। দেবতা, সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণেরা, মুনি-ঋষিরা ভিড় করে অর্জুনকে দেখতে লাগলেন। এই অসাধারণ মুহূর্তে মহারাজ পাণ্ডুর কোনও প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না। যা দেখি তাতে আমাদের শ্রদ্ধা আহত হয়।

নন্দনের সংবাদ বয়ে আনা এই বীর পুত্রটির সম্বন্ধে শতশৃঙ্গবাসী ঋষিমুনিদের বিস্ময় এবং জয়কার তখনও শেষ হয়নি, তারই মধ্যে পাণ্ডু কুন্তীর কাছে আরও একটি পুত্রের জন্য বায়না ধরলেন। কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। প্রজননশক্তিহীন এক অসহায় স্বামীর পুত্রকামনা মেটানোর জন্য তিনি তাঁরই ইচ্ছেতে অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। তাও একবার নয়, তিনবার। এখন স্বামী আবারও বলছেন চতুর্থ এক পরপুরুষের সংসর্গে পুনরায় পুত্রবতী হওয়ার জন্য। কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—মহারাজ! বংশকর পুত্র না থাকায় আমাদের আপৎকাল উপস্থিত

হয়েছিল—এ-কথা ঠিক। সেই রকম আপৎকালে স্বামীর সম্মতিতে দেব-পুরুষের সংসর্গে আমাদের পুত্রলাভ হয়েছে—তাতেও দোষ নেই। কিন্তু বিপৎকালেও তিন তিন বার পরপুরুষের সহবাসে পুত্রোৎপত্তির পর চতুর্থ পুত্রের জন্ম দেওয়া—সাধুদের আচার সম্মত নয়। কুন্তীর বক্তব্য—তোমার যতই অনুমতি থাকুক, এই বিপৎকালেও চতুর্থ পুরুষের সংসর্গে আমার উপাধি জুটবে স্বৈরিণীর, আবার যদি—যা মতিগতি দেখছি তোমার—পঞ্চম পুরুষের সহবাস জোটে আমার কপালে তা হলে লোকে আমায় বেশ্যা বলবে—অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।

আমরা যে সাহসিকা রমণীর আক্ষেপের কথা আরম্ভ করেছিলাম, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উল্লিখিত যে গৃহস্থ-পত্নী কুন্তীর উদাহরণে নিজের ব্যভিচার-দোষ সমর্থন করতে চেয়েছিল অথবা নীতি-যুক্তির নিয়মে এখনকার কালেও যাঁরা কুন্তীর মধ্যে অন্য কোনও ইঙ্গিত খুঁজে পান—তাঁদেব আমি কুন্তীর ওই শেষ বক্তব্যটুকু স্মরণ করতে বলি। কন্যাবস্থায় কৌতুক-সঙ্গমের আকস্মিকতা ছাড়া সচেতনভাবে কুন্তী অন্য কোনও পুরুষকে সকাম অভ্যর্থনা জানাননি। এমনকী দেবতা-পুরুষদের আহ্বান করার মধ্যেও স্বামীর ইচ্ছে এবং নিজের দিক থেকে পুত্রোৎপত্তির যান্ত্রিকতা থাকায়, তাঁর দিক থেকে কোনও সকাম ভাব আমরা লক্ষ করিনি।

বস্তুত যিনি রসিকতা করে শ্লোক বেঁধে বলেছিলেন—কপালের জোর লোকে কুন্তীকে সতী বলে, তাঁকেও শব্দ-চয়ন নিয়ে ভাবতে হয়েছে। তাঁকে শ্লোক বাঁধতে হয়েছে কর্মবাচ্যে—অর্থাৎ পাঁচটি পুরুষের দ্বারা কুন্তী কামিতা হয়েছিলেন—পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী। কর্তৃবাচ্যে এই বাক্যের রূপ দাঁড়াবে—সূর্য, পাণ্ডু, ধর্মরাজ, বায়ু এবং ইন্দ্র—এই পাঁচজন কুন্তীকে কামনা কবেছিলেন। এই শ্লোকের মধ্যে কুন্তীর সম্বন্ধে সকৌতুক কটু ভাবনা আছে বটে। কিন্তু তবু কামনার ক্ষেত্রে কুন্তীর কর্তৃত্ব নেই। অথাৎ রসিকতা করেও তাঁর সম্বন্ধে এ-কথা বলা যাচ্ছে না যে, তিনি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে আপন রতিসুখ চরিতার্থ করার জন্য কোনও পুরুষকে কোনওদিন কামনা করেছেন। তিনটি পর-পুরুষ সংসর্গ সত্ত্বেও পাণ্ডুর প্রতি নিষ্ঠা এবং অনুরাগটুকু মিলিয়ে নিতে হবে কুন্তীর আপন বক্তব্য অনুযায়ী—আর নয় মহারাজ! তোমার যত ইচ্ছেই হোক শুধু পুরুষান্তরের সংখ্যাই এর পর আমাকে স্বৈরিণী বা বেশ্যা করে তুলবে—অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।

কুন্তী এইটুকু বলেই পাণ্ডুকে ছেড়ে দেননি। তাঁকে শাসন করে বলেছেন—ধর্মের নিয়ম-নীতি তুমি যথেষ্টই জান। কিন্তু জেনেশুনেও যেন কিছুই তোমার খেয়াল নেই এমনিভাবে সমস্ত ধর্ম-নিয়ম অতিক্রম করে আমাকে আবারও পুত্রের জন্য বলছ কেন—অপত্যার্থং সমুৎক্রম্য প্রমাদাদিব ভাষসে।

আসলে এও এক বিকার। প্রজনন-শক্তিহীন অবস্থায় পাণ্ডুর এক ধরনের বিকার ছিল। কিন্তু অন্য পুরুষের সংসর্গে নিজের তিনটি পুত্র লাভ করেও পাণ্ডু যে এখনও পুনরায় স্ত্রীকে পুরুষান্তরে নিয়োগ করতে চাইছেন—এর মধ্যে বোধ হয় আরও বড় কোনও বিকার আছে। জানি না, মনস্তাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে কী ভাববেন, তবে পাণ্ডুর অবদমিত শৃঙ্গারবৃত্তিই যে তাঁর কুলবধূকে এক রকম দুর্গতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, সে-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

যাই হোক পাণ্ডুকে থামতে হল। পুত্রহীনকে পুত্র দান করে কুন্তী আপাতত চালকের আসনে বসে আছেন। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হবে। নিজের বিয়ের কয়দিনের মধ্যে পাণ্ডুকে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই পুলকিত হননি। মাদ্রীর প্রতি স্বামীর দেহজ আকর্ষণ হয়তো বা কিছু বেশিই ছিল, যার জন্য তিনি পীড়িত বোধ করে থাকবেন। কিন্তু মুখে কখনওই কিছু বলেননি। আজ পুত্রলাভের জন্য পাণ্ডুকে কুন্তীরই মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে—এতে যদি তাঁর অহঙ্কার কিছু নাও হয়ে থাকে, আত্মতৃপ্তি কিছু ঘটেইছে। চোখের সামনে কুন্তীর এই বাড়-বাড়ন্ত দেখে মাদ্রীও খুশি হননি। যে কোনও কারণেই হোক স্বামী-দেবতাটি তাঁর হাতের মুঠোয়ই ছিল, অতএব মাদ্রী কুন্তীর কাছে কোনও দীনতা দেখাননি। তাঁর অভীষ্টপূরণ করতে চেয়েছেন স্বামীর মাধ্যমেই।

মাদ্রী পাণ্ডুকে একদিন বলেই ফেললেন—মহারাজ! তোমার পুত্র জন্মাবার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে—তাতেও আমার দুঃখ হয়নি। কিন্তু আমিও রাজার মেয়ে এবং পুত্র প্রসবের শক্তি আমারও

ছিল। মাদ্রী বললেন—দেখ, গান্ধারীর একশোটি ছেলে হয়েছে—তাতেও আমার দুঃখ নেই, কিন্তু মহারাজ! আমি কুন্তীর চাইতে খাটো কীসে? তাঁর ছেলে হল অথচ আমার ছেলে হল না—এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়—ইদন্তু মে মহদ্‌ দুঃখং তুল্যতায়াম্‌ অপুত্রতা। মাদ্রী নিজের দুঃখ জানিয়ে এবার আসল প্রস্তাব পেশ করলেন পাণ্ডুর কাছে। বললেন—কুন্তী আমার সতীন বটে। তাঁর কাছে আমি হ্যাংলার মতো ছেলে হওয়ার মন্ত্র শিখতে যাব না—সংরম্ভো মে সপত্নীত্বাৎ বক্তুং কুন্তিসুতাং প্রতি। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, যদি তোমার ভাল লাগে, তবে কুন্তীকে তুমিই বলে রাজি করাও।

ছোট বউ বলে কথা। মাদ্রী যা বললেন, পাণ্ডু তা নিজেই ভেবেছিলেন। স্বামীর গাম্ভীর্য বজায় রেখেও কুন্তীর কাছে কিছু কাকুতি-মিনতি করতেই হল পাণ্ডুকে। কুন্তী রাজি হলেন। ভাবলেন—বেচারা! শেষে এইভাবে বলতে হল! স্বামীর আদরিণী ধনিকে করুণা করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। বললেন—ঠিক আছে। এইটুকু দয়া আমি তাকে করব—তস্মাদনুগ্রহং তস্যাঃ করোমি কুরুনন্দন। কুন্তী মাদ্রীকে মন্ত্র দিলেন বটে, কিন্তু সাবধান করে বললেন—একবার, শুধু একবারের জন্য যে কোনও দেবতাকে ডাকতে পারো তুমি।

মাদ্রী একবারে যমজ দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে কুন্তীর বুদ্ধির ওপর টেক্কা দিলেন। কুন্তীর মনে মনে রাগ হল বটে কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। এর পর পাণ্ডু আবার মাদ্রীকে মন্ত্র শেখানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন কুন্তীকে। একেই কুন্তী মাদ্রীকে সহ্য করতে পারেন না, তার মধ্যে তার চোরা-বুদ্ধিতে মনে মনে আরও রেগে রয়েছেন কুন্তী। স্বামীর এই দুর্বার পুত্রেচ্ছাও তাঁর আর ভাল লাগছে না। বস্তুত পুত্রের জন্য বারংবার এই প্রয়াসে পাণ্ডুরও কোনও সুপ্ত অভিলাষ থেকে থাকবে। আমার ধারণা—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র শত-পুত্রের পিতা হয়েছেন—এই ঈর্ষা হয়তো তাঁর অন্তরের অন্তরে কাজ করে থাকবে। পাণ্ডু জানতেন—কুন্তীকে বলে আর কোনও সুবিধে হবে না, এখন যদি মাদ্রীকে দিয়ে তাঁর অভীষ্ট পূরণ হয়—তাতে ক্ষতি কী?

কুন্তী বুঝে গেছেন তাঁর স্বামীকে। মাদ্রীকেও তাঁর চেনা হয়ে গেছে। অতএব পাণ্ডুকে প্রায় তিরস্কারের ভাষাতেই কথাগুলি বলে গেলেন কুন্তী। মাদ্রীর সম্বন্ধে তাঁর চিরকালীন মনোভাব যা ছিল, বিশেষত স্বামীর ব্যাপারে তাঁর সপত্নীর অভিমানও বড় পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কথার ভাষাতেই। কুন্তী বললেন—দেখ, মাদ্রীকে একবার একটি দেব-পুরুষকে ডাকবার কথা বলেছিলাম। সেখানে সে এক মওকায় যমজ-দেবতা ডেকে দুটি ছেলে পেয়েছে। এ তো চরম বঞ্চনা, আমাকে তো বোকা বানানো হয়েছে—তেনাস্মি বঞ্চিতা। এর পরেও আমি যদি তাকে আবার মন্ত্র-শিক্ষা দিই, তবে তো সন্তান-সৌভাগ্যে সে আমাকেও টেক্কা দেবে, অন্তত সংখ্যায়। তুমি আর বোলো না, খারাপ মেয়েছেলেদের কেতাকানুনই এইরকম—বিভেম্যস্যা হ্যভিভবাৎ কুস্ত্রীণাং গতিরীদৃশী। আমি বোকা কিনা, তাই বুঝিনি যে, যুগল-পুরুষের আহ্বানে ফলও দুটোই হয়। না, তুমি আর আমাকে অনুরোধ কোরো না, আমি খুব বুঝেছি, এবার আমাকে দয়া করো—তস্মান্নাহং নিযোক্তব্যা ত্বয়ৈষোঽস্তু বরো মম। পাণ্ডু কুন্তীকে আর ঘাঁটাতে সাহস করেননি।

৬

কুন্তী স্বামীকে ভালবাসার চেষ্টা করেছিলেন অনেক। কিন্তু স্বামীসুখ তাঁর কপালে ছিল না। দুর্বাসার কাছে স্বেচ্ছা-বিহারের মন্ত্র শেখা সত্ত্বেও তাঁর মনে ছিল অসাধারণ সংযম এবং তার চেয়েও বেশি ব্যক্তিত্ব। ইচ্ছে করলেই কামুকের স্থূলতায় তাঁকে ভালবাসা যায় না। তাঁকে ভালবাসতে হলে পুরুষের দিক থেকে যে ব্যক্তিত্ব, যে সংযম থাকা দরকার, সেই ব্যক্তিত্ব বা সেই সংযম পাণ্ডুর ছিল না। কুন্তীর অন্তর বুঝতে হলে স্বামী নামক পুরুষটির যে পরিশীলিত চিত্তবৃত্তি বা যে মার্জিত রুচিবোধ থাকা দরকার পাণ্ডুর তা ছিল না। ছিল না বলেই চতুর্থবার তিনি কুন্তীকে দেব-পুরুষ ভজনার কথা বলতে পেরেছিলেন। ছিল না বলেই মাদ্রীর মাধ্যমে তিনি নিজের বিকার চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছিলেন। কুন্তী তাঁকে অপমানও করেননি, কিন্তু তাঁর কথা শোনেনওনি। বস্তুত

সেখানে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যেখানে পাণ্ডু রুচির সীমা অতিক্রম করেছেন অথবা যেখানে রুচি কামুকতার স্থূলচিহ্নে চিহ্নিত হয়েছে।

স্বামীসুখ কুন্তীর কপালে ছিল না। তার কারণ পাণ্ডু নিজেই। আরও এক কারণ তাঁর সতীন মাদ্রী। পুত্র উৎপাদনের শক্তি না থাকলেও পাণ্ডুর কামুকতা ছিল যথেষ্ট। যদি কিন্দম মুনির অভিশাপের গল্পটি বিশ্বাস করতে হয়, তবে বলব—পাণ্ডু যে মৈথুনরত অবস্থায় মৃগ-মুনিকে হত্যা করেছিলেন, তার পিছনে পাণ্ডুর ক্ষত্রিয়ের যুক্তি যাই থাক, আসলে তিনি নিজের কাম-পীড়ন সহ্য করতে পারেননি বলেই মৃগের মৈথুনও সহ্য করতে পারেননি। পরে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে সানুতাপে নিজের সম্বন্ধেই বলেছেন—ভদ্র বংশে জন্মেও সংযমের লাগাম-ছাড়া কামমুগ্ধ লোকেরা নিজের দোষেই এমন বাজে কাজ করে যে তার দুর্গতির সীমা থাকে না—প্রাপ্নুবন্ত্যকৃতাত্মানঃ কামজালবিমোহিতাঃ।

মৃগ-মৈথুনের মধ্যে কোনও ইন্দ্রিয়পীড়ন অনুভব না করলে পাণ্ডু নিজের সম্বন্ধে এই কথাটা বলতেন না। এই মুহূর্তে স্মরণে আনতেন না পিতা বিচিত্রবীর্যের কথা, যিনি অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগে শরীরে যক্ষ্মা ধরিয়ে ফেলেছিলেন। পাণ্ডুর অবস্থাও প্রায় একই রকম। তবে তাঁর এই সম্ভোগ-প্রবৃত্তির ইন্ধন হিসেবে কুন্তীকে ব্যবহার করাটা পাণ্ডুর পক্ষে কঠিন ছিল। কারণ সেই সংযম, সেই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মদ্ররাজকন্যা এ বিষয়ে পাণ্ডুর মনোমত ছিলেন এবং তাঁর অনিয়ত শৃঙ্গার-বৃত্তিতে প্রধান ইন্ধন ছিলেন তিনিই। যথেষ্ট শৃঙ্গারে সাহায্য করার কারণেই স্বামীর প্রণয় ছিল তাঁর বাড়তি পাওনা। বস্তুত কুন্তী এর কোনওটাই পছন্দ করতে পারেননি। স্বামীর প্রণয়ের জন্য অসংযত রুচিহীনতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি, নিজেকেও বল্গাহীন ভাবে ভোগে ভাসিয়ে দিতে পারেননি।

মৃগ-মুনির অভিশাপের পর পাণ্ডু যে হঠাৎ বড় ধার্মিক হয়ে উঠলেন জপ-যজ্ঞ-হোমে দিন কাটাতে লাগলেন—তার পিছনে তাঁর ধর্মীয় সংযম যত বড় কারণ, শাপের ভয় তার চেয়ে অনেক বড় কারণ। মৃগ মুনির অভিশাপ ছিল—মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেই তোমার মরণ ঘটবে।

এই অভিশাপের পর কুন্তী স্বামীর ব্যাপারে আরও কড়া হয়ে গিয়েছিলেন। কোনওভাবেই যাতে তাঁর প্রবৃত্তির রাশ-আলগা হয়ে না যায়, সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন সতত। বস্তুত স্বামীর ব্রত-ধর্ম পালনে তিনি বরং খুশিই ছিলেন। সাময়িকভাবে পাণ্ডুও শান্ত হয়ে ছিলেন বটে, তবে পুরুষান্তরের সংসর্গে নিজের স্ত্রীর গর্ভে বারংবার পুত্র-প্রার্থনার মধ্যে তাঁর আপন কাম-বিকারই শান্ত হচ্ছিল। কিন্তু যেই তাঁর পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়েছে, বলা ভাল—কুন্তীর ব্যক্তিত্বে পুরুষান্তরে তাঁর শৃঙ্গার-নিয়োগ যেই বন্ধ হয়ে গেছে, অমনই পাণ্ডুর ধর্ম-কর্ম চুকে গেছে, এমনকী শাপের ভয়, মৃত্যুর ভয়—সব তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন আপন শৃঙ্গার-লালসায়।

অবশ্য সময়টাও ভাল ছিল না। ছেলেরা বড় হচ্ছিল। এদিকে চৈত্র এবং বৈশাখের সন্ধিতে বসন্তের হাওয়ায় পলাশ-চম্পকের মাতন শুরু হয়েছিল শতশৃঙ্গ পর্বতের বনে বনান্তে। এই উতলা হাওয়ায় পাণ্ডুর মনে মাঝে মাঝেই বাসনার শিখা জ্বলে উঠছিল। দূরে তাঁর ধর্ম-বালকরা খেলা করছিল, কুন্তী তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু মাদ্রী রাজাকে একা উতাল-চিত্তে ঘুরতে দেখে তাঁর পিছু নিলেন এবং তাও একাকিনী।

তিনি দুটি বালকের হাত ধরে রাজার সঙ্গে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। মহাভারতের কবি পর্যন্ত তাঁর এই ভঙ্গি নাপছন্দ করে লিখেছেন—মাদ্রী তাঁর পিছন পিছন গেছেন একা—তং মাদ্রী অনুজগামৈকা। তাও যদি বা তিনি সাবগুণ্ঠনে জননীর প্রৌঢ়তায় অনুগমন করতেন স্বামীর। না, তিনি তা করেননি। একটি শাড়ি পরেছেন যেমন সুন্দর তেমনই সূক্ষ্ম। তাও পুরো পরেননি অর্ধেকটাই কোমরে জড়ানো। সূক্ষ্ম শাড়ির অনবগুণ্ঠনে গায়ের অনেক অংশই বড় চোখে পড়ছিল। মাদ্রীকে তরুণীর মতো দেখাচ্ছিল। পাণ্ডু দেখছিলেন, কেবলই দেখছিলেন—সমীক্ষমাণঃ স তু তাং বয়স্থাং তনুবাসসম্।

পাণ্ডুর হৃদয়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। তিনি জড়িয়ে ধরলেন মাদ্রীকে। মাদ্রী শুধু স্বামীর

মৃত্যু-ভয়ে তাঁকে খানিক বাধা দিলেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্রের পরিধানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে রক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মৈথুন-লিপ্সায় পাণ্ডুর তখন এমন অবস্থা যে, অত বড় একটা অভিশাপের কথাও তাঁর মনে ছিল না। যদিবা মাদ্রীর কথায় তাঁর মনে হয়েও থাকে তবু—ধুর শাপ—শাপজং ভয়মুৎসৃজ্য—এইরকম একটা ভঙ্গিতে তিনি মৃত্যুর জন্যই যেন কামনার অধীন হলেন—জীবিতান্তায় কৌরব্যো মন্মথস্য বংশগতঃ। সঙ্গম-মুহূর্তেই পাণ্ডু মারা গেলেন। মাদ্রীর উচ্চকিত আর্তনাদ শোনা গেল। পাঁচটি কিশোর-বালককে সঙ্গে নিয়ে কুন্তী ছুটে এলেন পাণ্ডুর কাছে।

মাদ্রী এবং পাণ্ডু এমন অবস্থায় ছিলেন যে সেখানে কিশোর পুত্রদের কাছাকাছি যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। কাজেই দূর থেকে কুন্তীকে দেখেই মাদ্রী চেঁচিয়ে বললেন—ছেলে-পিলেদের নিয়ে এখানে যেন এসো না দিদি। তুমি ওদের ওখানেই রেখে, একা এসো—একৈব ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্ঠন্ত্বত্রৈব দারকাঃ। কুন্তী এলেন এবং দেখলেন—জীবনে যাঁকে তিনি একান্তই আপনার করে পেতে চেয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন।

কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—রাজা যথেষ্ট বুঝেশুনেই চলছিলেন। আমি তাঁকে সব সময় এসব ব্যাপার থেকে আটকে রেখেছি—রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যং বনে সততম্ আত্মবান্। সেই লোক তোমাকে হঠাৎ আক্রমণ করার সুযোগ পেলেন কী করে? এই দুর্ঘটনার জন্য কুন্তী মাদ্রীকে দোষারোপ করতে ছাড়লেন না। বললেন—মাদ্রী! তোমারই উচিত ছিল রাজাকে সামলে রাখা। এই নির্জন জায়গায় এসে তুমি রাজাকে প্রলুব্ধ করেছ—সা কথং লোভিতবতী বিজনে ত্বং নরাধিপম। আমি সব সময় যে রাজাকে অভিশাপের কথা মনে করে বিষণ্ণ থাকতে দেখেছি—এখানে এই নির্জনে সে তোমাকে পেয়েই তো অতিরিক্ত সরস হয়ে উঠল—ত্বাম্ আসাদ্য রহোগতাং...প্রহর্ষঃ সমজায়ত?

মাদ্রীর ওপরে যতই রাগারাগি করুন, তাঁর স্বামীটিও যে সমান দোষে দোষী—এ-কথা কুন্তী মনে মনে অনুভব করছিলেন। নিজের সম্বন্ধে সচেতনতাও তাঁর কম ছিল না। শাস্ত্রের নিয়মে তিনি জানেন যে, প্রথমা স্ত্রী হলেন ধর্মপত্নী। আর মাদ্রী যতই প্রলুব্ধ করুক তাঁর স্বামীকে, তাঁর বিয়ের মধ্যেই কামনার মন্ত্রণা মেশানো আছে। দ্বিতীয় বিবাহটাই যে কামজ। এত কামনা যে স্বামীর মধ্যে দেখেছেন এবং যাঁর মৃত্যুও হল কামনার যন্ত্রণায়—তাঁকে আর যাই হোক শ্রদ্ধা করা যায় না, ভালওবাসা যায় না। মাদ্রীকে গালাগালি করার পরমুহূর্তেই কুন্তী তাই শুষ্ক কর্তব্যের জগতে প্রবেশ করেছেন। বলেছেন—মাদ্রী! আমি জ্যেষ্ঠা কুলবধূ এবং তাঁর ধর্মপত্নী, কাজেই রাজার সহমরণে যেতে আমাকে বাধা দিয়ো না মাদ্রী। তুমি ওঠো। এই ছেলেগুলিকে তুমি পালন করো।

জীবনের এই চরম এবং অন্তিম মুহূর্তে মাদ্রী কুন্তীর কাছে কতগুলি অকপট স্বীকারোক্তি করে বসলেন। সেকালের পারলৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মাদ্রী বলে চললেন—স্বামীর সঙ্গে আমিই সহমরণে যাব দিদি। এই সামান্য জীবনে সীমিত স্বামীসুখে এবং সীমিত শারীরিক কামোপভোগে আমার তৃপ্তি হয়নি—নহি তৃপ্তাস্মি কামানাম্। আর রাজার কথা ভাবো। আমার প্রতি শারীরিক লালসাতেই তাঁর মৃত্যু হল। এই অবস্থায় আমি মৃত্যুলোকে গিয়েও তাঁর সম্ভোগ-তৃষ্ণা মেটাব না কেন—তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং ন যমসাদনে?

কুন্তী আবার এসব কথা বেশিক্ষণ শুনতে পারেন না। রুচিতে বাধে। হয়তো বা মনে হল—এই রকম একটি স্বামীর জন্য সহমরণের মতো এত বড় আত্মবলি কি বড় বেশি ত্যাগ নয়। কিন্তু এখনও তাঁর শোনার বাকি ছিল। দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েও মাদ্রী যতখানি মা হতে পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি নায়িকা। ফলত স্বামীকে চিরকাল সম্ভোগের প্রশ্রয়ে তিনি শুধু কুক্ষিগতই করেননি, সন্তানের স্নেহের থেকেও সম্ভোগ-তৃষ্ণা ছিল তাঁর কাছে বড়। আর কুন্তী যে সেই কন্যা অবস্থাতেই সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে মায়ের স্নেহ-যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছেন, সেই স্নেহ ব্যাপ্ত হয়েছিল তাঁর পরিবারের সর্বত্র। এমনকী অভিশপ্ত স্বামীকেও যে তিনি সমস্ত মৈথুন-চেষ্টা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেন, সেও বুঝি একরকম পুত্রস্নেহে—মানুষটা বেঁচে থাকুক—আর কিসের

প্রয়োজন—রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যম্। কিন্তু স্বামী যে এত ভোগী, তা তিনি এত বোঝেননি।

মাদ্রীর সেই অসফল সম্ভোগ-বাঞ্ছা ছাড়াও মাদ্রী এবার যা বললেন, তাতে তো কুন্তীর কোনওভাবেই আর মৃত্যুর পথে নিজেকে ঠেলে দেওয়া চলে না। সেটাও যে এক ধরনের স্বার্থপরতা হবে। শুষ্ক কর্তব্যের জন্য, সম্ভোগ-রসিক স্বামীর অনুগমনের জন্য নিজের সন্তানদের বলি দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। মাদ্রী বলেছিলেন—শুধু অসফল কাম-তৃষ্ণাই নয়, আমি তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমার নিজের ছেলেদের এক করে দেখতে পারব না—ন চাপ্যহং বর্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে। এই কথা শোনার পর কুন্তী আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেননি, সহমরণের কথাও আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেননি। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে, সুগভীর ব্যক্তিত্বে তিনি সন্তান-পালনের দায়িত্বটাই বেশি বড় মনে করেছেন। স্বামী আর সতীনকে তাঁদের অভিলাষ-পূরণের অবসর দিয়েছেন আপন মূল্যে—ইহজন্মেও-পরজন্মেও।

৭

পাঁচটি অনাথ পিতৃহীন বালক পুত্রের হাত ধরে কুন্তী স্বামীর রাজ্যের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে আছেন ঋষিরা। তাঁরাই এখন একমাত্র আশ্রয় এবং প্রমাণ। এই পাঁচটি ছেলে যে পাণ্ডুরই স্বীকৃত সন্তান, তার জন্য ঋষিদের সাক্ষ্য ছাড়া কুন্তীর দ্বিতীয় গতি নেই। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ ঋষিরাই হস্তিনাপুরে বয়ে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু মৃত স্বামীর রাজ্যপাট অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে 'সাকসেশন সার্টিফিকেট'টা যে আর্যবাক্যেই প্রথম পেশ করতে হবে—এ-কথা কুন্তীর ভালই জানা ছিল।

পুরনো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আবার কতকাল পরে দেখা হবে—এই অধীরতায় কুন্তী খুব দ্রুত হেঁটেছিলেন। পাঁচ ছেলে, রাজার শব আর ঋষিদের সঙ্গে কুন্তী যখন হস্তিনার দ্বারে এসে পৌঁছলেন তখন সকাল হয়েছে সবে। এর মধ্যেই রটে গেল—কুন্তী এসেছেন, রাজা মারা গেছেন, পাঁচটা ছেলে আছে কুন্তীর সঙ্গে। পুরবাসী জনেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল হস্তিনার রাজসভার কাছে। মনস্বিনী সত্যবতী, রাজমাতা অম্বালিকা, গান্ধারী—সবাই কুন্তীকে নিয়ে রাজসভায় এলেন। ঋষিরা পাণ্ডুর পুত্র-পরিচয় করিয়ে দিলেন কুরুসভার মান্যগণ্য ব্যক্তিদের কাছে, মন্ত্রীদের কাছে এবং অবশ্যই প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

পাঁচটি পিতৃহীন পুত্রের হাত ধরে কুন্তী যখন কুরুসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা দামি কাপড় পরে, সর্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার পরে রাজপুত্রের চালে জ্ঞাতি ভাইদের দেখতে এসেছিল। কুন্তীর কাছে এই দৃশ্য কেমন লেগেছিল? বনবাসী তপস্বীরা কুন্তীর পাঁচটি ছেলের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—মহারাজ! পাণ্ডু আর মাদ্রীর দুটি শব-শরীর এই এখানে রইল। আর তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পাঁচটি অসাধারণ ছেলে দিয়ে গেলাম আপনারই হেফাজতে। আপনি মায়ের সঙ্গে এই ছেলেদের দেখভাল করুন অনুগ্রহ করে— ক্রিয়াভিঃ অনুগৃহ্যতাম্। তখন কুন্তীর কি মনে হয়নি—হায়! কে কাকে অনুগ্রহ করে। তাঁর স্বামীই রাজা, ধৃতরাষ্ট্র তাঁরই রাজত্বের কাজ চালাচ্ছিলেন মাত্র। কিন্তু আজকে শুধুমাত্র রাজধানীতে মৃত্যু না হওয়ার কারণে আসল রাজপুত্রদেরই প্রার্থীর ভূমিকায় প্রতিপালনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হচ্ছে!

ধৃতরাষ্ট্র খুব ঘটা করে পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু কুন্তী বা তাঁর ছেলেদের রাজকীয় মর্যাদা তিনি দেননি। রাজবাড়িতে তাঁদের আশ্রয় জুটেছিল বটে, কিন্তু থাকতে হচ্ছিল বড় দীনভাবে, বড় হীনভাবে। ভীমকে যেদিন বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন দুর্যোধন, সেদিন ওই অত বড় ছেলেকে হারানোর ঘটনার পরেও ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু বলতে পারেননি কুন্তী। সমস্ত কুরুবাড়ির মান্য-গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে কুন্তীর একমাত্র বিশ্বাসের ব্যক্তি ছিলেন তাঁর দেওর বিদুর। দুই-একজন অতিপক্ক বুদ্ধিজীবী কুন্তী আর বিদুরের সম্পর্ক নিয়ে কথঞ্চিৎ সরসও হয়ে পড়েন দেখেছি। তবে তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে মহাভারতীয় যুক্তি-তর্কের থেকে আত্ম-হৃদয়ের প্রতিফলনই বেশি। এই একই

ধরনের প্রতিফলন দেখেছি আরও কতগুলি বুদ্ধিজীবীর নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার মধ্যেও। তাঁরা আবার কুন্তীর ছেলেগুলিকে ধর্ম-বায়ু বা ইন্দ্রের ঔরসজাত না ভেবে দুর্বাসার ঔরসজাত ভাবেন। আমি বলি—ওরে! সেকালে নিয়োগ প্রথা সমাজ-সচল প্রথা ছিল। পাণ্ডুর ছেলে ছিল না বলে কবি যেখানে ধর্ম, ইন্দ্র বা বায়ুকে কুন্তীর সঙ্গে শোয়াতে লজ্জা পাননি, সেখানে দুর্বাসার সঙ্গে শোয়াতেও কবির লজ্জা হত না—যদি আদতে ঘটনাটা তাই হত।

থাক এসব কথা। ভীমকে বিষ খাওয়ানোর পর কুন্তী একান্তে বিদুরকে ডেকে এনেছেন নিজের ঘরে। সুস্পষ্ট এবং সত্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রাজ্যলোভী দুর্যোধন সম্পর্কে। কিন্তু কোনওভাবেই নিজের সন্দেহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন—চক্ষুর অন্ধতার থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতা বেশি। ভীম যখন নাগলোক থেকে ফিরে এসে দুর্যোধনের চক্রান্তের কথা সমস্ত একে একে জানিয়েছেন, তখনও আমরা কুন্তীকে কোনও কথা বলতে দেখিনি। মহামতি যুধিষ্ঠির এই নিদারুণ ঘটনার প্রচার চাননি। পাছে আরও কোনও ক্ষতি হয়। কুন্তীকে আমরা এই সময় থেকে যুধিষ্ঠিরের মত মেনে নিতে দেখছি, যদিও বুদ্ধিদাতা হিসেবে বিদুরের মতামতই এখানে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।

আসলে কুন্তী যা চেয়েছিলেন, মহাভারতের কবি তা স্বকণ্ঠে না বললেও বোঝা যায়, অন্য সমস্ত বিধবা মায়ের মতোই তিনি তাঁর সন্তানদের ক্ষত্রিয়োচিত সুশিক্ষা চেয়েছেন। চেয়েছেন তাদের মৃত পিতার রাজ্যের সামান্য উত্তরাধিকার ছেলেরা পাক। তার জন্য তিনি হঠাৎ করে কিছু করে বসেননি, এতদিন পরে ফিরে এসে হঠাৎ করে ছেলেদের জন্য রাজ্যের উত্তরাধিকার চাননি। তিনি সময় দিয়ে যাচ্ছেন, ছেলেদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়ার অপেক্ষাও করছেন।

ভীষ্মের ইচ্ছায় দ্রোণাচার্যের তত্ত্বাবধানে কৌরব-পাণ্ডবদের একসঙ্গেই অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হল। আর এই অস্ত্রশিক্ষার সূত্র ধরেই তাঁর কনিষ্ঠপুত্র অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হিসেবে বেরিয়ে এলেন। কুন্তী এই দিনটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। যেদিন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সামনে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপরীক্ষার আসর বসল, সেদিন অর্জুনের ধনুকের প্রথম টংকার-শব্দে ধৃতরাষ্ট্র চমকে উঠেছিলেন। বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভাই! কে এল এই রঙ্গস্থলে? সমুদ্রের গর্জনের মতো এই শব্দ কীসের? বিদুর বললেন—তৃতীয় পাণ্ডব এসেছে রঙ্গস্থলে, তাই এই শব্দ। ধৃতরাষ্ট্র সগৌরবে বললেন, যজ্ঞের সময় শমীবৃক্ষের কাঠ ঘষে ঘষে যেমন আগুন জ্বালাতে হয়, আমাদের কুন্তী হলেন সেই আগুন-জন্মানো শমীকাঠের মতো। কুন্তীর গর্ভজাত এই তিনটি পাণ্ডব-আগুনে আজ আমি নিজেকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত মনে করছি—ধন্যো'স্মি অনুগৃহীতো'স্মি রক্ষিতো'স্মি মহামতে।

কুন্তী এই দিনটিরই অপেক্ষা করেছেন। বিধবা মা যেমন করে অপেক্ষা করেন—ছেলে পড়াশুনো করে পাঁচজনের একজন হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে, কুন্তীও তেমনই এত দিন ধরে এই দিনটিরই অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু পোড়া-কপালির কপালের মধ্যে বিধাতা এত সুখের মধ্যেও কোথায় এক কোণে দুঃখ লিখে রেখেছিলেন। কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুন যখন নিজের অস্ত্রশিক্ষার গুণে সমস্ত রঙ্গস্থল প্রায় মোহিত করে ফেলেছেন, সেই সময়েই সু-উচ্চ রঙ্গমঞ্চ থেকে কুন্তী দেখতে পেলেন—বিশাল শব্দ করে আরও এক অসাধারণ ধনুর্ধর তাঁর তৃতীয় পুত্রটিকে যেন ব্যঙ্গ করতে করতে ঢুকে পড়ল রঙ্গস্থলে।

কুন্তীর বুক কেঁপে উঠল—সেই চেহারা, সেই মুখ। সেই ভঙ্গি। বুকে সেই বর্ম আঁটা। কানে সেই সোনার দুল—মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—কুণ্ডল-দ্যোতিতাননঃ। কুন্তী দেখলেন—কত শক্তিমান, আর কত লম্বা হয়ে গেছে তাঁর ছেলে। হেঁটে আসছে যেন মনে হচ্ছে সোনার তালগাছ হেঁটে আসছে, যেন কঠিন এক পাহাড় পা বাড়িয়েছে রঙ্গস্থলের দিকে—প্রাংশুকনকতালাভঃ...পাদচারীব পর্বতঃ। কুন্তীর মনের গভীরে কী প্রতিক্রিয়া হল, মহাভারতের কবি তো লেখেননি। তবে নিরপেক্ষ একটি মন্তব্য করেই যখন কবি রঙ্গস্থলের খুঁটিনাটিতে মন দিয়েছেন, তখন ওই একটি মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় কুন্তীর মনে কী চলছিল। কবি বললেন—সূর্যপুত্র কর্ণ অর্জুনের ভাই হয়েও তাঁকে ভাই বলে বুঝলেন না—ভ্রাতা ভ্রাতরমজ্ঞাতং

সাবিত্রঃ পাকশাসনিম্‌ ।

যাঁকে অমর জীবনের আশীর্বাদ দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সে যে এইভাবে কোনওদিন ফিরে আসবে, তা কুন্তীর কল্পনাতেও ছিল না। যাঁকে জননীর প্রথম বাৎসল্যে কোলে তুলে নিতে পারেননি, সেই তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান আজ ফিরে এল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, প্রায় যুদ্ধোদ্যত অবস্থায়। প্রকৃতির প্রতিশোধ কি এমনতর হয় ! এখন এই মুহূর্তে পাঁচটি প্রায় যুবক ছেলের সামনে এই বিধবা রমণীর পক্ষে তাঁর কন্যা অবস্থার জননীত্ব স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। বলতে পারেন, স্বীকার করলে কীই বা এমন হত ? কী হত তা কুন্তীই জানেন। তবে নিজের স্বামীর প্রচণ্ড উপরোধেও যিনি লজ্জা আর রুচির মাথা খেয়ে যে কলঙ্কের কথা স্বীকার করতে পারেননি, আজ বিধবা অবস্থায় বড় বড় ছেলেদের সামনে সে-কথা কি স্বীকার করা সম্ভব ছিল ? তা ছাড়া রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কুন্তীর মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল, কর্ণের পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠায় সেই উত্তরাধিকারে নতুন কোনও ঝামেলা তৈরি হত কি না সেটাই বা কতটা নিশ্চিত ছিল। কুন্তীকে যে কুরুকুলের কলঙ্কিনী বধূ হিসেবে নতুন বিপত্তির মুখ দেখতে হত না, তারই বা কী স্থিরতা ছিল ?

অতএব নিজের মান, মর্যাদা এবং রুচির নিরিখে যাঁর বাৎসল্য-বন্ধন জন্মলগ্নেই তিনি ত্যাগ করেছেন, আজ আর তাঁকে আগ বাড়িয়ে সোহাগ দেখাতে চাননি কুন্তী। বরঞ্চ যে মুহূর্তে তিনি দেখেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র তাঁর কনিষ্ঠটিকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে, সেই মুহূর্তে মূর্ছাই ছিল তাঁর একমাত্র গতি। তিনি তাই অজ্ঞান হয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু অজ্ঞান হয়েও কি বাঁচবার উপায় আছে। মহামতি বিদুর তাঁর অবস্থা দেখে দাসীদের দিয়ে কুন্তীর চোখে-মুখে চন্দন-জলের ছিটে দেওয়ালেন। জ্ঞান ফিরে দেখলেন বড়-ছোট—দুই ছেলেই মারামারি করার জন্য ঠোঁট কামড়াচ্ছে। কুন্তী কষ্টে লজ্জায় কী করবেন ভেবে পেলেন না—পুত্রৌ দৃষ্ট্বা সুসংভ্রান্তা নান্বপদ্যত কিঞ্চন।

বাঁচালেন কৃপাচার্য। কৃপাচার্য কর্ণকে তাঁর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে সবার সামনে চরম অপমানের মধ্যে ফেলে দিলেন বটে, কিন্তু কুন্তীর কাছে এও বুঝি ছিল বাঁচোয়া। বংশ-পরিচয়ের কথায় কর্ণের পদ্ম-মুখে বর্ষার ছোঁয়া লাগল, তাঁর কান্না পেল—বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মামাগলিতং যথা—তবু কর্ণের এই অপমানেও শুধুমাত্র দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হল দেখে কুন্তী স্বস্তি পেলেন। এর পরেও কর্ণকে নিয়ে মুখর ভীমসেন আর দুর্যোধনের মধ্যে বিশাল বাগ্‌যুদ্ধ, অপমান পালটা অপমান চলল বটে, তবু এরই মধ্যে প্রতিপক্ষ দুর্যোধন যখন কর্ণের মাথায় অঙ্গরাজ্যের রাজার মুকুট পরিয়ে দিলেন, সেই সময়ে দুর্যোধনের ওপর কুন্তীর চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় কেউ হননি।

বাৎসল্যের শান্তি কুন্তীর ওইটুকুই। চাপা আনন্দে তাঁর বুক ভরে গেল—পুত্রম্‌ অঙ্গেশ্বরং জ্ঞাত্বা ছন্না প্রীতি-রজায়ত। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক কুন্তী বুঝলেন—তাঁর বড় ছেলেই প্রথম রাজ্য পেল এবং সবার কাছে সে হীন হয়ে যায়নি। এও এক আনুষ্ঠানিক তৃপ্তি, যার ব্যাখা দেওয়া সহজ নয়। কুন্তী যেটা বুঝলেন না, সেটা হল—এই যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্র—দুজনেই জন্মের মতো শত্রু হয়ে গেল। এখন যদিও যুদ্ধ কিছু হল না, তবু দুই সমান মাপের বীর দুজনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে রইলেন—এ-কথাটা কুন্তী বোধ হয় মায়ের মন নিয়ে তেমন করে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বুঝতে না পারলেও জননীর প্রথম সন্তান হিসাবে কর্ণ যে বেঁচে আছেন, তিনি যে সুষ্ঠু প্রতিপালন লাভ করে এত বড় ধনুর্ধর পুরুষটি হয়ে উঠেছেন—এই তৃপ্তি তাঁকে জননীর দায় থেকে খানিকটা মুক্ত করল অবশ্যই।

যাই হোক, দ্রোণাচার্যের সামনে এই অস্ত্র-প্রদর্শনীর পর এক বছর কেটে গেছে। কুন্তীর দুটি পুত্র, ভীম এবং অর্জুনের অসামান্য শক্তি এবং অস্ত্রনৈপুণ্যের নিরিখেই—অন্তত আমার তাই মনে হয়—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যুবরাজ করতে বাধ্য হলেন। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠের এই যৌবরাজ্য লাভের পর ভীম আর অর্জুনের প্রতাপ আরও বেড়ে গেল। তাঁরা এমনভাবে সব রাজ্য জয় করে ধনরত্ন আনতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের খ্যাতি এত বেড়ে গেল যে, ধৃতরাষ্ট্রের মন খুব তাড়াতাড়িই বিষিয়ে গেল—দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু। তার মধ্যে ইন্ধন যোগালেন রাজ্যলোভী দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বোঝালেন—যেভাবে হোক, পাণ্ডবদের একেবারে মায়ের

সঙ্গে নির্বাসন দিতে হবে—সহ মাত্রা প্রবাসয়।

ধৃতরাষ্ট্রের মনেও ওই একই ইচ্ছে ছিল, তিনি শুধু বলতে পারছিলেন না, এই যা। পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে তাদের মাকেও যে বাবণাবতের প্রবাসে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন দুর্যোধন, তার কারণ একটাই—কুন্তীর বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডবরা গিয়ে যদি শুধু কুন্তী রাজবাড়িতে থাকতেন, তা হলে বারণাবতের লাক্ষাগৃহে আগুন লাগানোর 'প্ল্যান' ভেস্তে যেতে পারে—এই দুশ্চিন্তাতেই দুর্যোধন কুন্তীকেও পাণ্ডবদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তিনি বোঝেননি যে, কুন্তীর বা পাণ্ডবদের ভাল চাওয়ার মতো লোক কুরুবাড়িতে আরও ছিল। মহামতি বিদুরের বুদ্ধিতে কুন্তী এবং পাণ্ডবভাইরা সবাই বারণাবতের আগুন-ঘর থেকে বেঁচে গেলেন।

কুন্তীকে এই সময় ছেলেদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরতে হয়েছে বটে, তবে তিনি খারাপ কিছু ছিলেন না। ছেলেরা এখন লায়েক হয়ে উঠেছে। বিশেষত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁর স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব এবং নীতিবোধ এতই প্রখর যে, তাঁর ওপরে নির্ভর না করে কুন্তীর উপায় ছিল না। যে কোনও বিপন্ন মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের কথা তিনি মেনে চলতেন এবং যুধিষ্ঠিরের কথার মর্যাদা তাঁর কাছে ছিল প্রায় স্বামীর কাছাকাছি। মেজ ছেলে ভীমের ওপরে তাঁর স্নেহটা একটু অন্যধরনের। তিনি জানেন—এ এক অবোধ, পাগল, একগুঁয়ে ছেলে। ভীমের গায়ের জোর সাংঘাতিক। কাজেই বনের পথে ভীমের কাঁধে চেপে যেতেও তাঁর লজ্জা করে না। সব ছেলের সমান পরিশ্রমের পর, অথবা ভীমের যদি অন্য ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিশ্রমও হয়ে যায় তবু যেন তাঁকেই ইঙ্গিত করে কুন্তী একটা কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন—পাঁচ ছেলের মা হয়ে, আজ এই বনের মধ্যে তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে আমার। মায়েব এসব কথার প্রথম প্রতিক্রিয়া ভীমের মনেই হবে। তিনি জল আনতে যাবেন এবং কুন্তীও তা জানেন।

এই গর্ব তাঁর অর্জুনের বিষয়েও ছিল। তবে অর্জুনের থেকেই কিন্তু কুন্তীর মাতৃস্নেহে প্রশ্রয়ের শিথিলতা এসেছে। হাজার হোক, ছোট ছেলে। মায়ের কনিষ্ঠ পুত্রটি অসাধারণ লেখা-পড়া শিখে অসম্ভব কৃতী পুরুষ হয়ে উঠলে মায়ের মনে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত নিরুচ্চার প্রশ্রয় তৈরি হয়, অর্জুনের ব্যাপারে কুন্তীরও সেই প্রশ্রয় ছিল। যদিও এই প্রশ্রয়ের মধ্যে মায়ের দাবিও ছিল অনেক। সে দাবি মুখে সচরাচব প্রকাশ পেত না, কিন্তু সে দাবির চাপ কিছু ছিলই। অর্জুনও তা বুঝতেন। সে-কথা পরে আসবে।

প্রশ্রয় বলতে যেখানে একেবারে বাধা-বন্ধহীন অকৃত্রিম প্রশ্রয় বোঝায়, যার মধ্যে ফিরে পাওয়ার কোনও তাগিদ নেই, যা শুধুই নিম্নগামী স্নেহের মতো, দাদু-দিদিমা বা ঠাকুমার-ঠাকুরদার অন্তর-বিলাস—কুন্তীর সেই প্রশ্রয় ছিল নকুল এবং সহদেবের ওপর, বিশেষত সহদেবের ওপর। মাদ্রী যে কুন্তীকে বলেছিলেন—তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমার ছেলেদের আমি এক করে দেখতে পারব না—এই কথাটাই কুন্তীকে আরও বিপরীতভাবে স্নেহপ্রবণ করে তুলেছিল নকুল এবং সহদেবের প্রতি। পিতৃ-মাতৃহীন এই বালক দুটিকে কুন্তী নিজের ছেলেদের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। আবার এদের মধ্যেও কনিষ্ঠ সহদেবের প্রতি তাঁর স্নেহ এমন লাগামছাড়া গোছের ছিল যে, তাঁকে বোধ হয় তিনি বুড়ো বয়েস পর্যন্ত খাইয়ে দিতেন অথবা ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। পাণ্ডবরা যখন বনে গিয়েছিলেন, তার আগে কুন্তী সহদেবের সম্বন্ধে দুনিয়ার মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে দ্রৌপদীকে বলেছিলেন—বনের মধ্যে তুমি বাপু আমার সহদেবকে একটু দেখে রেখো—সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সহাবেক্ষ্যো বনে বসন্। দেখো ওর যেন কোনও কষ্ট না হয়। কুন্তীর মানসিকতায় দ্রৌপদীকেও তাঁর এই কনিষ্ঠ স্বামীটির প্রতি বাৎসল্য বিতরণ করতে হয়েছে।

যাই হোক, প্রশ্রয় আর লালনের মাধ্যমে যে ছেলেদের কুন্তী বড় করে তুলেছিলেন, দেওর বিদুরের বুদ্ধিতে সেই পাঁচ ছেলেই তাঁর বেঁচে গেল। এখন তাঁদের সঙ্গেই তিনি বনের পথে চলতে চলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। মেজ ছেলে ভীম মায়ের কষ্ট দেখে জল আনতে গেল। আর এরই মধ্যে পথের পরিশ্রমে ঘুম এসে গেল সবার। যে বনের মধ্যে এই ঘুমের আমেজ ঘনিয়ে এল সবার চোখে সেই বন ছিল হিড়িম্ব রাক্ষসের অধিকারে। সে তার বোন হিড়িম্বাকে পাঠিয়ে দিল ঘুমন্ত

মানুষগুলিকে মেরে আনতে।

ততক্ষণে ভীমের জল আনা হয়ে গেছে। তিনি মা-ভাইদের পাহারা দিচ্ছিলেন। হিড়িম্বা ভীমকে দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে গেল। সে ভীমের কাছে হিড়িম্ব রাক্ষসের নরমাংসভোজনের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে সবাইকে বাঁচাতে চাইল। ভীমের এই করুণা পছন্দ হয়নি। অদূরেই হিড়িম্ব রাক্ষসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লাগল এবং এদিকে কুন্তী পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে জেগে উঠলেন। হিড়িম্বা মনুষ্যরমণীর ছাঁদে যেমনটি সেজে এসেছিল, তাতে কুন্তীর ভারী পছন্দ হয়ে গেল তাঁকে। সরলা হিড়িম্বা কুন্তীর কাছে তার পছন্দের কথাও গোপন করল না। সে পরিষ্কার জানাল ভীমকে সে বিয়ে করতে চায়।

ওদিকে ভীমের হাতে হিড়িম্ব মারা গেল এবং কুন্তী ছেলেদের প্রস্তাব-মতো পা বাড়ালেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য। কারও অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই অনাকাঙ্ক্ষিতের মতো হিড়িম্বা কুন্তী এবং তাঁর ছেলেদের পিছন পিছন চলতে লাগল। হিড়িম্বের ওপর তখনও ভীমের রাগ যায়নি। সেই রাগেই বোধ হয় তিনি হিড়িম্বাকেও মেরে ফেলতে চাইলেন। অবধারিতভাবে বাধা আসল যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে কুন্তীর কাছে হিড়িম্বার আত্মনিবেদন বুঝি ভোলার নয়।

হিড়িম্বা কুন্তীকে তার স্বভাব-সুলভ সরলতায় জানাল—মা! ভালবাসার কত কষ্ট, সে তুমি অন্তত বোঝো। তোমার ছেলের জন্য আমি এখন সেই কষ্ট পাচ্ছি। তুমি আর তোমার এই ছেলে দুজনেই যদি আমাকে এখন প্রত্যাখ্যান করো—বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া চাপি যশস্বিনি—তাহলে আমি আর প্রাণে বাঁচব না।

হিড়িম্বা এবার আসল লোকটিকে ধরেছে। সে জানে, এই মায়ের কথা ফেলার সাধ্য কারও মধ্যে নেই। হিড়িম্বা সমস্ত লোকলজ্জা ত্যাগ করে কুন্তীর কাছে অনুনয় করে বলল—তুমি আমাকে দয়া করো মা। তোমার ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে দাও আমাকে। আমি এই ক'দিনের জন্য তাঁকে নিয়ে যাব, আর যখনই তুমি বলবে আবার ফিরিয়েও দিয়ে যাব তোমার ছেলেকে, তুমি বিশ্বাস করো।

যুধিষ্ঠির বুঝলেন—মা একেবারে গলে গেছেন। মায়ের মতেই যুধিষ্ঠির ভীমকে ছেড়ে দিয়েছেন হিড়িম্বার সঙ্গে এবং তাঁদের পুত্র-জন্ম পর্যন্ত সময় দিয়েছেন বাইরে থাকার। যথা সময়ে ভীম এবং হিড়িম্বার ছেলে জন্মাল এবং দুজনেই এলেন কুন্তীর কাছে। কুন্তী এই সময়ে রাক্ষসীর গর্ভজাত এই পুত্রটিকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাতে শাশুড়ি হিসেবে তাঁর ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে অনেক আধুনিকা শাশুড়ির চেয়ে বেশি।

আজকের দিনে, তথাকথিত এই চরম আধুনিকতার দিনেও নিজের ছেলের সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনও মেয়ের বিয়ে হলে শাশুড়িরা আধুনিকতার খাতিরে যথেষ্ট সপ্রতিভ ভাব দেখালেও কখনও বা মনে মনে কষ্ট পান, আবার কখনও বা পুত্রবধূ বা তাঁর বাপের বাড়ির লোকের সামনে সোচ্চারে অথবা নিরুচ্চারে নিজের সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে উচ্ছ্রিত বোধ করেন। কিন্তু সেই মহাভারতের যুগেও কুন্তীর মতো এক মনস্বিনী রাজমাতা নিজের ছেলেকে শুধু রাক্ষসীর সঙ্গে একান্ত বিহারে পাঠিয়েও তৃপ্ত হননি, রাক্ষসীর বিকট চেহারার ছেলের বিলোম মস্তকে হাত বুলিয়ে তিনি অসীম মমতায় বলে উঠেছেন—বাছা! প্রসিদ্ধ কুরুবংশে তোমার জন্ম, আমার কাছে তুমি ভীমের সমানই শুধু নও, এই পঞ্চপাণ্ডবের তুমি প্রথম পুত্র, সব সময় আমরা যেন তোমার সাহায্য পাই—জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো'সি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক।

এমন অসীম মর্যাদায় একটি রাক্ষসীর পুত্রকে যে মনস্বিনী কুরুবংশের মাহাত্ম্যে আত্মসাৎ করেন, শাশুড়ি হিসেবে সেই মনস্বিনীর ধীরতা এবং বুদ্ধিকে আমাদের লোক-দেখানো আধুনিকতার গৌরবে চিহ্নিত না করাই ভাল। শাশুড়ি হিসেবে কুন্তীর বিচক্ষণতা এবং মমত্ব এর পরেও আমরা দেখতে পাব। কিন্তু এই মমত্ব কোনওভাবেই বাংলাদেশের জল-ভাত আর নদী-নীরের মতো নম্র কোনও মমত্ব নয়। এই মমত্বের মধ্যে জননীর সরসতা যতটুকু, ক্ষত্রিয় জননীর বীরতাও ততটুকুই। বরঞ্চ বীরতাই বেশি। ক্ষত্রিয় জননীর স্নেহের সঙ্গে বীরতা এমনভাবেই মিশে যায় যে এর জন্য আলাদা করে তাঁর ভাবার সময় থাকে না। এই বীরতা আগে তিনি নিজের ছেলের ব্যাপারে প্রমাণ করেছেন, তারপর তা প্রমাণ করেছেন শাশুড়ি হিসেবেও। সে-কথা পরে হবে। আসলে ভীমের অমানুষিক

শক্তি এবং লোকোত্তর ক্ষমতার ওপরে কুন্তীর এত বিশ্বাস ছিল যে, এর জন্য তিনি অনেক ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না। জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে উঠে পাণ্ডবরা বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে একচক্রা নগরীতে এলেন। সেখানে বামুনের ছদ্মবেশে এক বামুন বাড়িতেই আশ্রয় নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। এখানেই দুরন্ত বক-রাক্ষস থাকত। রাক্ষস মানে, সে যে মানুষ ছাড়া অন্য কোনও বৃহত্তর প্রাণী তা আমার মনে হয় না। তবে আর্য-সমাজের বাইরে এরা এমন কোনও প্রজাতি যাদের নরমাংসে অরুচি ছিল না। একচক্রা নগরের রাজা বক-রাক্ষসের সুরক্ষা ভোগ করতেন। বদলে বক রাক্ষসের নিয়ম ছিল—নগরের এক একটি বাড়ি থেকে তার খাবার জোগান দিতে হবে এবং যে ব্যক্তি ওই খাবার-দাবার নিয়ে বকরাক্ষসের অপেক্ষায় বসে থাকতেন, তিনিও বক-রাক্ষসের খাদ্য-তালিকায় একটি খাদ্য বলেই গণ্য হবেন। কুন্তীরা একচক্রাতে যে ব্রাহ্মণ বাড়িতে ছিলেন, কোনও এক সময় সেই বাড়ির পালা এল বক-রাক্ষসের খাবার জোগাড় করার। বামুন বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। বাড়ির বদান্য গৃহকর্তা যদি বলেন—আমি খাবার নিয়ে যাব, ব্রাহ্মণী তাতে বাধা দিয়ে বলেন—না আমি। ছেলে বলে—আমি যাব তো মেয়ে বলে—আমি।

বামুনবাড়িতে যখন এই আত্মদানের অহংপূর্বিকা এবং অবশ্যই কান্নাকাটি যুগপৎ চলছে, তখন কুন্তী ভীমকে জানিয়ে সেই বামুনবাড়িতে ঢুকলেন। কুন্তীর মাতৃহৃদয় তথা স্নেহ-মমতা এই ঘটনায় কতটা উদ্বেলিত হয়েছিল—সেটা বোঝানোর জন্য মহাভারতের কবি বেশি কথা খরচ করেননি। কিন্তু এমন একখানি জান্তব উপমা দিয়েছেন ব্যাস, যাতে কুন্তীর স্নিগ্ধ হৃদয়খানি পাঠকের কাছে একেবারে সামগ্রিকভাবে ধরা পড়েছে। কবি লিখেছেন—ঘরের মধ্যে বাছুর বাঁধা থাকলে তার ডাক শুনে গরু যেমন ধেয়ে গোয়ালের মধ্যে ঢোকে, সেই রকম করে কুন্তী ঢুকলেন সেই বামুনবাড়িতে—বিবেশ ত্বরিতা কুন্তী বদ্ধবৎসেব সৌরভী।

কুন্তী সব শুনলেন। বামুনের সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। শুনে বললেন—আমার পাঁচ ছেলে। তাদের একজন যাবে বক-রাক্ষসের উপহার নিয়ে। কুন্তী অবশ্যই ভীমের কথা মনে করেই তাঁর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বামুন তো অনেক না-না করলেন, কিন্তু কুন্তী বললেন—আমার ছেলেকে আপনি চেনেন না। সে বড় সাংঘাতিক। অনেক রাক্ষস-ফাক্ষস জীবনে সে মেরেছে। সে রাক্ষসকে মেরে নিজেকেও বাঁচিয়ে ফিরবে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির পর্যন্ত কুন্তীর এই পুত্র-বিতরণের উদারতায় খুশি হননি। ভয়ও দেখিয়েছেন অনেক। কিন্তু বীরমাতা তাঁর ছেলেকে চিনতেন। বিশেষত হিড়িম্ব-বধের পর ভীমের উপর তাঁর প্রত্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রত্যয়ের সঙ্গে ছিল ক্ষত্রিয়-জননীর উপকারবৃত্তি। সিংহ-জননী যেমন শিশুসিংহকে শিকার ধরার জন্য বেছে বেছে নরম শিকার ধরতে পাঠায় না, শিকারের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে তাকে যেমন ছেড়ে দেয়, কুন্তীও তেমনই ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারবৃত্তির সঙ্গে তাঁর ক্ষত্রিয়-জননীর গর্বটুকু মিশিয়ে দিয়েছেন ভীমকে রাক্ষসের সামনে ফেলে দিয়ে।

একচক্রায় সেই বামুনবাড়িতেই ছিলেন কুন্তী আর পাণ্ডবরা। এরই মধ্যে এক পর্যটক ব্রাহ্মণ এসে পাঞ্চাল-রাজ্যে দ্রুপদের ঘরে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত গল্প করে বলে গেলেন। কুন্তীর মনে বোধ হয় দীপ্তিময়ী দ্রৌপদী সম্বন্ধে পুত্রবধূর কল্পনা ছিল। কিন্তু মনে মনে থাকলেও সে-কথা একটুও প্রকাশ করলেন না। বরঞ্চ বেশ কাব্যি করে ছেলেদের বললেন—এখানে এই ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক কাল থাকলাম আমরা—চিররাত্রোষিতা স্মেহ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। এখানকার বন-বাগান—যা দেখবার আছে অনেকবার সেগুলি দেখেছি। বহুকাল এক জায়গায় থাকার ফলে ভিক্ষাও তেমন মিলছে না। তার চেয়ে চল বরং আমরা পাঞ্চালে যাই—তে বয়ং সাধু পাঞ্চালান্ গচ্ছামো যদি মন্যসে।

বলা বাহুল্য, পাণ্ডবরা জতুগৃহের ঘটনার পর দুর্যোধনের চোখে ধুলো দেবার জন্য ব্রহ্মচারী মানুষের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মায়ের কথায় পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরা সবাই পাঞ্চালে যাবার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এই উপক্রমের মধ্যেই একচক্রার সেই বামুন বাড়িতে উপস্থিত হলেন ব্যাসদেব। যত বড় নিরপেক্ষ মুনিই তিনি হন না কেন, কুরুবংশের প্রতি এই ঋষির অন্য এক মমতা

ছিল। বিশেষত পাণ্ডু ছিলেন তাঁরই ঔরসজাত সন্তান। তিনি মারা গেছেন, তবুও তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেরা আপন জ্যাঠতুতো ভাইদের চক্রান্তে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই অন্যায় তাঁর সহ্য হয়নি। একচক্রার যে বামুন বাড়িতে কুন্তী আর পাণ্ডবরা ছিলেন, সে বাড়িতে তাঁদের বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং বেদব্যাস—এবমুক্তা নিবেশ্যৈতান্ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। কুন্তীকে আশীর্বাদ করে বলে গিয়েছিলেন—তোমার ছেলেরা ধার্মিক। রাজা হবে তারাই। পুত্রবধূ কুন্তীকে অনেক আশ্বস্ত করে সেদিন তিনি চলে গিয়েছিলেন—কুন্তীমাশ্বাস্য প্রভুঃ—আজ যখন কুন্তী নিজেই আবার পাঞ্চালে যাবার প্রস্তাব করেছেন, তখন সেই বেদব্যাস আবার এসে কুন্তীকে তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন এবং পাঞ্চালী দ্রৌপদীর কথাটাও বলেছেন এমন করে যাতে পাঁচ ভাইয়ের এক বউ হবেন দ্রৌপদী।

স্বয়ং পাণ্ডবভাইরাও ব্যাসের মর্ম-কথাটা তেমন করে বোঝেননি যেমন করে বুঝেছিলেন কুন্তী। পাঞ্চালে এসে কুন্তী আর পাণ্ডবভাইরা কুমোরপাড়ার একটি বাড়িতে বাসা বাঁধলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যাবার দিনও তাঁরা ভিক্ষা করতেই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পথে ব্রাহ্মণদের মুখে স্বয়ম্বরের আয়োজন এবং ঘটা শুনে তাঁরাও গিয়ে উপস্থিত হলেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। এর পরের ঘটনা সবার জানা। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করলেন—অপিচ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী অন্যান্য রাজাদের সঙ্গেও তাঁকে এবং ভীমকে অনেক লড়তে হল। অবশ্য তাঁরা জিতেই ফিরলেন।

মহাভারতের জবান অনুযায়ী ভীম আর অর্জুনের সঙ্গে প্রতিপক্ষ রাজাদের লড়াই লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির, নকুল এবং সহদেব—এই তিনজন স্বয়ম্বর সভার বাইরে চলে এসেছেন, কিন্তু কোনওভাবেই বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে আসেননি। ভীম আর অর্জুন নববিবাহিতা বধূটিকে মায়ের কাছে নিয়ে এসে বলেছিলেন—মা, ভিক্ষা এনেছি। কুন্তী উত্তরে বলেছিলেন—যা এনেছ, তা সবাই মিলে ভোগ করো। এই কথার পর দ্রৌপদীকে দেখে কুন্তীর ভুল ভাঙে এবং তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে মীমাংসা চান, যাতে করে তাঁর কথাও থাকে, আবার পাঞ্চালী দ্রৌপদীও যাতে ধর্ম-সংকটে না পড়েন।

একটা মীমাংসার জন্য এই যে কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কাছে ছুটে গেলেন, এইখানে মহাভারতের পাঠক-পণ্ডিতেরা কিছু কিছু অনুমান করেন। তাঁরা বলেন—কুন্তীর কথাটা কোনও হঠোক্তি নয়। কুন্তী বলেছিলেন—যা এনেছ, তা সবাই মিলে ভোগ করো। অনেকের ধারণা—স্বয়ম্বর সভার ফল-নিষ্পত্তি, যা দ্রৌপদীকে লাভ করার ফলে অর্জুনের সপক্ষেই ঘটেছিল—সে ঘটনাটা কুন্তীর জানা ছিল। এবং জানা ছিল বলেই ভাইদের মধ্যে যাতে এই নিয়ে কোনও বিভেদ না হয়, তাই তিনি ইচ্ছে করেই অমন কথাটা বলেছিলেন—যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই কথাটা প্রথম এইভাবে বলার চেষ্টা করেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে কুন্তী মীমাংসার জন্য গেলেন, আর সিদ্ধান্তবাগীশ লিখলেন---বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে শুনেই যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব (যাঁরা যুদ্ধের আরম্ভেই বাইরে এসেছিলেন) চলে আসেন কুম্ভকারগৃহে মায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁরাই বলে দেন—দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন অর্জুন। তারপর যখন ভীম-অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন, তখন কুন্তী জেনে বুঝে অমন একটা হঠোক্তি করলেন—যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো।

ঠিক এইখানে সিদ্ধান্তবাগীশের এই মত অথবা যে পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করেন তাঁদের সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য হবার ভয় করি। কারণ মহাভারতে দেখছি—স্বয়ম্বর সভার জের টেনে যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য দিন ছেলেরা যে সারাদিনের ভিক্ষা সেরে কুন্তীর কাছে ফিরে আসত—তারও একটা মোটামুটি সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু কোনওদিনই এমন দেরি হত না যাতে কুন্তী দুশ্চিন্তায় পড়তেন। কিন্তু এখানে দেখছি—তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন—ছেলেরা ফিরছে না, ভিক্ষা নিয়ে আসার সময়টাও পেরিয়ে গেছে—অনাগচ্ছৎসু পুত্রেষু ভৈক্ষ্যকালে' ভিগচ্ছতি। কুন্তী এতটা ভাবছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা হয়তো তাদের চিনে মেরে ফেলেছে। অথবা মায়াবী রাক্ষসেরা ধরে নিয়ে গেছে ছেলেদের।

দেখা যাচ্ছে, ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি এবং ছেলেরা বাড়ি না ফিরলে মায়েদের যে দুশ্চিন্তা হয়, তাই

কুন্তীর হচ্ছে। তার মানে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব স্বয়ম্বর সভা থেকে বেরলেও বাড়ি ফেরেননি। সিদ্ধান্তবাগীশ পরে যা লিখেছেন (যা আমরা আগে বলেছি) তার একান্ত স্ববিরোধে এইখানে কুন্তীর দুশ্চিন্তার টীকা রচনা করে বলেছেন—যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব বাড়ি ফেরেননি। তাঁরা স্বয়ম্বরের যুদ্ধ রঙ্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুম্ভকারগৃহে আসবার পথে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। যদি এই যুদ্ধ বিগ্রহ দূরে তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত ছড়ায়, যদি মায়ের কোনও বিপদ হয়, তাই রাস্তাতেই তাঁরা গার্ড দিচ্ছিলেন—যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবাঃ মাতৃরক্ষার্থং রঙ্গান্নিক্রম্য তৎকুম্ভকারভবনাক্রমণপথে প্রতীক্ষন্তে স্ম ইতি প্রতীয়তে। দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্তবাগীশ আগে এক রকম বলেছেন, পরে আরেক রকম বলেছেন।

বস্তুত আমরাও এই অনুমানটাই মানি। হয়তো বাড়তি এইটুকু বলি যে, মায়ের বিপদ হবে—এই ভয়ে নয়, তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন ভীম আর অর্জুনের আশঙ্কাতেই। যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব—যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে যত ল্যাঙপ্যাঙাই হন না কেন, তাঁরা পালিয়ে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যদি বাইরে থেকেও কোনও আক্রমণ হানতে হয়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধনীতিতে পাঁচজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ যুদ্ধ করে না। ভীম অর্জুন যুদ্ধ করছেন, সেখানে দরকার হলে বাইরে থেকে আক্রমণ শানানোর সুবিধে বেশি। হয়তো সেই কারণেই তাঁরা রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। এবং ভীম-অর্জুন যুদ্ধ জিতে দ্রৌপদীকে নিয়ে রাস্তায় নামামাত্রই তাঁরাও এসেছেন একই সঙ্গে। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব—কেউই ভীম-অর্জুন ফেরার আগে বাড়ি ফিরেছিলেন—কুন্তীর দুঃশ্চিন্তার নিরিখে সে-কথা বিশ্বাস হয় না। সিদ্ধান্তবাগীশ একবার রাস্তায় অপেক্ষা করার কথা বলে পরে নিজেকে বাঁচানোর জন্য লিখেছেন—যুদ্ধের শেষ খবর শুনেই তাঁরা বাড়ি ফিরেছেন। আমি বলি—যুদ্ধ শেষ হলে তার প্রতিক্রিয়া হবে ভাইদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। প্রায় এক বয়সের ভাইয়েরা আগে নিজেরা একসঙ্গে মিলবে, তারপর হই হই করে মায়ের কাছে যাবে। এই রকম হয়।

অবিশ্বাসী পণ্ডিতেরা বলেন—অন্য ভাইরা যদি আগে না ফিরেই থাকেন, তবে ভীম আর অর্জুনকেই শুধু মায়ের কাছে গিয়ে ভিক্ষা এনেছি বলে দাঁড়াতে দেখলাম কেন ? আমি বলব লজ্জা, এর কারণ, লজ্জা। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছুই করেননি, অথচ নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে বেশ দালালি করে একটা কথা বলবেন—এটা তাঁদের ক্ষত্রিয়বুদ্ধিতে লজ্জা দিয়েছে। তা ছাড়া নতুন বউটিই বা কী ভাববে ? তিনি স্বয়ম্বরের রঙ্গস্থলে অর্জুনকেও দেখেছেন, ভীমকেও দেখেছেন। অতএব তাঁরা যে কথাটা বলতে পারেন, যুধিষ্ঠির, নকুল বা সহদেবের সে-কথা বলা মানায় না। তাই তাঁরা কিছু বলেননি এবং মায়ের সঙ্গে বউ-পরিচয়ের চরম লগ্নে তাঁরা একটু আড়ালেই থেকেছেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে ভুল ভেঙেছে, যে মুহূর্তে তিনি বুঝেছেন—ফস করে নতুন বউয়ের সামনে অমন কথাটা বলা ভুল হয়ে গেছে, অমনই কুন্তী তাঁর বড় ছেলের কাছে দৌড়ে গেছেন। নব-পরিণীতা দ্রৌপদীকেও দেখাতে চেয়েছেন—ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে যুদ্ধ জিতে বউ নিয়ে আসাটা যেমন বড় কিছু কথা নয়, তেমনই যুধিষ্ঠির যুদ্ধ না করলেও তাঁর মতের মূল্য কিছু কম নয়। কারণ ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধবৃত্তি যত বড়, ধর্মবুদ্ধি তার থেকেও বড়। তিনি একটা কথা ভুল করে বলে ফেলেছেন, তার মীমাংসার ভার তিনি দিয়েছেন বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরের হাতে। দেখাতে চেয়েছেন—ভীম-অর্জুন যত বড় যুদ্ধবীরই হোক, আমার অন্য ছেলেগুলিও কিছু ফেলনা নয়। সঙ্গে নতুন বউটির সুকুমার মনোবৃত্তির কথাটাও কুন্তী ভুলে যাননি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছেন—এমন একটা মীমাংসা কর, যাতে আমার কথাটাও মিথ্যে হয়ে না যায়, আর কৃষ্ণা পাঞ্চালীরও যেন কোনও বিভ্রান্তি না হয়—ন চ বিভ্রমেচ্চ।

যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত দেবার আগে অর্জুনকে যাচিয়ে নিয়েছেন। বলেছেন—তুমিই দ্রৌপদীকে জয় করেছ। তুমিই তাঁকে বিবাহ করো। অর্জুন সলজ্জে বলেছেন—না দাদা, আগে তোমার বিয়ে হোক, ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি। মনে রাখবেন কথাটা অর্জুনকে বলা হয়েছে, অর্জুনই তার

উত্তর দিয়েছেন। কুন্তীর এখানে কোনও পার্ট নেই। রসজ্ঞ মানুষেরা বলতে পারেন—কুন্তীর এ বড় অবিচার। কই হিড়িম্বা যখন ভীমকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তখন তো কুন্তী বলেননি—আগে আমার বড় ছেলে যুধিষ্ঠির বিয়ে করবে, তারপর ভীম।

আমি বলি—ভীমের জন্য হিড়িম্বা লজ্জা ত্যাগ করে যে সব কথা বলেছিলেন, সে সব কথা যদি বিদগ্ধা রাজনন্দিনীর মুখ দিয়ে বেরত, তাহলে যুধিষ্ঠির-কুন্তী নিশ্চয়ই অন্যভাবে ভাবতেন। তা ছাড়া ভীম স্বয়ং তো একবারও বলেননি যে, দাদা! এই রাক্ষসী-সুন্দরীকে আগে তুমি বিয়ে করো, তারপর তো আমার বিয়ের কথা আসবে। ভীম সরল লোক। দেখলেন—হিড়িম্বাও জোরজার করছে, মাও বলছেন। তিনি নির্দ্বিধায় হিড়িম্বাকে নিয়ে চলে গেছেন অন্য জায়গায়। কিন্তু অর্জুন যে মহাভারতের নায়ক। যুধিষ্ঠির প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মায়ের বিপাকের কথা ভেবেছেন, দ্রৌপদী সম্বন্ধে ব্যাসদেবের ভবিষ্যৎ-বাণী স্মরণ করেছেন এবং নব-পরিণীতা বধূর সামনে নিজের চারদিকে নায়কোচিত দূরত্বের আড়াল ঘনিয়ে নিয়ে বলেছেন—দাদা, আগে তোমার বিয়ে হোক, তারপর ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি। আমাকে দিয়ে অধর্ম করিয়ো না।

কুন্তী এখানে কী করবেন? এখানে তাঁর কৃত্য কিছু নেই। বিদগ্ধা দ্রৌপদীও কিছু বলেননি। অতএব সমস্ত সিদ্ধান্তটাই চলে গেছে যুধিষ্ঠিরের হাতে। বলতে পারেন—যুধিষ্ঠির যখন—'দ্রৌপদী আমাদের সবারই মহিষী হবেন'—বলে সিদ্ধান্ত দিলেন, সেটাতে কুন্তী আপত্তি করেননি কেন? করেননি, কেননা এতে তাঁর হঠোক্তির দায়টাও চলে গেছে, আর পাঁচ-জনের এক স্ত্রী হলে ভাইদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ হবে না—এই সুন্দর যুক্তিটা তাঁর পরম ঈপ্সিত ছিল। কিন্তু এটা তিনি জেনে বুঝে করেছেন তা মনে হয় না। তা ছাড়া এই বিয়ে নিয়ে পরেও কম লড়তে হয়নি। মহামতি দ্রুপদের সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে সবার সঙ্গে এই মায়ের বচন নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে তর্ক করতে হয়েছে। আর কুন্তী যে জেনে-বুঝে পাঁচ ছেলের সঙ্গে এক রূপসীর বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যই ফস করে একটা মিথ্যার মতো সত্য কথা বলেছেন, তা মনে করি না। আরও মনে করি না এই কারণে যে, দ্রুপদের সভায় অত বড় ঋষি-শ্বশুর স্বয়ং ব্যাসদেবের কাছে কুন্তী অত্যন্ত বিপন্নভাবে আর্জি জানিয়েছেন—ছেলেপিলেদের কাছে আমার কথাটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে বলে আমি বড় ভয় পাচ্ছি, আমি কী করে এই মিথ্যা থেকে মুক্তি পাব বলুন—অনৃতান্মে ভয়ং তীব্রং মুচ্যে'হম্ অনৃতাৎ কথম্? আর যাই হোক, বেদব্যাসের সঙ্গে কুন্তী চালাকি করবেন না।

শেষমেশ যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তে এবং ব্যাসদেবের অনুমোদনে কুন্তীর হঠাৎ বলা কথাটাই পাঁচ ছেলের একত্রে বিবাহের মঙ্গলে সমাপ্ত হল। বিয়ে হলে স্বামীহারা কুন্তী নববধূ দ্রৌপদীকে স্বামীদের কাছে আদরিণী হবার আশীর্বাদ করলেন প্রথমে। তারপরই প্রবাসিনী রাজমাতা ছেলেদের রাজ-সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় কল্যাণী বধূকে বললেন—কুরুদের রাজ্যে তুমি স্বামীর সঙ্গে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হও। ভাষাটা ছিল—তুমিই তোমার আপন ধর্ম-সৌভাগ্যে স্বামীকে বসাবে রাজার আসনে—অনু ত্বম্ অভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা। কুন্তীর তৃতীয় আশীর্বাদ ছিল কুরুবংশের গর্ভধারিণী জননীর একাত্মতায়। তিনি বলেছিলেন—আজকে যেমন বিবাহের পট্টবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তোমাকে অভিনন্দিত করছি, তেমনই তোমার ছেলে হবার পর পুত্র-সৌভাগ্যবতী তোমাকে আবারও অভিনন্দিত করব।

এই তিনটি আশীর্বাদের মাধ্যমে কুন্তী একদিকে যেমন নববধূ দ্রৌপদীকে কুলবধূর স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন,তেমনই তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রসিদ্ধ ভরত-বংশের পরম্পরার মর্যাদা। দ্রৌপদীর সৌভাগ্যেই হোক অথবা পাণ্ডবদের ধৈর্য এবং বীর্যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। রাজমাতা হওয়া সত্ত্বেও যে অপমান এবং বঞ্চনার গ্লানি নিয়ে কুন্তীকে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, কুন্তী সেই ঘরে ছেলে এবং ছেলের বউ নিয়ে ফিরে এলেন সগৌরবে। যুধিষ্ঠির রাজ্য পেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। ঘটা করে রাজসূয়যজ্ঞ করলেন। আর কুন্তী! নববধূ দ্রৌপদীর হাতে সমস্ত গৌরবের সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে রইলেন রাজমাতার দূরত্বে। ভাবটা

এই—স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা মাতা হিসেবে ছেলেদের আমি রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। এইবার তোমরা সুখে থাকো। আমি দায়মুক্ত।

৮

মুক্ত হতে চাইলেই কি আর মুক্ত হওয়া যায় ? কুন্তী বলেছিলেন—বাপের বাড়ির লোকের কাছেও আমি সুখ পাইনি, শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছেও নয়। স্বামী চলে গেলেন অকালে। ভাশুর আপন পুত্রস্নেহে অন্ধ। বারণাবতের আগুন থেকে বেঁচে মহামতি দ্রুপদের আত্মীয়তার সান্নিধ্যে সগৌরবে হস্তিনায় ফিরলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্যের প্রতিপত্তিও ধৃতরাষ্ট্রের সহ্য হয়নি। মতলববাজ শ্যালক এবং রাজ্যলোভী পুত্র তাঁকে যা বুঝিয়েছে, তিনি হয়তো তাই বুঝেছেন। কুন্তীর ছেলেদের বাড়বাড়ন্ত দুর্যোধনের যেমন সহ্য হয়নি ধৃতরাষ্ট্রেরও নয়। ফল পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবদের বনবাস।

এই সময় থেকে আমরা অন্য এক কুন্তীকে দেখতে পাব। রাজমাতা হিসেবে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যসুখ—তা কতটুকুই বা ভোগ করলেন তিনি ? সারা জীবন কষ্ট করে এসে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যসুখ তাঁকে বড় বেশি উৎফুল্ল করতে পারেনি। তিনি ছিলেনও একান্তে। কিন্তু তার মধ্যে এ কী হল ? ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা শকুনির ক্রীড়া কুশলতায় প্রথমে তাঁর ছেলেদের সর্বস্ব জিতে নিত। তাও তাঁর সইত। পাশার পণে ছেলেদের বারো বছর বনবাস হত তাও তাঁর সইত। কিন্তু উন্মুক্ত সভাস্থলের মধ্যে শ্বশুর ভাশুর গুরুজনদের সামনে কুলবধূর লজ্জাবস্ত্র খুলে দেবার চেষ্টা করল দুঃশাসন-দুর্যোধনেরা—এ তিনি সইবেন কী করে ?

ঠিক এই জায়গায় কুন্তী দ্রৌপদীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। একাত্ম হয়েছেন কুরুকুলের বধূর মর্যাদায়। তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছে—পাণ্ডুর স্ত্রী হিসেবে কুরুবাড়িতে যে মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সে মর্যাদা তিনি যেমন পাননি, তেমনই তাঁর ছেলের বউও পেল না। তাঁর শ্বশুর কুল তাঁর সঙ্গে যে বঞ্চনা করেছে, সেই বঞ্চনা চলল বধূ-পরম্পরায়। পাশাখেলায় পাণ্ডবরা হেরে গিয়ে যখন বনবাসের জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখন কুন্তী তাঁর অবাঙ্মুখ ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেননি, কথা বলেছিলেন শুধু পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে।

পরিস্থিতিটা বলি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে বিদায় চাইলেন সবার কাছে। কুন্তীও বুঝি ছেলেদের সঙ্গে বনে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ পাণ্ডুর বংশধর পুত্রদের যেখানে ঠাঁই হল না, সেই শত্রুপুরীতে তাঁর স্থান কোথায় ? কাজেই তিনিও বনে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মাত্মা বিদুর যিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রীও বটেন, তিনি পাণ্ডবদের ডেকে বললেন—রাজপুত্রী আর্যা পৃথা বৃদ্ধা হয়েছেন, বেশি কষ্টও তাঁর সইবে না, তিনি আর বনে যাবেন না, তিনি আমারই বাড়িতে থাকবেন আমারই সমাদরে—ইহ বৎস্যতি কল্যাণি সৎকৃতা মম বেশ্মনি। কথাটা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন অর্থাৎ রাজবাড়ির আনুকূল্য ছাড়াও বিদুরের অধিকারে তিনি বিদুরের ঘরে থাকবেন।

যুধিষ্ঠিব নিশ্চিন্ত হয়ে কাকা বিদুরের মত মেনে নিয়েছেন, সম্মত হয়েছেন কুন্তীও। ঠিক এই সময়ে বিদগ্ধা দ্রৌপদী উপস্থিত হয়েছেন মনস্বিনী কুন্তীর কাছে। কুন্তী আর চোখের জল রাখতে পারেননি। সেইকালের শাশুড়ি হয়েও ছেলের বউকে যে কত সম্মান দেওয়া যেতে পারে তার একটা উদাহরণ হতে পারে এই কথোপকথন। সাধারণত শাশুড়িরা সব সময় ছেলের ওপর অধিকার ফলাতে গিয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে কোঁদল করেন। পরিবর্তে শাশুড়িরা যদি ছেলের বউদের সম্মান সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহলে যে ছেলেবা আপনিই অধিকারে আসে সেটা বোধহয় কুন্তীর মতো কেউ জানতেন না। অবশ্য দ্রৌপদীও বিদগ্ধা বটে, শাশুড়িকে তিনি বুঝেছেন ভালমতো।

কুন্তী বলেছেন—বাছা ! এই বিরাট বিপদের মুহূর্তে কোনও কষ্ট মনে রেখো না তুমি। মেয়েদের কী করা উচিত তা তুমি জানো এবং স্বামীদের সঙ্গে কীভাবে তোমায় চলতে হবে—তাও তোমায়

বলে দিতে হবে না। তোমার পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—দুই কুলেরই তুমি অলংকার। এই কুরুকুলের ভাগ্যি মানি আমি, যে তারা তোমার ক্রোধের আগুনে ভস্ম হয়ে যায়নি এখনও। তোমার মধ্যে স্বামীদের জন্য ভাবনা যতখানি আছে, তেমনই আছে মায়ের গুণ—বাৎসল্য। শীগগিরই ভাল দিন আসবে তোমার।

এই সব শুভকামনার পরে কুন্তী শুধু তাঁর আদরের সহদেবকে বনের মধ্যে ভাল করে দেখে রাখতে বলেছেন দ্রৌপদীকে, এবং সে-কথা আমি আগে বলেছি। বিদগ্ধা দ্রৌপদী রওনা দিলেন, কুন্তীর কান্না দ্বিগুণতর হল। ছেলেদের জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন তিনি, অনেক ধিক্কার দিলেন নিজেকে। বললেন—চিরকাল ধরে ন্যায়-নীতি আর সমস্ত উদারতার মধ্যেই ছেলেরা আমার মানুষ হয়েছে, কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই ভীষণভাবে খারাপ চেয়েছে আমার—কস্যাপধ্যানজঞ্চেদং—যার ফলে দুর্দৈব উপস্থিত হল। অথবা এ আমারই ভাগ্যের দোষ—আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছিলাম ; নইলে এত গুণের ছেলে হয়েও এইভাবে দুর্ভোগ পোয়াতে হবে কেন তোমাদের ?

কুন্তী এবারে স্মরণ করলেন তাঁর সারা জীবনের কষ্টের কথা, তাঁর স্বামীর কথা, সপত্নী মাদ্রীর কথা, যাঁরা পুত্র-জন্মেব সুখে-সুখেই স্বর্গত হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও ছেলেদের নিয়ে তিনি যে আশায় বুক বেঁধেছিলেন, স্বার্থপর ভাশুরের আগ্রাসনে সে আশা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিনি বলেছেন—আগে যদি জানতাম ছেলেদের সেই বনবাসই জুটবে আবার কপালে, তাহলে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সেই শতশৃঙ্গ থেকে আর হস্তিনায় ফিরে আসতাম না—শৃতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগামিষ্যং গজাহ্বয়ম্। স্বামী-সতীনের মরণ দেখেও জীবনে বুঝি আমার বড় লোভ ছিল, তাই হয়তো এই কষ্ট—জীবিতপ্রিয়তাং মহ্যং ধিঙ্‌ মাং সংক্লেশভাগিনীম্।

কুন্তীর করুণ বিলাপে সেদিন পাণ্ডবদের বনবাস-দুঃখ আরও গাঢ়তর হয়েছিল। কোনওদিন কুন্তীকে এত আলুলায়িত ভেঙে-পড়া অবস্থায় আমরা দেখিনি। একবার তিনি ছেলেদের আটকে দিয়ে বলেন—ছাড় আমাকে, আমিও বনে যাব তোদের সঙ্গে, একবার নিজের বেঁচে থাকায় ধিক্কার দেন, আরেকবার সহদেবকে চেপে ধরে বলেন—সবাই যাক বাবা, তুই অন্তত আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য থাক এখানে, তাতে কী এমন অধর্ম হবে—মৎপরিত্রাণজং ধর্মম্‌ ইহৈব ত্বমবাপ্নুহি। এত বিলাপের পর শেষে আর কুন্তী শ্বশুর-ভাশুরের উদ্দেশে দুটো কথা না বলে পারেননি। বলেছেন—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ এঁরা নাকি ধর্মের নীতি-নিয়ম সব জানেন, এঁরাই নাকি এই বংশের রক্ষক, তা এঁরা থাকতেও আমার এই দুর্দশা হল কেমন করে—স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা ?

পাণ্ডবভাইরা ঠোঁট চেপে শরীর শক্ত করে পা বাড়ালেন বনের পথে। মহামতি বিদুর বহু কষ্টে দুর্দৈবের যুক্তিতে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কুন্তীকে। বিবাহিত পুত্রদের শোকে আকুল এক মাকে তিনি নিজের ঘরে স্থান দিলেন সসম্মানে। শোকে দুঃখে কুন্তী পাথর হয়ে গেলেন। প্রায় তেরো বছর অর্থাৎ যতদিন পাণ্ডবরা বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে দিন কাটিয়েছেন ততদিন মহাভারতের কবি আমাদের কুন্তীর খবর দেননি। হয়তো পুত্রশোকাতুর মাতার দুঃখ কবির মরমী ভাষাতে প্রকাশ করলেও সে বুঝি যথেষ্ট হত না, অথবা সে দুঃখ শুনে শুনে অভিনব-ঘটনা-পিপাসু পাঠকের মনে যদি কুন্তীর দুঃখকষ্টের প্রতি তুচ্ছতা জন্মায়, অতএব মহাভারতের কবি প্রায় তেরো বছর কুন্তীর খবর দেননি আমাদের। বনের মধ্যে পাণ্ডবদের অরণ্য-জীবনের নব নবতর ঘটনা-বিন্যাস করে পাঠকদের তিনি অন্যভাবে আকৃষ্ট এবং নিবিষ্ট রেখেছেন।

এই তেরো বছর যে মহাভারতের কবি কুন্তীকে পাঠক-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখলেন, তার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। মনে রাখা দরকার, কুন্তী ক্ষত্রিয়-রমণী। প্রিয় পুত্রদের বনবাসের কারণে সাময়িকভাবে তাঁর যত কষ্টই হোক, ক্ষত্রিয়-রমণীর হৃদয় বাংলাদেশের নদী-জল আর দুধ-ভাতে গড়া নয়। ক্ষত্রিয়-রমণীর কাছে পুত্রজন্ম সাময়িক রতি-মুক্তির ফল নয়, পুত্রের মাধ্যমে সে জগতের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এই যে তেরো বছর কেটে গেল—আমরা বেশ জানি—ছেলেদের বিবাসনের দিনটি থেকেই কুন্তীর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ। স্বামীর গুরুজন তাঁর শ্বশুর-ভাশুরের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কম ছিল না, কিন্তু তাই বলেই তাঁরা যা করেছেন, তাই

ঠিক এমন ভাবনা নিয়ে তিনি বিদুরের ঘরে বসে বসে চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন—এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই। তিনি কুরুবাড়িতে আছেন—নিজের ইচ্ছেয় নয়, বিদুরের ইচ্ছেয়, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্যে। সেই বিদুরের বাড়িতেই শোকাহত পাথর-প্রতিমা প্রতিরোধের আগুনে সজীব হয়ে উঠল। শ্বশুরবাড়ির মধ্যে বিদুরের দুর্গে বসেই তিনি অন্যায়কারী ভাশুরের বিরুদ্ধে মন শক্ত করে ফেলেছেন।

নিজের ছেলেদের প্রত্যেকের চরিত্র তিনি জলের মতো পড়তে পারেন। অতএব তেরো বছরের মাথায় পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্য আবার যখন সময় আসবে, তখন যাতে ছেলেরা তাঁর মিইয়ে না যায়—তার জন্য প্রত্যেক ছেলের মতো করেই উত্তেজনার ভাষা তৈরি করে রেখেছেন কুন্তী। তাঁর বুকে বিঁধে আছে প্রিয় পুত্রবধূটির অপমানের যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে তিনি একাত্ম অনুভব করেন। পুত্রবধূর মনোকষ্ট এবং অপমান তাঁর কাছে পাণ্ডুর কুলবধূদের পরম্পরায় সাধারণীকৃত। তিনি মনে করেন, পাণ্ডুর ঘরের বউরা—কুন্তীই হোন অথবা দ্রৌপদী—তাঁরা কেউ তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। অতএব আর তিনি অপেক্ষা করবেন না।

সময় এল। তেরো বছরের শেষে পাণ্ডব-কৌরবের শান্তি-বিনিময়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিজে এসেছেন কুরুদের বাড়িতে পাণ্ডবদের হক বুঝে নেবার জন্য। শান্তি তিনিও চান, কিন্তু পাণ্ডবদের ভাগ তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে—এই মনোভাবটা তাঁর ছিল। ফলে কুন্তীর পক্ষে নিজের শাণিত বক্তব্যগুলি পেশ করাটা খুব কষ্টকর হয়নি। তা ছাড়া বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই ভাইপোটির ওপর তাঁর নির্ভরতা ছিল একান্ত। ভাইপোটিও সেইরকম। কুরুদের সভায় যাবার আগে কৃষ্ণ একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেন। তেরো বছর ছেলেদের মুখ না দেখার ফলে কুন্তীর প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনর্গল কুশল প্রশ্নে। তারই সঙ্গে ছেলেদের কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি একইভাবে মুখর। বছরের পর বছর যে অন্যায় তাঁদের সইতে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত, সে ব্যাপারে এখন তিনি নিজেই উপদেশ দিয়েছেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ এখানে নিজে বেশি কথা বলেননি। কিন্তু কুরুদের সভায় কৃষ্ণের শান্তি-সফর যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই জিজ্ঞাসা করেছেন মনস্বিনী কুন্তীকে—তোমার ছেলেদের কী বলব বলে দাও, পিসি! অর্থাৎ এবার উত্তেজনাটা নিজেই চাইছেন।

প্রথমবার যখন কৃষ্ণ এলেন কুন্তীর কাছে, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে বিদুরের ঘরে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনা সেরে কৃষ্ণ পিসির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছেলের বয়সী ভাইপোকে দেখে কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন কুন্তী। বললেন—পাঁচ ভাই, ছোটবেলা থেকে এক-মত, এক-প্রাণ, অন্যায়ভাবে তাদের পাঠানো হল বনে। বাপ নেই, তাদের আমি কত কষ্ট করে মানুষ করেছি—বালা বিহীনাঃ পিত্রা তে ময়া সততলালিতাঃ। সমস্ত রাজ-সুখ ত্যাগ করে দুঃখিনী মাকে রেখে তারা চলে গেল বনে।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যসুখের প্রতিতুলনায় পাণ্ডবভাইরা কত কষ্টে বনে বাস করলেন—কৃষ্ণের সামনে তার একটা চিত্র তুলে ধরলেন কুন্তী। কুন্তী বললেন—হয় শঙ্খ-দুন্দুভির শব্দ, নয়তো হাতি-ঘোড়ার ডাকে ছেলেরা আমার সকালবেলায় জেগে উঠত। ব্রাহ্মণেরা পুণ্যাহ ঘোষণা করতেন, বাঁশিতে ভৈরবীর সুর চড়ানো হত, বাছারা আমার সেই শব্দ শুনে জেগে উঠত। আর এখন বিশাল বিশাল বনের মধ্যে জন্তুর ক্রূর-কর্কশ শব্দে ছেলেরা আমার বোধ হয় ঘুমোয়নি এতকাল।

কুন্তী ছেলেদের কথাই বলে চলেছেন—এই যে আমার বড় ছেলে যুধিষ্ঠির। যে নাকি অম্বরীষ-মান্ধাতা অথবা যযাতি-নহুষের মতো বিরাট এক রাজ্যের রাজা হবার উপযুক্ত, সেই যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে কেমন ছিল, কৃষ্ণ? আর যার গায়ে হাজার হাতির শক্তি, হিড়িম্ব, বক আর কীচকের মতো লোককে যে শায়েস্তা করেছে, সেই আমার ভীষণ রাগি ছেলে ভীম কেমন করে দিন কাটাল বনে বনে? অর্জুন, আমার অর্জুন। যার ওপর সমস্ত পাণ্ডবভাইরা ভরসা করে থাকে, এককে ক্ষেপে যে একশোটা বাণ ছুঁড়তে পারে, সামনাসামনি যুদ্ধ করে কেউ পারবে না যার সঙ্গে—সেই অর্জুন আমার কেমন আছে কৃষ্ণ? এইভাবে নকুল-সহদেব—পিতৃমাতৃহারা যে ভাই দুটিকে চোখে হারাতেন কুন্তী,

জননীর সমস্ত প্রশ্রয়ে যাদের তিনি মানুষ করেছেন, সেই নকুল-সহদেবকে ছাড়া কেমন করে দিন কেটেছে কুন্তীর—তাও তিনি জানালেন কৃষ্ণের কাছে।

সবার শেষে এল কুলবধূ কৃষ্ণার কথা। কুলবধূর সমস্ত মর্যাদা একত্র জড় করে শাশুড়ি কুন্তী এবার পুত্রবধূর কথা জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণকে। দোষ ধরলে তো কত কিছুই ধরতে পারতেন কুন্তী। পাঁচ ছেলের এক বউ। একে যত্ন করো না, ওকে খেতে দাও না, স্বামীদের সঙ্গে তর্ক করো, পিসতুতো দেওর কৃষ্ণের সঙ্গে অত কিসের বন্ধুত্ব তোমার, অর্জুনের ব্যাপারে তোমার রস বেশি, নকুল-সহদেবকে একটু দেখে রাখতে পারো না, স্বামীদের সঙ্গে একই তালে ঘুরে বেড়াও—এ রকম শত দোষ আবিষ্কার করা কিছুই কঠিন ছিল না শাশুড়ি কুন্তীর পক্ষে। কিন্তু কুন্তী তাঁকে দেখেছেন কুরুবাড়ির বধূ-পরম্পরায়। তিনি নিজে কুরুবাড়ির বউ, সেই বউ হিসেবেই তিনি দ্রৌপদীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বউ হিসেবে কুরুবাড়িতে কষ্ট পেয়েছি, অতএব শাশুড়ি হিসেবে সেটা পুষিয়ে নেব—এই দৃষ্টিতে নয়, দ্রৌপদীর মান-অপমানের কথা কুন্তীর বিলক্ষণ স্মরণে আছে।

তাই সবার কথা শেষ করে কুন্তী এবার আলাদা করে আসছেন দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে। বললেন—আমার সবগুলি ছেলের থেকেও অনেক বেশি আমার কাছে আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী—সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন। যেমন তার রূপ, তেমনই তার গুণ। নিজের কচি ছেলেগুলিকে বাড়িতে রেখে সে স্বামীর কষ্টের ভাগ নিতে গেছে বনে। আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, কৌলীন্য—কিছুই তো কম ছিল না তার, তবু স্বামীদের জন্যই সে বনে গেছে। দ্রৌপদীর জন্য কুন্তী এবার চিরাচরিত ভারতীয় ধর্মদর্শনেও সন্দেহ প্রকাশ করছেন। ধর্মের কর্তা বক্তা এবং অভিরক্ষিতার মতো এক ব্যক্তির নামই হল কৃষ্ণ। তাঁর কাছেই কুন্তী বলছেন—পুণ্য কর্ম করলেই মানুষ সুখ পায়—এমন নিশ্চয়ই নয় কৃষ্ণ, কারণ তা যদি হত তাহলে আমার দ্রৌপদীর সারা জীবন ধরে অক্ষয় সুখ পাওয়ার কথা।

আসলে কুন্তী এবার যেসব মেজাজি কথাগুলি বলবেন তার অন্তঃসূত্র হলেন দ্রৌপদী। ছেলেদের এই চুপ করে বসে থাকা আর তাঁর ভাল লাগছে না। ধর্ম-ধর্ম করে যুধিষ্ঠিরের শুভবুদ্ধি আর তৃপ্ত করছে না এই ক্ষত্রিয় রমণীর মন। কুন্তী বলছেন—দেখ কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন অথবা নকুল-সহদেব—কেউ আমার কাছে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর থেকে প্রিয় নয়। অমন একটা মেয়েকে রাজসভার মধ্যে এনে অপমানের চূড়ান্ত করা হল, আর এরা কেউ কিচ্ছুটি করল না—এর থেকে দুঃখের ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি—ন মে দুখঃতরং কিঞ্চিদ্ ভূতপূর্বং ততো'ধিকম্। রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে শ্বশুর-ভাশুরের সামনে জোর করে নিয়ে আসা হল, আর ব্রহ্মলগ্ন নির্বিঘ্ন পুরুষের মতো সেটা বসে বসে দেখলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কৌরবেরা।

কুন্তী এই প্রসঙ্গে বিদুরের অনেক প্রশংসা করলেন কৃষ্ণের কাছে, কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দ্রৌপদীকে সভাস্থলে নিয়ে আসার নিন্দা করেছিলেন। কুন্তী কিছুই বাদ দিচ্ছেন না, কুরুবাড়ির সমস্ত বঞ্চনা তিনি একটি একটি করে বলতে থাকলেন। তিনি ভাবছিলেন—মানুষটি কৃষ্ণ বলেই তিনি হয়তো শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হবেন কুরুসভায়। জুটবে আরও এক রাশ বঞ্চনা। বারবার অসহ্য নিপীড়ন আর মাঝে মাঝে দুই-চার মুদ্রা ভিক্ষা দেওয়ার মতো কিছু সান্ত্বনা পেতে পেতে কুন্তী এখন ক্লান্ত। শান্তিকামী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিনি তাই ঠাণ্ডা মাথায় নিজের জীবনের বঞ্চনাগুলি একটি একটি উপস্থিত করে তাঁর আসল প্রস্তাবের পথ পরিষ্কার করছেন।

আমরা এখন সেই জায়গায় উপস্থিত, যেখান থেকে আমরা কুন্তীর জীবনের কথা আরম্ভ করেছিলাম। জীবনের যে উপলব্ধি থেকে কুন্তী নিজেকে অবহেলিত এবং বঞ্চিত বলে মনে করেছেন, আমরা এখন সেই মুহূর্তে উপনীত। কঠিন এবং জটিল এক মনস্তত্ত্বের শিকার হয়ে কুন্তী যখন নিজের ভাইপোকে বলেছিলেন—বাপের বাড়িতেও বঞ্চনা লাভ করেছি, শ্বশুরবাড়িতেও তাই—আমরা এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

কুন্তী বলেছিলেন—জীবনে দুঃখ আমি কিছু কম পাইনি, কৃষ্ণ—নানাবিধানাং দুঃখানাম্ অভিজ্ঞাস্মি জনার্দন। ছেলেদের এই অজ্ঞাতবাস এবং তারপরে এখনও যে তাদের রাজ্য দেওয়া হচ্ছে না—সবই

সহ্য করা যেত যদি আমি ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতাম। বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সব জায়গাতেই আমি অবিচার পেয়েছি। তবু আমার এই বিধবার জীবন, ইন্দ্রপ্রস্থের সম্পদ-নাশ এবং কৌরবদের এই শত্রুতা—এও আমাকে তত কষ্ট দেয় না, যতটা দেয় ছেলেদের সঙ্গে আমার থাকতে না পারাটা—তথা শোকায় দহতি যথা পুত্রৈর্বিনাভবঃ। এই যে আমি প্রায় চোদ্দোটা বছর ধরে আমার অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম অথবা নকুল-সহদেব—কাউকে চোখে দেখতে পারছি না, এর পরেও কি কারও শান্তি থাকতে পারে ? আসলে কী জান কৃষ্ণ, মানুষ মারা গেলে তবেই লোকে তার শ্রাদ্ধ করে, আমার কাছে আমার ছেলেরা কার্যত মৃত, আমিও মৃত তাদের কাছে—অর্থতস্তে মম মৃতাস্তেষাং চাহং জনার্দন।

মহাভারতের কবির ব্যঞ্জনাটা এখানে ধরতে পারলেন কি না জানি না। সংস্কৃতে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি যে ধাতু থেকে আসছে 'শ্রদ্ধা' শব্দটিও সেই ধাতু থেকেই আসছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ মানে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন। সামগ্রিকভাবে এখানে কুন্তীর ভাবটা হল—আমার ছেলেরা আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মতো কিছু করেনি এবং আমিও তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা করার মতো কিছু পাইনি। তারা শুধুই আমার কাছে মৃত, আমিও তাদের কাছে তাই ; কিন্তু মানুষের মৃত্যু হলে যে শ্রাদ্ধ-তর্পণটুকু করে, অন্তত সেইটুকু তাদের কাছে আশা করা গিয়েছিল। তারা তাও করেনি—জীবনাশং প্রণষ্টানাং শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি মানবাঃ।

এখানে কুন্তীর শ্রাদ্ধ-তর্পণ বলতে যেন আবার আক্ষরিক অর্থে শ্রাদ্ধ বুঝবেন না। এখানে শ্রাদ্ধের মধ্যে কুন্তী তাঁর সন্তানদের তরফে কৌরবদের বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিক্রিয়া আশা করছেন। কুন্তী এর পরেই কৃষ্ণের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন—কৃষ্ণ! সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোলো (কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এককালে তিনি রাজা ছিলেন), সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বোলো—তুমি যে এত ধর্ম-ধর্ম কর, সেই ধর্মও যে একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেল বাছা! ধিক সেই ধর্মপুত্রের জননীকে, যাকে বেঁচে থাকতে হয় পরের ওপর নির্ভর করে—পরাশ্রয়া বাসুদেব যা জীবতি ধিগস্তু তাম্। আর আমার নাম করে সেই ভীম আর অর্জুনকে একবার বোলো। বোলো যে, ক্ষত্রিয়-জননীরা যে সময়ের কথা ভেবে সন্তান প্রসব করে, এখন অন্তত সেই সময়টা এসে গেছে—যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালো'য়মাগতঃ। এই সময়ও যদি বয়ে যায়, তবে এরপর মিথ্যাই সত্যের জায়গাটা অধিকার করে নেবে—মিথ্যা চাতিক্রমিষ্যতি।

যে ছেলের যা। ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের শাসনে, আর ভীম-অর্জুনকে ক্ষাত্রবীর্যের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করে কুন্তী বলেছেন—সময় যদি সেরকম আসে, তবে জীবনটাও খুব বড় কথা নয়, দরকার হলে জীবন দিতে হবে—কালে হি সমনুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যমপি জীবিতম্। আমরা ভাবি চিরাচরিত ক্ষাত্র-নীতি-সিদ্ধির জন্য কোন জননী এমন করে ছেলেদের বলতে পারেন ? কুন্তীর বক্তব্য—ভীম-অর্জুনের মতো বীর, যাঁরা নাকি যুদ্ধকালে দেবতাদেরও অন্ত ঘটাতে পারেন, সেই তাঁরা যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সভাস্থলে উপস্থিত দ্রৌপদীর অপমান দেখলেন—এটা তাঁদের লজ্জা—তয়োশ্চৈদ্ অবজ্ঞানং যত্তাং কৃষ্ণাং সভাং গতাম। দুঃশাসন-দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর প্রথমজাত সন্তান কর্ণও দ্রৌপদীর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহারটি করেছিলেন—কুন্তী তা ক্ষমার যোগ্য মনে করেন না। বরঞ্চ তাদের শত অপমান এবং কটূক্তির উত্তরে হঠাৎ-ক্রোধী ভীমসেন যে ক্ষেপে উঠেছিলেন—সেই ক্ষিপ্ততাই অনুমোদন করেন কুন্তী। নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন। তাঁর ধারণা—দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে যে অপব্যবহার করেছে—তার ফল বুঝবে সে—তস্য দ্রক্ষ্যতি যৎ ফলম্।

এই চরম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন যেখানে অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে ঘটনার গতির দিকে নজর রাখছেন, সেখানে তাঁর ওই অধীর হঠাৎ-ক্রোধী পুত্রটিই যে প্রধান ভরসা। সে যা করেছে, ঠিক করেছে যেন। কৃষ্ণকে কুন্তী বলেছেন—কৌরবদের এই চরম শত্রুতার মুখে আমার ভীম অন্তত চুপটি করে বসে থাকবে না। ভীম সারা জীবন শত্রুতা পুষে রাখে এবং শত্রুর শেষ না করে সে ছাড়বে না। দ্রৌপদীর অপমানে ভীম একান্তভাবে প্রতিক্রিয় হয়েছিলেন বলেই কুন্তীর আবার মনে পড়ল লজ্জারুণা দ্রৌপদীর কথা। কুন্তী বলেছেন—ছেলেরা পাশা খেলায় হেরেছে, দুঃখ নেই

আমার, রাজ্য হারিয়েছে তাতেও দুঃখ পাই না, বনবাসে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে—তাও আমি গণ্য করি না। কিন্তু রজস্বলা অবস্থায় কুলবধূকে সভার মধ্যে এসে যে অশালীন কথাগুলি শুনতে হল—সে দুঃখের থেকে বড় দুঃখ আমার কাছে কিছু নেই কৃষ্ণ ! কিছু নেই—কিন্নু দুঃখতরং ততঃ।

দ্রৌপদীর অপমান আজ কুন্তীর কাছে সমগ্র নারী জাতির একাত্মতায় ধরা দিয়েছে, যে নারী জাতির মধ্যে তিনিও একতমা। বার বার তাঁর মনে পড়ে—অমন অসভ্য পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী কাউকে সহায় পায়নি, স্বামীদেরও নয়। আজ কৃষ্ণের শান্তি-প্রস্তাবের প্রাক্কালে দ্রৌপদীর একাত্মতায় কুন্তী তাই নিজের লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছেন কৃষ্ণের কাছে। বলেছেন—ছেলেপিলেদের সঙ্গে আমার সহায় একমাত্র তুমি কৃষ্ণ ! তুমি আছ, বলরাম আছে, তোমার বীরপুত্র প্রদ্যুম্ন আছে। আর আমি ! তোমরা থাকতেও, ভীম-অর্জুনের মতো ছেলে থাকতেও আমাকে এই সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হল—সো'হম্ এবং বিধং দুঃখং সহেয়ং পুরুষোত্তম।

এই 'পুরুষোত্তম' শব্দটির মধ্যে যেন একটা খোঁচা আছে। অর্থাৎ লোকে তোমায় যে 'পুরুষোত্তম' বলে ডাকে, আমার এই সারা জীবনের লাঞ্ছনা গঞ্জনার নিরিখে ওই নামে বুঝি কলঙ্ক লেগেছে। কৃষ্ণ কুন্তীকে আশ্বাস দিলেন কুন্তীর পিতৃকুলের বিশ্বস্ততায়। বললেন—পিসি ! তুমি মহারাজ আর্যক শূরের মেয়ে। এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে আশ্রয় নেওয়ার মতো বিবাহসূত্রে তুমি এসে পড়েছ কৌরবকুলে। তুমি বীরপুত্রদের জননী বলেই এই আশা আমি রাখি যে, তোমার মতো প্রাজ্ঞ রমণীরাই সাধারণ সুখ-দুঃখের ওপর উঠতে পারবে—সুখদুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে ত্বাদৃশী সোঢ়ুমর্হতি। বস্তুত তোমার ছেলেরাও বনবাসের পরিসরে এই সাধারণ সুখ-দুঃখ ক্রোধহর্ষের ওপরে উঠে ধৈর্য অবলম্বন করেছে। বড় মানুষেরা এই রকমই করেন। সাময়িক সুখের থেকে পরিণত কালের অবিচল সুখই তাদের বেশি কাম্য। কৃষ্ণ বললেন—আমার বিশ্বাস—আর খুব বেশি দেরি নেই। শীগগিরই তোমার ছেলেরা তোমার পুত্রবধূ—সবাই এসে নিজেদের কুশল জানিয়ে অভিবাদন জানাবে তোমাকে।

কৃষ্ণের কথায় কুন্তী সাময়িকভাবে শান্ত হয়ে কৃষ্ণের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কুরুসভায় দুর্যোধন যখন কৃষ্ণের শান্তির প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিলেন, সেই সময়ে সুখ-দুঃখ অথবা ক্রোধ-হর্ষের ঊর্ধ্বতার দার্শনিক মাহাত্ম্য তাঁর কাছে আর তত সত্য ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন ধৈর্যের দিন এবারে শেষ। এখন শাস্তি দেবার সময় এসেছে। হস্তিনাপুর ছাড়বার আগে তিনি আবার এসেছেন মনস্বিনী কুন্তীর কাছে। কুন্তীর উত্তেজনা পাণ্ডবদের মধ্যে সংক্রমিত করার জন্য কৃষ্ণই নিজে বলছেন—বলো পিসি কী বলতে হবে পাণ্ডবদের, তোমার নাম করে যা বলতে হবে এইবার তা বলো—কিং বাচ্যা পাণ্ডবেয়াস্তে ভবত্যা বচনান্ময়া।

কৃষ্ণ এখন শুনতে চাইছেন। কৃষ্ণের মতো অত বড় বীরপুরুষ এবং বাকপটু মানুষ ! নিজের ওপর যাঁর অনেক আস্থা ছিল—ভেবেছিলেন—ঠিক পারব, কৌরব-সভায় সবার মধ্যে দুর্যোধনকে ঠিক রাজি করাতে পারব। কিন্তু পারলেন না। দুর্যোধন এবং তাঁর সাকরেদদের ভাব-ভাবনা আগে থেকে জানতেন বলেই কুন্তী কৃষ্ণের মাধ্যমে ছেলেদের যা বলার তা আগেই বলেছেন। এখন কৃষ্ণ নিজেই এসেছেন কুন্তীর কাছে—বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। কুন্তীকে বলেছেন—যুক্তি তর্ক দিয়ে অনেক বলেছি। আমি বলেছি, পণ্ডিত ঋষিরা বলেছেন, একটা কথাও যদি শোনে—ন চাসৌ তদ্ গৃহীতবান্। কৃষ্ণ বলেছেন—এখন তুমি বলো, তোমার কথা এখন আমি শুনতে চাই—শুশ্রূষে বচনং তব।

এই যে একটা সময়ের তফাত হল, তাতে কুন্তীও তাঁর বক্তব্য আরও শাণিত করার সুযোগ পেলেন। আগে যে ব্যক্তি শান্তিকামী হয়ে নিতান্ত পাঁচখানি গ্রামের বদলেই শান্তি বজায় রাখতে উদ্যত ছিলেন, সেই লোকের অর্থাৎ আমাদের কৃষ্ণের সমস্ত 'মিশন' এখন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কৃষ্ণের এই ব্যর্থতার সুযোগ, কুন্তীর কাছে এক বড় সুযোগ। বস্তুত কৃষ্ণ যে শান্তিকামী হয়ে কৌরব-সভায় পাণ্ডবদের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্যন্ত প্রার্থনা করেছিলেন—এই প্রার্থনা কুন্তীর মনোমত হয়নি। এখন কৃষ্ণ ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি সেই কথাগুলি বলতে পারছেন, যা আগে তিনি বলতে পারেননি।

কুন্তী বলছেন—তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বুদ্ধি, মনস্বিতা এবং মাতৃত্বের গ্লানি একত্রিত করে। পাঠক! অবহিত হয়ে শুনুন!

৯

এই মুহূর্তে আমার সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমিও যে সকরুণ প্রার্থনা জানাচ্ছি, তার কিছু কারণ আছে। আসলে সাধারণ পাঠক গল্প চান, ঘটনার পর ঘটনার বিন্যাস চান। উপন্যাসের চরিত্র যদি একসঙ্গে বেশি কথা বলে,তার বক্তব্য যদি দীর্ঘায়িত হয়, তবে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কুন্তীর চরিত্র বিশ্লেষণের পথে আমরা এখন এমন একটা জায়গায় উপস্থিত হয়েছি, যখন পাঠকের ধৈর্যের ওপরেই আমাদের আস্থা রাখতে হবে। আমার ভরসা একটাই—আমার পাঠক কোনও সাধারণ মামুলি পাঠক নন। মহাভারতের মতো বিশাল এক মহাকাব্যের ততোধিক বিশাল এক নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ শোনবার জন্য তিনি পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত। এই প্রস্তুতি থাকার জন্যই পাঠক তাঁর উদারতায় কুন্তীর এই বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর পাশে থাকবেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনবেন বলে আশা করি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা উত্থান-শক্তি-সম্পন্ন রাজার কথা শুনে থাকবেন। উত্থান-শক্তি বলতে সাধারণত আমরা উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাই বুঝি, রাজনীতির পরিভাষাতে ব্যাপারটা প্রায় একই বটে, তবে যে রাজা শত্রুর মোকাবিলা করতে সতত উদ্যোগ নেন, শত্রুর দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও যিনি আপন প্রাপ্তির কথা ভুলে যান না, সুযোগ এলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপর, প্রাচীন রাজনীতির পরিভাষায় তিনিই উদ্যমী রাজা, উত্থান-শক্তির অধিকারীও তিনিই। তেরোটা বছর ধরে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যেভাবে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কষ্ট ভোগ করে চলেছেন কুন্তী তাতে সুখও পাচ্ছেন না শান্তিও পাচ্ছেন না। পাশা-খেলার পণ হিসেবে বনবাসে যাওয়াটা ধর্মের নীতি-নিয়মে যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের ধীর চেতনা এই ওজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রমণীকে পীড়া দিচ্ছে।

কুরু-পাণ্ডবের রাজনীতির মধ্যে কুন্তী হয়তো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই, কিন্তু এই রাজনীতিটা তিনি হাড়ে হাড়ে বোঝেন। আর বোঝেন বলেই রাজনীতির মধ্যে যুধিষ্ঠিরের নিরন্তর ধর্মৈষণা আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তিনি তাই খবর পাঠাচ্ছেন—বাবা! তুমি যেমন ধর্ম-ধর্ম করে যাচ্ছ, সেটাই ধর্ম নয়, তোমার ধর্ম প্রজাপালন, সেই ধর্ম তো নষ্টই হয়ে গেল বাবা—ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মো মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ। কুন্তীর কাছে যুধিষ্ঠিরের হেয়তা এইখানেই। ছেলেকে তিনি লজ্জা দিয়ে বলেন—তোমার বুদ্ধিটা প্রায় গোঁ-গোঁ করে বই মুখস্থ করা ছাত্রের মতো। যারা বেদের অর্থ কিছুই বোঝে না অথচ দিন-রাত বেদ মুখস্ত করে ভাবে যে খুব ধর্ম হচ্ছে, তোমার বুদ্ধিও সেইরকম। ধর্মকার্যের আনুষ্ঠানিক কিছু তৃপ্তিতেই তুমি এমন বুঁদ হয়ে আছ যে ভাবছ খুব ধর্ম হচ্ছে—অনুবাকহতা বুদ্ধিঃ ধর্মম্ এবৈকমীক্ষতে।

যুধিষ্ঠির পূর্বে রাজা ছিলেন, এখন তিনি রাজ্যহারা, বনবাসী। ব্রাহ্মণোচিত উদার শান্ত ধর্মবুদ্ধির থেকেও তাঁর কাছে এখন রাজ্যোদ্ধারের পরিকল্পনা বড় হওয়া উচিত ছিল। অথচ এই যে কৃষ্ণ কুরুসভায় এলেন শান্তির দূত হয়ে, সেখানে শুধু যুধিষ্ঠির কেন, অর্জুন এমনকী ভীমের মতো লোকের কাছ থেকেও পুরাতন রাজ্যপাটের চেয়ে শান্তির কাম্যতা বেশি দেখা গিয়েছিল। এ জিনিস পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর যেমন সহ্য হয়নি, পঞ্চপুত্রগর্বিতা এই ক্ষত্রিয়া রমণীরও তা সহ্য হয়নি। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা ছিল—সম্পূর্ণ রাজ্যপাট নাই পেলাম,, অন্তত পাঁচ গ্রামের পরিবর্তেও যদি যুদ্ধ এড়িয়ে চলেন দুর্যোধন, তবু সেই কলহ-মুক্তিতে বুঝি ধর্ম আছে, শান্তি তো আছেই।

কুন্তীর কাছে অসহ্য এই সব যুক্তি। পূর্বতন রাজাদের উদাহরণে কুন্তী প্রকারান্তরে ধিক্কার দিচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে। বলেছেন—কৃষ্ণ! যেটা ধর্ম, অন্তত যুধিষ্ঠিরের কাছে যেটা ধর্ম হওয়া উচিত, সেই ধর্ম সে আপন বুদ্ধিতে নির্মাণ করতে পারে না। জন্মলগ্নেই তার ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন স্বয়ং

বিধাতা। ক্ষত্রিয় পুরুষেরা জীবন ধারণ করে বাহুশক্তির ওপর নির্ভর করে। কারণ পরম পুরুষের বাহু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষত্রিয় জাতি। নৃশংস কাজ করতে হলেও তার চরম অভীপ্সিত কাজ হল প্রজাপালন। তার সেই ধর্ম আজ কোথায়! কুন্তী বলেই চললেন। বললেন—বুড়ো মানুষদের মুখে শুনেছি—কুবের নাকি মুচুকুন্দ রাজাকে খুশি হয়ে এই সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জানো কৃষ্ণ! মুচুকুন্দ এই দান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি চাই, আমার নিজের শক্তিতে আমি আমার প্রার্থিত রাজ্য অধিকার করে নেব, আপনার দান চাই না আমি—বাহুবীর্যার্জিতং রাজ্যম্ অশ্নীয়ামিতি কাময়ে।'

আসলে কুন্তীও আর এই দান চান না। যিনি রাজরানি ছিলেন তাঁর ছেলেরা বনবাসের দীন প্রকোষ্ঠ থেকে পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করবেন আর দুর্যোধন সেই দান করবেন—দুর্যোধনের এই মর্যাদার ভূমিকা কুন্তী সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তী মনে করেন—ভাল কথা বলে, রাজ্যের অল্পাংশমাত্র গ্রহণের প্রস্তাব করে দুর্যোধনকে কিছুই বোঝানো যাবে না। পাণ্ডবদের দিক থেকে তার ওপরে চরম দণ্ড নেমে না আসলে ধর্মেরই অবমাননা ঘটবে। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—তুমি যে পূর্বে রাজা হয়েও ঋষিদের মতো পরম ত্যাগের মাহাত্ম্যে নিজেকে বেশ রাজর্ষির কল্পনায় স্থাপন করেছ, তুমি জেনে রাখো এটা রাজর্ষির ব্যবহার নয়—নৈতদ্ রাজর্ষিবৃত্তং হি যত্র ত্বং স্থাতুমিচ্ছসি। তুমি যদি ভেবে থাক যে, কোনও রকম নৃশংসতা না করে নিষ্কর্মার মতো বসে বসেই প্রজাপালনের ফল পাওয়া যাবে, তা হতে পারে না। স্বর্গ থেকে তোমার বাপ-ঠাকুরদারা তোমার এই বুদ্ধি-ব্যবহার দেখে পুলকিত হয়ে আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন—এটা ভেবো না, এমন কী মা হিসেবে আমারও কোনও আশীর্বাদ নেই এ ব্যাপারে—ন হ্যেতাম্ আশিষং পাণ্ডুর্ন চাহং ন পিতামহঃ।

পাঁচ পাঁচটি বীর পুত্র থাকতেও তিনি নিজে অসহায়ভাবে শত্রুপুরীতে বসে আছেন। ছেলেদের শুভদিনের জন্য আর কতই বা অপেক্ষা করতে পারেন কুন্তী। এর থেকে দুঃখের আর কীই বা আছে যে রাজরানি এবং রাজমাতা হয়েও তাঁকে জ্ঞাতিশত্রুর বাড়িতে বসে পরের দেওয়া ভাতের গ্রাস মুখে দিতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য—বাপ-ঠাকুর্দার মান আর ডুবিও না যুধিষ্ঠির, তুমি রাজা ছিলে, অতএব রাজার মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তোমার একান্ত ধর্ম—যুধ্যস্ব রাজধর্মেণ মা মজ্জয় পিতামহান্।

কৃষ্ণের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনন্ত উত্তেজনায় সংবাদ পাঠিয়ে কুন্তী এবার কৃষ্ণকে একটা গল্প বলছেন। বলছেন—এই গল্প শুনে ভালটা কী হওয়া উচিত, করণীয়ই বা কী—সেটা তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলতে পারবে। এই গল্পটির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। কুন্তীর গল্পে চরিত্র দুটি—মা বিদুলা আর তাঁর ছেলে সঞ্জয়, যে সিন্ধুদেশের রাজার কাছে যুদ্ধে হেরে নিরাশ হয়ে শুয়ে ছিল। এখানে বিদুলা ছেলেকে যা বলেছেন, কুন্তীও ঠিক তাই বলতে চান। বিদুলার গল্পে তাঁর ছেলের যে অবস্থা হয়েছে, কুন্তী মনে করেন—তাঁর ছেলেদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের। বস্তুত কড়া কড়া যে সব কথা বিদুলা তাঁর ছেলেকে বলেছেন, সেগুলি বোধহয় মা হিসেবে সোজাসুজি বলা যায় না বলেই কুন্তী বিদুলার জবানে বলছেন যুধিষ্ঠিরকে। এখানে বিদুলার সঙ্গে কুন্তীর এক চুলও তফাত নেই, এমনকী কোনও একপদীভাবে কুন্তীকে বিদুলা-কুন্তী বললেও দোষ হয় না। দোষ হয় না বিদুলার ছেলে সঞ্জয়কেও যুধিষ্ঠির ভেবে নিলে।

বিদুলার গল্পের প্রথম প্রস্তাবে কুন্তী বিদুলার ওরফে নিজেরই পরিচয় দিচ্ছেন। কুন্তী বলছেন—জানো কৃষ্ণ! এই বিদুলা ছিলেন রাজচিহ্নে চিহ্নিতা এক ক্ষত্রিয়া রমণী। যেমন বড় বংশ, তেমনই তাঁর নিজের খ্যাতি। অবিনয়ী মোটেই নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী, রাগী মহিলাও বটে। রাজার সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা ছিল, অন্যদিকে তিনি চরম দীর্ঘদর্শিনী, ভবিষ্যতের করণীয় এবং তার ফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

সন্দেহ নেই, বিদুলার ব্যক্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব খ্যাপন করে কুন্তী জানাতে চাইলেন—বংশ, মর্যাদা এবং দীর্ঘদর্শিতার ব্যাপারে বিদুলার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নেই কোনও। অতএব বিদুলার কথা, তাঁরই কথা। কুন্তী বলেছেন—জানো কৃষ্ণ! সিন্ধুরাজের কাছে হেরে গিয়ে বিদুলার ছেলে হতাশায় শুয়ে ছিল

নিজের মনে। বিদুলা সেই পেটের ছেলেকে কী বলেছিলেন জানো ? বলেছিলেন—কোথাকার এক কুপুত্তুর এসে জন্মেছে আমার পেটে। যে ছেলে শত্তুরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে সেই ছেলে হলি তুই। আমার মতো মা তোর জন্ম দেয়নি, তোর বাপও তোর জন্ম দেয়নি, তুই কোত্থেকে এসে জুটেছিস আমার কপালে—ন ময়া ত্বং ন পিত্রা চ জাতঃ ক্বাভ্যাগতো হ্যসি।

একটু আগে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কুন্তী বলেছিলেন, তিনি বাপ-ঠাকুরদার নাম ডোবাচ্ছেন—মা মজ্জয় পিতামহান্। এখন বিদুলার মুখ দিয়ে কুন্তী যা বলছেন তাও যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশেই। অতএব এর পর থেকে আমরা আর 'বিদুলা বললেন'—এমন করে বলব না, বরঞ্চ বিদুলার একাত্মতায় আমরা বলব—বিদুলা-কুন্তী বললেন। যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বিদুলা-কুন্তীর বক্তব্য—ক্রোধলেশহীন ক্লীব পুরুষকে কেউ গণনার মধ্যে আনে না। এমন করে নিজেকে ছোট কোরো না, এত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ো না—মাত্মানং অবমন্যস্ব মৈনমল্পেন বীভরঃ।

কুন্তী এখানে সেই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যপাটের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরের চাওয়া পাঁচখানি গ্রামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছেন। বিদুলারূপী কুন্তী বলছেন—কাপুরুষ ছেলে কোথাকার, দয়া করে একবার গা তোলো, দুর্যোধনের বুদ্ধিতে পরাজিত হয়ে আর নিষ্কর্মার মতো শুয়ে থেকো না, একবার গা তোলো—উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ। বনবাস থেকেই লোক পাঠিয়ে পাঁচটি মাত্র গ্রাম ভিক্ষে করছ তুমি। আরে মজা নদী যেমন অল্প জলেই ভরে দেওয়া যায়, ইঁদুরের প্রার্থিত অঞ্জলি পূরণ করতে যেমন সামান্যই জিনিস লাগে, তেমনই তোমার মতো সন্তুষ্ট কাপুরুষ অল্পেই সন্তুষ্ট হবে।

পঞ্চ গ্রামের প্রার্থনাতেই কুন্তী বুঝি রেগে গেছেন। ভাবটা এই—বনে বসে বসে শান্তির খবর ছড়াচ্ছ, কেন বাপু তুমি এখনও শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারোনি শত্রুর ওপর ! গাব গাছের কাঠ যেমন সহজে জ্বলে ওঠে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে স্ফুলিঙ্গের কণা, তেমনি করে একবারও যদি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠতে তুমি ? তা তো নয়, শুধু তুষের আগুনের মতো গুমিয়ে গুমিয়ে জ্বলছ আর ধোঁয়া ছাড়ছ। ওই ধোঁয়াটাই যুধিষ্ঠিরের শান্তির বাণী। আরে, সারা জীবন ওমনি করে গুমিয়ে গুমিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার থেকে একবার, অন্তত একবার, মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠাও অনেক ভাল—মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতং চিরম্।

ভীমকে বিষ খাওয়ানো হল, তবু যুধিষ্ঠির সবাইকে চুপ করে থাকতে বলেছিলেন, কুন্তীও মেনে নিয়েছেন সে-কথা। কিন্তু বারণাবতে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে পাশা খেলার পণে সেটা জিতে নেওয়া, কুলবধূকে রাজসভায় বিবস্ত্র করার চেষ্টা, বারো বছরের বনবাস, এক বছরের অজ্ঞাতবাস, তাও এখন আবার শান্তি কামনা—এইভাবে গুমিয়ে গুমিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেঁচে থাকা—এটা কুন্তীর সহ্যের বাইরে। তাঁর মত হল—তুমি ক্লীব, তোমার রাজ্যপাট সব গেছে, যশ-খ্যাতি সব গেছে, ভোগ-সুখ সব গেছে, এখন শুধু ধর্মের ধ্বজাটা সামনে রেখে বেঁচে থেকে লাভ কী রে ব্যাটা—ধর্মং পুত্রাগতঃ কৃত্বা কিং নিমিত্তং হি জীবসি। হয় তুমি নিজের বীরত্ব দেখাও, নয় মরো—উদ্ভাবয়স্ব বীর্যং বা তাং বা গচ্ছ ধ্রুবাং গতিম্। আরে সেরকম সেরকম লোক আছে, যারা রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যুর সময়ে মাটিতে পড়তে পড়তেও শত্রুর কোমর জড়িয়ে ধরে পড়ে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেও তার উদ্যম নষ্ট হয় না। তো সেই রকম একটা পুরুষকার আত্মস্থ করো তুমি, নইলে সে রকম কাজ যদি কিছুই না করতে পারো তবে তো তুমি পুরুষও নও স্ত্রীও নও, তোমার জন্ম হয়েছে শুধু জনসংখ্যা বাড়াবার জন্য—রাশিবর্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্।

নিজের পেটের ছেলে যুধিষ্ঠির। এই তেরো বছর ধরে শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করা তার উচিত ছিল। উচিত ছিল দুর্যোধনের ওপর বিরাগ-গ্রস্ত মন্ত্রী-প্রজাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। তারপর এই বনবাসের শেষে একেবারে বাঘের মতো দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ যুধিষ্ঠির এ সব কিছুই করেননি। কুন্তীর ধৈর্য তাই শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে—হয় মার, নয় মরো। মায়ের কাছ থেকে এই সমস্ত কঠিন কথার উত্তরে বনবাসক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির বিদুলার পুত্রের মতো তো বলতেই পারেন যে, মা। আজ যদি আমরা মরে যাই, তা হলে এই রাজ্য-পাট, ভোগ-সুখ অথবা তোমার

নিজের জীবনেরই বা কী মূল্য থাকবে—কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ?

কুন্তী জানেন যুধিষ্ঠিরের মতো নিরুপদ্রব শান্তিকামী ব্যক্তির কাছ থেকে এইরকম একটা মর্মবিদারী মমতা-মাখা প্রতিপ্রশ্ন হতেই পারে। তিনি বলতেই পারেন—বুঝি বা আকরিক লোহা সব এক জায়গায় করে মা তোমার হৃদয়ে গড়ে দিয়েছেন বিধাতা—কৃষ্ণায়সস্যেব চ তে সংহত্য হৃদয়ং কৃতম্। নইলে, নিজের ছেলেকে পরের মায়ের মতো এমন করে যুদ্ধে নিয়োগ কর তুমি ?

কুন্তী এসব আবেগ-ক্লিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানেন। তিনি জানেন যে, হ্যাঁ, যুদ্ধে গিয়ে ছেলেগুলি আমার মারাও যেতে পারে। কিন্তু তবু এইভাবে দিন দিন হীনবল হয়ে অতি অদ্ভুত এক পর্যায়মরণ বরণ করা ক্ষত্রিয় রমণীর পক্ষে যেমন উপযুক্ত নয়, তেমনই উপযুক্ত নয় ক্ষত্রিয় পুত্রদের পক্ষেও। উৎসাহহীন, নির্বীর্য কতগুলি পুত্র আপন কুক্ষিতে ধারণ করার জন্য কুন্তী লজ্জা বোধ করেন। দিনের পর দিন পরের ওপর নির্ভর করার মধ্যে যে দরিদ্রতা আছে, সেই দরিদ্রতা স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর চেয়েও তাঁর কাছে কষ্টকর বেশি—পতিপুত্রবধাদেতৎ পরমং দুঃখমব্রবীৎ। কেন না, সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই পরান্নজীবিতার মধ্যে যে লজ্জা, সেই লজ্জা ক্ষত্রিয়া বীর রমণীর সয় না। বিদুলার মতো কুন্তী বলতেই পারেন—আমি ছিলাম বিরাট বৃষ্ণিবংশের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল কুরুদের রাজবাড়িতে, স্বামী আমাকে সমস্ত সুখে রেখেছিলেন, স্বামীর রাজ্যে আমি ছিলাম সব কিছুর ওপর—ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী ভর্ত্রা পরমপূজিতা। কুন্তী বলতে পারেন—দাস-দাসী, ব্রাহ্মণ-ঋত্বিক, আচার্য-পুরোহিত—আমরা ছিলাম এঁদের আশ্রয়। আর আজ! কেউ আমাদের ভরসা করে না, আমিই অন্যের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এর চাইতে আমার মরণও ছিল ভাল—সান্যমাশ্রিত্য জীবন্তী পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।

পুত্রস্নেহের থেকে কুন্তীর কাছে আজ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনেক বড়। কারণ যুদ্ধের জন্যই পুত্রের জন্ম, যুদ্ধ-জয়ের মধ্যেই তার চরম সার্থকতা। যুদ্ধে জয় হোক বা মৃত্যু হোক নিজের, তবু যুদ্ধের মাধ্যমেই ক্ষত্রিয়-পুরুষ হয়ে ওঠে ইন্দ্রের মতো—জয়ন্ বা বধ্যমানো বা প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্। বিদুলার মতো এক ক্ষত্রিয়-রমণীর জবানে কথা বলতে বলতে কুন্তী দেখছি আর যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য বিস্তার করছেন না। রাজনীতির মূল উপদেশের সঙ্গে যখন বীরত্ব আর উত্তেজনার সংবাদ পাঠাতে হল পুত্রদের কাছে, তখন এই শেষ মুহূর্তে কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরের কথা মনে আনলেন না। বিদুলার গল্প শেষ করেই কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছেন—আমার কথায় তুমি অর্জুনকে একটা খবর শুধু মনে করিয়ে দেবে কৃষ্ণ। সেই ছোট্টবেলার কথা, অর্জুনের তখন কেবলই জন্ম হয়েছে। আমি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বসেছিলাম। সেই সময়ে আকাশবাণী হয়েছিল—এই ছেলে তোমার সমস্ত শত্রু হত্যা করে পৃথিবী জয় করবে ভবিষ্যতে, এই ছেলের যশ হবে আকাশ-ছোঁয়া—পুত্রস্তে পৃথিবীং জেতা যশশ্চাস্য দিবং স্পৃশেৎ। ভীমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে নাকি বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করবে।

কুন্তী বললেন—সেই অর্জুনকে জানিয়ো কৃষ্ণ! যে আশায় ক্ষত্রিয় রমণীরা ছেলে ধরে পেটে, সেই সময় এখন এসে গেছে, ভীমকেও জানিয়ো ওই একই কথা—এতদ্ ধনঞ্জয়ো বাচ্যো নিত্যোদ্যুক্তো বৃকোদরঃ। কুন্তী আবারও তুললেন দ্রৌপদীর সেই অপমানের কথা। বললেন—সেই অপমানের থেকে আর কোনও বড় অপমানের কথা তিনি ভাবতে পারেন না এবং অর্জুনও যেন এই দ্রৌপদীর কথাটা খেয়ালে রাখেন—তং বৈ ব্রূহি মহাবাহো দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর।

পাণ্ডব-সহায় কৃষ্ণ পিসি কুন্তীর সমস্ত উত্তেজনার আগুন পোয়াতে পোয়াতে রওনা দিলেন বিরাটনগরের উদ্দেশে, পাণ্ডবরা সেইখানেই রয়েছেন এখন। কৃষ্ণ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবসভায় 'রিপোর্ট' চলে এসেছে কুন্তীর বক্তব্য নিয়ে। ভীষ্ম এবং দ্রোণ লাগাম-ছাড়া দুর্যোধনকে শাসন করার চেষ্টা করেছেন মনস্বিনী কুন্তীর চরম যুক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তাঁরা বলেছেন—কুন্তীর কথার মধ্যে উগ্রতা থাকতে পারে, কিন্তু সে কথাগুলি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং ধর্মসম্মত—বাক্যমর্থবদত্যুগ্রমুক্তং ধর্ম্যমনুত্তমম্। ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনকে জানালেন যে, মায়ের কথা এবার অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তাঁর ছেলেরা। কৃষ্ণও সেইভাবে তাদের বোঝাবেন।

এতদিন পাণ্ডবরা যা করেননি, এখন তা করবেনই—এই স্পষ্টতা হঠাৎ করে আসেনি। যে ভাষায়, যে যুক্তিতে কুন্তী আজ পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন, তা একদিনের উত্তেজনা নয়। দিনের পর দিন সহ্য করতে করতে শ্বশুর-কুলের বৃদ্ধ-জনের কাছ থেকে আর যখন কোনও সুবিচারের আশা রইল না, কুন্তী যখন বুঝলেন যে, পাণ্ডবদের জন্য তাঁর ভাশুরের অনুভব মমতাহীন মৌখিকতামাত্র, সেইদিন কুন্তী তাঁর সমস্ত সৌজন্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চরম দিনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। নইলে, এতদিন তিনি এত কঠিনভাবে কোনও কথা উচ্চারণ করেননি। কুন্তীর সমস্ত ধৈর্য অত্যন্ত সযৌক্তিকভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে বলেই যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়ানোর মধ্যেও এখন ধর্মের সম্মতি এসেছে—উক্তং ধর্ম্ম্যমনুত্তমম্।

১০

কৃষ্ণ যখন কৌরব-সভায় শান্তির দূত হয়ে এলেন, তখন তিনি সভায় যাবার আগে একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, আবার সভা ব্যর্থ হবার পরেও একবার দেখা করেছিলেন। প্রথমবার যখন কুন্তীর সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়, তখন কুন্তী একবার বলেছিলেন—আমার ভাশুরের ছেলেদের এবং আমার ছেলেদের কোনওদিনই আমি আলাদা চোখে দেখিনি—ন মে বিশেষো জাতু আসীদ্ ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবৈঃ। এই কথার মধ্যে হয়তো সত্য কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে দিনের পর দিন বঞ্চনা সহ্য করে কুন্তী এত ধৈর্য ধরলেন কী করে! কিন্তু এই সত্যের চেয়েও আরও গভীর এক বিষণ্ণ সত্য আছে, যার জন্য দুর্যোধনের ব্যাপারে ধৈর্য ধরেছেন কুন্তী। সেই সত্য হয়তো কর্ণ, যাঁকে দুর্যোধন পালনে-পোষণে এবং মন্ত্রণায় এমনই এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছেন যা কুন্তীর অপরাধী মনে অন্যতর ধৈর্যের জন্ম দিয়েছে।

দিনের পর দিন অস্থির অহঙ্কারী দুর্যোধনের সঙ্গে পড়ে নিজের একান্ত-জাত সন্তানকে একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতে দেখলেন কুন্তী। অস্ত্রশিক্ষার আসরে দুর্যোধন যখন তাঁকে অঙ্গরাজ্য দান করে রাজার পদবীতে স্থাপন করেছিলেন তখন দুর্যোধনের ওপর কুন্তীর চেয়ে বেশি খুশি বোধ হয় কেউ ছিলেন না। কিন্তু কুন্তীর সেই খুশি একটু একটু করে ভেঙে যেতে থাকল। তিনি দেখলেন, দুর্যোধনের সঙ্গে মিশে মিশে, তার সমস্ত অন্যায়ের অংশভাগী হয়ে কেমন করে তাঁর কন্যাগর্ভের পুত্রটি একেবারে বয়ে গেল। কর্ণ যেদিন উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন দুঃশাসনকে—সে খবর কি কুন্তীর কানে যায়নি? গিয়েছিল। দুর্যোধনের ওপর খুশি থাকার এই বুঝি শেষ দিন, আপন কুক্ষিজাত পুত্রকে ক্ষমা করার পক্ষেও বোধহয় সেই দিনটি ছিল চরম দিন। কৃষ্ণের কাছে কথা বলতে গিয়ে বারংবার যখন দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের অন্যায়ের প্রসঙ্গ আসছিল, তখন কর্ণকেও কুন্তী সমানভাবে দায়ী করেছেন—দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ পুরুষাণ্যভ্যভাষতাম্। পুত্র বলে তার অন্যায় অনুক্ত রাখেননি কুন্তী।

কিন্তু আজ কী হবে? দুর্যোধন শান্তির প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন এক ফুঁয়ে। যুদ্ধের উদ্যম শুরু হয়ে গেল সশব্দে, সোচ্চারে। বিদুর এসে কুন্তীকে বললেন—তুমি তো জান, ঝগড়া-ঝাঁটি এড়িয়ে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারটা আমি কীরকম পছন্দ করি। কিন্তু এত চ্যাঁচাচ্ছি, তবু দুর্যোধন কিছুই শোনে না। ওদিকে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, তাঁর ভীমার্জুন, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য সহায়-শক্তি থাকা সত্ত্বেও দুর্বলের মতো শান্তি-শান্তি করে যাচ্ছেন—কাঙ্ক্ষতে জ্ঞাতি-সৌহার্দাদ্ বলবান্ দুর্বলো যথা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন, তবু তিনি থামবেন না—বয়োবৃদ্ধো ন শাম্যতি। ছেলের কথায় মত্ত হয়ে অন্যায়ের রাস্তা ধরেছেন তিনি, আর এই জ্ঞাতিভেদ সৃষ্টির কাজে বুদ্ধি জুগিয়ে যাচ্ছে জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনিরা।

এই যুদ্ধোদ্যোগের মুহূর্তে বিদুর যখন সমস্ত রাজনীতিটার 'পারস্পেক্‌টিভ' বুঝিয়ে দিচ্ছেন কুন্তীকে, ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও কর্ণের নাম কুন্তীকে বুঝি শেষবারের মতো উচ্চকিত করে তুলল। বিদুর,

ধর্মময় বিদুর বলেছিলেন—যদি ধার্মিক সুজনের প্রতি এত অধর্ম করবে, তবে কোন মানুষটা বিষিয়ে না যাবে—কো ন সংজ্বরেৎ ? কৃষ্ণের শান্তির কথাতেও যেখানে কাজ হল না, সেখানে কৌরবদের অন্যায়-অধর্মে যে বহু বীরপুরুষই মারা পড়বে, তাতে সন্দেহ কী ? এইসব ভেবে ভেবে দিনে রাতে দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না।

বিদুরের যেমন ঘুম হয় না, তেমনই কুন্তীরও ঘুম হয় না। বিদুরের রাজনৈতিক ভাষ্যে কর্ণ যুদ্ধ লাগবার অন্যতম কারণ, আর সে যুদ্ধ যদি লাগে তবে অনেক বীরপুরুষই মারা যাবে—সে ভীমও হতে পারে, অর্জুনও হতে পারে, কর্ণও হতে পারে। এই একটু আগে কৃষ্ণের মাধ্যমে বীর পুত্রদের যিনি যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেছেন, তিনি ওই ভবিষ্যৎ বীরনাশে এত উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন কেন ? হ্যাঁ এই যুদ্ধের দোষ অনেক, কিন্তু যুদ্ধ না করলে সেই চিরকালীন নির্ধনতা, অপমান আর বঞ্চনা। একদিকে নির্ধনতার যন্ত্রণা অন্যদিকে জ্ঞাতিক্ষয়ের মাধ্যমে জয়লাভ—দুইই তাঁর কাছে সমান সমান—অধনস্য মৃতং শ্রেয়ঃ ন হি জ্ঞাতিক্ষয়ো জয়ঃ। কুন্তী এসব বোঝেন, এমনকী পাণ্ডব-কৌরবদের এই জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রত্যেক সমরনায়কের রাজনৈতিক অবস্থিতিটাও তিনি ভালভাবেই জানেন।

কুন্তীর মতে এই যুদ্ধে ভয়ের কারণ তিন জন—পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং কর্ণ। তিনজনই দুর্যোধনের জন্য লড়াই করবেন। তবু এর মধ্যে তাঁর সান্ত্বনা এবং স্থির বিশ্বাস যে, আচার্য দ্রোণ প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবেন না। আর পিতামহ ভীষ্মই বা কী করে পাণ্ডবদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্নেহমুক্ত হবেন ? আর বাকি রইলেন শুধু কর্ণ। হায় ! কুন্তী কী ভাবে বোঝাবেন নিজেকে। কৌরব পক্ষে এই কর্ণই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, কুন্তীর মতে যার ভবিষ্যতের দৃষ্টি নেই কোনও। দুর্যোধনের পাল্লায় পড়ে মোহের বশে কেবলই সে কতগুলি অন্যায় করে যাচ্ছে, পাণ্ডবদের তো সে চোখেই দেখতে পারে না—মোহানুবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্।

মুশকিল হল, যত অনর্থই ঘটাক এই কর্ণ, তার শক্তি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কুন্তী ভাবেন—ওই অসামান্য শক্তি নিয়ে কর্ণ যে শুধু তাঁর অন্য ছেলেগুলিব বিপদ ঘটাতেই ব্যস্ত রইল—এই মর্মান্তিক বাস্তব তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল—তন্মে দহতি সম্প্রতি। আজ যখন এই মুহূর্তে কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন দুর্ভাবনায় হতাশায় হঠাৎই ঠিক করে বসলেন—যাব আমি। ঠিক যাব। কন্যা-জননীর লজ্জা ত্যাগ করে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে গিয়ে জানাব যথাযথ সব কথা। জানাব—কেমন করে দুর্বাসার কাছে মন্ত্র পেয়ে কুন্তিভোজের ঘরে বসেই আহ্বান করেছিলাম তার পিতাকে। জানাব—একই সঙ্গে আমার কন্যাত্ব এবং স্ত্রীত্ব—এই পরস্পরবিরোধী আবেগ কী রকম ব্যাকুল করে তুলেছিল আমাকে—স্ত্রীভাবাদ্ বালভাবাচ্চ চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ। একদিকে পিতার মর্যাদা রক্ষা অন্যদিকে কৌতূহল আর অজ্ঞানতার বশে সূর্যের আহ্বান—কুন্তী ঠিক করলেন—এক এক করে সব কর্ণকে জানাব আমি। কন্যাবস্থায় হলেও সে আমার ছেলে, আমার ভাল কথাটা কি সে শুনবে না, ভাইদের ভালটা কি সে বুঝবে না—কস্মান্ন কুর্যাদ্ বচনং পশ্যন্ ভ্রাতৃহিতং তথা। কুন্তী ঠিক করলেন—আজ আমি কর্ণের কাছে গিয়ে সব কথা বলব, তারপর চেষ্টা করব তার মন যাতে পাণ্ডবদের দিকে ফিরে আসে—আশংসে ত্বদ্য কর্ণস্য মনোʼহং পাণ্ডবান্ প্রতি।

কুন্তী রওনা দিলেন। তিনি জানেন এই সময়ে কর্ণ গঙ্গার তীরে পূর্বমুখ হয়ে বসে থাকেন। জপ করেন বেদমন্ত্র। দ্বিপ্রহর কাল অতিক্রান্ত বটে, কিন্তু সূর্যের তাপ প্রচণ্ড। রোদে কুন্তীর শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। সূর্য কি শাস্তির মতো কোনও কিরণ বিকিরণ করছেন আজ ! ভাগরথীর তীরে এসে কুন্তী দেখলেন—পুব দিকে মুখ করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যায় বসে আছেন কর্ণ। তাঁর মুখ দিয়ে উদগীর্ণ হচ্ছে বেদমন্ত্রের নিস্বন—গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌষীদ্ বেদাধ্যয়ন-নিস্বনম্। পশ্চিম দিক থেকে অলসগমনে আসা তাপার্তা কুন্তীকে কর্ণ দেখতে পাননি। পুত্রের জপ-ধ্যান-বেদমন্ত্র—কিছুর মধ্যেই মায়ের সহজ ভাব নিয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে পারলেন না কুন্তী। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যতাপে তপ্ত হয়ে নিজের চারদিকে ঘনিয়ে নিলেন আপন উত্তরীয়ের ছায়া, হয়তো

প্রথম স্বামীর কাছে লজ্জায়। দেখে মনে হল পদ্মের মালা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—পদ্মমালেব শুষ্যতী।

কর্ণের জপ-ধ্যান শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল। পুব দিক থেকে কর্ণ এবার দৃষ্টি সরিয়ে আনবেন পশ্চিম আকাশে। বিদায় দেবেন প্রায় অস্তগামী সূর্যকে। এই দিক বদলের মুহূর্তেই চোখে পড়ে গেলেন কুন্তী। এই নির্জন নদীতীরে হঠাৎ এই প্রৌঢ়া মহিলাকে একলা দেখেই হাত জোড় করে এগিয়ে এলেন কর্ণ। কতবার তিনি এঁকে দেখেছেন দূর থেকে। অভিমানী বীর কর্ণ সৌজন্যে আনম্র হয়ে সস্মিত ভাষে নিজের পরিচয় দিলেন—আমি কর্ণ, 'অধিবথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত'—রাধেয়ো'হম্ আধিরথিঃ কর্ণস্ত্বমভিবাদয়ে।

কুন্তীর মুশকিল হল—তিনি জানতেন না যে, কর্ণ সব ব্যাপারটাই জানেন। যে পুত্রের জন্মের বৃত্তান্তে কালিমা থাকে, সে নিজের গবেষণাতেই প্রথমত নিজের পরিচয় জানবার চেষ্টা করে। লোকের কথায় আরওই সে জেনে যায় কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বিশেষত এখানে এই খানিক আগেই স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণকে একা রথে উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্যত্র। কৃষ্ণ তাঁকে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন—দেখো ভাই, তুমি কুন্তীর ছেলে অতএব চলে এসো পাণ্ডবের দিকে, ঝামেলা মিটে যাবে, দুর্যোধন ট্যাঁফো করতে পারবে না। কর্ণ রাজি হননি—সে অন্য কথা, কিন্তু ভাইপো কৃষ্ণ যেখানে পিসি কুন্তীর কন্যাগর্ভের কথা জানে, সেখানে কর্ণ সেটা জানতেন না, তা আমরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। তা ছাড়া যদি আগে নাও জেনে থাকেন, তা হলেও অন্তত কুন্তী যখন তাঁর কাছে এসেছেন, তার আগে তো তিনি কৃষ্ণের মুখেই সব শুনে নিয়েছেন।

এই নিরিখে দেখতে গেলে বলতেই হবে যে, কর্ণের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে কুন্তীর যে সলজ্জ সংশয় ছিল, কর্ণের দিক থেকে তা ছিল না। ফলত প্রথম অভিবাদনের মুখেই কর্ণ তাঁর সারা জীবনের কলঙ্ক-অভিমান, একত্রিত করে দাঁত শক্ত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন—আমি 'অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত'—রাধেয়ো'হম্ আধিরথিঃ।

সেকালের অভিবাদনে এই রকমই নিয়ম ছিল। অভিবাদনের সময় নিজের নাম বলতে হত, অপরিচিত হলে কখনও বা পরিচয়ও দিতে হত। অপর পক্ষ সম্মানে বা বয়সে বড় হলে অভিবাদিত ব্যক্তি নাম ধরেই আশীর্বাদ করতেন। কিন্তু কর্ণ, হয়তো ইচ্ছে করেই কুন্তীর মনে জ্বালা ধরানোর জন্য নিজের নাম বলার আগে নিজের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বিন্যাস করে সগর্বে নিজেব নাম বলেছেন—আমি অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত।

'গর্ভ' কথাটা শুনেই কুন্তীর মনে অন্য এক প্রতিক্রিয়া হল। সেই যেদিন পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে কুন্তী বলেছিলেন—যিনি তোমায় পালন করবেন সেই ভাগ্যবতী রমণী অন্য কেউ—সেই রমণী আজ শুধু পুত্র পালনের গুণে কর্ণের কাছে গর্ভধারণের অধিকার লাভ করছে। 'আমি রাধেয়'—কথাটা শোনামাত্রই কুন্তীর মুখে তাই তীব্র প্রতিবাদ ঝরে পড়েছে—না না, বাছা তুমি মোটেই রাধার ছেলে নও। তুমি আমার ছেলে, তুমি কুন্তীর ছেলে, সূত অধিরথ মোটেই তোমার পিতা নন—কৌন্তেয় স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা। সারথির ঘরে তোমার জন্ম নয়। আমি যখন বাপের বাড়িতেই ছিলাম তখন কন্যা অবস্থায় আমারই পেটে জন্মেছিলে তুমি। তুমি আমার ছেলে, তুমি পার্থ। স্বয়ং স্বপ্রকাশ সূর্যদেব তোমার বাবা।

মহাভারতের সামান্য সংলাপকে কেন্দ্র করে যে কবি কর্ণের সারা জীবনের অভিমান এবং কুন্তীর সারা জীবনের পুত্রস্নেহ একত্র মন্থন করে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' রচনা করেছিলেন, তাঁর পক্ষে মনস্তত্ত্বের অপূর্ব প্রসার ঘটিয়ে কর্ণকে সত্য, নিষ্ঠা এবং নীতিপরায়ণতার একান্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করাটা অসম্ভব ছিল না। অসম্ভব ছিল না কর্ণকে বঞ্চনা এবং হতাশার তিলক পরিয়ে তাঁকে মহান করে দিতে। বিংশ শতাব্দীতে বসে মহাকাব্যের এক অন্যতম প্রতিনায়ককে জীবন-যন্ত্রণার চরমে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁকে মর্যাদার তত্ত্বে বিভূষিত করাটা নিঃসন্দেহে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। তবে মহাকাব্যের কবির এই দায় ছিল না। বিশাল মহাকাব্যের পরিসরে যে মানুষ নিজেই নিজের কাছে করুণার পাত্র, সেই কুন্তীকে দিয়ে তিনি আর কীই বা করাতে পারতেন এই মুহূর্তে ? পুত্রের মনোযন্ত্রণাব মূল্যে তিনি

জননীর মনোযন্ত্রণা লঘু করে দেখেননি। বিংশ শতাব্দীতে কর্ণের মনস্তত্ত্বের জটিল আবর্ত তাঁকে শেষ পর্যন্ত মহান করে তুললেও মহাকাব্যের কবির কাছে সরলতার দায় ছিল বেশি।

কুন্তী বলেছিলেন—আমি কর্ণকে সব খুলে বলব। বলব—আমার নিজের চরিত্রের কথা ছেড়েই দাও, আমার পালক পিতার চরিত্র রক্ষার জন্য আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে—দোষং পরিহরন্তী চ পিতুশ্চারিত্ররক্ষিণী। যে রমণী বালিকা অবস্থায় আপন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হয়ে পালক পিতার ইচ্ছা অনুসারে মানুষ হয়েছেন, পালক পিতার সুনাম রক্ষার জন্য যাঁকে নিজের সন্তান ভাসিয়ে দিতে হয়েছে জলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে যাঁকে প্রজনন শক্তি-রহিত একটি পতি বরণ করতে হয়েছে, উপরন্তু শ্বশুরবাড়িতে যাঁর নিজের স্থিতিই অত্যন্ত শঙ্কাজনক, সেই অভাগা রমণী নিজেই নিজের কাছে এত বড় করুণার পাত্র যে, তাঁর পক্ষে আপন কন্যাবস্থার পুত্র নিয়ে জীবনে টিকে থাকা কঠিন ছিল।

আজ সেই কন্যাবস্থার পুত্রের সঙ্গে সংলাপে কুন্তী প্রথমেই ধাক্কা খেলেন। যে গর্ভ ধারণের জন্য এতকালের এত মানসিক চাপ—সেই গর্ভ ধারণের যন্ত্রণাটাই অস্বীকার করছে তাঁর পুত্র। হ্যাঁ, বালিকার প্রগল্‌ভতায় পুত্রের প্রতি সুবিচার তিনি করেননি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ছেলে তার গর্ভধারিণীর ভূমিকাটাই অস্বীকার করবে? জননীর মুখের ওপর ছেলে বলবে—না তুমি জননী নও? কুন্তী যত কথা বলবেন বলে ভেবে এসেছিলেন, সেসব কিছুই তিনি বলতে পারেননি। আচমকা নিজের গর্ভধারিণীব ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপ্রস্তুতের মতো আগে বলতে হয়েছে—না-না তুমি রাধার ছেলে নও, তুমি আমার সবার বড় ছেলে, তুমি রাধেয় নও, তুমি পার্থ!

সব গুলিয়ে গেল। ভেবেছিলেন—গুছিয়ে গুছিয়ে দুর্বাসার কথা বলব, সূর্যদেবের কথা বলব, নিজের সমস্যার কথা বলব—কিছুই সেভাবে বলা হল না কুন্তীর, সব গুলিয়ে গেল। এই অবস্থায় নিজেকে সপ্রতিভ দেখানোর জন্য কুন্তীকে নিজের বিশাল জীবনসমস্যার কথা খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে হল। কুন্তী বললেন—আলোকদাতা সূর্যদেব আমারই কুক্ষিতে তোমার জন্ম দিয়েছিলেন। এইরকমই সোনার বর্ম, কানের দুল তোমার জন্ম থেকে। আমার বাবা কুন্তিভোজের অন্দর মহলে তোমার জন্ম দিয়েছিলাম আমি।

কুন্তী খুব তাড়াতাড়ি—কর্ণের দিক থেকে কোনও প্রতিবাদ, কোনও বিরূপতার আগেই বলে ফেললেন—সেই তুমি আমার ছেলে হয়েও নিজের মায়ের পেটের ভাইদের চিনতে পারছ না। উলটে কোন এক অজানা মোহে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের তুমি সেবা করে যাচ্ছ। এই কি ধর্ম বাছা? যে পৃথিবী, যে ধন-সম্পদ অর্জুন জিতে এনেছিল অসাধু লোকেরা সেসব লুটেপুটে নিল, এখন তুমি বাছা আবার সেসব জুটিয়ে এনে নিজেই সব ভোগ করো। লোকে দেখুক—কর্ণ আর অর্জুন এক জায়গায় জুটলে কী হয়, কেমন মাথা নুয়ে যায় সবার—সন্নমন্তামসাধবঃ। কুন্তী ভবিষ্যতের এক অসম্ভবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন—কর্ণ আর অর্জুন এক জায়গায় হলে, ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক বলরাম আর কৃষ্ণের মতো। তোমাদের দু'জনের সংহত শক্তি রুখবে, এমন বুকের পাটা কার বাছা? পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তোমার শোভা হবে যেন দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা। তুমি বাপু আর সারথির ছেলে কথাটা মুখেই এনো না—সূতপুত্রেতি মা শব্দঃ পার্থস্ত্বমসি বীর্যবান্—তুমি আমার ছেলে, তুমি পার্থ।

প্রায় প্রগলভ জননীর ভাষণে কর্ণ একটুও টললেন না। 'তুমি কুন্তী অর্জুনজননী'—এত সব কবিতার পরিণত শ্লেষ মহাভারতে নেই। তবে উতোর-চাপান এখানেও কিছু কম হল না। কর্ণ কুন্তীকে সম্বোধন করলেন মায়ের ডাকে নয়, বললেন—'ক্ষত্রিয়ে'। কথাটার মধ্যে সাংঘাতিক সত্য আছে, পরে আসব সে-কথায়। কর্ণ বললেন—আমাকে জন্মকালেই বিসর্জন দিয়ে যে অন্যায়টি আপনি করেছেন তাতে আব অন্য কোন শত্রু আপনার চেয়ে আমার বেশি অপকার করবে—ত্বৎকৃতে কিন্নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যান্ মমাহিতম্। যে অবস্থায় আমি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার লাভ করে মেজাজে থাকতে পারতাম, সেই অবস্থায় আপনি মায়ের কাজ এতটুকু করেননি, এখন নিজের স্বার্থে আপনি আমাকে খুব ছেলে-ছেলে করছেন—সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী।

কুন্তী এই গালাগালি হজম করে যাচ্ছেন, একটি কথাও তিনি বলছেন না। আর কথাগুলি তো

ঠিকই। কর্ণ বললেন—আজ যদি আমি সব ছেড়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যাই, লোকে আমাকে ভিতু বলবে না ? কোনওদিন আমার ভাই বলে কেউ ছিল না, আজ যদি এই যুদ্ধকালে হঠাৎ পাণ্ডবদের আমি ভাই বলে আবিষ্কার করি, তবে ক্ষত্রিয়জনেরা আমাকে কী বলবে—অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ। কর্ণ দুর্যোধনের অনেক গুণ-গান করলেন। কত সম্মান তিনি দিয়েছেন, কত ভোগসুখ—সবই একে একে বললেন। আর বলতেই বা হবে কেন কুন্তী সেসব জানেন, তিনি তাতে সুখীও ছিলেন। পুত্রের প্রতি মাতার কর্তব্য করা হয়নি বলেই, কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের প্রশ্রয়-গৌরবে তিনি সুখীই ছিলেন। কিন্তু আজ কী হবে ? যুদ্ধ যে লাগবেই, তিনি তা চানও।

ক্ষত্রিয়া রমণীর এই কঠিন হৃদয় কর্ণ জানেন। তিনি বলেছেন—যুধিষ্ঠিরের বাহিনীর মধ্যে অন্য চার ভাইয়ের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে না, আমার যুদ্ধ শুধু অর্জুনের সঙ্গে। হয় সে মরবে আমার হাতে, নয় আমি তার হাতে। তবে আপনার তাতে ক্ষতি নেই কোনও। আপনি পঞ্চপুত্রের জননী, তাই থাকবেন আপনি, আপনি নিরর্জুনা হলে কর্ণ আপনার থাকবে, আর আপনি অকর্ণা হলে অর্জুন আপনার থাকবে—নিরর্জুনা সকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি।

কুন্তী শুনলেন, কর্ণের সব কথা শুনলেন, অন্যায়-ধিক্কার সব শুনে জননীর দায়-প্রত্যাখ্যান—তাও শুনলেন। ক্ষত্রিয় পুত্রদের জননী হিসেবে কুন্তী বুঝলেন কর্ণকে তার শেষ বক্তব্য থেকে নড়ানো যাবে না। ভবিষ্যতের পুত্রশোক তাঁর হৃদয় গ্রাস করল। তিনি আস্তে আস্তে কর্ণের কাছে এলেন। কর্তব্যে স্থির অটল, অনড় কর্ণকে তিনি সারা জীবনের প্রৌঢ় বাসনায় আলিঙ্গন করলেন—উবাচ পুত্রমাশ্লিষ্য কর্ণং ধৈর্যাদকম্পনম্। হয়তো আর হবে না। সেই বালিকা বয়সে পুত্রের জন্মলগ্নে জননীর যে স্নেহ প্রথম ক্ষরিত হয়েছিল, নিরুপায়তার কারণে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল বলে যে শিশুপুত্রটিকে তিনি সজোরে কোলে চেপে ধরেছিলেন, আজ এতদিন পরে সেই ছেলেকে আবারও জড়িয়ে ধরলেন কুন্তী। বুঝলেন—জীবনের ধারায় জননীর কর্তব্য-বন্ধন মুক্ত করে একবার পুত্রকে ভাসতে দিলে সে ভেসেই চলে, সারা জীবন আর তাকে ধরা যায় না, ধরতে চাইলেও, না। কুন্তী তাই জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। আর দেখতে পাই কি না পাই। হয় অর্জুন, নয় কর্ণ—একজন তো যাবেই, যদি কর্ণ যায় তবে সামনা-সামনি একতম পুত্রের সঙ্গে এই শেষ দেখা। কুন্তী কর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন দ্বিতীয়বার।

ক্ষত্রিয় পুত্র যেমন তার সত্য থেকে চ্যুত হল না, ক্ষত্রিয়া রমণীও তেমনই তাঁর ভবিষ্যৎ ভাবনা থেকে সরলেন না। কর্ণকে বললেন—কৌরবদের বিনাশ যাতে হয়, তুমি সেই খেয়ালটা রেখো, বাছা। আমি এত করে তোমায় বোঝালাম, কিন্তু কিছুই হল না। কপালে যা আছে হবে—দৈবন্তু বলবত্তরম্। অর্জুন ছাড়া তাঁর অন্য চার ছেলের দুর্বলতা কুন্তী জানেন, অতএব যুদ্ধকালে এই চারজনের যাতে ক্ষতি না হয়, সে-কথা তিনি আবারও মনে করিয়ে দিলেন কর্ণকে ; কেন না, কর্ণও কথা দিয়েছিলেন তিনি অর্জুন ছাড়া আর কারও ক্ষতি করবেন না। মহাভারতের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ শেষ হল অদ্ভুত সৌজন্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কুন্তী বললেন—মঙ্গল হোক তোমার বাছা, সুস্থ থাকুক তোমার শরীর। উত্তরে কর্ণও বললেন একই কথা। যে আবেগ সারা জীবন ধরে কুন্তী জমা করে রেখেছিলেন কর্ণের জন্য, তা উপযুক্ত ভাবে মুক্ত হল না পাত্রের কাঠিন্যে। কুন্তী যখন জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে তখন ব্যাস তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন 'অকম্পনম্'। হয়তো কর্ণের এই বিশেষণ তাঁর অনড় অকম্প স্বভাবের জন্যই।

১১

একটা কথা করজোড়ে নিবেদন করি। আমি আগে বারংবার বলেছি কুন্তী তাঁর শৈশব থেকেই এক কঠিন মনস্তত্ত্বের শিকার। তার মধ্যে কন্যা অবস্থায় এক শিশুপুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবং উপর্যুপরি স্বামীর কাছে, পুত্রদের কাছে সেই পুত্রের জন্মকথা চেপে গিয়ে কুন্তীর মনের মধ্যে এমন

এক জটিল আবর্ত তৈরি হয়েছিল যা তাঁর মনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছে। স্ত্রীলোকের জীবন-আরম্ভ যাকে বলে, সেই আরম্ভের পূর্বেও কুন্তীর এই যে বিধিবহির্ভূত পুত্রলাভ, সেই পুত্র তাঁর জীবনের প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ এবং শেষ ভাগেও অন্তর্দাহ তৈরি করে গেছে।

আমরা কর্ণকুন্তীর সংলাপে এখনই যে পর্যায়টুকু শেষ করলাম, এটাকে মধ্যভাগের শেষ পর্যায় বলা যায়। বলতে পারেন—কর্ণের কথা স্বামীকে তিনি বলেননি, কিন্তু বশংবদ পুত্রদের তিনি বলতেই পারতেন। আমরা বলি—কুন্তী এটাকে নিজের কলঙ্ক বলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ফলে স্বামীকে তিনি বলেননি আর স্বামীর মৃত্যুর পরেও এমন কিছু ঘটেনি যাতে করে লজ্জা ত্যাগ করে ছেলেদের সে-কথা বলা যায়। 'এমন কিছু' বলতে আপনারা কুন্তীর শাশুড়ি সত্যবতীর কথা স্মরণ করতে পারেন। কন্যা অবস্থায় তাঁর পুত্র হলেন স্বয়ং মহামুনি ব্যাস। কিন্তু মৎস্যগন্ধা সত্যবতী শান্তনুকে ব্যাসের কথা কিছুই বলেননি, ছেলেদেরও বলেননি। কিন্তু কুরুবংশ যখন লোপ হয়ে যেতে বসল, তখন মাত্র সত্যবতী পুত্রকল্প ভীষ্মের কাছে ব্যাসের কথা প্রস্তাব করেন কুরুবংশের রক্ষাকল্পে। তাই বলেছি, তেমন কিছু হয়নি যে, কুন্তীকে বলতে হবে। বিশেষত এ সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাই হল চেপে যাওয়া।

বলা যেতে পারে, এখন এই বিশাল ভারত-যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে কুন্তী ছেলেদের কাছে কর্ণের কথা বলতে পারতেন ; পাণ্ডব-কৌরবদের যুদ্ধটাই তা হলে লাগত না, হত না অজস্র লোকক্ষয়। কারণ পরের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারব যে, মহামতি যুধিষ্ঠির মায়ের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—আগে যদি জানতাম কর্ণ আমাদের বড় ভাই, তা হলে লোকক্ষয়ী যুদ্ধ হত না।—আলবত জানি, যুধিষ্ঠির যা চাইতেন, কুন্তী তা চাইতেন না। এখানে সেই ক্ষত্রিয়া রমণীর বিচারটুকু মাথায় রাখতে হবে।

মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ বাঙালির স্নেহ, মায়া আর মমতার মৃদুতায় তৈরি। এই চিত্র-কবিতায় কর্ণ যতবার কুন্তীকে মা-মা করে ডেকেছেন, মূল মহাভারতে তা একবারও ডাকেননি। কর্ণ কুন্তীকে চিনতেন বলেই তাঁকে প্রথম সম্বোধন করেছেন—'ক্ষত্রিয়া' বলে। অন্যত্র আরও কৃত্রিমভাবে—'যশস্বিনী' বলে, 'আপনি' বলে। বস্তুত ক্ষত্রিয়া রমণীর হৃদয় বাংলার শ্যাম-শীতল নদী আর অন্নের মৃদুতা দিয়ে গড়া নয়। যতদিন কর্ণ দুর্যোধনের ভোগচ্ছায়ায় সুখী ছিলেন, কুন্তীরও ততদিন কিছু বলার ছিল না, কেন না ছেলের এই সুখ তাঁর অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি বুঝলেন তাঁরই ছেলের শক্তিকে উপজীব্য করে দুর্যোধনেরা তাঁর অন্য ছেলেদের বঞ্চিত করছে, সেদিন থেকেই তাঁর হৃদয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। বিশেষত কুরুসভায় দ্রৌপদীর চরম অপমানের পর কর্ণকে নামত দায়ী করতেও কুন্তীর বাধেনি। ক্ষত্রিয়া রমণী নিজ পুত্রের অন্যায় সহ্য করে না।

শেষ কথাটা হল—শ্বশুরকুলের বৃদ্ধ-জনেরা তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। পাণ্ডু মারা যাবার পর রাজরানির সম্মান তাঁর দূরে থাক, কুরুবাড়িতে তাঁকে থাকতে হয়েছে ভিখারির মতো। উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রদের প্রাপ্য ভাগও তিনি পাননি। উপরন্তু জুটেছে অপমান। নিজের অপমান, পুত্রবধূর অপমান। এর পরে বিদুলার জবানিতে, পুত্রদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন কুন্তী। যে রমণী সারা জীবনের অপমানের শোধ নেওয়ার জন্য প্রিয় পুত্রদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতে পারেন, তিনি এখন হঠাৎ কর্ণকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে ঘোষণা করে যুদ্ধের আগুনে ছাই চাপা দেবেন, এমন মৃদুলা রমণী কুন্তী নন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—কর্ণকে বড় ভাই জানলে যুদ্ধ করতাম না। আর কুন্তী বলেছিলেন—বাবা তুমিও পাণ্ডবপক্ষে এসো, কৌরবদের বিনাশ করো, যুদ্ধ করো।

অর্থাৎ যুদ্ধ করতেই হবে, ক্ষত্রিয়া রমণীর এই কাঠিন্যের মধ্যে যথাসম্ভব করুণার মতো যেটা কর্ণের জন্য করা সম্ভব, কুন্তী তাই করেছেন। আসলে তাঁর ঈর্ষা হচ্ছিল—আরে আমারই ছেলে ওটা, তার কাঁধে বন্দুক রেখে তোরা যুদ্ধ করবি ? কর্ণ নিজেই কুন্তীকে বলেছেন—আমাকে নৌকোর মতো আশ্রয় করে কৌরবরা এই যুদ্ধসাগর পার হবেন—ময়া প্লবেন সংগ্রামং তিতীর্ষন্তি দুরত্যয়ম্। কুন্তীর ঈর্ষা—তোরা যুদ্ধ করবি, কর না, কিন্তু আমার ছেলেটাকে নৌকো ঠাউরেছিস কেন ? তুই বাবা চলে

আয় তো এই ধারে, দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, দেখুক চেয়ে চেয়ে কৌরব-ঠাকুরেরা—অদ্য পশ্যন্তু কুরবঃ কর্ণার্জুনসমাগমম্।

ঠিক এই বুদ্ধি নিয়েই কুন্তী গিয়েছিলেন কর্ণের কাছে। অন্তরের এই মুখ্য ধারার তলায় তলায় ছিল সারা জীবনের পাপবোধ, পুত্রের প্রতি মায়ের কর্তব্য পালন করার দায় এবং অন্য মানসিক জটিলতা। কিন্তু যে মুহূর্তে কর্ণ তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি পুনরায় কঠিন সেই ক্ষত্রিয়া রমণী। অন্তরের স্নেহধারা বয়ে চলল অন্তরের পথেই। সম্পূর্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ধরে একবারের তরেও কুন্তীর দিকে নেত্রপাত করেননি মহাভারতের কবি। শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য—সব রথী-মহারথীরা যুদ্ধভূমিতে শয্যা গ্রহণ করছেন। কুন্তীর সম্বন্ধে কথাটি নেই কবির মুখে। হয়তো অন্তরালে বসে বসে এই বিভ্রান্ত জননী নক্ষত্রের আলোকে ঘোর যুদ্ধফল পাঠ করছিলেন—এক জন তো যাবেই, হয় কর্ণ, নয় অর্জুন। মহাভারতের কবি যে মুহূর্তে আবারও তাঁর চিত্রপটে কুন্তীর ছবি আঁকলেন, সেই কুন্তীর সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব কুন্তীর কোথায় যেন এক গভীর যোগসূত্র আছে।

যুদ্ধের আগে প্রথম পুত্র কর্ণকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন কুন্তী। কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর যুদ্ধের পরে আবারও যখন আমরা কুন্তীর দেখা পেলাম, তখন কর্ণ মারা গেছেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলেছিল মাত্র আঠারো দিন। কুন্তী যখন কর্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ চলছে। অর্থাৎ আঠারো দিন নাই হোক, মাত্র কুড়ি-বাইশ দিন আগে যে পুত্রের সঙ্গে দেখা করে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরেছিলেন কুন্তী, এখন সে মারা গেছে। কুন্তীকে আমরা যুদ্ধজয়ী পাণ্ডবপক্ষের পুত্রগর্বিণী রাজমাতার মতো দেখতে পেলাম না। দেখলাম বিজিত কৌরবপক্ষের স্বামীহারা, পুত্রহারা হাজারো রমণীদের সঙ্গে একাকার, বিষণ্ণা, হাহাকারে সমদুঃখিতা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যতখানি রোমাঞ্চকর ছিল, যুদ্ধোত্তর কুরুক্ষেত্র ছিল ততখানিই করুণ। এমন কেউ ছিল না, যার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব একজনও মারা যায়নি। যুদ্ধ জয় করে পঞ্চপাণ্ডব বেঁচেছিলেন বটে, তবে তারাও পুত্র হারিয়েছেন, আত্মীয়-কুটুম্ব অনেককেই হারিয়েছেন। আরও যা হারিয়েছেন তা তখনও জানতেন না। যুদ্ধশেষের পর যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে প্রথম গান্ধারীর কাছে গেছেন, কারণ তাঁর একটি সন্তানও বেঁচে নেই। তা ছাড়া 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে'—সেই নিয়মে ভবিষ্যতের রাজা যুধিষ্ঠির আপন কর্তব্য পালন করে তারপর এসেছেন মায়ের কাছে। দ্রৌপদীও রয়েছেন সেখানেই।

ছেলেরা পাঁচ পাণ্ডবভাইরা মায়ের কাছে এলেন—শুধু এইটুকু বলেই মহাভারতের কবি তুষ্ট হলেন না, বললেন—মাতরং বীরমাতরম্—শুধু মায়ের কাছেই নয়, বীরমাতার কাছে। মনে পড়ে কুন্তীর উত্তেজনা—যে সময়ের জন্য ক্ষত্রিয় কামিনীরা সন্তান পেটে ধরে, অর্জুন—সেই সময় এখন এসে গেছে। ব্যাসকে তাই লিখতে হল—সংগ্রামজয়ী বীরপুত্রের জননীর কাছে ফিরে এল তার পুত্রেরা—মাতরং বীরমাতরম্। কতক্ষণ ধরে কুন্তী চেয়ে থাকলেন পুত্রদের মুখের দিকে, কতক্ষণ ? নিশ্চয়ই মনে হল—আরও একজন যদি থাকত ! প্রিয়পুত্রেরা যুদ্ধ করতে গিয়ে কত কষ্ট পেয়েছে, এই যন্ত্রণা যুদ্ধ জয়ের থেকেও এখন পীড়া দিতে থাকল কুন্তীকে। যুদ্ধজয়ের অন্তিম মুহূর্তে কঠিনা ক্ষত্রিয়া রমণী পরিণত হয়েছেন সাধারণী জননীতে।

আনন্দের পরিবর্তে কুন্তীর চোখ ভরে জল এল। এক ছেলে মারা গেছে—সে দুঃখ কেঁদে জানাবারও উপায় নেই তাঁর। কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন কুন্তী—বাষ্পমাহারয়দ্দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্। প্রিয় পুত্রদের প্রত্যেকের ক্ষতস্থানে বার বার হাত দিয়ে জননীর স্নেহ-প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন তিনি। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের শোক ভুলতে চাইলেন জীবিতদের গায়ে হাত বুলিয়ে। স্বামীদের দেখে দ্রৌপদীর দুঃখ তীব্রতর হল। কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি বললেন—মা ! সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু, আপনার অন্য নাতিরা সব কোথায় গেল ? কই, আজকে তারা তো কেউ এল না আপনার কাছে। আমার ছেলেরা কেউ বেঁচে রইল না, আর আমি এই রাজ্য দিয়ে কী করব—কিংনু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।

কুন্তী আবারও একাত্ম হলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে। দ্রৌপদী তো আর জানেন না যে, তাঁর মতো কুন্তীও আজ পুত্রহারা। সমদুঃখের মর্যাদায় কুন্তী পুত্রবধূকে মাটি থেকে ওঠালেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন মায়ের স্নেহে, সন্তানহারার একাত্মতায়। সবাইকে নিয়ে তিনি চললেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর কাছে। বুঝলেন—যে জননী তার একশোটি পুত্র হারিয়েছে, তার যন্ত্রণা সকলের কষ্ট লঘু করে দেবে। গান্ধারীর দুঃখে কুন্তী নিজে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করলেন।

কুরুরমণীদের সবাইকে নিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত হয়েছেন গঙ্গার ঘাটে। আছেন গান্ধারী, আছেন কুন্তী। পাণ্ডবরা এসেছেন জননীর সঙ্গে। কুরুবাড়ির পুত্রবধূরা জলে নেমে তর্পণ করছেন। এমন সময় মনে মনে বিপর্যস্ত কুন্তী চোখের জলে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের উদ্দেশে বললেন—যে মহাবীরকে সকলে সারথির ছেলে বলে ভাবত, সবাই যাকে জানত রাধার ছেলে সেই কর্ণ তোমাদের সবার বড় ভাই। সৈন্যদলের মধ্যে যাকে দেখতে লাগত সূর্যের মতো, দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর যে ছিল নেতা, যার মতো বীর এই তিন ভুবনে আর দ্বিতীয়টি নেই—যস্য নাস্তি সমো বীর্যে পৃথিব্যামপি কশ্চন—সেই কর্ণ তোমাদের বড় ভাই। এই বিরাট যুদ্ধে সে অর্জুনের হাতে মারা গেছে, তার জন্য এক অঞ্জলি জল দিয়ে গঙ্গায় তর্পণ করিস তোরা। সে তোদের বড় ভাই, সূর্যের ঔরসে আমারই গর্ভে তাব জন্ম হয়েছিল তোদেরও অনেক আগে—স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত।

পাণ্ডবরা হঠাৎ করে প্রায় অসম্ভব এই নতুন খবর শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। কর্ণের জন্য তাঁদের দুঃখ ভ্রাতৃসম্বন্ধের নৈকট্যে তীব্রতর এবং আন্তরিক হয়ে উঠল। যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে পর্যন্ত স্থির থাকেন, তিনি রাগে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে মায়ের কাছে তাঁর প্রথম পুত্রজন্মের সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি শুনতে চাইলেন। মায়ের সঙ্গে যুধিষ্ঠির কখনও এই ব্যবহার করেননি। কিন্তু কুন্তী ওই একবারই যা বলেছেন, তিনি বারবার এক কথা বলেন না। যুধিষ্ঠির মনে আকুল, মুখেও গজর গজর করতে থাকলেন। বার বার বলতে থাকলেন—এ কী আক্কেল তোমার, সব কথা চেপে থাকার জন্য আজ তোমার জন্য আমরা মরলাম—অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গ্রহণেন বয়ং হতাঃ। আগে বললে এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধ হত না, কর্ণ পাশে থাকলে এই পৃথিবীতে কী আমাদের অপ্রাপ্য ছিল—এইরকম নানা সম্ভাবিত সৌভাগ্যের কথা বলে ধর্মরাজ দুষতে লাগলেন কুন্তীকে। কুন্তী এ-কথারও জবাব দিলেন না। ভাবটা এই—আমার ছেলে মারা যেতে আমার যে কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট তোমাদের ভাইদের হতে পারে না বাছা। যুধিষ্ঠির সাময়িক শ্রাদ্ধ-তর্পণ সেরে চলে এলেন বটে। কিন্তু এর কাছে তার কাছে মায়ের এই রহস্য-গোপনের কথা এবং ভ্রাতৃহত্যার শোক বারংবার বলেই চললেন। তবু কুন্তী কিছু বললেন না।

যুধিষ্ঠির কর্ণের নানা খবর পেলেন মহর্ষি নারদের কাছে। গভীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাকলেন অন্তরে। কুন্তী এবার প্রয়োজন বোধ করলেন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলার। বোঝাতে চাইলেন—তোমার দুঃখের চাইতে আমার দুঃখ কিছু কম নয় বাছা। বললেন—কেঁদো না, মন দিয়ে শোনো আমার কথা—জহি শোকং মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চেদং বচো মম। আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেক। তোমরা যে তার ভাই—এ-কথা আমি অনেক করে বলেছিলাম তাকে। আর শুধু আমি কেন, তার জন্মদাতা পিতা সূর্যদেবও তাকে আমারই মতো করে বুঝিয়েছেন। ভগবান সূর্যদেব এবং আমি অনেক যত্নে, অনেক অনুনয় করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাকে না পেরেছি বোঝাতে, না পেরেছি তোমাদের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে। মেলা তো দূরের কথা, সে তোমাদের ব্যাপারে আরও প্রতিকূল হয়ে উঠল। আমিও দেখলাম—যাকে বুঝিয়ে শাম্য করা যাবে না, তাকে উপেক্ষা করাই ভাল। আমি তাই করেছি—প্রতীপকারী যুস্মাকম্ ইতি চোপেক্ষিতো ময়া।

কুন্তীর এই স্বীকারোক্তির পরেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে ছাড়েননি। কেন তিনি আগে বলেননি কর্ণের গোপন জন্ম-কথা—এই কারণে অনেক গালাগাল অনেক শাপ-শাপান্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে শুনতে হল কুন্তীকে। যুধিষ্ঠির বুঝলেন না—প্রথম পুত্রের মৃত্যুতে অন্য পুত্রদের যুদ্ধ-জয় কুন্তীর কাছে তিক্ত হয়ে গেছে। তাঁর নিশ্চয়ই মনে পড়ে আপন পুত্রবধূর সেই স্মরণীয় বিলাপের ভাষা—আমার

ছেলেরা বেঁচে নেই, এই রাজ্য দিয়ে আমি কী করব—কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।
কুন্তী এখন নির্বিঘ্ন, নিরাসক্ত এক বিশাল বৈরাগ্যের জন্য অপেক্ষমান।

দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধ কুন্তীও চেয়েছিলেন, দ্রৌপদীও চেয়েছিলেন। যুদ্ধের জন্য উত্তেজনা তৈরি করার ব্যাপারে দ্রৌপদী যতখানি মুখরা ছিলেন, কুন্তীও ঠিক ততটাই। যুদ্ধ লাগলে আত্মীয়, পরিজন, এমনকী প্রিয় পুত্রদেরও কারও না কারও মৃত্যু হতে পারে—এই সত্য তাঁদের জানা ছিল। তবু শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ দুজনেই যুদ্ধ চেয়েছেন অন্যায়কারী কৌরবদের শাস্তির জন্য। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ধীরে চলার নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে বলেছিলেন—এত অপমানের পরেও যদি তোমরা চুপ করে বসে থাক, তবে থাক, যুদ্ধ করবে আমার বাপ-ভাই, যুদ্ধ করবে আমার ছেলেরা, আর তাদের নেতা হবে অভিমন্যু। আর কুন্তী কৌরবদের শাস্তির জন্য ছেলেদের বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন, যে উপাখ্যানের বিষয়বস্তু—ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা যুদ্ধ অথবা মৃত্যুভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। তারা হয় মরে, নয়তো প্রতিশোধ নেয়। কুন্তী-বিদুলার প্রসঙ্গ পরে আরও একবার স্মরণ করতে হবে আমাদের।

শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ—দুজনেরই এই উত্তেজনার পর তাঁদের এই পুত্রশোক মহাভারতের পাঠকদের কেমন যেন সংশয়িত করে তোলে, তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার পথ যেন রুদ্ধ করে দেয়। বস্তুত এইখানেই ক্ষত্রিয়া রমণী এবং জননীর বিচার। কুন্তীর শ্বশুরকুল, বিশেষত কুরুজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং পুত্রবধূর ওপর যে অন্যায় চালিয়ে গেছেন, তার প্রতিবিধান করাটা কুন্তী এবং দ্রৌপদীর কাছে অনিবার্য ছিল, কারণ স্ত্রীলোক এবং শ্বশুর-ভাশুরের রক্ষণীয়া হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যে অপমান সয়েছেন, সে অপমান বোধহয় পাণ্ডবরাও সননি। কাজেই ক্ষত্রিয়া রমণী হিসেবে একজন পুত্রদের, অন্যজন স্বামীদের যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছেন। সেই প্ররোচনা যেমন সত্য, আবার এখন পুত্রদের মৃত্যুতে এই দু'জনের কষ্টও ততটাই সত্য। জ্ঞাতি-বান্ধব এবং অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর পর দ্রৌপদী রাজরানি হয়ে তবু যতটুকু সুখী হয়েছেন, কুন্তীর মনে কিন্তু রাজমাতা হওয়ার সুখ একটুও নেই। কারণ কুন্তীর বয়স হয়েছে, তিনি সংসারে নির্বিঘ্ন হয়ে উঠেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—শ্বশুর-ভাশুর ধৃতরাষ্ট্রের ওপর যে কুন্তীর এত রাগ ছিল, পুত্রদের যুদ্ধজয়ের পর সেই কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর ছেলেরা নিযুক্ত হল ধৃতরাষ্ট্রের সেবায়। আরেকভাবে বলা যায় কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের সুখকামনাতেই আত্মনিয়োগ করলেন। পাণ্ডবরা, বিশেষত মহারাজ যুধিষ্ঠির যা কিছু করতেন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়েই করতেন, আর এদিকে কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের আত্ম-প্রতিনিধি গান্ধারীর কাজে এমনভাবে নিজেকে নিয়োগ করলেন, যাতে মনে হবে তিনি যেন পুত্রবধূ, স্বামীর পরিজনদের সেবায় নিমগ্ন।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগচী মশাই কুন্তীর এই ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই মুখ্যত কুন্তী-চরিত্রের মাহাত্ম্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কুন্তী-চরিত্রের এইটাই 'ফোকাল পয়েন্ট'। কুন্তীর মৃত্যু পর্যন্ত এই ব্যবহারের ব্যাপ্তি। তাঁর মতে কুন্তী স্বামীর ঘর বেশিদিন করতে পারেননি, স্বামী-সেবা যাকে বলে এবং যা নাকি সেকালে স্ত্রীলোকের অন্যতম ধর্ম ছিল, নানা কারণে সেই সেবা-সৌভাগ্যও কুন্তীর কপালে জোটেনি। এখন পুত্রহীন এই বৃদ্ধদম্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে কুন্তী তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর সতীত্ব এখানেই, এইখানেই তাঁর সার্থকতা এবং হয়তো বা এই কারণেই পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার মধ্যে কুন্তীর নাম—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।

মহামহোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমার মাথায় রেখে সবিনয়ে জানাই কুন্তীর সতীত্ব নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নই। এমনকী চিন্তিত নই বৈষ্ণবরা যে কারণে কুন্তী সহ ওই রমণীকে সতী-পাতকনাশিনী বলেছেন, তাই নিয়েও। বৈষ্ণবরা বলেন, এই পঞ্চকন্যাই ভগবানকে স্বশরীরে—কেউ রাম-রূপে, কেউ কৃষ্ণ-রূপে দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁরা পাতকনাশিনী সতী। বললাম তো যে ভাবেই হোক এই মাহাত্ম্য নিয়েও আমি চিন্তিত নই। কথাটা হল—কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র

এবং গান্ধারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন প্রায় পুত্রবধূর অভিমানে—কুন্তিভোজসুতা চৈব গান্ধারীমন্ববর্তত। কেন?

এবার একটা ফালতু কথা বলি। গুণিজনে আমার অপরাধ নেবেন না। ভিড় বাসে একটি সিট খালি হয়েছে। সেই খালি আসনের সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তির দাঁড়াবার কায়দা, তাৎক্ষণিক শারীরিক সংস্থান এবং তৎপরতার কারণে আসনটি কারও কাছে প্রাপ্য হয়, এবং অন্য কারও কাছে প্রাপ্য হয় না। কিন্তু আসনটি অপ্রাপ্য হলেও ক্বচিৎ কেউ শারীরিক নিপুণতা, তৎপরতা এবং বলিষ্ঠতায় সেইখানে বসে পড়ে। তখন ঝগড়া লাগে। আসনটি যার প্রাপ্য স্বাভাবিক কারণেই সে অন্যান্য যুক্তিবাদীদের সমর্থনে এবং ন্যায়তই তর্কে জিতে যায়। অন্যায়ী অনধিকারী তখন আসন ছেড়ে উঠতে চায় এবং অধিকারী ব্যক্তি তখন বদান্য হয়ে বলেন—আরে ছি ছি, বসুন, আপনিই বসুন, একবার শুধু বললেই হত, এই তো দু-মিনিটের মামলা, সবাই তো নেমে যাব। অপ্রস্তুত অনধিকারী তখন সেই আসনে বসতে বাধ্য হন, এবং যতক্ষণ বসে থাকেন ততক্ষণ আপন অপ্রাপ্য অধিকারে মানসিকভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকেন।

এখানেও তাই। পাণ্ডু ছিলেন রাজ্যের নির্বাচিত অধিকারী। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর রাজ্যে বসে পড়েছিলেন। যুদ্ধ হল। যুদ্ধে পাণ্ডুর প্রতিনিধিরা জিতলেন। জিতে বললেন—জ্যাঠামশাই! আপনিই রাজা। আপনি যা বলবেন, আমরা তাই করব—ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য পৃথিবীং পর্যপালয়ন্। ভিড় বাসে সেই অধিকারীর বদান্যতায় অনধিকারী যেমন শারীরিকভাবে উঠতেও পারে না, আবার মানসিকভাবে বসতেও পারে না, ধৃতরাষ্ট্রও সেইভাবেই পনেরো বছরে কাটালেন। আর কুন্তী! যে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় আচরণে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, তিনি যে এত এখন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অনুগতা হয়ে পড়লেন, তার কারণ নৈতিকভাবে তাঁর জয় হয়ে গেছে। বিজয়িনীর নম্রতার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই, বরং মাহাত্ম্য আছে। অধিকন্তু একশত পুত্রের মৃত্যুতে যে জনকজননী শোক-ক্লিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের গৌরবে প্রতিষ্ঠা করে নিজে নত হওয়ার মধ্যেও বিজয়িনীর মাহাত্ম্য আছে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়া মহিষীর অসংখ্য সেবা করে, বশংবদ হয়ে কুন্তী যেমন একদিকে তাঁদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে ছিল তাঁর স্বাধিকারের বদান্যতা—তুমি আমার অধিকার স্বীকার করেছ, বাস্, ঠিক আছে, তুমিই বসে থাক রাজার আসনে, আমি নির্বিঘ্ন, আমি সিদ্ধকাম।

এই সিদ্ধকাম অবস্থাতেই কুন্তীর বৈরাগ্য এসেছে। তাছাড়া পনেরো বছর ধরে এই অন্ধ ভাশুর এবং তাঁর পুত্রহীনা পত্নীর সঙ্গে থেকে থেকে কুন্তীও ভোগসুখে নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে যথাসম্ভবের থেকেও বেশি সম্মান দিয়ে চলতেন। বিলাস, ভোগ-সুখ এবং মর্যাদা কোনওটাই ধৃতরাষ্ট্র কম পাননি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে। তবে এই সব কিছুর মধ্যে ক্ষুদ্র কণ্টকের মতো একটি মাত্র বস্তুই ধৃতরাষ্ট্রকে বিদ্ধ করত। সবাইকে লুকিয়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীম মাঝে মাঝে গঞ্জনা দিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এ ঘটনা যুধিষ্ঠির, অর্জুন অথবা দ্রৌপদী-কুন্তী কেউই জানতেন না। ধৃতরাষ্ট্রও কাউকে বলেননি।

পনেরো বছর যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে সুখবাস করে ধৃতরাষ্ট্র এবার বনে যাবার জন্য তৈরি হলেন। বানপ্রস্থের সময় ধরলে ধৃতরাষ্ট্রের একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, তিনি যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। ইচ্ছে—বাকি জীবন সাধন, তপস্যায় কাটিয়ে দেওয়া। যেদিন গান্ধারীকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রওনা দিলেন বনের উদ্দেশে, সেদিন রাজ্যের যত নর-নারী রাস্তায় ভেঙে পড়ল তাঁদের দেখতে। বৃদ্ধ রাজা বনে যাচ্ছেন, গান্ধারী বনে যাচ্ছেন, পাণ্ডবরা সবাই তাঁদের পেছন পেছন চলেছেন। কুন্তীও চলেছেন চোখ-বাঁধা গান্ধারীর হাত ধরে। হস্তিনাপুরের সিংহদ্বার ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছেন তাঁরা। পুরবাসীরা ফিরে গেছে অনেক আগেই। এবার যুধিষ্ঠিরও ফিরবেন। আর কত দূরই বা যাবেন তিনি। ধৃতরাষ্ট্রও বার বার বলছেন—এবার ফিরে যাও বাছা, আর কত দূর যাবে তুমি, যাও যাও।

গান্ধারীর হাত-ধরা কুন্তীকে যুধিষ্ঠির এবার বললেন—আপনি এবার ফিরে যান মা, আমি মহারাজ

ধৃতরাষ্ট্রকে আরও খানিকটা এগিয়ে দিই—অহং রাজানমন্বিয্যে ভবতী বিনিবর্ততাম্। যুধিষ্ঠির বললেন—ঘরের বউরাও সব রয়ে গেছে, আপনি এবার তাদের নিয়ে ফিরে যান। আমি আরও কিছু দূর যাই মহারাজের সঙ্গে। যুধিষ্ঠিরের এই কথার পর গান্ধারীর হাতটি আরও শক্ত করে ধরলেন কুন্তী। চোখে তাঁর জল এল। তবু একেবারে আকস্মিকভাবে, যুধিষ্ঠিরের একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কুন্তী বললেন—আমার সহদেবকে যেন কখনও বকাঝকা কোরো না বাছা। সে বড় ভাল ছেলে, যেমন আমায় ভালবাসে, তেমনই তোমাকেও। তাকে সব সময় দেখে রেখো।

যুধিষ্ঠির কিছু বুঝতেও পারেননি। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে পৌঁছতে নয়, কুন্তীও যে তাঁদের সঙ্গে চলেছেন সব ছেড়ে, কিচ্ছুটি না বলে—সে-কথা যুধিষ্ঠির কিছু বুঝতেই পারেননি। কুন্তী এবার বললেন—আর তোমাদের বড় ভাই কর্ণকে সব সময় স্মরণে রেখো বাবা। আমারই দুর্বুদ্ধিতে তাকে একদিন আমি প্রতিপক্ষে থেকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আর দেখো, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি। নইলে কর্ণকে না দেখেও এখনও যে সে হৃদয় আমার খান খান হয়ে যায়নি, তাতে বুঝি এ একেবারে লোহা। ব্যাপারগুলো এমনই হয়েছিল, আমার পক্ষে আরও ভাল করে কী-ই বা করা সম্ভব ছিল, বাছা। তবু সব দোষ আমারই, কেন না আমি কর্ণের সব কথা তোমাদের কাছে খুলে বলিনি—মম দোষো'য়মত্যর্থং খ্যাপিতো যন্ন সূর্যজঃ।

মনে রাখবেন—এই কথাগুলি কুন্তীর সাফাই গাওয়া নয় অথবা বনে যাবার শেষ মুহূর্তের স্বীকারোক্তিও নয় কিছু। কথাগুলি গভীর অর্থবহ। এই কথাগুলি পরে কুন্তী বলেছিলেন—আমার বাকি জীবন আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবায় কাটিয়ে দিতে চাই—শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী সদা বনে। আগেই বলেছি, মহামহোপাধ্যায় যোগেন বাগচী কুন্তীর এই শ্বশুর-শাশুড়ি শুশ্রূষার মধ্যেই কুন্তীর চরিত্র-মাহাত্ম্য খ্যাপন করতে চেয়েছেন।

মহাজনের এই পদাঙ্কিত পথে আমি যে তেমন করে পা বাড়াতে পারছি না, তার একমাত্র কারণ কর্ণ। আমি আগে বলেছি যে, শৈশবে আপন পিতৃ-মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত কুন্তীর মধ্যে এমনিই এক মানসিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সে জটিলতা আরও বাড়ে কন্যা অবস্থায় তথাকথিত এক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে। বাবা-মার কাছে এ কথা বলতে পারেননি, স্বামীর কাছে বলতে পারেননি, ছেলেদের কাছে তো বলতেই পারেননি। এদিকে শ্বশুরকুল তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে না, অথচ প্রধানত যাঁর ভরসায় তাঁর শ্বশুরকুল তাঁরই প্রতিপক্ষভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, তিনিও তাঁর ছেলে, কর্ণ। তিনি এমনই সত্যসন্ধ যে, তাঁকে বলে কয়েও কিছু করা যায়নি। প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অন্য ছেলেরা এবং কুন্তী পূর্বাহ্নেই জানতে পারছেন—কর্ণ মারা যাবেন।

যে গভীর জটিলতার সূত্রপাত হয়েছিল যৌবনে, যার বৃদ্ধি ঘটেছিল বিধবার সমস্ত জীবনের অন্তর-গুপ্তিতে, সেই জটিলতা কর্ণের মৃত্যুতেও শান্ত হয়নি, বরং তা বেড়েছে। যে যুধিষ্ঠির জীবনে মায়ের মুখের ওপর গলা উঁচু করে কোনওদিন কথা বলেননি, সেই যুধিষ্ঠির রাগে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে জননীকে বলেছেন—তোমার স্বভাব-গুপ্তির জন্য আজ আঘাত পেলাম আমি—ভবত্যা গূঢ়মন্ত্রত্বাৎ পীড়িতো'স্মীত্যুবাচ তাম্। যুধিষ্ঠির জননীকে উদ্দেশ করে সমগ্র নারীজাতিকে শাপ দিয়েছিলেন—মেয়েদের পেটে কোনও কথা থাকবে না—সর্বলোকেষু যোষিতঃ ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তি।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তর দেননি, প্রতিবাদ করেননি, আপন মনে বকবকও করেননি। যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বুঝি তখনও চেনেননি। আমি হলফ করে বলতে পারি—মেয়েদের পেটে কথা না থাকার অভিশাপ শত কোটি প্রগলভা রমণীর অন্তরে যতই ক্রিয়া করুক, মনস্বিনী কুন্তীর তাতে কিছুই হয়নি। এই যে রাজ্য-পাওয়া বড় ছেলে গলা উঁচু করে কর্ণের ব্যাপার নিয়ে অত বড় কথাটা বলল, তার প্রতিক্রিয়া কুন্তী মনের মধ্যে চেপেই ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য পাওয়া মাত্রই তিনি রাজমাতার যোগ্য বিলাস ছেড়ে মন দিয়েছিলেন শ্বশুরকল্প ধৃতরাষ্ট্রের সেবায়। যুধিষ্ঠির বুঝতেও পারেননি নিস্তরঙ্গভাবে পুত্রদের দেওয়া ভোগ-সুখ থেকে অবসর নিলেন কুন্তী। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে দিনের পর দিন অন্তরে বৈরাগ্য সাধন করার ফলেই এত সহজে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বনে যাওয়ার

ব্যাপারে। জলপান বা ভাত খাওয়ার মতো অতি সহজেই তিনি বলতে পারছেন—আমিও গান্ধারীর সঙ্গেই বনে থাকব বলে ঠিক করেছি।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই সহজ প্রস্থানের পথে তিনি আবারও সেই কর্ণের প্রসঙ্গ তুলছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, এমন একটা প্রসঙ্গ যা নিয়ে পুত্রের কাছে তিনি উচ্চৈঃস্বরে অভিযুক্ত হয়েছিলেন একদা পনেরো বছর আগে। কুন্তী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেননি, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাশী কিংবা বনে যাননি। কিন্তু পনেরো বছর তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে রেখেছেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া চেপে রেখেছেন নিপুণভাবে। যাবার আগে শুধু জবাবদিহির মতো করে কথাটা আবারও তুলছেন কুন্তী। বলেছেন—আমার হৃদয়টা লোহার মতো বাবা, নইলে কর্ণের মরণ সয়েও বেঁচে রইলাম কী করে? তবে ঘটনার প্রবাহ ছিল এমনই যে, আমি কী বা করতে পারতাম সেখানে—এবং গতে তু কিং শক্যং ময়া কর্তুম্, অরিন্দম।

কথাটার মধ্যে পনেরো বছরের অর্ন্তদাহ আছে, অভিমান আছে, জবাবদিহিও আছে। যুধিষ্ঠিরের কথাটা যে তিনি সেদিন মেনে নিতে পারেননি, তারই উত্তর দিচ্ছেন আজ পনেরো বছর পরে, বানপ্রস্থে যাবার পথে। অথচ বলার মধ্যে সহজ ভাবটা দেখবার মতো—সবই আমার দোষ, বাছা। তুমি ভাইদের নিয়ে তোমার বড় ভাই কর্ণের কথা সব সময় স্মরণে রেখো। তার মৃত্যু উপলক্ষ করে দান-ধ্যান কোরো।

কুন্তীর যাত্রা এবং বক্তব্যের আকস্মিকতায় যুধিষ্ঠির হতচকিত হয়ে গেছেন। তিনি কথাই বলতে পারছেন না—ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ। পনেরো বছর আগে বলা কথার জবাবটা যে এইভাবে মায়ের বনবাস-যাত্রার মুখে এমন হঠাৎ করে ফিরে আসবে—এ তিনি ধারণাই করতে পারছেন না। কথা আরম্ভ করার জন্য তাঁকে ভাবতে হল এক মিনিট—মুহূর্তমিব তু ধ্যাত্বা। দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে তিনি উত্তর দিলেন—এ তুমি কী বলছ মা! এ তুমি নিজে নিজে কী ঠিক করেছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি—ন ত্বামভ্যনুজানামি প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

মুহূর্তের মধ্যে যুধিষ্ঠির গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। বললেন—মা! তুমিই না এক সময়ে আমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলে? বিদুলার গল্প বলে তুমিই যেখানে আমাদের এত উৎসাহ দিয়েছিলে, সেই তুমি কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না—বিদুলায়া বাচোভিস্ত্বৎ নাস্মান্ সন্ত্যক্তুমর্হসি। কৃষ্ণের কাছে তোমারই বুদ্ধি পেয়ে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, রাজ্যও পেয়েছি তোমারই বুদ্ধিতে। সে বুদ্ধি এখন কোথায় গেল মা? আমাদের এত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম উপদেশ দিয়ে এখন তুমি নিজেই তো সেই ধর্মের চ্যুতি ঘটাচ্ছ। আমাদের ছেড়ে, এই রাজ্য ছেড়ে, তোমার পুত্রবধূকে ছেড়ে কোথায় তুমি বনের মধ্যে গিয়ে থাকবে?

ছেলের কান্না-মাখা কথা শুনে কুন্তীর চোখে জল এল। তবু তিনি চলতে লাগলেন গান্ধারীর সঙ্গে। কুন্তীও কোনও কথার উত্তর দিলেন না দেখে ভীম ভাবলেন—মা বুঝি একটু নরম হয়েছেন। ভীম বললেন—তোমার ছেলেরা যখন রাজ্য পেল, যখন সময় এল একটু ভোগ-বিলাসে থাকার, তখনই তোমার এই অদ্ভুত বুদ্ধি হল কেন, মা—তদেয়ং তে কুতো মতিঃ! আর যদি এই বুদ্ধিই হবে তবে আমাদের দিয়ে যুদ্ধে এত লোকক্ষয় করালে কেন? বনেই যদি যাবে তবে সেই বালক-বয়সে আমাদের শতশৃঙ্গ পর্বতের বন থেকে কেন টেনে এনেছিলে এখানে? বারবার বলছি মা, কথা শোনো, বনে যাবার কল্পনা বাদ দাও, ছেলেদের উপায়-করা রাজলক্ষ্মী ভোগ করো তুমি, ফিরে চলো ঘরে।

কুন্তী ভীমের কথাও শুনলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরবার লক্ষণ একটুও দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। দ্রৌপদী-সুভদ্রা কত বোঝালেন কুন্তীকে, ছেলেরা সবাই কত করে বললেন ফিরে যেতে, কুন্তী বারবার তাঁদের দিকে ফিরে তাকান—যেন এই শেষ দেখা, আর চলতে থাকেন। সাশ্রুমুখে পুত্রদের দিকে বারবার তাকানোর মধ্যে কুন্তীর স্নেহানুরক্তি অবশ্যই ছিল—সা পুত্রান্ রুদতঃ সর্বান্ মুহুর্মুহুরবেক্ষতী। কিন্তু তাঁর চলার মধ্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের শক্তি লুকানো ছিল। তিনি তাই থামছিলেন না। বস্তুত ওই শক্তিতে কুন্তী এবার চোখের জল মুছলেন, রুদ্ধ করলেন বাষ্পোদ্ভিন্ন

স্নেহধারার পথ। কুন্তী নিজেকে শক্ত করে দাঁড়ালেন বনপথের মাঝখানে। প্রিয় পুত্রেরা তাঁকে যুক্তির জালে আবদ্ধ করেছে। প্রশ্ন করেছে—কেন তুমি পূর্বে আমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে এখন বনে পালাচ্ছ। ছেলেদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবেন তিনি। কুন্তী দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর সেই তেজ, সেই দীপ্তি।

কুন্তী বললেন—প্রশ্নটা তোমাদের মোটেই অন্যায় নয় যুধিষ্ঠির! সত্যিই তো, আমি তোমাদের চেতিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সময়ে, যখন শত্রুর ওপর আঘাত হানায় তোমরা ছিলে কম্পমান—কৃতমুদ্ধর্ষণং পূর্বং ময়া বঃ সীদতাং নৃপ। কেন অমনি করেছিলাম জান? জ্ঞাতিরা পাশাখেলায় তোমাদের সর্বস্ব হরণ করে নিয়েছে, সুখ বলে যখন কোনও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তোমাদের, তখনই আমি তোমাদের উত্তেজিত করেছি—কৃতমুদ্ধর্ষণং ময়া। আমি তোমাদের উত্তেজিত করেছি এই কারণে, আমার স্বামী পাণ্ডুর ছেলেরা যাতে পৃথিবী থেকে মুছে না যায়, যাতে তাঁর বীর পুত্রদের যশোহানি না হয়।

এই কথাটার মধ্যে ভীমের প্রশ্নের জবাবও আছে। ভীম বলেছিলেন—বনেই যদি যাবে তবে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কেন আমাদের বন থেকে টেনে এনেছিলে এখানে—বনাচ্চাপি কিমানীতা ভবত্যা বালকা বয়ম্? কুন্তী জবাব দিয়েছেন স্বামীর ইতিকর্তব্যতার কথা মনে রেখে। বস্তুত পাণ্ডু অকালে মারা যাবার পর কুন্তী যখন বিধবা হলেন তখন অন্য ব্যক্তিত্বময়ী বিধবা রমণীদের মতো তাঁরও একমাত্র ধ্যান ছিল—কেমন করে তাঁর নাবালক ছেলেগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়। এর জন্য মুনি-ঋষিদের ধরে পাণ্ডুর মৃতদেহ নিয়ে নাবালকদের হাত ধরে তিনি উপস্থিত হয়েছেন শ্বশুরবাড়িতে। ভূতপূর্ব রাজরানির প্রাপ্য সম্মান তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাননি, পেয়েছেন শুধুই আশ্রয়। সেই আশ্রয়ও নিরাপদ ছিল না। ভীমকে বিষ খাওয়ানো, বারণাবতে সবাইকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা—সব কিছু কুন্তী সয়েছেন এবং অপেক্ষা করেছেন সুদিনের। ছেলেরা ততদিনে মহাশক্তিশালী বীরের মর্যাদা পেয়েছে। রাজনীতিতে সমর্থন এসে গেছে কুন্তীর আসল বাপের বাড়ি বৃষ্ণি যাদবদের কাছ থেকে এবং বিবাহসূত্রে পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছ থেকেও।

ধৃতরাষ্ট্র এই বিধবা মহিলার উচ্চাশা চেপে রাখতে পারেননি। চেষ্টা তিনি কম করেননি। কুন্তীকে যদি একটুও ভয় না পেতেন ধৃতরাষ্ট্র, তা হলে অন্তত বারণাবতে কুন্তী সহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করতেন না। যাই হোক, পাঞ্চালদের সঙ্গে বৈবাহিক যোগাযোগের পর এবং বারণাবতের ঘটনায় নিজের রাজ্যে নিজেরই মান বাঁচাতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অবাধ্য ছেলেদের ধৃতরাষ্ট্র রুখতে পারেননি। তাদের প্ররোচনায় পাশাখেলার ছলে পাণ্ডবদের সর্বস্ব নিয়ে বনবাসে পাঠান ধৃতরাষ্ট্র।

কুন্তী এই অন্যায় সইতে পারেননি। বাপের সম্পত্তির ভাগ তারা কিছুই পেল না, উলটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বনে, কুন্তী এই অন্যায় সইতে পারেননি। স্বামীর অবর্তমানে নিজের কষ্টে প্রতিষ্ঠিত রোজগেরে ছেলেদের দেখে বিধবা মা যে সুখ পান, ঠিক সেই সুখই কুন্তী নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, যখন যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। কিন্তু দুর্যোধন-ভাইদের জ্ঞাতি চক্রান্তে ছেলেদের যে রাজ্যনাশ হয়ে গেল, তখনও কুন্তী হাল ছাড়েননি। তিনি একা বসেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। বিদুরের কথায় যে তিনি শেষ পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে বনে যাওয়া বন্ধ করে কুরুবাড়িতেই রয়ে গেলেন, তার কারণ বিদুরের মর্যাদারক্ষা যতখানি, তার চেয়েও বেশি তাঁর অধিকারবোধ—আমার শ্বশুরবাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমার হক আছে থাকার, আমি রইলাম শুধু পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিতার অধিকারে। রাজা পাণ্ডুর বংশ এবং উত্তরাধিকার যাতে মুছে না যায় কুরুবাড়ি থেকে—যথা পাণ্ডোর্ন নশ্যেত সন্ততিঃ পুরুষর্ষভাঃ—সেইজন্যই তিনি কুরুবাড়িতে একা জেগে বসেছিলেন এবং সময়কালে ছেলেদের উত্তেজিত করেছেন চরম আঘাত হানার জন্য—ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্।

কুন্তী বললেন—তোমাদের শক্তি কিছু কম ছিল না। দেবতাদের মতো তোমাদের পরাক্রম। সেই তোমরা চোখ বড় করে চেয়ে চেয়ে জ্ঞাতিভাইদের সুখ দেখবে আর নিজেরা বনে বসে বসে

আঙুল চুষবে—সে আমি সইতে পারিনি বলেই তোমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছি—মা পরেষাং স্থাতব্যং তৎ কৃতং ময়া। যুধিষ্ঠির! মর্যাদায় তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো হয়েও তুমি কেন বনে বাস করবে, সেই জন্যই আমার উত্তেজনা। একশো হাতীর বল শরীরে নিয়েও ভীম কেন কষ্ট পাবে, সেই জন্যই আমার উত্তেজনা। ইন্দ্রের সমান যুদ্ধবীর হয়েও অর্জুন কেন নিচু হয়ে থাকবে—সেই জন্যই আমার উত্তেজনা। আর তোমরা এত বড় বড় ভাইরা থাকতে নকুল-সহদেব আমার বনের মধ্যে খিদেয় কষ্ট পাবে—এই জন্যই আমার উত্তেজনা।

কুন্তী এবার শেষ প্রশ্ন তুললেন সমগ্র রাজনীতির সারমর্মিতায়। বললেন—এই যে এই মেয়েটা, পাণ্ডবদের সুন্দরী কুলবধূ দ্রৌপদী। একে যখন সভার মধ্যে নিয়ে এসে অপমান করল সবাই, সকলে চুপটি করে বসে থাকল। পঞ্চস্বামীগর্বিতা হয়েও সাহায্যের আশায় যাকে কাঁদতে হল অনাথের মতো, আমার শ্বশুরকুলের বড় মানুষেরা ব্যথিত হয়েও চুপ করে বসে থাকলেন। দুঃশাসন এসে তার চুলের মুঠি ধরল—এখনও ভাবলে আমার মনে হয় আমি অজ্ঞান হয়ে যাব—এরকম অসভ্যতা দেখেই আমি তোমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছি, শুনিয়েছি বিদুলার উদ্দীপক সংলাপ।

কুন্তী বলতে চান—পাণ্ডবদের যুদ্ধে উত্তেজিত করার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থ কমই। ছেলেরা রাজ্য জিতে ভোগ-বিলাস এনে দেবে তাঁর কাছে আর তিনি বিলাস-ব্যসনে মজে থাকবেন, বসে বসে সুখ ভোগ করবেন—এই আশায় তিনি যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়াননি ছেলেদের মধ্যে। কুন্তীর বক্তব্য—যুদ্ধের উত্তেজনার বিষয় এবং কারণ তাঁর ছেলেদের মধ্যেই ছিল, অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরা যা চলছিল—যে অন্যায় যে অবিচার, তাতে বহু পূর্বে তাঁর ছেলেদেরই উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল। তাদের দিক থেকে অত্যন্ত উচিত এই প্রতিক্রিয়া যখন কুন্তী লক্ষ করলেন না, তখনই তাঁকে কঠিন কথা বলতে হয়েছে, বিদুলার মরণান্তিক কঠিন সংলাপ শোনাতে হয়েছে ছেলেদের। এর মধ্যে জননী হিসেবে তাঁর পাওয়ার কিছু নেই, যা প্রাপ্য তা তাঁর ছেলেদেরই, ঠিক যেমন যুদ্ধে উত্তেজিত হওয়ার কারণগুলিও ছিল তাদেরই একান্ত।

যুধিষ্ঠির এবং ভীমের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের উত্তরে কুন্তী তাঁর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেননি। যে প্রশ্ন করতে ছেলেদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, সেই প্রশ্ন যখন তারা কঠিনভাবেই করল, তখন উত্তর এসেছে অবধারিত কঠিনভাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কুন্তী ছেলেদের রেখে বনের পথে পা বাড়িয়েছেন জীবনের মতো। কাজেই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে নেমে আসছে প্রশান্তি, বনযাত্রার বৈরাগ্য।

কুন্তী বললেন—তোমাদের যে এত করে যুদ্ধ করতে বলেছিলাম, তার আসল কারণ কী জান? তোমাদের বাবা ছিলেন রাজা। তোমরা রাজার ছেলে। আমারই গর্ভজাত সন্তানদের হাতে পড়ে সেই মহাত্মা পাণ্ডুর রাজবংশ উচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, সেই কারণেই আমি তোমাদের উৎসাহিত করেছি। জেনে রেখো, তোমরা নিজেরাই যদি নিরালম্ব অবস্থায় থাকো, তবে তোমাদের ছেলেরা, তোমাদের নাতিরা কোনওদিনই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—ন তস্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা ক্ষতবংশস্য পার্থিব। কাজেই যা কিছু উৎসাহ-উদ্দীপনা তা তোমাদেরই কারণে, আমার নিজের ভোগসুখের জন্য কিছু নয়। ভাবতে পারেন কি—একটি সমৃদ্ধিশালী, সুপ্রতিষ্ঠিত বংশধারার জন্য কুন্তী কত আধুনিকভাবে লালায়িত!

ভীম বলেছিলেন—তোমার ছেলেরা এখন রাজ্য জিতেছে, সেই রাজসুখ এখন তোমার ভোগ করার কথা—যদা রাজ্যমিদং কুন্তি ভোক্তব্যং পুত্রনির্জিতম্—রাজমাতার প্রাপ্য সুখ যখন তোমার কাছে আমাদেরই পৌঁছনোর কথা, ঠিক তখনই তোমার এই বানপ্রস্থের ইচ্ছে হল? কুন্তী এই প্রশ্ন এবং পুত্র-নির্জিত রাজ্য-সুখের ভোক্তব্যতা নিয়ে যে অসাধারণ উক্তিটি করেছেন তা এই অতি বড় আধুনিক সমাজেও আমি অত্যন্ত সযৌক্তিক মনে করি।

কুন্তীর বক্তব্যের আগে আমি দুটো সামান্য কথা নিবেদন করে নিই। আমার সহৃদয় পাঠককুল আমাকে কুন্তীর বক্তব্যের সারবত্তা বোঝানোর সময় দিন একটু। আজকের দিনের অনেক কৃতী ছেলে বলে—পাশ্চাত্য সমাজ বড় ভাল। ওখানে যার যার, তার তার। ছেলে বড় হল, চাকরি

করছে বউ নিয়ে আলাদা আছে। বাপ-মাও আলাদা আছে। শাশুড়ি-বউতে দিন-রাত কথা কাটাকাটি নেই, ভ্যাজর-ভ্যাজর নেই। ভারী সুন্দর ব্যবস্থা।

এই 'সুন্দর' ব্যবস্থার মধ্যে আমি কিছু নিন্দনীয় দেখি না। ভারতবর্ষেও আজকাল তাই হচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলি একে একে ভেঙে যাচ্ছে। বস্তুত এতেও আমি কিছু নিন্দনীয় দেখছি না। কারণ এমনটি হবেই। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার দিকে তাকালে অনেক কিছু সহজে বোঝা যাবে। আমাদের অব্যবহিত পূর্বকালে যা দেখেছি, তাতে জমি সম্পত্তি এবং বসতবাড়ির একটা বিশাল ভূমিকা ছিল সমাজে। ছেলেরা বাপের সম্পত্তি পেত। বাবা যদি সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতেন, তা হলে শাশুড়ি দাপট দেখাতেন, পুত্র-পুত্রবধূ নিগৃহীত বোধ করতেন। জমি-সম্পত্তির যুগ অতীত হয়ে যাবার পর যখন বাপ চাকরি করে, ছেলেও চাকরি করে সেই অবস্থায় শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার অনুপাত বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। এই কাঠামোতে বাপ মারা গেলে মায়ের অবস্থা বড় করুণ। এই অবস্থায় পুত্রবধূ দাপট দেখায়, শাশুড়ি নিগৃহীতা বোধ করেন।

এখন দেখছি সমাজ অতি দ্রুত এই পারিবারিক ঝগড়াঝাটির নিষ্পত্তি ঘটিয়ে ফেলেছে। এখন বাপ চাকরি করতে করতেই ছেলের পড়াশুনো, তার ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠার দিকে যেমন নজর রাখেন, তেমনই তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীর যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার ব্যবস্থাও করেন। অথবা বাপ যদি বেঁচেও থাকেন, তা হলে অবসরকালীন জীবনে বুড়োবুড়ি পুত্র-পুত্রবধূকে বাদ দিয়েও কীভাবে জীবন কাটাবেন, তার একটা অঙ্ক কষে নেন আগে থেকেই। অর্থাৎ তাঁরা আর পুত্রের উপার্জিত ধনে ভাগ বসাতে চান না। ভাবটা এই—আমরা বেঁচে থাকি, তোমরাও সুখে থাক, ঝগড়াঝাটি যেন না হয়, বাছা। আমরা প্রায় পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থার কাছাকাছি চলে আসছি।

এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে—তা জানি না, তবে এ ব্যবস্থা আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলির মধ্যেই চলতে পারে, অন্যত্র নয়। অন্যত্র সেই একই হাল—রোজগেরে ছেলে, পুত্রবধূর দাপট, বাবা-মা নাজেহাল। এর মধ্যে যদি আবার একজন স্বর্গত হন, তখন অন্যজনের অবস্থা হয়ে ওঠে আরও করুণ। তিনি মনে মনে কষ্ট পান, একান্তে বসে কাঁদেন। পুত্রবধূর তবু মায়া হয় না, অথচ এই অসহায় শাশুড়ি নামের ভদ্রমহিলাটি—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বশুরই আগে স্বর্গত হন—নিজের ছেলেটিকে রেখে অন্যত্রও চলে যেতে পারেন না। কারণ মায়া-মোহ তো আছেই, সহায়-সম্বলহীনতাও আছে।

ঠিক এইরকম একটা পটভূমিকায় আমি কুন্তীর বক্তব্য পেশ করতে চাই। যদিও এখানে শাশুড়ি-বউয়ের কোনও ব্যাপারই নেই। যা আছে, তার নাম সংসার-চক্র। তবে মনে রাখা দরকার কুন্তীর বক্তব্যের একটা পটভূমিকা আছে। শাস্ত্র, কাব্য এমনকী সাধারণ মানুষের শেষ কথাটির মধ্যেও আমরা বুঝতে পারি যে, ভারতবর্ষ কোনওকালেই ভোগ-বিলাসের প্রশস্তি গায় না, তার প্রশস্তি বৈরাগ্যেই। এখানে অতি ভোগী মানুষেরও এক সময় মনে হয়—চাওয়ার আগুনে ইন্ধন জোগালে তার কোনও শেষ নেই, অতএব একটা কোথাও শেষ করতে হবে। এই দর্শন থেকেই ভারতবর্ষে আশ্রম-ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল। এই আশ্রম কিন্তু ঋষির আশ্রম নয়, আশ্রম-ব্যবস্থা।

চতুর্বর্ণের বিষম ব্যবস্থায় শত দোষ থাকতে পারে, তার অনেকটাই আমরা বুঝে নিয়েছি। এমনকী ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার সময়টা কেমন কাটানো উচিত, সে সম্বন্ধেও মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু এই সেদিনও কবি-ঋষি শান্তিনিকেতনে ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার যে আয়োজন করেছিলেন, তার মধ্যে দোষ থাকলেও আনন্দের ভাগটা অন্যরকম। গার্হস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও আমার কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু মানুষ কতকাল গৃহস্থ অবস্থায় রতি-সুখ, সন্তান-সুখ ভোগ করবে, তার একটা সীমা ছিল। এই সীমার শেষ থেকেই বানপ্রস্থের আরম্ভ।

সাধারণ মতে সময়-সীমাটা পঞ্চাশ, কথায় বলে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দাম্পত্য এবং বাৎসল্য রস উপভোগ করে বেরিয়ে পড়ো ঘর থেকে। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু কাজে খুব কঠিন। কারণ ততদিনে পঞ্চাশোর্ধ্ব বুড়ো-বুড়ির মধ্যে অন্যতর এবং আরও গাঢ়তর এক

ঘনিষ্ঠতা জন্মে যায় ; দিন যত যায় বাৎসল্যরসও ঘনীভূত হয় ততই। এই অবস্থায় ঘর ছেড়ে বেরনো বড় কঠিন। সেকালেও এটা কঠিন ছিল। স্বয়ং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই বেরতে পারেননি এবং পারেননি বলেই নিজের বংশনাশ তাঁকে বড় কাছ থেকে দেখে যেতে হয়েছে। কিন্তু বেরনোর নিয়মটা 'থিওরেটিক্যালি' ছিলই। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বড় গৌরব করে রঘুবংশীয় নৃপতিদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যৌবনকালে তাঁরা বিষয়-সুখ চাইতেন বটে, কিন্তু বুড়ো বয়স হলেই তাঁরা বনে চলে যেতেন—বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

দেখুন, কবিরও মমতা ছিল। তিনিও পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেতে বলেননি ; বলেছেন বুড়ো বয়সে—বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাম্। এইটাই কথা—ঘর থেকে বেরতে হবে। তা একটু বয়স বেশিই হোক, কিন্তু বেরতে হবে। আসলে পুত্র এবং পুত্রবধূকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখেই বেরনো ভাল, তাতে পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে মধুর, মনটা থাকে অসূয়াহীন—ভালয় ভালয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই। তা অনেকে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখা মাত্রই বেরতে পারেন না, কারণ নাতি-নাতনির জন্য নিম্নগামিনী স্নেহধারায় আরও কিছু কাল কাটে। বাস্তববাদী কবি-ঋষিরা তাতেও আপত্তি করেননি। ভাবটা এই—যতদিন সম্মান নিয়ে আছ, ততদিন থাকো, কিন্তু সম্মানের অসম্ভাবনা মাত্রেই বেরিয়ে পড়। দুঃখের বিষয়—আজ আর কেউ বনে যায় না। গেলে, অনেক পারিবারিক অশান্তির নিরসন হয়ে যেত।

আপনারা স্বয়ং ব্যাসদেবের কথাটাই স্মরণ করুন। তাঁর মা সত্যবতী কুরুবংশের ধারা রক্ষার জন্য অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন। মহারাজ শান্তনুর ঔরসে আপন গর্ভজাত পুত্র দুটির মৃত্যু তাঁকে দেখতে হয়েছে। তারপর অতিকষ্টে পূর্বজাত পুত্র ব্যাসকে বুঝিয়ে দুই পুত্রবধূ অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে দুটি নিয়োগজাত সন্তান পেয়েছিলেন। কুরুবংশের দুই অঙ্কুর—ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। অন্ধত্বের জন্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে পারলেন না। রাজা হলেন পাণ্ডু। কিন্তু সেই সিংহাসনস্থ পাণ্ডুর মৃত্যুও সত্যবতী দেখতে বাধ্য হলেন। আর কত ?

হস্তিনাপুরে যেদিন পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, সেদিন ত্রিকালদর্শী ব্যাস জননী সত্যবতীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—সুখের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে মা, যে সময় আসছে তোমার পক্ষে তা মোটেই ভাল নয়—অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ। ব্যাস আরও বললেন—মা ! পৃথিবী তার যৌবন হারিয়ে ফেলেছে, সামনের সমস্ত দিনই পাপে আর কষ্টে ভরা—শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠ-দিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা।

'পৃথিবী গতযৌবনা'—মহাকবির ব্যঞ্জনা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের কী করে বোঝাব—এটা কত বড় কথা। আসলে প্রত্যেক মানুষের জীবনে যতদিন যৌবনকাল, যতদিন কর্মক্ষমতা, এই পৃথিবীও তার কাছে ততদিন যুবতী। কিন্তু মানুষের প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে পৃথিবীও প্রৌঢ়া হয়ে যায়, মানুষের বৃদ্ধত্বে পৃথিবীও বৃদ্ধা। অর্থাৎ ততদিনে সেই পৃথিবী আমার সন্তান বা সন্তানকল্পদের কাছে যুবতী রূপে ধরা দেয়। ওঁরা বলেন, জেনারেশন গ্যাপ' আমরা বলি—তুমি যত বুড়ো হবে, তোমার পৃথিবীও তোমার সঙ্গে বুড়ি হবে, তুমি আর মেলাতে পারবে না। তোমার যুবক সন্তানের যুবতী পৃথিবীর সঙ্গে, তোমার বুড়ো বয়সের বুড়ি পৃথিবী মিলবে না। ব্যাস তাই বললেন—পৃথিবী গতযৌবনা। চলো মা এবার বনে গিয়ে মনের সুখে ঈশ্বরচিন্তা করবে।

কুন্তীর মনে আছে এসব কথা। মনে আছে বৃদ্ধা দিদি-শাশুড়ি তাঁর দুই শাশুড়ি অম্বিকা এবং অম্বালিকার হাত ধরে বনে চলে গিয়েছিলেন। যুবতী পৃথিবী রয়ে গেল অন্ধ যুবক ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। তারপর কুরুক্ষেত্রবাহিনী গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কুন্তী তাঁর শ্বশুরের শিক্ষায় নিজেই চলে যাচ্ছেন বনে। যুবতী পৃথিবী রইল তাঁর যুবক পুত্রদের হাতে। তাঁর তো আর কিছু করার নেই। ভীম বলেছিলেন—ছেলেরা তোমার রাজ্য পেয়েছে, সেই রাজ্য তুমি মনের সুখে ভোগ কর। কুন্তী সদর্পে উত্তর দিয়েছেন—রাজসুখ ! রাজসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি, পুত্র ! আমার স্বামীর যখন সুখের দিন ছিল, তখন তাঁর রাজত্বে রাজরানি হয়ে রাজ্যসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি—ভুক্তং রাজ্যফলং পুত্র ভর্তুর্মে বিপুলং পুরা। টাকা-পয়সা খরচা করার অজস্র স্বাধীনতা তিনি আমায় দিয়েছিলেন, অনেক অনেক দান করেছি আমি, তিনি কোনওদিন বাধা দেননি। আর আনন্দ ! স্বামীর

সঙ্গে একত্রে বসে সোমরস পান করেছি—পীতঃ সোমো যথাবিধি। আর কী চাই ?

কুন্তীর কথাগুলির মধ্যে যেমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব আছে, তেমনই অধিকার-বোধের মর্যাদা। বস্তুত কুন্তীর মতো একজন বিদগ্ধা রমণী যে জীবনবোধের কথা বলেছেন, সে জীবনবোধ যদি আমাদের থাকত তা হলে সংসারের অনেক বিপন্নতা এবং অসহায়তা থেকেই আমরা মুক্তি পেতাম। এ-কথাটা আপনারা মানবেন কিনা জানি না, আমি অন্তত মানি যে, স্বামীর অধিকারে স্ত্রীর যত মর্যাদা, পুত্রের অধিকারে তত নয়। পুত্র যদি অনেক গুণে গুণীও হন, তবুও নয়। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা শৃঙ্গার রস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি জানে।' অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য রসটা হল সমরস, দু'জনেই সে রসের সমান অংশীদার। এই মমতার সূত্রেই স্বামীর জীবিতকালে স্ত্রী যে অধিকার বোধ করেন, স্বেচ্ছায় যা দান-বিতরণ করতে পারেন, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের জমানায় সে অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে না। সমরস নয় বলেই তখন ব্যবহারে সংকোচ আসে। তা ছাড়া ততদিনে পুত্রের জীবনেও যেহেতু অন্যতরা এক সমরসিকার আবির্ভাব হয়, তাই জননীকে পূর্বতন স্মৃতি নিয়েই কাটাতে হয়। আর কুন্তীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী রমণী হলে সেই পূর্বতন স্মৃতি নিয়েই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন—তাতে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

সেকালের ক্ষত্রিয়া রাজমহিষীদের মদ্যপানে বাধা ছিল না। এখানে কুন্তী পাণ্ডুর সঙ্গে একসঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন—অথবা সোমকে যদি মদ্য নাই বলেন, তবে একসঙ্গে বসে সোমসুধা পান করতেন—এই কথাটা এখানে খুব বড় কথা নয়। এখানে সোমপানের ব্যঞ্জনাটা হল—তাঁরা একত্রে জীবনের চূড়ান্ত আনন্দও ভাগ করে নিতেন। কুন্তীর আনন্দের ভাণ্ডার সেদিনই পূর্ণ হয়ে গেছে। আজ স্বামীর অবর্তমানে পুত্রনির্ভর আনন্দে কুন্তীর তত ভরসা নেই, বরঞ্চ সংকোচ আছে, কেন না তাঁর কাছে এখন তাঁর পৃথিবী গতযৌবনা। বরঞ্চ ক্ষত্রিয়া বধূ এবং রাজরমণীর মর্যাদায় বিদুলার কথা বলে তিনি যে স্বামীর অবর্তমানেও পুত্রদের স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, এইটুকুই ক্ষত্রিয় বিধবাব পক্ষে যথেষ্ট। পুত্রদের দেওয়া রাজ্যসুখে আজ আর তাঁর কোনও আকাঙ্ক্ষাই নেই—নাহং রাজ্যফলং পুত্রা কাময়ে পুত্র-নির্জিতম্। রাজ্যসুখ তিনি স্বামীর আমলেই যথেষ্ট ভোগ করেছেন, এখন কোনও অগৌরবের ছোঁয়ায় সেই পূর্বতন গৌরব যাতে কলুষিত না হয়, সেইজন্যই আজ কুন্তীর এই অপ্রত্যাশিত বানপ্রস্থ।

স্বামীর মৃত্যুর পর কতগুলি অসহায় বালককে নিয়ে তিনি হস্তিনায় এসেছিলেন। সেই দিন থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুন্তী তাঁর ভাশুরঠাকুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে করুণা পাননি। আজ যখন বৃদ্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, সহায়সম্বল সব গেছে, তখন কুন্তী অসীম করুণায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শাশুড়ি-কল্প গান্ধারীর অসহায় হাতে। তিনি আজ এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে চলেছেন হাত ধরে বনের পথে। স্বামীকে তিনি বেশিদিন ইহলোকে পাননি, তাঁর অবর্তমানে স্বামীর রক্ত-মাংস যাঁর দেহে-কোষে আছে, সেই ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করে তিনি খানিকটা স্বামীসেবার সান্ত্বনা পেতে চান। ছেলেদের বলেছেন দৃঢ় সংকল্পে—ফিরে যাও বাছারা—নিবর্তস্ব কুরুশ্রেষ্ঠ। জীবনের শেষ কটা দিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর মতো শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে আমি আমার পতিলোকে যাত্রা করতে চাই।

কুন্তী চলে গেলেন। সদর্পে মাথা উঁচু করে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠির ভীম—এঁরা যেন একটু লজ্জাই পেলেন—ব্রীড়িতা সন্ন্যবর্তন্ত। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী অবশ্য কুন্তীকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক বোঝালেন, কিন্তু কুন্তী ফিরলেন না। ফিরলেন না, কারণ, আমার ধারণা, সেই শ্বশুর ব্যাসদেবের কথা কুন্তীর মনে আছে—পৃথিবী গতযৌবনা। ফিরলেন না, কারণ কুমার যুধিষ্ঠির পুত্রশোকার্তা ক্ষত্রিয়া জননীকে কর্ণের কথা বলে একবার হলেও অতিক্রম করেছে। এই অতিক্রম যে বারবার ঘটবে না তার কী মানে আছে—পৃথিবী গতযৌবনা। তাঁর সময় চলে গেছে। কুন্তী যে দৃঢ়তা নিয়ে পুত্রদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন, সেই দৃঢ়তা নিয়েই আজ বনে চলে গেলেন।

অগত্যা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে, কৃষ্ণা-পাঞ্চালীকে নিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনায়। মা চলে গেছেন, রাজকার্যে তাঁদের মন বসে না। কিছুদিন যাবার পরেই যুধিষ্ঠির লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে ভাই,

বউ আত্মীয পবিজন সঙ্গে নিয়ে চললেন বনের পথে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কুন্তীরা তখন সবাই শতযূপ মুনিব অরণ্য আশ্রমে থাকেন। পাণ্ডবরা লোকমুখে খবর নিতে নিতে শতযূপের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তপস্বী বালকেরা বনের মধ্যে রাজপুরুষ, পাইক-বরকন্দাজ দেখে অবাক হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তপস্বী বালকদের শুধোলেন—আমরা যে শুনেছিলাম এখানেই আছেন তাঁরা। কাউকেই তো দেখছি না। বালকেরা বলল—এই তো যমুনায় গেছেন জল আনতে, পুজোর জন্য ফুল তুলতে।

পাঁচ ভাই পাণ্ডব সঙ্গে সঙ্গে চললেন যমুনার দিকে। দেখলেন—বৃদ্ধা কুন্তী এবং গান্ধারী কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরছেন যমুনা থেকে। সঙ্গে সুস্নাত ধৃতরাষ্ট্র। মাদ্রীপুত্র কনিষ্ঠ সহদেব তো শিশুর মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কুন্তীকে—সহদেবস্তু বেগেন প্রাধাবদ্ যত্র সা পৃথা। আমি আগেই বলেছি—কুন্তী এই সপত্নী পুত্রটিকে কত ভালবাসতেন। সহদেব কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে যত কাঁদেন, কুন্তীও ততই কাঁদেন। সাশ্রুকণ্ঠে সানন্দে আর কোনও বীরপুত্রের কথা না বলে গান্ধারীকে তিনি খবর দেন—আমার সহদেব এসেছে, দিদি, সহদেব এসেছে। পাণ্ডবরা একে একে সবাই কুন্তীর কাছে এলেন, তাঁদের কাঁখের কলসী তুলে নিলেন নিজের মাথায়। সবাই ফিরে এলেন শতযূপের আশ্রমে। মুহূর্তের মধ্যে মুনির অরণ্য আশ্রম হস্তিনাপুরের রূপ নিল। আরও আনন্দের খবর এল—কুরু-পাণ্ডব-বংশের বিধাতা মহাভারতের কবি মহামুনি ব্যাসও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হয়েছেন শতযূপের আশ্রমে।

মহামতি ব্যাসের আজ অন্যরূপ। নিজেরই পুত্র-প্রপৌত্র, পুত্রবধূরা সব এক জায়গায়। ধৃতরাষ্ট্র-কুন্তী-গান্ধারীকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—কী চাও তোমরা বলো। আজ আমি আমার যোগসিদ্ধির ঐশ্বর্য দেখাব। বলো কী চাও ? ব্যাস বুঝতে পারছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী এই নির্জন বনে এসে যত তপস্যাই করুন, তাঁদের মনে এখনও কাঁটার মতো ফুটে আছে শত-পুত্রের শোক। ব্যাসের কথা শুনেই ধৃতরাষ্ট্র কেঁদে ফেললেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা কেড়ে নিয়ে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সবার মন বুঝে বললেন—এতই যদি আপনার দয়া, তবে আমার মতো অভাগা রমণীদের, যাদের পুত্র গেছে, স্বামী গেছে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে, তাঁদের স্বামী-পুত্রদের একবার দেখান না দয়া করে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মতো ভেসে এল কর্ণের প্রতিচ্ছবি, চিরকালের লুকিয়ে রাখা সূর্য-সম্ভবা দীপ্তি—কর্ণ, সেও কি লুকিয়ে রাখা যায় ? একবার কি কুন্তী অসাড়ে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণও করে ফেলেছিলেন কর্ণের নাম ? কেন না ব্যাসের বিশেষণ দেখছি—দূরশ্রবণদর্শনঃ—যিনি দূরের কথা শুনতে পান, মনের ছবি দেখতে পান। ব্যাস কুন্তীকে দেখলেন বড় মনমরা। স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলেন—কুন্তী ! বলো তুমি। তোমার মনে কীসের কষ্ট ; খুলে বলো আমায়।

এই মুহূর্তে কুন্তীকে আমরা দেখছি আত্মনিবেদনের পরম পরিসরে। কুন্তী বললেন—আপনি আমার সাক্ষাৎ শ্বশুর। দেবতার দেবতা। আমার এই চরম সত্যের স্বীকারোক্তি আমার দেবতাদের দেবতাকে আমি শোনাতে চাই—স মে দেবাতিদেবস্ত্বং শৃণু সত্যাং গিরো মম।

আমার সহৃদয় পাঠককুল। আমি আগেই আপনাদের জানাই—কুন্তী কর্ণের কথা বলবেন ! মনে রাখবেন—এখানে তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠির বসে আছেন, যে যুধিষ্ঠির মাকে মৃদু অভিশাপ দিয়েছিলেন কর্ণের কারণে। মনে রাখবেন, এখানে তাঁর স্বামীজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র আছেন, গান্ধারী আছেন, আছেন কুলবধূরা—যাঁরা শাশুড়ির কীর্তি শুনে ছ্যা-ছ্যা করতে পারেন। কুন্তী আজ সবার সামনে, বিশেষত দেবকল্প শ্বশুর ব্যাসের সামনে নিজের চরম স্বীকারোক্তি করছেন। প্রথমজন্মা সূর্যসম্ভব যে পুত্রটি তাঁর সারা জীবনের পুলক-দীপ্তি হয়ে থাকতে পারত, তাকে সারা জীবন লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণা তাঁকে পাপের মতো পুড়িয়ে মারে। যে সারা জীবন পাপের মতো করে অন্তরে লুকিয়ে ছিল, তাকেই আজকে কুন্তী দেখতে চান এবং দেখাতে চান সবার সামনে, প্রাণ ভরে, প্রথম পুত্রের সম্পূর্ণ

মর্যাদায়।

এই ঘটনাটা আমি কুন্তীর জীবনে অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। জীবনের আরম্ভে প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চের দিনে যাঁকে দিয়ে কুন্তী প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন, সারা জীবন তাঁকে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আজ তিনি তাঁকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাছে যতখানি ছিল, এ তার থেকেও বেশি—আপন মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রথমজন্মা পুত্রের প্রতিষ্ঠা। কুন্তী যাঁকে দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন আজ শেষের দিনে তাঁকেই দেখতে চাইছেন। পরম প্রিয় স্বামী নয়, পুত্রদাতা দেবতাদের নয়, যাঁকে দিয়ে কুন্তী নিজের গর্ভের মধ্যে দ্বিতীয় সত্তার আনন্দ পেয়েছিলেন প্রথম, কুন্তী তাঁকেই শেষের দিনে দেখতে চাইছেন, দেখতে চাইছেন কর্ণকে। হয়তো এইজন্যই, এই মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যই কুন্তী পঞ্চ পুণ্যবতী রমণীর মধ্যে একতমা—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। এর পরেও কে তাঁকে কুলঙ্কষা বলে তিরস্কার করবে ?

কুন্তী বললেন—আপনি তো জানেন, সেই ঋষি দুর্বাসা কেমন করে ছিলেন আমার ঘরে। কেমন করে আমি তাঁর সেবা করেছি। সেই যুবতী বয়সে তাঁর ওপরে রাগের কারণ অনেক ছিল আমার, কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হইনি। আমি যে তাঁর কাছে বর নিয়েছি, তাও তাঁর শাপের ভয়ে, আমি নিজে কোনও বর চাইনি। তিনি দেবতার আহ্বান আর সঙ্গমের মন্ত্র দিলেন আমার কানে। তখন আমার কী বা বয়স, যৌবনের স্পষ্টাস্পষ্ট রহস্য জানতে গিয়ে আমি সেদিন আহ্বান করে বসলাম দেব দিবাকরকে। আমার মূঢ় হৃদয়ের কৌতূহলী আহ্বান সত্য করে দিয়ে হঠাৎ তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বিশ্বাস করুন—আমি তখন কাঁপছিলাম। কত কেঁদে পায়ে ধরে বলেছিলাম—তুমি চলে যাও এখান থেকে—গম্যতামিতি। কিন্তু গেলেন না, শাপের ভয়, ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে নিজের দীপ্ত তেজে আমাকে আকুল করে আমাতে আবিষ্ট হলেন তিনি—ততো মাং তেজসাবিশ্য মোহয়িত্বা চ ভানুমান্। হায়! তারপর সেই গূঢ় জাত প্রথমজন্মা পুত্রকে আমার জলে ভাসিয়ে দিতে হল। সূর্যের প্রসন্নতায় আমি যেমন অনূঢ়া কন্যাটির মতো ছিলাম, তাই হলাম আবার।

তবু, কিন্তু তবু, সেদিন আমার সেই ছেলেটিকে—যাকে আমি আমার ছেলে বলে জেনেও অবহেলা করলাম, ভাসিয়ে দিলাম জলে, তার জন্য আমার শরীর মন সব সময় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আপনি বোঝেনও সে কথা—তন্মাং দহতি বিপ্রর্ষে যথা সুবিদিতং তব। এতক্ষণ সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে কুন্তী এবার তাঁর কৃতকর্মের ন্যায়-অন্যায় যাচাই করতে চাইছেন। কুন্তী জানালেন—সব আপনাকে বললাম। আমার পাপ হয়েছে, না হয়নি, আমি তার কিচ্ছু জানি না। আমি শুধু আমার সেই ছেলেকে একবার দেখতে চাই—তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভগবন্—আপনিই তাকে দেখাতে পারেন।

অসামান্য দীর্ঘদর্শিতার কারণে ব্যাস জানেন যে, কন্যা অবস্থায় পুত্রজন্মের জন্য কুন্তীর চরিত্রে পাপের স্পর্শ লেগেছিল কি না—এই প্রশ্ন কুন্তীকে যেমন সারা জীবন কুরে কুরে খেয়েছে, তেমনই এই প্রশ্ন অন্যদের মনেও আছে। কুন্তীর কথার উত্তরে ব্যাস প্রথম বললেন—তোমার কোনও দোষ ছিল না কুন্তী—অপরাধশ্চ তে নাস্তি। আর দোষ ছিল না বলেই পুত্রের জন্মের পরেও তুমি দেবতার আশীর্বাদে পূর্বের সেই কন্যাভাব আবারও লাভ করেছ। আসলে কী জান—দেবতারা ওই রকমই। তাঁদের অলৌকিক সিদ্ধি আছে, অতএব ওইভাবেই তাঁরা মনুষ্যশরীরে আবিষ্ট হন। তাঁদের এই অলৌকিক দেহ-সংক্রমণ সত্ত্বেও তুমি যেহেতু অন্য মানুষের মতোই মনুষ্যধর্মেই বর্তমান, সেই হেতু তোমার কোনও দোষ এখানে নেই। ভাবটা এই—যদি দোষ থাকে তবে সেই দেবতার। তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস তাঁর এই ভাব-ব্যঞ্জনা শুদ্ধ করে দিয়ে বলেছেন—আসলে কারওই দোষ নয় কুন্তী—অসামান্য দৈব তেজে বলীয়ান ব্যক্তির দোষ সাধারণের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না, বড় মানুষের সবই ভাল, সবই শুদ্ধ। আর তোমার কী দোষ, তুমি আগেও যা ছিলে, দেবসঙ্গমের পরেও তাই ছিলে—সেই লজ্জারুণা কন্যাটি—কন্যাভাবং গতা হ্যসি।

প্রশ্নের মীমাংসা হল। মীমাংসা করলেন মহাভারতের হৃদয়-জানা কবি, মীমাংসা করলেন ঋষি-সমাজের মূর্ধন্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত কন্যা-সত্যবতীর জাতক পারাশর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।

ব্যাস উত্তর দিলেন মানে, প্রশ্নের সমাধান সবারই হয়ে গেছে। এইবার মৃতজনদের সামনে নিয়ে আসার জন্য আপন যোগৈশ্বর্য প্রকট করবেন ব্যাস। তিনি ভাগীরথীতে স্নান করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত প্রিয়জনদের আহ্বান করলেন আবাহন মন্ত্রে। ভাগীরথীর তীরে তুমুল কোলাহল শোনা গেল—কর্ণ, দুর্যোধন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে, দুঃশাসন, শকুনি, ঘটোৎকচ সবাই সশরীরে দেখা দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা—সকলে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই যে মৃত ব্যক্তিরা সব ব্যাসের তপঃসাধনে ভাগীরথী তীরে সশরীরে উপস্থিত হলেন, এঁদের কারও মনে কোনও গ্লানি নেই, ক্রোধ নেই, অসূয়া নেই, ঈর্ষা নেই—নির্বৈরা নিরহংকারা বিগতক্রোধমৎসরাঃ। অত্যন্ত স্বাভাবিক রাজকীয় মর্যাদায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে। যেমন তাঁদের বেশ-ভূষা, তেমনই ভাস্বর তাঁদের শরীর-সংস্থান। জীবিত অবস্থায় যে মহাবীরের যেমন বেশ ছিল, যেমন ছিল তাঁদের রথ, বাহন, ঠিক তেমনই রথে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর সব উপস্থিত হলেন মায়ের সামনে, পিতার সামনে, প্রিয়তমা পত্নীর সামনে।

এমন করে কুন্তী কর্ণকে কোনওদিন দেখেননি। এমনভাবে, এমন সহানুভূতির মহিমায় কোনওদিন কুন্তী কর্ণকে এমন দেখেননি। পুনর্জীবিত অবস্থায় কর্ণকে কুন্তী দেখলেন অন্য এক মূর্তিতে। ভাগীরথীর তীরে কর্ণকে দেখা মাত্রই পাঁচভাই পাণ্ডবরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধেয়ে গেলেন তাঁর দিকে—সম্প্রহর্ষাৎ সমাজগ্মুঃ। পরস্পরকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্থানে পেয়ে ভারী খুশি হলেন তাঁরা—ততস্তে প্রীয়মানা বৈ কর্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ।

ঠিক এইরকম একটা দৃশ্যই তো কুন্তী সারাটা জীবন ধরে পরম কামনায় দেখতে চেয়েছেন। পাঁচ ভাই নয়, ছয় ভাই যেন এই অনন্ত সৌহার্দে বাঁধা পড়ে—এই তো কুন্তীর চিরকালের বাসনা। শ্বশুর ব্যাসের করুণায়—চিত্রং পটগতং যথা—এই পরম ঈপ্সিত ছয় ভাইয়ের মিলন দেখে কুন্তীর সব আশা পূরণ হয়ে গেল। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—এই দৃশ্যকে স্বপ্ন বলা যাবে না, কেন না তা হলে বলতে হবে ব্যাস 'ম্যাজিক' দেখাচ্ছেন। মোহ বা ভ্রান্তিও বলা যাবে না, কারণ ঋষি-চূড়ামণি ব্যাস আপন বিদ্যায় এবং তপস্যার মাহাত্ম্যে এই নিষ্পাপ প্রত্যক্ষ মনুষ্য-রূপ দেখাচ্ছেন। বস্তুত কুন্তী যে ব্যাসের বিদ্যায় পুত্রকে স্বরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তা শুধু এই অসামান্য দৃশ্যটির জন্য। মহাভারতের কবি এ-কথা লেখেননি যে, কর্ণকে দেখামাত্র কুন্তী ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। লিখেছেন—ভাইরা সানন্দে ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। কুন্তী তো এইটাই দেখতে চেয়েছেন সারা জীবন ধরে। তাঁর কন্যা অবস্থার প্রচ্ছন্নজাত পুত্রটি স্নেহের সরণিতে কোনওমতেই যে বিধিসম্মত পুত্রদের থেকে আলাদা নয়, সেই প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা।

বস্তুত এই অসম্ভব এবং অসামান্য এক চিত্রকল্পের পর আমার দিক থেকে কুন্তীর জীবনের আর কোনও ঘটনা জানানোর ইচ্ছে নেই। মহাভারতকে পৌরাণিকেরা 'ইতিহাস' বলেন। কুরু-পাণ্ডববংশের সার্থক ঐতিহাসিক হিসেবে এরপর ব্যাসকে লিখতে হয়েছে পাণ্ডবদের হস্তিনায় ফিরে যাওয়ার কথা। লিখতে হয়েছে—কেমন করে যাবার সময় পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিলেন—মা! এই অরণ্য আশ্রমে তোমায় ফেলে রেখে কিছুতেই আমি হস্তিনায় ফিরে যাব না। লিখতে হয়েছে—নির্জন বৈরাগ্য সাধনের জন্য কীভাবে কুন্তী সহদেবকে সাশ্রু বিদায় দিয়েছেন। এমনকী লিখতে হয়েছে—প্রজ্জ্বলিত দাবানলে তপোনিষ্ঠ কুন্তীর মৃত্যুর কথাও।

কিন্তু কেন জানি না—ওই ভাগীরথী-তীরে কর্ণকে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত দেখার ঘটনাই আমার কাছে কুন্তীর জীবনের শেষ দৃশ্য বলে মনে হয়। পরেরটুকু মহাকাব্য নয়, ইতিহাস। সমস্ত মহাভারতের মধ্যে প্রায় কোনও অবস্থাতেই কুন্তীকে আমরা নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত দেখিনি। সেই কন্যা অবস্থায় রাজপ্রাসাদের অলিন্দে রক্তিম সূর্যকে দেখে কুন্তীকে আমরা সানন্দ-কুতূহলে যৌবনের আহ্বান জানাতে দেখেছিলাম। আর আজ এই ভাগরথীতীরে তাঁর প্রথমাজন্মা পুত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠায় কুন্তীকে আমরা সানন্দমনে তপস্যার পথে পা বাড়াতে দেখলাম। ব্যাসকে তিনি বলেছিলেন—পাপ হোক পুণ্য হোক আমি আমার সেই ছেলেকে একবার দেখতে চাই। কিন্তু কর্ণের

ওই ভ্রাতৃমিলনের পর কুন্তীকে এখন আমরা অনন্ত বৈরাগ্যময় এক বিশাল বিশ্রামের মধ্যে পরিতৃপ্ত দেখতে পাচ্ছি, যে দুধের ছেলেটিকে কুন্তী জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জল বাহ্যত অশ্বনদীর হলেও কুন্তীর অন্তরবাহিনী ফল্গু নদীতে কর্ণ চিরকাল ভেসে চলেছেন। আজ ব্যাসের ইচ্ছায় সেই অন্তর-ফল্গুর বালি খুঁড়ে কুন্তী কর্ণকে তুলে আনলেন সবার সামনে। এর পরে আর তাঁর পাবার কিছু নেই। যাঁকে প্রথম দিনে পেয়েছিলেন অসীম কৌতুকে ছলনায়, আজ শেষের দিনে তাঁকেই পেলেন আন্তর প্রতিষ্ঠায়, পরম প্রশান্তিতে। এখন তাঁর কোনও পাপবোধ নেই, জবাবদিহি নেই, শান্ত সুস্থভাবে এখন তিনি ছেলেদের বলতে পারেন—তোমরা প্রকৃতিস্থ হও বাছারা—স্বস্থা ভবত পুত্রকাঃ। তোমরা ফিরে যাও, আমাদের আর আয়ু বেশি নেই—তস্মাৎ পুত্রক গচ্ছ ত্বং শিষ্টমল্পং চ নঃ প্রভো।

যুধিষ্ঠির

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মও মারা গেছেন। গঙ্গায় তাঁর ঔর্দ্ধদেহিক তর্পণ সেরে যুধিষ্ঠির কেবলই ভেজা কাপড়ে তীরে উঠে এসেছেন। তাঁর প্রাণ-মন আচ্ছন্ন। কুরুবংশের সবচেয়ে বুড়ো মানুষটি, যিনি ধৃতরাষ্ট্রের বাবারও অগ্র-জন্মা, তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবার শেষে মাবা গেলেন। যুধিষ্ঠির সেই মানুষটির কথা ভাবতে ভাবতেই গঙ্গাতীরে উঠছিলেন। কিন্তু আর সহ্য করতে পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন গঙ্গার বেলাভূমিতে।

ভাইরা ছিলেন। কৃষ্ণ ছিলেন। সবাই যুধিষ্ঠিরকে বীজন-সেচন করে সুস্থির করে তুললেন। কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনের অকাল-মৃত্যু, প্রিয়-প্রিয়তম ব্যক্তিদের তাঁরই কারণে আত্মবলিদান তিনি সহ্য করতে পারছেন না। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— এই অকাবণ প্রাণহানিতে কোনও দায়ই নেই তোমার। আমারই দোষ— কারণ আমি সেই দুর্বুদ্ধি পুত্রের কথা শুনে চলেছি— দুর্যোধনমহং পাপমন্ববর্তং বৃথামতিঃ। আমার ছোটভাই বিদুর আমাকে পই-পই করে বারণ করেছিলেন। আমি শুনিনি। বিদুর বলেছিলেন— দুর্যোধনের দোষেই এই কুরুবংশ সমূলে বিনষ্ট হবে। কিন্তু আমি শুনিনি। তাকে কারাগারেও বন্দি করিনি। এমনকী বিদুর আমাকে এমনও বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে— যুধিষ্ঠিরকে যদি আপনি রাজা নাও করেন, তবে আপনি নিজে মধ্যস্থ হয়ে রাজ্য পালন করুন। আমি তাও শুনিনি। আমি দুর্যোধনের মতেই চলেছি। তার ফল যা হবার হয়েছে। কিন্তু এই সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে এমন কিছু দেখছি না, যার মধ্যে তোমার কোনও শোকের কারণ থাকতে পারে— ন শোচিতব্যং ভবতা পশ্যামীহ জনাধিপ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে গেলেন। যুধিষ্ঠির শুনলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর শোকবেগ কিছু প্রশমিত হল না। হওয়ার কারণও নেই। একেক জনের শোক-হর্ষের কারণ এবং পরিধি একেক রকম। ধৃতরাষ্ট্র সারা জীবন তাঁর দুর্যোধন-দুঃশাসনের গণ্ডির বাইরে চিন্তা করেননি। কীভাবে তাঁর পুত্রেরা রাজা হতে পারে, কীভাবে তারাই শুধু সুখে থাকবে— এই ক্ষুদ্র চিন্তায় যিনি জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে শুধু এইটাই বলা সম্ভব— বাবা! শোকের যদি কিছু ঘটে থাকে, তবে আমার কিংবা গান্ধারীরই সেটা ঘটেছে। আমার একশো ছেলে মারা গেছে— শোচিতব্যং ময়া চৈব গান্ধার্য্যা চ মহীপতে— তোমার তো তেমন কিছু হয়নি, বাবা! তুমি কেন শোক করছ?

কী করে বোঝাবেন যুধিষ্ঠির? কেন সবার দুঃখ ছাপিয়ে তাঁর দুঃখ বড় হয়ে উঠছে? ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকে বোঝা যায়— শত পুত্রের মৃত্যুর পরেও তাঁর যেন এক ধরনের সান্ত্বনা আছে। তিনি যেন বুঝেই ফেলেছেন— ছেলেরা দুষ্টবুদ্ধি ছিল, সেই পাপে তারা গেছে। পাপের প্রতিফল মৃত্যু, আর সেই মৃত্যুর ফলে পিতামাতার শোক— ফলং প্রাপ্য মহদ্ দুঃখং নিমগ্নঃ শোক-সাগরে। খুব সোজা সরল হিসাব। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের জীবনে তো এই সোজা সরল হিসাব নেই। কেমন করে তিনি মনকে বোঝাবেন? সারা জীবনের যন্ত্রণার জটিলতায় তাঁর মন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে— ভীষ্ম

কী পাপ করেছিলেন ? তিনি মারা গেলেন কেন ? কী করেছিলেন দ্রোণাচার্য ? তিনি তো কুরু-পাণ্ডব-বংশের কেউ নন ? তিনি বেঘোরে প্রাণ দিলেন কেন ? কী করেছিল অভিমন্যু ? কোন পাপে সেই সদ্য-যুবকের প্রাণ গেল। এমনকী দুর্যোধনের আর আর ভাইরা, কর্ণ, শল্য— এঁদের জন্যও তাঁর যন্ত্রণা কিছু কম নেই ? এ সব কথা কেমন করে বোঝাবেন যুধিষ্ঠির ? সেই যেদিন অস্ত্র-পরীক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য সবাইকে এক পংক্তিতে দাঁড় করিয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রথম ডেকে বলেছিলেন—বৎস যুধিষ্ঠির ! তুমি কী দেখতে পাচ্ছ, সেদিন কী দেখেছিলেন তিনি ?

যুধিষ্ঠির দেখেছিলেন— একটি গাছের ওপর দ্রোণাচার্য একটি খেলনা পক্ষী বসিয়ে রেখেছেন পত্রান্তরালে। যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন পাখিটাকে বাণবিদ্ধ করতে হবে। কিন্তু দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন— বৎস যুধিষ্ঠির ! তুমি কী দেখতে পাচ্ছ ? তুমি কি গাছটাকে দেখতে পাচ্ছ ? আচ্ছা, এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে কি দেখতে পাচ্ছ তুমি ? আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার ভাইরাও তো দাঁড়িয়ে আছে, তুমি কি ওদেরও দেখতে পাচ্ছ ?

কী করে বুঝবেন যুধিষ্ঠির, আচার্য দ্রোণ, যাঁকে তিনি এত শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন সেই আচার্যের প্রশ্নের মধ্যে কোনও জটিলতা থাকবে ? আচার্য কি শিষ্যের মন বোঝেন না ? সরল শিশুকে প্রশ্ন করা হল— তোমার কাছে দশটি আম ছিল। তুমি তোমার ভাইকে চারটি আম দিয়ে দিলে ? তোমার হাতে কটা রইল ? শিশু গুনতে থাকে— এক, দুই, তিন, চার। শিক্ষক প্রথমে নির্বিকার-ভাবে মাঝখান থেকে বললেন— ওরে ! এটা যোগ হবে না, বিয়োগ হবে ? শিশু বলল— বিয়োগ। মাস্টারমশাই ছাত্রের আত্মবিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য চোখ গরম করে বললেন— অ্যাঁ, এটা বিয়োগ ? হতচকিত বালক হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে শিক্ষককে সমর্থন করে— না স্যর ! যোগ।

অঙ্কে ভুল হয়ে গেল। সরল ছাত্র কী করে ভাববে— তাঁর মাস্টারমশাই অঙ্ক পরীক্ষার সঙ্গে আরও একটা পরীক্ষা করছেন। ভাষার জটিলতায় তার মনোবল পরীক্ষা করছেন। সরল শিশু যেমন জটিলতার ভাষা বোঝে না, যুধিষ্ঠিরও তেমনই বোঝেন না— তাঁর আচার্য, তাকে লক্ষ্যভেদের চেয়েও বড় এক পরীক্ষায় নিমজ্জিত করেছেন। বোঝেন না বলেই তাঁর কত সরল উত্তর— হ্যাঁ আচার্য ! আমি দেখতে পাচ্ছি— আমার সামনে এই বিশাল বনস্পতি, ডালপালা-পাতায় ভরা বিশাল বনস্পতি। দেখতে পাচ্ছি আপনাকে, কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ভাইদের দেখতে পাচ্ছি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্যত-শীর্ষ। আর ওই যে শিল্পীর নিপুণ হাতে বানানো পক্ষীটি— সেটাও দেখতে পাচ্ছি— বার বার সব দেখছি, দেখতে পাচ্ছি— ভবন্তঞ্চ তথা ভ্রাতৃন্ ভাসঞ্চেতি পুনপুনঃ। যেন সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর ওই পাখিটি।

অঙ্কে ভুল হয়ে গেল। আচার্য একটুও খুশি হলেন না। বোর্ডে অঙ্ক কষতে এসে প্রথম চরণেই ভুল করলে মাস্টারমশাই যেমন চোখটি ছোট করে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন— বেঞ্চে গিয়ে বোস। যথেষ্ট হয়েছে। দ্রোণ সেইভাবে অখুশি হয়ে গালাগালি দিলেন— সরে যাও এখান থেকে। তোমার দ্বারা হবে না— তমুবাচ অপসর্পেতি...নৈতচ্ছক্যং ত্বয়া বেত্তুং লক্ষ্যমিত্যেব কুৎসয়ন্।

হতবাক যুধিষ্ঠির অঙ্ক মেলাতে না পেরে কেমন করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কেমন তাঁর মনের অবস্থা হয়েছিল— মহাভারতের কবি সে সব কথা কিছু বলেননি। বলেননি বলেই আরও জানি— যুধিষ্ঠির হতচকিত হলেও তাঁর নিজস্ব অঙ্কের হিসাবে তিনি স্থির। লোকচক্ষে সে হিসাব যত বড় ভুলই হোক— আচার্যের সামনে সব দেখার সেই হিসাবটুকুই তাঁর জীবনের অঙ্ক। তিনি সব দেখতে পান— বিশাল বনস্পতিকে দেখতে পান, আচার্যকে দেখতে পান, ভাইদের দেখতে পান, আর সেই অকিঞ্চিৎকর পাখিটিও দেখতে পান।

ধৃতরাষ্ট্র সারা জীবন ধরে শুধু পুত্রের রাজত্ব-প্রাপ্তি নিয়ে চিন্তা করেছেন, অতএব পুত্রের মৃত্যুর পর সেটাই তাঁর একমাত্র শোক। কিন্তু যিনি ভীষ্মকে দেখেছেন বিশাল বনস্পতির মতো, যিনি আচার্যকে বরণ করেছিলেন গুরু হিসেবে, যে ভাইদের তিনি চেনেন ভাই হিসেবেই— কুরু-পাণ্ডবদের বিভেদ যাঁর কাছে এক রাজনৈতিক কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছু নয়, এমনকী কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধে দূর দূর থেকে উড়ে আসা স্বপক্ষীয়— বিপক্ষীয় পদাতিক, ভাড়া করা সৈন্য-পক্ষীগুলিও যাঁর শোকদৃষ্টি এড়ায়

না, তাঁর অক্ষ কোনওদিন মেলে না। আচার্যের সামনে অস্ত্র-পরীক্ষার দিনে সব দেখতে পাওয়ার মধ্যে যে অকৃতকার্যতা ছিল, সেই অকৃতকার্যতা আজ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেও কাজ করছে— তিনি রাজা হতে পারছেন না। রাজা হতে চাইছেন না। কারণ লক্ষ্যভেদের সময় যেমন অর্ধনিমীলিত একচক্ষুতে একতম শিকার তাঁর চোখে পড়েনি, তেমনই আজও একচক্ষুর একাগ্রিকা দৃষ্টিতে তিনি রাজত্বের দিকে তাকিয়ে নেই।

তিনি সব দেখতে পান, সবার দিকে তাঁর দৃষ্টি আছে বলেই সকলকেই তিনি হারিয়ে বসে আছেন। মনের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর যুদ্ধ চলে। কেউ তাঁর সম-দৃষ্টির ব্যবহারে খুশি নয়। ভীম নয়, হয়তো অর্জুনও নয়, দ্রৌপদী নয়, নকুল-সহদেব তো নয়ই। এমনকী গর্ভধারিণী জননী পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। সবাইকে তিনি খুশি করতে চান, এমনকী শত্রুপক্ষকেও। অথচ কেউ তাঁর সম-ব্যবহারে খুশি নয়। তাঁকে তাই সব সময় যুদ্ধ করতে হয় নিজের সঙ্গে, অস্ত্রহীন নিরন্তর সংগ্রাম। কথাটা অন্য কেউ বুঝতে না পারুক, চতুর-শিরোমণি কৃষ্ণ ঠিক বুঝেছিলেন। ঠিক সময়ে যেভাবে তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিলেন, তাতে আজকের দিনের মহান মনস্তত্ত্ববিদরাও হার মানবেন।

রাজসিংহাসনে বসতে অনিচ্ছুক যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ বলেছিলেন— মানুষের দুই রকমের অসুখ হয়, দাদা! শরীরের অসুখ আর মনের অসুখ— দ্বিবিধো জায়তে ব্যাধিঃ শারীরো মানসস্তথা। এই দুই ব্যাধি কিন্তু আলাদা থাকতে পারে না। এ ওকে সাহায্য করে, ও একে সাহায্য করে। অর্থাৎ শরীর খারাপ হলে মনও আস্তে আস্তে বিবশ হয়, আবার মন খারাপ হলে শরীরও গোলমাল করতে থাকে। তাই বলছিলাম— এই শরীর আর মনের অসুখ পরস্পর প্রতিপূরকের মতো জড়িয়ে আছে— পরস্পরং তয়ো-র্জন্ম নির্দ্বন্দ্বং নোপপদ্যতে।

কৃষ্ণ বলতে চাইলেন— যুধিষ্ঠির মনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করতে করতে শরীরটিও খারাপ করে ফেলেছেন। কিন্তু কেন এমন হবে? যুধিষ্ঠির তো মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নন। সাধারণ জনে যখন দুঃখে পড়ে, তখন সুখের কথা স্মরণ করে দিন কাটায়। ধনৈশ্বর্য-প্রতিপত্তিহীন জমিদারপুত্রেরা এ বিষয়ে স্মরণীয়। আর কতক মানুষ আছে যারা সুখের দিনে দুঃখের কথাগুলি স্মরণ করে দিন কাটায়। কৃষ্ণ বললেন— কিন্তু তুমি তো এর কোনওটাই নও দাদা। তুমি দুঃখের দিনে দুঃখ ঘোচানোর কোনও চিন্তা করনি, আর আজ সুখের দিনেও কোনও সুখের কথা চিন্তা করছ না— স ত্বং ন দুঃখী দুঃখস্য ন সুখী সুসুখস্য বা। তা, এমন একটা লোককে আমি কী বা বলব? যার দুঃখবোধের ক্ষমতাই নেই, সুখ-দুঃখে যার সমান দৃষ্টি, তেমন একটা স্বভাব-শান্ত লোককে আমি কী বোঝাতে পারি, দাদা— অথবা তে স্বভাবো'য়ং যেন পার্থাবকৃষ্যসে।

কৃষ্ণ পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। একে একে অন্যায় পাশা-খেলা, বনবাস, অজ্ঞাতবাস, বিরাটনগরে কীচকের আচরণ, অভিমন্যু-বধ— সব একে একে স্মরণ করিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু তাতে যুধিষ্ঠিরের কোনও বিকার হল না। কৃষ্ণ এবার আসল কথাটা বললেন। বললেন— তুমি ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে যে বিরাট যুদ্ধ করে এসেছ, দাদা, আজ সেই রকম একটা যুদ্ধ করতে হবে তোমার মনের সঙ্গে। শুধু তোমার মনের সঙ্গে— মনসৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধম্ উপস্থিতম্।

বস্তুত দ্রোণ-ভীষ্মের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র-যুদ্ধের কথা বলছেনও না কৃষ্ণ। কারণ এঁদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির কতটুকুই বা যুদ্ধ করেছেন? মনে রাখতে হবে ভীষ্ম-দ্রোণকে বধ করার ব্যাপারেও যুধিষ্ঠিরকে সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয়েছে তাঁর মনের সঙ্গেই। যে পিতামহের কাছে সারা জীবন তিনি স্নেহ-প্রশ্রয় পেয়েছেন, যে আচার্যের সাধুবাদ সদা-সর্বদা তাঁকে শক্তি, উৎসাহ আর উদ্দীপনা জুগিয়েছে— যুদ্ধ লাগলে সেই পিতামহ এবং আচার্যের প্রাণহানি করার চেষ্টা করতে হবে— এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে যুধিষ্ঠির কোনওদিন মুক্তি পাননি। যুদ্ধ লাগার আগে এই দু'জনই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে উদ্‌যুক্ত করেছেন। যুধিষ্ঠিরের মানসিক দ্বন্দ্ব তাতে থেমে যায়নি। তাঁদের মৃত্যুর পর সেটা বরং বেড়েছে।

এখন আরেক লড়াই। তাঁকে রাজা হতে হবে। কৃষ্ণ বলেছেন— এ লড়াইটা আরও কঠিন, দাদা ! এ লড়াই করতে হবে মনের সমস্ত যুক্তি সাজিয়ে নিজের কাজের মাধ্যমে। লড়াই করতে হবে নিরাকার এক মুক্ত মনের সঙ্গে, যেখানে ধনুক-বাণের কোনও কার্যকারিতা নেই, আত্মীয়-বন্ধুর ভূমিকা নেই কোনও। তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে শুধু নিজের সঙ্গে— আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্। সবার শেষে কৃষ্ণ জোর দিয়ে বললেন— এ যুদ্ধ তোমায় জয় করতেই হবে, দাদা ! নইলে কী অবস্থা হবে তোমার— তস্মিন্ননির্জিতে যুদ্ধে কামবস্থাং গমিষ্যসি ?

২

নিবন্তর মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একজন শান্ত মানুষের যে কী অবস্থা হতে পারে যুধিষ্ঠির তা জানেন। কারণ তিনি নিজেই সেই অবস্থার শ্রেষ্ঠতম শিকার। কৃষ্ণ আজ তাঁকে মনের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করতে বলছেন, কিন্তু কৃষ্ণ জানবেন কী করে যে, যুধিষ্ঠিরের এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তাঁর জন্ম-লগ্ন থেকেই।

পাণ্ডু যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পত্নী কুন্তী দুর্বাসার মন্ত্রবলে ইচ্ছানুরূপী দেবতাকে পুত্রার্থে আহ্বান জানাতে পারেন, তখন প্রথমেই তিনি ধর্মরাজের কথা ভেবেছিলেন। কুন্তীকে তিনি বলেছিলেন— তুমি ধর্মকে আহ্বান কর। ধর্মের ঔরসে আমরা যে পুত্র পাব, তার মন কখনও অধর্মের দিকে যাবে না— দত্তস্যাপি চ ধর্মেন নাধর্মে রংস্যাতে মনঃ। আমার প্রজারাও তাকে সাক্ষাৎ ধর্ম বলে মেনে নেবে। সমস্ত কুরুবংশের মধ্যে সেই হবে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক।

কুন্তী স্বামীর কথা শুনে শুভদিনে শুদ্ধাচারে ধর্মদেবের পূজা করলেন। তারপর তাঁকে আহ্বান করলেন দুর্বাসার মন্ত্রে। ধর্মদেব উপস্থিত হলেন এবং মিলিত হলেন কুন্তীর সঙ্গে। সময়োচিত গর্ভধাবণ সম্পূর্ণ হল। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দুপুর বেলায়, সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগন থেকে তাঁর সহস্র-কিরণে পৃথিবীকে তপ্ত করে দিয়েছেন, সেই সময়ে কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মালেন। তাঁর জন্ম-লগ্নেই আকাশ থেকে দৈববাণী হল— এই বালক হবে ধার্মিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সত্যবাদী এবং বাজা— এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ। পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্রের নাম হবে যুধিষ্ঠির।

আশ্চর্য লাগে আমাদের— জন্ম-লগ্নেই যে মানুষটির ওপর নরোত্তম ধার্মিকের এক মার্কা মেরে দেওয়া হল, সদা-সত্য কথনের বিশাল মর্যাদায় যে শিশুটিকে চিহ্নিত করা হল, সারা জীবন ধরে সেই ধর্ম আর সেই সত্যবাদিতা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে এক পরম তত্ত্বের মতো, আদর্শের মতো। সারাক্ষণ তাঁকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে— আমি ঠিক কাজটিই করছি তো ? ধর্ম থেকে, সত্য থেকে আমি বিচ্যুত হচ্ছি না তো ? অন্য কেউ পাশা খেললে দোষ নেই, যুধিষ্ঠির পাশা খেললেই তিনি ধর্মচ্যুত। স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে না পারলে অন্যের ক্ষেত্রে তা পৌরুষের অপমান, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে তা ধর্ম-চ্যুতি।

আরও আশ্চর্য— কী বিপ্রতীপ মাহাত্ম্যই না তাঁর কাছে আশা করা হয়েছে ! একদিকে তিনি ধার্মিক শ্রেষ্ঠ নরোত্তম হবেন, সত্যবাদী হবেন, আর একদিকে তিনি রাজাও হবেন— বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্ব্যাং ভবিষ্যতি। ধর্ম, সত্য এবং রাজত্ব— একই ব্যক্তির মধ্যে চরম বিপ্রতীপ এই তিনটি গুণের সমাহার যেখানে সমস্ত মানুষের আশার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সেই ব্যক্তিকে মনের সঙ্গে কীরকম সংগ্রাম করতে হয়, তা একমাত্র যুধিষ্ঠিরই জানেন। হয়তো বা জানেন কৃষ্ণও ; নইলে জীবনের শেষ কল্পে এসে যুধিষ্ঠিরের যখন রাজা হওয়ার সময় এসেছে তখনই তিনি এই মানস-যুদ্ধের কথা তুলবেন কেন ? আসলে যুধিষ্ঠিরের জীবনে যখন রাজা হওয়ার সময় এসেছে, ধর্ম আর সত্যের পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে। তাঁর রাজা হওয়া তাই ঠিক ইতরজনের রাজা হওয়ার মতো নয়। ধর্ম সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হলে, তবেই যুধিষ্ঠিরের রাজ-যোগ উপস্থিত হয়। কারণ, তিনি ধর্মরাজ।

ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের জানাই—ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা বলেন ৫১৬৮ বছর পূর্বের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঠিক দুপুরবেলায় যুধিষ্ঠির জন্মলাভ করেন। তাঁর

জন্মরাশি বৃশ্চিক। সিংহ লগ্ন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই অন্যান্য পণ্ডিতদের সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের রাশি-নক্ষত্র বিচার করে তাঁর ভাগ্যফল ঘোষণা করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁর চরিত্রে অসাধারণ ধর্মপ্রবণতার সঙ্গে প্রবল রাজযোগও উপস্থিত। মধ্যজীবনের বনবাস বা অরণ্যচারিতাও কোষ্ঠীর বাইরে নয়। ধনবত্তার সঙ্গে আছে পুত্রহানি। চরম মানসিক অশান্তির সঙ্গে উৎকৃষ্ট ভ্রাতৃযোগ এবং পত্নীযোগও লক্ষণীয়। শেষ বয়সে মঙ্গলের দশায় রাজ্যলাভের কথাও গণতকারেরা ঘোষণা করেছেন।
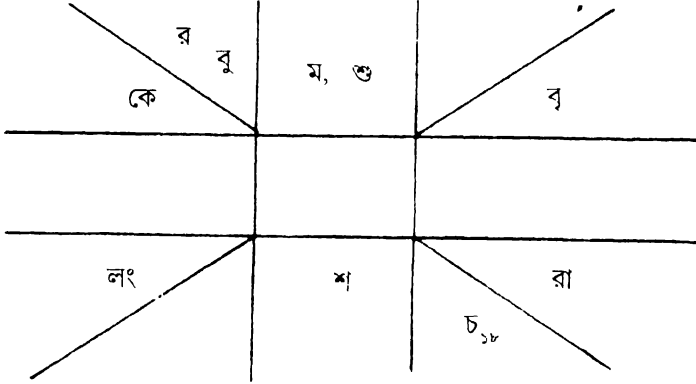
যুধিষ্ঠিরের কোষ্ঠী দেখে পণ্ডিতেরা বিচার করতে থাকুন। আরও গভীরভাবে, আরও নিখুঁত করে। কিন্তু আমরা জানি, মানুষের জীবন কোষ্ঠীর নিয়মে চলে না। যুধিষ্ঠিরেরও চলেনি। কোষ্ঠীতে আছে, তিনি ধার্মিক হবেন ; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ধর্ম যে কত কঠিন, কত বড়— তা শুধু তাঁর জীবন দিয়েই প্রমাণ করা যায়। একই রকমভাবে যুধিষ্ঠিরের রাজযোগ, যুধিষ্ঠিরের স্ত্রীযোগ। তাঁর সফলতা এবং অতি অবশ্যই তাঁর বিফলতাও কখনও অন্য কোনও লোকের মতো নয়। অন্য ধার্মিকের মতোও নয়, অন্য রাজার মতোও নয়, এমনকী অন্য অসফল মানুষের মতোও নয়। যুধিষ্ঠির যেখানে ধার্মিক, প্রেমিক অথবা রাজা, সেখানে শুধু একজনের সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা যায়— তিনি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই। যুধিষ্ঠির যা চাইছেন সেটাই হল আসল যুধিষ্ঠির বা সেটাই যুধিষ্ঠিরের আদর্শ, সেখানে তিনি উপমান। বাস্তব-জীবনে যুধিষ্ঠির যা করতে পেরেছেন, সেখানে যদি কোনও অসাফল্য থাকে, তবে সেই অসাফল্যের কারণ কখনওই প্রায় তিনি নন এবং সেই অসাফল্যের জায়গাটাতেই মানুষ যুধিষ্ঠিরকে প্রায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে। এই মানুষের পরিসরেই যুধিষ্ঠির উপমেয়-মাত্র। তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে হবে আদর্শ যুধিষ্ঠিরের। এ বড় কঠিন কাজ। তবু মানুষ যুধিষ্ঠিরকে পেতে হলে তাঁর জীবনের প্রথম পদক্ষেপ থেকে স্বর্গারোহণের পথ পর্যন্ত আমাদের অতি সাবধান হয়ে চলতে হবে।

কেমন লেগেছিল সেই দিনটি অথবা সেই মুহূর্ত, যখন উতলা বসন্তের হাওয়ায় পাণ্ডুর দ্বিতীয়া-পত্নী মাদ্রীর চিৎকার ভেসে এল— দিদি, আসুন শিগ্‌গির। আমি মরেছি। কুন্তী তাঁর তিন পুত্র আর নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রীর কাছাকাছি যাবার আগেই তাঁকে নিরস্ত হতে হল। মাদ্রী পুনরায় চিৎকার করে বললেন— তুমি একাই এস দিদি ! ছেলেরা ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাক— একৈব ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্ঠন্ত্বত্রৈব দারকাঃ। বেশ বুঝতে পারি— পাণ্ডু তাঁর প্রিয়া পত্নীর সঙ্গে হঠাৎ সঙ্গমে রত হলে মাদ্রী অসংবৃত ছিলেন। তাই পাণ্ডুকে কিন্দম মুনির শাপে মৃত অবস্থায় কোলে শুইয়ে রেখেও মাদ্রীকে ছেলেদের ব্যাপারে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে হয়েছে। কিন্তু ঠিক এই অবস্থায়, কুন্তী যখন একা মাদ্রীর নিকটতর হলেন, তখন চারটি ছোট ছোট ভাইদের আগলে দাঁড়িয়ে জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির কী ভাবছিলেন ?

কী ভাবছিলেন, মহাভারতের কবি তা বলেননি। কিন্তু আমরা জানি— যুধিষ্ঠির অন্তত পিতা পাণ্ডুর আকালিক সঙ্গম-তাড়না নিয়ে গবেষণা করছিলেন না। বরঞ্চ পিতার আকালিক মৃত্যুতে

শতশৃঙ্গ পর্বতের উপত্যকা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব এই মুহূর্তে যে একাকীত্বের মধ্যে পতিত হলেন, সে বুঝি তিনি ছাড়া আর কেউ অনুভব করলেন না। তখন তাঁর ষোলো বছর মাত্র বয়স। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শবদেহ নিয়ে যে দিন শতশৃঙ্গবাসী ঋষিরা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আছেন সেই চার ভাই এবং জননী কুন্তী। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর বনগমনের পর থেকে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। তিনি কুন্তীকে চেনেন বটে, কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রদের তিনি তখনও চেনেনই না।

কুন্তী এবং পাণ্ডব-পুত্রদের দেখবার জন্য সমস্ত হস্তিনাপুর সেদিন ভেঙে পড়েছিল। পাণ্ডুমাতা অম্বালিকা থেকে আরম্ভ করে ভীষ্ম, বিদুর, সত্যবতী সকলেই সেদিন কুরুসভার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। কেমন লেগেছিল যুধিষ্ঠিরের, যখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে সুবর্ণভূষণে মণ্ডিত অবস্থায় দেখতে পেলেন— ভূষিতা ভূষণৈশ্চিত্রৈঃ শতসংখ্যা বিনির্যযুঃ। জানি, ভাল করে জানি, যুধিষ্ঠিরের কিছুই মনে হয়নি। তিমি ভীম নন, অর্জুন নন, তিনি যুধিষ্ঠির। কী আশ্চর্য এই নামটা! যাঁরা যুদ্ধ করতে জানেন, যুদ্ধ জিততে জানেন, তাঁদের নামের সঙ্গে যুদ্ধ শব্দটার কোনও যোগই রইল না। অথচ যিনি যুদ্ধ করতে জানেন না, যুদ্ধ জয় করতে পারেন না, অস্ত্র পরীক্ষার আসরে যাঁকে আচার্যের তিরস্কার শুনতে হবে, তাঁকে জন্ম-লগ্নেই নামকরণ করা হল যুধিষ্ঠির— অর্থাৎ যুদ্ধের সময়েও তাঁর মস্তিষ্ক স্থির থাকবে। এইখানেই স্মরণ করতে হবে কৃষ্ণের সেই অনবদ্য উক্তি— এ যুদ্ধ ধনুক-বাণ দিয়ে হয় না, সৈনিক-ভৃত্যদের দিয়েও এ যুদ্ধ হয় না, বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নিয়েও এ যুদ্ধ জয় করা যায় না— যত্র নৈব শরৈঃ কার্য্যং ন ভৃত্যৈ র্ন চ বন্ধুভিঃ। এ হল নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে চিরকাল তাঁকে স্থির থাকতে হবে বলেই জন্ম-লগ্নেই ধর্মদেবের দেওয়া সেই নাম— যুধিষ্ঠির ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডোঃ প্রথমজঃ সুতঃ।

শতশৃঙ্গবাসী মুনিরা পাণ্ডুর স্থলাভিষিক্ত কার্যকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দিয়ে বললেন— সাক্ষাৎ ধর্ম থেকে পাণ্ডুর এই জ্যেষ্ঠপুত্র জন্ম-গ্রহণ করেছে, এর নাম যুধিষ্ঠির— সাক্ষাদ্ ধর্মাদ্ অয়ং পুত্রস্তত্র জাতো যুধিষ্ঠিরঃ। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর অন্য পুত্রদের জন্ম-কথাও শুনলেন। কিন্তু সেদিন তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসন থেকে নেমে এসে প্রথম পরিচিত পাণ্ডু-পুত্রদের সালিঙ্গনে কুশল প্রশ্ন করেননি। পিতৃহারা ষোলো বছরের জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে তিনি একবারও বলেননি— তুমি কুলজ্যেষ্ঠ— হস্তিনাপুরে তোমার অধিকার কেউ সন্দেহ করে না। না, ধৃতরাষ্ট্র এ-কথা বলেননি। শতশৃঙ্গবাসী ঋষিরা কিন্তু ইঙ্গিত করে বলেছিলেন— ধর্মাত্মা পাণ্ডু বনে থেকেও পাঁচটি পুত্রের মাধ্যমে পিতৃপিতামহের বংশ-পরম্পরা রক্ষা করেছেন— এষ পৈতামহো বংশঃ পাণ্ডুণা পুনরুদ্ধৃতঃ।

যুধিষ্ঠির কি এই ইঙ্গিত বোঝেননি? ঠিকই বুঝেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বোঝেননি। বুঝেও বোঝেননি। কেননা, বুঝলে এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজপদে অঙ্গীকার করতে হয়। এই সরল অনুধাবন-প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র রাজোচিত গাম্ভীর্যে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর দাহকার্য তথা শ্রাদ্ধের কথা ঘোষণা করেছেন। ছোটভাই মারা যাওয়ায় তিনি শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে শোক নিশ্চয়ই কুন্তী কিংবা পাণ্ডবদের চেয়ে বেশি ছিল না।

লক্ষণীয় বিষয় হল, পাণ্ডুর দাহ এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণ সম্পন্ন হয়ে গেলে পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের আমরা যখন হস্তিনায় প্রবেশ করতে দেখছি, তখন ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁর পুত্রদের কাউকে প্রত্যুদ্‌গমন করে পাণ্ডবদের ঘরে নিয়ে আসতে দেখছি না। লক্ষণীয়, গঙ্গা-তীরে অশৌচ-ক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধের শেষে হস্তিনানগরীর পৌরজন এবং জনপদবাসীরাই পাণ্ডবদের নিয়ে হস্তিনায় প্রবেশ করেছেন— পাণ্ডবান্ ভরতর্ষভান/ আদায় বিবিশুঃ সর্বে পুরং জানপদাস্তদা। শতশৃঙ্গের পর্বতগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আসা পাণ্ডব-ভাইরা পুরঃপ্রবেশের পথে কৌরব ভাইদের কাছ থেকে এমন কোনও উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন না, যাতে নতুন পিতৃগৃহ তাঁদের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। ধৃতরাষ্ট্রও এ ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহ দেখাননি।

রাজধানীতে রাজবাড়ির কাছাকাছি একটা থাকবার জায়গা নিশ্চয়ই পাণ্ডবরা পেয়েছিলেন; এমনকী শরীর ধারণের উপযুক্ত খাবারও তাঁরা পেয়ে যাচ্ছিলেন— সংব্যবর্দ্ধন্ত ভোগাংশ্চ ভুঞ্জানা পিতৃবেশ্মনি। কিন্তু সে শুধু খাবারই। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই মর্যাদা মোটেই লাভ করছিলেন

না, যা দুর্যোধন লাভ করেছিলেন পিতার কাছে। পার্থক্য একটা ছিল এবং সেটা ভালভাবেই ছিল। ভীমকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্য দুর্যোধন যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা কার্যকর করার জন্য রাজযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন দুর্যোধন। গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটিতে জায়গা ঠিক করা, সেখানে অস্থায়ী গৃহনির্মাণ করা, প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা রাখা এবং সমস্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রের সহযোগিতা পেতে দুর্যোধনের কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভাইদের নিয়ে থাকতে হত ভৃত্যের মতো। এমনকী অস্থায়ী কার্যনির্বাহিক রাজা ধৃতরাষ্ট্র অথবা তাঁর পুত্র অন্যায় করলেও, তা জোরে বলবার সাহস ছিল না পাণ্ডবদের।

দুর্যোধন যখন সুপরিকল্পিতভাবে ভীমকে বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন, তখন দুর্যোধনের বাইরের ব্যবহার দেখে যুধিষ্ঠির কিছুই বুঝতে পারেননি। মহাভারতের কবি টিপ্পনী কেটে বলেছেন— ভাল লোক দুনিয়াটাকে সব সময় ভালই দেখে— স্বেনানুমানেন পরং সাধুঃ সমনুপশ্যতি। ভীমকে না দেখে তিনি ভেবেছেন— ভীম আগেই বাড়ি চলে গেছেন। একবারও তাঁর সন্দেহ হল না— সবাই আছে, শুধু ভীম নেই কেন? তারপর যখন বাড়িতে ফিরে দেখলেন ভীম নেই, তখন যুধিষ্ঠিরের মন ভয়ে একেবারে আকুল হয়ে উঠল। একবার মাকে জিজ্ঞাসা করেন— ভীম কোথায় গেল ; একবার এখানে-সেখানে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন, তারপর অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়ে মায়ের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেন— ছাতা-জুতো, উত্তরীয়, উষ্ণীষ— ভীমের কোনও জিনিস আমরা পরিত্যক্ত অবস্থায় কুড়িয়ে পাইনি। আর তাকে তো দেখছিই না। আমার ভাল মনে হচ্ছে না, মা— নহি মে শুধ্যতে ভাবস্তং বীরং প্রতি শোভনে। সে যে কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে আছে— এ কথা বিশ্বাস করতে আমি একটুও রাজি নই, আমার মনে হচ্ছে— তাকে মেরে ফেলা হয়েছে, মা— যতঃ প্রসুপ্তং মন্যে'হং ভীমং নেতি হতস্ত সঃ।

প্রথমবার, হস্তিনাপুরে বসবাসের সময়ে এই প্রথমবার যুধিষ্ঠির কারও নাম না করে কৌরবদের অন্তর্ঘাত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সন্দেহ এতটাই সত্য ছিল যে, মহাভারতের কবি তাঁকে এই মুহূর্তে রীতিমত বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত করেছেন— ধর্মরাজেন ধীমতা। ভীমকে দেখতে না পেয়ে বীরজননী কুন্তী বিদুরকে ডেকে এনেছেন নিজের ঘরে। কুন্তীর উৎকণ্ঠা দেখে বিদুরও পাণ্ডবদের নিয়ে পুনরায় ভীমের অন্বেষণে বেরিয়েছেন। ভীমকে পাওয়া যায়নি। কুন্তী তখন বিদুরের কাছে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব-সন্দেহ পুনরাবৃত্তি করেছেন। বলেছেন— ক্ষমতালোভী নির্লজ্জ দুর্যোধন ভীমকে হয়তো মেরেই ফেলেছে— নিহন্যাদপি তং বীরং জাতমন্যুঃ সুযোধনঃ।

আমরা জানি— ভীম মারা যাননি। দুর্যোধন তাঁকে মারার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। সমস্ত পাণ্ডব-ভাইদের মধ্যে ভীমের ব্যাপারেই দুর্যোধনের চরম আশঙ্কা ছিল এবং তাঁকে মেরে দুর্যোধন তাঁর পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। দুর্যোধনের এই বুদ্ধিটুকু যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্নেই ধরে ফেলেছেন— সেটা আমরা দেখেছি আগেই, কিন্তু এই বুদ্ধির জন্যই যে কবি তাঁকে 'ধীমান্' বলে চিহ্নিত করেছেন, তা মোটেই নয়। বরঞ্চ বাসুকির পাতালপুরী থেকে ফিরে আসার পর যুধিষ্ঠির যেভাবে ঘটনার যবনিকাপাত করেছেন— তার মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা লুকিয়ে আছে।

ভীম বেঁচে ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। ভাইদের সামনে, মায়ের সামনে দুর্যোধনের সমস্ত অপকর্ম এবং কৌশলগুলি সবিস্তারে শোনাতে লাগলেন ভীম। ভীমের যা চরিত্র তাতে খুব চুপিচুপি সব কথা বলে ভবিষ্যতের শিক্ষা নেবার লোক তিনি নন। ভীমের কথার মধ্যেই যুধিষ্ঠির তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন— একদম চুপ ! এ সব কথা কারও সামনে আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কোরো না— তূষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং বাক্যং কথঞ্চন।

এই একটা ধমকের মতো কথা বলেই যুধিষ্ঠির যেন পিতৃহারা ভাইদের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি জানেন— জননী কুন্তী অধৈর্য হয়ে বিদুরের কাছে দুর্যোধনের কুপরিকল্পনা নিয়ে নানা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শুধু ভরসা এই— মহামতি বিদুর পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁদের সন্দেহের কথা দুর্যোধনের কানে গেলে সে যে আরও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে— সে-কথা বলাই বাহুল্য। বিদুর এতকাল ধরে কুরুসভার প্রবর-মন্ত্রী। কুন্তীর কথা শুনে বিদুর তাঁর তাৎক্ষণিক

প্রতিক্রিয়া চেপে রেখেও বলেছিলেন— এরকম করে জোরে জোরে বলবেন না, বউদিদি— মৈবং বদস্ব কল্যাণি ! এ সব কথা শুনিয়ে এখন যদি দুর্যোধনকে বকাবকি করি, তাহলে উলটে সে আরও অনিষ্ট করবে আপনার— প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষে'পি প্রহরেত্তব ।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠির যে প্রায় ধমকে উঠলেন ভীমকে, তার একমাত্র কারণ, বিদুরের দূরদর্শী-বুদ্ধিটুকু যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসাৎ করেছেন। বিদুর যে-কথা কুন্তীকে বলেছিলেন ভীমকে ফিরে পাওয়ার আগে, ঠিক সেই কথাটিই যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেছেন ভীম ফিরে আসার পরে। যুধিষ্ঠির জানেন, তিনি এখন শুধু পিতৃহারাই নন, রাজ্যহারাও বটে। কুন্তীর হাত ধরে ঋষিদের সামনে নিয়ে পাঁচ ভাই যেদিন রাজবাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিনও তাঁরা রাজপুত্রের প্রাপ্য সম্মান পাননি। আর আজও তাঁরা কুরুদের বাড়িতে রয়েছেন অনুগৃহীতের মত। অন্যের অধিগৃহীত ভূমিতে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থেকে যদি পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করতে হয়, তবে ধৈর্যশীল হতেই হবে— পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এটা জানেন। খুব ভাল করে জানেন। আর জানেন বলেই মহামতি বিদুরের ধীর-গভীর নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান তিনি গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন প্রথম থেকেই।

মহাভারতের একেবারে শেষ দিকে বিদুর যখন মারা গেলেন, ঠিক তার আগে আগে যুধিষ্ঠির বিদুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বনে। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী— সকলেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বসবাস করছিলেন, বিদুরও ছিলেন তাঁদের কাছাকাছি। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই বিদুরের প্রথম সংবাদ পেলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন— বিদুর সাংঘাতিক তপস্যা করছেন। আহার করেন না, বিশ্রাম করেন না, ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন— বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ। এই শূন্য কাননের মধ্যে ব্রাহ্মণরা কখনও তাঁকে দেখতে পান, কখনও পান না।

এই সব কথা বলতে বলতেই যুধিষ্ঠির বিদুরকে চকিতে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির তাঁর পিছন পিছন ছুটলেন। বার বার ডাকতে থাকলেন কাকা ! আমি যুধিষ্ঠির, আমি হস্তিনার রাজা। বিদুর কিছুতেই কান দিলেন না। বন থেকে বনান্তরে তিনি পাগলের মতো ছুটে চলেছেন, আর মহারাজ যুধিষ্ঠির ছুটছেন তাঁর পিছন পিছন। মহাভারতের কবি মন্তব্য করলেন— এক মহাবুদ্ধি ব্যক্তি আরেক মহাবুদ্ধি মানুষের অনুগমন করলেন— অভিজজ্ঞে মহাবুদ্ধিং মহাবুদ্ধির্যুধিষ্ঠিরঃ।

এই যে একটি মাত্র পংক্তির মধ্যে যুধিষ্ঠির এবং বিদুরের বুদ্ধির সামান্য ঘটল— এই সমানতাই সব নয়। একটু পরেই ধাবমান বিদুর এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এবং যুধিষ্ঠির দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। বিদুর যুধিষ্ঠিরের দিকে অনিমেষ স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন আর মনে হল যেন বিদুরের চোখ যুধিষ্ঠিরের চোখে, তাঁর প্রাণ যুধিষ্ঠিরের প্রাণে, তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করল। কবি আবারও মন্তব্য করলেন— বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গে প্রবেশ করলেন— স যোগবলমাস্থায় বিবেশ নৃপতেস্তনুম্।

কথাগুলির মধ্যে অলৌকিকতার অংশটুকু ছেঁটে দিলেও বলা যায়— নীতি এবং ধর্মের যে সাবাংশটুকু দিয়ে মহাকবি বিদুরের চরিত্র এঁকেছেন, ঠিক সেই সারাংশ যুধিষ্ঠিরের অন্তরে থাকায় যুধিষ্ঠিরের 'দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি' সবই বিদুরের মতো। জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে যুধিষ্ঠির বিদুরের নীতি দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন এবং জীবনের শেষপর্বে বিদুরকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন। বিদুরই ছিলেন যুধিষ্ঠিরের আদর্শ। যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষ ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণ দিয়ে আদর্শকেই শুধু আত্মসাৎ করেন।

কতগুলি প্রলাপজ্ঞ পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের অবৈধ সন্তানরূপে চিহ্নিত করেছেন। বলা বাহুল্য— এঁরা অবৈধতার মধ্যেই একমাত্র রস খুঁজে পান। অতএব কোনও মহাভারতীয় প্রমাণ ছাড়াই এঁরা নাটক লিখতে ভালবাসেন। এঁদের খেয়াল থাকে না— অবৈধতার কোনও বিষয় মহাভারতের কবি লুকোননি। অতএব যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে নতুন কোনও অবৈধতার আবিষ্কার করতে গেলে রস জারিয়ে ওঠে এবং তাতে সমানধর্মা সহৃদয়ের রসাভাস পুষ্ট হয়। তাঁর দিক থেকে লাভ এইটুকুই।

জীবনের প্রথম বড় একটি সিদ্ধান্ত দেবার সময় যুধিষ্ঠির যে বিদুরের অনুগামী হলেন, তার একটি রাজনৈতিক কারণও আছে। ধৃতরাষ্ট্রের সভায় যাঁরা মন্ত্রী ছিলেন, বিদুর তাঁদের অন্যতম। উপায় না থাকলেও একমাত্র তিনি এবং অংশত পিতামহ ভীষ্ম হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার স্বীকার করতেন। এর মধ্যে পিতামহ তত স্পষ্ট করে সে-কথা বলতেন না, বিদুর সেটা বলতেন। বিদুর অনীতি অন্যায় মেনে নেন না। ধৃতরাষ্ট্রের মতো বড়ভাই বললেও মেনে নেন না। বিরুদ্ধ-জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজকুলের এক প্রধান মন্ত্রণাদাতার স্পষ্ট-পক্ষপাত যদি লাভ করা যায়, তবে সেটা যুধিষ্ঠিরেরই লাভ। যুধিষ্ঠির তাই আরও বেশি করে বিদুরের অনুগামী হতে চাইলেন। নীতি, যুক্তি এবং ধর্মবোধের সাধর্ম্য থাকায় বিদুরও সব সময় যুধিষ্ঠিরকে যথোপযুক্ত বুদ্ধি দিয়ে যেতে থাকলেন— ধর্মাত্মা বিদুরস্তেষাং প্রদদৌ মতিমান্ মতিম্।

ভীমকে চুপ করতে বলা মানে শত্রুপক্ষকে নিজেদের পরিকল্পনা বুঝতে না দেওয়া। অর্থাৎ তোমাদের কুপরিকল্পনা আমরা বুঝে গিয়েছি, কিন্তু দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে শোরগোল করে লোক জমিয়ে দুর্যোধনের রাজনৈতিক ফয়দা বেশি হতে দেব না। কেন না তাতে দুর্যোধন সোজাসুজি ঘটনা অস্বীকার করবেন এবং নিজের রাজনৈতিক প্রভাব এবং টাকাপয়সা খরচা করে হস্তিনাপুরের রাজনীতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসবেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে থামিয়ে দিয়ে ভাইদের বললেন— আজ থেকে তোমরা সযত্নে একে অন্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে— ইতঃ প্রভৃতি কৌন্তেয়া রক্ষতান্যোন্যমাদৃতাঃ। যুধিষ্ঠির ভাইদের সদা সর্বদা সচেতন হয়ে থাকতে বললেন, কিন্তু ভীমের প্রতি দুর্যোধন যে অন্যায় করেছিলেন, সেই অন্যায়ের জন্যই পাণ্ডবদের ওপর বিদুরের পক্ষপাত রয়ে গেল। যুধিষ্ঠির কৌরবদের এই প্রথম অন্যায় একেবারে প্রচার করতে না দেওয়ার ফলে বিদুরের মতো মহাবুদ্ধি-মন্ত্রী প্রথম থেকেই পাণ্ডবদের পক্ষপাতী হয়ে গেলেন এবং সাধ্যমত তিনি পাণ্ডবদের বুদ্ধি জোগাতে লাগলেন কৌরবদের মন্ত্রিসভায় থেকেও।

৩

পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ হল। এই অস্ত্রশিক্ষার আসরে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ একেবারেই যেন বেমানান। যে ধ্যান, যে নিষ্ঠা নিয়ে একজন উচ্চাশী ব্যক্তি অস্ত্রশিক্ষা করে, সেই ধ্যান কিম্বা সেই নিষ্ঠা অর্জুন-ভীম-অথবা কর্ণ-দুর্যোধনদের ছিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তা ছিল না। অথবা সে উচ্চাশাও বুঝি ছিল না। তাঁর ধ্যান এবং নিষ্ঠা অন্যত্র ন্যস্ত হওয়ার ফলে, অস্ত্র-শিক্ষার আসরে তিনি ছিলেন প্রায় ফেল-করা ছাত্রটির মত। বনের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে গাছের ওপর পক্ষী রেখে দ্রোণাচার্য যেদিন প্রথম অস্ত্র-পরীক্ষা নিলেন, সেদিন যুধিষ্ঠিরের কপালে তিরস্কার জুটেছিল। অস্ত্রগুরু বলেছিলেন— এখানে দাঁড়িয়ে ওই বৃক্ষশাখায় বসা মৃৎপক্ষীর চক্ষু, বাণবিদ্ধ করতে হবে তোমাদের। পাণ্ডব-কৌরব সকলে সার দিয়ে দাঁড়ালেন ধনুক-বাণ হাতে। সবাই গুরুর আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রথমেই সর্ব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পালা। জ্যেষ্ঠ বলে তাঁকেই প্রথমে ডাকলেন দ্রোণাচার্য। কী মিষ্টি করেই না দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করেছিলেন! কিন্তু প্রশ্নে প্রশ্নেই সরল সাদা অঙ্ক একেবারে গুলিয়ে গেল। যুধিষ্ঠির সব দেখতে পাচ্ছেন— পাখি, গাছ, আচার্য, ভাইরা— সবাই তাঁর অঙ্কের গণ্ডির মধ্যে বাস করেন। তিনি এক দৃষ্টিতে বৃক্ষের উচ্চ-চূড়ে বসা পাখি দেখতে পান না, দেখতে পান না উচ্চাশার শেষ প্রান্তে রাখা হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন। যে মুহূর্তে দ্রোণাচার্য বললেন— তোমার দ্বারা আর যাই হোক এই লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয়, সেদিনই বোঝা গেছে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দিকেও তাঁর কোনও তীক্ষ্ণ এবং একক দৃষ্টি নেই। রাজা হওয়ার ব্যাপারে নিজের ওপর আস্থাও নেই তত। ভীম এবং অর্জুনের মতো অসাধারণ যোদ্ধা যাঁর ভাই এবং সঙ্কেত পাওয়া মাত্র যে ভাইরা তাঁর জন্য জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারেন, সেই ভাইদেরও যুধিষ্ঠির খুব বড় যোদ্ধা বলে ভাবেননি। ছোট বলেই হোক অথবা অতি কাছের লোক বলেই হোক, সব সময় যুধিষ্ঠিরের মনে সংশয় ছিল— ওরা বোধহয় পারবে

না। অস্ত্র-পরীক্ষার রঙ্গস্থলে যুযুধান ভীম-দুর্যোধনের প্রায় সম-শক্তির যুদ্ধ দেখে তিনি কোনও ভরসা পাননি ; অন্য দিকে অস্ত্র-কৌশলের অপূর্ব প্রয়োগে অর্জুন যখন একক হয়ে উঠেছিলেন রঙ্গস্থলে, ঠিক তখনই কর্ণ এসে অর্জুনের সমস্ত অস্ত্র-কৌশল পুনরাবৃত্তি করায় যুধিষ্ঠিরের ক্ষাত্র-তেজ মোটেই উদ্দৃপ্ত হয়নি। যুধিষ্ঠির মনে মনে ভেবেছেন— কর্ণের মতো বীর দুনিয়ায় আর দুটি নেই— যুধিষ্ঠিরস্যাপ্যভবৎ তদা মতির্ন কর্ণতুল্যো'স্তি ধনুর্দ্ধরঃ ক্ষিতৌ।

যে দু-একটি উদাহরণ দিয়েছি— যেমন একটা— দুর্যোধন অন্যায় করলেও ভীমকে তা না বলতে দেওয়া, যেমন দুই— অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনের থেকে কর্ণকে বড় বলে ভেবে নেওয়া— এ সব থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে— যুধিষ্ঠির বুঝি খুব নরম মানুষ, মনোবলহীন, মেরুদণ্ডহীন। এমনকী দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা দেবার সময়ে পাণ্ডবরা যখন দ্রুপদকে জীবিত ধরার জন্য রথে চড়লেন— রথানারুরুহুস্তদা— তখন প্রথমে যাঁকে এই যুদ্ধে যেতে বারণ করা হল, তিনি যুধিষ্ঠির। অর্জুন তাঁকে পরিষ্কার বলে দিলেন— আপনি এইখানেই থাকুন, আপনাকে যুদ্ধে যেতে হবে না— যুধিষ্ঠিরং নির্বার্য্যাশু মা যুধ্যস্বেতি পাণ্ডবম্।

যেখানে দ্রুপদ-শাসনের সময় নকুল-সহদেবের মতো নগণ্য বীরকেও অর্জুন চক্র-রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জুনের এই অনুরোধ আমাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এটা কি এক ধরনের গৌবব-গন্ধহীন অবহেলা, নাকি বেশি সম্মান দেওয়া ! সামগ্রিক মহাভারতের বিভিন্ন উদাহরণে অবশ্য ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, যুধিষ্ঠির পারবেন না বলে নয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের মত স্থূল, পাশবিক হত্যাকাণ্ডে যুধিষ্ঠিরের মতো বিরাট পুরুষকে ভীম-অর্জুন কখনই জড়াতে চাননি। ভাবটা এই— আমাদের মতো ষণ্ডা-জোয়ান ভাইরা থাকতে দাদাব যাওয়ার প্রয়োজন কী ? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও— যখন একটি মায়ের গর্ভে অনেকগুলি সন্তানের জন্ম হত— তখনও কোনও কোনও পরিবারে আমরা বড়ভাইকে প্রায় পিতার আসনে বসতে দেখেছি। বর্ষাকালে পিতোপম জ্যেষ্ঠদাদাটিকে জোয়ান ছোটভাই কাঁধে করে নদী পার করে দিচ্ছে অথবা ভ্রাতা-ভগিনীকুলের বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে বড়দাদা এসে পড়ায় ঝগড়ার আসর স্তব্ধ হয়ে গেল— এরকম ঘটনা আমার নিজের চোখেই অনেক দেখা।

যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের বয়সের তফাত বেশি না হলেও পিতা না থাকার ফলে পাণ্ডব-পরিবারে যুধিষ্ঠির প্রায় পিতার আসনেই বসে গিয়েছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের প্রখর ধর্মবোধ, নীতিবোধ, সত্যনিষ্ঠা। ধর্ম, নীতি, সত্যনিষ্ঠা যাঁর মধ্যেই প্রবল হবে, তিনি যে খানিকটা ধীর-স্থির-স্থবির হয়ে যাবেন— সে-কথা খুব বেশি চিন্তা না করেও অনুমান করা যায়। এই ধীরতা এবং স্থিরতার সুফল, কুফল দুইই ফলেছে এবং তাও একেক জনের কাছে একেক ভাবে।

পাঞ্চালরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করে দ্রোণাচার্যকে রাজ্য দান করার এক বৎসর পর কুরুবাড়িতেও একটা লক্ষণীয় ঘটনা ঘটল। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হলেন। হয়তো সেই ভীমের বিষপানের ঘটনা প্রচার না হওয়ায় এবং যুধিষ্ঠিরের সহনশীলতায় ধৃতরাষ্ট্র এতটাই বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে যে, যুবরাজের পদ নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার চিন্তা করেননি। মহাভারতের কবি লিখেছেন— যুধিষ্ঠির তাঁর ধৈর্য, স্থৈর্য, কোমলতা, দয়া-প্রণয়ের গুণে পিতাকেও অতিক্রম করেছিলেন— পিতুরন্তর্দধে কীর্তিং শীলবৃত্তসমাধিভিঃ। কিন্তু আমরা জানি— এ সব গুণে তাঁর পিতা এমনিতেই পুত্রের চেয়ে খাটো ছিলেন, আর ওই সব গুণগুলি তাঁর যুবরাজ হওয়ার পরবর্তী পর্বের কোনও আকস্মিকতা নয়। হয়তো ওই গুণগুলি তাঁর জন্মগত বলেই শত অন্ধতার মধ্যেও ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যুবরাজ না বানিয়ে পারেননি।

ধৃতরাষ্ট্রের এই মোহ বেশিদিন টেকেনি। ভীম-অর্জুনের বলবত্তা লোক-প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য জুড়ে চাউর হয়ে গেল যে, অর্জুনের মতো বীর আর দ্বিতীয়টি নেই। আসলে যে সব রাজ্য পাণ্ডুও জয় করতে পারেননি, সে সব অর্জুন জয় করে এসেছিলেন। এর ওপরে ছিল অর্থ। ভীম এবং অর্জুন দুজনেই দক্ষিণ এবং পূর্বদেশ জয় করে রাশি রাশি অর্থ জমা করে দিয়েছিলেন কুরুদের রাজকোষে— ধনৌঘং প্রাপয়মাস কুরুরাষ্ট্রং ধনঞ্জয়ঃ। দেশজয় এবং

রাজকোষবৃদ্ধি— এই দুটিই হয়তো কুরুরাষ্ট্রের পক্ষে সন্তোষজনক এবং হিতকরই ছিল, কিন্তু এই হিতকর্ম পাণ্ডবদের মাধ্যমে ঘটায় তাঁদের ওপর ধৃতরাষ্ট্রের কেমন যেন রাগই হল। তিনি ফিকির খুঁজতে লাগলেন— কীভাবে পাণ্ডবদের তাড়ানো যায়। লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির যদি বা নিজগুণে কুরুরাষ্ট্রের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, তবে সে পদ তাঁর নষ্ট হল ভীমার্জুনের শৌর্য-বীর্য অতিরিক্ত প্রকট হয়ে যাওয়ায়। ধৃতরাষ্ট্রের মন দূষিত হয়ে গেল, মতও পালটে গেল। তিনি এখন পাণ্ডবদের রাজ্য থেকে তাড়াতে চান।

কুরুরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষেরা, পৌরজনেরা যুধিষ্ঠিরকেই রাজা হিসেবে চাইছিলেন। তাঁর পিতা মারা গেছেন এই সহানুভূতির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের শান্ত স্বভাব এবং মানসিক পরিণতি পুরবাসীদের মুগ্ধ করেছিল। গ্রামে-গঞ্জে সভায়-চত্বরে পুরবাসীদের মুখে যুধিষ্ঠিরের গুণগান শুনে দুর্যোধন ঈর্ষায় জ্বলতে থাকলেন— যুধিষ্ঠিরানুরক্তানাং পর্যতপ্যত দুর্মতিঃ। ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনেরা এমন আশঙ্কাও করেছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের জন্য পুরবাসীরা তাঁদেরও মেরে ফেলতে পারে— কথং যুধিষ্ঠিরস্যার্থে ন নো হন্যুঃ সবান্ধবান্।

এই সন্দেহ এবং ঈর্ষা দুইই অমূলক ছিল। পুরবাসীরা ভাবত— তরুণ যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মকে সসম্মানে খাওয়াবেন, পরাবেন। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাও যুধিষ্ঠিরের সমাহৃত ভোগ থেকে বাদ যাবেন না। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অসম্ভব শ্রদ্ধা লক্ষ করেই পুরবাসীরা এই সমদৃষ্টি তরুণকে নিজেদের রাজা করবে বলে ভাবত— তে বয়ং পাণ্ডবজ্যেষ্ঠং তরুণং বৃদ্ধশীলিনম্। অভিষিঞ্চামঃ......।

পুরবাসীদের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার আগেই দুর্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন ধৃতরাষ্ট্র। বারণাবত জায়গাটা যে কত মনোরম, কত সুন্দর— এ সব কথা বারবার লোক দিয়ে পাণ্ডবদের কাছে বলালেন ধৃতরাষ্ট্র। তারপর নিজেই একদিন যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন— একবার ঘুরে এসো তোমরা। ভারী ভাল জায়গা। তার মধ্যে আবার মহাদেবের উৎসব লেগেছে সেখানে। তোমরা মাকে সঙ্গে নিয়ে বারণাবতে যাও। দানধ্যান কর, তারপর সুখে ফিরে এস।

যুধিষ্ঠিরের যে খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, তা মোটেই নয়। বরঞ্চ এই আপাতমধুর প্রস্তাবের মধ্যে যে একটা 'কু' আছে— এটা তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যে ভাবে বলছেন এবং বারণাবতে পাঠানোর জন্য তাঁর ইচ্ছেটা এতই বেশি প্রবল যে, যুধিষ্ঠির ভাবলেন— যদি না যাই, তা হলে হয়তো জোর করেই পাঠাবেন ধৃতরাষ্ট্র। তা ছাড়া কুরুরাষ্ট্র-যন্ত্রের মন্ত্রী সেনাপতি যতই তাঁর অনুরক্ত থাকুন, তাঁদের চালানোর শেষ শক্তি হলেন ধৃতরাষ্ট্র। এই অসহায়তার মধ্যে যুধিষ্ঠির যদি ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সম্মতি না দেন, তবে অন্যভাবে বিপদ আসতে পারে— এই ভেবে যুধিষ্ঠির তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন— আত্মনশ্চাসহায়ত্বং তথেতি প্রত্যুবাচ তম্।

এই রাজি হওয়ার পর থেকেই অতি অল্প বয়সেও যুধিষ্ঠিরের অসম্ভব মানসিক পরিণতি আমরা লক্ষ করি। আমরা জানি, বারণাবতে পুরোচন নামক একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা দুর্যোধন সহজে দাহ্য একটি জতুগৃহ তৈরি করিয়েছিলেন। পাঁচ ভাই পাণ্ডব এবং কুন্তীকে জতুগৃহের আগুনে সুপরিকল্পিতভাবে পুড়িয়ে মেরে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে পাণ্ডবরা মারা গেছেন— এই প্রচার এবং অজুহাত আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন দুর্যোধন। ঠিক কী ঘটবে এটা যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্নেই জানতেন না ঠিকই। কিন্তু সমাতৃক পাণ্ডবদের ইচ্ছা করেই যে বারণাবতে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে— সে-কথা যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন এবং ভাইদের সে-কথা তিনি বোঝাতেও পেরেছিলেন নিশ্চয়। নইলে ধৃতরাষ্ট্র যেমনটি বলেছিলেন— তোমরা কদিন বারণাবতে কাটিয়ে আবার হস্তিনায় ফিরে এস— কঞ্চিৎ কালং বিহৃত্যৈবং সুখিনঃ পুনরেষ্যথ— তাতে তো দুঃখের কিছুই ছিল না, বরং আনন্দেরই কিছু ছিল।

কিন্তু ঘটনাটা যে এত সহজ নয়, এটা যে একরকমের নির্বাসন, সে-কথা যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন বলেই পাণ্ডবরা ভীষ্ম-দ্রোণ-ধৃতরাষ্ট্রের মতো পূজ্যস্থানে প্রণাম জানানোর সময় কষ্ট-ক্লিষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে

ছিলেন— পাদৌ জগৃহুরার্তবৎ। এমনকী শুধু পাণ্ডবরাই নয়, কুরুরাষ্ট্রের পৌর, জনপদবাসীরাও ঘটনাটা বুঝেছিল। যুধিষ্ঠিরের ক'দিনের রাজত্বেই কুরুরাজ্যের প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে ভালোবেসে ফেলেছিল। যুধিষ্ঠিরের সুযোগ্য শাসন যে ধৃতরাষ্ট্র মেনে নিতে পারছেন না এবং সেই ঈর্ষা থেকেই যে তিনি রাজ্যের যুবরাজকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছেন— প্রজাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরকে বিদায় নিতে দেখে বারবার তারা পাণ্ডবপিতা পাণ্ডুকে স্মরণ করছিল এবং তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রদের ধৃতরাষ্ট্র যে সহ্য করতে পারছেন না— এটাই তারা বিশ্বাস করছিল— রাজপুত্রান্ ইমান্ বালান্ ধৃতরাষ্ট্রো ন মৃষ্যতে।

যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে এটা একটা বড় সুবিধে। কুরুরাষ্ট্র থেকে রাজা তাঁকে বিতাড়ন করলেও রাজ্যের প্রজারা তাদের পরিচিত জনপদ ছেড়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বারণাবতে যেতে চাইছে— গৃহান্ বিহায় গচ্ছামো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ— এই জন-সমর্থন যুধিষ্ঠিরের কাছে এক বড় প্রাপ্তি এবং হয়তো এই প্রাপ্তি যুধিষ্ঠির বলেই। জন-সমর্থন এই পর্যায়ে চলে এসেছিল যে যুধিষ্ঠির এক সময় ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই পৌরজনদের বলতে বাধ্য হলেন— আপনারা ঘরে ফিরে যান। ধৃতরাষ্ট্র যা চান, সেটা আমাদের মানতে হবে নিঃশঙ্কচিত্তে—অশঙ্কমানৈস্তৎ কার্যম্। অর্থাৎ আশঙ্কা একটা আছেই এবং সেটা তিনি বলে ফেললেন খুব 'ক্যাজুয়ালি'। কিন্তু এই আশঙ্কা এবং বিপন্ন মুহূর্তে এতগুলি মানুষ যে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছে, তার মান্যতা দিতে ভোলেননি যুধিষ্ঠির। তিনি বলেছেন— আপনারাই আমাদের বন্ধু— ভবন্তঃ সুহৃদো'স্মাকম্। সঠিক সময়ে যখন সত্যিই আপনাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমাদের— যদা তু কার্যমস্মাকং ভবদ্ভিরুপপৎস্যতে— তখন যেন আমাদের প্রিয় এবং হিতকার্যে আমাদের সহায় হবেন আপনারা।

বলতে পারেন, এ তো আর গণতন্ত্র নয় রে বাবা! যে, এত জনসমর্থনের প্রয়োজন আছে। আমরা বলি— কুরুরাষ্ট্রে রাজা যত বড় স্বেচ্ছাচারীই হন না কেন, জনসমর্থনের প্রয়োজন তাঁদেরও ছিল। দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্র যে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়লেন, তার কারণ একটা যদি হয় ভীমার্জুনের বলবত্তা, তা হলে অন্য কারণ যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে জনতার উদ্দাম উচ্ছ্বাস এবং আগ্রহ। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে প্রথম নালিশ জানিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের পেছনে এই জনসমর্থনের কথা মনে রেখেই— পৌরানুরাগ-সন্তপ্তঃ পশ্চাদিদমভাষত।

যুধিষ্ঠিরের পিছনে এই বিপুল জন-সমর্থনের অন্য একটা মূল্যও আছে। যে শৌর্য-বীর্যের আধিক্যে তৎকালীন রাজা একনায়ক স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হতে পারতেন, সেই শৌর্য-বীর্য যুধিষ্ঠিরের ছিল না। কিন্তু প্রজারঞ্জনের বৃত্তি, যা যে কোনও রাজার আদর্শ এবং কাম্য ছিল, অথবা যা শৌর্যের থেকেও বড় শক্তি, যুধিষ্ঠির সেই আদর্শে তাঁর রাজাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরিষ্কার বোঝা যায়— শুধু ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন নয়, যুবরাজের সিংহাসনে বসে থেকে এতদিন তিনি সাধারণ মানুষকেও সমান চোখে দেখতে পেয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের জোর এই সাধারণ-সমর্থনে এবং তিনি যখন বারণাবতে জতুগৃহের পথে রওনা হলেন, তখন এই সমর্থন হস্তিনাপুরে তাঁর জন্য মজুদ রইল।

বারণাবতে যাবার ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের মনে একটা আশঙ্কা এবং দ্বিধা ছিল, কিন্তু সেখানে ঠিক কী ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনও পূর্ব ধারণা যুধিষ্ঠিরের ছিল না। কিন্তু পুরবাসীরা যখন চলে গেল, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি গুরুস্থানে পাণ্ডবদের বিদায়-প্রণাম জানানো হয়ে গেছে, ঠিক তখনই বারণাবতের 'ভবিষ্যৎ যুধিষ্ঠিরের জানা হয়ে গেল। জানালেন সেই বিদুর। রাজবাড়িতে এখানে সেখানে লোক-জন দাঁড়িয়েই থাকে। বিদুর তাই কথ্য সংস্কৃত ভাষায় নিজের বক্তব্য জানালেন না। বিদুর এবং যুধিষ্ঠির— দু'জনেরই একটা সুবিধে ছিল— এঁরা সংস্কৃত ছাড়াও বিভিন্ন দেশি ভাষা জানতেন। প্রজা-সাধারণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকার ফলে আর্যেতর দেশজ ভাষাগুলি দু'জনেরই ভাল আয়ত্ত ছিল। মহাভারত বলেছে— এঁরা ছিলেন 'প্রলাপজ্ঞ'। 'প্রলাপ' শব্দটা শুনলে এখন উলটো-পালটা চেঁচানোর ব্যাপারটাই মাথায় আসে, কিন্তু বস্তুত প্রলাপ মানে এখানে সাধারণজনের আলাপের ভাষা এবং সে ভাষা সংস্কৃত-জানা সামাজিকদের বোধশক্তির বাইরে।

অন্যের কাছে যা প্রলাপের মতো বিদুর সেই লুপ্তবর্ণ-বিকৃতবর্ণ দেশজ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে

দিলেন— বারণাবতে যে ঘরে তাঁরা থাকবেন, সে ঘর তৈরি হয়েছে অতিদাহ্য পদার্থ দিয়ে। আগুন লাগানোর লোক যে কাছেই থাকবে, সে-কথা বলে দেবার পর কীভাবে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকতে হবে, কীভাবে সজারুর মতো সুরঙ্গ কেটে পালাতে হবে— সব কথা অস্পষ্ট ইঙ্গিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন বিদুর। বিদুরের ভাষা এমন ছিল যে, জননী কুন্তী পর্যন্ত অবাক হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন— বিদুর যে ঘাড় নেড়ে নেড়ে ভিড়ের মধ্যে কী বলে গেল, আর তুমিও বাছা! ঘাড় নেড়ে নেড়ে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে গেলে— এ সব কথার মানে কী, কিছুই তো বুঝলাম না— ত্বয়া চ তথেত্যুক্তো জানীমো ন চ তদ্‌বয়ম্। যুধিষ্ঠির মাকে বেশি আতঙ্কিত করেননি— কিন্তু দুর্যোধনের আগুন লাগানোর পরিকল্পনা এবং তা থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে, সে বিষয়ে বিদুরের উপদেশ মাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বারণাবতে পৌঁছে পাণ্ডবরা পুরবাসীদের কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করলেন। জতুগৃহে আগুন লাগানোর জন্য দুর্যোধন আগে থেকেই যাকে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই পুরোচন যুধিষ্ঠির এবং তাঁর পরিবারবর্গকে প্রথমে একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন, তারপর সেখানে পাণ্ডবরা দশদিন থাকার পরেই তাঁদের তিনি 'শিবভবন' বলে এক নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এই শিবভবন আসলে শিব নয়, অশিব, অমঙ্গলের আসন— শিবাখ্যম্ অশিবং তদা— জতুগৃহ।

যুধিষ্ঠির বাড়িতে ঢুকেই ঘি, গালা, চর্বির গন্ধ পেলেন। ভীমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এসে ব্যাপারটা তিনি বলেও দিলেন। ভীমকে বললেন এই জন্য যে, ভীমই তাঁদের মধ্যে সরলতম ব্যক্তি যিনি যখন তখন যা কিছু করে ফেলতে পারেন। কিন্তু ওই ভীমকেই আবার যদি ঠিকভাবে চালনা করা যায়, তবে অভীষ্ট লাভ আশার অতীত হয়ে দেখা দিতে পারে। যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন— ভাল ভাল শিল্পীদের দিয়ে এই বাড়ি তৈরি করিয়েছে দুর্যোধন। সহজে আগুন লাগানোর যত মশলা আছে— শণ, ধুনো, সুজো, কাঁচলা— সব মিশিয়ে এই বাড়ি তৈরি করেছে দুর্যোধন। আর ওই যে পুরোচন নামে নিপাট ভাল মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছ, ও কিন্তু আমাদের পুড়িয়ে মারার জন্য ছোঁক-ছোঁক করছে।

সব শুনে সরল ভীম বললেন— এতই যদি সব বুঝতে পারছেন, দাদা!— যদীদং গৃহমাগ্নেয়ং বিহিতং মন্যতে ভবান্— তবে আমরা ভালয় ভালয় আমাদের সেই পুরনো বাড়িটাতেই ফিরে যাই না কেন? যুধিষ্ঠির বললেন— না ভাই! তা হবে না। আমরা যে পুরোচন কিংবা দুর্যোধনকে সন্দেহ করছি, সে ভাবটাই দেখানো যাবে না। আমরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করব, কিন্তু সন্দেহের কোনও চিহ্নই ফুটে উঠবে না আমাদের চোখে-মুখে। নতুন বাসস্থানও একটা চুপি-চুপি খুঁজে নিতে হবে, কিন্তু আমাদের থাকতে হবে এখানেই— ইহ যত্তে র্নিরাকারৈ র্বস্তব্যমিতি রোচয়ে।

কে বলে যুধিষ্ঠিরের সাহস নেই। যুধিষ্ঠির জানেন— রাজবাড়ির রাজনীতির মধ্যে অনেক বাঁকা গলিঘুজি আছে। তিনি ইচ্ছে করলে ভীমকে দিয়ে পুরোচনকে মেরে ফেলতে পারতেন, জতুগৃহখানি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারতেন সবার সামনে, কিন্তু তাতে যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে জবাবদিহির অন্ত থাকত না। পুরোচন কুরুবাড়ির বিশ্বস্ত ভৃত্য। দুর্যোধন তাকে অপকর্মে নিযুক্ত করেছেন ঠিকই, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে এই কর্মে সায় আছে— সে-কথা যুধিষ্ঠির বোঝেন। আর বোঝেন বলেই তিনি জানেন যে পুরোচনকে হঠাৎ মেরে ফেললে প্রশ্ন উঠবে অন্যভাবে। অন্যদিকে বারণাবতে যে বাড়িটায় পাণ্ডবরা থাকবেন সেটা পাণ্ডবদের জন্যই তৈরি হচ্ছে তা খুব ঘটা করে প্রচার করা হয়েছিল এবং তারপর বানানো হয়েছিল জতুগৃহ। কিন্তু বাড়িটা যে জতুগৃহ, এই খবরটা দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্র ছাড়া কুরুবাড়ির বৃদ্ধ পুরুষেরা কেউই জানতেন না। যুধিষ্ঠির এমন একটা খেলা খেলতে চান যাতে কোনওভাবেই গৃহ-দাহনের দায় তাঁর ওপরে এসে না পড়ে। যুধিষ্ঠির চান— পুরোচনই ওই ঘরে আগুন লাগাক, এবং তারপর ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুজ্যেষ্ঠরা এই কাজের জন্য দায়ী করুন দুর্যোধনকে— ধর্ম ইত্যেব কুপ্যেরন্ যে চান্যে কুরুপুঙ্গবাঃ।

যুধিষ্ঠির রাজোচিত দুঃসাহসে জতুগৃহেই বাস করতে চেয়েছেন এবং ভীমকে বুঝিয়েছেন— আমরা নতুন জায়গায় এসেছি, এখানে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই, কিন্তু দুর্যোধন নিজের

রাজধানীতে মন্ত্রী-অমাত্যের সমর্থন পাচ্ছেন। টাকা-পয়সা ছড়িয়ে যে একটা কিছু করব, তারও উপায় নেই, আমাদের কিচ্ছুটি নেই, কিন্তু দুর্যোধনের সহায়-সম্পত্তি সবই আছে। আজকে আমাদের দিক থেকে কোনও বিপরীত আচরণ ঘটলে দুর্যোধন সৈন্য-সামন্তের বল আমাদের ওপর প্রয়োগ করবে, এবং তাতে আমাদের মরতেও হতে পারে— হীনকোষান্ মহাকোষঃ প্রয়োগৈ র্ঘাতয়েদ্ ধ্রুবম্। যুধিষ্ঠির বিদুরের ইঙ্গিত মাথায় রেখে ভীমকে বলেছিলেন— এই বাড়িতে আমরা থাকব এবং বাড়ির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ইদুরের মতো লুকিয়ে থাকব, যাতে ওপরে আগুন লাগলেও গর্ত-গুহায় আঁচ না লাগে।

আমরা জানি, যুধিষ্ঠিরের স্থিরবুদ্ধিতে এবং বিদুরের সাহায্যে পাণ্ডবরা মাকে নিয়ে জতুগৃহের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয় এবং সেটা যুধিষ্ঠিরের মহাবুদ্ধির পরিচয়ও নয় কিছু। যুধিষ্ঠির ভীম নন, কিম্বা অর্জুনও নন। তিনি আজকে যা করেন, তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। একটি মায়ের সঙ্গে পাঁচটি ব্যাধ যুবক জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মরেছিল বটে কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধিতে বারণাবতের সমস্ত জনপদবাসীর সমবেদনা পাণ্ডবদের অনুকূলে বাহিত হয়েছিল। তারা ছি-ছিক্কারে গালাগালি দিয়েছিল দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে— নূনং দুর্যোধনেনেদং বিহিতং পাপকর্মণা। এ গালাগালির জের হস্তিনাপুর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনেরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন। তাঁরা ঘটা করে পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধশান্তিও করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বৃদ্ধদের তথা জনপদবাসীদের সমস্ত অনুকম্পা পাণ্ডবদের জন্য জমা হয়ে রইল এবং তা রইল যুধিষ্ঠিরের সঠিক পরিচালন-শক্তিতে।

জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে পাণ্ডবরা যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন সদা জাগরূক ভীমসেনকে আমরা রাগে ফেটে পড়তে দেখেছি, হাতে হাত ঘষতে দেখেছি। তাঁকে বলতে শুনেছি— ব্যাটা দুর্যোধন! তোর ওপরে ঠাকুরের অসীম দয়া। নইলে, এখনও পর্যন্ত যুধিষ্ঠিব তোকে মেরে ফেলার হুকুম দিচ্ছেন না আমাকে? এতদিনে কর্ণ-শকুনি আর তোর ভাইদের সঙ্গে তুইও যমালয়ে যেতিস ব্যাটা। কিন্তু আমি নাচার, দাদা যুধিষ্ঠির এখনও পর্যন্ত তোর ওপর ক্রুদ্ধ হননি— কিন্নু শক্যং ময়া কর্তুং যত্তে ন ক্রুধ্যতে নৃপঃ।

সত্যিই যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হন না। যেটাতে রাগ হওয়া উচিত, তাতেও তাঁর রাগ হয় না। একই ঘটনায় অন্তত দশ জন বড় মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয়, যুধিষ্ঠিরের তা হয় না। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য এবং স্থিরতার নিরিখে যদি পৃথিবীর অন্য কীর্তিমান পুরুষের প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ করা যায়, তবে অন্য কীর্তিমানদের কীর্তি লঘু হয়ে যাবে। যুধিষ্ঠির জানেন— ক্রোধের জন্ম হয় অভীষ্ট বস্তুর কামনা প্রতিহত হলে। যুধিষ্ঠির তাই এমন কিছু কামনা করেন না, যার অপ্রাপ্তি তাঁর মনের মধ্যে ক্রোধের জন্ম দেবে। তিনি রাজসিংহাসন চান না, এমনকী দুর্যোধন বিপন্ন হন, তাও তিনি চান না। কারণ দুর্যোধনের বিপন্নতা মানে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, জননী গান্ধারী! যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে থাকতে চান অক্ষোভ, অক্রোধের স্বর্গভূমিতে। যুধিষ্ঠির জানেন— ক্রোধ অল্পসত্ত্ব ব্যক্তির অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। মহামনা ব্যক্তির ক্ষমাসুন্দর চোখটি ছিল বলেই দুর্যোধনের মতো ব্যক্তির দিকে তিনি সাবহেলে তাকিয়ে থাকতে পারেন, অন্যেরা তা পারেন না এবং পারেন না বলেই বিপ্রতীপভাবে তিনি যুধিষ্ঠির, অন্যেরা নন, অন্যান্যদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রতিক্রিয়া মেলে না।

সময়ে দেখা যাবে, হিড়িম্বার মতো তথাকথিত রাক্ষসীর সঙ্গেও যুধিষ্ঠির একমত হতে পারেন, কিন্তু ভীমের সঙ্গে পারেন না। হিড়িম্বা মনে মনে ভীমকে পতিত্বে বরণ করেছিল। বনের পথে যেতে যেতে সে অনুরাগিণীর সমস্ত আকুতি নিয়ে জননী কুন্তীকে বলেছিল— আপনি এবং আপনার পুত্র ভীম যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি বাঁচব না— প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। শতবার অনুরুদ্ধ হয়েও ভীম তো ননই, কুন্তীও বিবাহের কোনও অনুমোদন দিতে পারেননি। কারণ যুধিষ্ঠির এখনও কোনও কথা বলেননি। পাণ্ডব-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ, করণীয় এবং অকরণীয় বিষয়গুলি প্রধানত নির্ভর করত যুধিষ্ঠিরের ওপরে। শেষ কথা এবং শেষ সিদ্ধান্ত প্রধানত তাঁর। সিদ্ধান্ত ভাল না খারাপ, তার বিচার হয়েছে ঘটনার ফলোদয়ের পর। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ

ছিল সবসময়ই যুধিষ্ঠিরের হাতে।

হিড়িম্বা বলেছিলেন— বিপদের সময় যে নিজের এবং পরের ধর্ম রক্ষা করে, ধর্ম সেই বোঝে। আর ধর্ম থেকে বিচ্যুতি মানেই ধার্মিকের বিপদ— আপৎসু যো ধারয়তি ধর্মং ধর্মবিদুত্তমঃ। হিড়িম্বা আরও একটা সুন্দর কথা বললেন। বললেন— ধর্ম প্রাণ রক্ষা করে, ধর্ম প্রাণ দেয়। ধর্মকে তাই লোকে 'প্রাণদ' প্রাণদাতা বলে। মানুষকে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কি নিন্দা থাকতে পারে— পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।

কথা শুনেই বোঝা যায়— সেকালের রাক্ষস-রাক্ষসীরা কোনও আজব জন্তু নন। হিড়িম্বা ভীমকে দেখে ভালবেসে ফেলেছেন, মনে মনে তাঁকেই স্বামী হিসেবে বরণ করেছেন। ভীমকে ছেড়ে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া তাঁর কাছে ধর্মহানি তো বটেই, এবং তা আত্মহত্যার সামিল। এই মুহূর্তে স্বয়ং ভীম, জননী কুন্তী এবং অন্যান্য পাণ্ডব ভাইরাও বনের পথে চলছিলেন সম্মুখে দৃষ্টি রেখে। হিড়িম্বা তাঁদের পিছন পিছন আসছিলেন এবং কখনও বা জননী কুন্তী তাঁর কথা শুনছিলেন সানুকম্পায়। কিন্তু যেই মাত্র রাক্ষসীর মুখে প্রাণদায়ী ধর্মের কথা উচ্চারিত হল, সেই মুহূর্তেই পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মুখ ঘুরিয়ে পৃষ্ঠগামিনী হিড়িম্বার সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। রাক্ষসীকে সমর্থন করেছেন পূর্ণ প্রাণে— তুমি যা বলেছ, হিড়িম্বা ; সব সত্য— এবমেব যথাত্থ ত্বং হিড়িম্বে নাত্র সংশয়ঃ।

আর ঠিক এইখানেই যুধিষ্ঠির। যে মুহূর্তে ধর্মের নীতি তাঁর মনে সঠিক স্বরূপ নিয়ে দাঁড়াবে, তখনই তিনি মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াবেন, সমর্থন করবেন রাক্ষসীকেও— তুমি যা বলেছ, তাই ঠিক— এবমেব যথাত্থ ত্বং— ধর্ম যে প্রাণ দেয়, ধর্ম যে প্রাণদ। যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার মুখে যা শুনেছিলেন, আমরা ভবিষ্যতেও দেখব— সেই 'প্রাণদ' ধর্মের কথা তিনি মনে রেখেছেন আজীবন। হিড়িম্বাকে খুশি হয়ে অনুমতি দিয়েছেন— দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও আমার ভাইকে, যথেচ্ছ বিহার কর, কিন্তু রাত্রি হওয়ার আগেই তাঁকে ফিরিয়ে দেবে আমাদের কাছে। পাণ্ডবরা বনের পথে চলেছেন। নানা বিপদ আসে রাতের বেলাতেই। ভীমকে তখন সঙ্গে দরকার। অতএব সব দিক রেখেই তিনি হিড়িম্বাকে প্রিয়মিলনের অনুমতি দিলেন সানন্দে।

আসলে ধর্ম ব্যাপারটা সমস্ত ব্যাপ্তি নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে ধরা দেয়। এই ধর্ম ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যর ধর্ম নয়। বিচিত্র এবং বিষম পরিস্থিতিতে যেটা ন্যায়-নীতির যুক্তি সিদ্ধ করে, যেটা সাধারণ মানদণ্ডে 'হওয়া উচিত' বলে মনে হবে, সেটাই যুধিষ্ঠিরের ধর্ম। পথ চলতে চলতে আপন ভ্রাতার প্রণয়প্রার্থিনী তথাকথিত এক রাক্ষসী রমণীর একনিষ্ঠ অনুরাগের মধ্যে যখন ধর্মের সংজ্ঞা খুঁজে পান যুধিষ্ঠির, তখনই বুঝতে হবে তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। কোথায়, কখন, কোন ঘটনায় তিনি ধর্মের সংজ্ঞা খুঁজে পাবেন, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে চলতে চলতেই আমাদের যুধিষ্ঠিরকে চিনে নিতে হবে। অনুরাগিণীর ভালোবাসার মধ্যেও যে ধর্ম আছে এবং সেই ধর্ম স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে যে কোনও লজ্জা বা সংকোচ নেই এ-কথা রাক্ষসীই বলেছিল— যেন যেনাচরেদ্ধর্মং তস্মিন্ গর্হা ন বিদ্যতে। কিন্তু রাক্ষসীর প্রণয় স্বীকার করে নিতে স্বয়ং ভীমের কিছু সংকোচ ছিল হয়তো। জননী কুন্তী হিড়িম্বার অনুনয়ে বিচলিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পুত্রেরা কেউই কিছু বলছে না দেখে তিনিও জোর করে কিছু বলেননি।

কিন্তু লজ্জা-সংকোচের বিচার ছাড়াও এই কাজটা করলে আমার স্বার্থ থাকবে, ওটা করলে আমার ভাল লাগবে, সেটা করলে আমার পারিবারিক সুবিধে হবে— এই নিজের ভাল-মন্দ, পরিবারের স্বার্থ, লজ্জা-সংকোচ— সব কিছুর ওপরে উঠে একেকটি পরিস্থিতিতে নিজের স্বার্থ, নিজের মান-মহিমা-গরিমাকে গৌণ করে দেখার মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের ধর্মের সংজ্ঞা। যুধিষ্ঠিরকে তাই দেখতে হবে নতুন আলোয়, সার্বিক নীতিবোধের সুষম মাত্রায় এবং স্বয়ং ব্যাসের দৃষ্টিতে। বনের পথ ছেড়ে পাণ্ডবরা যখন বাসস্থান খুঁজে বেড়াচ্ছেন লোকালয়ের মধ্যে, তখন ব্যাস এসেছিলেন বনভূমিতে। দুর্যোধনেরা সবাই যে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্যই নির্বাসনে পাঠিয়েছেন— এ-কথা ব্যাস জানতেন। বনভূমির মধ্যে জীবিত পাণ্ডবদের দেখে তাঁর স্নেহবৃত্তি উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছিল।

কুন্তীকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন— বেঁচে থাকো মা ! তোমার এই বড়ছেলে চিরন্তন ধর্মের নিত্যকালের আশ্রয়। দেখে নিয়ো, সে তার সত্যধর্ম বজায় রেখেই এই পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করবে— জীব পুত্রি সুতস্তে'য়ং ধর্মনিত্যো যুধিষ্ঠিরঃ।

'ধর্মনিত্য'। যুধিষ্ঠিরের বিশেষণ হিসেবে এই যে বিশেষণটি ব্যাসের মুখ দিয়ে বেরুল, এটা কোনও মৌখিকতার আড়ম্বরমাত্র নয়। 'ধর্মনিত্য' কথাটা যে যেভাবেই অর্থ করুন, আমরা মনে করি একটি মানুষের মনের মধ্যে যদি নিরন্তর ঔচিত্যের চর্চা হতে থাকে তবে সেই চর্চাই যুধিষ্ঠিরের সহজাত সঙ্গী, এমনকী যুধিষ্ঠির যদি রাজসিংহাসনে বসতে চান, তবে সেখানেও ঔচিত্যের চর্চা বজায় রেখেই তা চান, নচেৎ নয়। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম শুধু তাঁকে বাঁচায় না, তাঁর ধর্ম তাঁর চারপাশে থাকা পরিবার, পরিজন এমনকী তাঁর অনাত্মীয়দেরও বাঁচানোর চেষ্টা করে।

'ধর্মনিত্য' কথাটা বললে মনে হতে পারে— এ বুঝি যুধিষ্ঠিরের সহজাত গুণ, এই বিশাল মনুষ্যসমাজ এবং বহিঃপ্রকৃতি থেকে যেন তাঁর শেখার কিছু নেই। আমরা বলি— 'হ্যাঁ, ধর্ম তাঁর নিত্যসঙ্গীই বটে, কিন্তু তিনি ধর্ম এবং নীতিবোধের প্রকৃষ্টতম আধার বলেই, বাহ্য-জগৎ এবং মনুষ্য-সমাজের চিরন্তন নীতিগুলিও তাঁর হৃদয়ে গভীর ছায়া ফেলে এবং যুধিষ্ঠির তখন শেখেন। একজন পুরুষকে ভালবেসে সেই রাক্ষসী রমণী যখন পরম আকুতিতে আত্মনিবেদন করেছে, তখন সেই রমণীর কাছেই তিনি ভালবাসার ধর্ম শেখেন। সোচ্ছ্বাসে বলেন, যা বলেছ ঠিক, এটাই ধর্ম— এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বম্। একইভাবে এই শেখার নমুনাটুকু আবার দেখতে পাব একচক্রা গ্রামে। সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বক-রাক্ষসের খাবার জোগাড় করতে না পেরে নিজেই মরতে চেয়েছিলেন। পাণ্ডবরা কুন্তীর সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের বিপদ দেখে কুন্তী নিজে তাঁকে কথা দিয়েছিলেন— আমার একটি পুত্র বক-রাক্ষসের খাবার পৌঁছে দেবে। সে আগে অনেক রাক্ষস-খোক্কস মেরেছে, গায়েও প্রচুর শক্তি। রাক্ষসরা তাকে কিছুই করতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হন— অমার ওই ছেলেটিই বক-রাক্ষসের খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবে— রাক্ষসায় চ তৎ সর্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্।

আমরা বেশ জানি— কুন্তী ভীমের কথা ভেবেই ব্রাহ্মণকে বিপৎ-ত্রাণের কথা দিলেন। কিন্তু কথাটা যুধিষ্ঠিরের কানেও গেল। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। আমরা আগে বলেছি— ভীম অর্জুন যত বড় বীরই হন না কেন, যুধিষ্ঠির যে তখনও তাঁদের খুব বেশি ভরসা করতেন, তা নয়। এর কারণ এই নয় যে, যুধিষ্ঠির তাঁদের বীর ভাবতেন না ; আসলে পিতৃহারা ভাইগুলিকে তিনি এমনভাবেই পিতার মতো আগলে রাখতে চাইতেন যে, জেনেশুনে কোনও বিপন্নতার মুখে ঠেলে দিতে তাঁর চিন্তা থেকে যেত। জতুগৃহে আগুন লাগানো হবে— এ ঘটনা তাঁর জানা ছিল, হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বাহুযুদ্ধও তিনি দেখেছেন, কিন্তু এ যে বক-রাক্ষস। একটি নগরের সে রাজা, নগরের সমস্ত মানুষ তার ভয়ে তটস্থ। মা হয়ে কুন্তী কী করে তাঁর ছেলেকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন— এই কথা যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন না।

হিড়িম্বা কিংবা বক-রাক্ষসকে আমাদের রূপকথার রাক্ষস ভাবার কোনও কারণ নেই। সোজা কথায় এঁরা আর্যেতর জনজাতির মানুষ হতে পারেন অথবা আজকালকার দিনে একেকটি পাড়ার আধিপত্য যেমন একেকজন গুণ্ডা-মস্তানের হাতে থাকে এঁরাও তেমনই পেশিশক্তিবিশিষ্ট মানুষও হতে পারেন। গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় রাক্ষস বলতে গুণ্ডা-বদমাশই বুঝিয়েছেন এবং তা যদি হয় তবে পেশিশক্তির লড়াইতে ভীমের সঙ্গে পেরে ওঠা যে সে-কালে কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না, সেটা তাঁর মা-জননী বুঝলেও যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন না। যুধিষ্ঠির বললেন— মা ! ভীম কি নিজের ইচ্ছেয় এই কাজ করতে যাচ্ছে, না আপনি তাকে বলেছেন। জননী স্বীকার করলেন যে, তিনি বলেছেন ভীমকে রাক্ষসের কাছে যেতে। যুধিষ্ঠির বললেন— আপনি পরের ছেলের জন্য নিজের ছেলেকে বিপদে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন, এটা কেমন কথা হল— কথং পরসুতস্যার্থে স্বসুতং ত্যক্তুমিচ্ছসি ? কোন মানুষ আপনার এই কাজ সমর্থন করবে ? নিজের পুত্রত্যাগ কি কোনও ধর্মে সইবে, বিশেষত মায়ের ধর্মে ?

বস্তুত এমন একটা প্রতিক্রিয়া যেন যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে আশা করা যায় না। পরের উপকারের জন্য যুধিষ্ঠির আত্মবলি দেবেন না, এবং সে কাজে তিনি বাধা দিচ্ছেন— এমনটি যেন যুধিষ্ঠিরের কাছে আশা করা যায় না। যিনি স্বর্গে যাবার পথে অধম কুকুরটিকে পর্যন্ত ত্যাগ করেননি, তিনি নীচ স্বার্থপরের মতো কথা বলছেন— এ যেন বিশ্বাস করা দুরূহ। লক্ষণীয়— এখানেও যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধ কাজ করছে এবং সে ধর্ম পারিবারিক ধর্ম। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে তিনি ছোটভাইদের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তিনি জানেন— ভীমের কোনও বিপদ হলে লোকে তাঁকেই দুষবে। ভীমকে রক্ষা করা তাঁর পারিবারিক দায় এবং সে দায়ও যুধিষ্ঠিরের কাছে ধর্ম। তা ছাড়া কিছু স্বার্থও আছে, অবশ্য সেটাও পারিবারিক স্বার্থ। যুধিষ্ঠির নিজেকে কোনওদিনই খুব একটা বিশাল যুদ্ধবাজ মানুষ বলে ভাবেন না, অথচ নিজের জননী এবং ভাইদের স্বার্থেই তাঁর পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করার দায়িত্ব আছে। যুধিষ্ঠির জানেন, যুদ্ধ যদি লাগে তবে অর্জুনের মতো ভীমও তাঁর অন্যতম ভরসা। যুধিষ্ঠির বললেন— যার শক্তিতে আমরা দুর্যোধনদেব মেরে এতকালের হৃতরাজ্যটা পেয়ে গিয়েছি বলে মনে করি, সেই ভীমকে তুমি এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ মা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? বেশ বুঝতে পারছি, সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট সয়ে-সয়ে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে— কচ্চিন্নু দুঃখৈর্বুদ্ধিস্তে বিলুপ্তা গতচেতসঃ।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বোঝালেন— বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঠিকই আছে বাবা। আমার মাথায় কোনও গোলমাল হয়নি। তবে কী জান, এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে আমরা সুখে বাস কবছি এতকাল। দুর্যোধন আজও টের পায়নি— আমরা বেঁচে আছি। আমাদের বাড়িওয়ালা ব্রাহ্মণ এত উপকার করেছেন, আমি শুধু সেই উপকারের প্রতিদান দিচ্ছি, বাবা— তস্য প্রতিক্রিয়া পার্থ ময়েয়ং প্রসমীক্ষিতা। আরও একটা কথা। একজন সাধারণ লোক উপকার পেলে যতটুকু প্রত্যুপকার করার কথা ভাবে একজন বড়মানুষ তার থেকে বেশি উপকার করার চেষ্টা করেন। ভাবটা এই, অন্তত তোমার তাই কবা উচিত— যাবচ্চ কুর্যাদন্যো'স্য কুর্যাদ্ বহুগুণং ততঃ। আজ ভীম যদি বিপন্ন ব্রাহ্মণের এই উপকারটুকু করে তবে দুটি কাজ হবে একসঙ্গে। এক, উপকারের প্রত্যুপকার, দুই, ধর্ম, বিপন্নকে রক্ষা করার ধর্ম— প্রতীকারশ্চ বাসস্য ধর্মশ্চাচরিতো মহান্।

সেই শব্দটা আবার কানে এল যুধিষ্ঠিরের। ধর্ম। পারিবারিক ধর্মের চেয়েও মানুষের ধর্ম বড়। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, একেবারে শূদ্র পর্যন্ত সর্বস্তরের সমস্ত মানুষের বিপৎ-ত্রাণের ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে কুন্তী বললেন— আমি ব্যাসের কাছে এই কথাগুলি শুনেছি। ধর্মনিত্য যুধিষ্ঠির— এমন স্বচ্ছ তাঁর হৃদয়াধার যেখানে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্মশব্দের উচ্চারণ মাত্রেই তাঁর 'বিশদীভূত-মনোমুকুরে' সেই ধর্মের ছায়া পড়ে। যুধিষ্ঠির তখন শেখেন। হিড়িম্বার কাছে এক ধর্ম শেখেন, মায়ের কাছে আরেক ধর্ম শেখেন, বিদুরের কাছে শেখেন অন্য এক ধর্ম। এমনি করে শিখতে-শিখতেই ধর্মনিত্য যুধিষ্ঠিরের ধর্মময় মনোজগৎ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। মায়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির বলে ওঠেন— উপপন্নমিদং মাতঃ— আপনি যা বলেছেন তা সর্বাংশে ঠিক। একদিকে হিড়িম্বার অনুরাগের ধর্ম, অন্যদিকে নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি পরের উপকারের ধর্ম— এই দুই বিপ্রতীপ ধর্মের প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের প্রতিক্রিয়া একই। যুধিষ্ঠির শিখে নিয়েছেন, অন্যের ধর্ম আত্মসাৎ করেছেন।

বক-রাক্ষস ভীমের শক্তির কাছে পর্যুদস্ত হল, সে মারা গেল। এই ঘটনার পরেই আমরা একচক্রা গ্রামের যেখানে পাণ্ডবরা এতকাল বাস করছিলেন, সেখানে এক ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখছি। ব্রাহ্মণ কথায় কথায় দ্রোণাচার্য এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের চিরশত্রুতার কাহিনী শোনালেন। শোনালেন দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হবে— এই জব্বর খবর যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের মনে যে খুব দোলা লাগিয়েছিল— তা মোটেই নয়। কিন্তু পাণ্ডবজননী কুন্তী পুত্রদের বিয়ে দেবার বাসনা করছিলেন মনে মনে। হয়তো সেই কারণেই তিনি পুত্রদের কাছে পাঞ্চালরাজ্যে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, যদিও তাঁর অজুহাত ছিল একেবারেই অন্যরকম। পাঞ্চালদেশে ভাল ভিক্ষা মিলবে এবং দেশটাও খুব সুন্দর— এটাই ছিল তাঁর অজুহাত।

পাঞ্চালে যাত্রা করার ব্যাপারটা প্রায় স্থিরই হয়ে গিয়েছিল। এই গমনোন্মুখ অবস্থায় আমরা স্বয়ং ব্যাসদেবকে উপস্থিত হতে দেখছি সেই বন্য গ্রামের ভিতর। একটা ঘটনা এখানে লক্ষ করার মতো দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের জতুগৃহের চক্রান্তের পর পাণ্ডবদের যাত্রাপথে আমরা দু'বার ব্যাসকে পাণ্ডবদের কাছে ঘুরে যেতে দেখলাম। ব্যাসদেব কৌরব-পাণ্ডবদের এক পিতামহ। নিজ মুখেই তিনি বলেছেন— তোমরা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, দু'পক্ষই আমার কাছে সমান— সমাস্তে চৈব মে সর্বে যূয়ং চৈব ন সংশয়ঃ। কিন্তু আজকে তোমরা যেভাবে বিপন্ন হয়ে আছ এবং তোমাদের যা বয়স, তাতে এখন তোমাদের ওপরেই আমার স্নেহ বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে— তস্মাদভ্যধিকঃ স্নেহো যুস্মাসু মম সাম্প্রতম্।

পাণ্ডব-কৌরবের বংশকর পিতামহ যেভাবে পাণ্ডব-পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন, তার একটা বড় কারণ অন্তত যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর বড় ভরসা। যুধিষ্ঠির একদিন ধর্মের দ্বারা পৃথিবী জয় করে ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করবেন— ধর্মেন পৃথিবীং জিত্বা...প্রশাসিষ্যতি ধর্মরাট্— এই ভাবনা ব্যাসের মনে দৃঢ়মূল। যুধিষ্ঠির তাঁর এতদিনের ধৈর্য এবং কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়েই ব্যাসের এই পক্ষপাত জয় করে নিয়েছেন। আজ পাঞ্চাল-যাত্রার মুখে আবার ব্যাসের সঙ্গে দেখা হল। দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ এবং পাঞ্চাল-যাত্রার পরামর্শ তাঁর মুখ দিয়েও শোনা গেল। মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসের এই পক্ষপাতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ঘটনা ঘটল পাঞ্চাল-যাত্রার পথে। অর্জুনের সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্ররথের যুদ্ধ এবং বন্ধুত্বের পর পাণ্ডবরা পুরোহিত নির্বাচন করলেন ধৌম্যকে।

মনে রাখতে হবে— পুরোহিত নির্বাচন মানে একজন পুরুতঠাকুর ঠিক করে আসা নয়। সেকালের দিনে পুরোহিতরা ক্ষত্রিয়-রাজাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। মন্ত্রিত্ব থেকে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছিল এই পুরোহিতের পদমর্যাদা। সূর্যবংশীয় দশরথ-রামচন্দ্রের মতো রাজারা পুরোহিত বশিষ্ঠের আজ্ঞাধীন ছিলেন। পুরোহিতরা যেরকম রাজাদের বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করাতেন, তেমনই তাঁদের কাছেই রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি শিখতেন ক্ষত্রিয়-পুরুষেরা। রাজারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিশিষ্ট পুরোহিতের সঙ্গে যুক্ত না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের রাজনৈতিক সত্তা সম্পূর্ণ হত না। পাঞ্চাল যাত্রার পথে যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ দেবলের ছোটভাই ধৌম্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। পাণ্ডবরা সকলে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করলেন।

ধৌম্যের মতো গুরু লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবরা যে শুধু নিজেদের অভিভাবকযুক্ত মনে করলেন তাই নয়— নাথবন্তমিবাত্মানং— তারা মনে করলেন— রাজ্য এবং পাঞ্চালী-দ্রৌপদী দুইই তাঁদের করতলগত— তে সমাশংসিরে লব্ধাং শ্রিয়ং রাজ্যঞ্চ পাণ্ডবাঃ। আসল ঘটনা হল, ধৌম্যের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক শিক্ষা আরম্ভ হল। যে শিক্ষা এতদিন বিদুরের মাধ্যমে ইতস্তত লাভ করছিলেন যুধিষ্ঠির তার পাকাপাকি ব্যবস্থা হল ধৌম্যকে গুরু হিসেবে পাবার সঙ্গে সঙ্গে। 'ধর্মনিত্য' যুধিষ্ঠিরের রাজনীতির শিক্ষা আরম্ভ হল রাজ্যহীন অবস্থায়, বনপথে। পাণ্ডবরা ধৌম্যকে নিয়েই পাঞ্চালে পৌঁছলেন।

৪

পাঞ্চাল পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-মহোৎসবের ঘটা টের পাওয়া গেল। দলে দলে ব্রাহ্মণেরা চলেছেন উৎসবে যোগ দিতে। সেখানে পাণ্ডবরাও চলেছিলেন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বেশে। গমনোৎসুক ব্রাহ্মণরা পাণ্ডবদের তেমন করে চেনেন না। তাঁরা বললেন— কোথা থেকে আসছেন আপনারা। যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন— আমরা একচাকা থেকে আসছি। সঙ্গে মা আছেন। ব্রাহ্মণরা খুব লোভ দেখালেন— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে। ভারী লক্ষ্মীমতী আর সুন্দরী সেই মেয়ে। দ্রুপদের আয়োজনও বিশাল। খাওয়া-দাওয়া তো আছেই, সঙ্গে প্রচুর দক্ষিণা টাকা-পয়সা, গরু—প্রদাস্যন্তি ধনং গাংশ্চ ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সর্বশঃ। চলুন আমাদের সঙ্গে। আপনার ওই ভাইটিকে তো বেশ শক্তপোক্ত মনে হচ্ছে, চাই কি পণ জিতে দ্রৌপদীকে পেয়েও যেতে পারে। যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণদের কথা শুনে শেষে মন্তব্য করলেন— নিশ্চয়ই। আমরাও এই এলাম বলে।

বস্তুত স্বয়ম্বর-সভায় যুধিষ্ঠিরের কিছুই করার ছিল না। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলেন, দ্রৌপদীকে লাভ করলেন এবং সমবেত দ্রৌপদীকামী রাজাদের সঙ্গে ভীম-অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই মুহূর্তেই যুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেবকে আমরা দ্রুপদ-সভা ত্যাগ করে চলে যেতে দেখছি। মহামতি কৃষ্ণ সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ করে দেখলেন যে, এক গৌরকান্তি বিনীত যুবক, পদ্ম-পাতার মতো দীর্ঘ তাঁর চোখ, লম্বা একটি নাক— গৌরঃ প্রলম্বোজ্জ্বলচারুঘোণঃ— এক বিশাল দীর্ঘদেহী পুরুষ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল— বিনিঃসৃতঃ সো'প্যুত ধর্মপুত্রঃ।

মানুষের টিপ্পনী কাটার এই তো সুযোগ। কী অক্ষম একটি মানুষ! বিশাল বিশাল রাজাদের সঙ্গে দুটি মাত্র ভাই যুদ্ধ করছে, আর কী স্বার্থপরের মতো যুধিষ্ঠির বেরিয়ে এলেন রাজসভা ছেড়ে! সঙ্গে আবার নকুল-সহদেবকেও নিয়ে এলেন। মহাভারতে ভাল করে খেয়াল করে দেখবেন— যুধিষ্ঠির যখন দ্রুপদের রাজসভা ছেড়ে চলে এসেছেন, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম-গন্ধও ছিল না। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের স্কন্ধস্থিত জীর্ণ উত্তরীয়গুলি উড়িয়ে দিয়েছিলেন হাওয়ায়। দ্রুপদ-সভার বাদ্যকারেরা তুরী-ভেরী-শতাঙ্গের শব্দে আকাশ মুখরিত করে তুলেছিল। হর্ষিত রাজা দ্রুপদ সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন অর্জুনের দিকে, রাজসভার বাজনা-বাদ্যি আরও বেড়ে উঠল, আর এই প্রবল শব্দেব মধ্যেই যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেবকে নিয়ে সভা ত্যাগ করলেন— তস্মিংস্তু শব্দে মহতি প্রবৃদ্ধে যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ। আবাসমেবোপজগাম শীঘ্রম্...।

যুদ্ধ-বিগ্রহ যখন লাগেইনি, তখনই নকুল-সহদেবকে নিয়ে সভাত্যাগের কারণ একটাই। বিবাহ মানেই পরিচয়-জ্ঞাপনের সময়। বংশ-গোত্র জানান দেবার সময়। ধরে নিলাম— এঁরা বলতেন— আমরা ব্রাহ্মণ, একচক্রা থেকে আসছি। তাহলেও প্রশ্ন উঠত। পঞ্চপাণ্ডব ততদিনে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। মহামতি কৃষ্ণ যে পাণ্ডব-ভাইদের পূর্বে দেখেননি, তিনি কিন্তু দ্রুপদসভায় পাণ্ডবদের ব্রাহ্মণবেশে বসে থাকতে দেখেই চিনে গিয়েছিলেন। একশোটা বাঙালির মধ্যে পাঁচজন শিখ কিংবা রাজস্থানী ক্ষত্রিয় দেখলে হাবে-ভাবে ঠিকই যেমন চেনা যায় তেমনই একইভাবে অতগুলি শুষ্করুক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে পঞ্চ-পাণ্ডবকে কৃষ্ণ আলাদা করে ফেলেছিলেন চেহারা দেখেই—দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্।

কৃষ্ণ অন্যতর মানুষের থেকে বেশি বুদ্ধিমান, এ কথা ধরে নিয়েও বলা যায় পাণ্ডবদের পঞ্চত্বের সংখ্যাটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, হয়তো যুধিষ্ঠির সেই কারণেই সভাকক্ষ ত্যাগ করেছেন নকুল-সহদেবকে নিয়ে। কারণ ব্রাহ্মণের মেলে এতক্ষণ যারা কেউই তাদের খেয়াল করেননি, দ্রৌপদীর বরমাল্য-দানের পর সেই পঞ্চপাণ্ডব একত্র হলে চিনে ফেলা এবং চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার খুবই সুবিধে। নকুল-সহদেবকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের চলে যাবার কারণ সেইটাই। এর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অক্ষমতা খোঁজার চেষ্টা অথবা আরও উর্বরভাবে যাঁরা এর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ঈর্ষার খবর পান, তাঁদের শুধু যুধিষ্ঠিরের মৌলিক চরিত্রটি স্মরণে রাখতে বলি।

ঈর্ষা-অসূয়ার মতো ক্ষুদ্রতা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কোথাও নেই। যদি যুদ্ধ লাগে, তবে ভীম আছেন; কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ছাড়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ভীমার্জুন থাকতেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, এমন হয়নি। দ্রোণাচার্যের দক্ষিণা দেবার সময় অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে যেতে বারণ করেছিলেন এবং এখানেও যুদ্ধ লাগবার সময় অর্জুনের সেই একই ইঙ্গিত ছিল— অর্জুন ব্রাহ্মণদের বলেছিলেন আপনারা শুধু পাশে দাঁড়িয়ে দেখুন— আমি কী করি— উবাচ প্রেক্ষকা ভূত্বা যূয়ং তিষ্ঠত পার্শ্বতঃ। কাজেই যুধিষ্ঠির চলে এসেছেন, তা ছাড়া যুদ্ধে রক্তক্ষয়ের পরিণতি তাঁর এত বেশি মধুর লাগত না, যে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা উপভোগ করবেন। তিনি চলে এসেছেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করলেন না, অথবা নেমে এলেন পথে— এগুলো কোন বড় কথাই নয়। বড় কথা হল— স্বয়ম্বরের পরবর্তী পর্বে একজন অতি-অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদের মতো যুধিষ্ঠিরের নিপুণ আচরণ। ভীম-অর্জুন দু'জনে দ্রৌপদীকে নিয়ে এসে চিন্তাক্লিষ্ট জননীকে বলেছিলেন,—মা! কী ভিক্ষা এনেছি দেখো। জননী কুন্তী মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—যা এনেছ সকলে মিলে ভাগ করে নাও। তারপর মুখ ঘুরিয়ে কুন্তী যখন দ্রৌপদীকে দেখলেন, তখনই

তিনি বুঝলেন, তিনি কত বড় ভুল করেছেন। কিন্তু এই পরম বিপন্নতার মধ্যে কুন্তীর চোখের সামনে মুশকিল-আসান যে ছবিটি ভেসে উঠল, সেটা যুধিষ্ঠিরের ছবি। সাংসারিক সমস্যা সমাধান করার জন্য একজন সুগৃহিণী যে তাড়না নিয়ে স্বামীর কাছে দরবার করতে যান, প্রায় সেই তাড়নাতেই কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কাছে দৌড়লেন। তাঁর স্বামী নেই, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মতো সর্বাপদহর একটি পুত্র আছে।

আর যুধিষ্ঠিরও সেইরকম। বাড়ির কর্তাটি যেমন বহির্বাটীর চৌকির ওপর পাকা মাথাটি নিয়ে হুকো হাতে বসে থাকেন, যুধিষ্ঠিরও প্রায় তেমনই বসেছিলেন। কুন্তী নববধূ দ্রৌপদীর হাত মুঠো করে ধরে উপস্থিত হলেন সংসারের গুরুঠাকুর যুধিষ্ঠিরের কাছে—পাণৌ গৃহীত্বোপজগাম কুন্তী/ যুধিষ্ঠিরং বাচমুবাচ কুন্তী। কুন্তী জানালেন তাঁর সমস্যার কথা—আমি বলে ফেলেছি, এখন কী উপায় ?

যুধিষ্ঠির এই কৃষ্ণোজ্জ্বল অগ্নিপুঞ্জের মতো রমণীকে পূর্বাহ্নেই দ্রুপদসভায় দেখেছেন। তিনি জানেন— অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে তাঁকে জিতেছেন। আরও জানেন— অর্জুনের মতো মহাবীরের গলায় মালা দেওয়ার সময় এই পরম ব্যক্তিত্বময়ী বিদগ্ধা রমণীটি কত মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির সব দেখেছেন। কিন্তু মা যখন বলেছেন, তাঁর কথার সত্যতা রাখার চেষ্টা করতে হবে, এটা যেমন বড় কথা, তেমনই যুধিষ্ঠিরের আরও একটি চিন্তা হল— মায়ের সত্য-রক্ষার মধ্য দিয়ে যেন একটি সামগ্রিক মঙ্গল সূচিত হয়।

কুন্তীর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। চিন্তার প্রথম সূচনাতেই যুধিষ্ঠিরের মনে এল— ব্যক্তি অর্জুনের বীর্য-লব্ধ মুগ্ধ দ্রৌপদীর কথা। তিনি জানেন এই সম্মানটুকু অর্জুনকে দিতে হবে এবং তিনি এও জানেন যে, দ্রৌপদীকে বিবাহ করবার জন্য অর্জুনকে অনুরোধ করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন। অর্জুনকে তিনি চেনেন। পাণ্ডবভাইদের মধ্যে অর্জুনই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করেন শিষ্যের মতো, যুধিষ্ঠিরের মনও তিনি বোঝেন শিষ্যের মতো। যাই হোক, যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন— তুমিই লক্ষ্যভেদ করে এই রাজপুত্রীকে স্বয়ম্বরে লাভ করেছ, অতএব ইনি তোমারই, তোমার সঙ্গেই এঁকে সবচেয়ে ভাল মানাবে— ত্বয়া জিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী ত্বয়ৈব শোভিষ্যতি রাজপুত্র।

একটি ভদ্র পরিবারের বাড়ির বড়রা যদি নিজস্ব প্রয়োজনে একটি সুকুমারমতি বালকের জিনিস-পত্র ব্যবহার করাব জন্য বালকের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তা হলে সেই বালক যেমন জগতের সমস্ত গৌরব নিজের উদ্ভাসিত মুখে প্রকট করে তোলে, অর্জুনও সেইরকমভাবে যুধিষ্ঠিরকে বললেন,—কেন দাদা, মিছিমিছি আমাকে পাপের ভাগী করছেন। একে তো আর ধর্ম বলা যায় না। আগে আপনার বিয়ে হোক, ভীমের বিয়ে হোক তারপর তো আমি ! আমার এই সিদ্ধান্ত শুনে যেটা আপনার ধর্মসম্মত মনে হয় এবং যেটা আমাদের যশের কারণ হবে—আপনি সেটাই স্থির করুন।

অর্জুন তাঁর একক অধিকার ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাণ্ডবভাই দ্রৌপদীর দিকে একযোগে দৃষ্টিপাত করলেন। এতগুলি বীর-চক্ষুর একত্র সন্নিবেশে দ্রৌপদী কতটা স্বস্তিতে ছিলেন জানি না, কিন্তু যুধিষ্ঠির সবার চোখমুখের ভাব দেখে সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন যে, দ্রৌপদীর জন্য তাঁর সব ভাইই লালায়িত। তাঁর মনে পড়ল ব্যাসের কথা। পাঞ্চালে আসবার আগে ব্যাসদেব তাঁদের দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন— পূর্বজন্মে দ্রৌপদী নাকি মহাদেবের কাছে বর পেয়েছিলেন যে তাঁর পতি হবে পাঁচটি এবং তাঁরা সবাই ভরতবংশীয়— পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে ভবিষ্যন্তীতি ভারতাঃ।

তবে শুধুই কি ব্যাসের আশ্বাস ! তিনি এতক্ষণ ধরে দ্রৌপদীর প্রতি ভাইদের সকাম লোলুপ দৃষ্টি লক্ষ করেছেন— তেষামাকার-ভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। কিন্তু মহাভারতের কবি জানাননি যুধিষ্ঠিরের নিজের কোন দৃষ্টি ছিল দ্রৌপদীর প্রতি। মহাভারতের বক্তা, নিরপেক্ষ দর্শক বৈশম্পায়ন সাধারণভাবে বলেছিলেন— পাণ্ডবগণ সকলেই দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন— দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ। এঁদের মধ্যে তো যুধিষ্ঠিরও আছেন। কৃষ্ণা-দ্রৌপদীকে দেখে সমস্ত পান্ডবই তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করলেন— এর মধ্যেও তো যুধিষ্ঠির আছেন। কিন্তু যাঁর ওপরে সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে, তিনি নিজের কথা বেশি ভাবতে পারেন না, ভাবা উচিত নয়। আর ঠিক সেই

কারণেই দ্রৌপদীর আকর্ষণ কার হৃদয়ে কত বেশি, সেই ব্যক্তি-হৃদয়ের হিসেব-নিকেশ না করে মহাভারতের কবি একেবারে সবার মেলে যুধিষ্ঠিরের হৃদয়টাও মিশিয়ে দিলেন।

যুধিষ্ঠির ব্যাসের কাছে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী লাভের কথা যেমন শুনেছিলেন, তার থেকেও বড় এক সামগ্রিক স্বার্থ তাঁর মনে কাজ করছিল। দ্রৌপদী অসাধারণ রূপবতী ; পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকটি ভাই তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন। এখন যদি অর্জুনের সঙ্গেই এই রমণীর বিবাহ হয় তবে অন্যান্য ভাইদের মনে ক্ষোভ নাই থাকুক, হতাশা থাকবে দুঃখ থাকবে। একটি রমণীকে নিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত পাঁচ ভাইয়ের এক জোটের মধ্যে বিভেদ উপস্থিত হয়, তবে পাণ্ডবদের পিতৃরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন তো দূরের কথা, নিজেদের মধ্যেই এক দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হবে। প্রধানত সেই ভয়েই— মিথো ভেদভয়ান্নৃপঃ— যুধিষ্ঠির তাঁর অসাধারণ সিদ্ধান্ত জানালেন— সুন্দরী সুলক্ষণা দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই পত্নী হবেন। এই সিদ্ধান্ত যে ভাইদের কাছে কতটা স্বাগত ছিল— তা তাঁদের পরবর্তী আচরণেই বোঝা যায়। যুধিষ্ঠিরের মতামত শুনে ভাইরা সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদীকে নিয়ে ভাবতেই থাকলেন, ভাবতেই থাকলেন— তমেবার্থং ধ্যায়মানা মনোভিঃ/সর্বে চ তে তস্থুরদীনসত্ত্বাঃ।

যুধিষ্ঠিরের এই সিদ্ধান্ত সমস্ত ভাই-এর কাছে যতই মনোগ্রাহী হোক কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে এই সিদ্ধান্ত যে কতটা সুখপ্রদ ছিল, সে খবর এখনও পাওয়া যায়নি এবং তা বোঝানোর সময়ও এখন আসেনি। দ্রৌপদী পাণ্ডববাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছেন, এই মুহূর্তে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাও মুশকিল। কিন্তু পাঁচ ভাই একসঙ্গে একটি রমণীকে বিবাহ করবেন— এই অসম্ভব কথাটা দ্রুপদরাজা এবং তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বোঝানোও তো যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ল। দ্রুপদরাজা পাণ্ডবদের প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে তাঁদের রাজসভায় ডেকে আনলেন এবং পরম সম্মানে তাঁদের জন্য আতিথেয়তা সম্পন্ন করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দ্রুপদ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, সেই মুহূর্তেই যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্ত শুনে দ্রুপদ তো আকাশ থেকে পড়লেন।

দ্রুপদ বললেন— এমন কথা তো জীবনে শুনিনি, বাবা ! একজন পুরুষমানুষ অনেকগুলি স্ত্রীর স্বামী হতে পারেন, এমন নিশ্চয়ই দেখেছি। কিন্তু একটি রমণীর অনেকগুলি স্বামী— এমন খবর তো জীবনে শুনিনি বাপু— নৈকস্যা বহবস্তাত শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ। লৌকিক আচারই বলো আর বৈদিক আচারই বলো— তোমার মতো একজন ধর্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে অধর্মের কাজ করা কখনও ঠিক হবে না। দ্রুপদের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে যেন একটা ধাক্কা লাগল। তিনি অধর্ম করছেন ? মায়ের কথা রাখতে হবে— এই যুক্তি যদি নিতান্ত স্বার্থপরের মতোও হয়, তবু কি এর মধ্যে অন্য কোনও ধর্ম-যুক্তি ছিল না ?

দ্রুপদের কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বললেন, তা নিতান্ত এক অহঙ্কারীর বক্তব্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তবু তার মধ্যে ধর্মের যুক্তিও আছে। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— অধর্মের কথা বলবেন না, মহারাজ ! ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম— সূক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্— আমরা সেই সূক্ষ্ম ধর্মের গতিপথ ভাল করে বুঝতে পারি না। অর্থাৎ সে ধর্ম এতটাই সূক্ষ্ম, যে আপাতত তা অধর্ম বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু তবু তা ধর্ম, কেন না যুধিষ্ঠির বলছেন— আমার তাই মনে হচ্ছে। আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরয় না, অধর্মে আমার প্রবৃত্তি হয় না— ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্মে ধীয়তে মতিঃ।

বলতে পারেন— কে এমন বড়-মানুষ হে তুমি ? অধর্মের দিকে তোমার মনই যায় না, অসত্যের দিকে কখনও তোমার মন টলে না— এসব ডম্ফাই করলেই কি তোমার সিদ্ধান্তটা প্রমাণসহ বলে মানতে হবে ? আমরা বলি— সত্যিই মানতে হবে। যুধিষ্ঠির বলছেন বলেই মানতে হবে। যুধিষ্ঠির বলেছেন— ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের নিরিখে ধর্ম শব্দটা যে কত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ঘি জিনিসটা খেতে কেমন— এটা যেমন 'স্পেসিফিক্যালি' ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন, ভারতবর্ষের জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র পরিবেশে ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বোঝানোও ঠিক ততখানিই কঠিন। আগে একটা উদাহরণ দিই। কারণ ধর্ম ব্যাপারটা সামান্যভাবে না বুঝলে যুধিষ্ঠিরকে অন্তত বোঝা

যাবে না। বসন্তের রহস্য কিছুই না বুঝলে কোকিলকে বুঝবেন কী করে ?

আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়— কুরু-পাণ্ডবদের যিনি বাবা হতে পারতেন, সেই বিচিত্রবীর্য যখন মারা গেলেন তখন জননী সত্যবতী শান্তনুর গঙ্গাগর্ভজাত পুত্র ভীষ্মকে বললেন— বাবা ! বিচিত্রবীর্য আমার ছেলে, তোমার ভাই— তা সে তো অল্প বয়সেই মরে গেল। রেখে গেল দুটি বিধবা বউ। তাদের ছেলেপিলেও নেই। তা তুমি বাপু তাদের গর্ভে উপযুক্ত সন্তানের জন্ম দাও। এই বিশাল ভরত-বংশ উৎসন্ন হতে দিয়ো না, বাবা। আমার কথা শোনো, তুমি এই দুই বিধবাকে বিয়ে করো, পুত্রের জন্ম দাও— এটাই ধর্ম— মন্নিয়োগান্ মহাবাহো ধর্মং কর্তুমিহার্হসি।

বিখ্যাত ভরতবংশে পুত্র জন্মাল না, অতএব সেকালের সমাজ-সচল নিয়োগ-প্রথায় বিচিত্রবীর্যের বিধবা স্ত্রীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার কথা বলা হল ভীষ্মকে এবং সত্যবতীর মতে এটাই ধর্ম। যাঁকে এই ধর্ম করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে নিরপেক্ষ কথকঠাকুরের ভাষায় সেই ভীষ্ম হলেন ধর্মাত্মা এবং তিনি যে উত্তর দিচ্ছেন, সেটাও ধর্মের বিধি-নিয়ম সম্মত— উবাচাথ ধর্মাত্মা ধর্ম্যমেবোত্তরং বচঃ।

সত্যবতীর সঙ্গে ভীষ্মের বয়সের খুব বেশি ফারাক ছিল না বলেই আমার মনে হয়, কিন্তু পিতা শান্তনুর সম্পর্কে তিনি ভীষ্মের জননীকল্পা। ভীষ্ম জননীর কথা প্রথমেই মেনে নিয়ে বললেন— মা ! তুমি যা বললে, সেটা যে পরম ধর্ম— তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু তুমি তো জানোই মা, তোমার সঙ্গে পিতা শান্তনুর বিয়ের আগে তোমারই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম— আমি কোনওদিন বিয়েই করব না। আজকে সেই সত্য-প্রতিজ্ঞা থেকে আমি সরে আসতে পারি না। কারণ সেটা ধর্ম নয়।

সত্যবতী বললেন— আমার জন্য তুমি যা করেছিলে, যা বলেছিলে, তা সবই আমার মনে আছে। তবে কিনা এ হল বিপদের সময়, আপৎকাল। ভরত-কুরুদেব কুলতন্তু ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই আপদ্ধর্মও তো একটা আছে বাবা— আপদ্ধর্মং ত্বমাবেক্ষ্য— সেটা বুঝে এমন একটা কিছু করো যাতে এই কুলতন্তুও অবিচ্ছিন্ন থাকে, আবার তোমার ধর্মও থাকে। ভীষ্ম বললেন যে, দুটো কাজ তাঁর দ্বারা হবে না। সত্যবতীকে বললেন— তুমি ধর্মের দিকে তাকাও মা, আমাদের সবাইকে ডুবিও না। শান্তনুর সন্তান-পরম্পরা যাতে পৃথিবীতে থাকে, সেটা আলাদা করে আমি ভাবব এবং সে বিষয়ে কথাও বলব। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করতে পারি না কারণ সত্য-প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়— সত্যাচ্চ্যুতিঃ ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্মেষু প্রশস্যতে।

লক্ষ করে দেখেছেন নিশ্চয়ই— এই সামান্য সংলাপের মধ্যে অন্তত তিন-চার রকমের ধর্মের কথা বলা হল। প্রথমটির বিষয়ে পারিবারিক চাহিদা আছে অর্থাৎ বংশ-রক্ষা করতে হবে, পিতা-পিতামহের কাছে যে ঋণ, তা শোধ করতে হবে। সত্যবতী বলেছেন— ভীষ্ম ! তুমি পুত্রের জন্ম দাও, বাপ-ঠাকুরদাদের ডুবিও না— মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্। এই কথার উত্তরে ভীষ্মের সশ্রদ্ধ উত্তর কিন্তু একেবারে বিপরীত। অর্থাৎ বাপ-ঠাকুরদার বংশ-রক্ষার ধর্ম করতে গিয়ে তুমি আবার আমাদের ডুবিও না। অর্থাৎ আমারও একটা ব্যক্তিগত ধর্ম আছে— আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

ভীষ্মের প্রতিবাদে সত্যবতীর বংশধর্ম, পারিবারিক ধর্ম যে মুহূর্তে আপদ্ধর্মে পরিণত হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীষ্মের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞাও ক্ষত্রিয়ের জাতি-ধর্মে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধর্মের বিপরীতে ব্যক্তিগত ধর্ম। আবার আপদ্ধর্মের মতো একটা 'সামান্য', নিয়মের বিপরীতে এখানে জাতিধর্মের মতো অন্য আরও একটা 'সামান্য' নিয়ম দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সবগুলোই ধর্ম। এখানে প্রত্যেকটি বাক্য শাস্ত্রের যুক্তিতে সমর্থন করা যায়।

বস্তুত এই রকম কোনও ধর্ম হলেও হত। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা অথবা বংশ-রক্ষার ধর্ম। যুধিষ্ঠির এখানে দ্রুপদকে যা বলেছেন, সেটাকে কিন্তু এইরকম কোনও ব্যক্তিনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক নীতি— কোনও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। শুধু— মা এইরকম বলেছেন এবং আমি মায়ের কথাই সমর্থন করি— এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্— শুধুমাত্র এই যুক্তিতে এক সুচিরপ্রোথিত সামাজিক প্রত্যয় প্রত্যাখ্যান করে পাঁচ ভাই মিলে একই রমণীকে বিবাহ করাটা

আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনীয় নয় বলেই যুধিষ্ঠির বলেছেন— ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম, মহারাজ ! আমরা সেই সূক্ষ্মতা বুঝতে পারি না। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যে সূক্ষ্মতার কথা বলছেন, সেটা দ্রুপদকে যেমন বোঝানো সম্ভব নয়, তেমনই যুধিষ্ঠিরের পক্ষেও সেটা বলা সম্ভব নয়। কেন বলা সম্ভব নয়, সেটা জানাই।

জৈমিনীয় মীমাংসা-সূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার কুমারলি ভট্ট তাঁর তন্ত্রবার্তিকের মধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোনও সিদ্ধান্ত ধর্মসম্মত হল কি না তা বিচার করতে হলে প্রমাণ বলে কাকে মানতে হবে ? এই প্রশ্নের মীমাংসায় স্বভাবতই বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রগুলি ধর্ম এবং বিদ্যার আধার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বেদমূলক শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র এইগুলিই প্রধান। এখন প্রশ্ন হল—এই সব শাস্ত্র-যুক্তি ছাড়াও সমাজে আরও অনেক কিছু চলে যেগুলিকে আমরা ধর্ম-সঙ্গত বলে মনে করি। দেশকাল সমাজ ভেদে বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুমত সদাচারও তো ধর্মের আধার। এইখানে কুমারিলভট্ট মনু-যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রকারদের প্রমাণ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে— হ্যাঁ, শুধু সদাচার কেন, কোনও বিতর্কিত বিষয়ে বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তির আত্মতুষ্টিও একটা প্রমাণ। কারণ মনু-যাজ্ঞবল্ক্য সেই রকমই লিখেছেন— শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

বলতে পারেন আত্মতুষ্টি— আত্মনস্তুষ্টিরেব চ— এও কি ধর্ম বিষয়ে কোনও প্রমাণ হতে পারে, না হওয়া উচিত ? নিজের ভাল লাগা, নিজের তুষ্টি তো আরও স্বার্থ বাড়িয়ে তুলবে, সেখানে ধর্ম কোথায় ? আর সদাচার ? সেও বড় গোলমেলে কথা। বিশিষ্ট এবং মহান ব্যক্তি এমন সব গণ্ডগোল করে রেখেছেন, যা অনুসরণ করতে গেলে বিপদ হবে— সদাচারেষু দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসং চ মহতাম্...। কুমারলি ভট্ট এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রাদিদেবতা থেকে আরম্ভ করে মহামতি রামচন্দ্র পর্যন্ত সকলেরই কোনও না কোনও দুঃসাহসের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলি মোটেই সদাচার নয়। লক্ষণীয় যুধিষ্ঠির যে ছোটভাইয়ের বউকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন— এই দুঃসাহসের কথাও সেখানে সযত্নে উল্লিখিত হয়েছে— যুধিষ্ঠিরস্য কনীয়ো'র্জিত-ভ্রাতৃজায়া-পরিণয়নম্।

ভট্টের আশয়টি পরিষ্কার। অর্থাৎ এগুলি বড় মানুষের সাহস। তাঁদের অপার ধারণ-ক্ষমতা আছে। অতএব একটা-দুটো অন্যায় আচরণ করলেও সেগুলি সাধারণের আচরণীয় নয়। আমাদের চিন্তা কিন্তু অন্য জায়গায়। কোনও অন্যায় আচরণ করার পর সেটাকেই যদি বিশিষ্ট মানুষের আত্মতুষ্টির জায়গা বলে ধরে নিই তাহলে তো সমাজ এবং ধর্মের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কুমারিল বলেছেন—ব্যাপারটা অত সোজা নয়। প্রথমত বড় মানুষেরা যেখানে ধর্ম অতিক্রম করেন, সেখানে যদি শ্রুতি-স্মৃতির সামান্য প্রচ্ছন্ন 'সাপোর্ট'ও থাকে, তবে তা কাজে লাগিয়ে তথাকথিত কালিমালিপ্ত মহান পুরুষটিকে তো উদ্ধার করতেই হবে। তাতেও না হলে, তাঁদের অতিমানুষ তেজ এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিরিখে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে তাঁরা লোক-সমাজে অশ্রদ্ধেয় না হয়ে পড়েন—

> শ্রুতিসামান্যমাত্রাদ্বা ন দোষো'ত্র ভবিষ্যতি।
> মনুষ্যপ্রতিষেধাদ্বা তেজোবলবশেন বা ॥
> যথা বা ন বিরুদ্ধত্বং তথা তদ্গময়িষ্যতি ॥

যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদী-পরিণয় বিষয়ক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা দেখানোর জন্য কুমারিল তাই প্রথমে স্বয়ং ব্যাসদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আমরা জানি—দ্রুপদরাজা যখন কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ-পতিত্বের প্রস্তাব মেনে নিতে পারছেন না, তখন স্বয়ং ব্যাসদেব এসে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের সংবাদ অপিচ মহাদেবের বরদানের কথা বলে দ্রুপদরাজাকে সম্পূর্ণ শান্ত করার চেষ্টা করেন। ব্যাসের প্রতিপাদিত অর্থ কুমারিল ভট্টের কাছে পুরাণ-বচনের মর্যাদা ধরে বলেই তিনি সেটাকে ধর্মের যুক্তি বলেই মনে করেছেন—পাণ্ডুপুত্রাণামেকপত্নীবিরুদ্ধতা। সাপি দ্বৈপায়নেনৈব ব্যুৎপাদ্য প্রতিপাদিতা।

কুমারিল কিন্তু জানেন যে, ব্যাসের অলৌকিক যুক্তিগুলি সাধারণের কাছে নিশ্চয়ই তত গ্রাহ্য হবে না, যদি না সেখানে লৌকিক মঙ্গলের প্রশ্ন থাকে। যুধিষ্ঠিরের ভয় ছিল—অসামান্যা দ্রৌপদী একটি

মাত্র ভাইয়ের কপালে স্ত্রী হিসেবে জুটলে ভাইতে-ভাইতে ঝগড়া লাগবে, পাঁচ ভাইয়ের জোট ভেঙে যাবে—মিথো ভেদভয়ান্নৃপঃ। কুমারিল এই কথাটা মনে রেখে বলেছেন—রমণীকুলের রত্নভূতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়েছেন পৈত্রিক উত্তরাধিকারের মতো রত্নের মর্যাদায়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল—যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তে সবরকম বিভেদ দূরীভূত হওয়ায় ভাইদের মধ্যে সংঘাতটাও তো এড়ানো গেছে—পরস্পরং সংঘাতাবিষয়ং চ ভেদপ্রয়োগানবকাশার্থং দর্শয়িতুং সাধারণ্যপ্রখ্যাপনম্।

এটাও না হয় বোঝা গেল, কিন্তু আত্মতুষ্টির কথাটা এখনও বাকিই রয়ে গেল। যুধিষ্ঠির কেন বললেন—অধর্মের দিকে যেহেতু আমার মন যায় না, অতএব এইটাই ধর্ম। কুমারিল ভট্ট এই জায়গাও ধরেছেন, তবে যুধিষ্ঠিরের নাম তিনি এই প্রসঙ্গে করেননি। কুমারিল বলেছেন—যে সমস্ত পুরুষ শ্রুতি-স্মৃতির নির্দিষ্ট পথেই সবসময় বিচরণ করেন, বেদবিহিত সংস্কারে যাঁদের অন্তর সর্বদা পরিশীলিত তাঁরা এমন কিছু করতেই পারেন না, যার মধ্যে উন্মার্গগামিতার চিহ্ন আছে—বহুকালাভ্যস্ত-বেদতদর্থজ্ঞানাহিত-সংস্কারাণাং বেদনিয়তমার্গানুসারিপ্রতিভানাং নোন্মার্গেন প্রতিভানং সম্ভবতি।

সব কিছুর পরে কুমারিলের দার্শনিক মন্তব্য—বহুদিন ধরে যাঁদের মনপ্রাণ ধর্মের আচার-নিয়মেই সংস্কৃত হয়ে আছে, তাঁদের মন ধর্মসম্মত বিষয় ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে লিপ্তই হবে না, অধর্মের কাজে তাঁদের আত্মতুষ্টিও ঘটবে না কিছুতেই—বহুদিনাভ্যস্তধর্মব্যাপ্তাত্মনো হি ন কথঞ্চিদ্ ধর্মকরণরূপাত্মতুষ্টি-রন্যত্র সম্ভবতীতি। পরিষ্কার ভাষায়—এইরকম পর্যায়ের একটি মানুষ যদি তথাকথিত অন্যায়ের মধ্যেও নিজে সেই কাজ করে বা সিদ্ধান্ত দিয়ে তুষ্ট হন, তবে বুঝতে হবে সেইটাই ধর্ম—ধর্মত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে। বৈদিকবাসনাজনিতত্বাদ্ বেদ এব স ভবতি।

এবার আমাদের মহাভারতের মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে এসে বলি—যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তো আর এটা বলা সম্ভব নয় যে—মহারাজ! আমার মন শম-দমাদি সাধনে সংস্কৃত হয়ে গেছে, আমি একজন বৈদিক সংস্কার-সম্পন্ন আর্য পুরুষ, অতএব আমি যা বলব তাই ধর্ম। সত্যি কথা বলতে কি, যুধিষ্ঠির যা বলেননি অথবা অহঙ্কার দেখানোর ভয়ে যা তিনি বলতে পারেননি, যুধিষ্ঠির সেই রকমই একজন শম-দম-সম্পন্ন বিরাট পুরুষ। এবং আমরা যেরকম বিষম পরিস্থিতিতে অথবা সঙ্কটকালে প্রায়ই বলে থাকি—আমার মন বলছে—এই রকমটা করা উচিত—সেই রকম পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরের মতো উচ্চ-সংস্কার-সম্পন্ন মানুষ যদি সামগ্রিক পরিবারেব মঙ্গলের জন্য এমন একটা সিদ্ধান্ত দেন যা আপাতদৃষ্টিতে লোক-বেদবিরুদ্ধ, তবুও সেটাই ধর্ম। কারণ ধর্মের অবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রবৃত্তিই হতে পারে না।

আমরা ধরেই নিলাম—অন্যান্য ভাইদের মতো কৃষ্ণা-দ্রৌপদীর রূপ-লাবণ্য যুধিষ্ঠিরকেও আকর্ষণ করেছিল। এই বিদগ্ধা রমণীর অলৌকিক উজ্জ্বলতায় যুধিষ্ঠিরও ভাইদের মতো একইরকম বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ছিলেন—ধরেই নিলাম। কিন্তু দ্রৌপদী-বিজেতা তাঁকেই তো প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে বিবাহ করবার জন্য—ভবান্ নিবেশ্যঃ প্রথমম্। এমনকী দ্রুপদরাজাও যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—তা হলে আপনিই যথাবিধানে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।—ভবান্ বা বিধিবৎ পাণিং গৃহ্ণাতু দুহিতুর্মম। কিন্তু না, স্বার্থ সিদ্ধ করার সুযোগ থাকতেও তা একটুও ব্যবহার করেননি যুধিষ্ঠির। তিনি মায়ের কথা শুনে সংসারের প্রথম-প্রাপ্ত মহার্ঘ্য রত্নটি পাঁচ ভাই মিলে ভাগ করে নিয়েছেন। দ্রুপদরাজাকে তিনি বলেছেন—মহারাজ! আমাদের এইরকমই নিয়ম। একের দ্বারা প্রাপ্ত রত্ন আমরা সকলে একসঙ্গেই গ্রহণ করি এবং ভোগ করি—এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহ ভোজনম্।

এরই মধ্যে স্বয়ং বেদব্যাসের যুক্তিতন্ত্র ব্যাখ্যাত হল যুধিষ্ঠিরেরই অনুকূলে। দ্রুপদ স্ত্রীজাতির রত্নভূতা দ্রৌপদীকে সানন্দে তুলে দিলেন পাঁচ ভাইয়ের হাতে। দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিয়ে হওয়ার পর-পরই পাণ্ডব-কৌরবদের জ্ঞাতি-সম্বন্ধ রাজনৈতিক সম্বন্ধে পরিণত হল। পাঞ্চালরাজ্যের রাজা দ্রুপদ হস্তিনাপুর-নিবাসী কৌরবদের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা। দ্রোণাচার্যের কারণে তাঁর রাজ্যের

অর্ধেকটা চলে গেছে এবং দ্রোণাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র। দ্রোণাচার্যের প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দেওয়ার সময় পাণ্ডব-মধ্যম অর্জুনই যদিও দ্রুপদকে জীবিত ধরে এনেছিলেন, তবু অর্জুনের মর্যাদাবোধ এবং অমানুষী শক্তির নিরিখে দ্রুপদ তাঁর ওপরে মোটেই ক্ষুব্ধ হননি। বরঞ্চ দ্রৌপদীর বিবাহের সূচনায় তিনি মনে মনে অর্জুনকেই পাত্র হিসেবে চেয়েছিলেন। আজ এই বিবাহের সূত্রে দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডবদের নতুন এক সম্পর্ক হয়ে যাওয়ায় দ্রুপদের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

অন্য দিকে দেখুন, পাণ্ডবরাও এক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী, যাঁদের নেতা হলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর দিক থেকে সমস্ত সততা থাকা সত্ত্বেও কৌরবরা পদে পদে তাঁদের বিরোধিতা করছেন। তাঁদের জ্ঞাতি-বিরোধ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বিষ দেওয়া, আগুন লাগানো ইত্যাদি কোনও অপকর্মেই তাঁদের কোনও দ্বিধা নেই। কৌরবদের আরেক বিরুদ্ধ-গোষ্ঠী হিসেবে পাণ্ডবপক্ষের মুখপাত্র যুধিষ্ঠির হাত মেলালেন দ্রুপদের সঙ্গে। যুধিষ্ঠিরকে যাঁরা বোকা ভাবেন, তাঁদের জানাই—দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবাহ হওয়াব প্রাক্কালে দ্রুপদ যখন প্রথম পাণ্ডবদের পরিচয় পেলেন, তখনই তাঁদের সসম্মানে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। রাজবাড়িতে নিজেদের পরিচয় দ্রুপদকে নিশ্চিতভাবে জানানোর পর-পরই যুধিষ্ঠির রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গের প্রথম সূচনায় যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে বলেন—আপনার কাছে সব কথাই সত্য বলছি। তার কারণ বৈবাহিক-সম্বন্ধে আপনি শুধু আমাদের গুরুই নন, আপনি আমাদের আশ্রয়—ভবান হি গুরুরস্মাকং পরমঞ্চ পবায়ণম্। দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে আপ্লুত বোধ করেছেন— হর্ষ-ব্যাকুল-লোচনঃ। যুধিষ্ঠির এবার আস্তে আস্তে জানিয়েছেন—কীভাবে কৌরবরা তাঁদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং কীভাবে পাণ্ডবরা জতুগৃহের আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সব ঘটনা যুধিষ্ঠির আনুপূর্বিকভাবে দ্রুপদকে জানালেন—স তস্মৈ সর্বমাচখ্যৌ আনুপূর্ব্যেণ পাণ্ডবঃ। যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শোনার পর আমরা দেখছি—দ্রুপদ কৌরব-শ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ দ্রুপদ এবং যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপন স্বার্থে একাত্ম হলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এর পরে দ্রৌপদীর বিবাহের সূত্র ধরে যুধিষ্ঠিরের পুরো পরিবারের সঙ্গে প্রথাগতভাবে পরিচিত হবেন। কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট রাজনৈতিক চুক্তি হয়ে গেল যুধিষ্ঠির আর দ্রুপদের মধ্যে। দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত রাজনৈতিক আশ্বাস দিয়ে পাণ্ডবরা যাতে তাঁদের রাজ্য ফিরে পান, সে বিষয়ে আপন প্রতিজ্ঞা জানালেন যুধিষ্ঠিরকে—প্রতিজজ্ঞে চ রাজ্যায় দ্রুপদো বদতাং বরঃ।

যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক আশ্বস্ততা বাড়ল আরও একটি কারণে। যদুবংশীয় কৃষ্ণ-বলরাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেছেন এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁরা নিজের দাদার মতোই সম্মান করেন। এমনিতেই তাঁদের মধ্যে আত্মীয়-সম্বন্ধ আছে—কৃষ্ণের পিতা এবং যুধিষ্ঠিরের মাতা আপন ভাই-বোন। পাণ্ডবরা কৌরবদের হাতে বারবার বিপন্ন হওয়ায় কৃষ্ণ এবং অন্যান্য যাদবরা এমনিতেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহ-সূত্রে পাঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের যখন একটা 'আঁতাত' হয়ে গেল, তখন মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন নিরপেক্ষ মন্তব্য করলেন—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডবদের এই যে সংযোগটি ঘটল—পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং গতস্য দ্রুপদস্য হ—এতে পাণ্ডবদের আর কোনও ভয়ই রইল না, এমনকী শক্তিমান দেবতাদের থেকেও তাঁদের আর ভয় রইল না বলে মনে হল।

পাণ্ডব-পাঞ্চালদের এই জোটের বিষয় কুরুসভাতেও প্রচুর আলোচিত হল। ধৃতরাষ্ট্র অনুভব করলেন যে, দ্রুপদরাজাকে সবান্ধবে আত্মীয় হিসেবে পেয়ে পাণ্ডবরা লাভবান হয়েছেন, তাই শুধু নয়, তাঁদের রাজনৈতিক শক্তিমত্তা অনেক বেড়ে গেছে। কুরুবাড়ির বৃদ্ধদের চাপ, পাণ্ডবদের পিছনে পাঞ্চাল-যাদবদের জোট বাঁধা এবং পাণ্ডবদের পৈতৃক অধিকার—সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কুরুরাজ্যের একাংশ ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন। রাজ্যের জন্য যেখানে জমি-জায়গা দিলেন ধৃতরাষ্ট্র, সেটা জায়গা হিসেবে খুব ভাল নয় বটে, তবে শত হলেও সেটা

পাণ্ডবদের প্রথম স্বাধিকার, আর পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেখানে রাজা হবেন। রাজ্য লাভ করার ফলে যুধিষ্ঠিরের মনে যে খুব ব্যক্তিগত উন্মাদনা ছিল, তা মোটেই নয়। তবে জননী কুন্তী এতকাল রাজরানি ছিলেন, ভাইরা পৈতৃক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সেই ছোটবেলা থেকে বিবাহের বয়স পর্যন্ত একটি রাজপরিবারের অকারণ দুর্দশা—এই সমস্ত কিছুই যুধিষ্ঠিরের অন্তরে ক্রিয়া করে থাকবে। অতএব উচ্চাবচ ভূমি, শস্যহীন এক প্রান্তর যুধিষ্ঠিরের জন্য নির্ধারিত হলেও যুধিষ্ঠির বিমনা হলেন না। রাজধর্মের আদর্শে স্থিত হয়ে ভাইদের সঙ্গে সানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন যুধিষ্ঠির—পালয়ামাস ধর্মেণ পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ।

৫

রত্নাভূতা দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিয়ে হল, তাই আমাদেরও দায় আছে সেই রত্নের একটু বিচার করার। শুনেছি বিশিষ্ট রত্নের ওপর রঙের ছায়া পড়ে। রত্নের ওপর রঙের ছায়া পড়লে সেই রত্ন নতুন রূপ ধারণ করে। কথাটা অসত্য নয়, তবে সে রত্ন যদি হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল সাদা হত, তবে এই বিচিত্র রঙের খেলা মানাত ভাল। কিন্তু মহাভারতের কবি দ্রৌপদীকে উজ্জ্বল নীলাভ বৈদুর্যমণির সঙ্গে তুলনা করেছেন বারবার। হতে পারে, এ তুলনা তাঁর গায়ের রঙের সঙ্গে। কিন্তু দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও এই বৈদূর্য-নীলিমা জমাট বাঁধা আছে। ফলে অন্য রঙের ছায়া পড়া মাত্রই নীলাভ সেই মণি অন্যতর এক রূপ পরিগ্রহ করে না। আপন রঙের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, সে অন্য রঙের ছায়া গ্রহণ করে স্বল্পমাত্র, এবং সে ছায়া কখনওই দ্রৌপদীর আপন বিদগ্ধতার বৈদূর্য-নীলপ্রভা অতিক্রম করতে পারে না।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সাধারণ সূত্রটি সর্বত্র দৃঢ়, এবং তা একই রকম। কিন্তু এই পাঁচ ভাইয়ের প্রত্যেকের চরিত্র আলাদা, ব্যক্তিত্বও আলাদা। যুধিষ্ঠির যেদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হয়ে বসলেন, সেদিন তাঁর পট্টমহিষীর আসন অলংকৃত করেছিলেন দ্রৌপদী। নারদের দেওয়া বিধানে জ্যেষ্ঠের পরম্পরায় দ্রৌপদী প্রত্যেক স্বামীর ঘর আলো করবেন এক বৎসর ধরে—একৈকস্য গৃহে কৃষ্ণা বসেদ্‌বর্ষমকল্মষা—এই ঠিক ছিল পাঁচ স্বামীর মধ্যে। অত্যন্ত প্রত্যাশিতভাবে যুধিষ্ঠিরই প্রথম সুযোগ পান দ্রৌপদীর সঙ্গসুখ উপভোগ করার। এই বিদগ্ধা রমণীর সঙ্গ লাভ করে যুধিষ্ঠিরের মন কতটা রঞ্জিত হল, নববধূর লজ্জিত বাসরশয্যায় যুধিষ্ঠিরের কানে কানে কী কথা বলেছিলেন দ্রৌপদী—সে সব খবর মহাভারতের কবি দেননি।

শুধু একদিন যখন সেই ব্রাহ্মণের গরু চুরি হয়ে গেল, আর অর্জুন অস্ত্র-সংগ্রহের জন্য ঢুকলেন যুধিষ্ঠিরের ঘরে—হয়তো তখন একান্তে জ্যেষ্ঠস্বামীর সঙ্গে বসেছিলেন দ্রৌপদী। বাস্! এইটুকুই। মহাভারতের কবি দ্রৌপদীর স্বামী-সম্বন্ধ নিয়ে আর দ্বিতীয় কোনও অন্তরঙ্গ-চিত্র তৈরি করেননি। যেখানে অন্যের প্রবেশ ছিল অপরাধের মতো সেখানে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ঘরে প্রবেশ করে অপরাধী হলেন পূর্বকৃত বিধানে। কী আশ্চর্য! আর কেউ নয় অর্জুনই, যাঁকে স্বয়ম্বরে বরণ করার সময় দ্রৌপদী এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মদ্যপান না করলেও তাঁর অন্তর্গত মুগ্ধতায় তিনি মদস্খলিতা যুবতীর মতো বিনাবাক্যে শুধু চোখের দৃষ্টিতে কথা বলছিলেন অর্জুনের সঙ্গে—মদাদৃতে'পি স্খলতীব ভাবৈর্বাচা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্যা।

দ্রুপদ-সভায় ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে বসে যুধিষ্ঠির কি বিদগ্ধ রমণীর এই সরস সাত্ত্বিক বিকার লক্ষ করেননি? মায়ের কথায় তথা পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভেদের ভয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়েই একক রমণীর পঞ্চস্বামিত্বের প্রস্তাব বেরিয়েছিল এবং পরিস্থিতির চাপে দ্রৌপদীকে তা মেনেও নিতে হয়েছিল বিনা বাক্যে। কিন্তু এই কারণে দ্রৌপদীর মনে কোনও ক্ষোভ ছিল কিনা, তা প্রায় কখনওই বোঝা যায়নি। যদি সে ক্ষোভ থেকেও থাকে, তবে রমণীয় গুণে এবং বিদগ্ধতায় তা কখনও বাইরে প্রকট হতে দেননি দ্রৌপদী। তবে মহাভারতের কবির হাতে আছে কবিত্বের কৌশল, আর ব্যঞ্জনাবৃত্তির অপূর্ব উন্মিলনী ক্ষমতা। কবি সেই শক্তিতে বিভিন্ন জায়গায় এমন এমন সব ঘটনার সন্নিবেশ

করেছেন, যাতে করে পঞ্চ-স্বামীর প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরে কী ছিল অথবা দ্রৌপদীর অন্তর্হৃদয়েই বা কী আছে, তা বেশ বোঝা যায়।

যেমন এই ঘটনাই ধরুন না। অর্জুন ব্রাহ্মণের স্বার্থে যুধিষ্ঠিরের ঘরে ঢুকে অপরাধী হলেন এবং পূর্ববিধান মেনে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নির্দ্বিধায় বললেন—আদেশ করুন, আর্য ! দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে যেতে চাই। আমরা তো এইরকমই নিয়ম করেছি—বনবাসং গমিষ্যামি সময়ো হ্যেষ নঃ কৃতঃ। ঠিক এই কথাটি শোনার পর যুধিষ্ঠিরের মুখের অবস্থাটি বোঝা না গেলেও মনের অবস্থাটা বোঝা যায়। নিশ্চয়ই সেই স্বয়ম্বর-সভার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল—দ্রৌপদীর বাক্যহীন মদস্খলিত সেই মুগ্ধদৃষ্টি অর্জুনের দিকে প্রসারিত। অথচ সেই মানুষটিকে আজ বনবাসে যেতে হবে। যুধিষ্ঠির যেন আর সহ্য করতে পারলেন না। নিজেকে তাঁর এতই অপরাধী মনে হল যে, তিনি যেন কেমন থতমত খেয়ে বললেন—তুমি তো আমাকে সমস্ত কাজে প্রমাণ বলে মানো। তা আমাকেই যদি মানো, তবে শোনো—তোমার কোনও অন্যায়ই হয়নি অর্জুন। বড়দাদার ঘরে ছোটভাই ঢুকলে কীসের দোষ— গুরোরনুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সঃ ? দোষ হত, যদি আমি ঢুকতাম তোমার ঘরে।

কথাটা যুধিষ্ঠির যতখানি অর্জুনের উদ্দেশে বলেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি বলেছেন দ্রৌপদীর উদ্দেশে। এ যেন নিজের হাতে তাঁকে পঞ্চ-স্বামীর শাস্তি দিয়ে দ্রৌপদীর কাছে জবাবদিহি করা—তুমি ফিরে এসো অর্জুন। আমার কথা শোনো। এতে তোমার কোনও অধর্ম হবে না, আমার ঘরে ঢুকে তুমি একটুও অন্যায় করনি—ন হি তে ধর্মলোপো'স্তি ন চ মে ধর্ষণা কৃতা। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি দ্রৌপদীর কাছে। অর্জুন বড়ভাইকে শাসন করে বলেছেন—তোমার কাছেই না শিখেছি দাদা, চালাকি করে ধর্ম হয় না—ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্। অর্জুন বনবাসে চলে গেছেন।

অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর মনে যত দুর্বলতাই থাক, যুধিষ্ঠিরের এই ব্যবহারে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর হতবাক হওয়ার কথা। হয়তো সেদিনই তিনি বুঝেছেন—কত অসহায় এই মানুষটি ! স্বামী হিসেবে নিজেকে সশক্তিতে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই, অথচ সেই মানুষটি রাজা হয়ে বসেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে। এটাই সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা, রাজা হওয়ার জন্য যে মানসিক শক্তি এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার দরকার হয়, সেই রাজনৈতিক দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। দ্রুপদসভায় দ্রুপদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা এবং মিত্রপক্ষে পাঞ্চাল যাদবদের লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক দৃঢ়তা শেষ বিন্দুতে পৌঁছেছে। একটি সম্পূর্ণ রাজ্য স্বাধিকারে পাওয়ার পর মহাভারতের কবির মুখে আমরা, তাঁর রাজ্য পরিচালনার প্রশংসা শুনি। কিন্তু এ প্রশংসা নিতান্তই অর্থবাদ মনে হয়। কারণ, সভাপর্বের আরম্ভেই আমরা নারদকে যুধিষ্ঠিরের সভায় প্রবেশ করতে দেখছি রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে।

ঋষি হলে কী হবে, নারদের রাজনৈতিক জ্ঞান রাজাদের থেকেও অনেক বেশি। স্বয়ং কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে নারদের উল্লেখ করেছেন বারবার। নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁর রাজ্যের কৃষি-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-কর্ম, গুপ্তচর, মন্ত্রী, অমাত্য, সৈন্য-সামন্ত সম্বন্ধেই শুধু প্রশ্ন করলেন না, তাঁর রাজ্যের জল-নিকাশী ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে বীজধানের বিলিব্যবস্থা নিয়ে পর্যন্ত উপদেশ দিলেন। বলতে পারেন—যুধিষ্ঠির নতুন রাজা হয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থে, তাই এত উপদেশ। আমাদের ধারণা তা নয়, যুধিষ্ঠিরকে তিনি ভালই চিনতেন। রাজনীতির খেলা খেলতে হলে যে একে রাখতে হবে, তাকে ফেলতে হবে, একে যমদণ্ড দিতে হবে, তাকে তোষাতে হবে এবং এই অদ্ভুত খেলা যে যুধিষ্ঠিরের জানা নেই, সেটা নারদ খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

নারদের মুখে আদর্শ-রাজার কর্তব্যগুলি শুনে যুধিষ্ঠির যে খুব স্বস্তিতে ছিলেন, তা মনে হয় না। এক সময় তাঁকে অতি বিহ্বলভাবে—রাজার জীবনে ধর্ম, অর্থ এবং কামের সাফল্য নিয়ে সাধারণ প্রশ্ন করতে দেখি—কথং বৈ সফলা বেদা কথং বৈ সফলং ধনম্ ? অন্তত এই প্রশ্নের উত্তর যুধিষ্ঠিরের জানা ছিল। কিন্তু অনধীত বিষয় নিয়ে শিক্ষকের প্রশ্ন-পরম্পরায় বিব্রত হয়ে অতি ভাল ছাত্রও যেমন মাঝে মাঝে বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলে, রাজনীতির উপদেশ-কূট যুধিষ্ঠিরের মনেও তেমনই এক

গভীর বিহ্বলতা তৈরি করে। তিনি বুঝতে পারেন—অন্তত যুধিষ্ঠির নিজেকে চেনেন বলেই পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, রাজনীতির এই দ্বিরূপকোষ তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নারদকে তিনি বলেই দেন—আমি যথাসাধ্য যথামতি চেষ্টা করে যাচ্ছিমাত্র। বড় বড় রাজারা যেভাবে রাজ্য শাসন করে গেছেন—আমরা তাঁদের সৎ আদর্শটুকু গ্রহণ করতে পারি মাত্র—বয়স্তু সৎপথং তেষাং যাতুমিচ্ছামহে প্রভো—এইটুকুই যা। তবে তাঁরা যেভাবে রাজ্য চালিয়েছেন, আমরা তা সত্যিই পারি না।

সন্দেহ নেই, এই ভাষার মধ্যে বিনয় আছে। তবে এর মধ্যে সত্যও আছে। নারদের মুখে ইন্দ্রসভা, যমসভা এবং আরও নানান দেবসভার কথা শুনে আপন রাজসভাকে কোনও দেবসভায় পরিণত করার কথা তিনিও মুহূর্তের জন্য ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, অসম্ভব আগ্রহ আর মনোযোগ দিয়ে ঋষিবাক্য শুনতে শুনতে যুধিষ্ঠিরের যে ছোট্ট একটা বিপদের সূচনা হয়ে গেল, সেটা তিনি ভাল করে বুঝলেন না।

অবশ্য এরকম হয়। যে একটা বিষয় ভাল জানে এবং অন্যটা মোটামুটি জানে, সেখানে যদি কেউ তার দ্বিতীয় আকর্ষণ সেই মোটামুটি বিষয়টার সম্বন্ধে বৃহত্তর আকর্ষণ তৈরি করতে পারে তখন মানুষ ভাবে—ওটাও পারব, ভাল করেই পারব। নারদ এই বিপদটাই করে গেলেন। যুধিষ্ঠির একটা সামান্য রাজ্য চালাচ্ছেন বটে কিন্তু রাজ্য চালাতে গেলে যে শুধু রাজ্য নিয়েই ভাবতে হয়, এ বোধ বুঝি তাঁর ছিল না। ওদিকে নারদঋষি নিপুণ বক্তৃতা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলে গেলেন—মহারাজ! তোমার ভাইরা সব মহা-শক্তিধর। তুমি ইচ্ছে করলে এই সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারো। তুমি এক কাজ করো—রাজসূয় যজ্ঞ করো—রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠম্ আহরস্বেতি ভারত।

কথাটা সোজাসুজি নারদের মুখ থেকে বেরোলেও হত। কিন্তু তা নয়। নারদ নাকি দেবসভায় যুধিষ্ঠিরের পিতা পাণ্ডুর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং পিতা পাণ্ডু নাকি স্বর্গালোকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত। হরিশ্চন্দ্র সসাগরা ধরণীর অধিপতি ছিলেন এবং রাজসূয়যজ্ঞ করে সমস্ত রাজাদের তিনি বশে স্থাপন করেছিলেন। মহারাজ পাণ্ডু হরিশ্চন্দ্রের এই অতুল কীর্তি দেখে নারদের মুখ দিয়ে পুত্রদের বলে পাঠিয়েছেন—তোমরা রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করো—পিতা চাহ কৌন্তেয় পাণ্ডুঃ কৌরবনন্দনঃ। পাণ্ডু আরও বলে দিয়েছেন—তোমরা রাজসূয়যজ্ঞ করলে আমি হরিশ্চন্দ্রের মতো ইন্দ্রের সভায় যেতে পারব এবং বহুকাল সেখানে থাকতেও পারব—ত্বয়ীষ্টবতি পুত্রাহং হরিশ্চন্দ্রবদাশু বৈ।

কথাটা শুনলে কার না মন বিচলিত হবে! পিতা স্বর্গ থেকে আর্তস্বরে পুত্রদের কাছে বলছেন—বাছারা! রাজসূয়যজ্ঞ করো, তবে আমার আত্মার শান্তি হবে। এই অবস্থায় যে কোনও পুত্রই অন্তত পিতৃকার্য করার জন্যই, যে কাজের সে যোগ্য নয়, সেই কাজও করার চেষ্টা করবে। যুধিষ্ঠির নারদের মুখে পিতার প্রার্থনা শুনে রাজসূয়যজ্ঞের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন ঠিকই, কিন্তু মহাভারতের কবি জনান্তিকে লক্ষ করেছেন যে, যুধিষ্ঠির নারদের কথা শুনে একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিলেন—ঋষেস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা নিঃশশ্বাস যুধিষ্ঠিরঃ।

আসলে রাজসূয়যজ্ঞ যে যুধিষ্ঠিরকে মানায় না, তা নয়। কিন্তু যজ্ঞের সম্পূর্ণটাই যদি ব্রাহ্মণ্য তপস্যা বা সাধনের বিষয় হত, তাহলে যুধিষ্ঠিরের অত ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু এই যজ্ঞে শম-দমের সাধন যদি বা কিছু থাকেও তবে তার সবটাই এক বিশাল ক্ষত্রিয়-লালসার জন্য। রাজ্যের বৃদ্ধি হবে, সামন্ত রাজারা সর্বত্র আনত হবেন এবং রাজসূয় অনুষ্ঠানকারী রাজার প্রতিস্পর্ধী হবেন না কেউ। আসলে রাজসূয় মানে নিজের শক্তিটা ভাল করে যাচাই করে নেওয়া। রাজপ্রতিনিধি সেনা-নায়করা চতুর্দিকে যাবেন, যে বশ্যতা মানবে না তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন এবং অজস্র ধনরত্ন নিয়ে রাজার কাছে ফিরবেন। তারপর যেদিন যজ্ঞের আসল অনুষ্ঠান হবে, সেদিন পরাজিত রাজারা নজরানা নিয়ে আসবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করে যাবেন। এই তো রাজসূয়। কিন্তু এই যজ্ঞ করতে হবে শুনে যুধিষ্ঠিরের নিঃশ্বাস দীর্ঘতর হল। তাঁর শান্তি বলে কিছু থাকল না—চিন্তয়ন্ রাজসূয়েষ্টিং ন লেভে শর্ম ভারত।

ক'দিন ধরে শুধু এই শলা-পরামর্শেই কাটল যে, যুধিষ্ঠির নিজে রাজসূয়যজ্ঞ করার যোগ্য কি না।

শেষে মন্ত্রী পুরোহিত এবং অন্যান্য সকলেই যখন তাঁর যোগ্যতার বিষয়ে একমত হলেন, তখন তিনি কৃষ্ণকে ডাকতে পাঠালেন দ্বারকায়। কৃষ্ণ এলেন এবং তিনি এসেই যুধিষ্ঠিরের চটকা ভেঙে দিলেন। রাজসূয়যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির সম্রাট হবেন কি, দেখা গেল—সম্রাটের মতো অন্য এক ব্যক্তি পূর্বাহ্নেই চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি জরাসন্ধ। সমস্ত রাজমণ্ডল তাঁর আজ্ঞাবর্তী এবং তাঁকে অতিক্রম করার মতো কোনও রাজা তখন ভূভারতে নেই। স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁর ভয়ে লুকিয়ে থাকেন মথুরায়। কৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সৈন্য-সামন্তের অপ্রতিরোধ্য শক্তি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরলেন যুধিষ্ঠিরের সামনে। তাতে তাঁর হতাশ হওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প রইল না। ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যটুকুই প্রকৃত যুধিষ্ঠিরকে চিনিয়ে দেয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—কৃষ্ণ! তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান। এমন করে আমাকে এখনও পর্যন্ত কেউ বুঝিয়ে বলেনি, তুমিই আমার সমস্ত সন্দেহ দূর করে দিয়েছ। আসলে যুধিষ্ঠিরের আশেপাশে এতদিন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব হুজুগে মাতার মতো একটা ঘটনা পেয়ে যুধিষ্ঠিরকে খুব করে রাজসূয়ের জন্য মাতিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের বোধ-বুদ্ধি জাগ্রত হল। প্রকৃত যুধিষ্ঠির কী সুন্দর করে এবার নিজের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করছেন। যুধিষ্ঠির বললেন—এই বিশালা পৃথিবীতে কত ছোট ছোট রাজারা আছেন। এতটুকু রাজ্য, এতটুকু সম্পত্তি, এতটুকু রাজকোষ আর গুটিকতক বশংবদ প্রজা—নিজেদের ছোট্ট ছোট্ট বিষয়-আশয় নিয়ে কী সুখেই না আছেন তাঁরা—গৃহে গৃহে হি রাজানঃ স্বস্য স্বস্য প্রিয়ঙ্করাঃ। তাঁরা কেউ বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেননি, সম্রাট হওয়াটা অত কষ্টকর জেনেই তাঁরা নিজের ছোট্ট রাজ্যটি নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন। যুধিষ্ঠির এবার নিজের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন— আমারই বা এত কী দরকার? আমার কাছে শান্তিই সবচেয়ে বড় কথা, আমার তাতেই মঙ্গল। ধনরত্নসম্বলিত এই বিপুলা পৃথিবীকে যদি জয় করতে পারতাম এবং সে জয়ের মধ্যেও যদি মঙ্গল থাকত, তবেই বুঝতাম যে আমার মঙ্গল হল—তাং বিজিত্য বিজানামি শ্রেয়ো বৃষ্ণিকুলোদ্বহ। কিন্তু তার চেয়ে আমার কাছে শান্তিই অনেক বড় কথা, সেই শান্তির মধ্যেই আমার মঙ্গল লুকোনো আছে—শমমেব পরং মন্যে শমাৎ ক্ষেমং ভবেন্মম।

যুধিষ্ঠির শান্তি চান। এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সম্রাট হবার সব ইচ্ছে চলে গেছে। তিনি বুঝেছেন—অনেক ছোট ছোট রাজার মধ্যে একজন বড় রাজা, একজন সম্রাট থাকতেই পারেন—কশ্চিৎ কদাচিদেতেষাং ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো জনার্দন। তাতে তাঁর কী আসে যায়? কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মতো এমন সন্তুষ্ট, এমন শান্ত অন্যেরা হবেন কেন? তাঁর ভাইরা ভীম, অর্জুন এমনকী কৃষ্ণও একে একে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে চেতিয়ে তুললেন। যুধিষ্ঠির কী করবেন? দুর্ভাগ্যবশত তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র, দুর্ভাগ্যবশত তিনি রাজা। জরাসন্ধ-বধের উদ্যোগ তাঁকে নিতেই হল। তবু সেই প্রবল পরাক্রমী রাজার সঙ্গে লড়তে যাবার আগে ছোট দুই ভাইয়ের জন্য তাঁর পিতৃতুল্য উদ্বেগটুকু স্মরণ করার মতো। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছিলেন—ভীম আর অর্জুন, এরা আমার দুই নয়নের মণি। আর তুমি? কৃষ্ণ! তুমিই আমার মন। আমি স্বার্থপর লোকের মতো শুধু সাম্রাজ্যের লোভে কী করে এই সাংঘাতিক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার ভাইদের পাঠাব? এদের কিছু হলে আমি বাঁচব কী করে—মনশ্চক্ষুবিহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবেৎ?

আমরা জানি—জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভীম জিতেই ফিরেছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের সঙ্গে এই যুদ্ধ এবং রাজসূয়যজ্ঞের আগেই যুধিষ্ঠিরকে আমরা দু-হাত তুলে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখছি। তিনি বলেছেন—পাণ্ডবদের প্রভু তুমি, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করে আছি—পাণ্ডবানাং ভবান্ নাথো ভবন্তঞ্চাশ্রিতা বয়ম্। এই কথাটাকে সরস ভক্তিভাবে নেবার কোনও প্রয়োজন নেই, ভক্তিরসের ঘটনাও এটা নয়। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের আরম্ভ থেকে সমস্ত কাজে কৃষ্ণই পাণ্ডবদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। রাজনীতির মধ্যে যে জটিলতা আছে, যে আবর্ত আছে, যুধিষ্ঠির তার মধ্যে সফলভাবে প্রবেশ করতে পারেন না বলেই তিনি কৃষ্ণের ঘাড়ে তাঁর জীবনের ওই অংশটুকু চাপিয়ে দিয়েছেন। রাজসূয়যজ্ঞের শেষ পর্বে সমস্ত বিরাট পুরুষদের বাদ দিয়ে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করে যুধিষ্ঠির আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ভার কৃষ্ণের

কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। রাজসূয়যজ্ঞের শেষে কৃষ্ণের উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের অকপট স্বীকারোক্তি ছিল—তোমার জন্যই রাজসূয়যজ্ঞ করতে পেরেছি, তোমার জন্যই সমস্ত ক্ষত্রিয়রা আজ আমার বশীভূত—ক্ষত্রং সমগ্রমপি চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বশে স্থিতম্।

যুধিষ্ঠিরের একটা সুবিধে অবশ্যই ছিল। যাঁরা তাঁর রাজসূয়যজ্ঞের সমাপন-ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারতেন—যেমন জরাসন্ধ, শিশুপাল—এঁরা একই সঙ্গে কৃষ্ণেরও সমান শত্রু ছিলেন। ফলে কৃষ্ণকে এ ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন করার মধ্যে যুধিষ্ঠিরেরই বুদ্ধিমত্তা নিহিত। কারণ কৃষ্ণের রাজনৈতিক বুদ্ধি ততদিনে প্রায় সর্বত্রই প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আপন মামাতো ভাই বলেই শুধু নয়, পিতৃহীন, এবং পদে পদে বঞ্চিত পাণ্ডবদের জন্য কৃষ্ণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল বলেই যুধিষ্ঠির তাঁর আপন রাজনৈতিক ভার কৃষ্ণের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছেন। কৃষ্ণও সেই ভার পালন করেছেন যথাসাধ্য যথামতি।

রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যুধিষ্ঠিরের চরম বাড়-বাড়ন্ত হল। চার ভাই চতুর্দিক জয় করে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে ধন-রত্ন নিয়ে এলেন। সমস্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করলেন। এ পর্যন্ত বেশ ভাল ছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের সমৃদ্ধি, ময়-দানবের তৈরি ইন্দ্রপ্রস্থের জাঁক-জমক, এবং সামন্ত রাজাদের আনা মহামূল্য উপহার দুর্যোধনের মনে চরম ঈর্ষা এবং অসূয়া জাগিয়ে তুলল। স্ফটিক নির্মিত রাজসভায় নিজের কারণে নিজেরই যে অপমান ঘটল দুর্যোধনের, সেটার থেকেও বড় কথা হল দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরকে সইতে পারছিলেন না। অবশ্য যুধিষ্ঠিরেরও সামান্য একটু দোষ আছে এখানে, অবশ্য দোষ না বলে এটাকে দুষ্টুমি বলাই ভাল। অতি গম্ভীর ভদ্র-সজ্জনের মনের মধ্যেও সাময়িক একটা দুষ্টুমি চেপে বসে। এই দুষ্টুমি বাইরে থেকে ধরার উপায় নেই, কিন্তু চাপা একটা দুষ্টুমি সেখানে হয়েই যায়।

রাজসূয় সমাধা করার জন্য যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের নানা কাজে লাগিয়েছিলেন। কৃপাচার্যের কাজ ছিল—ধন-রত্নের রক্ষণ এবং দক্ষিণাদান। বিদুরের কাজ ছিল অর্থব্যয়ের হিসেব রাখা এবং ব্যয় করা। দুঃশাসন খাদ্য-পানীয়ের তত্ত্বাবধান করছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির বললেন—সমবেত এবং ক্রমাগত আসা সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে উপহার এবং নজরানাগুলো এক জায়গায় করে রাখবে তুমি। নিছক দুষ্টুমি ছাড়া এটা আর কী হতে পারে? আসলের ওপর ফাউ পেলে মানুষের বেশি আনন্দ হয়। কিন্তু দুর্যোধনের ক্ষেত্রে সেটা বিপরীত হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক করদান ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের সন্তোষ বিধানের জন্য শত শত সামন্ত রাজার আনা মহামূল্য পারিতোষিকগুলিই দুর্যোধনের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দুর্যোধন পরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—আমি সবার বড়, তাই আমাকেই যোগ্যতম মনে করে যুধিষ্ঠির আমাকে রাজাদের কাছ থেকে ধনরত্নের উপহারগুলি সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। আমি কিন্তু রাজাদের আনা সেই রত্নরাশির এপার-ওপার দেখতে পাইনি। ধন-রত্ন হাতে ধরে নিতে নিতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে পরিশ্রান্ত দেখে রাজারা সব রত্নোপহার হাতে করে দাঁড়িয়েই রইল, দাঁড়িয়েই রইল—অতিষ্ঠন্ত ময়ি শ্রান্তে গৃহ্য দূরাহৃতং বসু।

দূর দূর থেকে আসা রাজাদের বশ্যভাব এবং তাঁদের আনা উপহার-রাশি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পরিবেশ যতই উন্নত করুক, সেটা দুর্যোধনের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত এক প্রতিপক্ষতা তৈরি করল। তার মধ্যে রাজসূয়যজ্ঞের প্রধান অর্ঘ্য পাণ্ডবদের পরমাত্মীয় বৃষ্ণিকুলের ধুরন্ধর কৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত হওয়ায় দুর্যোধনের পক্ষে সেটা আতঙ্কেরও কারণ হয়ে উঠল। রাজসূয়যজ্ঞের আগেই তৎকালীন দিনের অবিসংবাদিত নেতা জরাসন্ধের বধ, এবং রাজসূয়যজ্ঞের শেষ পর্বে জরাসন্ধের শিষ্য এবং পুত্র বলে আখ্যাত শিশুপালের মৃত্যু হওয়ায় দুর্যোধনের মনে নতুন এক রাজনৈতিক আবর্ত তৈরি করেছিল এবং এটাকে আবর্ত না বলে আতঙ্ক বলাই ভাল। রাজসূয়যজ্ঞের অব্যবহিত পরে দুর্যোধন এই আতঙ্কিত মনোভাব ব্যক্তও করেছেন শকুনির কাছে। তিনি বলেছেন—দেখ! কৃষ্ণ শিশুপালকে মেরে ফেলল, কিন্তু সেই সভায় এমন কোনও পুরুষ ছিল না, যে শিশুপাল-বধের প্রতিশোধ নিতে পারে—ন চ তত্র পুমানাসীৎ কশ্চিত্তস্য বশানুগঃ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ পাণ্ডবদেব কাছে এক বিরাট সাফল্য মনে হলেও জরাসন্ধ এবং শিশুপালের মৃত্যু রাজনৈতিক দিকে নতুন এক মাত্রা তৈরি করল। ফলত যুধিষ্ঠিরের পরম-ঈপ্সিত সেই শান্তি বোধহয় তাঁর জীবন থেকে দূরেই রয়ে গেল। যুধিষ্ঠির বোধহয় নিজে বুঝেওছিলেন এ-কথা। হয়তো সেই কারণেই রাজসূয়যজ্ঞেব শেষে যুধিষ্ঠির পিতামহ ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চেদিবাজ শিশুপাল তো মারা পড়লেন। এতে আবার কোনও উৎপাত সৃষ্টি হবে না তো—অপি চৈদ্যস্য পতনাচ্ছন্নম্ ঔৎপাতিকং মহৎ। ভবিষ্যতে যিনি মহাভারতের কবি হবেন, তিনি তাঁর ক্রান্তদর্শিনী দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরেব বাজসূয় যজ্ঞেব পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পালা-বদল হয়ে গেল। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তোমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ঠিক। গোলমাল লাগবে এবং সাংঘাতিকভাবেই তা লাগবে। তোমাকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কুল প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে—সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং ক্ষযং যাস্যতি ভারত।

কথাটা যুধিষ্ঠিরের কাছেও আতঙ্কেব কারণ। বাজসূয়যজ্ঞ করে এই ফল তিনি কামনা করেননি। সঙ্গে সঙ্গে ভাইদের ডেকে যুধিষ্ঠির বলেছেন—আজ থেকে আমার প্রতিজ্ঞা শোনো। আজ থেকে আমরা কাবও সঙ্গে কটু কথা বলব না—জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গেও না, অন্যান্য রাজাদের সঙ্গেও না। বরঞ্চ জ্ঞাতিরা যেভাবে বলেন, সেইভাবেই চলার চেষ্টা কবব—স্থিতো নিদেশে জ্ঞাতীনাং যোক্ষ্যে তৎ সমুদাহরন্। কিন্তু যুধিষ্ঠিরেব এত সদিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি যা ভাবলেন, তা হল না। পিতামহ ব্যাস বলেছিলেন—উৎপাত যাই আসুক তা নিয়ে চিন্তা কোরো না তুমি। কেননা কালের গতি রোধ করা তোমাব পক্ষে সম্ভব নয়—মা তৎকৃতে হ্যনুধ্যাহি কালো হি দুরতিক্রমঃ।

যুধিষ্ঠির তবু চিন্তা করেছিলেন, চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের আড়ম্বর দেখে ঈর্ষাব আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছেন, তখন সেই আগুনে ইন্ধন জোগালেন শকুনি। তিনি দুর্যোধনকে বোঝালেন—কম চেষ্টা তো তুমি করনি। বিষ দেওয়া, আগুন লাগানো সবই তোমাব বিফলে গেছে। এমনকী সমস্ত রাজন্যবর্গের পরম আকাঙ্ক্ষিত দ্রৌপদীকেও পেয়েছে ওরাই। মাঝখান থেকে লাভেব লাভ এই হয়েছে যে, দ্রুপদরাজার মতো একজন সহায় তারা লাভ করেছে, বাসুদেব-কৃষ্ণও এসে গেছেন পাণ্ডবদেব পক্ষে। দুর্যোধন বললেন—তা হলে আজই সকলে মিলে আক্রমণ করি ওদেব। শকুনি বললেন—মাথা খারাপ! ভীম, অর্জুন, দ্রুপদ, কৃষ্ণ—এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কবা অত সহজ নয়। তার চেয়ে স্বযং যুধিষ্ঠিরকে জয় করে কী তাঁর রাজ্য এবং ধনবত্ন লাভ কবা যায়, তার উপায় বলি শোন!

দুর্যোধন উৎকর্ণ হলেন এবং শকুনি তাঁর সর্বস্বহারী প্রস্তাব পেশ করলেন দুর্যোধনের কাছে। শকুনি বললেন—যুধিষ্ঠিব ভীষণ পাশা খেলতে ভালবাসে কিন্তু পাশা-খেলার কৌশল জানে না—দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্। অন্য দিকে পাশা-খেলাব কৌশলে আমার সমকক্ষ কাউকে আমি এখনও দেখিনি। যুধিষ্ঠিবকে যদি পাশা-খেলার জন্য আহ্বান করা যায়, তবে সে 'না' করবে না। সে আসবে এবং আমার সঙ্গে খেলবেও। তখন পণে জিতে তার বাজ্য এবং রাজলক্ষ্মী দুইই আমি এনে দেব তোমার হাতে—রাজ্যং শ্রিয়ঞ্চ তা দীপ্তাং ত্বদর্থং পুরুষর্ষভ।

এই প্রথম আমরা যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে এমন একটা কথা শুনলাম, যা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে যেন মানায় না। মহাভারতেই অন্যত্র দেখব যে, রাজা-রাজড়াদের কতগুলো সর্বনেশে অভ্যাস থাকে। যেমন ঘুমোনো, শিকাব করা, পাশা-খেলা, পরনিন্দা, স্ত্রী-সঙ্গ, মদ্যপান, গান-বাজনা ইত্যাদি। মনু মহারাজ থেকে আরম্ভ করে সেকালেব রাজনীতিব তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সবাই বলেছেন—আদর্শ রাজা যেন কখনও এই সব বদভ্যাস না করেন। তা হলে রাজা এবং রাজ্য—দুয়েরই সর্বনাশ হবে। এগুলি কামজ ব্যসন এবং এই বিলাস-ব্যসনের কোনও অন্ত নেই। রাজারা যেন কখনও এ-সবে লিপ্ত না হন—ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলি—উপদেশ এবং আদর্শের জগৎ এক রকম, আর বাস্তব জগৎ আর একরকম। বাস্তবে এমন রাজপুরুষ, এমনকী আধুনিক গণতন্ত্রের মন্ত্রিপুরুষ কাউকে দেখাতে পারবেন, যাঁরা মদ্যপান, স্ত্রী-সঙ্গ অথবা মনুকথিত পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ অথবা অর্থদূষণের

মতো সাংঘাতিক ব্যসনের সঙ্গে যুক্ত নন ? পাশা-খেলা, শিকার অথবা গান-বাজনার ব্যসন এখন 'আউটডেটেড'। এখনকার রাজমন্ত্রীরা আরও বড় বড় ব্যসনে লিপ্ত। যাক সে-কথা, সকলেই এটা বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের মতো মহামতি মানুষ কেন এই পাশা-খেলার বদভ্যাস করেছিলেন ? সম্ভাবিত উত্তর দেওয়ার আগে আরও একটি কথা বলে নিই—তত্ত্বজ্ঞেরা ব্যসনগুলির নিন্দা যতই করুন, মানুষের কিছু অভ্যাস থাকেই। আসল কথা, অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। যে ব্যক্তি সারাক্ষণ বই পড়ে এবং আর কোনও দিকেই মন দেয় না, সংসারে তাঁরও সুখ নেই। বই-পড়া বা ছবি আঁকাও অতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে তা ব্যসনের মধ্যেই গণ্য হয়ে যাবে। তত্ত্বজ্ঞেরা এই অতিরিক্ত আসক্তি বন্ধ করার জন্যই একেবারে বর্জনের বিধান জারি করেছেন।

বাস্তবের দিকে তাকিয়ে দেখুন—স্বয়ং মুনি-ঋষিরা রাজসূয়যজ্ঞের আসরে, অগ্ন্যাধেয় যাগের আসরে পাশা খেলতেন। সমাজে পাশা-খেলা অতিরিক্ত অভ্যাস ছিল বলেই খোদ ঋগ্‌বেদে অক্ষসূক্তের জন্ম হয়েছে। অন্য দিকে গান-বাজনা এবং নাচের ব্যসন রাজমহলে চালু ছিল বলেই আজকের দিনে আমরা রাগ-রাগিণী আর বহুতর নৃত্যকলার ছন্দে মনোরঞ্জন করতে পারছি। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে রাগ-রাগিণী, নৃত্যকলা এবং সাহিত্যের বিবর্তন আধুনিক কাল পর্যন্ত ঘটত না বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

এ সব কথা বলে আমরা অবশ্য যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার সাফাই গাইছি না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলাটা তাঁর ধর্মভাবনার সঙ্গে একান্ত স্ববিরোধী কিনা, সেটার একটা মীমাংসা চাইছি আমরা। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলব—একমাত্র পাশা-খেলাই যুধিষ্ঠিরকে মানুষ করেছে, নইলে তিনি দেবতা হয়ে যেতেন, অথবা দেবতাও নয়, কারণ দেবতাদেরও এসব দুর্বলতা আছে। তা হলে কী ? জানি না। যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে শুধু আমরা কেন, মহাভারতে তাঁর স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলেই এমন একটা আদর্শ ধারণা প্রচার করেন, যেন যুধিষ্ঠিরের কোনও দোষ থাকতে নেই এবং সামান্য দোষ হলেই তাঁকে ভণ্ড মনে করতে হবে। না হলে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের' মতো এমন একটা সাংঘাতিক প্রবাদই বা তৈরি হবে কেমন করে ? যুধিষ্ঠিরের শতসংখ্যক উদার ধর্ম-ভাবনার সঙ্গে যাঁরা পাশা-খেলাকে মেলাতে পারেন না, তাঁদের জানাই—মহাভারতের কবির কাছে যুধিষ্ঠির একটা 'এক্সপেরিমেন্ট'। একটি নীতিশুদ্ধ মানুষ, যাঁর মন সদা-সর্বদা ধর্ম এবং ত্রিজগতের মঙ্গল ভাবনায় পরিশীলিত, তিনিই যুধিষ্ঠির—এ-কথা যেমন ঠিক, তেমনই একটি মানুষ, যিনি সব সময় নীতি-যুক্তির 'পারফেকশনে' পৌঁছতে চাইছেন, অথচ পারছেন না—এটাও যুধিষ্ঠির। এই যে 'চাইছেন, অথচ পারছেন না'—এই চেষ্টা এবং অসাফল্যের মধ্যেই মানুষ যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিচরিত্র নিহিত আছে।

একবার ভাবুন—কৃষ্ণা-পাঞ্চালীকে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তিনি নিজে কী পেয়েছেন ? দ্রৌপদীর এক-পঞ্চমাংশ পতিত্ব লাভ করে তিনি নিজে সব সময় এমন থতমতভাবে থেকেছেন যে, কখনওই তিনি ভাবতে পারেননি—এই রমণী সর্বাংশে আমারই। আবার সবার মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তিনি যে মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলেন, তাও সফল হয়নি। কারণ দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীর প্রত্যেকের একক সম্পূর্ণ মন জয় করতে পারলেও তাঁর স্বামীদের মনে সব সময়েই কিছু সঙ্কোচ থেকে গেছে। অন্য দিকে জ্ঞাতি-বিরোধের তপ্ত আগুনের মধ্যে বসে পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণিদের সমর্থনে যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গেল, এও কি তাঁর কাছে খুব কাম্য ছিল ? পৈতৃক রাজ্যের একাংশমাত্র লাভ করে তার ছোট্ট ইন্দ্রপ্রস্থের গণ্ডির মধ্যেই তিনি সুখী থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এবং পরিবেশ তাঁকে তেমন সুখী থাকতে দেয়নি। রাজা হলে সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, রাজসূয়যজ্ঞ করে সকলের অধীশ্বর হতে হবে—এই কি তিনি চেয়েছিলেন ? তিনি যা চেষ্টা করেন, তা সর্বাংশে সফল হয় না, যা ভাবেন, সবাই তা ভাবে না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—জ্ঞাতিদের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করবেন না ; তিনি তা করেনওনি। কিন্তু নিজেকে জ্ঞাতি-বিরোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে গিয়ে, সমস্ত জগতের কাছে তিনি ঘৃণাস্পদ হয়ে গেলেন।

পাশা খেলতে যুধিষ্ঠির খুব ভালবাসতেন। কবে কখন কার সঙ্গে পড়ে তাঁর এই পাশা-খেলার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল মহাভারতের কবি তার বিন্দুবিসর্গ পূর্বে জানাননি। সভাপর্বে এসে দুরাত্মা শকুনির কুমন্ত্রণার মধ্যে আমরা হঠাৎই শুনতে পেলাম—যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে ভালবাসেন—দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ঃ হয়তো এটা তাঁর বিলাস, ঠিক আমাদের যেমন 'হবি'। কিন্তু শকুনি যে বলেছেন—যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে জানেন না—এটা ভুল। যুধিষ্ঠির ধর্মভীরু মানুষ। পাশাযুদ্ধের নীতিনিয়ম বজায় রেখেও পাশা-খেলা যায়, যুধিষ্ঠির সেই খেলাই জানেন। পাশা-খেলার মধ্যে যে শঠতা আছে, যে জুয়োচুরি আছে—সেটা তিনি শকুনির মতো জানতেন না বলেই, শকুনি মন্তব্য করেছেন—তিনি পাশা-খেলা জানেন না।

দুর্যোধনের ঈর্ষা, অসূয়া আর মনস্তাপে বিগলিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র যখন শকুনির পাশা-খেলার প্রস্তাবটাই মেনে নিলেন, তখন কুরুসভার প্রবর-মন্ত্রী বিদুরকে পাঠানো হল ইন্দ্রপ্রস্থে, যুধিষ্ঠিরের কাছে। বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের মুখোদ্গীর্ণ যে আহ্বান-বাণীটি পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে সংশয় কিংবা ভয়ের কিছু ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—পুত্র! আমাদের সভাটা এখন তোমাদের ইন্দ্রপ্রস্থের মতোই হয়েছে। ভাইদের সঙ্গে একবার তুমিও এসে দেখে যাও এই সভা। আরও একটা খবর আছে। আমরা এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একটা পাশা-খেলার আসর বসিয়েছি। আমার ইচ্ছে—ভাইদের সঙ্গে তুমিও এসে এই খেলায় যোগ দাও। অন্যান্য কৌরবরাও সব এসে গেছেন। মজাও হবে খুব। তোমরা আসলে আমরা সবাই আনন্দ পাব—প্রীয়ামহে ভবতাং সঙ্গমেন সুহৃদ্-দ্যূতং ক্রিয়তাং রম্যতাঞ্চ।

ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—'সুহৃদ-দ্যূত' অর্থাৎ বন্ধুরা মিলে যেমন তাস-পাশা খেলে। কিন্তু এই কথাটার মধ্যে যে ফাঁকি আছে, সে-কথা বিদুর সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। বিদুর বলেছেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে সব জুয়াড়িদের নিযুক্ত করেছেন পাশা-খেলার জন্য—দুরোদরা বিহিতা যে তু তত্র—সেই সব ধূর্তদের তুমি গিয়েই দেখতে পাবে। বিদুরের কথা থেকে যতটুকু বোঝা যায়, যুধিষ্ঠিরও তা বুঝেছিলেন। বিদুরকে তিনি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ছাড়া সে সভায় আর কারা আছেন, বিদুর? শত শত পণ রেখে খেলব, তাদের নামটা অন্তত জানি—ব্রূহি নস্তান্/ যৈর্দীব্যামঃ শতশঃ সন্নিপত্য। বিদুর বললেন—সবার আগে আছেন শকুনি। তাঁর মতো অক্ষ-নিপুণ এবং পাশার অনুরাগী আর কে আছেন? পাশা-খেলায় তাঁর হাত একেবারে মোক্ষম ফল নিয়ে আসে—রাজাক্ষদেবী কৃতহস্তো মতাক্ষঃ। জুয়াড়ি আছেন আরও। বিবিংশতি, চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র—এঁরাও উপস্থিত আছেন দ্যূতসভায়।

যুধিষ্ঠির নাম শুনেই আঁতকে উঠলেন; বললেন—এরা তো সব সাংঘাতিক জুয়াড়ি। ছল আর শঠতাই তো এদের প্রধান অস্ত্র—মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্নিবিষ্টা/মায়োপধা দেবিতারো'ত্র সন্তি। তবু বলছি—পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র যদি ডেকে পাঠান, তবুও আমি যাব না—এমন তো হতে পারে না। পাশা-খেলার জন্য আমায় ডাকলে যেতেই হবে আমাকে—আহূতো'হং ন নিবর্তে কদাচিৎ—আমি সেখানে ফিরে আসতে পারি না।

যুধিষ্ঠির ফিরতে পারতেন। বিদুরের কথা শুনেই ফিরতে পারতেন। বলতে পারতেন—খেলব না শকুনির সঙ্গে। একবার বলেওছিলেন সে-কথা; কিন্তু সেখানেও সেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রসঙ্গটা রেখেই দিলেন যুধিষ্ঠির। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র যদি না বলেন, তবে শকুনির সঙ্গে কিছুতেই খেলব না—ন চাকামঃ শকুনিং দেবিতাহং/ন চেন্মাং জিষ্ণুরাহ্বয়িতা সভায়াম্। এটা কি পাশা-খেলার একটা অজুহাত!

দেখুন, আজকালকার দিনের কুলতন্তুছিন্ন তিন-সভ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারগুলিতে জ্যাঠামশাই অথবা কাকাবাবুদের কথার কোনও মূল্য নেই। কিন্তু পিতৃহীন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শত বঞ্চনা করা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যুধিষ্ঠিরের শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। নানা বঞ্চনার এবং নানা ঘটনার অনুক্রমে সেই শ্রদ্ধায় ঘাটতি নিশ্চয়ই হয়েছে, তবু যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অসহায় অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতেন তাঁরই যুক্তি-তর্কের অনুকূলে। আরও একটা কথা—এই অন্ধ জ্যাঠামশাইটির সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের অভিমানও কিছু কম ছিল না। এই যে বিদুর এসে ধৃতরাষ্ট্রের পাশা-খেলার প্রস্তাব করলেন তাঁর

কাছে, এবং তাঁকে যে সতর্কও করে দিলেন, যুধিষ্ঠির কি তার পরেও পাশা-খেলার গূঢ়ার্থ বোঝেননি ? বুঝেছেন। বিদুরকে তিনি বলেওছিলেন—এই পাশা খেলার মধ্যে আমি ঝগড়ার গন্ধ পাচ্ছি—দ্যূতে ক্ষত্তঃ কলহো দৃশ্যতে নঃ। ঝগড়ার কথা বুঝেও কোন বুদ্ধিমান লোক পাশা খেলতে যায় ?

যুধিষ্ঠির তবু যাচ্ছেন। বিদুরকে তিনি বলেছেন—ধৃতরাষ্ট্র ডাকলে আমার না গিয়ে উপায় নেই। পুত্রের কাছে পিতার এই আহ্বান আমি তুচ্ছ করি কী করে, তিনি যে আমার চিরকালের প্রিয়—ইষ্টো হি পুত্রস্য পিতা সদৈব। কী করে বোঝাব—আজকের সামাজিক পরিস্থিতি এবং আজকের পারিবারিক গঠনের নিরিখে কী করে এই সম্পর্ক বোঝাব ? জ্যাঠামশাই ডাকলে পরে ভ্রাতুষ্পুত্র যে সেটাকে পিতাঠাকুরের ডাক বলেই মনে করতেন—এমন সম্পর্ক যে আমি চোখে দেখেছি, আর দেখেছি বলেই যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্ম অনুভবটুকু বুঝতে পারি। তাঁর না গিয়ে উপায় নেই, কারণ জ্যাঠামশাই ডেকেছেন মানে পিতাঠাকুরই ডেকেছেন—টীকাকারের ভাষায়—পর্যায়সাম্যাৎ জ্যেষ্ঠতাতোঽপি তাত এব। কিন্তু মনে মনে যুধিষ্ঠিরের কিছু অভিমান ছিলই। যে ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি এত সম্মান করেন, যাঁকে তিনি পিতার মতো মনে করেন, তিনি আপন পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে বিবাদ ডেকে আনছেন ? তিনি এইভাবে বঞ্চনা করতে চান পরম বিশ্বাসী ভ্রাতুষ্পুত্রদের ? তাই যদি হয়, তবে হোক সেই বঞ্চনা। যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবেন—তবে নেমে আসুক সেই চরম শাস্তি। জ্যাঠামশাই হয়েও তিনিই না হয় চরম বঞ্চনা করুন আমাদের সঙ্গে। দুনিয়ার লোক দেখুক। যুধিষ্ঠিরের কোনও দোষ নেই, কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যাঠামশাই তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না। এই অভিমানটুকু যুধিষ্ঠিরের ছিল বলেই মহাভারতের নিরপেক্ষ বক্তা বৈশম্পায়ন মন্তব্য করলেন—যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের এই পাশা-খেলার আহ্বান সহ্য করতে না পেরেই যেন সাভিমানে হস্তিনাপুর রওনা হলেন—অমৃষ্যমাণস্তস্যাথ সমাহ্বানম্ অরিন্দমঃ।

ভাইদের নিয়ে, দ্রৌপদীকে নিয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে পৌঁছলেন। প্রথম দিন আদর-আপ্যায়ন আর পুনর্মিলনের আচ্ছন্নতার মধ্যেই কেটে গেল। পরের দিন দ্যূতসভার আয়োজন। সকালে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে দ্যূতসভায় উপস্থিত হলেন। দ্যূতসভা রমরম করছে। কোনও কথা বলার আগেই তাঁকে যিনি সাদর আহ্বান জানালেন, তিনি দুর্যোধনের মাতুল শকুনি। শকুনি বললেন—সভা প্রস্তুত। সকলে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছেন—উপস্তীর্ণা সভা রাজন্ সর্বৈঃ ত্বয়ি কৃতক্ষণাঃ, —পাশা-খেলা আরম্ভ হোক।

শকুনির কথা শোনামাত্রই যুধিষ্ঠিরের সাতঙ্ক উত্তর শোনা গেল—দেখ মাতুল ! দ্যূতক্রীড়ায় শঠতা অর্থাৎ জুয়োচুরি চলে প্রচুর। এখানে ক্ষত্রিয়ের শক্তি কোনও কাজে লাগে না, —নিকৃতি-র্দেবনং পাপং ন ক্ষাত্রোঽত্র পরাক্রমঃ। তাই বলছিলাম—মাতুল ! তুমি যেন অন্যায় পথে একজন জুয়াড়ির মতো শঠতা করে আমাকে নৃশংসভাবে জিতে নেওয়ার চেষ্টা করো না। যুধিষ্ঠির শকুনিকে দেখেই বুঝে গেছেন—কী হতে চলেছে। তিনি যেমন হাহাকার করে শকুনির কাছে অনুনয় জানালেন, তাতে শকুনির মতো জুয়াড়ির মনে কোনও কোমল স্পর্শ লাগল না। এ যেন ভয়ঙ্কর এক ঠগ দোকানদারের কাছে ভদ্রলোকের অনুনয়—আমায় ঠকিয়ে নিয়ো না ভাই। দোকানদার ভাবলেশহীন মুখে অভিনয় করে বলে—আপনি জিনিস চেনেন, আপনার ভয় কী ? শকুনিও একইভাবে বললেন—যে মানুষ পাশার দান পড়ার আগেই সংখ্যাটি বুঝতে পারে, শঠতা বা অন্যায় হলে যে তার প্রতিকার করতে জানে, পাশার দান ফেলার ব্যাপারেও যে ওস্তাদ, সেই মানুষ অন্যের শঠতাও সহ্য করতে পারে। অর্থাৎ সে ঠিক ধরে ফেলতে পারবে অন্যের শঠতা কোথায়।

শকুনি যা বলেছেন তার মধ্যে তাঁর পাশা-খেলার কায়দাটা পুরোই বলা ছিল। সেকালে পাশা-খেলা কীভাবে হত এবং শকুনি কীভাবে পাশা খেলেছিলেন—সে সব কথা আমি অন্যত্র বলেছি। এখানে শুধু এইটুকু জেনে রাখলেই হবে যে, সম্ভবত অনেকগুলি ঘুঁটি নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শকুনির পাশা-খেলা হয়েছিল এবং দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুঁটিগুলো গুনে ফেলার একটা তৎপরতা থাকত। পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন—ঘুঁটি গোনার সময়েই পাশা-খেলায় কে কত ধূর্ত, তার প্রমাণ হয়ে যেত। আসলে সেকালের পাশা খেলাটা হয়তো প্রধানত জোড়-বিজোড়ের খেলায় নিষ্পন্ন হতো।

ডাক দেওয়ার পর পাশার ঘুঁটি চেলে গুনতে হত এবং গোনার সময় চোখ বুলিয়েই অক্ষশৌণ্ড বুঝতে পারত যে, দানটি তার ডাকের সংখ্যা অনুসারেই পড়েছে কি না। শকুনি এটাকেই বলেছেন—যো বেত্তি সংখ্যাং নিকৃতৌ বিধিজ্ঞঃ। চালের ঘুঁটি যদি ডাক অনুসারে না পড়ে তখনই নিপুণ জুয়াড়ির কেরামতি। জোড়-বিজোড় যাই হোক, নিজের ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে অসামান্য ক্ষিপ্রতায় ঘুঁটি সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা জোগাতে হবে। শকুনি তাই বলেছেন—ধূর্ত জুয়াড়ি তার দানের পর সমস্ত চেষ্টা চালাবে অসামান্য ক্ষিপ্রতায়—চেষ্টাস্বখিন্নঃ কিতবোঽক্ষজাসু।

শকুনি কী করবেন, শকুনি তা বলেই দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির এই রকম করে, 'প্রফেশনালি' পাশা-খেলা শেখেননি। পাশা খেলতে তিনি ভালবাসেন এই মাত্র। তিনি আবারও শকুনিকে সানুনয়ে সবিনয়ে বললেন—দেখ মাতুল! আমরা ক্ষত্রিয়। শঠতা করে পাশা-খেলা আমরা শিখিনি। শঠতা করে পরের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। জুয়াড়ির পাশা-খেলাকে কি ভদ্রলোকেরা ভাল বলে? শকুনি এবার যুধিষ্ঠিরের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন—এই পাশা খেলার আড্ডায় এসে তুমি যদি আমাদের সবাইকে শঠ, কপট বলতে থাক, আর পাশার আড্ডায় এসে যদি তুমি এত কপটতার ভয়ই পাও, তা হলে তোমার খেলতে হবে না বাপু, তুমি বাড়ি যাও—দেবনাদ্ বিনিবর্তস্ব যদি তে বিদ্যতে ভয়ম্।

যুধিষ্ঠির ফেরেননি। ধৃতরাষ্ট্রের কথা তাঁর মনে আছে! ধৃতরাষ্ট্রের কথাই তাঁর কাছে এখন নিয়তি হয়ে গেছে। অতএব বিধিই বলবান, আমি দৈবাধীন—এইসব শুদ্ধ নিয়তির কথা বলে যুধিষ্ঠির খেলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু খেলতে গিয়েই প্রথম ধাক্কা খেলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর প্রতিপক্ষে দুর্যোধন খেলবেন না। খেলবেন মাতুল শকুনিই। দুর্যোধন শুধু পণ দেবেন। যুধিষ্ঠির প্রতিবাদও করেছিলেন—একের খেলা অন্যে খেলবে, এ তো ঠিক নয়—অন্যেনান্যস্য বৈ দ্যূতং বিষমং প্রতিভাতি মে। তুমি যখন পণ দেবে, তবে তুমিই পাশা হাতে নাও।

যুধিষ্ঠিরের তর্ক-যুক্তি কেউ কানেও তোলেননি। খেলা আরম্ভ হয়েছে এবং যুধিষ্ঠির একের পর এক পণ হারতে আরম্ভ করলেন। পাশা-খেলার ঝোঁকে এবং নেশায় যুধিষ্ঠিরের রোখ চেপে গেল। যুধিষ্ঠির এই পাশা-যুদ্ধে স্থির থাকতে পারলেন না। এমনকী বিদুর যখন নিজের ব্যক্তিত্বে কঠিন কথা বলে সাময়িকভাবে দ্যূতসভা স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, তখনও যুধিষ্ঠির নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। দুর্যোধন-শকুনির উস্কানিতে তিনি আবারও খেলা আরম্ভ করেছেন। প্রাণপ্রিয় ভাইদের নিয়ে বাজি ধরতে তাঁর কণ্ঠস্বর স্খলিত হয়নি এবং শেষমেষ পঞ্চস্বামী-গর্বিতা দ্রৌপদীকে নিয়ে বাজি ধরতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। এক মুহূর্তের মধ্যে ধর্মরাজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের 'ইমেজ' ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মহাভারত একটু-আধটু পড়ি বলে শতজনে শতরকম কটূক্তিতে যুধিষ্ঠিরের এই বাজি-ধরা বিশেষত দ্রৌপদীকে বাজি-ধরার প্রসঙ্গ তোলেন এবং মন্তব্য করেন যুধিষ্ঠিরের মতো ভণ্ড, কাপুরুষ, অসভ্য বাজে লোক আর দ্বিতীয়টি হয় না। আমিও মেনে নিই—সত্যি কথা। অন্তত এই জায়গায় যুধিষ্ঠিরের জন্য সাফাই গাইবার কিচ্ছুটি নেই। আমি সাফাই গাইবার চেষ্টাও করি না, আর আমার মতো সামান্য মানুষ যুধিষ্ঠিরের হয়ে গান গাইলেও সে গান লোকে শুনবে না। তাঁদের যুধিষ্ঠির তাঁদের মতোই। কিন্তু আজকে যখন এই যুধিষ্ঠিরের চরিত্র লিখতে বসেছি, তখন আমার কথাটি না বলেও পারছি না। কারণ মহাভারতের কবি তো আমাদের মতো ক্ষুদ্র হৃদয় মানুষ নন, তিনি যে বিশালবুদ্ধি—'ব্যাসস্য, বিশালবুদ্ধেঃ'। সত্যি কথা বলতে কি মহাভারতের কবির আশয় বুঝে যুধিষ্ঠিরকে আমি একটু অন্য চোখে দেখি।

আচ্ছা ভাবুন তো, আপনি হলে কী করতেন? ভীমকে বিষ খাওয়ানো হল, অথচ যুধিষ্ঠির তা নিয়ে কথাই বলতে দিলেন না। আপনি-আমি হলে হস্তিনাপুরে শোরগোল তুলে দুর্যোধনের বাপের শ্রাদ্ধ করে দিতাম। কিন্তু যুধিষ্ঠির চুপ করে থেকেছেন। আমার-আপনার যদি ভীম-অর্জুনের মতো বশংবদ দুটি মহাবীর ভাই থাকত, তা হলে জতুগৃহে আগুন লাগানোর প্রস্তাব বোঝামাত্র—কারণ যুধিষ্ঠির তা আগেই বুঝেছিলেন—আমরা তখনই কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতাম। আপনি-আমি যদি

অর্জুনের কাছ থেকে বড়ভাই হওয়ার সুবাদে এবং সুযোগে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর মতো রমণীকে বিবাহ করবার বিনীত অনুরোধ পেতাম, তা হলে সেই মুহূর্তেই রাজি হতাম। পাঞ্চাল-বৃষ্ণিদের সহায় থাকা সত্ত্বেও আমাকে-আপনাকে যদি পৈতৃক রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে আমাদের জ্যাঠামশাই বলতেন—তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থের মতো শস্যহীন বন্ধুর মালভূমিতে গিয়ে বাড়িঘর তৈরি করে থাক, তা হলে কি যুধিষ্ঠিরের মতো বিনা বাক্যে জ্যাঠামশাইয়ের বচন মাথায় করে আমরা চলে যেতাম ? যুধিষ্ঠির তাই গেছেন। আর আমাদের জ্যাঠামশাই আমাদের ঠকাবে জেনেও যদি জুয়ো খেলতে ডাকতেন, তা হলে কি আমরা সেই অনুরোধ মেনে বউ-ভাই সঙ্গে নিয়ে পাশায় হারতে আসতাম ? যুধিষ্ঠির কিন্তু এসেছেন।

মহাভারতের কবি দেখেছেন—সাধারণ মাঝারি-মাপের মানুষ যা করে যুধিষ্ঠির তা করেন না। এই যে পাশা-খেলা হল—তার সম্বন্ধে ভগবান বলে চিহ্নিত সেই মানুষটি কী বলেছিলেন ? পাণ্ডবদের বনবাসের সময় কৃষ্ণ এই কপট পাশা-খেলার গল্প শুনে প্রথম মন্তব্য করেছিলেন—আমি ছিলাম না সেই সভায়, তাই। আমি যদি দ্বারকাতেও থাকতাম, তা হলে আমাকে না ডাকলেও আমি অনাহূত অবস্থায় কৌরবসভায় উপস্থিত হতাম। প্রথমে নিশ্চয়ই এই পাশা-খেলা যাতে না হয়, সেই চেষ্টা করতাম, কিন্তু তার পরেও যদি আমার কথা না শুনত তা হলে পাশা খেলতে বসা ওই বদমাশ জুয়াড়িদের মেরে সভাটাকেই লণ্ডভণ্ড করে দিতাম—তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্। আর ওই দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন—এঁদের সবাইকে মেরে—এতান্ নিহত্য সমরে—আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেই সিংহাসনে বসাতাম।

আমরা জানি—কৃষ্ণ যা বলেছেন, হয়তো তাই করতেন। কিন্তু কৃষ্ণ যা করতেন বলে বলেছেন, সেটা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিত মাত্রেই ভীম-অর্জুনও করে দিতে পারতেন। কিন্তু সে সব কিছুই নয়, একের পর এক বাজি ধরে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হারিয়ে বসলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু আমরা যা করতাম, এমনকী কৃষ্ণ অথবা ভীম-অর্জুন যা করতে পারতেন, যুধিষ্ঠির তা করেন না বা করেননি। পাশা-খেলার আগে পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, তাতে যুধিষ্ঠিরের অশেষ এবং অতুলনীয় ধৈর্য লক্ষ করেছি আমরা। অথচ পাশা-খেলার মতো এমন একটা তুচ্ছ অভ্যাস, যা আমি-আপনিও বৃহত্তর স্বার্থে অবশ্যই বর্জন করতাম, সেখানে যুধিষ্ঠির এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন, যা সাধারণ জনেও সাধারণত করে না। আর সমস্ত ঘটনার এই কেন্দ্রবিন্দুতেই আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত মন্তব্য পেশ করে থাকি—ঠিক এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরকে আমার একান্ত মানুষের মতো লাগে।

শাস্ত্রে-কাব্যে, ইতিহাসে-পুরাণে আমরা শত শত 'ধ্যানাবস্থিত' 'তদ্গত' মুনি-ঋষিদের দেখেছি। অধিগুণসম্পন্ন শত শত দেবতা-পুরুষ দেখেছি। তাঁদের জ্ঞান, তপস্যা, বৈরাগ্য—কোনওটাই কিছু কম নয়, বরঞ্চ বেশ বেশি। কিন্তু তবু কোনও বসন্তের উতলা বাতাসে, অথবা ক্রোধ-মোহের কোনও উত্তেজনায় দেবতা, মুনি, সাধুপুরুষ—সবারই কোনও না কোনও সময় চারিত্রিক ত্রুটি ঘটে যায়, আর ঠিক সেই সময়েই তিনি আমাদের মতো মানুষ হয়ে যান। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম-দর্শনের প্রবক্তা জীব গোস্বামী তাঁর ষট্ সন্দর্ভের একটির মধ্যে নারদ, শুকদেব ইত্যাদি এমন কতগুলি ঋষি-মুনির সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে দোষের অণুমাত্রও সম্ভাবনা করা যায় না। কিন্তু একটা সময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কযুক্তির শেষ পর্যায়ে তাঁদের মধ্যেও 'কষায়' বা দোষ লক্ষ করা গেছে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা বৃথা হয়ে যায়নি।

আমাকে অনেকে বলেন—অমুক সাধু, অমুক মহাপুরুষ, তাঁর এই দোষ ! তিনি অমুক স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েছিলেন। অমুকের টাকা-পয়সার লোভ আছে। তমুকে ভীষণ বদরাগি—ইত্যাদি। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না। ছোটবেলা থেকে আমার যুবক বয়স পর্যন্ত বহু সাধু-মহাত্মার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগাযোগ ছিল। এঁদের ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সাধনের কোনও তুলনা আমি খুঁজে পাইনি। কিন্তু আত্মিক যোগাযোগ থাকার ফলে এঁদের কিছু কিছু দোষও আমার চোখে পড়েছে, যা সাধারণ জনের চোখে আরও বেশি খারাপ লাগবে। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি এবং শাস্ত্র-দর্শন ঘেঁটেও দেখেছি—এই সামান্য সামান্য দোষগুলির জন্য তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা মোটেই

বৃথা নয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি এমনই জটিল এক জীবনগ্রন্থি যা হাজার শম-দম-সাধনের মধ্যেও আপন সত্তা প্রকট করে ফেলে। রুদ্ধা প্রকৃতি কখনও বা তার বিরুদ্ধতার প্রতিপক্ষে প্রতিশোধও নেয়। কিন্তু তাই বলে তাঁদের সারা জীবনের ধ্যান, ধারণা, দর্শন-মনন, সারা জীবনের শম-দম-সাধন ব্যর্থ হয়ে যায় না। তবে এ সব কথা বলে বুঝিয়ে হয় না, এগুলি অনুভববেদ্য।

পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠিরের আত্মবিস্মৃতির কথাটা আমরা এই নিরিখেই অন্তত সহৃদয়ের সমব্যথা দিয়ে বিচার করতে চাই। জীবনের কোনও একটি কাজেও যেখানে তিনি কোনও দিন মাত্রা লঙ্ঘন করেননি, সেখানে এই মাত্রাজ্ঞানহীন আত্ম-বিস্মৃতিই তাঁকে আমার কাছে মানুষ করে তোলে। যুধিষ্ঠিরের একটি কর্ম-পদ্ধতিও আমার আপনার কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে মিলবে না। তাঁর ধৈর্য, স্থৈর্য, সহ্যশক্তির সঙ্গে কখনও কোনও অবস্থায় আপনি একাত্ম হতে পারবেন না। সেই ধৈর্য-স্থৈর্য এতই বিপুল, এতই তা অতিমানুষিক যে সব সময়ই তা বাহুল্য মনে হবে। আর এই রকম একজন বিরাট মানুষ যখন পাশা-খেলার নেশায় আত্ম-বিস্মৃত হন, তখনই এক মুহূর্তে তিনি মানুষের চোখে সত্যধর্মের সিংহাসন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যান। কিন্তু ভারী আশ্চর্য—মহাভারতের কবিও এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করেন। সাধারণ জনের মতো তিনি কঠিন, নৃশংস নন বলেই পাশা-খেলার চরম মুহূর্তে তাঁর আপন সৃষ্ট ধর্মরাজকে জুগুপ্সার জগতে নামিয়ে দিয়েই তাঁকে একান্ত মানুষোচিত করে তোলেন। এক বিশাল ভুল করিয়ে দিয়ে প্রতিতুলনায় তাঁকে আরও এক মহত্তর এবং লোকোত্তর ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেন মহাকবি।

যে মুহূর্তে দ্রৌপদীর প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করে তাঁর পণের উৎকর্ষ প্রকট করেছিলেন যুধিষ্ঠির, সেই মুহূর্তে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। কৌরবসভার বৃদ্ধরা হাহাকার করে উঠেছিলেন, বিদুর নিজের মাথা টিপে ধরে বসে পড়েছিলেন সবার মধ্যে। আর ধৃতরাষ্ট্র! পিতৃহীন যুধিষ্ঠির যাঁকে পিতা বলেন? সেই ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলেন না। কেবলই—শকুনি জিতেছে কি, জিতেছে কি—এই প্রশ্নে আকুল করে তুললেন সভাগৃহ। কর্ণের হাসি, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিৎকার আর বৃদ্ধদের চোখের জলের মধ্যে শকুনি ঘোষণা করলেন—জিতমিত্যেব—জিতেছি, অবশ্যই জিতেছি। খেলা শেষ। যা যা পাবার ছিল পেয়ে গেছেন কৌরবেরা। সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের আদেশ নেমে এসেছে—কাকা বিদুর! দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন এই রাজসভায়, আমাদের দাসীদের সঙ্গে রাজবাড়ির ঘর-দোর ঝাড় দিতে ডেকে আনুন তাঁকে।

বিদুর চিৎকার করে উঠেছেন প্রতিবাদে। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। চুলের মুঠি ধরে দ্রৌপদীকে রাজসভায় নিয়ে এলেন দুঃশাসন। ব্যাপারটা আর ঘর-দোর ঝাড় দেওয়ার পর্যায়ে রইল না। পাণ্ডবদের কুলবধূ কৌরবদের সভাবঙ্গে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন, দুর্যোধন অথবা কর্ণের যে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তা না হয় আমরা আগেই খানিকটা বুঝেছি। কিন্তু পাণ্ডবদের বিপন্ন অবস্থায় কুরুসভার বৃদ্ধদের কী চরিত্র প্রকাশ পেল? বিদুর-বিকর্ণ ছাড়া একটি লোকও দ্রৌপদীর সহায়তায় এগিয়ে আসেননি। যুধিষ্ঠির যদি পাশা-খেলার মন্দ বুদ্ধি প্রকাশ না করে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানীতেই রাজমর্যাদা নিয়ে বসে থাকতেন, তা হলে মহাভারতের কবির পক্ষে এই সব বাস্তব পরিস্থিতি, এবং এই সব প্রতিনিয়ত ঘটমান বর্তমানগুলি এমন সত্যের দৃষ্টিতে দেখা বা লেখা সম্ভব হত না। ধর্মরাজের চরিত্র-হানি করার এটাও একটা উদ্দেশ্য।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশা খেলে এবং পণ রেখে অন্যায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছেন—তাতে করে এটাও না হয় বোঝানো গেল যে, পাশা খেললে একজন শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষেরও এই গতি হতে পারে, তার মান-সম্মান গৃহ-বিত্ত-দারা সবই নষ্ট হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, এই অসামান্য বিপর্যয়ের মধ্যেও যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে কেউ কিন্তু এমন কথা বলছেন না যে, তিনি ধর্ম থেকে পতিত, নষ্ট চরিত্র এবং অসৎ। এমনকী দ্রৌপদী কৌরবসভায় যাবার আগে একটি আইনের প্রশ্ন তোলেন—যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে বাজি রেখে তারপরে দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছেন, নাকি আগে দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পরে নিজেকে হেরেছেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু ভারী আশ্চর্য, কুরুসভার রঙ্গস্থলে পৌঁছেও দ্রৌপদী সোচ্চারে বলেছেন—ধর্মপুরুষ যুধিষ্ঠির ধর্মের দিকেই তাকিয়ে আছেন এবং সে ধর্ম

এতই সূক্ষ্ম, এতই নিপুণভাবে সে ধর্ম বুঝতে হয় যে, আমরা তা ধারণ করতে পারি না বলে আমরা তাঁর দোষ ধরতে পারি না—বাচাপি ভর্তুঃ পরমাণুমাত্রমিচ্ছামি দোষান্ ন গুণান্ বিসৃজ্য।

দোষ একটাই। যুধিষ্ঠির পাশা খেলেছেন এবং জুয়াড়ির মতো পণ রেখেছেন। কিন্তু হেরে যাবার পরেও যুধিষ্ঠির বলবেন—না আমি দ্রৌপদীকে পণ রাখিনি ; এই দুরাত্মা শকুনিটা জোর করে আমাকে দিয়ে পণ রাখিয়েছে এবং হারিয়েছে—না, এই সব ওজর-আপত্তি তিনি একবারও তোলেননি। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম স্বয়ং দ্রৌপদীর প্রশ্নের কোনও মীমাংসা করে দিলেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই বিপর্যস্ত মুহূর্তেও ভীষ্ম তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন—তিনি এই ঋদ্ধা পৃথিবীও ত্যাগ করবেন বরং, কিন্তু সত্য ত্যাগ করবেন না। ভীষ্মের ছোট্ট কথাটার মধ্যেও কুরুসভায় দ্যূতক্রীড়ার সমস্ত তথ্যটা দেওয়া আছে। ভীষ্ম বলেছেন—শকুনির মতো পাশা খেলতে পারে এমন দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা তৈরি করেছেন—কুন্তীসুতস্তেন নিসৃষ্টকামঃ।

আসলে পরের পর বাজি রাখতে রাখতে যুধিষ্ঠিরের ঘোর লেগে গিয়েছিল। তিনি বাজি রাখছেন, হারছেন এবং যখন বাজি ধরার মতো আর কিছুই নেই, তখন শকুনিই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—কোন বস্তু তিনি বাজি রাখতে পারেন। দ্রৌপদীকে বাজি রাখার ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু খেলায় যে শঠতা হচ্ছে, শকুনি যে সব অন্যায় করছেন, যুধিষ্ঠির সময়ে তার প্রতিবাদও করেননি। সময়ে 'শঠতা'র উচ্চারণ না করায়—ন মন্যতে তা নিকৃতিং যুধিষ্ঠিরঃ—তিনি এক সময় পরাজিত ঘোষিত হয়েছেন। এ বিষয়ে ভীষ্মের ধারণা এইরকমই। দ্রৌপদী ভীষ্মকে বলেছেন—কুরুসভার বদমাশ শঠ জুয়াড়িরা রাজাকে ডেকে এনেছে এখানে। পাশা-খেলার ইচ্ছে তাঁর মোটেই ছিল না, কাজেই শকুনি তাঁকে প্ররোচিত করেছেন এটা কেমন কথা ! আসল কথা হল, শুদ্ধস্বভাব যুধিষ্ঠির শকুনির শঠতা ধরতেই পারেননি—সংশুদ্ধভাবো নিকৃতিপ্রবৃত্তম্ অবুধ্যমানঃ। সকলে একসঙ্গে মিলে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই খেলা জিতেছে শকুনি এবং যুধিষ্ঠিরও পরে বুঝতে পেরেছেন—শকুনি কতটা অন্যায় করেছে—পশ্চাদয়ং কৈতমভ্যুপেতঃ।

কিন্তু পরে বুঝে তো আর লাভ নেই। তখন যা হবার হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের ওই এক বিপদ। পরে বুঝতে পারে। কিন্তু যুধিষ্ঠির অন্যায়ভাবে পরাজিত হলেও তিনি যখন নিজেই এই আত্মহত্যার খেলা খেলেছেন ও পরাজিত হয়েছেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে কোনও ওজর আপত্তি শোনা যায়নি। দ্রৌপদীর চরম অপমান দেখে ক্রুদ্ধ ভীম দাদা যুধিষ্ঠিরকেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—যুধিষ্ঠির ! জুয়াড়িদেরও পোষা বেশ্যা থাকে, তারাও অন্তত সেই বেশ্যাদের বাজি রাখে না। তুমি সেখানে কুলবধূ দ্রৌপদীকেও বাজি ধরেছ। বেশ্যার ওপর মানুষের যে দয়া থাকে, তোমার কি তাও নেই ? ভীম রাগের চোটে যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলার হাতটি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভীমের কথা বেশি দূর এগোতে পারেনি। তার আগেই সর্বদর্শী অর্জুন যুধিষ্ঠিরের চিরন্তন মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভীমকে স্তব্ধ করে দিয়ে বলেছেন—তুমি তো আগে কোনও দিন এইভাবে কথা বলনি ! পরম ধার্মিক, আমাদের সবার বড়দাদাকে এইভাবে তুমি অপমান করতে পার না—ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং মাতিক্রমিতুমর্হসি। শত্রুরা কি তোমারও ধর্মগৌরব নষ্ট করে দিয়েছে ?

কী ভয়ঙ্কর ঘটনাই না ঘটতে চলেছে পাশাখেলার আসরে ! সে যে কত বড় বিপদ, তা ভীম না বুঝলেও অর্জুন অন্তত বোঝেন। এই অসম্ভব মুহূর্তেও যুধিষ্ঠিরের ওপর অর্জুনের মায়া হল। হয়তো তাঁর মনে পড়ল সেই দিনটির কথা, যেদিন স্বয়ম্বরসভার ভূষণ-মণ্ডিতা দ্রৌপদীকে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেদিনও এই ভীমই ছিলেন তাঁর সঙ্গে। দুজনে একসঙ্গে মায়ের কাছে এসে বলেছিলেন—মা ! কেমন ভিক্ষা এনেছি দেখ ! নিজের অজ্ঞান্তে জননী কুন্তী পাঁচ ভাই মিলে ভিক্ষা ভাগ করে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু তারপর ? তারপর যখন জননীর ভুল ভাঙল, তখন যে যুধিষ্ঠিরই সমস্ত ভবিষ্যতের নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ালেন। জননী যে যুধিষ্ঠিরকেই সিদ্ধান্ত নেবার ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনের কথা আজ ভীমের মনে নেই। কারই বা থাকে ? সেদিন যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভাইয়ের

দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন—কোনও ভাইই যদি কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর অধিকারে বঞ্চিত হন, তো ভাইতে ভাইতে বিভেদ ঘটবে। যুধিষ্ঠিব তা চান না। এক রমণীব জন্য ভ্রাতৃ-বিবাদ—যুধিষ্ঠির, পিতৃসম যুধিষ্ঠির, সংসারের কর্তা-ঠাকুর যুধিষ্ঠিব তা হতে দেবেন না। অথচ আজ তাই ঘটতে চলেছে। দ্যূতসভাব নীচতায় পাঞ্চালীর অপমান ঘটল, সেটা সহ্য করা যেমন কঠিন, ঠিক তেমনই অসহনীয় এই ভ্রাতৃ-বিবাদ। এই ঘটনায় যুধিষ্ঠিরের মনে যে কত ব্যথা লাগবে, তা ভীম না বুঝলেও অর্জুন বোঝেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের ভাই নন শুধু, শিষ্যও বটে—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। ভাই বলে তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি মায়ায় কাতর হন, আর শিষ্য বলে যুধিষ্ঠিরের অপমান তাঁর সহ্য হয় না। অর্জুন তাই যুধিষ্ঠিরের হয়ে ভীমের কাছে ওকালতি করতে আরম্ভ করলেন বৃহত্তর স্বার্থে

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে দাঁড়ালেন—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসারে। পাশা-খেলায় আহূত রাজাকে তো আসতেই হবে। তাঁকে খেলতেও হয়েছে পরের ইচ্ছায়—আহূতো হি পরৈ রাজা ক্ষাত্রং ধর্মম্ অনুস্মরন্। দীব্যতে পরকামেন...। তবে শুধু শুধু তাঁকে গালমন্দ করছেন কেন? অর্জুনের যুক্তি থেকে বোঝা যায়—যুধিষ্ঠির পুরোই দোষী নন। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে বিপদ ঘটিয়েছে তাঁর ভদ্রতা এবং মুখচোরা স্বভাব। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়যজ্ঞের সময় চেদিবাজ শিশুপাল যখন তাঁর অভীষ্টতম কৃষ্ণকে গালাগালি দিচ্ছিলেন, তখনও সেই চরম মুহূর্তে যুধিষ্ঠিব শিশুপালের পিছন পিছন অনুগমন করে তাঁকে সানুনয়ে বলেছিলেন—এরকম করে কঠিন কথা বলবেন না রাজা, এতে অধর্ম হয়—অধর্মশ্চ পরো রাজন্ পারুষ্যঞ্চ নিরর্থকম্। আবার ধৃতরাষ্ট্রের পাশা-খেলার আহ্বান শুনেও তিনি সেই একই ভদ্রতা দেখিয়েছেন—পিতার সমান জ্যাঠামশাই ডেকেছেন, অতএব যেতেই হবে। শকুনির সঙ্গে খেলতে বসেও সেই একই ভদ্রতা—ঠকিয়ে দিয়ো না, মাতুল। ক্ষত্রিয়ের ছেলে, যুদ্ধবিগ্রহ করে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণদের রক্ষা করি। তুমি অন্যায়ভাবে খেলে আমাদেব ঠকিয়ো না, মাতুল—তদ্ বৈ শ্রেয়ো মাস্ম দেবী র্মা জৈষীঃ শকুনে পরান।

আপনাবাই বলুন, এই ভদ্রতা কি শকুনির মতো খলস্বভাব ঠগীব সঙ্গে চলে। পাশা-খেলার সময় খেলার ঝোঁকে শকুনিব ছল-জুয়াচুরি তিনি কিছুই ধরতে পারলেন না। কিন্তু পণ ধরে হেবে যখন গেছেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাত ধর্ম থেকে সরেও আসবেন না। তা হলে যুধিষ্ঠিরের ভদ্রতা, ধর্ম এবং সত্যের কী ফল হল? সারা সময় জুড়ে দ্রৌপদীর ওপর যথেচ্ছ অপমান তাঁকে সহ্য করতে হল অধোবদনে, একটি কথাও না বলে। সভার মধ্যে কর্ণ-দুর্যোধনের বিকৃত চিৎকার, দ্রৌপদীর কাপড় ধরে দুঃশাসনের টানাটানি, মাঝে মাঝে ভীমেব আস্ফালন, হুঙ্কার, প্রতিজ্ঞা আর দ্রৌপদীর করুণ তর্কযুক্তি,—সব যুধিষ্ঠিবকে সহ্য করতে হল নিজেরই দুঃসহ অপমানের যন্ত্রণায়। উত্তরঙ্গ সভাগৃহের মাঝখানে যুধিষ্ঠিব বসে রইলেন সমাহিতের মতো।

শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীই বাঁচালেন। বীরের ঘরণী তিনি, রাজসভার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে একটুও অপমানিত না করেও তিনিই যুধিষ্ঠিরকে বাঁচালেন। ধৃতরাষ্ট্র বর চাইতে বললে—তিনি প্রথম যাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে বললেন, তিনি যুধিষ্ঠির। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ এই ঘটনায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর অন্তর্নিহিত ভালবাসাব সন্ধান পেয়েছেন এবং তাঁকে দ্রৌপদীর নায়ক ঠাউরে বসেছেন। সবিনয়ে জানাই—এ ঘটনায় দ্রৌপদীর ভালবাসা কিছুই প্রকট হয় না তাঁর ভালবাসাটা বড় জটিলও বটে। এখানে যুধিষ্ঠিরকেই প্রথম দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পিছনে দুটি কারণ আছে। প্রথম কথা হল যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামী। শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠের মুক্তিতে তাঁর নিজেরই মাহাত্ম্য বাড়ে। দাসী থেকে তিনিও এক মুহূর্তেই রানির পর্যায়ে উন্নীত হন। সেই মুহূর্তে এই মর্যাদাই তাঁর প্রয়োজন ছিল। আরও একটা কথা। যুধিষ্ঠিরকে মুক্ত করে তিনি তাঁর পাশা-খেলার অমানুষী ইচ্ছেটাকে চরম লজ্জা দিলেন।

সর্বশেষে জানাই—যুধিষ্ঠিরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি পাশা খেলুন আর নাই খেলুন, পণ ধরুন বা নাই ধরুন, কৌরবরা পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত কবতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যখন ধৃতরাষ্ট্র এবং

দুর্যোধন—দু'জনেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পাণ্ডবভাইদের আবার ইন্দ্রপ্রস্থের রাস্তা থেকে ধরে আনলেন দ্বিতীয়বার পাশা খেলার জন্য, তখনই বোঝা যায়, মহাভারতের কবির কাছে যুধিষ্ঠিরের অপটু পাশা খেলাটা একটা জুতসই নিমিত্তমাত্র, প্রতিতুলনায় কৌরবদের জঘন্য চক্রান্তটা সর্বসমক্ষে তুলে ধরাটাই মহাকবির আসল উদ্দেশ্য ; যুধিষ্ঠিরকে সামান্য আদর্শভ্রষ্ট করে তারই পথ ধরে মহাকাব্যের গতি এবং নাটকীয়তা এক চরম খাতে বইয়ে দিয়েছেন মহাভারতের কবি।

দ্রৌপদী এবং ভাইদের নিয়ে যুধিষ্ঠির বনে চললেন নির্বিণ্ণ মুনির মতো। যাবার সময় কুরুবৃদ্ধদের সবার কাছে বিদায় চাইলেন যুধিষ্ঠির। সবাইকে বলে গেলেন—আবার দেখা হবে—সর্বান্ আমন্ত্র্য গচ্ছামি দ্রষ্টাস্মি পুনরেত্য চ। কুরুবৃদ্ধরা দুঃখে লজ্জায় কেউ কথা বলতে পারলেন না। শুধু বিদুর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—অন্যায়ভাবে কেউ যদি জিতে নেয় তোমাকে, তবে তোমার সেই পরাজয়ে লজ্জা নেই কোনও, দুঃখও কিছু নেই—নাধর্মেণ জিতঃ কশ্চিদ্ ব্যথতে বৈ পরাজয়ে। তুমি শুধু ধর্মকেই জান, অতএব জয় তোমাদের হবেই। যুধিষ্ঠির বনের পথে পা বাড়ালেন কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে এই মুখ ঢাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—অন্যায়ভাবে আপনার ছেলেরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিলেও যুধিষ্ঠির কখনও ধর্মভ্রষ্ট হন না। বনে যাবার সময় একান্ত ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের চোখেও হয়তো ক্রোধের ছায়াপাত ঘটেছে। ধর্মিষ্ঠের চক্ষু থেকে যদি ক্রোধাগ্নির উৎপত্তি ঘটে এবং তাতে যদি জগৎ ধ্বংস হয়, যুধিষ্ঠির তাই বস্ত্রে আবৃত্ত করেছেন তাঁর মুখ—বস্ত্রেণ সংবৃত্য মুখং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির বনের পথে রওনা হলে হস্তিনাপুরের প্রজাদের মধ্যে রীতিমতো বিক্ষোভ শুরু হল। তারা ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতার নিন্দা করার সময় নীতি-নিপুণ অন্যান্য কুরুবৃদ্ধদেরও ছেড়ে কথা কইল না। তারা যুধিষ্ঠিরের পিছন পিছন চলল বনের পথ ধরে। তাদের ধারণা—ধর্মভ্রষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যে থাকার চেয়ে যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষের সঙ্গে বনে থাকাও ভাল। তারা বলল—আপনারা যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানেই যাব—বয়মপ্যনুগচ্ছামো যত্র যূয়ং গমিষ্যথ। যুধিষ্ঠির তাদের অনেক বোঝালেন। ভীষ্ম, বিদুর এবং জননী কুন্তীর সুরক্ষা এবং সেবা করার জন্যই যে তাদের রাজ্যে থাকাটা একান্ত প্রয়োজন—এই কথা বলে যুধিষ্ঠির তাদের ফিরিয়ে দিলেন সানুনয়ে। ফিরে যাবার সময় তারা রীতিমতো কাঁদতে থাকল—চক্রুরার্তস্বরং ঘোরং হা রাজন্নিতি দুঃখিতাঃ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে প্রজারা দুঃখিত মনে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের ব্রাহ্মণ-সজ্জন অনেকেই যাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের রাজ্য ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চলে এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু কিছুতেই ফিরে যেতে রাজি হলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁদের কত বোঝালেন—আমাদের রাজ্য নেই, সম্পত্তি নেই, বনের মধ্যে কোনওমতে ফল, মূল, মাংস জুটিয়ে খাওয়া-দাওয়া চলবে। সেখানে যদি আপনারা থাকেন, তবে আপনাদের বড় কষ্ট হবে এবং সে কষ্ট আমি সইতে পারব না। বামুন-ঠাকুররা বললেন—মহারাজ ! বনে আপনারা যেমন থাকবেন, আমরাও সেইভাবে থাকতে প্রস্তুত হয়েছি—গতি র্যা ভবতাং রাজন্ তাং বয়ং গন্তুমুদ্যতা। আর দেখুন, ভগবানও ভক্তকে ছাড়েন না, আপনি সেখানে...। যুধিষ্ঠির তাঁদের কথা তেমন করে না ফুরোতেই বললেন—ব্রাহ্মণদের প্রতি আমার ভক্তি চিরন্তনী। কিন্তু কী করি, নির্জন বনে আমার কোনও সহায় থাকবে না। যে ভাইরা আমার ফল-মূল, মাংস জোগাড় করে আনবে, তারা দুঃখ-শোকে কাতর হয়ে পড়েছে। দ্রৌপদীর অপমান, রাজ্যহরণ—সব কিছু মিলিয়ে তাদের মনের অবস্থা এমন যে, আমি তাদের বলতে পারব না যে—যাও এখন, বামুন-ঠাকুরদের তণ্ডুল জোগাড় করে আন।

সাধারণ অবস্থায়, ক্ষত্রিয় পুরুষ উপস্থিত থাকতে ব্রাহ্মণদের অন্ন সংগ্রহের কথা ভাবতে হত না। তাঁরা ধ্যান-জপ, যজ্ঞ-হোম নিয়ে থাকতেন, ক্ষত্রিয়রা তাঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠিরের অসহায় করুণ অবস্থা জেনেও তাঁর অনুগামী হয়েছেন স্বেচ্ছায় যুধিষ্ঠিরকে ভালবেসে। অতএব যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে তাঁরা বললেন—আমাদের ভরণ-পোষণ নিয়ে আপনাকে একটুও বিব্রত হতে হবে না, মহারাজ—অস্মৎপোষণজা চিন্তা মা ভূত্তে হৃদি পার্থিব। আমাদের

খাবার-দাবার আমরাই জোগাড় করে নেব। আমরা ধ্যান করব, জপ করব, আর শুধু আপনার মঙ্গলের চিন্তা করব। আর অবসর সময়ে নানা কথায়, মনোহর উপাখ্যানে আমরা ভুলিয়ে রাখব আপনাদের সবাইকে—কথাভিশ্চাতিরম্যাভিঃ সহ রংস্যামহে বয়ম্।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই অনুযাত্রার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমাদের ধারণা। তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণরা ছিলেন রাজযন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। রাজনীতির তাত্ত্বিক জ্ঞান যেমন তাঁদেরই অধিগত ছিল, তেমনই রাজাদের সিংহাসনে স্থাপন করা থেকে আরম্ভ করে রাজ্য পরিচালনা এবং রাজত্বে তাঁদের স্থিতিসাধন করাটাও তাঁদেরই ওপর অনেকটা নির্ভর করত। ঠিক এই নিরিখে দেখতে গেলে হস্তিনাপুর ছেড়ে ব্রাহ্মণদের বহুলাংশে চলে আসাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অন্য দিকে যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে দেখতে গেলেও ব্রাহ্মণদের এই সঙ্গতি তাঁর বনবাসী জীবনের পরম রসায়ন। তার কারণ শুধু এই নয় যে, অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে উতলা হাওয়ার মধ্যে ব্রাহ্মণদের মুখোদ্গীর্ণ নানা উপাখ্যান আর খেচরান্নের সহযোগে তাঁর বনবাস-কাল মুখর হয়ে উঠবে। আসল কথা ব্রাহ্মণদের সঙ্গ এবং তাঁদের দার্শনিক যুক্তি-তর্ক যুধিষ্ঠির ব্যক্তিগতভাবে এতই পছন্দ করেন যে, স্বয়মাগত ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে তিনি উদ্বেলিত বোধ করেছেন। তিনি তাঁর ভাব গোপন না করেই বলে ফেলেছেন—কোনও সন্দেহ নেই, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে থাকতেই আমার সব সময় ভাল লাগে—এবমেতন্ন সন্দেহো রমে'হং সততং দ্বিজৈঃ। তবে আমরা থাকতেও ব্রাহ্মণরা তাঁদের নিজেদের খাবার নিজেরা জোগাড় করবেন—এ আমি কেমন করে সইব ?

যুধিষ্ঠিরের এই খেদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেছেন এবং বনবাসের প্রথম দিন থেকেই ব্রাহ্মণদের নানা উপদেশ এবং আলোচনার মধ্য দিয়েই যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবদের বনবাস-জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। মাঝখানে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অপমানিত হয়ে মহামতি বিদুর কয়েকদিনের জন্য পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন। দ্বারকা থেকে এসেছিলেন কৃষ্ণ আর পাঞ্চাল থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন। বিদুরের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যৎসামান্যই কথা হয়েছিল, কিন্তু সেই সামান্য কথারও একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। কারণ, বিদুর যা বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির সেইভাবে চলছিলেন অনেক আগে থেকেই। সে-কথায় পরে আসব। অন্য দিকে বনবাসের কুটীরে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের আগমন তাঁর অস্বস্তিই তৈরি করেছিল বেশি। কারণ, কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের ভাই এবং বন্ধু ছিলেন, ঠিক তেমনই ছিলেন দ্রৌপদীর সখা।

কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর যে চরম অপমান হয়েছিল, তার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল এই বনবাসের কুটীরে—কৃষ্ণের সামনে এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে। দ্রৌপদী সেদিন শুধু যুধিষ্ঠিরকে নয়, পঞ্চপাণ্ডবদের কাউকেই তিরস্কার করতে বাকি রাখেননি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার দায়েই যে শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীর অপমান চরমে পৌঁছেছিল, সেটা যুধিষ্ঠির ভাল করেই জানতেন। আর জানতেন বলেই—পড়লে কথা সবার মাঝে/ যার কথা তার গায়ে বাজে—এই নিয়মে যুধিষ্ঠির যথেষ্টই বিব্রত ছিলেন। আশ্চর্য হল, যে মুহূর্তে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং স্বয়ং অর্জুন দ্রৌপদীর সামনে তাঁদের কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলেন দুর্যোধন-দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে, তখনও কিন্তু কথা শেষ হয়ে যায়নি। কৃষ্ণ বার বার বলেই চলেছিলেন—ইস ! আমি যদি সেই সময় দ্বারকায় থাকতাম, তা হলে এই ভয়ঙ্কর পাশা-খেলা হতে দিতাম না। পাশা-খেলার হাজারো দোষ দেখিয়ে আমি কুরুবৃদ্ধদের প্রত্যয় জন্মাতাম এবং তারপরেও যদি ওরা না শুনত, তা হলে...ইত্যাদি ইত্যাদি। সবার শেষে কৃষ্ণ আবারও যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আমি দ্বারকায় ছিলাম না, সেই জন্যই তোমরা এই পাশা খেলার ফাঁদে পড়লে, দাদা—যেনেদং ব্যসনং প্রাপ্তা ভবন্তো দ্যূতকারিতম্।

যুধিষ্ঠির দেখলেন—পাশা-খেলার ধুয়াটা কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়ছেন না। যে কথাই বলেন, তার শেষেই কৃষ্ণ যোগ করেন—ইস্ ! আমি যদি তখন দ্বারকায় থাকতাম...ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির দেখলেন—বারংবার এই পাশা-খেলার উচ্চারণ তাঁর নতুন বিপদ ডেকে আনবে দ্রৌপদীর সামনে। এতক্ষণ যে তিরস্কার পাণ্ডবদের সবার উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে, হয়তো সেই তিরস্কার এবার নেমে আসবে ব্যক্তিগতভাবে যুধিষ্ঠিরের ওপরেই। হয়তো এই যাত্রা কোনও রকমে বাঁচবার জন্যই ভারতবর্ষীয় একান্নবর্তী পরিবারের বড়কর্তার মতো যুধিষ্ঠির কী নিপুণভাবে কথা ঘোরালেন।

বললেন—কী জন্য তুমি দ্বারকায় ছিলে না, ভাই ? কোথায় গিয়েছিলে কী বা করলে সেখানে—ক চাসীদ্ বিপ্রবাসস্তে কিঞ্চাকার্ষীঃ প্রবাসতঃ ? অর্থাৎ অন্য গল্প বল, পাশা-খেলা থাক।

কৃষ্ণ নিজের প্রবাস-কাহিনী শোনালেন, সাময়িকভাবে যুধিষ্ঠিরের ফাঁড়াও হয়তো কাটল। কিন্তু যে বিদগ্ধা রমণীর এক পঞ্চমাংশ মাত্র লাভ করে একটুও যাকে সামলাতে পারেননি যুধিষ্ঠির, সেই রমণী যে তাঁকে এত সহজে ছেড়ে দেবেন না, তাও তিনি ভালই জানতেন। আসলে যুধিষ্ঠিরকে আপনি কীভাবে দেখবেন ? তিনি ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বভাবটা একটুও ক্ষত্রিয়জনোচিত নয়। যে উৎসাহনশক্তি বা উদ্যম ক্ষত্রিয়ের প্রধান গুণ, তা তাঁর মধ্যে কোনও দিন লক্ষিত হয়নি। এই বনবাসে আসা অবধি ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বলেননি। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিরুদ্ধেও সামান্য ধিক্-শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া—ধিক্ পাপান্ ধৃতরাষ্ট্রজান্—তিনি এমন কথা কখনও বলেননি—যাতে মনে হয় একটা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।

বনে এসে ইস্তক তিনি কী করছেন ? ব্রাহ্মণ-সজ্জনের সঙ্গে সদা সর্বদা তত্ত্ব-তথ্য আর দার্শনিক আলোচনায় মত্ত আছেন যুধিষ্ঠির। অনুতপ্ত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পেয়ে সারথি সঞ্জয় যখন অপমানিত বিদুরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেন তখন সঞ্জয় এসে দেখেছিলেন—যুধিষ্ঠির বসে আছেন বিদুরের সঙ্গে শত-সহস্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে বসে যুধিষ্ঠির যা বুঝতেন, যা শুনতেন, তা অন্তত উৎসাহ-উদ্যমের কথা নয়। তা শুধুই তত্ত্ব-কথা। ক্ষত্রিয়াণী দ্রৌপদী, কৌরবসভায় চরম লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কি এই তত্ত্ব-কথা শুনে পুলকিত বোধ করতেন একটুও ?

কৃষ্ণ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন কুরুকুল ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা সেরে যে যার বাড়ি ফিরে গেলেন, তখন কুরুদেশের পৌরপ্রধানেরা—মুখ্যাশ্চ সর্বে কুরুজাঙ্গলানাম্—যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বিলাপ করেছিলেন অনেক। যুধিষ্ঠির তাঁদের আদর করেছিলেন খুব, কিন্তু কোনও উৎসাহের প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেননি। রাজনীতিতে পৌরমুখ্যদের এই সমর্থন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জেনেই সেদিন অর্জুন উত্তর দিয়েছিলেন—বনবাসের কাল শেষ হলেই মহারাজ যুধিষ্ঠির বলপ্রয়োগ করে শত্রুদের যশ হরণ করবেন। পৌরমুখ্যরা সেদিন সানন্দে অর্জুনের জয়ধ্বনি দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কী করেছিলেন ? কুরুজঙ্গলবাসী ব্রাহ্মণ এবং পৌরমুখ্যেরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেছিলেন—বারো বছর এই নির্জন বনে থাকতে হবে। তোমরা একটা জায়গা খুঁজে বার কর, যেখানে ফুল-ফলের অভাব নেই, মৃগপক্ষীর অভাব নেই, আর অভাব নেই ধার্মিক মানুষের—বারোটা বছর যেখানে সুখে শান্তিতে কাটাতে পারি—যত্রেমাঃ শরদঃ সর্বাঃ সুখং প্রতিবসেমহি।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের মন জানেন। নারদ এবং ব্যাসদেবের সুচিবসঙ্গরঞ্জিত যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণদের স্পর্শলুব্ধ যুধিষ্ঠির কোথায় থাকতে চান, অর্জুন তা জানেন। অর্জুনের তত্ত্বাবধানে দ্বৈতবনের সুশীতল সরোবরের তীরে যেখানে থাকবার ব্যবস্থা হল—সেখানে হাজার ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এলেন—বহবো ব্রাহ্মণাস্তত্র পরিবব্রু-র্যুধিষ্ঠিরম্—আরও দ্বৈতবনের তাবৎ ব্রাহ্মণ এবং মুনি-ঋষিরা—পূতাত্মনাং চীরজটাধরাণাম্—এসে মিলিত হলেন পূর্বাগত ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে। দ্বৈতবনে আসবার পরেই যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হয় বিখ্যাত মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে। সমস্ত দ্বৈতবনের মধ্যে এক বিশাল ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডল রচিত হল। একদিকে ঋক্-সাম-যজুর্বেদের মন্ত্রধ্বনি, অন্যদিকে পাণ্ডবদের ক্ষত্রোচিত ধনুর্ঘোষ—দুয়ে মিলে ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্রতেজের মিল সূচিত হল—জ্যাঘোষঃ পাণ্ডবানাঞ্চ ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্।

সন্দেহ নেই, সেকালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই পরস্পর অন্বয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্কট অনেক লঘু করে দিয়েছে। কিন্তু মহাভারতের তথ্য থেকে বুঝতে পারি—শুধুমাত্র পাণ্ডবদের জ্যাঘোষ ছাড়া ক্ষাত্রশক্তির আর কোনও আস্ফালন দ্বৈতবনে শোনা যায়নি। বস্তুত সম্পূর্ণ দ্বৈতবন যুধিষ্ঠিরের অনুগামী ব্রাহ্মণ্যের সমর্থনেই মুখরিত ছিল—অনুকীর্ণং মহারণ্যং ব্রাহ্মণৈঃ সমপদ্যত। নিশ্চয়ই এটাও খুব কম কথা নয়। কিন্তু স্বয়ং যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের জ্যাঘোষে যতখানি পরিতৃপ্ত ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত ছিলেন বক দালভ্য অথবা নারদ, বেদব্যাস, কাশ্যপ, শৌনক,

সুহোত্র, হোত্রবাহনের ব্রাহ্মণ্যভাবনায়।

এইভাবে কতদিন চলে? বিস্ফোরণ ঘটল। দিবারাত্র চোখের সামনে বই খুলে যে অধ্যাপক বসে আছেন, তাঁর স্ত্রী যেমন সংসারের চালচুলো সামলাতে গিয়ে নিরীহ স্বামীটির ওপর মাঝে-মাঝেই ঝেঁজে ওঠেন, দ্রৌপদী একদিন সেইভাবে ঝেঁজে উঠলেন যুধিষ্ঠিরের ওপর। লক্ষ করে দেখুন—ভীম থেকে সহদেব—এই চতুষ্পাণ্ডবের চাইতে মাত্র এক থেকে চার বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের ভাবটি ছিল এক বৃহৎ সংসারের কর্তামশাই পিতা ঠাকুবটির মতো। এ-কথা আমি আগেও বলেছি। কোনও দিন কোনও ভারী কাজ যুধিষ্ঠিরকে করতে হয়নি। কোনও অসুর-রাক্ষসেব সঙ্গে যুদ্ধ নয়, বনবাসের ফল-মূল আহরণ নয়, কোনও লঘু কাজও নয়। সব তাঁর বশংবদ ভাইরা করেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি গুরুর সম্মানে—গুরুবন্-মানবগুরুং মানয়িত্বা মনস্বিনম্।

কিন্তু কেন এই গুরুর সম্মান? কারণ সেই ধর্ম। কারণ সেই সর্বাশ্লেষী বিশ্বজনহিতকর মানবতা, যা তাঁকে সমস্ত ব্যক্তিগত আবর্ত থেকে উঠিয়ে এনে এক নির্বিকার জগতে সমাসীন করে দিয়েছে। ক্ষত্রিয় তো নয়ই, এমনকী সাধারণ ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিদের মতোও তিনি নন। হাজারো ব্রাহ্মণের সাহায্য এবং উপদেশ তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ এবং ঋষিরাও যেখানে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, সেখানে তিনি তাঁদের থেকেও উর্ধ্বে। আমরা এক সময়ে অন্যত্র বলেছিলাম—শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার মতো এক সারাৎসার দার্শনিক উপদেশের পাত্র যুধিষ্ঠির না হয়ে অর্জুন হলেন কেন? আমরা দেখিয়েছিলাম—শমদমাদি সাধন-সম্পদ অর্জুনের মধ্যে ছিল তথা গীতায় উপদিষ্ট দার্শনিক-তত্ত্ব ধারণ করার মতো যোগ্যতা এবং পাত্রতা ছিল বলেই, অর্জুন গীতার শ্রোতা নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু গীতার মধ্যে যে স্থিতধী মানুষের বর্ণনা আছে, সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ এবং জয়-পরাজয়ের সমানবোধসম্পন্ন যে মহান ব্যক্তির বর্ণনা আছে, যুধিষ্ঠির নিজে তো তার উদাহরণ-স্বরূপ বটেই এবং যুধিষ্ঠির আরও বড় কিছু।

গীতায় বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি যোগসিদ্ধির পথে আরোহণ করতে ইচ্ছুক, তাকে কর্ম করতে হয়। আর যিনি যোগসিদ্ধ ব্যক্তি তার কর্ম করার প্রয়োজন নেই। কর্মত্যাগই তার পক্ষে প্রশস্ত—যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। একজন যোগের উচ্চতায় আরুরুক্ষু অন্যজন আরূঢ। অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও এই পার্থক্য। অর্জুন যথেষ্ট নির্বিণ্ণ হলেও তাঁকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম-কর্ম পুরোপুরি পালন করতে হয়। আর যুধিষ্ঠির যোগারূঢ় বলে, তাঁর কাছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম-উৎসাহ-উদ্যমের কোনও মূল্য নেই। যুধিষ্ঠিরকে কখনও আমরা রাজোচিত উত্থানশক্তিসম্পন্ন দেখিনি। মনে মনে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ত্যাগ করে তিনি জীবনমুক্ত এক সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

মুশকিল হল, এত বড় বড় কথা বললে প্রশ্ন ওঠে—তা হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধ করা, বিবাহ করা, গৃহস্থ ধর্ম, পুত্রলাভ—এগুলি কি মজা নাকি? উত্তরে বলি—এ সব দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। ভগবদ্‌গীতায় রাজর্ষি জনকের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জীবন্মুক্ত সর্বত্যাগী ঋষি হওয়া সত্ত্বেও রাজধর্ম, সংসারধর্ম সবই করেছেন—রামকৃষ্ণের ভাষায় পাকাল মাছের মতো। যুধিষ্ঠিরের জীবনযাত্রার উদাহরণও আমরা রাজর্ষি জনকের একাত্মতায় দেখতে চাই। যুধিষ্ঠিরের এই জীবন্মুক্ত মনোভাব সাধারণ্যে বোঝানোর মতো নয়। এমনকী তাঁর ভাইরাও যে তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝেছেন, তা নয়। স্ত্রী দ্রৌপদী যথেষ্ট বিদগ্ধা হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের এই মানসিক পর্যায় কখনও সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারেননি বলেই মনে করি। আর আধো-বোঝা আধো-না-বোঝা মনোভাব থেকেই তাঁদের মনে সেই শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে, যাতে যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিবারের কাছে কর্তামশাইয়ের মতো, গুরুঠাকুরের মতো হয়ে গেছেন।

কিন্তু বাস্তব জগতের নানান জটিলতার মধ্যে এই গুরুঠাকুরটির কী অবস্থা হতে পারে, তার প্রমাণ যেমন আমরা আগেও পেয়েছি, এখনও পাব। ব্যাপারটা দ্রৌপদীর দিক থেকে দেখুন। কী পেয়েছেন তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে? সারাক্ষণ জ্ঞান আর সত্যের উচ্চচূড়ায় বসে থাকা যুধিষ্ঠির তাঁর প্রথম এবং জ্যেষ্ঠ স্বামী। তাঁকে সহজে ভালবাসা বড় কঠিন। সাধারণের মতো তাঁকে ভালবাসতে গেলেই মনে হয়—ইনি তো সাধারণ নন। ধর্ম, সত্য এবং দর্শনের আবরণ ভেদ করে তাঁর প্রেমিক

হৃদয়খানি আবিষ্কার করার চেয়ে কোনও দেবতার হৃদয় আবিষ্কার করাও অনেক সহজ। লোকটি একাধারে অবুঝ এবং কঠিনও বটে। অন্য সবার যখন রাগ হয়, তখন তাঁর রাগ হয় না। সবার যখন লজ্জায় মাথা নুয়ে যাচ্ছে, তখনও তাঁর কোনও লজ্জা নেই—আমরা তাঁকে পাশা খেলবার সময়েও এইরকম দেখেছি। সবাই যখন প্রতিশোধ-স্পৃহায় অভিশাপ অথবা বধের প্রতিজ্ঞা করেন, তখন এই মানুষটি চোখে কাপড় জড়িয়ে হাঁটেন।

এমন মানুষের স্ত্রী হয়ে দ্রৌপদী কী করবেন? দ্রৌপদীর দুঃখ হয়, রাগ হয়, আর সব চেয়ে বেশি হয় মায়া। এই পরম জ্যেষ্ঠ-স্বামীটির আবরণ ভেদ করতে পারেন না বলেই কখনও তাঁর ওপর রাগে ফেটে পড়েন, কখনও তাঁর জ্ঞান আর তাত্ত্বিক বোধের গরিমায় অসম্ভব শ্রদ্ধালু বোধ করেন, আর কখনও পরম স্নেহময়ী জননীর মতো—সংসারের বড় ছেলে, ধম্ম-কম্ম ছাড়া কিচ্ছুটি বোঝে না—এমনই এক মায়ায় যুধিষ্ঠিরকে লালন করেন দ্রৌপদী। কিন্তু যেখানে দ্রৌপদীর স্ত্রীত্বের অধিকার, সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর ব্যবহার অনেকদিন ঘর করা প্রাচীন গৃহিণীটির মতো। ভাবটা এই—সংসার তোমার। কেন তুমি সংসারের সমস্ত প্রাণীগুলোর সুখ-দুঃখ বোঝ না। শুধু দিনরাত ওই জটাধারী মুনি-ঋষিগুলোর সঙ্গে বসে বসে ধম্মচর্চা করলেই চলবে। আমার কথা ছেড়েই দিলাম না হয়, চারটে ছোট ছোট ভাই আছে, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কখনও।

বলা বাহুল্য, দ্রৌপদীর এই প্রাচীন গৃহিণী-স্বভাবের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি আক্ষেপ-অধিক্ষেপ যতই লক্ষিত হোক, এর মধ্যে অন্তঃসলিলা নদীর মতো এক মমতা ছিল দ্রৌপদীর। একে পরিষ্কারভাবে প্রেম বলতে আমরা রাজি নই। তবে মমতা, মায়া—এগুলিও প্রেমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই পড়ে। মহাভারতে দেখা যাবে—অসংখ্য ঋষি-ব্রাহ্মণের সঙ্গে দিন দিন যুধিষ্ঠিরের আধ্যাত্মিক চর্চা যখন বেড়েই চলেছে, সেই সময়েই দ্বৈতবনের অন্তর্গৃহে একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

কথাটা আরম্ভ হয়েছিল ঠাণ্ডাভাবেই, তারপর ক্ষত্রিয়াণী দ্রৌপদীর রাজরক্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল উত্তেজনায়, প্রতিশোধ-স্পৃহায়, আর ধর্মশুদ্ধ যুধিষ্ঠির তখন নিজেকে পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হলেন। দ্রৌপদী বলেছিলেন—রাজা আমার। সেই যেদিন ধৃতরাষ্ট্রের অসভ্য ছেলেগুলো তোমাকে এবং আমাকে মৃগচর্ম পরিয়ে বনবাসে পাঠাল, সেদিন কিন্তু ওদের দুঃখও হয়নি, অনুতাপও হয়নি—বনং প্রস্থাপ্য দুষ্টাত্মা নান্বতপ্যত দুর্মতিঃ। তুমি ওদের সবার বড়ভাই এবং ধর্মই ছিল তোমার একমাত্র আশ্রয়, তবু ওরা তোমার সঙ্গে কী নোংরা ভাষাতেই না কথা বলেছিল। যে তুমি কোনও দিন কষ্টে অভ্যস্ত নও, তাকে কষ্ট দিয়ে ওরা কীরকম মজা পাচ্ছে দেখ—ঈদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপপূরুষঃ। ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার সেই দুধ-সাদা বিছানা, সোনার আসন, বহুমূল্য পোশাক, গা দিয়ে চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুর-ভুর করে! ভাবতেও কেমন লাগে! আর এখানে? এখানে তোমার কণ্টক শয্যা, কুশের আসন, কৌপীন পরিধান, আর গা থেকে ধুলো ঝাড়তে হচ্ছে সব সময়—সত্যিই আমার মনে কোনও শান্তি নেই—কা শান্তি-র্হৃদয়স্য মে।

মানুষ নিজের কষ্টকে সব চেয়ে বড় করে দেখে। দ্রৌপদীও ভেবেছিলেন, হয়তো যুধিষ্ঠির তাঁর কথা শুনে বিষণ্ণ বোধ করবেন। কিন্তু না, কিছুই হল না। দ্রৌপদী এবার বললেন—আচ্ছা ভীমকে বনবাসীর সাজে দেখে তোমার কষ্ট হয় না, রাজা? ওই অমানুষিক শক্তি! ওই তেজ! সে বুঝি একাই সমস্ত কৌরবকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অথচ সে এখন এই বনের মধ্যে ফল-মূল কুড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে। দ্রৌপদী একে একে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—সবার সঙ্গে নিজেরও দুর্দশার বর্ণনা করলেন এবং এঁদের সকলের অনুষঙ্গে বারংবার তাঁর প্রশ্ন ছিল একটাই—তোমার রাগ হয় না? কেন রাগ হয় না তোমার—কস্মাদ্ রাজন্ ন কুপ্যসি? কস্মান্-মন্যুর্ন বর্ধতে?

এতগুলো কথা শুনে যুধিষ্ঠির একটা কথারও উত্তর দিলেন না। দ্রৌপদীর মেজাজ আস্তে আস্তে চড়ছে। তিনি বললেন—তোমার বোধহয় রাগ বলে কোনও জিনিস নেই। চিরকাল শুনে এসেছি—রাগ ছাড়া ক্ষত্রিয় হয় না—তোমায় দেখে বুঝি কথাটা উলটো। তবে এটাও জেনে রেখ—যে ক্ষত্রিয়-পুরুষ তেজ দেখানোর সময় এলেও তেজ দেখায় না, তাকে লোকে অবজ্ঞা করে। তাই বলছিলাম—শত্রুদের ওপর এত ক্ষমা তুমি দেখিয়ো না—তৎ ত্বয়া ন ক্ষমা কার্যা শত্রূন্ প্রতি

কথঞ্চন।

যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ দ্রৌপদীর কথা শুনে একটু তির্যকভাবেই উত্তর দিলেন—মহাপ্রাজ্ঞে! আমাকে যে তুমি এত করে ক্রোধী হওয়ার উপদেশ দিচ্ছ, সেই ক্রোধ জিনিসটা কি খুব ভাল? ক্রোধ যে সহ্য করতে পারে, সেই তো মঙ্গল লাভ করে। যে ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ যা করা উচিত নয় তাই করে, যা বলা উচিত নয় তাই বলে, সেই সর্বনাশা ক্রোধ কী করে আমি করতে পারি—তং কথং মাদৃশঃ ক্রোধং বিসৃজেল্লোকনাশনম্। কোনও জ্ঞানী মানুষ রাগ পুষে রাখতে বলেন না। অন্য মানুষ ক্রোধ প্রকাশ করলেও যে রেগে ওঠে না, সে যেমন নিজেকেও বাঁচাচ্ছে, তেমনই অন্যকেও বাঁচাচ্ছে—ক্রুধ্যন্তম্ অপ্রতিক্রুধ্যন্ দ্বয়োরেষ চিকিৎসকঃ।

দ্রৌপদী এতক্ষণ যে বস্তুটিকে 'তেজ' বলে মনে করছিলেন যুধিষ্ঠিরের মতে তা আদৌ তেজ নয়! যে ক্রোধ শুধুমাত্র দুর্যোধনের বধের উদ্দেশ্য নিয়ে বল্গাহীন ছুটতে থাকবে, সেই ক্রোধ অন্তত যুধিষ্ঠিরকে মানায় না—মাদৃশঃ প্রসৃজেৎ কস্মাৎ সুযোধনবধাদপি। যুধিষ্ঠির মনে করেন—যিনি প্রকৃত তেজস্বী, তাঁর হৃদয়ে ক্রোধের স্থান নেই। বস্তুত মূর্খ লোকেরাই ক্রোধ জিনিসটাকে তেজ বলে ভাবে। যুধিষ্ঠিরের মতে ক্ষমাই মনস্বীদের আসল তেজ। দুর্যোধন ক্ষমা ধারণ করার যোগ্য নয় বলেই, তাঁর মধ্যে ক্ষমা নেই। আর যুধিষ্ঠির যোগ্য বলেই ক্ষমা তাঁকে আশ্রয় করেছে—অর্হস্তত্রাহমিত্যেবং তস্মান্মাং বিন্দতে ক্ষমা।

যুধিষ্ঠিরের কাছে 'ক্ষমা' বস্তুটা ক্রোধের উলটো পিঠে একটা বৃত্তিমাত্র নয়। বস্তুত এটা তাঁর রাজনীতিবোধেরও অঙ্গ। সেই কবে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অপমানিত হয়ে বিদুর চলে এসেছিলেন স্বেচ্ছা-বনবাসে যুধিষ্ঠিরের কাছে। বিদুর চলে যাবার পরেই ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়েছিলেন। রাজনীতির বোধে বিদুর ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক। তিনি যদি নিজের অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতিবোধে পাণ্ডবদের ঋদ্ধ করতে থাকেন, তবে যে ধৃতরাষ্ট্রের আপন পুত্রদের সর্বনাশ হবে—এ-কথা ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছিলেন—বিবৃদ্ধিং চ পরাং মত্বা পাণ্ডবানাং ভবিষ্যতি। কিন্তু বিদুর যতটুকু সময় বনে ছিলেন, সেই সময়টুকুই যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিতধী মানুষকে রাজনীতি বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিদুর সেদিন যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—শত্রুরা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ফেলে দিলেও, যে রাজা ক্ষমা অবলম্বন করে উৎকৃষ্ট কালের অপেক্ষা করেন, তিনি একাকী এই পৃথিবী শাসন করার যোগ্য হন—ক্লেশৈ স্তীব্রৈ-র্যুজ্যমানঃ সপত্নৈঃ/ ক্ষমাং কুর্বন্ কালমুপাসতে যঃ।

শুকনো ঘাস দিয়েও যেমন আগুন জিইয়ে রাখা যায়, ক্ষমা অবলম্বন করেও তেমনই এক সময় নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিদুরের এই ক্ষমার রাজনীতিই যৌধিষ্ঠিরী নীতিতে পরিণত হয়েছে। 'ক্ষমা' জিনিসটা তাই তাঁর কাছে কোনও ক্ষণিক হৃদয়বৃত্তি নয়। ক্ষমা তাঁর কাছে রাজনীতি, অধ্যাত্মনীতি, জীবননীতি। যুধিষ্ঠির বলেছেন—আমার এই 'ক্রোধ-শান্তির রাজনীতিই ক্ষমা'—যে নীতির প্রশংসা করবেন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, যে নীতির প্রশংসা করবেন কৃষ্ণ, যে নীতির সমর্থন করবেন দ্রোণাচার্য এবং বিদুর।

খুব পড়াশুনো করা লোক অবুঝ স্ত্রীর কাছে পড়াশুনো নিয়ে জ্ঞান দিলে যা হয়, দ্রৌপদীরও বুঝি তাই হল। অথচ দ্রৌপদী ততখানি অবুঝ বা নির্বোধ নন, যেমনটি অন্যান্য সাধারণীরা। আসলে ক্ষত্রিয়াণী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের এত ক্ষমা সইতে পারছিলেন না বলেই চেঁচিয়ে উঠলেন—সৃষ্টিকর্তা বিধাতার পায়ে নমস্কার, যিনি এমন মোহগ্রস্ত করে রেখেছেন তোমাকে। দেখ, তোমার ভাইরাও ধর্ম কিছু কম বোঝে না। নিজের প্রাণের চেয়েও ধর্মই তাঁদের কাছে বড়। অন্য দিকে ধর্মের জন্য, সত্যরক্ষার জন্য তুমি ভাইদের এবং আমাকেও যে ত্যাগ করতে পার তাও আমি জানি। কিন্তু যে ধর্মের জন্য তোমার এত দরদ—সে ধর্ম তোমাকেও কিন্তু রক্ষা করছে না। আমরা শুনেছি—রাজা, যদি ধর্মকে রক্ষা করেন, তবে সেই ধর্ম রাজাকেও রক্ষা করে। কিন্তু সে ধর্ম তোমাকেই শুধু রক্ষা করে না—ত্বাস্তু মন্যে ন রক্ষতি। দ্রৌপদী অভিমান থেকেই এ সব কথা বলেছেন, নইলে যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধে তাঁর কোনও অশ্রদ্ধা ছিল না। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে আপামর জনসাধারণ কত সুখে ছিল, কত সম্মান নিয়ে যুধিষ্ঠির রাজত্ব চালিয়েছেন, তার সরব প্রশংসা দ্রৌপদীর মুখে শোনা গেছে। কিন্তু

আজ সেই ধর্মশুদ্ধ রাজা বনবাসের জ্বালা ভোগ করছেন আর ধর্মনাশী দুর্যোধন সম্পত্তি ভোগ করছেন—বিধাতার এই বিপরীত আচরণে দ্রৌপদী বিধাতার ওপরেই ক্ষুব্ধ—ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যো'নুপশ্যতি। দ্রৌপদীর সাভিমান বক্তব্য—মানুষ যদি আপন কৃতকর্মের ফল পায়, একজনের কৃতকর্মের ফল যদি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়, তাহলে ধর্মযাজী যুধিষ্ঠিরের দুর্ভোগ আর ধর্মনাশী দুর্যোধনের সম্ভোগ লাভ হতে পারে না। বিধাতার এই বিষম উপন্যাসে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী ধারণা করেন—স্বয়ং ঈশ্বরই বুঝি আজ পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন—কর্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ।

অভিমানহতা দ্রৌপদীর কথাগুলি শুনতে লাগল সেই বিলাপিনী নারীর মতো, যে স্বামী-পুত্রের বিপত্তিতে ঈশ্বরকেই দোষ দেয়—হায়! এ কী হল, ভগবান! এই তোমার মনে ছিল?—ইত্যাদি। বস্তুত কারও ভাল বা মন্দ অবস্থার জন্য ঈশ্বর দায়ী নন। গীতায় সেই অমূল্য কথাটি আছে ভগবানের জবানীতে—ঈশ্বর কারও পাপও গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান মানুষ তবুও ঈশ্বরের মধ্যে বৈষম্য-আচরণ আবিষ্কার করে। দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাই দ্রৌপদীর এই সাভিমান আক্ষেপ সহ্য করতে পারেননি। তিনি বলেছেন—তুমি বলেছ ভাল দ্রৌপদী, কিন্তু কথাটা বলেছ নাস্তিকের মতো। দ্রৌপদী কী করে বোঝাবেন—পাগল দার্শনিক স্বামী তার প্রিয়া পত্নীর মমতামাখা অভিমানটুকু পর্যন্ত বোঝেন না। তিনি জ্ঞান দিতে থাকেন। তত্ত্বে, দর্শনে, বিশ্বাসে ঘা পড়েছে, অতএব যুধিষ্ঠির থামবেন না। তিনি বলতে থাকবেন।

তিনি যা বলবেন—তা সব আমরা এখানে উদ্ধার করব না। শুধু সেইটুকু বলব—যাতে বোঝা যায় আমরা কেন তাঁকে এক সময় ক্ষত্রিয় রাজা অথবা একজন ব্রাহ্মণ ঋষির চেয়েও বড় বলে মনে করেছি। সেইটুকু বলব, যাতে বোঝা যায় কেন তাঁকে আমরা পূর্বে রাজর্ষি জনকের মান্যতা দিয়েছি, কেনই বা বসিয়েছি গীতোক্ত যোগারূঢ় ব্যক্তির সিংহাসনে। যুধিষ্ঠির বললেন— দ্রৌপদী! আমি ধর্মাচরণ করি, অতএব আমাকে সুখভোগই করতে হবে—এর কোনও মানে নেই। আমি ধর্মের ফল খুঁজে বেড়াই না। দান করতে হয় তাই দান করি, যজ্ঞ করতে হয়, তাই যজ্ঞ করি। ধর্মের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হোক বা না হোক, ধর্মের আচরণটাই আমার স্বভাব—ধর্মং চরামি সুশ্রোণি ন ধর্মফলকারণাৎ। ধর্মের ফল নিয়ে আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই, কারণ আমি ধর্মের এমন বাণিজ্য করি না যে, আমাকে ভাবতে হবে—আমি এতটুকু দিয়েছি, অতএব ততটুকু আমায় পেতে হবে।

গীতার সঙ্গে কেমন মিলে যাচ্ছে—কর্মেই তোমার অধিকার আছে অর্জুন, ফলে কোনও অধিকার নেই—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্জুন এই পর্যায়ে উঠতে চান, অতএব তাঁকে গীতার উপদেশ করতে হয়েছে। আর যুধিষ্ঠির এই পর্যায়ে উঠে গেছেন, অতএব তিনি যোগারূঢ়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই নীতি তাঁকে সহসা উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেয় না। বিপন্নতা, দুঃখ, বিপর্যয় তাঁকে শান্ত করে, আরও শান্ত করে। তাঁকে বুঝতে শেখায়—মানুষ যখন পৃথিবীর মতো সহনশীল আর ক্ষমাবান হবে, তখন সেই ক্ষমা আর শান্তির মধ্যেই শুধু নতুনের জন্ম হয়। ক্রোধ শুধু মৃত্যু আর বিনাশ ডেকে আনে, সে সৃষ্টি করে না—ক্ষমাবতো হি ভূতানাং জন্ম চৈব প্রকীর্তিতম।

আমরা জানি—দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে যেভাবে তিরস্কার করেছিলেন, তার মধ্যে মায়া-মমতার ভাগটাই ছিল বেশি। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম এবং যুধিষ্ঠিরের ঈশ্বরের ওপর দ্রৌপদী যে আক্রোশ দেখিয়েছিলেন, তা বাস্তবে দ্রৌপদীর অন্তর্গত হৃদয়ের ভাব নয়। দ্রৌপদী নিজেও তা বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমি কোনও ভাবেই তোমার ধর্ম বা ঈশ্বরকে আঘাত দিতে চাইনি—নাবমন্যে ন গর্হে চ ধর্মং পার্থ কথঞ্চন। আমার দুঃখ হয়েছে, তাই বলেছি। যুধিষ্ঠিরের মুখে হাজার তত্ত্বকথা শুনেও দ্রৌপদী কিন্তু থামেননি। কৌরব রাজনীতির শঠতা এবং কপটতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বার বার রাজধর্মে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। রাজধর্ম বলতে দ্রৌপদী বুঝিয়েছেন সেই প্রচণ্ড উদ্যম, উদ্দীপনা, উত্থানশক্তি এবং শত্রুপক্ষের সতত ছিদ্রান্বেষণ, যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এই বৃত্তি একটুও লক্ষিত হয় না।

মৃদু তিরস্কার শোনার পর বিদগ্ধা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মতো সমান দার্শনিকতা প্রয়োগ করেই তাঁর

তর্ক-যুক্তি সাজিয়েছেন। কিন্তু কথা শেষ হতে না হতেই মধ্যম-পাণ্ডব ভীম একেবারে সপ্তম সুরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করলেন। যুধিষ্ঠিরের বনবাসে আসার প্রতিজ্ঞা পালন তাঁর মতে ক্ষুদ্র একটুখানি ধর্মলেশমাত্র ; শকুনির কাছে বনবাসের বাজি হারার সামান্য প্রতিজ্ঞার জন্য এত কষ্ট পাওয়ার কোনও অর্থই নেই তাঁর কাছে—ধর্মলেশাপ্রতিচ্ছন্নঃ... দুঃখেষু পরিতপ্যতে। যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ—ভীম শুধু যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধই সব। সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তুমি শুধু লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবে। শকুনি-দুর্যোধনরা শঠ আচরণ করেছে, অতএব তাদের সঙ্গে শঠ আচরণই করা উচিত। ভীম যুধিষ্ঠিরকে রীতিমতো গালাগালি দিলেন এবং ছোটভাই ভীম বলেছেন বলেই যুধিষ্ঠিরের মনে তা বড় বেশি বাজল।

যুধিষ্ঠির খুব দুঃখ পেলেন। এমন কথাও তিনি ভীমকে বললেন যে—তুমি আমার বনবাসের প্রতিজ্ঞার সময়েই এই কঠিন কথাগুলো বলতে পারতে, আজ বলে লাভ কী ? এতই যখন গালাগালি দিচ্ছ, তো সেই সময়ে তুমি যে আমার পাশা-ক্রীড়ার হস্তটি পুড়িয়ে দেবে বলেছিলে, তাই করলেই পারতে। তাতে এমন কী দুষ্কর্ম হত ? তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তরল বিষ পান করছি যেন—দুয়ে বিষস্যেব রসং হি পীত্বা। সেই সময় এক রকম প্রতিজ্ঞা করে, এখন আরেক রকম করব, তা আমার দ্বারা হবে না। মাটিতে গাছের বীজ ফেলে যেমন অঙ্কুরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তেমনই আমাদেরও অপেক্ষা করতে হবে।

ভীম অধৈর্য মানুষ। তিনি এতটুকুও অপেক্ষা করতে চান না। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে চান শত্রুর ওপর। ভীম বললেন—তোমার স্বভাবের কোমলতায় তুমি বেশি দয়ালু হয়ে গেছ। বামুনরা যেমন নিরুদ্যমে যাগ-যজ্ঞ করে নিশ্চিন্ত বসে থাকে, তেমনই শাস্ত্র-শাস্ত্র আর ধর্ম-ধর্ম করে তোমার বুদ্ধিটাই ভোঁতা হয়ে গেছে—অনুবাকহতা বুদ্ধি র্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী। আমার কেবলই ভাবনা হয়—এমন এক দয়ালু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মাল কী করে—ঘৃণী ব্রাহ্মণরূপো'সি কথং ক্ষত্রেষ্বজায়থাঃ ?

যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ভীমের সমস্ত গালাগালি শুনলেন। উলটে কোনও গালাগালি করলেন না, মন্দ কথাও বললেন না। ভীমের ধৈর্যহীন ক্রুদ্ধ ভাষণের প্রত্যুত্তর দিলেন রাজনীতির যুক্তিতে, যৌধিষ্ঠিরী নীতির মাহাত্ম্যে। যুধিষ্ঠির বললেন—রাজধর্ম, বর্ণধর্ম—দুটোই আমার একটু-আধটু জানা আছে ভাই—শ্রুতা মে রাজধর্মাশ্চ বর্ণানাঞ্চ বিনিশ্চয়াঃ। কিন্তু যে মানুষ ভবিষ্যতে কী করা উচিত তাও জানে আর বর্তমানে কী করা উচিত তাও জানে, সেই কিন্তু বুদ্ধিমান লোক। তুমি নিজের শক্তি আর বলদর্পিতার জোরে যেমন চপলতা প্রকাশ করলে, তার উত্তরে দু'-চারটে নাম শোনাই, শোন।

পাণ্ডব-কৌরবের কল্পিত যুদ্ধকালে কী ধরনের যুদ্ধপক্ষ বা 'অ্যাক্সিস' তৈরি হতে পারে, তার একটা নিপুণ চিত্র তুলে ধরলেন যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির বললেন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। কারণ এঁরা কৌরবদের অন্নের ঋণ মেটাবেন—অবশ্যং রাজপিণ্ডস্তৈ-র্নির্বেশ্য ইতি মে মতিঃ। রাজ্যের বাইরে যাঁরা কৌরবদের হিতার্থী তাঁরাও তাঁদের পক্ষে আসবেন। এদিকে রাজসূয়যজ্ঞের সময় যে সব রাজাকে আমরা যুদ্ধে জয় করে, উৎপীড়ন করে রাজকর দিতে বাধ্য করেছিলাম, তাঁরা সবাই দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেবেন, আমাদের পক্ষে নয়—দুর্যোধনহিতে যুক্তা ন তথাস্মাসু ভারত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—এঁরা সব দিব্য-অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবেন, অন্য দিকে তাঁদের সঙ্গে আছেন কর্ণ—তাঁর মতো যুদ্ধ-বীর খুব বেশি নেই। এঁদের প্রতিপক্ষে তুমি আমাদের দেখ। আমাদের সহায়-সম্পদ, দিব্য-অস্ত্র কিছুই নেই। অথচ এই বীর যোদ্ধাদের যুদ্ধে জয় না করে তুমি কোনওভাবেই দুর্যোধনকে মারতে পারবে না—অশক্যো হ্যসহায়েন হন্তুং দুর্যোধনস্ত্বয়া।

যুদ্ধকালের বাস্তবচিত্রখানি ভীমের সামনে তুলে ধরে যুধিষ্ঠির তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন—ভাই ! ভীষ্ম-দ্রোণের মতো মহাবীর এবং কর্ণের মতো ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্ধর বীরের কথা চিন্তা করে রাত্রে আমার ঘুম হয় না, আর তুমি এখনই যুদ্ধ-যুদ্ধ করছ—ন নিদ্রামধিগচ্ছামি চিন্তয়ানো বৃকোদর। ভীম নিজের বাহুবলে যতই বিশ্বাসী হোন, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের শক্তি তিনি জানেন। যুধিষ্ঠিরের মুখে হঠাৎ এই

রাজনৈতিক মেরুকরণের বাস্তব তাৎপর্য বুঝে ভীম কিন্তু রীতিমতো চিন্তিত হলেন। তিনি আর একটুও অধৈর্য হলেন না, একটাও কথা বললেন না যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে।

যুধিষ্ঠির-ভীমের ঝটিকা-সংলাপের অব্যবহিত পরেই বনবাসের কুটীরে উপস্থিত হলেন ব্যাসদেব। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিব্য-অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোগী হতে বললেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা—এই সব মহাবীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে যে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োজন হবে—সেটা ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন ব্যাসদেব। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা দান করলেন, যে বিদ্যার সাধনে অর্জুন দেবতাদের তুষ্ট করে অস্ত্র লাভ করতে পারবেন। যে উদ্যোগ এবং উৎসাহশক্তির কথা দ্রৌপদী-ভীম বলে আসছিলেন, তার সূত্রপাত হল এক ঋষির মাধ্যমেই, যে ঋষি কৌরব-পাণ্ডবের এক পিতামহ হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি দুর্বলতায়। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদ্যা শিখে চলে গেলেন তপস্যায়।

বনবাসকালে যে সময়টুকু অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছাকাছি থাকলেন না, সেই সময়টুকু শুধু যুধিষ্ঠির কেন, কারওই ভাল কাটল না। ভীম যুধিষ্ঠিরের পিঠোপিঠি ভাই। দাদা বলে যুধিষ্ঠিরকে তিনি মোটেই ছেড়ে দেন না, অর্জুনের মতো গুরু বলেও মানেন না যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির-ভীমের ঝগড়া লাগলে একমাত্র সামাল দেওয়ার লোক হলেন অর্জুন। তিনি ভীমকে কোনওমতে থামিয়ে রাখেন। এই মুহূর্তে অর্জুন চলে যাওয়ায় ভীমের আক্রোশ বেড়েই চলল যুধিষ্ঠিরের ওপর। থামাবারও কোনও লোক নেই। যুধিষ্ঠির অসহায়। ভীম সেই একই কথা আবারও বলে চললেন—তোমার জন্যই আজকে আমাদের এই বনবাসের কষ্ট। পাশা খেলা জান না, তবু পাশা খেলতে বসেছিলে। অর্জুন আজকে তপস্যা করতে গেল, এর জন্যও তুমি দায়ী। এখনও বলছি, আমাদের ভাল চাও তো, একবার শুধু বল। তারপব দেখ, আমি দুর্যোধনকে কীভাবে মেরে ফেলি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠির একটুও মাথা গরম করলেন না। পরিবর্তে তাঁকে জড়িয়ে ধরে পরম স্নেহে মস্তকাঘ্রাণ করে বললেন—ভাই! আমাদের বনবাসের কাল অতীত হলে, তুমি একেবারে অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে দুর্যোধনকে মেরে আসবে। আমাকে যে তুমি উলটে ওদের সঙ্গে শঠতা করতে বলছ, সেই শঠতা ছাড়াও দুর্যোধনকে মারতে পারবে—হন্তা ত্বমসি দুর্ধর্ষং সানুবন্ধং সুযোধনম্। ভীম বারবার যুধিষ্ঠিরকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, অজ্ঞাতবাসের পর কৌরবরা আবারও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাশা খেলে তাঁকে হারাবে। যুধিষ্ঠির সে ব্যাপারেও একটা 'গার্ড' নিলেন। বৃহদশ্ব নামে এক মুনি এসে যুধিষ্ঠিরকে নলরাজার পাশা-খেলার বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন। সেই বৃহদশ্ব পাশা-খেলার সমস্ত কূট রহস্য জানতেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে 'অক্ষহৃদয়' শিখে নিয়ে অন্যতর এক বাস্তবের জন্যও নিজেকে তৈরি রাখলেন।

কাম্যক বনের আশ্রমে তিন ভাই আর দ্রৌপদীকে নিয়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনের ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন। এই সময়ে অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর সপ্রেম বিলাপ তাঁকে ধৈর্য ধরে শুনতে হয়েছে। অর্জুনকে কেউই কম ভালবাসতেন না। দ্রৌপদীর বিলাপের সঙ্গে ভীম-নকুলদের আর্ত কণ্ঠও মিশ্রিত হয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর একান্ত অনুভূতি যুধিষ্ঠিরকে আলাদাভাবে মথিত করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু তিনি তা বুঝতে দেননি। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী এবং ভাইদের সঙ্গে তিনিও একাত্ম হয়েছেন একইভাবে—শ্রুত্বা বাক্যানি বিমনা ধর্মরাজো'প্যজায়ত—কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। অর্জুনের বিরহ-কষ্ট ভোলাবার জন্য তিনি এবার সবাইকে নিয়ে তীর্থযাত্রা অর্থাৎ আমাদের লৌকিক ভাষায় দেশ-ভ্রমণে বেরলেন। এই সম্পূর্ণ সময় ধরে দেশ-ভ্রমণ আর নানা মুনির কাছে নানা উপাখ্যান শুনে দিন কাটল যুধিষ্ঠিরের। এরই মধ্যে অর্জুনের ফিরে আসবার সময় হল। পাণ্ডবরা সবাই গন্ধমাদন পর্বতের কাছে এসে অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন—ষড় রাত্রমবসন্ বীরা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ।

অর্জুনের জন্য সবার এই অপেক্ষার মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের জীবনে সেই মিষ্টি ঘটনাটি ঘটল। কোথা থেকে এক দিব্যগন্ধী পদ্মপুষ্প হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছিল দ্রৌপদীর সামনে। আর দ্রৌপদী অমনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আপন প্রেম-বশংবদ ভীমকে বললেন—আমাকে এইরকম পদ্ম আরও এনে

দাও। এই মনোহর সুরসৌগন্ধিক পদ্মপুষ্প আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেব—*ইদঞ্চ ধর্মরাজায় প্রদাস্যামি পরন্তপ।* ভীমকে পাঠিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী পুষ্পবতী হয়ে পৌঁছলেন ধর্মরাজের কাছে। দ্রৌপদীর কাছে থেকে অনর্ঘ উপহার লাভ করে যুধিষ্ঠির কতটা পুলকিত হয়েছিলেন, মহাভারতের কবি তা পরিষ্কার করে বলেননি। পণ্ডিত-রসিকজনে কেউ কেউ এই ঘটনার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে যুধিষ্ঠিরকেই দ্রৌপদীর আসল প্রেমিক এবং নায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর এই পুষ্পাহরণের ঘটনা যুধিষ্ঠিরের প্রতি রসাবেশ হিসেবে ব্যাখ্যা না করাই ভাল। পঞ্চস্বামীর চির-প্রার্থনীয়া দ্রৌপদী তাঁর একেক স্বামীকে একেক সময়ে একেকভাবে তুষ্ট করেছেন। কিন্তু আপ্রবন্ধস্থিত স্থায়িভাবের মতো দ্রৌপদীর প্রেম-সর্বস্বতা যে অর্জুনকে কেন্দ্র করেই চিরকাল আবর্তিত হয়েছে, তা অর্জুনের চরিত্র আলোচনাতেই পরিষ্কার হয়ে পড়বে। এমনকী এই মুহূর্তে যে পরম সরসতায় পদ্ম-পুষ্পের উপহার নিয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কাছে ছুটলেন—জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তত্তদা—তার মধ্যেও আমরা অলক্ষিতভাবে এবং তির্যকভাবে অর্জুনের উপস্থিতি লক্ষ করি।

এই কিছুক্ষণ আগে আমরা দুর্গম পার্বত্যপথ ভেঙে সমস্ত পাণ্ডবভাই এবং দ্রৌপদীকে চলতে দেখেছি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু অর্জুন ফিরে আসবেন স্বর্গপুরী থেকে, আর সেই সময় দ্রৌপদী সেখানে উপস্থিত থাকবেন না—এ তিনি মেনে নিতে পারেননি। দ্রৌপদীকে অবশ্য নিজমুখে যাবার প্রস্তাব করতেই হয়নি। দ্রৌপদীর মন বুঝে তাঁর বশংবদ ভীমই জোর করে বলেছিলেন—অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী তো অবশ্যই যাবেন—ব্রজত্যেবেহ কল্যাণী শ্বেতবাহ-দিদৃক্ষয়া। দরকার হলে আমি তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যাব। পার্বত্যপথ বেয়ে যেতে যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন দ্রৌপদী। নকুল তাঁকে কোনওমতে ধরে ফেলেই চিৎকার করে উঠেছিলেন যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে।

যুধিষ্ঠির পরম স্নেহে দ্রৌপদীকে নিজের কোলে শুইয়ে সেদিন অনেক কেঁদেছিলেন। বারবার নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—আমারই পাপে আজ এই বরবর্ণিনী সুন্দরীর এমন হতদশা। এমন সুন্দর পা দু'টি, এমন সুন্দর মুখ। আমার জন্যই আজ তাঁর সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গেছে—মৎকৃতে'দ্য বরার্হয়াঃ শ্যামতা সমুপাগতম্। যুধিষ্ঠির অনেক বিলাপ করেছিলেন—কেন আমি পাশা খেলেছিলাম! কেন সেই দুর্বুদ্ধি হল? পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে হয়েছে, সে কত না সুখ পাবে—এই ভেবে দ্রুপদরাজা কতই না সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুখ-পালিতা রমণী আজ আমারই কর্মদোষে মাটিতে পড়ে আছে—শেষে নিপতিতা ভূমৌ পাপস্য মম কর্মভিঃ।

দ্রৌপদীর জন্য যুধিষ্ঠিরের এই শোকের মধ্যে ভালবাসা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এই ভালবাসার ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। অনুরূপ অবস্থায় নকুল কি সহদেবের পতন ঘটলেও যুধিষ্ঠির একই রকম বিলাপ করতেন। দ্রৌপদী ভীমকে সুর-সৌগন্ধিক আহরণ করার জন্য দূরে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাঁর দেরি হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের পরম উদ্বেগ আমরা আশ্চর্য বিস্ময়ে লক্ষ করেছি। দ্রৌপদী এই ঘটনার জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে তিরস্কৃতও হয়েছিলেন। লক্ষ করে দেখবেন, শুধু স্ত্রী কিংবা ভাই নয়, পরবর্তী সময়ে আপন-পক্ষীয় কোনও বিপন্ন রাজা অথবা পুত্রস্থানীয় অভিমন্যুর জন্যও আমরা তাঁর পরম আর্তি লক্ষ করব। এমনকী শত্রুপক্ষের মহাবীরদের ওপরেও তাঁর সম্মান এবং মমতা কিছু কম ছিল না। বস্তুত সর্বভূতের হিতের জন্য মহামানবের মমতা অফুরান না হলে যুধিষ্ঠিরও আমাদের মতোই শুধু স্ত্রী-পুত্র কেন্দ্রিক এক সাধারণ প্রাণী হতেন।

আসলে আমরা বলতে চাইছিলাম যে,—যুধিষ্ঠির যেমন আকস্মিকভাবে দ্রৌপদীর পদ্মোপহার লাভ করলেন, তার মধ্যে দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠির-গত প্রেম যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল অন্যতর এক 'অকারণ' পুলক—অর্জুনের সঙ্গে অতি শীঘ্রই তাঁর দেখা হবে সেই পুলক—যে পুলকে হৃদয়-হরণ নায়ক এসে পৌঁছবার আগেই আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়, হৃদয় নাচতে থাকে, দ্রৌপদী পদ্ম হাতে ছুটতে থাকেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, অন্য একজনকে নিমিত্তমাত্র ব্যবহার করে।

যাই হোক অর্জুন স্বর্গ থেকে ফিরে এলেন দিব্য-অস্ত্রের সম্ভার স্কন্ধে বহন করে। সমস্ত পাণ্ডবভাই

আনন্দে আত্মহারা হলেন। আর এই প্রথম আমরা যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয়ের প্রত্যয়ে কথঞ্চিৎ দৃঢ় হতে দেখলাম। অর্জুনকে যুধিষ্ঠির সোচ্চারে বলে উঠলেন—আজকে আমি মনে করছি সমস্ত পৃথিবী বিজিতা হয়েছে, আজকে সত্যিই মনে হচ্ছে—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের বশে আসতে বাধ্য হবে—মন্যে চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রানপি বশীকৃতান্।

পাণ্ডবদের বনবাস-কালে ভীম অজগরে পরিণত নহুষের কবলে পড়লেন এবং তাঁর মুক্তি ঘটল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অজগরের বিশাল এক সংলাপ শেষ হবার পর। এই সংলাপ মানবিক তত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ধর্মই যে সবচেয়ে বড়, এ-কথা যুধিষ্ঠিরের মুখেই আমরা প্রথম শুনতে পাই। এই সংলাপে সারাৎকার হিসেবে এ ঘটনা যুধিষ্ঠিরের দার্শনিক সত্তা প্রমাণ করার জন্য খুব বড় উদাহরণ হতে পারে, কিন্তু পাণ্ডবদের পারিবারিক ঘটনার পরম্পরায় আমরা এই দার্শনিক আলোচনা আপাতত দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। আমরা যুধিষ্ঠিরের মুখে ক্ষত্রিয়জনোচিত প্রথম প্রত্যয়ের কথা শুনেছি। পাণ্ডবদের বনবাস-কাল শেষ হয়ে আসছে। অতএব ক্ষমতার ধর্মে উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করার যে যৌধিষ্ঠিরী নীতির কথা আমরা পূর্বে উচ্চারণ করেছিলাম, এখন সেই ব্যাপারে আমাদের অবহিত থাকতে হবে।

আশ্চর্য হল—যুধিষ্ঠিরের মুখে যখনই ক্ষত্রিয়ের প্রত্যয় দৃঢ় হতে আরম্ভ করেছে, তখনই আরও একবার বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের বনবাস-ভবনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি আমরা। এর আগে কৃষ্ণ এসে দ্রৌপদীকে পরম সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বার বার বলেছিলেন—আমি যদি সেদিন থাকতাম, তা হলে সব লণ্ড-ভণ্ড করে দিতাম। কৃষ্ণের মতো অসাধারণ রাজনীতিবিদের মুখে এই সব অধীর কথাবার্তা শুনে দ্রৌপদীর সঙ্গে ভীমও ভাবতেন যে, যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞাত বনবাস-কাল সম্পূর্ণ না করেই বোধহয় কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে নামা উচিত। ভীমের মুখ দিয়ে সে-কথা স্পষ্ট করে একবার বেরিয়েওছে। ভীম বলেছিলেন—বারো বছর শেষ হবার আগেই চলুন আমরা গিয়ে দুর্যোধনদের মেরে ফেলব। শুধু অর্জুন তপস্যা করতে গেছে, তাকে বন থেকে নিয়ে আসব, আর দ্বারকা থেকে নিয়ে আসব কৃষ্ণকে—নিবর্ত্য চ বনাৎ পার্থমানায্য চ জনার্দনম্। বাস্, তারপর আক্রমণ।

ভীম যা বলছেন, কৃষ্ণ তাতে রাজি হতেন কি না, তা রহস্যই থেকে যাবে। কিন্তু রাজনীতিবিদ্যার সর্বশেষ রহস্য-জানা কৃষ্ণও যে এই বিষয়ে সময়ের অপেক্ষায় আছেন অথবা তিনিও যে হঠকারিতা করার মতো লোক নন, তা তাঁর অন্তর্দেশীয় রাজনীতি-চক্রেও বোঝা গেছে, এখনও বোঝা যাবে। কৃষ্ণ তাঁর নিজের শত্রু জরাসন্ধ-বধের জন্য বহুকাল অপেক্ষা করেছেন। আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় পালিয়ে গেছেন, সেখানেও বহুকাল অপেক্ষা করেছেন, কিন্তু নিজে থেকে জরাসন্ধের আক্রমণে যাননি। ঠিক একইভাবে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সামনে যত উষ্ণ ভাষণই দিয়ে থাকুন, আজ সপ্রশংসভাবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—রাজ্যলাভের থেকেও ধর্ম অনেক বড় কথা—ধর্মঃ পরঃ পাণ্ডব রাজ্যলাভাৎ। সত্য এবং সরলতার গৌরবে তুমি শুধু ইহলোক নয়, পরলোকও জিতে নিয়েছ। কোনও গ্রাম্য আচরণে তোমার মন লুব্ধ হয় না, কামনায় তুমি জর্জরিত নও, ধন-সম্পত্তির লোভে তুমি তোমার আপন সত্য-ধর্ম ত্যাগ কর না—সত্যিই তোমাকেই তো ধর্মরাজ বলব—তস্মাৎ প্রভাবাদসি ধর্মরাজঃ। সভ্যতা-ভব্যতা এবং ধর্ম মাথায় উঠিয়ে কৌরবরা যেভাবে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, তা তোমার মতো ধৈর্য, সহ্য এবং বুদ্ধিসম্পন্ন না হলে অন্য কারও পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হত না—অপেতধর্মব্যবহারবৃত্তং/ সহেত তৎ পাণ্ডব কস্ত্বদন্যঃ।

কৃষ্ণ পরিষ্কার যৌধিষ্ঠিরী নীতির প্রশংসা করছেন। ক্ষমা, ধৃতি, কাল-প্রতীক্ষা। শেষ বাক্যে কৃষ্ণ তাঁর রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তার প্রতিজ্ঞা করে রাখলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে—যেদিন তোমার প্রতিজ্ঞার দিন শেষ হবে, সেদিন আমরা সবাই কৌরবদের শাসন করার জন্য তোমার পাশে এসে দাঁড়াব—ইমে বয়ং নিগ্রহণে কুরূণাং যদি প্রতিজ্ঞা ভবতঃ সমাপ্তা।

পাণ্ডবদের বনবাস-কুটীরে ব্রাহ্মণ-ঋষিদের আসা-যাওয়া পূর্ববৎ চলছে। বনবাসের শেষ প্রান্তে কৃষ্ণ এসে বৃষ্ণিবীরদের সমর্থনের কথা জানিয়ে গেলেন এবং তৎকালীন রাজনৈতিক স্থিতিতে বৃষ্ণিবীরদের পাশে থাকার মূল্য অনেক। এঁরা অবশ্য আগেও তাঁর সহায় ছিলেন, কিন্তু পরিবর্তিত

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাণ্ডবরা যখন বিপন্ন বনবাসে দিন কাটাচ্ছেন, তখন এই সমর্থন জরুরি ছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে। অজ্ঞাতবাসের আগে আগেই পাণ্ডবরা যখন দ্বৈতবনে বাস করছেন তখন কতগুলি খুচরো ঘটনা ঘটে গেল। শকুনি-কর্ণের পরামর্শে দীন-হীন পাণ্ডবদের কুটীরের কাছাকাছি তাঁবু গেড়ে তাঁদের সামনে কৌরবদের সমৃদ্ধি প্রমাণের একটা ঝোঁক চাপল দুর্যোধনের। গরিব আত্মীয়ের সামনে ধনীর পোশাক পরে গাড়ি হাকিয়ে চলার যে বিকৃত আনন্দ, সেই আনন্দ পেতে চাইলেন দুর্যোধন—অসমৃদ্ধান্ সমৃদ্ধার্থঃ পশ্য পাণ্ডুসুতান্ নৃপ।

ধৃতরাষ্ট্রকে বিপরীত বোঝানো হল। দুর্যোধন কুরুবাড়ির বউদের গা ভর্তি গয়না পরিয়ে সদলবলে পাণ্ডবদের কুটীরের সামনে এসে তাঁবু গাড়লেন। কিন্তু ঘটনা যত সহজ হবে ভেবেছিলেন, তত সহজ হল না। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন আগে থেকেই সেই জায়গা দখল করে রেখেছিলেন। ফলে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধল। যুদ্ধ আরম্ভ হল গন্ধর্বসৈন্যদের সঙ্গে কৌরবদের। কৌরবরা সদলে পরাজিত হলেন। দুর্যোধন কুরুবাড়ির বউ-ঝিদের নিয়ে বন্দি হলেন গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে। মহারথ কর্ণ পালিয়ে বাঁচলেন। দুর্যোধনের মন্ত্রীরা কোনও রকমে এসে যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্যোধনের বিপদের কথা জানালেন এবং সাহায্য চাইলেন। ঠিক এইখানে মহামতি যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার দেখবার মতো।

অন্য সাধারণ কেউ হলে যা করতেন, দুর্যোধনের দুরবস্থার কথা শুনে ভীম তাই করলেন। বললেন—আমাদেরও ভালবাসার লোক আছে তা হলে—দিষ্ট্যা লোকে পুমানস্তি কশ্চিদস্মৎপ্রিয়ে স্থিতঃ। হাতি-ঘোড়া সাজিয়ে আমাদের যে কাজটা করার কথা ছিল, সেটা গন্ধর্বরাই করে দিয়েছে। বেশ হয়েছে। ব্যাটা, আমাদের খারাপ অবস্থার সুযোগ নিয়ে মেজাজ দেখাতে এসেছিলি। এখন হল তো ? আমরা সুখে বসে রইলাম, অথচ আমাদের কাঁধের ভারটা অন্য লোক টেনে দিল—যেনাস্মাকং হৃতো ভার আসীনানাং সুখাবহঃ।

যুধিষ্ঠির ভীমকে স্তব্ধ করে দিলেন। বললেন—এমন করে বোলো না, ভীম। জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ হয়েই থাকে। কিন্তু তবু জেনো, আমরা একই বংশজাত। আজকে বাইরের কোনও লোক এসে আমাদের জ্ঞাতি-ভাইদের মারবে-ধরবে, আমাদের কুলবধূদের ধর্ষণা করবে—সে আমাদের বংশের অপমান। আমাদের বংশের গৌরব রক্ষা করার জন্যই অন্তত আজ আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং তা এখনই—উত্তিষ্ঠধ্বং নরব্যাঘ্রাঃ সজ্জীভবত মা চিরম্।

যুধিষ্ঠিরকে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে আমরা কখনও দেখিনি। শরণাগতকে রক্ষা করতে হবে অথবা বংশের গৌরব রক্ষা করতে হবে—শরণঞ্চ প্রপন্নানাং ত্রাণার্থঞ্চ কুলস্য চ—এই সাধারণ রাজধর্মের কথা তো যুধিষ্ঠির বলতেই পারেন এবং ক্ষত্রিয় হিসেবে ভীম-অর্জুনের মতো ব্যক্তির কাছে সে-কথা যথেষ্ট গ্রাহ্যও হবে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই অতি সদ্‌ব্যবহারের সঙ্গে দুষ্টুমিও আছে কিছু। রাজসূয়যজ্ঞের সময় দুর্যোধনকে রাজাদের দেওয়া উপহার গোছানোর কাজ দিয়ে শান্তবুদ্ধি যুধিষ্ঠির যে মিষ্টি দুষ্টুমিটুকু করেছিলেন, সেই দুষ্টুমি এখানেও আছে।

মনে রাখতে হবে—দুর্যোধন কুলবধূ দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে অপমান করেছিলেন। আজ যুধিষ্ঠির কী মিষ্টি-মধুর বিনিময়ে সেই অপমানের শোধ তুললেন। যুধিষ্ঠির বারবার বলেছেন—দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন আমাদের অপ্রিয়-সাধনের জন্য এখানে এসেছিল। দুর্যোধন বন্দি হয়েছে। ঠিকই হয়েছে। কিন্তু দুর্যোধন বন্দি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুলস্ত্রীরা যে অন্যের হাতে বন্দি হল—তাতে আমাদের কুলের মর্যাদাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল—স্ত্রীণাং বাহ্যাভিমর্শাচ্চ হতং ভবতি নঃ কুলম্ ? জ্ঞাতি-ভাইদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে বলে বাইরের লোকের হাতে কুলস্ত্রীর মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে—ভদ্রলোকেরা অন্তত এ জিনিস সহ্য করে না—ন মর্ষয়ন্তি তৎসন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্।

বস্তুত দুর্যোধন তো তাই করেছিলেন। কুলস্ত্রী দ্রৌপদীকে বাইরের লোকের সামনে রাজসভায় এনে দুর্যোধন যে অদ্ভুত ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, আজকে ভদ্রলোকের মর্যাদা বুঝিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির শান্তভাবে তার প্রত্যুত্তর দিলেন। দুর্যোধনের অমাত্যরা তা শুনে গেলেন। আরও একটা দুষ্টুমি আছে এর মধ্যে। যে ব্যক্তি অসহায় দীন পাণ্ডবদের সামনে ধনমানের সমৃদ্ধি প্রকট করতে

এসেছিল, তাকে যদি বিপন্ন অবস্থায় রক্ষা করা যায় তবে উলটে নিজের সমৃদ্ধিটাই তাকে দেখানো যায় শান্তভাবে। দ্বৈতবনে আসবার আগে শকুনি দুর্যোধনকে বলেছিলেন—কী মজাই না হবে, যখন ঝলমলে পোশাকে আমরা গিয়ে বাকল-পরা অর্জুনকে দেখব—অভিবীক্ষেত সিদ্ধার্থো বল্কলাজিনবাসসম্। কিন্তু সেই বাকল-পরা অর্জুনই যখন বিপন্ন দুর্যোধনকে বাঁচিয়ে ফিরবেন, তখন সুদিনের আশায় যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন—দুর্যোধন বিপদে পড়ে যখন তোমার বাহুবলের ভরসায় বাঁচতে চাইছে—তার চেয়ে আনন্দের আর কী আছে—কিং চাপ্যধিকমেতস্মাৎ...জীবিতং পরিমার্গতে। দ্বৈতবনে আসবার আগে শকুনি বলেছিলেন—ধন-পুত্র-রাজ্য লাভ করেও সেই আনন্দ হয় না, যতটা হয় দুরবস্থায় পড়া শত্রুদের সামনে নিজের ঋদ্ধি প্রকট করার সময়। যুধিষ্ঠির শকুনি-দুর্যোধনের মতো বিকৃত আনন্দ পছন্দ করেন না। তিনি বললেন—একটা লোককে বরদান করলে যে আনন্দ হয়, রাজ্যলাভ অথবা পুত্রজন্মের জন্য যে আনন্দ হয়, শত্রুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মধ্যে আনন্দের সেই মর্যাদা আছে জেনো।

এও এক ধরনের ফিরিয়ে দেওয়া। যুধিষ্ঠির এই মর্যাদায় প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সেদিন যুধিষ্ঠিরের কী বিপুল উৎসাহ। তিনি বলেছিলেন—ভীম তুমি যদি না যাও তো আমি নিজে যাব—এই আমার ব্রত, এই আমার যজ্ঞ—স্বয়মেব প্রধাবেয়ং যদি ন স্যাদ্ বৃকোদরঃ। যুধিষ্ঠিরকে নিজে যেতে হয়নি। যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য ভীম-অর্জুন খুশি হয়ে মেনে নিয়েছিলেন। গন্ধর্ব-চিত্রসেনের হাত থেকে তাঁরা মুক্ত করে এনেছেন দুর্যোধনকে। ভীম-অর্জুনের সঙ্গে এসেছিলেন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন। সেদিন রাজার মতো লাগছিল যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার। দুর্যোধনের সামনেই চিত্রসেনকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেছিলেন—অনেক উপকার করলেন আমার। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অসভ্য ছেলে এই দুর্যোধন—দুর্বৃত্তো ধার্তরাষ্ট্রো'য়ম্। তবু ভাল এই দুরাত্মাকে ছেড়ে দিয়ে আপনারা আমার কুলমর্যাদা রক্ষা করেছেন—কুলং ন পরিভূতং মে মোক্ষণে'স্য দুরাত্মনঃ। বেশ আপনারা আসুন, বড় ভাল লাগল—প্রীয়ামো দর্শনেন বঃ।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে কুলস্ত্রীর মর্যাদা রাখতে হয়। সেই সামান্য বনভূমির মধ্যে গন্ধর্বের কবলমুক্ত কৌরবস্ত্রীদের সামনে কুরুবাড়ির মন্ত্রীদের দ্বারা স্তুত হতে হতে যুধিষ্ঠির ঠাণ্ডা মাথায় দুটি কথা বললেন দুর্যোধনকে—এরকম সাহস আর কোরো না, বৎস। হঠাৎ করে যারা কাজ করে তাদের ভাল হয় না, দুর্যোধন। যাও, ভাইদের সঙ্গে মনের সুখে সবাই মিলে এবার বাড়ি ফিরে যাও। আমরা তোমাদের বাঁচিয়েছি, তাতে কোনও দুঃখ, বা লজ্জা পেয়ো না—গৃহান্ ব্রজ যথাকামং বৈমনস্যং চ মা কৃথাঃ।

লজ্জা দেবার জন্যই যেন এ-কথা বলা। আরও একবার ঠিক এই রকম ভাবেই যুধিষ্ঠির কথা বলেছিলেন। সেবার দুর্যোধনের ভগ্নীপতি ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র জামাই সিন্ধুপ্রদেশের রাজা জয়দ্রথ এসেছিলেন যুধিষ্ঠিরের অরণ্যকুটীরে। পাণ্ডবরা সেদিন কেউ বাড়ি ছিলেন না। মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন। দ্রৌপদী জয়দ্রথের সামান্য আতিথেয়তা করতেই তিনি তার প্রতিদান দিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে জোর করে রথে টেনে তুলে।

জয়দ্রথ যা ভেবেছিলেন, তা অবশ্য হল না। দ্রৌপদী নিজেও বুঝি সে ব্যাপারে নিশ্চিন্তই ছিলেন। তাই প্রথম দিকে জয়দ্রথের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টি করেও শেষ পর্যন্ত নিজেই জয়দ্রথের রথে উঠে পড়েছেন দ্রৌপদী। তিনি জানতেন যে, তাঁর পাঁচ স্বামীর কেউ না কেউ ঠিক খবর পাবেন এবং তাঁকে উদ্ধার করবেন। সত্যিই পাঁচ ভাই মৃগয়া সেরে ফেরার পথেই খবর পেয়ে গেলেন— জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করেছেন। একসঙ্গে তাঁরা অনুসরণ করলেন জয়দ্রথের রথবর্ত্ম। জয়দ্রথ দেখতে পেলেন পাণ্ডবদের রথ আসছে। এঁদের কথা তিনি অনেক শুনেছেন বটে, তবে এঁদের শক্তি এবং মর্যাদা তেমন করে জানেন না জয়দ্রথ। তিনি দ্রৌপদীকেই প্রশ্ন করলেন—মনে হচ্ছে, এঁরাই তোমার স্বামীরা, তা এঁদের কার কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা একটু বল দেখি বুঝিয়ে।

দ্রৌপদী বলেছেন— নিশ্চয়ই বলব। মৃত্যু-পথযাত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করাটা আমার ধর্ম—আখ্যাতব্যং ত্বেব সর্বং মুমূর্ষোঃ। দ্রৌপদী প্রথমেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা বলেছেন। তাঁর সৌম্য

সুন্দর চেহারার বর্ণনা দিয়ে দ্রৌপদী জানিয়েছেন— ওই যে দেখছেন সোনার বরণ গায়ের রং, দীর্ঘ আয়ত দুটি চোখ, সবাই ওঁকে কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করে— এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং বদন্তি। ইনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। চেহারার বর্ণনা দিয়েই দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তি-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করছেন। আশ্চর্য হল— সেটা কোনও 'যুদ্ধবীর ধীরোদাত্ত বা ধীরোদ্ধত নায়কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নয়। সে চরিত্র এমনই এক প্রশান্তি আর ক্ষমতার মায়া দিয়ে তৈরি যে, অন্য মানুষের কাছে তার প্রথম পরিচয়টাও তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

দ্রৌপদী বললেন— শত্রুও যদি এই ধর্মচারী মনুষ্য-বীরের শরণাগত হয়, তবে ইনি তাঁর জীবন দান করেন। কথাটা বলেই দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বাঁচবার পরামর্শ দিয়ে অন্তত যুধিষ্ঠিরের শরণ গ্রহণ করতে বললেন। বললেন— ওরে বোকা! এখনও যদি বাঁচতে চাস তো তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই যুধিষ্ঠিরের পায়ের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়া— পরেহ্যেনং মূঢ় জবেন ভূতয়ে/ ত্বমাত্মনঃ প্রাঞ্জলি র্ন্যস্তশস্ত্রঃ। নিজের অভিজ্ঞতায় দ্রৌপদী এ-কথাটা যথেষ্টই জানেন যে, জয়দ্রথ যদি তাঁর অন্য স্বামীদের, বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয়-স্বামী ভীমের হাতে পড়েন, তবে তিনি বেঁচে ফিরবেন না এবং কোনও অজুহাতও তাঁর কাছে খাটবে না। কিন্তু হাজারো অন্যায় করেও যদি যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ানো যায়, তবে সেই আপাতদৃষ্ট অনুতাপ-গ্রস্ত পাপিষ্ঠকে প্রায় খ্রিস্টীয় করুণায় ক্ষমা করে দেবেন যুধিষ্ঠির।

কিন্তু জয়দ্রথ দ্রৌপদীর কথা মোটেই শোনে নি। তিনি তাঁর মহান সৈন্য-বাহিনীকে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ভীমার্জুনের সম্মিলিত আক্রমণে তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং জয়দ্রথ রণে-ভঙ্গ দিয়ে পলায়নে মন দিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে ছেড়ে— পলায়নমনাভবৎ। কিন্তু পালাতে চাইলেই বা তিনি পালাবেন কোথায়? ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেই দিলেন— আপনি দ্রৌপদীকে নিয়ে কুটীরের অভিমুখে যাত্রা করুন, জয়দ্রথ আমার হাত থেকে বেঁচে ফিরবে না—ন হি স মোক্ষ্যতে জীবন্ মূঢ়ঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ।

যুধিষ্ঠির মধ্যম-পাণ্ডবের এই ক্রোধমূর্তি চেনেন এবং তাঁর কথা যে শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হবে, তাও তিনি ততক্ষণে বুঝে গেছেন। এক লহমার মধ্যে তাঁর সুদূরদর্শী চক্ষুতে দুটি করুণ নারীমুখ উদয় হল। তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন— জয়দ্রথ ভীমের হাতে মারা গেছেন এবং তাঁর মৃত শরীরের উপরে আছড়ে পড়েছেন একটি বিধবা রমণী, যিনি সম্পর্কে তাঁর জ্যাঠতুতো বোন দুঃশলা। আর এক রমণী বৃদ্ধা মাতৃসমা, যাঁর বদ্ধনেত্র থেকে জলধারা নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি হস্তিনাপুরবাসিনী গান্ধারী। জামাতার অন্যায় জেনে তাঁকে তিনি সমর্থনও করতে পারবেন না, অথচ বিধবা কন্যার জন্য পটবদ্ধ-চক্ষু থেকে তাঁর অবিরাম জলধারা নির্গত হবে।

আগেই বলেছিলাম— যুধিষ্ঠির সব দেখতে পান। অতি বিপন্ন এবং চরম মুহূর্তেও সবার কথা তাঁর মনে থাকে। অতএব যে মুহূর্তে ভীম বললেন— ব্যাটা বাঁচবে না আমার হাত থেকে— সেই মুহূর্তেই তিনি সকরুণ আর্তনাদে বলে উঠলেন— যত অসভ্যতাই করুক ওকে একেবারে মেরে ফেলো না ভীম। দুঃশলা ভগিনীর কথা মনে রেখো। মনে রেখো জননী গান্ধারীর কথা— দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্। আপনারাই একবার ভাবুন— যার স্ত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এক অশিষ্ট লম্পট, তাকে শাস্তি দেবার চরম মুহূর্তে কি শত্রুপুরবাসিনী দুটি নিরীহ অসহায় নারীর কথা একবারও মনে আসবে আমাদের?

স্বয়ং দ্রৌপদীও তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীর এই ভালমানুষি সহ্য করতে পারেননি। ভীমকে তিনি বলে দিয়েছিলেন— যদি আমার প্রিয়ত্বের কথা ভাব, তবে জয়দ্রথকে হত্যাই করবে। ভীম জয়দ্রথকে ধরে ফেলেছিলেন এবং যেভাবে তিনি তাঁকে মারতে আরম্ভ করেছিলেন, তাতে তাঁর মৃত্যু অবধারিত ছিল। সেই অবস্থায় এই হত্যাকাণ্ড থেকে তাঁকে বিরত রেখেছিলেন অর্জুন, যিনি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা এবং শিষ্য বলে পরিচিত। জয়দ্রথকে যখন যুধিষ্ঠিরের কাছে ধরে আনা হল তখন ভীম তাঁর সমুচিত প্রতিক্রিয়ায় দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। ভীম পূর্বাহ্নেই জয়দ্রথের মাথার চুল খানিকটা খানিকটা কামিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষত্রিয় বীরের কাছে এই অপমান ছিল মৃত্যুর মতোই। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের এই অবস্থা

দেখে করুণ হাস্যে ভীমকে বলেছিলেন— অনেক হয়েছে। এবার ছেড়ে দাও ভাই— তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতামিতি চাব্রবীৎ।

ভীম কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কথা শোনেননি, উলটে তাঁকে বলেছেন— আপনি দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন— অর্থাৎ সোজা কথায়, দ্রৌপদীর অনুমতি নিতে হবে এই বাবদে, শুধু যুধিষ্ঠিরের কথায় হচ্ছে না। জয়দ্রথের কামানো মাথাটি তাঁর নিজের কাছে যতটা অপমানকর ছিল, সবার সামনে ভীমের এই অতিক্রমও যুধিষ্ঠিরের কাছে অপমানকর ছিল সমান। তাঁর মতো মর্যাদার মানুষের নির্দেশ অনুজ ভাইরা শুনছে না, অথবা সবার সামনে তাঁকে স্ত্রীর নির্দেশ মেনে নিতে বলছে— এই অপমানও যুধিষ্ঠিরের কাছে খুব কম কষ্টকর নয়। কিন্তু কষ্টকর হলেও যুধিষ্ঠির প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবেন— এমন ব্যক্তিত্ব তিনি নন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনই যে, ওই অপমানকর কথা শুনেও তিনি আবারও তাঁর পূর্ব বক্তব্যই উচ্চারণ করবেন এবং সেটা আরও মধুর করে। কিন্তু সেই মধুর উচ্চারণের মধ্যেই এমন দু-একটি শব্দ থাকবে, এমন দৃঢ় উন্নত এক মর্যাদা থাকবে যাকে অতিক্রম করা ভীষণই কঠিন হবে।

ভীম যেমন বলেছিলেন তাতে মনে হবার কথা যেন দ্রৌপদীই এখানে শেষ কথা বলবেন। যুধিষ্ঠির ভীমের ওই কথা শুনেও কিন্তু দ্রৌপদীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। জিজ্ঞাসা করলে দ্রৌপদীর দিক থেকে এমন অনেক কথা আসতে পারত, যা তাঁর কাছে রুচিকর হত না। অথচ দ্রৌপদীই যেহেতু এখানে প্রধান বিপন্নতার শিকার, তাই দ্রৌপদীর দিকে না তাকিয়েও ভীমকে বলে তিনি যেন দ্রৌপদীকেই অনুরোধ করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন— আমাদের মতো মানুষের কথা যদি প্রমাণ বলে মনে কর তবে এই পুরুষাধমকে ছেড়ে দাও— মুঞ্চেমমধমাচারং প্রমাণা যদি তে বয়ম্।

দ্রৌপদী এতক্ষণ ধরে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধ-স্থিতিতে দাঁড়িয়ে জয়দ্রথকে হত্যা করার কথা বলেছেন এবং ভীমকেও তিনি সেইমতো প্রস্তুত করে ফেলেছেন। কিন্তু এই যে নিস্তরঙ্গ ব্যক্তিত্ব, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্যের ওপরে উঠে যুধিষ্ঠির যখন আপন মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সামনে একবার-দুবার প্রতিবাদ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ওই সর্বহিতৈষিণী দৃঢ়-বাক্যের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ নিজের মত টিকিয়ে রাখা যায় না। দ্রৌপদীকে তখন পূর্বের বলা-কথা গিলে নিয়ে বলতে হয়— ঠিক আছে, ছেড়েই দাও, ভীম! ওর মাথাটা তো কামিয়েই দিয়েছ, ওতেই যথেষ্ট অপমান হয়েছে। আর ও তো আমাদের দাসত্বও স্বীকার করেছে।

দ্রৌপদীর কথায় ভীম জয়দ্রথকে ছেড়ে দিলেন। জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরকে কৃতজ্ঞতার অভিবাদন জানালে, যুধিষ্ঠির বললেন— যাও, তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। কোনও দিন যেন এমন পাপ আর করতে যেয়ো না। একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হওয়ার দরুন যুধিষ্ঠির জানেন যে, জয়দ্রথের কতটা অপমান হয়েছে। ভীম কিংবা দ্রৌপদী সেটা বুঝতে পারেন না। পারা সম্ভবও নয়। কারণ দ্রৌপদীর সঙ্গে জয়দ্রথ যে ব্যবহার করেছেন, তার প্রতিরোধ-বৃত্তিতে ভাবনা করলে জয়দ্রথের মুক্তি অসম্ভব ছিল। কিন্তু ওই মুহূর্তে জয়দ্রথের মনে কী হচ্ছে, সেটা তেমন মানুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব, যিনি শত্রুরও সহমর্মিতায় দায়বদ্ধ। জয়দ্রথকে মুক্তি দেবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁকে বলে দিলেন— তোমার বুদ্ধি ধর্মে স্থিত হোক, কখনও অধর্মে মন দিয়ো না— ধর্মে তে বর্ধতাং বুদ্ধির্মা চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ।

জয়দ্রথের মন মোটেই ধর্মে স্থিত হয়নি, বরঞ্চ স্থিত হয়েছে প্রতিহিংসায়। কারণ তিনি যুধিষ্ঠির নন। জয়দ্রথ মুক্তি পেলেন যুধিষ্ঠিরের করুণায়। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি— একই অবস্থায় সকলে যা করে, যুধিষ্ঠির তা করেন না। দুর্যোধন বনের মধ্যে এসে যে উৎপাত করেছেন, জয়দ্রথ যেভাবে পাণ্ডবদের প্রিয়া পত্নীকে হরণ করেছেন, তাতে অন্য কেউ হলে, এবং সত্যিই যদি তাঁর বল-বীর্য হত ভীম কিংবা অর্জুনের মতো, তাহলে দুর্যোধন এবং জয়দ্রথ কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতেন না। কিন্তু এই ক্রুদ্ধ-বিপন্ন মুহূর্তেও কুলবধূদের মর্যাদার কথা ভাবা, কিম্বা জয়দ্রথকে হত্যার অঙ্গীকার প্রায় সমুচিত জেনেও একমাত্র যুধিষ্ঠিরই সেখানে দুঃশলা ভগিনী কিংবা জননী গান্ধারীর

হৃদয় মনে রাখতে পারেন।

বিচিত্র এই যৌধিষ্ঠিরী নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ লুকিয়ে আছে বনপর্বের শেষে, যখন ধর্মরূপী যক্ষ সেই বিষ-সরোবরের ধারে আসা প্রত্যেক পাণ্ডব-ভাইকে জলস্পর্শের কারণে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ধর্মরূপী যক্ষের বায়না ছিল— তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবে জলস্পর্শ করতে হবে। যুধিষ্ঠির হঠকারিতা করেননি ; হঠকারিতা করা তাঁর অভ্যাসই নয়। তিনি যথাসাধ্য উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যক্ষের প্রশ্নোত্তর-পর্ব মোটেই গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়নি। যক্ষের প্রশ্নগুলি শুনলে মনে হবে— এ তো একেবারেই সহজ কথা। সামান্য পড়াশুনো থাকলেই যক্ষের প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই যেন উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু ধর্মরূপী যক্ষ এমনই এক মাষ্টারমশাই যিনি প্রশ্ন করেন সহজ, কিন্তু, উত্তরটা চান একেবারেই অসাধারণ। এমনই সে উত্তর, যা শত শাস্ত্রের নোটবই মুখস্থ করে দেওয়া যাবে না। নিজের জীবন মন্থন করে, শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে হাজারো মুনি-ঋষির উপদেশ মন্থন করে যে সারটুকু উঠবে, সেই সার থেকেই শুধু ধর্ম-যক্ষের প্রশ্ন সমাধান করা যায়।

যুধিষ্ঠির বনে নির্বাসিত হয়েও প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলে মরছেন না। তিনি যেখানেই থাকেন, সেখানেই ক্ষত্রিয়ের জ্যাঘোষের সঙ্গে ব্রহ্মঘোষ মিলিত হয়। অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে যুধিষ্ঠির মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে নানা উপদেশ শুনে গেছেন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তীর্থের পর তীর্থ ঘুরে বেড়িয়েছেন। বারো বচ্ছর বনবাসের পর যুধিষ্ঠির এখন আরও শান্ত, আরও দান্ত আরও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এর ফলে অতি সাধারণ কথাও তাঁর কাছে গভীর অন্বীক্ষার বিষয়। যুধিষ্ঠির যদি সেই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেন, তা হলে বোঝা যাবে কোনও প্রশ্নই সাধারণ নয়। জয়দ্রথকে হত্যার প্রশ্নে যখন তাঁর মনে দুঃশলা-গান্ধারীর চকিত আবির্ভাব ঘটে, এই প্রশ্নোত্তরপর্বেও দেখব— যা আমরা কখনও ভাবিনি, অথচ ভাবা উচিত ছিল, সত্যিই ভাবা উচিত ছিল, যুধিষ্ঠির সেই সত্যটা উচ্চারণ করেন। সেই সত্যটা এমন সাংঘাতিক, এমন নির্মম যে, আমাদের ভাবতে ভয় করে বা অস্বস্তি লাগে বলেই যেন আমরা ভাবি না। অথচ যুধিষ্ঠিরের সারা জীবনের নীতিবোধ, জীবনবোধ এবং সার্বিক ভাবনা আমাদের সেই ভয় এবং অস্বস্তির দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করে বুঝিয়ে দেবে— তুমি ঠিক ভাবনি, তোমার ভাবনায় গলতি আছে। তুমি সবার কথা ভাবনি, শুধু নিজের কথা ভেবেছ। আর এটা বোঝার পরেই যুধিষ্ঠিরের ওপর আপনার রাগ হবে, ক্ষোভ হবে, লোকটাকে নীতিবাগীশ বলে গালাগালি দিতে থাকবেন, কিন্তু সবার শেষে ওই দ্রৌপদী, ওই ভীমের মতো তাঁর সর্বময় সর্বহিতকর-ব্যক্তিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবেন।

যক্ষ যখন জিজ্ঞাসা করবেন— আচ্ছা ! জ্ঞান কাকে বলে অথবা দয়া জিনিসটাই বা কী, তখন আমি-আপনি বলব— আরে ভাল করে পড়াশুনো করলেই জ্ঞানলাভ হয়। আর দয়া ? গরিব মানুষকে একটু-আধটু সাহায্য করলেই সেটা দয়া। যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বলবেন— জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ— জ্ঞান হল যেটা যা, তার স্বরূপটি ঠিকঠাক বোঝা। এই জ্ঞানের পরিণতি আত্মচৈতন্যের উপলব্ধিতে। আর দয়া ? দয়া সর্বসুখৈষিত্বম্, অর্থাৎ দয়া হল সবার সুখের জন্য চেষ্টা করা। গরিবকে দুটো পয়সা দিয়ে ভালমানুষি করলাম আর বড়লোককে ঝাঁটা-পেটা করলাম— এটা দয়া নয়। দয়া মানে সকলের সুখচেষ্টা, বিশ্বজনহিতায়।

এই সামান্য কথা শুনলেই বোঝা যায়— যুধিষ্ঠিরের ভাবনাগুলি এক অন্যতর খাতে বইছে, এ সব ভাবনা আমার-আপনার মতো নয়। আমরা যদি যক্ষের প্রশ্ন শুনতাম— আচ্ছা স্থৈর্য, ধৈর্য এ সব কী ? স্নান করা বা দান করা— এ সবই বা কাকে বলে। আমরা উত্তরে বলতাম— স্থিরতাই স্থৈর্য কোনও ঘটনায় আকুল-ব্যাকুল না হওয়াই তো স্থৈর্য, আর ধীরতা বা ধৈর্যও ওই একইরকম জিনিস— ধীর থাকা। যুধিষ্ঠির বলবেন— নিজের ধর্মে ঠিক থাকাটাই হল ধৈর্য— স্বধর্মে স্থিরতা ধৈর্যম। আপনারা বলবেন— এও কি কোনও ধর্ম হল ? ধর্ম বলতে চাল-কলা-নৈবেদ্য বলুন ঠিক আছে ; এমনকী স্বধর্ম বলতে ব্রাহ্মণের যজন-যাজন-অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসন-প্রজাপালন ইত্যাদি বলুন, তাও বুঝি। কিন্তু যে কোনও মানুষের স্বধর্মে স্থিরতা— এ তো যেন কেমন কঠিন কথা। সহজ

প্রশ্নের কঠিন উত্তর। ভেবে দেখুন— যিনি যে কাজটি করেন, দিনের পর দিন সে কাজের একঘেঁয়েমি তাঁকে পেয়ে বসে। এই অবস্থায় যদি প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজটি করতে চায় এবং তা সুষ্ঠু ভাবেই করতে চায়, তবে তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্থিরতা। যে ছাত্র, তার স্বধর্ম পাঠাভ্যাস ঠিক রাখতে গেলে যে স্থিরতা দরকার, ঠিক সেই স্থিরতাই দরকার একজন করণিকেরও, একজন চিকিৎসকেরও, একজন শিক্ষকেরও।

তা হলে দেখা গেল, আমাদের স্থৈর্যের চিন্তা-ভাবনা একরকম, যুধিষ্ঠিরের স্থৈর্য-চিন্তা আরেক রকম। একইভাবে যুধিষ্ঠিরের ভাবনায় 'ধৈর্য' শুধুমাত্র মানসিক ধীরতা নয়, ধীরতা হল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এমনই এক গভীর তত্ত্ব, যা অভ্যস্ত হলে কাম-ক্রোধ-লোভ আপনিই প্রশমিত হবে। যুধিষ্ঠির এই মূলটাকে ধরেন, একেবারে মূল, যেখান থেকে সমস্যাটা আরম্ভ হয়। এই মৌলিক ভাবনায় 'স্নান' ব্যাপারটা জলস্নান নয় মোটেই। স্নান হল মনের ময়লা দূর করা, আর দান মোটেই করুণার দান নয়। মুদ্রা দুই-চারি দানের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের দান-মাহাত্ম্য নিহিত নয়, তাঁর দান মানেই গভীর এক অর্থবোধ। দানং বৈ ভূতরক্ষণম্— দান সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করে।

এমনতর ছোট-বড় নানান প্রশ্নোত্তরেই যুধিষ্ঠিরের অনন্যতা বোঝা গিয়েছিল। এই অনন্যতা চরমে উঠল যক্ষের চারটিমাত্র প্রশ্নে। যক্ষ বললেন— কে সবচেয়ে আনন্দে আছে ? যুধিষ্ঠির বললেন— যে মানুষ নিজের দেশে থাকতে পারে, সেই মানুষ যদি ধার-কর্জ না করে দিনের শেষে নিজের ঘরে চারটি শাক-ভাত খেতে পারে, তবে তার চেয়ে আনন্দে আর কেউ নেই।

আমার প্রথম বয়সে ভেবেছি— এ আবার কীরকম আনন্দ ? শাক-ভাত খেয়ে কি কেউ আনন্দে থাকতে পারে ? এখন এই বয়সে এসে বুঝি— শাকান্নেই পরম আনন্দ, যদি না তার মধ্যে দরিদ্রতার অতৃপ্তিটুকু না থাকে। এখানে যক্ষ-প্রশ্নে না থাকলেও অন্য এক মহাপুরাণে এই প্রশ্ন শুনেছি— দরিদ্র কাকে বলে ? উত্তরটা এসেছে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকেই। আসল দরিদ্র হল সেই, যে সব সময় অসন্তুষ্ট। সন্তুষ্টি, আত্মতৃপ্তিই হল ধন-সম্পত্তির প্রধান লক্ষণ। এই নিরিখে দেখতে গেলে দিনান্তে শাকান্ন-ভোজী এক দরিদ্র ব্যক্তিও শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির গুণে পরম ধনী হয়ে উঠতে পারেন এবং গৃহস্থের ঘর-সংসার সামলেও পরম আনন্দে থাকতে পারেন।

অথচ দেখুন, আমরা এমন করে কখনও ভাবিনি। অথবা ভাবুন সেই পরম আশ্চর্য বস্তুটির কথা— তাও কি আমরা সেইভাবে ভেবেছি। আমাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে নিয়ত নতুন আবিষ্কারেই আমরা শুধু আশ্চর্য হই, চমৎকৃত হই। কিন্তু কখনও কি ভেবেছি যে, দিনের পর দিন কত মানুষ মারা যাচ্ছে, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে কত শত কালপক্ব শরীর। অথচ আমরা ভাবছি— আমরা থাকব, আমাদের গতায়ু হতে বিলম্ব আছে। সত্যিই তো, এর থেকে আশ্চর্য আর কিছু নেই।

এ ছাড়া যক্ষের সেই প্রশ্নটাও তো সাংঘাতিক— পথ কাকে বলে ? কত সহজ সরল প্রশ্ন ! অথচ বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, ছ-ছ'টা আস্তিক দর্শনের তর্ক-যুক্তির সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করেও যুধিষ্ঠির সেই যুগে বলতে পেরেছেন— দেখ বাপু ! দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের ব্যাপারে তর্ক-যুক্তি কখনও শেষ কথা বলতে পারে না ; শ্রুতি-স্মৃতির বিভিন্ন প্রস্থান, ঋষি-মুনিদের ভিন্ন ভিন্ন মত, একজনের সঙ্গে আরেক জনের কোনও মিল নেই—এই অবস্থায় কাউকে শেষ প্রমাণ বলে মানা যায় না— তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না/নৈকো ঋষি-র্যস্য মতং ন ভিন্নম্। যুধিষ্ঠির বললেন— ধর্মের সত্য-তত্ত্ব কোন গুহায় নিহিত আছে জানি না। ধর্মশাস্ত্রের শাসন আর অনুশাসনের সহস্র পথ বাদ দিয়ে তাই সেই পথেই যাওয়া ভাল, যে পথে বহু মানুষ গেছে। পথ সেইটাই।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে শাস্ত্র নয়, মুনি-ঋষির অনুশাসন নয়, বহুজনের পদ-প্রশস্ত পথই পথ— এ কথা বলা অত সহজ ছিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরই শুধু এমন কথা বলতে পারেন, কেননা তিনি অন্য মানুষের মতো কথা বলেন না। আরও একবার সেই বিলক্ষণ স্বভাব ফুটে উঠবে যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংলাপের শেষকল্পে। ধর্মরূপী যক্ষ পুত্র যুধিষ্ঠিরের সমস্ত উত্তর শুনে পরম প্রীত হয়ে বললেন— তোমার ভাইদের মধ্যে একজনের অন্তত প্রাণ ফিরিয়ে

দিতে পারি আমি। তুমি কাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাও বল— তস্মাত্ ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু।

চতুষ্পাণ্ডবের একতমকে তা হলে বাঁচিয়ে তোলা যাবে। যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র নকুলের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। ভীম নয়, অর্জুন নয়, নকুল। ধর্মরূপী যক্ষ ঠিক আমাদের মতোই অবাক হলেন। বললেন— কেন ভীম তো তোমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই। আর অর্জুন ? সেই তো তোমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা-ভরসা। তাঁদের ছেড়ে তুমি তোমার মায়ের সতীন-পো নকুলকে বাঁচাতে চাইছ কেন— সাপত্নং জীবমিচ্ছসি ? তুমি একবারও একটু ভেবে দেখলে না ? যাঁর গায়ে হাজার হাতির বল, ভবিষ্যতে যাঁকে তোমার কাজে লাগবে, তাঁকে বাদ দিয়ে তুমি কিনা নকুলকে বাঁচাতে চাইছ ? যে বাহুবলের জন্য অর্জুনকে তোমরা সব সময় মাথায় তুলে রাখ, সেই অর্জুনকে বাদ দিয়ে তুমি কিনা নকুলকে বাঁচাতে চাইছ ? এ কেমন বুদ্ধি ?

যুধিষ্ঠির তাঁর বিলক্ষণ-উত্তর দিলেন আবার। বললেন— ধর্ম। বুদ্ধি নয়, ধর্ম। ধর্ম যদি একবার বিপর্যস্ত হয়, তবে সেই ধর্মই মানুষকে হত্যা করে। আর ধর্মকে যদি সদা-সর্বদা রক্ষা করে চলা যায়, তবে সেই মানুষকে রক্ষা করে— ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। আমি কোনও পরমার্থ চাই না, যক্ষ ! আমি চাই সর্বত্র আমার অনৃশংসতা বজায় থাকুক, সেই আমার ধর্ম। আমার পিতার ধর্মপত্নী দু'জন। কুন্তী এবং মাদ্রী। তাঁদের দু'জনেই অন্তত পুত্রবতী থাকুন, এই আমার অভিলাষ— ইতি মে ধীয়তে মতিঃ। আমার দুই জননী কুন্তী এবং মাদ্রীর মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য করি না। নকুল যদি বেঁচে ওঠে, তবে আমার দুই মায়ের মধ্যে সেই সমতা আসে, যে সমতা আমি চাই— মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু। কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র আমি বেঁচে আছি, আর আমার দ্বিতীয়া-জননী মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুল বেঁচে উঠুক। তাতে আমার দুই জননী সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এ হল সেই সহৃদয়তা যাতে এই বিপন্ন সময়েও তাঁর মৃতা জননীটি কথা মনে আছে। তুলনায় অন্য পাণ্ডবভাইদের' চেয়ে দুর্বল বলে, ভবিষ্যতে কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধে নকুল ভীম-অর্জুনের মতো কার্যকরী হবেন না বলে নকুলের জীবনের কোনও মূল্য নেই— এই নৃশংসতা যুধিষ্ঠিরকে মানায় না। সমস্ত পরমার্থের চেয়েও আজকে সেই প্রেতা জননীর আকাশ-দৃষ্টি তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। স্বর্গস্থা হয়েও সেই জননী যাতে না বলতে পারেন— তোমার মায়ের পেটের ভাইই তোমার কাছে বড় হল, বাছা। আমি কি তোমার পিতৃকুলের ধর্মপত্নী নই যে আমার সব পুত্রগুলিকেই মরণের পথে ঠেলে দিলে ? যুধিষ্ঠির কী করে এই পূর্বমৃতা জননীর দুঃখ সইবেন ?

আমরা জানি— ওই অসাধারণী সর্বকল্যাণময়ী যুক্তির পরে শুধু নকুল কেন, সমস্ত পাণ্ডবভাইরা এবং দ্রৌপদীও বেঁচে উঠেছেন ধর্মের করুণায়। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, যুধিষ্ঠিরকে, নিজের পুত্রকে। তিনি দেখে গেলেন যে, কপট পাশায় বিতাড়িত হয়ে বারো বছর বনবাস যাপন করার পরেও ক্রোধ, লোভ অথবা কোনও স্বার্থপরতা যুধিষ্ঠিরকে এতটুকু অস্থির করেনি। তিনি স্থিত হয়ে আছেন চিরন্তন এবং শাশ্বত ধর্মের অনুশাসনে। মানবিকতার সমস্ত সাধারণ গুণ নিয়েই তিনি অসাধারণ। স্বয়ং ধর্মের দ্বারা পরীক্ষিত যুধিষ্ঠির ধর্মের পরীক্ষায় যেমন উত্তীর্ণ হলেন, তেমনই উত্তীর্ণ হলেন বারো বছরের বনবাসের পরীক্ষায়। তাঁর এবং তাঁর ভাইদের বনবাস-পর্ব শেষ হল। এবার এক বছরের অজ্ঞাতবাস।

৬

শুধু মহত্ব, মহত্ব আর বদান্যতা— শুধু এই নিকষ-ভাল দিয়ে যদি একটি মানুষের চরিত্র তৈরি হয়, তবে সেও বড় একঘেঁয়ে হয়ে ওঠে। যুধিষ্ঠিরও প্রায় তাই হয়ে উঠেছেন। তবু ভাল, যে পাশা-খেলার জন্য তাঁকে সবার কাছে দিনরাত ধিক্কার শুনতে হচ্ছে, সেই পাশাখেলাটা তিনি তত ভাল জানতেন না, অথচ পছন্দ করতেন। অসংখ্য ভালর মধ্যে এই একটুখানি মন্দ ছিল বলেই আবারও আমরা একটু হাঁপ ছাড়তে পারছি। যুধিষ্ঠিরের কী পাশাখেলার নেশা ! অত গালমন্দ শুনে অত

বিপদে পড়েও তাঁর লজ্জা নেই। বিরাটরাজার' বাড়িতে অজ্ঞাতবাসের ছদ্মবেশ ধারণ করার আগে তিনি সহাস্যে বলছেন— আমি বেশ বিরাটরাজার সভাসদ সেজে থাকব। আমার নাম হবে কঙ্ক। বিরাটরাজার সঙ্গে পাশা খেলে তাঁর মনোরঞ্জন করব। যুধিষ্ঠির এবার পাশার ঘুঁটিগুলি স্মরণ করে অদ্ভুত উচ্ছ্বাসে বলে ফেললেন— ওঃ ভাবতেই কেমন লাগছে! বৈদুর্যমণির মতো নীল নীল ঘুঁটি, সোনার মতো হলুদ রঙের ঘুঁটি, লাল, সাদা এই চার রঙের ঘুঁটির সারি চালিয়ে যখন খেলব, তখন লাল-কালোর দান ফেলতে কী মনোরমই না লাগবে— কৃষ্ণাক্ষাল্লোহিতাংশ্চৈব নির্বৎস্যামি মনোরমান্।

মহাকাব্যের কবি শুধু একখানি পাশার দান ফেলে দেবতা-প্রতিম যুধিষ্ঠিরকে আবারও এক মুহূর্তে মানুষ করে তুললেন। সারা বনপর্ব জুড়ে অসংখ্য ঋষি-মুনির বিচিত্র সদুপদেশ শুনতে শুনতে যুধিষ্ঠির প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে দুর্যোধন এবং জয়দ্রথ যদি বা কিছু মনুষ্যোচিত মুক্তি দিয়ে থাকে, তবে বিরাটরাজার নতুন দেশও তাঁর কাছে এক নবতর মুক্তি, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাই থাকুক— মানুষের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধবাসরে এইজন্যই কি বিরাট-পর্ব পাঠের বিধি— epic relief? যাই হোক যুধিষ্ঠির একে একে তাঁর চার ভাইয়ের অজ্ঞাতবাসের পরিকল্পনাও শুনলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব— সবারই অজ্ঞাতবাসের পরিকল্পনা শুনে যুধিষ্ঠির এবার কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর কথায় এলেন। যুধিষ্ঠির বললেন— কৃষ্ণা-পাঞ্চালী আমাদের সকলের প্রিয়া পত্নী। মায়ের মতো তাঁকে যত্নে রাখা দরকার, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতো সে আমাদের সম্মান পাবার যোগ্য— মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা।

বস্তুত এই একটি পংক্তির মধ্যেই দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের আপন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করি। তরুণ-তরুণীর সতত বার্যমান প্রেম নয়, বিবাহিত যুবক-যুবতীর সতত সুলভ দাম্পত্য প্রেমও নয়— এ এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি। বেশি বয়সের পুরুষের সঙ্গে অল্পবয়সী বালিকার বিবাহ হলে, সে বালিকা যেমন দাম্পত্য প্রেমের পরিবর্তে স্বামীর স্নেহরসেই বেশি সিক্ত হয়, যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্রৌপদীও প্রায় সেইরকম। সারাক্ষণের জ্ঞানচর্যা আর সত্যের নিষ্ঠায় যুধিষ্ঠির নিজের সংসারে বৃদ্ধ কর্তাটির মতো হয়ে গিয়েছেন। তিনি দ্রৌপদীর মতো এক রমণীর এক-পঞ্চমাংশ স্বামীত্ব লাভ করে, তাঁকে স্নেহ ছাড়া আর কীই বা দিতে পারেন? নতুন শ্বশুরবাড়ি যাবার মুখে কন্যার পিতা যেমন করেন, যুধিষ্ঠির সেই ভাবনায় বলে ওঠেন— অন্য বউ-ঝিরা যেমন ক্লিষ্ট-কর্ম করতে পারে, কৃষ্ণা যে তেমন কিছু পারেই না— ন হি কিঞ্চিদ্ বিজানাতি কর্ম কর্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ। সে সুকুমারী, ছেলেমানুষ— সুকুমারী চ বালা চ— তার ওপরে রাজার ঘরের মেয়ে। যেখানেই গেছে, কাজকর্ম তো করতে হয়নি, শুধু ফুলের মালার গন্ধ, গয়না-গাঁটি আর জামা-কাপড়— এইগুলোই ও বোঝে— এতান্যেবাভিজানাতি যতো যাতা হি ভাবিনী। কী করে যে বিরাটরাজার ঘরে অন্যের অজ্ঞাত হয়ে দ্রৌপদী থাকবে— তাই তো ভাবছি।

যুধিষ্ঠিরের ভাবনাটুকু মিথ্যে নয়, কিন্তু এই ভাবনা যৌবনোদ্দীপ্তা রমণীর প্রেমিকের মতো, নাকি সুখচ্ছায়াপ্রতিপালিতা কন্যার পিতার মতো— তা সহৃদয়ের অনুভববেদ্য। আমরা জানি, দ্রৌপদী তাঁর কাজ খুঁজে পেয়েছিলেন বিরাটপত্নী সুদেষ্ণার কেশপরিচর্যায়। কিন্তু সারা বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠিরের কৃত্য কিছু নেই, শুধু রাজার সঙ্গে পাশা-খেলা ছাড়া। এমনকী বিরাটপর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে যদি রাজশ্যালক কীচকের উপদ্রব একটা রীতিমতো বড় ঘটনা হয়ে থাকে, তবে সেখানেও যুধিষ্ঠিরের অনুপ্রবেশ নিতান্তই সামান্য, যদিও সে অনুপ্রবেশ ঘটনার গুরুত্বে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। দ্রৌপদীর রূপে মোহাবিষ্ট কীচক যখন দ্রৌপদীকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এলেন রাজসভায় এবং বিচার-প্রার্থিনী দ্রৌপদীকে লাথিও মারলেন, তখন রাগে যুধিষ্ঠিরের কপালে ঘাম জমে গিয়েছিল— যুধিষ্ঠিরস্য কোপাত্তু ললাটে স্বেদ আগতঃ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সময় ভীমও নিজের কাজে এসেছিলেন রাজসভায়। ভীমের হস্তনিষ্পেষণ এবং দাঁতের ঘর্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির আকারে-ইঙ্গিতে কোনওমতে ভীমকে ঘরে পাঠান। অজ্ঞাতবাস প্রকট হয়ে যাবার ভয়ে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির পাক্কা অভিনয় করলেন। দ্রৌপদীকে বললেন— তুমি সুদেষ্ণার ঘরে যাও।

এখন রাগের সময় নয় বলেই তোমার গন্ধর্ব-পতিরা ছুটে আসছেন না। তুমি সময় বোঝো না, যাও এখন। শুধু শুধু বিনোদিনী নটীদের মতো রাজসভায় দাঁড়িয়ে থেকো না। মৎস্যরাজ বিরাটের পাশা-খেলার অসুবিধে হচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, দ্রৌপদী কেঁদে-কেটে, বিচার চেয়ে যেভাবে 'সিন' তৈরি করেছিলেন এবং রাজসভার সমস্ত লোক তাঁর চেহারা দেখে যেভাবে মর্যাদা দিচ্ছিল— এবং পূজয়তস্তাং তু কৃষ্ণাং প্রেক্ষ্য সভাসদঃ— তাতে তাঁর পরিচয় প্রকট হয়ে যেতে পারত। এমনকী যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারের পরেও দ্রৌপদী রাগ করে বলেছিলেন— যাদের সবার বড়ভাই পাশা-জুয়া খেলে বেড়াচ্ছে, তাঁদের এত দয়া বলেই আমি সুখের সময়েও ভোগের মুখ দেখিনি। দ্রৌপদীর এই কথায় বিপদ ঘটতে পারত। রাগের মধ্যে দ্রৌপদী বুঝতেও পারেননি যে, যুধিষ্ঠির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেই দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে যেরকম ক্রোধে অধীর হতে দেখেছেন, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না যে, ব্যবস্থা একটা হবেই। আর সেই জন্যই যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছিলেন শান্তভাবে— তুমি যাও সৈরিন্ধ্রী। তোমার গন্ধর্ব-স্বামীরা তোমার প্রিয় কাজটি করে দেবেন। যে তোমার অপ্রিয় কাজ করেছে, তাকে দণ্ড দিয়ে তোমার দুঃখ দূর করবেন তোমার গন্ধর্ব-স্বামীরা— ব্যপনেষ্যন্তি তে দুঃখং যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝতে পারেননি। শুধু শুধুই ভীমের কাছে অনুযোগ করছেন— যার স্বামী যুধিষ্ঠির, তার আবার সুখ ? দ্রৌপদী সম্পূর্ণ তিন-অধ্যায় জুড়ে যুধিষ্ঠিরকে অকথ্য গালাগালি দিয়েছেন ভীমকে শুনিয়ে। কিন্তু এই প্রথম, মধ্যম-পাণ্ডব দ্রৌপদীর প্রতি সম্পূর্ণ সমব্যথী হয়েও যুধিষ্ঠিরের কথার মাত্রাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন দ্রৌপদীকে। ভীম বলেছেন— আমি তখনই বিরাটরাজার সর্বনাশ করে ছাড়তাম, কিন্তু যুধিষ্ঠির আমাদের অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছেন, তাই কিছু করার ছিল না— অত্র মে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যৎ প্রতীক্ষতে। ভীম অনেকক্ষণ দ্রৌপদীর মুখে যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে দ্রৌপদীকে বলেছেন— যা বললে, বললে। তোমার মুখে এই তিরস্কারের কথা যদি যুধিষ্ঠির শোনেন, তবে তিনি আত্মহত্যা করবেন— শৃণুয়াদ্ যদি কল্যাণি ধ্রুবং জহ্যাৎ স জীবিতম্।

পিঠোপিঠি ভাই হওয়ার দরুন ভীম যুধিষ্ঠিরকে যত খারাপ কথাই বলুন, আজ প্রিয়া মহিষীর মুখে তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীর অবমাননা শুনে ভীম কিন্তু ভীষণ দুঃখিত হয়েছেন। অপার ধৈর্য নিয়ে যুধিষ্ঠির যে শেষ দিনটির জন্য কীভাবে অপেক্ষা করছেন, সেটা বুঝেই ভীম দ্রৌপদীকে বলেছেন— রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী সীতাকে রাবণ নিজের ঘরে চুরি করে নিয়ে গিয়ে নানা কষ্ট দিয়েছিল। সীতা কিন্তু শত দুঃখ সয়েও রামচন্দ্রকেই কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করেছেন। সীতা, লোপামুদ্রা এঁরা যেমন গুণবতী, তুমিও তো সেইরকমই, দ্রৌপদী— তথা ত্বমপি কল্যাণি সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।

দ্রৌপদী লজ্জা পেয়েছেন। বলেছেন— মনের দুঃখ সইতে না পেরেই আমি এমন কুকথা বলেছি, আমার রাজাকে আমি তিরস্কার করছি না— অপারয়ন্ত্যা দুঃখানি ন রাজানমুপালভে। আমরা জানি, এরপর নির্বিঘ্নে কীচক-বধ হয়ে গেছে। ওদিকে অজ্ঞাতবাসের শেষ কল্পে কৌরবরা বিরাটরাজার দেশ আক্রমণ করেও কোনও ফল লাভ করতে পারেননি। অর্জুনের বাহুবলে বিরাটরাজ্য রক্ষিত হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের নির্মোক মোচন করে পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরকে বিরাটরাজার সিংহাসনেই বসিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডবদের পরিচয় আবিষ্কৃত হল। বিরাট অভিভূত হলেন। কুমারী উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিয়ে দিয়ে বিরাটরাজা পঞ্চপাণ্ডবকে দিয়ে হীন কাজ করানোর ঋণ শোধ করলেন। উৎসবে আনন্দে বিরাটনগরী মেতে উঠল।

অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাটনগরীতে আমরা যুধিষ্ঠিরের সমর্থকদের সমবেত হতে দেখছি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের আগে ঠিক যেমন দেখেছিলাম, এখানেও তেমনই যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব শুরু হচ্ছে কৃষ্ণের কথার সূত্রপাতে। সভায় উপস্থিত বৃষ্ণি-বীরেরা, পাঞ্চালরা, কেকয় এবং মৎস্যদেশের প্রধানরা নিজ নিজ মত ব্যক্ত করছেন, আর সে সব মতামতের শুভাশুভ বিচার করে কৃষ্ণ তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। বস্তুত যুদ্ধোদ্যোগের সময় থেকেই যুধিষ্ঠিরের ভার অনেক

হালকা হয়ে গেছে। রাজনীতি যখন যুদ্ধের পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, তখন সেই যুদ্ধাশ্বের লাগাম যুধিষ্ঠিরের হাত থেকে প্রধানত কৃষ্ণের হাতে চলে গেছে। কিন্তু তবুও লক্ষণীয় বিষয় হল, কুরুসভায় যখন দ্রুপদের পুরোহিতের মাধ্যমে সন্ধির প্রস্তাব গেল এবং ধৃতরাষ্ট্র তার উত্তরে পালটা-সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে সঞ্জয়কে পাঠালেন, যুধিষ্ঠির কিন্তু তখন আর পূর্বের যুধিষ্ঠির নেই। তাঁর প্রত্যয় দৃঢ়, কথাবার্তা স্পষ্ট এমনকী যুদ্ধেও তাঁর কোনও আপত্তি নেই।

দ্রুপদরাজার দূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুধিষ্ঠিরের হয়ে বেশ কড়া ভাষাতেই জানিয়ে গেছেন যে, কোনও অজুহাত চলবে না। পাণ্ডবদের পৈতৃক-রাজ্য ফিরিয়ে দিতেই হবে। সম্পূর্ণ কৌরব-সভার মধ্যে এই কঠিন ভাষার কিছু প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সূত সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে দূত হিসেবে পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মনে কূটবুদ্ধি তখনও কাজ করছিল। পাণ্ডবদের অমানুষিক শক্তি এবং সহায়ক মিত্র-রাজাদের কথা মাথায় রেখে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তিই চাইছিলেন, কিন্তু রাজ্য দেবার অভিপ্রায় তাঁর এক বিন্দুও ছিল না। সঞ্জয়কে যখন দূত হিসেবে তিনি পাঠাচ্ছেন, রাজ্যখণ্ডের কথা তিনি উচ্চারণও করছেন না, কিন্তু পাণ্ডবরা যে কত ভাল, কত বীর, কত তাঁদের মাহাত্ম্য, এই সব স্তোকবাক্য দিচ্ছেন। ভীম-অর্জুন-কৃষ্ণ ইত্যাদি যুদ্ধবীরদের অমানুষী ক্ষমতার কথা তিনি জানেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন— ভীম, অর্জুন এমনকী কৃষ্ণকেও আমি তেমন ভয় পাই না— নাহং তথা হ্যর্জুনাদ্ বাসুদেবাদ্/ভীমাদ্বাপি যমযোর্বা বিভেমি— কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির যদি ক্রোধযুক্ত হন, তবে সেই ক্রোধকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি— মন্যোরহং ভীততরঃ সদৈব।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে 'অজাতশত্রু' বলে ডাকেন। অতএব শত্রুহীন মানুষটির ক্রোধ যে ঠিক ভীম-অর্জুনের মতো নয়, সেটা তিনি জানেন। যুধিষ্ঠিরের তেজ ঠিক সাধারণের তেজ নয়, তাঁর তেজ ব্রহ্মচর্যের, তপস্যার, সত্যের। আর ঠিক সেই জন্যই তিনি যে ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হন, বুঝতে হবে অজস্রবার সেখানে ক্ষমা করাটা হয়েই গেছে এবং সেই ক্রোধ যুক্তিযুক্ত— তস্য ক্রোধং সঞ্জয়াহং সমীক্ষ্য স্থানে জানন্ ভৃশমস্ম্যদ্য ভীতঃ। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে অনেক কথা বলে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে বলার জন্য।

সঞ্জয় বিরাটরাজার রাজধানীতে পৌঁছলেন ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা নিয়ে। যুধিষ্ঠির কুরুবাড়ির সব মানুষের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন বটে কিন্তু প্রথম চোটেই তিনি ভীম-অর্জুনের অপ্রতিরোধ্য শক্তির কথাও ঘোষণা করেছেন। এ যেন অন্য এক যুধিষ্ঠির। সমস্ত বনবাস-কাল জুড়ে তিনি অজস্রবার তিরস্কার শুনেছেন দ্রৌপদীর কাছে, ভীমের কাছে। তবু তিনি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করেছেন। নিজের সত্যপথ থেকে চ্যুত না হয়ে পাশা-খেলার প্রায়শ্চিত্তও করেছেন। ইতিমধ্যে অর্জুন দিব্য-অস্ত্র লাভ করেছেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাঞ্চাল-যাদব এবং আরও সব রাজনৈতিক শক্তির সমবেদনা তাঁর দিকেই বর্ষিত হয়েছে। তিনি এবার দণ্ড-দানের জন্য প্রস্তুত। যুধিষ্ঠির নিজেই বলে দিয়েছেন— ভাল কথা বলেই হোক, ছেড়ে দিয়ে হোক— কোনও ভাবেই আমরা ধৃতরাষ্ট্রের সেই অহঙ্কারী পুত্রটিকে সুপথে আনতে পারিনি, অতএব এখন তো অন্যভাবে প্রস্তুত হতেই হবে— সর্বাত্মনা পরিণেতুং বয়ঞ্চ ন শক্নুমো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রম্।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে একটু স্তোকবাক্য দেবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যুধিষ্ঠির সে সব কথা শুনতে চাননি। তিনি বলেছেন— এখানে সবাই আছেন— পাঞ্চালরা আছেন, যাদবরা আছেন, বিরাট আছেন, অতএব তোমার যা বলার, ধৃতরাষ্ট্র যা যা তোমাকে বলে দিয়েছেন, তা এঁদের সবার সামনে বল— যত্তে বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রানুশিষ্টং/ গাবল্গণে ব্রূহি তৎ সূতপুত্র। সঞ্জয় বললেন— ধৃতরাষ্ট্র শান্তি চান— শমং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো'ভিনন্দন্। তোমরা প্রত্যেকে একেকজন ইন্দ্রের সমান বীর, সমস্ত ধর্মের নীতি-নিয়মও তোমরা জান। ঋজুতা-মৃদুতার মতো বড় গুণ যেমন তোমাদের আছে, তেমনই এক বিরাট বংশে তোমাদের জন্ম। তোমাদের তাই এমন কোনও হীন কর্ম মানায় না যা তোমাদের কলঙ্কিত করে।

দু'পক্ষের যুদ্ধ-সম্ভাবনায় অযথা যে লোকক্ষয়ের সৃষ্টি হবে, সে ব্যাপারে পাণ্ডবদের দায়টুকুর কথাই

ধৃতরাষ্ট্র বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে। জ্ঞাতিবধের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের যে জয় আসবে সে জয় যে প্রায় পরাজয়েরই সমান— পরাজয়ো যত্র সমো জয়শ্চ— সে-কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে একটু লজ্জাও দিতে চেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়েছেন— পাঞ্চাল-যাদবদের দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যেমন সহজ নয়, তেমনই ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি বীরের দ্বারা সুরক্ষিত কৌরবদের জয় করাও তত সহজ নয়। দু'পক্ষের এই তুল্যশক্তিতার প্রমাণ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র আবারও বলেছেন— জয়ই হোক অথব পরাজয়— এক্ষেত্রে কারওই সুবিধে হবে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে— জয়ে চৈব পরাজয়ে চ নিঃশ্রেয়সং নাধিগচ্ছামি কিঞ্চিৎ।

ধৃতরাষ্ট্রের বাণী সঞ্জয় অনেক শুনিয়ে গেলেন এবং এই মুহূর্তে এই সব জ্ঞানের কথার পিছনে ধৃতরাষ্ট্রের যে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে সেটা বুঝতে পেরে যুধিষ্ঠির যেন একটু বিরক্তই হলেন। তিনি বললেন— আমি কোন কথাটা এমন বললাম, সঞ্জয়! যাতে তোমার মনে হল আমরা যুদ্ধ চাই— কাং নু বাচং সঞ্জয় মে শৃনোষি/ যুদ্ধৈষিণীং যেন যুদ্ধাদ্ বিভেষি। যুদ্ধের চেয়ে যে শান্তি অনেক বড় জিনিস— এ আমরা বেশ জানি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর শতপুত্রের সঙ্গে আমাদের পাঁচ ভাইকে যোগ করে যে ভোগ লাভ করতে পারতেন, সে ভোগ এখন চলছে আমাদের বাদ দিয়েই এবং তাতেও কোনও তৃপ্তির লক্ষণ নেই। আগুনে ঘি দেবার মতো সেই ভোগেচ্ছা বেড়েই চলেছে— কামার্থলাভেন তথৈব ভূয়ো/ ন তৃপ্যতে সর্পিষেবাগ্নিরিদ্ধঃ। আমরা জিজ্ঞাসা করি— সমস্ত রাজৈশ্বর্য লাভ করেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কেন দীনচেতা মানুষের মতো কথা বলছেন— লালপ্যতে সঞ্জয় কস্য হেতোঃ। তিনি তো সর্বদাই তাঁর মন্দবুদ্ধি-পুত্র এবং তাঁর মন্ত্রণাদাতা কুবুদ্ধি কতগুলি মানুষের কথাই শুনে চলেছেন। মহামতি বিদুর যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছিলেন, সে সব কথা তো কই তিনি একটুও শোনেননি। শোনেননি, কেননা তিনি সেইটাই করবেন, যা তাঁর ছেলের পছন্দ। এইভাবেই তিনি অধর্মের মধ্যে প্রবেশ করছেন— সুতস্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রিয়ৈষী/ সংবুধ্যমানো বিশতে'ধর্মমেব।

পূর্বে ঘটা কিছু কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন যুধিষ্ঠির। সঞ্জয়কে তাঁর অন্তরের বোধটাও ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন— সম্ভব নয়, সঞ্জয়! শান্তি জিনিসটা সত্যিই অসম্ভব। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলের মন্ত্রী কারা দেখ। দুঃশাসন, শকুনি— এঁরা সব। এঁরা থাকতে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি-স্বস্তি কিছু হবে না— কথং স্বস্তি স্যাৎ কুরুসৃঞ্জয়ানাম্। ধৃতরাষ্ট্র চাইছেন— তিনি তাঁর ছেলেদের নিয়ে নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করবেন, তেমন ভাবলে কি আর শান্তির পথ প্রশস্ত হবে, সঞ্জয়? ধৃতরাষ্ট্র প্রধানত কর্ণের ভরসায় আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে রেখো, সঞ্জয়! বিপদকালে কর্ণ কোনও দিন অর্জুনের সামনে দাঁড়াতে পারেননি।

যুধিষ্ঠির নরমে-গরমে কথা শেষ করে নিজের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন সঞ্জয়কে। তিনি বললেন— বুড়ো রাজা ধৃতরাষ্ট্র যদি এইভাবে স্বার্থবুদ্ধি নিয়েই চলেন, তবে পাণ্ডবদের কোপে দগ্ধ হবে সব। আর তুমি তো জান সঞ্জয়! আমরা সারা জীবন কত কষ্ট পেয়েছি, তোমার মুখ চেয়ে সে-কথা না হয় আর তুললাম না। কিন্তু আমাদের শেষ কথা শোনো— আগে যেমন ছিল তেমনটিই হোক আবার। দুর্যোধন আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে দিক, আর সে যেখানে ছিল থাক, আমাদের আপত্তি নেই। তোমরা যদি এইভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরে আস, তবেই তুমি যেমন বললে, সেই শান্তির পথ খোলা থাকবে, নচেৎ নয়— অদ্যাপি তত্তত্র তথৈব বর্ততাং শান্তিং গমিষ্যামি যথা ত্বমাত্থ।

হস্তিনাপুর থেকে আসার আগে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শান্তি-শান্তি করে সঞ্জয়ের মগজ-ধোলাই করে দিয়েছেন। অতএব যুধিষ্ঠিরের এত কথার পরেও আবারও তিনি শান্তির কথা বলেছেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির তবুও তাঁর কথায় আমল দেননি। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে কথা বলতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরের কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সঞ্জয় যে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য বুঝতে পারছেন না, তা মোটেই নয়। কিন্তু যেহেতু তিনি দূতকর্মে নিযুক্ত, অতএব ধৃতরাষ্ট্রের কথার পিছনেই তাঁকে লেগে থাকতে হবে এবং তিনি তা ছিলেনও। শেষে সঞ্জয় বিদায় চেয়েছেন এবং এই বিদায়-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কথার মাত্রা পরিবর্তিত হয়েছে। সঞ্জয়ের মাধ্যমে তিনি সকলকে, হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির সকলকে কুশল

জানাচ্ছেন।

এই কুশল-পৃচ্ছার মধ্যে এমনই এক সর্বব্যাপিনী দৃষ্টি ছিল, যাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা কুরুবৃদ্ধগণই শুধু নন, হস্তিনাপুরবাসী ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু-তপস্বীরাই শুধু নন, এমনকী তাঁর কাছে মন্দ হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধন-দুঃশাসনও তাঁর কুশল-জিজ্ঞাসার অন্তর থেকে বাদ যাননি। একদিকে কুরুসভার দৌবারিক-গাণনিক ইত্যাদি ব্যক্তিরা যেমন যুধিষ্ঠিরের শুভেচ্ছা লাভ করেছেন সঞ্জয়ের মাধ্যমে, তেমনই শুভেচ্ছা পেয়েছেন কুরুবাড়ির মাতৃস্থানীয়ারা, রাজকন্যারা বা বধূরা। ভারী আশ্চর্য হস্তিনাপুরের দাস-দাসীদেরও ভোলেননি যুধিষ্ঠির, ভোলেননি, অন্ধ-কুব্জ-খঞ্জদের, ভোলেননি সমাজের নিন্দিত ভোগপ্রিয় বেশ্যাদেরও পর্যন্ত। তাঁদেরও কুশল-বার্তা পাঠিয়েছেন যুধিষ্ঠির।

কিন্তু সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েও শেষে যুধিষ্ঠির বলেছেন— দুর্যোধন যে সমস্ত রাজাদের স্বপক্ষে পেয়েছেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, তাঁদের মতো বীরযোদ্ধা পৃথিবীতে নেই— ন হীদৃশাঃ সন্তি অপরে পৃথিব্যাম্— কিন্তু শত্রু বিজয়ের জন্য আমার কাছে ধর্মই হল সবচেয়ে বড় শক্তি— মম ধর্ম এব মহাবলঃ শত্রুনিবর্হনায়। তবে হ্যাঁ সঞ্জয়! আমি এতক্ষণ ধরে যা বলেছি, তা শুধু ধৃতরাষ্ট্রকেই নয়, তুমি দুর্যোধনকেও শোনাবে। আর এটাও তাকে বলবে— যে, তোমার যেটা ভাল লাগছে, সেটাই সব সময় আমরা করে যাব না— নৈবং বিধাস্যাম যথা প্রিয়ং তে। হয় আমাদের পৈতৃক প্রাপ্য-অংশ আমাদের দিয়ে দাও, নয়তো যুদ্ধ কর— দদস্ব বা শত্রুপুরীং মমৈব যুধ্যস্ব বা ভারতমুখ্য বীর।

'আমরা যুদ্ধ করব, দরকার হলে যুদ্ধ করব'— এমন কথা আমরা যুধিষ্ঠিরের মুখে একবারও শুনিনি। কিন্তু এখন তিনি মত প্রকাশ করছেন দৃঢ়ভাবে, বক্তব্য পেশ করছেন সুস্পষ্টভাবে। এখনও তিনি সঞ্জয়ের মাধ্যমে কুরুবৃদ্ধদের কাছে অনুনয় করে বলছেন— আমরা যুদ্ধ চাই না— অযুদ্ধং সৌম্য ভাষস্ব হিতকামে যুধিষ্ঠিরে— অথবা ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি এখনও জানাচ্ছেন— আমরা একসঙ্গেই বাঁচতে চাই, আপনি শত্রুদের কথা শুনবেন না— তাত সংহত্য জীবামো দ্বিষতাং মা বশং গমঃ— কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটাও বলছেন— আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর কিন্তু নয়। বনবাসের দিনগুলিতে আমরা যে কষ্ট সহ্য করেছি, তা আমরা মনে রাখিনি অথবা আমাদের বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা তার প্রতিবিধান আচরণ করিনি। কুরুবাড়ির সব মানুষেরাই এ-কথা মানবেন— বলীয়াংসো'পি সন্তো যৎ তৎ সর্বং কুরবো বিদুঃ। যুধিষ্ঠির স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— কৃষ্ণা-দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে যেভাবে তাঁকে অপমান করা হয়েছিল, তাতে জননী কুন্তীর অতিক্রমটুকুও দুর্যোধন-দুঃশাসনরা মনে রাখেনি, কিন্তু সে সব অন্যায়ও আমরা উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু এখন আর কোনও কথাই শুনব না। এখন আমাদের রাজ্যভাগ আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে— যথোচিতং স্বকং ভাগং লভেমহি পরন্তপ। আমরা পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি গ্রাম অন্তত চাই। তাতেই শান্তি আসতে পারে, নচেৎ নয়।

যাঁরা যুধিষ্ঠিরকে খুব দুর্বল বলে ভাবেন, তাঁদের এই সব জায়গাগুলি স্মরণ করতে বলি। কোনও সন্দেহ নেই যে, তৎকালীন সদোত্থায়ী ক্ষত্রিয়-রাজাদের নিরিখে যুধিষ্ঠির একেবারেই অন্যরকম। মহাভারতেই যেখানে তিনি ভীষ্মের কাছে রাজনীতির উপদেশ শুনেছেন এবং সেই উপদেশের মধ্যে যখনই রাজনীতির কূট বর্ণিত হয়েছে, তখনই অত্যন্ত বিব্রত হয়েছেন যুধিষ্ঠির। মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে 'অর্থ-বিনিশ্চয়' নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রাজনীতির মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। ভীষ্ম বলেছিলেন— রাজনীতিতে দয়া, মায়া, স্নেহের কোনও স্থান নেই। শুধু তাই নয়—রাজ্যলাভ এবং ধনলাভের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তথাকথিত ন্যায়-নীতির ভাবনাটা এতই দূরে রাখতে হয় যে, হৃদয়হীনতা বা নৃশংসতাই সেখানে প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়াবে।

ভীষ্মের কথা শুনে যুধিষ্ঠির আঁতকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—এ সব আপনি কী শোনালেন পিতামহ! এ তো অধর্মটাই ধর্ম হয়ে গেল, আর ধর্ম হয়ে গেল অধর্ম— অধর্মে ধর্মতাং নীতে ধর্মে চাধর্মতাং গতে। আপনি যা বলছেন, তা তো মোটেই ভাল কথা নয়। রাজাদের যা করা উচিত বলে আপনি বলছেন, সে তো প্রায় দস্যুর মতো ব্যবহার এবং এই ব্যবহার আমরা বর্জন করতে চাই।

আপনার মুখে এই সব নৃশংসতার ঔচিত্য শুনে আমার তো মূর্ছা যাবার জোগাড় হল আর আমার এতকালের ধর্ম-কর্ম সব তো চুলোয় গেল— সংমুহ্যামি বিষীদামি ধর্মো মে শিথিলীকৃতঃ।

সত্যি কথা বলতে কি, বাস্তবে এই হল যুধিষ্ঠিরের চরিত্র। দয়া-মায়াহীন কূট নৃশংস রাজনীতি তাঁর চরিত্রে নেই। হতে পারে, সেই অর্থে উত্থানশক্তিসম্পন্ন কোনও রাজার গুণই তাঁর মধ্যে নেই। কিন্তু তবুও তাঁকে দুর্বল বলা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। আপনিই ভাবুন— যেখানে পাঞ্চালী-কৃষ্ণার অপমান ঘটছিল, সেখানে একটি বিশাল সভাস্তম্ভ ভেঙে নিয়ে ভীমের পক্ষে দুর্যোধন-দুঃশাসনের মাথায় বাড়ি মারাটাই ছিল সোজা এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানে চুপ করে বসে যুধিষ্ঠিরের মতো সহ্য করাটাই সবচেয়ে কঠিন এবং অস্বাভাবিক, এবং অন্যের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক বলেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। ভীম-দ্রৌপদী বনবাস-কালে বহুবার যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচনা দিয়ে বলেছেন— ওরা যখন আমাদের সঙ্গে কপট আচরণ করেছে, তখন আমরাই বা বনবাসের সত্য ভেঙে ওদের সঙ্গে শঠতা করব না কেন। শঠের সঙ্গে শঠ আচরণ করাই রাজনীতি।

কিন্তু রাজনীতি হলেও সেটা যৌধিষ্ঠিরী নীতি নয়। তাঁর জোর রাজনীতি নয়, ধর্মনীতি। আমার দুঃখ হয়, যে মহত্তম ব্যক্তিটি— 'রেজিস্ট নট্ ইভিল' বলে দুনিয়া মাতালেন, তিনি একবার যুধিষ্ঠিরকে দেখলেন না। দেখলে বুঝতেন— রাজা এবং রাজনীতির সর্বাঙ্গীন পরিবেশের মধ্যে তিনি শুধু অপেক্ষা করে গেছেন— শত্রুকেও কতটা ক্ষমা করা যায়। দ্রৌপদীকে তিনি বুঝিয়েছিলেন— ক্ষমাই আমার একমাত্র শক্তি। দ্রৌপদী বোঝেননি, বুঝতে চাননি। কিন্তু আজকে তাঁর বনবাস-মলিন ক্লান্ত দিবসগুলির শেষে আবারও যখন ধৃতরাষ্ট্রের মুখে শান্তির মৌখিকতা শুনতে হচ্ছে যুধিষ্ঠিরকে, তখনই তিনি দৃঢ় হয়ে উঠছেন। ধৃতরাষ্ট্র এতটুকু রাজ্য ছেড়ে দেবেন না, দুর্বিনীত পুত্রকে তিনি এখনও সুরক্ষিত রেখে মুখে শান্তির কথা বলছেন— এ তো পরম অধর্ম। ন্যায়-নীতির এই অতিলঙ্ঘন যুধিষ্ঠিরকে আজ আপন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় করে তুলেছে। এখন তিনি যে ক্ষমা অতিক্রম করে যুদ্ধের কথা বলছেন, তার কারণ অসীম-ক্ষমার শেষ প্রান্তে আছে দণ্ড, সেই দণ্ডই এখন ধর্ম হয়ে উঠেছে। আর দণ্ড ধর্মে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির তাঁর আপন ধর্মে দৃঢ় হয়ে উঠেছেন। তিনি দুর্বল নন। যেখানে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির সঙ্গতি ঘটবে, সেখানে তিনি একটুও দুর্বল নন, পরম শক্তিমান। তিনি তখন সঞ্জয়কে বলেন— আমরা শান্তির জন্য যতটা সমর্থ যুদ্ধের জন্যও ততটাই। আমরা মৃদুতার ক্ষেত্রে যতখানি সমর্থ, দারুণ নৃশংসতার ক্ষেত্রেও ততটাই—

> অলমেব শমায়াস্মি তথা যুদ্ধায় সঞ্জয়।
> ধর্মার্থয়োরলঞ্চাহং মৃদবে দারুণায় চ ॥

তুমি প্রস্থান কর সঞ্জয়। আশা করি কুরু-পাণ্ডবদের আবারও অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাব।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের সমস্ত বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির ভালই জানতেন যে, ধৃতরাষ্ট্র একটা কথাও শুনবেন না। এই বৃদ্ধের প্রতি তিনি করুণা করতেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সব বুঝেশুনেও যে শেষ পর্যন্ত পুত্রের স্বার্থ দেখবেন— এই গ্রাম্য মনোবৃত্তির প্রতি যুধিষ্ঠিরের করুণা ছিল। যার জন্য সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে তিনি নরমে-গরমে যা কিছুই বলুন, কৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় শান্তির দূত হয়ে যাচ্ছেন, তখনই কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর আপন-স্বরূপে ফিরে এসেছেন। কৃষ্ণের কাছে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ইচ্ছাটুকু ব্যক্ত করে বলেছেন— বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তো আর আমাদের প্রতি সম আচরণ করবেন না। তিনি নিজেও লোভী, মনেও তাঁর পাপ আছে। তিনি চাইছেন— রাজ্যও দেব না, অথচ শান্তি হোক, যুদ্ধ-বিগ্রহে আপন পুত্রের পাছে ক্ষতি হয়— অপ্রদানেন রাজ্যস্য শান্তিমস্মাসু মার্গতি।

যুধিষ্ঠির দুঃখ করে বলেছেন— দুর্যোধনের সব কথা শুনেই লুব্ধ বৃদ্ধ আত্মীয়দের প্রতি অসদাচরণ করছেন। নইলে কত সামান্য একটা রাজ্যাংশ চেয়েছি বলো। কিন্তু দুষ্টমতি দুর্যোধন তাও দেবে না। সে ভাবছে সমস্ত রাজ্যখণ্ডের ওপর একমাত্র তারই অধিকার— ন চ তানপি দুষ্টাত্মা ধার্তরাষ্ট্রো'নুমন্যতে। কিন্তু আমাদের অবস্থাটাও তো দেখছ? ধন-সম্পত্তি অনেক লাভ করেও আমরা

হারিয়েছি, দুঃখ-কষ্টও অনেক গেছে। কিন্তু দিনের পর দিন এই নির্ধনতা আর সইছে না। পত্র-পুষ্প-ফলহীন বৃক্ষে যেমন পাখি এসে বসে না তেমনই আমার নির্ধনতার জন্য আমার জ্ঞাতি-বন্ধুরা, ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে— অপুত্রাদ্ অফলাদ্ বৃক্ষাদ্ যথা কৃষ্ণ পতত্রিনঃ। রাজনীতিজ্ঞ শম্বরাসুর বলেছিলেন— যার আজকের খাবার নেই, কালকে সকালে খাবার পয়সা নেই, তার চেয়ে করুণ-অবস্থা কার হতে পারে— যত্র নৈবাদ্য ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃশ্যতে।

ভারী আশ্চর্যভাবে আমরা এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের মুখে অর্থ বা ধন-সম্পত্তির মাহাত্ম্য শুনে রীতিমতো আলোড়িত হই। যুধিষ্ঠির এই কথা বলছেন— যার ধন নেই, সে মৃত ; যার ধন আছে, তারই জীবন আছে। ধনই পরম ধর্ম, সব কিছু ধনের ওপরেই নির্ভর করে— ধনমাহুঃ পরং ধর্মং ধনে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

আমরা জানি—এগুলি যুধিষ্ঠিরের অন্তরের কথা নয়। তাঁর পরম আদরণীয়, চার-চারটি ভাই এতকাল তাঁরই কারণে কষ্ট সহ্য করেছেন, প্রিয়া দ্রৌপদী রাজপুত্রী হয়েও এতকাল তাঁরই অপরাধে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। তার মধ্যে স্বার্থপর স্নেহান্ধ-রাজার পুত্রের কারণে অসভ্যতা যুধিষ্ঠিরকে ব্যথিত করেছে। যুধিষ্ঠির নিজে সদা সন্তুষ্টিতে বিশ্বাসী, কিন্তু ভাই এবং স্ত্রীর কারণে হয়তো তিনি আজ অর্থের প্রাধান্য খ্যাপন করছেন। এমনিতে যে তাঁর কাছে অর্থের কোনও প্রাধান্য নেই, তা আমরা বুঝব সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে। তখন স্বয়ং অর্জুন অর্থের প্রাধান্য ঘোষণা করে যুধিষ্ঠিরকে রাজা হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই অর্থের প্রাধান্য মানেননি। তিনি তখন অর্জুনকে খণ্ডন করেছিলেন ধর্মের প্রাধান্য খ্যাপন করে।

বস্তুত এখানেও শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে। অর্থের মাহাত্ম্য ঈষৎ ঘোষণা করেই তিনি ধর্মের পরিধিতে ফিরে এসেছেন, ঠিক যেমন একটু আগেই সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধের সপক্ষে কথা বলেও তিনি আবারও যুদ্ধ-হিংসা-বর্জিত এক সুন্দর শান্ত জগতে উত্তরণ করছেন। কৃষ্ণকে তিনি বলছেন— দেখ কৃষ্ণ! আমাদের প্রথম বিকল্প হল যাতে আমরা কোনও উত্তেজনার মধ্যে না গিয়ে শান্তি লাভ করতে পারি, দুই পক্ষ সমানভাবে রাজসুখ ভাগ করে নিতে পারি— প্রশান্তাঃ সমভূতাশ্চ শ্রিয়ং তামশ্নুবীমহি। কিন্তু এখানে চরম পথটা হল কৌরবদের হত্যা করে রাজ্য লাভ করা। কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে যাদের কোনও সম্বন্ধ নেই তাঁদের বধ করা যেমন অন্যায় হবে, তেমনই অন্যায় হবে আমাদের গুরুজন এবং জ্ঞাতিদের বধ। সত্যি কথা বলতে কি যুদ্ধের মধ্যে কিছুই ভাল নেই— কিন্নু যুদ্ধে'স্তি শোভনম্।

যুদ্ধ-বিগ্রহ যুধিষ্ঠিরের কাছে এতটাই বিরক্তিকর ছিল যে, তিনি সামাজিক-সংস্কার ক্ষত্রিয়-সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে যুদ্ধের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন— আমাদের এই ক্ষত্রিয়-জাতির স্বধর্মটাই পাপ করা। জলের মধ্যে বড় মাছ যেমন ছোট মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে তেমনই ক্ষত্রিয়রাও অন্য দুর্বলতর ক্ষত্রিয়দের মেরে জীবন ধারণ করে— ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ং হন্তি মৎস্যো মৎস্যেন জীবতি। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে একান্ত আপন মত বোঝাচ্ছেন— এই দেখ না, যুদ্ধ লাগলে একজন মাত্র কৌশলী যুদ্ধবীর বহু লোককে মারছে, আবার কখনও বা বহুজনে মিলে একজনকে। একজন মহাবীর একটা কাপুরুষকে হত্যা করছে কখনও, কখনও বা এক সাধারণ যোদ্ধা অসামান্য এক যুদ্ধবীরকে মেরে ফেলছে— সুশূরঃ কাপুরুষং হন্তি অযশস্বী যশস্বিনম্।

যুদ্ধে সবটাই খারাপ। নিজের পক্ষের কোনও ক্ষতি হল না আর শত্রুপক্ষের সবটাই লোকসান— এমনটা হয় না। অতএব যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিটফল একটাই— ক্ষতি। আর যদি বা কোনওরকমে জয় এল, তা হলেও রাজকোষের অপচয় হবে সাংঘাতিক— যস্য স্যাদ্ বিজয়ঃ কৃষ্ণ তস্যাপ্যপচয়ো ধ্রুবম্। যুদ্ধের এত দোষ কিন্তু সবার মুখ চেয়ে যুধিষ্ঠির এও বলতে পারছেন না যে, তাঁর এতটুকু লোভ নেই রাজ্যপাটে। এ যেন ভগবদ্গীতার সেই স্বধর্মপালন। নিরাসক্ত বিষয়-ভোগ। ক্ষত্রিয়ের পূর্বনির্দিষ্ট স্বধর্ম পালন করার জন্য তিনি রাজ্য-সম্পদ চান বটে কিন্তু তার জন্য কুলক্ষয় এবং মানুষের ক্ষতি তিনি চান না— ন চ ত্যক্তুং তদিচ্ছামো ন চেচ্ছামঃ কুলক্ষয়ম্। যুদ্ধ বন্ধ করার সমস্ত উপায় ব্যর্থ হলে যে যুদ্ধই হবে— এটা যুধিষ্ঠির জানেন, কিন্তু যুদ্ধ করাটা আসলে যে এক ধরনের পশুবৃত্তি

সেটাও যুধিষ্ঠির জানেন।

যুদ্ধের মূল চেহারাটা দেখিয়ে যুধিষ্ঠির বলেছেন— জান কৃষ্ণ ! এ হল কুকুরের মতো। বিশেষত এখন ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যে ধরনের কথাবার্তা, ভাব-বিনিময় চলছে তার সঙ্গে দুটি কুকুরের ঝগড়ার কোনও পার্থক্য নেই— তচ্ছুনামিব সম্পাতে পণ্ডিতৈরুপলক্ষিতম্। তিনি বলেছেন— কৃষ্ণ দেখ, দুটি কুকুর যখন ঝগড়া করে তখন প্রথমে দুটোই ল্যাজ উঁচিয়ে আসে, তারপর বিকৃত শব্দে পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতে থাকে। সেই বিকৃত চিৎকারেই দুজনে দুজনের নিন্দা এবং নিজের প্রশংসা গাইতে থাকে। তারপর মাটিতে গড়াগড়ি, দন্ত-প্রদর্শনী, পুনরায় চিৎকার এবং তারপরেই ভীষণ যুদ্ধ— দন্তদর্শনমারাবস্ততো যুদ্ধং প্রবর্ততে। যুধিষ্ঠির বলেছেন— শেষ পর্যন্ত যে কুকুর বেশি বলিষ্ঠ, সেই তো জিতে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যুদ্ধ কালে মানুষের সঙ্গে কুকুরের কোনও তফাত রইল না— এবমেব মনুষ্যেষু বিশেষো নাস্তি কশ্চন।

যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ভাবনায় ক্লিষ্ট হন বলেই খুব সুন্দর তিনটি বিকল্পের কথা জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণকে। বললেন— আমরা উদাসীন থাকতে পারি, কিন্তু তাতে রাজ্য লাভ অসম্ভব। আমরা যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু তাতে আমাদেরও কুলক্ষয় ঘটবে। আর আমরা প্রণিপাত-বৃত্তি অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ নেই। কারণ পুত্র-স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের প্রণিপাত-বৃত্তিকে উপহাস করবেন এবং আমাদের দুর্বল ভাববেন— স পুত্রবশমাপন্নঃ প্রণিপাতং প্রহাস্যতি। অথচ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতার সমান, তিনি আমাদের পরম মাননীয় পূজ্য ব্যক্তি। এই রকম এক সংকটে আমাদের ধর্মও বজায় থাকে অথচ ঐহিক লাভও সম্পন্ন হয়— এমনটা যে কী করে হবে, কৃষ্ণ ! সে শুধু তুমিই জান। তুমি ছাড়া আর আমাদের কেইই বা আছে বল— কো হি কৃষ্ণাস্তি নস্ত্বাদৃক্ সর্বনিশ্চয়বিৎ সুহৃৎ।

'ধর্মও বজায় থাকে অথচ ঐহিক লাভও ঘটবে'— এরকম একটা কথা ভীষণ রকমের 'প্যারাডক্সিক্যাল' মনে হতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের এই হল সমাজদর্শন। আমাদের চতুর্বর্গের প্রথম বর্গটি হল ধর্ম এবং এই ধর্মকে অর্থের সঙ্গেও লাগাতে হবে, কামের সঙ্গেও লাগাতে হবে। যে কোনও উপায়ে অর্থ-সম্পত্তি লাভ করছি, তা হবে না। ধর্ম অতিক্রম না করে আপন সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে। কাম মানেই যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা নয়। বিবাহের মাধ্যমে, পুত্রোৎপত্তির মাধ্যমে কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করাটাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। যুধিষ্ঠির ধর্মের প্রতীক, এই পরম অদ্ভুত সঙ্কটে তিনি বিব্রত বোধ করছেন। কেমন করে ধর্মও থাকে অথচ অর্থ-সমৃদ্ধিও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত— কথমর্থাচ্চ ধর্মাচ্চ ন হীয়েমহি মাধব।

অন্য দিকে আরও একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয়। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে আত্ম-সমর্পণ করছেন। ভবিষ্যতে ভগবদ্গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হবে— তুমি সমস্ত ধর্মত্যাগ করে আমার শরণ নাও, অর্জুন— এ উপদেশ অর্জুনকে দেওয়া হবে, কিন্তু যুধিষ্ঠির তা পূর্বাহ্নেই জানেন। পিতা-প্রতিম ধৃতরাষ্ট্রের কাছে রাজ্য যাচনা করে প্রত্যাখ্যাত হলে যুদ্ধের মাধ্যমে যে ধর্ম-সঙ্কট উপস্থিত হচ্ছে তার থেকে রেহাই পেতে হলে যে সর্বধর্ম ত্যাগ করে পরমেশ্বর-প্রতিম একজনের শরণ নেওয়া দরকার সে-কথা বুঝেই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছেন— এই রকম সঙ্কটে একমাত্র পুরুষোত্তম তুমি ছাড়া আমার আর কোনও গতি নেই। কারণ তুমি আমাদের প্রিয়, তুমি আমাদের প্রিয় কামনা কর এবং সমস্ত বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, তাও তুমিই জান— প্রিয়শ্চ প্রিয়কামশ্চ গতিজ্ঞঃ সর্বকর্মণাম্।

কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ আবার এতটাই যে, যুধিষ্ঠির তাঁকে পরম পুরুষোত্তম জেনেও শত্রু-শিবিরে একা যেতে দিতে চান না। এমনই তাঁর মমতা যে, তিনি ভাবনা করছেন— একা কৃষ্ণকে পেয়ে দুর্যোধনরা যদি তাঁর ক্ষতি-সাধনে প্রবৃত্ত হন ! যুধিষ্ঠির বলেছেন— না কৃষ্ণ ! এটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি যত ভাল কথাই বলো, দুর্যোধন কিন্তু শুনবে না— দুর্যোধনঃ সূক্তমপি ন করিষ্যতি তে বচঃ। তার মধ্যে এখন তার স্বপক্ষীয় রাজারা তাকে ঘিরে রয়েছে। দুর্যোধন যা বলবে, তারা তাই করবে। তাদের সবার মাঝখানে তোমাকে একা ছেড়ে দিতে আমার মন মানছে না— তেষাং মধ্যাবতরণং তব কৃষ্ণ ন রোচয়ে।

কৃষ্ণের জন্য যুধিষ্ঠিরের এই প্রিয়ত্ব-মমত্বের মধ্যেও তাঁর তীক্ষ্ণ অনুমান-শক্তি কত নির্ভুল ছিল, তা আমরা দুর্যোধনের পরবর্তী আচরণে বুঝতে পারি। কৃষ্ণের শান্তির দৌত্য বিফলে যাবার পর দুর্যোধন যে তাঁকে বন্দি করবার অপচেষ্টা করবেন, এটা তাঁর বাবা ধৃতরাষ্ট্রও ভাবতে পারেননি, কিন্তু যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন। কৃষ্ণ ব্যর্থচেষ্ট হয়ে কুন্তীর কাছে ফিরে এসে বলেন— আর কিছুই হবার নয়। মহাকাল এদের গ্রাস করেছে। যাই হোক, আমি এখন পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যাব, তোমার শেষ কথা যদি কিছু বলার থাকে তো বলো।

কুন্তী কাউকে প্রথমে কিছু বলেননি, শুধু যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন। একটু কটু ভাবেই বলেছেন যে,—কৃষ্ণ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বোলো, এতে তার ধর্মই নষ্ট হচ্ছে— ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্ম মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে তাঁর চিরন্তন কুলধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন— ক্ষত্রিয়ের জন্ম পরমেশ্বরের বাহু থেকে এবং বাহুবলেই তাদের জীবিকা চলে। প্রজা-পালনের জন্য যদি ক্রূর কর্মও করতে হয়, তবে সেটাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম— ক্রূরায় কর্মণে নিত্যং প্রজানাং পরিপালনে। এইভাবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজধর্ম এবং আপন পিতৃ-পিতামহের কুলধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করার পরামর্শ দিয়েছেন। একেবারে শেষে ক্ষত্রিয়াণী বিদুলার উপাখ্যান বর্ণনা করে কুন্তী বোঝাতে চেয়েছেন— এতে যদি তাঁর পুত্রের জীবন-নাশ ঘটে তাও ভাল, কিন্তু একজন ক্ষত্রিয়-ঘরের জাতক যুদ্ধ না করে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুক— এটা কুন্তী চান না।

যুদ্ধের প্রতি হাজারো বিতৃষ্ণা নিয়েও যুধিষ্ঠিরও এখন আপন কুলধর্ম ক্ষত্রিয়-বৃত্তিতে পুনরাবর্তন করছেন। কৃষ্ণের কথা শুনে, ভীষ্ম বিদুরের কথা শুনে এবং জননী কুন্তীর কথা শুনে এখন তিনি রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। কারণ আর অন্য কোনও উপায় তাঁর সামনে খোলা নেই। ভীম-অর্জুনকে তিনি বলেছেন— যা ঠেকানোর জন্য এই কষ্টকর বনবাস গ্রহণ করলাম, আজ তাই এসে উপস্থিত হল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, অবশ্য দেখছি— চেষ্টা না করলেও যা হবার তাই হত— সেই যুদ্ধ করতেই হবে— যাদের বধ করা উচিত নয়, সেই সব নিরীহ মানুষকে মারতে হবে, মান্য গুরুজনদের হত্যা করতে হবে। কী অদ্ভুত এই বিবাদ— উপাবৃত্তঃ কলির্মহান্। অর্জুন এবং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই বিষণ্ণ কথার কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। কিন্তু নিঃশব্দে তাঁরা এও বুঝিয়ে দিলেন যে, অবস্থার প্রয়োজনে যুদ্ধ তাঁদের করতেই হবে। অগত্যা যুধিষ্ঠির এই যুদ্ধবাদ মেনে নিলেন বৃহত্তর স্বার্থে, মেনে নিলেন কৃষ্ণের হাতে সমস্ত ভার সমর্পণ করে।

আরও একবার সেই ধর্মকথার তাৎপর্যটুকু এখানে বুঝে নেওয়া দরকার। লক্ষ করে দেখুন— এই যুদ্ধোদ্যোগের পর ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হবে এবং সেখানে অর্জুনের বৈক্লব্য দেখে পরম ঈশ্বর নামে প্রথিত ব্যক্তিটি অর্জুনকে গীতার উপদেশ করবেন। আশ্চর্য হল সারা জীবন যিনি ধর্ম-ধর্ম করে এসেছেন, সেই যুধিষ্ঠির কিন্তু এই উপদেশের আধার হলেন না। হলেন অর্জুন। আগেই এর সমাধান বলেছি। গীতার সমস্ত উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে যোগভূমিতে পৌঁছাতে চাইছেন, যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্নেই সেখানে আরূঢ়। নিরাসক্ত কর্ম করা থেকে সর্ব-কর্মফল-ত্যাগ, এমনকী সমস্ত ধর্মত্যাগ করে যে ঈশ্বরের শরণাগতি— গীতার এই চরম এবং পরম উপদেশ পূর্বাহ্নেই যুধিষ্ঠিরের আত্মস্থ। রাজার সিংহাসনেও তাঁর লোভ নেই, বনবাসেও কোনও কষ্ট নেই তাঁর। ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসেও তাঁর কোনও স্ফীতি ঘটেনি আবার বনবাসের মালিন্যও তাঁকে স্পর্শ করে না। শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি তাঁকে ছেড়ে দেন, চরমভাবে অপমানিত হয়েও শত্রুপক্ষের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গেও তাঁর সম-দুঃখভাব বিচলিত হয় না। ভগবদ্গীতোক্ত উপদেশের এমন ফলিত উদাহরণ যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কেই বা হতে পারেন। আর ঠিক এতটাই নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ বলেই তিনি স্থিতধী, তিনি যুধিষ্ঠির।

যাই হোক, দার্শনিক যুধিষ্ঠিরের অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ শুরু হল এবং ওই আঠেরো দিনের যুদ্ধপর্ব যুধিষ্ঠিরকে একেবারে অস্থির করে দিল। আর এইটুকু সময়ের মধ্যে কত দুঃখজনক কাজই না তাঁকে করতে হয়েছে। মানবিকতার কত সঙ্কট, কত ধর্ম-সঙ্কট এই যুদ্ধকালেই তৈরি হয়েছে, তা শুধু যুধিষ্ঠিরই জানেন। যুধিষ্ঠিরের মনে আছে সেই নবম দিনটির কথা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নবম দিন

শেষ হয়েছে। সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু মুছে যাবার পর পাণ্ডবশিবিরে যুধিষ্ঠিরের ঘরে রীতিমতো এক সভা বসে গেছে। পাঞ্চালরা, বৃষ্ণিরা সকলে পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। রাত্রি বাড়ছে— ততো রাত্রিঃ সমভবৎ সর্বভূতপ্রমোহিনী।

সমবেত সেনা-প্রধানেরা ভীষ্মের আক্রমণে পর্যুদস্ত, ব্যতিব্যস্ত। নয় দিনের যুদ্ধে কত নিরীহ সৈন্য ভীষ্মের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। মর্মাহত রণক্লান্ত যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন— আর নয় কৃষ্ণ ! নল-খাগড়ার বনে হাতি ঢুকলে যেমন মটাস মটাস করে সব ভেঙে যায় আমার সৈন্যদের সেই অবস্থা হয়েছে কৃষ্ণ। ইন্দ্র-বরুণকেও বোধহয় যুদ্ধে হারানো সম্ভব কিন্তু ভীষ্মকে নয়। আমার বুদ্ধি কত কম যে, আগে বুঝিনি, রণক্ষেত্রে আমাদের ভীষ্মের সম্মুখীন হতে হবে। আর সেইজন্যই আমার আজ এই করুণ অবস্থা। অতএব আর নয়, কৃষ্ণ ! আমার পক্ষে আবারও বনে যাওয়াই ভাল— শ্রেয়ো মে তত্র বৈ গতম্। আমি আর যুদ্ধ করতে চাই না। ভীষ্মের বাণের সামনে আমার সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছে যেন আগুনে পিঁপড়ে পড়ছে। আমার ভাইরা তাঁর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত। এ সবই আমার দোষ। আমার দোষেই আমার ভাইদের বনবাসের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, আমার দোষেই পাঞ্চালী-কৃষ্ণার ওই অপমান। আর এই ভীষ্মের সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে— বেঁচে থাকাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। যদি বাঁচি তবে শেষ জীবনটুকু ধর্ম আচরণ করে কাটাব— জীবিতস্যাদ্য শেষেণ চরিষ্যে ধর্মমুত্তমম্।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ এবং আবেগ দুই বুঝলেন, তাঁকে সান্ত্বনাও দিলেন অনেক। এমনও বললেন যে, প্রয়োজনে তিনি পূর্ব-প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করে অস্ত্র ধারণ করবেন ভীষ্মের বিরুদ্ধে। যুধিষ্ঠির বললেন— না কৃষ্ণ ! আমাদের জন্য তুমি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হও, এ আমি চাই না। বরঞ্চ আমরা ভীষ্মের কাছেই যাই। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন— আমি দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করব বটে কিন্তু তোমাকে সৎপরামর্শ দেব সব সময়। কিন্তু দুঃখটা কোথায় জান, কৃষ্ণ ! আমার বাবার বাবা ঠাকুরদাদাকে আমরা মারতে চাইছি, ক্ষত্রিয়-রাজার স্বধর্মটা কতটা ন্যক্কারজনক, আন্দাজ করতে পার— পিতুঃ পিতরমিষ্টঞ্চ ধিগস্তু ক্ষত্রজীবিকাম্ ?

যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে নিয়ে, কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে পিতামহ ভীষ্মের কাছে গেলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু অসহায় ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— কী করে আপনাকে জয় করব, পিতামহ ! কী করেই বা আমরা রাজ্য লাভ করব— তখন কেমন লেগেছিল যুধিষ্ঠিরের ! এত কষ্টকর কথা যুধিষ্ঠির কাউকে কোনওদিন বলেনি। তিনি রাজ্য চান না, ঐশ্বর্য চান না, কিন্তু শুধু ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছেন বলে তাঁকে তাঁর পরম-প্রিয় পিতামহের মৃত্যুর উপায় জানতে হচ্ছে পিতামহের কাছেই। তাও কী জন্য ? তাঁর একান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যের প্রাণের মূল্যে পাওয়া রাজত্বের জন্য। এমন রাজত্ব যুধিষ্ঠির অন্তত চান না।

দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম মারা গেছেন। কিন্তু তাতে যুধিষ্ঠিরের যন্ত্রণা কিছু কমেনি। দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বের সময়ে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্তটি নেমে এল— অভিমন্যুর মৃত্যু। যুধিষ্ঠির কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে। তিনি নিজেই যে সেই কৈশোর-গন্ধী নতুন যুবককে যুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করেছিলেন। মহামতি দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহের কোনও দ্বার অরক্ষিত নেই। সেই ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে শত্রুক্ষয় করতে হবে এবং বেরিয়েও আসতে হবে আপন বুদ্ধিমত্তায়। অর্জুন নিজে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। এ দিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ তৈরি করে অবিরাম পাণ্ডব-সৈন্য শাতন করে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির ভীম সকলে প্রমাদ গণছেন সৈন্য-ক্ষয় দেখে। কিছু একটা করতে হবে।

বেচারা যুধিষ্ঠির ! তিনি গুহা-নিহিত ধর্মের তত্ত্বও বুঝি সরলভাবে বোঝেন, কিন্তু যুদ্ধের কিছুই বোঝেন না। অথচ এমনই দুর্দৈব যে, অবস্থার চাপে পড়ে যুধিষ্ঠিরকেই যুদ্ধ-চালনার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। দ্রোণের অবিরাম আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে— অভিক্রুদ্ধং দ্রোণং মত্বা যুধিষ্ঠিরঃ— পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ অভিমন্যুকে বললেন— অর্জুন এসে যাতে আমাদের গালমন্দ না করে, তুমি সেইরকম একটা কিছু কর, বাছা— এত্য নো নার্জুনো গর্হেৎ যথা তাত তথা কুরু। এই চক্রব্যূহ ভেদ করার

শক্তি আমাদের কারও নেই। অর্জুন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং তুমি— এই চারজন শুধু এই বিশেষ ব্যূহভেদের রহস্য জান। কিন্তু পঞ্চম কোনও ব্যক্তি নেই যে জানে এ সম্বন্ধে। তাই আমি বলছিলাম— বাছা ! তুমি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রবেশ কর এই চক্রব্যূহের মধ্যে— ক্ষিপ্রমস্ত্রং সমাদায় দ্রোণানীকং বিশাতয়। নইলে আমাদের এই অক্ষমতা দেখে তোমার পিতা এসে আমাদের দুষবেন, বাছা !

সেই ভয়ঙ্কর বালক-কিশোর জ্যেষ্ঠ-তাতের কথা অমান্য করেননি। শুধু বলেছিলেন— পিতার কাছে আমি চক্রব্যূহে প্রবেশ করবার কৌশলটুকুই শিখেছি, কিন্তু এই ব্যূহ থেকে বেরবার উপায় আমি শিখিনি— নোৎসহে তু বিনির্গন্তুমহং কস্যাঞ্চিদ্ আপদি। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— তুমি শুধু একবার, প্রবেশ পথটি তৈরি করে দাও— দ্বারং সংজনয়স্ব নঃ— তারপর আমরা তোমার পিছন পিছন ঢুকছি। কথাটার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বেশি হল মহাবলী ভীমের অনুধ্বনিতে। ভীম বললেন— আমি ঠিক তোমার পিছন পিছন— এই চক্রব্যূহের অন্তরে প্রবেশ করব। আর আমার সঙ্গে থাকবেন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বৃষ্ণিবীর সাত্যকি— অহং ত্বানুগমিষ্যামি ধৃষ্টদ্যুম্নো'থ সাত্যকিঃ।

নবযুবক অভিমন্যু যে এই সব মহাবীরদের অনুগমনের খুব অপেক্ষা করছিলেন, তা মনে হয় না। কারণ মহাবীরের যুদ্ধ-রোমাঞ্চ তাঁর সমস্ত শরীরে। কোনও বাধাই তাঁর কাছে বাধা নয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে অনুগমনের কথা দিয়েছিলেন তা যেমন এক দিকে অভিমন্যুর সুরক্ষার কারণে, অন্যদিকে ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকিকে অবিশ্বাস করা যায় না বলেই। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— তুমি একবার যদি ঢোকার পথটি করে দিতে পার তবে আমরা সব দিক রক্ষা করে তোমার অনুগমন করব— রক্ষন্তঃ সর্বতোমুখাঃ। আর ভীম বলেছিলেন— তুমি যদি একবার চক্রব্যূহের মুখটুকু ভেঙে দাও— সকৃদ্‌ভিন্নং ত্বয়া ব্যূহং— তা হলে অন্যদের আমরা ধ্বংস করে দেব— বয়ং প্রধ্বংসয়িষ্যামো নিঘ্নমানা বরান্ বরান্।

আমরা জানি যে, যুধিষ্ঠির-ভীমের ভাবনা সত্যে পরিণত হয়নি দ্রোণাচার্যের ব্যূহ নির্মাণ-কৌশলে এবং জয়দ্রথের পরাক্রমে। সৌভদ্র অভিমন্যু চক্রব্যূহের যে পথ দেখিয়েছিলেন, সে পথ দিয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি জয়দ্রথের অমানুষিক বীরত্বে— পাণ্ডূনাং দর্শিতঃ পন্থাঃ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ। অভিমন্যু সপ্তরথীর অন্যায় আঘাতে মৃত্যুবরণ করছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আজ আর স্থির রাখা যাচ্ছে না। প্রধানত তাঁরই প্ররোচনায় অভিমন্যু শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেছেন, এখন তাঁর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির কী করবেন ? কী করে তিনি মুখ দেখাবেন অর্জুনের সামনে, কৃষ্ণের সামনে অথবা সুভদ্রার সামনে। অথচ এঁদেরই মুখ উজ্জ্বল করার জন্য তাঁদেরই প্রিয়-কামনায় তিনি অভিমন্যুকে এই ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। অথচ তাঁদেরই সবচেয়ে অপ্রিয় ঘটনাটি ঘটে গেল— প্রিয়কামো জয়াকাঙ্ক্ষী কৃতবানিদমপ্রিয়ম্। যুধিষ্ঠির সমস্ত ঘটনার মূলে নিজের লোভকেই দায়ী করছেন এখন। তিনি বলেছেন— মোহ থেকেই এমন লোভের সৃষ্টি হয়, নইলে অভিমন্যুকে যুদ্ধে পাঠানোর দোষটুকু আমি বুঝতে পারলাম না কেন— ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ মোহাল্লোভঃ প্রবর্ততে।

যুদ্ধের আগে উদ্যোগপর্বে যুধিষ্ঠির এই ভয়ের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন— আমি যুদ্ধ চাই না, কৃষ্ণ ! একজন কাপুরুষও যুদ্ধের সময় হঠাৎ করে এক মহাবীরকে মেরে ফেলে, অযশস্বী ব্যক্তি হত্যা করে যশস্বী-ব্যক্তিকে। সত্যিই তো এখানেও তাই হল। সপ্তরথী মিলে এক বালককে বধ করল। এবং এর ভবিষ্যত ফল কী হবে যুধিষ্ঠিরই একমাত্র তা আন্দাজ করতে পারেন। তিনি জানেন পুত্রশোকে আর্ত ক্রুদ্ধ অর্জুন পরের দিন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের চষে ফেলবেন এবং ভয়ংকর অনর্থপাত ঘটবে সেই কালে— পার্থঃ পুত্রবধাৎ ক্রুদ্ধঃ কৌরবান্ শোষয়িষ্যতি।

যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য স্বয়ং ব্যাস এসেছেন পাণ্ডব-শিবিরে। যুধিষ্ঠিরের মন মানেনি। অর্জুনের কাছে লজ্জা নয়, কৃষ্ণ কিম্বা সুভদ্রার কাছেও নয়। নিজের কাছে নিজেরই যুধিষ্ঠিরের লজ্জা। অর্জুন-বাসুদেবের প্রিয় কামনায় এবং অভিমন্যুর মুখ উজ্জ্বল করার জন্যই যুধিষ্ঠির তাঁকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যা ভেবেছিলেন, তা হল না। আর সত্যিই তো, কী ছেলেমানুষের মতোই না তিনি ভেবেছিলেন ! যুদ্ধবিদ্যার সারাংশটুকুও জানা থাকলে দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার মতো

সাত মহারথ-যোদ্ধার শক্তি-বলয়ের মধ্যে এক বালককে কেউ প্রবেশ করতে অনুরোধ করে না, বিশেষত যে ব্যূহ-নিষ্ক্রমণের উপায় জানে না। তার ওপরে দ্বিতীয় ছেলেমানুষি নিজেদের ওপর ভরসা করা।

কিন্তু অসাধারণ অক্ষাত্রোচিত ছেলেমানুষির জন্যই যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠির। কনিষ্ঠ অর্জুন যুদ্ধের সম্পূর্ণ সময় ধরে ছেলেমানুষের মতোই যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেছেন। এই যে এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেল, এর জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে একটি কুবাক্যও বলেননি। ভীম এবং অন্যান্য বীরেরা যে ব্যূহ-দ্বারে জয়দ্রথের পরাক্রমে নিরস্ত হয়েছেন, সেজন্য জয়দ্রথ-বধের বীরোচিত প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন অর্জুন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলেননি। একটি শিশুকে যেমন তার পিতা-মাতা সমস্ত বিপন্নতা থেকে আগলে রাখে, অর্জুনও তেমনই এই জ্ঞানবৃদ্ধ শিশু যুধিষ্ঠিরকে চিরকাল সমস্ত অস্ত্রাঘাত থেকে আগলে রেখেছেন। জয়দ্রথকে বধ করতে যাবার আগে নিজের শিষ্য যুযুধান সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের সুরক্ষার ভার দিয়ে অর্জুন বলেছিলেন— জয়দ্রথকে হত্যা করাটা যেমন আমার সবচেয়ে বড় কাজ, ঠিক তেমনই বড় আরেকটা কাজ হল ধর্মরাজকে রক্ষা করা, তাঁকে বিপন্মুক্ত রাখা—

যথা পরমকং কৃত্যং সৈন্ধবস্য বধো মম।
তথৈব সুমহৎ কৃত্যং ধর্মরাজস্য রক্ষণম্ ॥

বেচারা যুদ্ধানভিজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-স্বভাব যুধিষ্ঠির। সম্পূর্ণ যুদ্ধখণ্ডে তাঁর অবদানও ব্রাহ্মণোচিত এবং সত্যনিষ্ঠ, যদিও সেখানেও তাঁর বিপন্নতা তৈরি হয়েছে যুদ্ধের কারণেই। এই যে একটু আগে ভীষ্মের কাছেই তাঁর মৃত্যুর উপায় জেনে এলেন যুধিষ্ঠির, যুদ্ধ না করতে পারলেও এটাই যুদ্ধে তাঁর অবদান। আবার দ্রোণাচার্যকে যখন কেউই বাগে আনতে পারছেন না, তখনও এই যুধিষ্ঠিরই আবার পাণ্ডব-শিবিরের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠলেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সে ছিল এক রীতিমতো ধর্ম-সংকট। দ্রোণাচার্যকে যখন কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না, তখন কৃষ্ণই এই পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, এই ভয়ংকর মানুষটিকে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দিতে হবে। কথাটা অর্জুনের কাছেও ভাল ঠেকেনি, যুধিষ্ঠিরও অতি কষ্টে এতে মত দিয়েছেন।

কৃষ্ণের কথা মতো ভীম অশ্বত্থামা নামে একটি হাতিকে মেরে কোনওমতে বাক্যে সত্যতা রক্ষা করে দ্রোণকে বলেছিলেন— অশ্বত্থামা মারা গেছেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য কম্পমান হলেও দ্রোণ ভীমের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি আরও বিপুল পরাক্রমে পাণ্ডবসৈন্য বধ করা আরম্ভ করেছিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের যে বিপুল ক্ষয় আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা মনে রেখে কৃষ্ণ দ্বিতীয়বার যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামার মৃত্যু-সংবাদ দ্রোণকে দেবার জন্য। ভীমকে যখন প্রথমবার দ্রোণ-পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ রটনা করতে বলা হয়েছিল, তখন সে ব্যাপারটাই যুধিষ্ঠিরের মোটে ভাল লাগেনি। তিনি অতি-কষ্টে কৃষ্ণের কথা মেনে নিয়েছিলেন— কৃচ্ছ্রেণ তু যুধিষ্ঠিরঃ। এখন কৃষ্ণ তাঁকেই বলছেন সেই সংবাদের পুনরাবৃত্তি করতে। কারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এই কথা উচ্চারণ করলে দ্রোণ তা বিশ্বাস করবেন।

যুধিষ্ঠিরের কাছে এ এক বিশাল ধর্ম-সংকট। কী করে তিনি এত বড় অন্যায়টা করবেন। কৃষ্ণ বললেন— না বলে উপায় নেই ধর্মরাজ! এই রকম ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণ যদি আর আধ বেলা যুদ্ধ করেন— যদ্যর্ধদিবসং দ্রোণো যুধ্যতে মন্যুমাস্থিতঃ— তবে নিশ্চিত জেনে রাখুন আপনার পাণ্ডব-সেনার একটি সৈন্যও টিকবে না। অতএব এই সাংঘাতিক বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করুন আপনি। অন্তত এই মুহূর্তে আপনার ধর্মসম্মত সত্য-রক্ষার চেয়ে মিথ্যাটাই অনেক বেশি শ্রেয়— সত্যাজ্জ্যায়োঽনৃতং বচঃ। মনে রাখবেন এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি আপনি মিথ্যা কথা বলেন, তবে মিথ্যার দোষ তাতে লাগে না— অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতেঽনৃতৈঃ।

যুধিষ্ঠিরের কাছে এই কথাগুলি খুব পরিচিত নয়। তাঁর কাছে যা অসত্য মনে হচ্ছে, সত্য-জ্ঞানের আধার কৃষ্ণের কাছে তা সত্য নয়। যুধিষ্ঠিরের সত্যের যুক্তি কিছু রুক্ষ-শুষ্ক বটে, তার মধ্যে নমনীয়তার কোনও অবকাশ নেই, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে সেই যুক্তি পরিবর্তনীয়, নমনীয়। মহামতি

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই সত্য-যুক্তির পরমার্থতা নিয়ে তাঁর 'নীতি যুক্তি ও ধর্ম'-এর মধ্যে অসামান্য আলোচনা করেছেন। 'এথিকস্' এবং 'মর‍্যালিটি'র প্রসঙ্গও সেখানে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত, আমরা তাই সেই তাত্ত্বিক আলোচনা পড়ে নিতে বলছি অনুসন্ধিৎসু পাঠককে। আরও বলছি এই কারণে যে, তাঁর থেকে বেশি কিছু বলার ক্ষমতা আমাদের নেই। এখানে আমরা সেইটুকুই অবশ্য বলব, যা একান্তই যুধিষ্ঠির-সংক্রান্ত।

আমরা জানি— কৃষ্ণের ওপর আস্থা রেখে যুধিষ্ঠির এই অসত্য ভাষণ করেছিলেন সভয়ে এবং অনিচ্ছায় এবং অবশ্যই আপন-পক্ষের জয়ৈষণায়— তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ। অশ্বত্থামার মিথ্যা-মৃত্যুর সঙ্গে অশ্বত্থামা নামের হস্তীর অনুষঙ্গটুকু যতই সত্যভাষণের ভান তৈরি করুক কিন্তু যুধিষ্ঠির রেহাই পাননি। সারা জীবনের মধ্যে এই এতটুকু সত্য-চ্যুতিতে জীবনের শেষে তাঁকে একবার নরক-দর্শন করতে হয়েছিল—সেটা খুব বড় কথা নয়। কিন্তু ঐহিক চলমান জগতে তিনি যে মর্যাদা নিয়ে চলছিলেন, সেই মর্যাদা তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আরও একভাবে। মহাভারতের কবি একটি ঘটনার উল্লেখ করে কৃষ্ণের চাইতে যুধিষ্ঠিরের অনমনীয় রুক্ষ-সত্যকেই যেন সমর্থন জানালেন।

কবি লিখেছেন— আগে নাকি সত্যবাদিতার শাশ্বত কারণে যুধিষ্ঠিরের রথ সব সময় মাটি থেকে চার আঙুল ওপর দিয়ে চলত—তস্য পূর্বং রথঃ পৃথ্যাশ্চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতঃ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই মিথ্যা-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সত্যরথ ভূমি স্পর্শ করল— তস্য বাহাঃ স্পৃশন্ মহীম্। জানি, বেশ জানি— এই ঘটনায় সত্যশীল যুধিষ্ঠিরের কত কষ্ট হল। যে সত্য রক্ষার মধ্যে তাঁর অহঙ্কার ছিল, তাঁর অনন্যসাধারণত্ব ছিল সেই সত্যের অভিমান-মঞ্চ থেকে নেমে আসতে হল যুধিষ্ঠিরকে। পরম ঈশ্বর বুঝি কোনও অহঙ্কারই সহ্য করেন না, সত্যের অহঙ্কারও নয়। তাঁর চতুরঙ্গুলি-উন্নত অলৌকিক সত্যরথ ভূমি স্পর্শ করে তাঁকে সবার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। অলৌকিক দিব্য-আসন থেকে নেমে তাঁকে মনুষ্যোচিত ভূমি স্পর্শ করতে হল বহুজনের জীবনের কারণে। হয়তো মনুষ্যজগতে তারও প্রয়োজন আছে। রুক্ষ সত্যের নীতি জীবনের যুক্তির কাছে পরাজিত— এই সত্যও হয়তো তাঁর উপলব্ধি করার ছিল।

নীতির থেকে যুক্তিই যে এখানে বড় সত্য—সেটা সত্য-চ্যুত যুধিষ্ঠির মনে মনে না মানলেও, সে সত্যও তিনি বুঝতে পারলেন নিজের কারণে। সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তাঁকে এই যুক্তির ধর্ম শিখিয়ে দিল। আমরা দেখব— যুধিষ্ঠিরের মতো এত ধীর মানুষও কেমন অস্থির হয়ে পড়লেন কর্ণের পৌনঃপুনিক আক্রমণে। বার বার তিনি পরাজিত হচ্ছিলেন কর্ণের কাছে। বার বার তিনি মার খাচ্ছিলেন। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছল যে, অর্জুনের সামান্য অনুপস্থিতিতে ভীম-যুধিষ্ঠির— এই দুই ভাইকে প্রায় নাকাল করে তুলেছেন কর্ণ। ধর্মময় যুধিষ্ঠিরের অবস্থা এখন এমনই যে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এখন তিনি শুধু দেখেন—ওই কর্ণ আসছেন মারতে, এই তিনি আসছেন যুধিষ্ঠিরকে ধরতে—পশ্যামি তত্র তত্রৈব কর্ণময়মিদং জগৎ।

তাঁর এই অপার দুঃখ-ভয় ক্রোধে পরিণত হল এক সময়। একদিন তিনি অর্জুনকে বলেই ফেললেন— তুমি বনবাসের সময় দ্বৈতবনে দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে— কর্ণকে মারব— তার কী হল ? আজকে কর্ণের সামনে ভীমকে ফেলে, আমাকে ফেলে তুমি যে পালালে সেটা কি খুব অর্জুনের মতো হল ?

যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই মুহূর্তে অর্জুনকে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাঁকে সব দিকে তাল রাখতে হয়। যেখানেই ফাঁক, সেখানেই অর্জুনের প্রয়োজন পড়ে। সেদিন দুর্ধর্ষ সংশপ্তকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল অর্জুনকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির আর এ সব যুক্তি মানতে নারাজ। অর্জুনকে তিনি কেবলই গালাগালি দিচ্ছেন। এমনও বলছেন— কুন্তীর গর্ভে তাঁর জন্ম নেওয়াটাই বৃথা হয়েছে। আবার এমনও বলছেন— বাপু আগে বললেই পারতে অর্জুন! তখন তো খুব বলেছিলে— আমি এই করব, সেই করব। কিছুই তো পারছ না। ঘটোৎকচ মারা গেল, অভিমন্যু মারা গেল, এখন দেখছি দুর্যোধনই ঠিক বলেছিল— কর্ণের সামনে দাঁড়ানো তোমার কম্মো নয়। আমি মূর্খ বলে দুর্যোধনের

কথায় বিশ্বাস করিনি, আর মূর্খের মতোই তোমার ভরসায় পাঞ্চাল-বৃষ্ণি-কেকয় ইত্যাদি রাজাদের ডেকে এনেছি যুদ্ধ করার জন্য। বৃথা সব বৃথা।

ক্ষোভে দুঃখে যুধিষ্ঠির শেষ কথা উচ্চারণ করলেন— কর্ণ তোমাকে একটি তৃণের সমান মনে করে। নইলে বার বার সে আমাকে এইভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে পারে— তৃণং চ কৃত্বা সমরে ভবন্তং/ ততো'হমেবং নিকৃতো দুরাত্মনা। যুদ্ধক্ষেত্রের হাল সে এমনভাবেই পরিবর্তন করে দিয়েছে, যাতে আমার মনে হয়েছে— আমার কোনও স্বজন-বান্ধব নেই। আর তুমি যে হাতে একটা সোনার বাটওয়ালা খড়্গ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর কাঁধে এই গাণ্ডীব ধনু— এ শুধু তোমার অঙ্গশোভামাত্র— গাণ্ডীবং তালমাত্রম্। আমার ইচ্ছে— তোমার গাণ্ডীব-ধনুকখানি কৃষ্ণের হাতে দিয়ে তুমি যদি তাঁর রথের সারথি হতে, তো অনেক ভাল হত। অথবা তুমি যদি সত্যিই কর্ণকে না মারতে পার, তবে যে কাউকে তুমি গাণ্ডীবটি দান করে দাও, যে অন্তত তোমার থেকে বেশি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী— দেহি-অন্যস্মৈ গাণ্ডীবমেতদদ্য/ যো'স্ত্রৈস্ত্বভ্যধিকো নরেন্দ্রঃ। ধিক তোমার গাণ্ডীবকে। ধিক তোমার নিজের নাম লেখা বাণগুলিকে। ধিক তোমার কপিধ্বজ রথকে।

প্রক্ষেপবাদী পণ্ডিত-সজ্জনেরা যদি বলতেন— এই অংশটুকু মূল মহাভারতের কবির লেখা নয়, কারণ সমগ্র মহাভারতের মধ্যে কখনও যুধিষ্ঠিরকে এমন রাগ করতে দেখা যায়নি, কখনও তাঁকে এমনতর কটু কথা বলতে শোনা যায়নি, তা হলে আমাদের মতো মানুষকে হয়তো এই সময় চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। সত্যিই তো যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে স্থিরতা এবং ধৈর্যের যে ধারাবাহিকতা আছে, তাতে এই অসম্ভব রাগটুকু তাঁকে মানায় না। বিশেষত এই রাগ তিনি যার ওপরে করছেন, তিনি সদা-সর্বদা তাঁর অনুগামী শিষ্যের মতো আচরণ করেছেন, তাঁর অন্যায়ের সময়েও অর্জুন কখনও তাঁকে অতিক্রম করেননি। সেই অর্জুনকে তিনি যে ভাষায় অপমান করলেন এবং যার একাংশমাত্র এখানে আমরা উদ্ধার করেছি, তা অন্তত কোনওভাবেই যুধিষ্ঠিরোচিত নয়।

কিন্তু হয়। এমনটিই হয়। বার বার বলেছি এ-কথা। শত ধর্ম, শত সত্যের অন্তরালে যুধিষ্ঠিরও তো একজন মানুষ। মহাভারতের কবিকে যখন এ-কথা সপ্রমাণ করতে হয়, তখনই যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাহীদের মনে ধাক্কা লাগে। যুধিষ্ঠির-চরিত্রের এমনতর ব্যতিক্রম-ন্যাস পরোক্ষে সেই অসম্ভব সত্যই প্রমাণ করে যে, যুধিষ্ঠির মূলত সত্যবাদী, মূলত ধীর-স্থির। আরও একটা কথা হল— সত্যের নীতির চেয়ে প্রজ্ঞা এবং যুক্তির প্রয়োজনটাও যে জীবনে কখনও অপেক্ষিত, সেটাও যুধিষ্ঠির হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে গেলেন তাঁর কটু-ভাষণের উত্তরপর্বে। দ্রোণের মৃত্যুর পূর্বে সত্য-চ্যুত হয়ে তাঁর যদি কোনও মানসিক আঘাত লেগে থাকে, তবে সেই সাময়িক সত্য-চ্যুতির সার্থকতার প্রমাণ তাঁকে পেতে হল নিজের মাধ্যমেই।

অর্জুনকে যদি তিনি আরও পাঁচটা জঘন্য কথা বলে গালাগালি দিতেন, তা হলেও তিনি কোনওভাবেই যুধিষ্ঠিরকে কোনওভাবেই অতিক্রম করতেন না। সে কথা জোর দিয়েই বলা যায়, এমনকী অনেক প্রমাণ দিয়েও বলা যায়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের শেষ কথা শুনেই অর্জুনকে আমরা তাঁর আপন প্রকোষ্ঠে ফিরে আসতে দেখছি। সেখানে তাঁর প্রাণসখা কৃষ্ণও বসে আছেন অনেকক্ষণ। তিনি অবশ্য অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাক্যগুলি কানে শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু কিছুই না বোঝার ভান করে বসে আছেন।

অর্জুন এলেন এবং এসেই একটি ক্ষুরধার তরবারি তুলে নিলেন হাতে। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভাই যুধিষ্ঠিরকে মারতে চান— জিঘাংসুর্ভরতর্ষভম্। এক মুহূর্তে কৃষ্ণ বুঝে গেলেন কী হতে চলেছে। তিনি একটু বোকা সেজে জিজ্ঞাসা করলেন— ঢাল-তরোয়াল নিয়ে চললে কোথায় ভায়া—উবাচ কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত। এখন এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে বলে তো জানি না। ওই যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধি ছেলেগুলো, মধ্যম-পাণ্ডব তো শেষ করে এনেছেন তাঁদের। আর তুমি এই এক্ষুনি বলে গেলে— দাদা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে আসি। তা দেখাও তো হল তাঁর সঙ্গে। আর তিনি তো ভালই আছেন— স রাজা ভবতা দৃষ্টঃ কুশলী চ যুধিষ্ঠিরঃ। তো হঠাৎ কার এমন খবর পেলে, যার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তরোয়াল নিয়ে দৌড়চ্ছ— কস্মাত্ত্বান্ মহাখড়্গং

পরিগৃহ্যাতি সত্বরঃ।

দুজনের এই কথোপকথনের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে আসতেও দেখা গেল। অর্জুন তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে কৃষ্ণকে বললেন— এই যে যিনি এক্ষুনি বললেন— তোমার ওই গাণ্ডীব ধনুকটি অন্যের হাতে তুলে দাও, তাঁর মাথাটা কেটে ফেলতে চাই আমি। সেটাই আমার নিয়ম— ছিন্দাম্যহং তস্য শিরঃ ইত্যুপাংশুব্রতং মম।

অর্জুনের নাকি প্রতিজ্ঞা ছিল— যে ব্যক্তি তাঁর গাণ্ডীব-ধনুর নিন্দা করবে, তিনি তাকে হত্যা করবেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা সে বড় সাংঘাতিক জিনিস। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম। অর্জুন তাই এখন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। কারণ তিনিও ধর্ম-চ্যুত হতে পারেন না— প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যামি হত্বৈনং নরসত্তমম্। তিনি কৃষ্ণকে বললেন— তোমার কী মত ? আমার কি এটাই করা উচিত নয় ? কৃষ্ণ অর্জুনকে একরাশ ধিক্কার দিয়ে বললেন— ছিঃ অর্জুন। তোমার বুদ্ধিটা এমন মোটা দাগের, তা তো জানতাম না। বেশ বুঝতে পারছি— তুমি বৃদ্ধ পণ্ডিত-জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা করনি— ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্-ত্বয়া। সময় উপস্থিত হলে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়— সেটাই তুমি বুঝলে না। অথচ তুমি নাকি সত্য রক্ষা করতে যাচ্ছ ? কবে কোন সময়ে বাচ্চা ছেলের মতো একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আর সেই প্রতিজ্ঞা তোমার রাখতে হবে ? মনে রেখো— যুধিষ্ঠির তোমার বড়ভাই। তাঁর মতো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে দুটো নেই, তিনি তোমার গুরু। আর তাঁকে কিনা তুমি হত্যা করার কথা ভাবছ— স গুরুঃ পার্থ কস্মাত্ত্বং হন্তুকামো'ভিধাবসি ?

কৃষ্ণ বন্ধুভাবে অনেক গালমন্দ করলেন অর্জুনকে। কৌশিক নামে এক মুনির একটি বিশেষ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে তিনি জানালেন যে সময়কালে সত্য-কথা বলা বা প্রতিজ্ঞার সত্যতা-রক্ষাও কত অন্যায় ঘটাতে পারে। কৃষ্ণ বলেছিলেন— এমন ক্ষেত্র আসতেই পারে যেখানে সত্য জানলেও বা সত্য হলেও তা উচ্চারণ করা উচিত নয়, কখনও বা সত্যের বদলে মিথ্যা কথা বলাটাই পরম শ্রেয় এবং পরম সত্য বলেও গণ্য হতে পারে— যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চানৃতং ভবেৎ। বিশেষত একটা মিথ্যা যদি মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগে, তবে সেই মিথ্যা পরমধর্ম বলে গণ্য হবে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কাজটাই করিয়েছিলেন দ্রোণ-বধের সময়। কৃষ্ণ আজকে যা অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, সেই পরম-তত্ত্ব যুধিষ্ঠির জানতেন বলেই পরম সত্যবাদী হয়েও তিনি তাঁর নমনীয়তাটুকু দেখিয়েছেন। কৃষ্ণের বক্তব্য ছিল— যেখানে সত্য বললে প্রাণিবধের সম্ভবনা, সে সত্য না বলাই ভাল এমনকী মিথ্যা বলাও ভাল— ভবেৎ সত্যম্ অবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। যুধিষ্ঠির যে দ্রোণ-বধের জন্য মিথ্যাবাক্য বলেছিলেন, তা বহু-জীবনের রক্ষার কল্পে। সে দিন দ্রোণবধের পূর্ব মুহূর্তে মিথ্যা-বাক্য উচ্চারণে সম্মত হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের যদি কোনও খুঁতখুঁতি থেকে থাকে, তবে আজ কৃষ্ণের তত্ত্ববাক্য শুনে সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর চলে গিয়ে থাকবে।

আরও বড় কথা যুধিষ্ঠির নিজেই এমন মৃত্যুর সামনে সেদিন এসে দাঁড়ালেন, যা তাঁর অকল্পনীয় ছিল। তাঁর শিষ্যের মতো ছোটভাই তাঁকে মারতে চাইছে। কৃষ্ণের বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং সত্য নির্ধারণের অদ্ভুত বিচার অর্জুনকে তাঁর ক্রোধোদ্যম থেকে বিরত করেছে ঠিকই, কিন্তু যুধিষ্ঠিরও আরেকবার বুঝেছেন যে, দ্রোণ-বধের সময় মিথ্যা উচ্চারণ করে তিনি কোনও অন্যায় করেননি। আসলে অর্জুনের মধ্যে সেই উদার নমনীয়তা নেই যা যুধিষ্ঠিরের আছে। নইলে দ্রোণ-বধের সময় যে মিথ্যা-উচ্চারণের প্রস্তাব কৃষ্ণ দিয়েছিলেন, অর্জুন সেটাও মানেননি, অর্জুন তার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সত্যবাদিতা থেকে চ্যুত হয়ে যাঁর ধর্মরথ ভূমি স্পর্শ করেছে, যার জন্য তাঁকে ভবিষ্যতে নরক-দর্শন করতে হবে, সেই যুধিষ্ঠিরও কিন্তু সত্যের বিচার করেন প্রজ্ঞা দিয়ে নমনীয়তা দিয়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, যুধিষ্ঠিরকে অন্য জনে যতই বোকাসোকা ভাবুন, তাঁর সত্য-বুদ্ধি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং সেইজন্যেই স্থান-কাল-পাত্র বুঝে তা নমনীয়ও বটে। আমরা দ্রোণ-বধের পূর্বে মিথ্যা-উচ্চারণ সম্বন্ধে যে খুঁতখুঁতির কথা কল্পনা করেছি, তা আমাদের কল্পনামাত্রই। বাস্তবে

কিন্তু কৃষ্ণ যেই বলেছেন— দ্রোণ-বধ সম্পন্ন হলে বহুজনের প্রাণ-রক্ষা ঘটবে, যুধিষ্ঠির তাতে অনিচ্ছুকভাবে হলেও সম্মত হয়েছেন। তাঁর যে তর্কযুক্তিসম্মত এক সত্যের বোধ ছিলই, সে কথা অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের তিরস্কার-বাক্য থেকেই বোঝা যায়। আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার গোঁয়ার্তুমি থেকে সত্যচ্যুত হওয়াটাই অর্জুনের পরম ধর্ম হবে, সেটা বোঝানোর সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন— আজকে আমি তোমাকে যে সত্য-বিচারের আসল রহস্যটা জানাচ্ছি, তা শুধু আমি কেন, এ সত্য বোঝাতে পারতেন মহামতি ভীষ্ম অথবা বোঝাতে পারতেন সমস্ত ধর্মের রহস্য যিনি জানেন, সেই যুধিষ্ঠির— যদ্ ব্রূয়াত্তব ভীষ্মো হি ধর্মজ্ঞো বা যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের এই অসম্ভব মর্যাদা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সত্য অথবা ধর্ম সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি কত ব্যাপক, কত উদার, কত পরিচ্ছন্ন এবং কতটা বহুজন-হিতৈষিণী। আবারও সেই পুরনো কথাটা ফিরে আসে— তিনি সব দেখতে পান। তাঁর মিথ্যাচারে দ্রোণ মারা গেলেন, সেটা বড় কথা নয়। রাজধর্মের নীতিতে কোনও না কোনওভাবে তাঁকে মরতেই হত। কিন্তু তাঁর অনৃত-সত্যের কারণে সাময়িকভাবে হলেও পাণ্ডব-সেনারা বেঁচে ছিলেন। এই মুহূর্তে সেই ভূতহিতৈষিণী বুদ্ধিতেই পাণ্ডব অর্জুন একভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন এবং সব যখন ঠিকঠাক হয়ে গেল অর্জুন অনেক ক্ষমাও চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

ছোটভাইকে এইভাবে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে দেখে আর যুধিষ্ঠির থাকতে পারলেন না। হাতে ধরে তাঁকে উঠিয়ে যুধিষ্ঠির জড়িয়ে ধরলেন অর্জুনকে। ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটির মতন করে ছোটভাই অর্জুনের কাছে যুধিষ্ঠির বললেন— দেখ ভাই! আমার সমস্ত সৈন্যদের সামনে কর্ণ আমার গায়ে আঁটা লোহার বর্মটি কেটে ফেলে দিল, আমার রথের ধ্বজা কেটে দিল। তাকে আঘাত করার জন্য আমি আমার মহাশক্তিটি উঠিয়েছিলাম, সেটাও দিল খান-খান করে। আমার রথের ঘোড়াগুলি. আমার ধনুক, বাণ সবই গেল কর্ণের আক্রমণে— কবচঞ্চ ধ্বজশ্চৈব ধনুঃ শক্তি-র্হয়াঃ শরাঃ। এমন অদ্ভুত অপমান আমার কখনও হয়নি। সমস্ত সৈন্যদের সামনে এমন অপমান! এত অসহায় লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন এখনই মরে যাই— ব্যবসীদামি দুঃখেন ন চ মে জীবিতং প্রিয়ম্। এর পরেও কি আমি তোমাকে বলব না যে, আজই মারা চাই কর্ণকে।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অসহায় অবস্থা এবং তাঁর অপমান হৃদয়ঙ্গম করে সেইদিনই কর্ণ-বধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। কর্ণ মারাও গেছেন যুধিষ্ঠিরের অভিলাষ মতোই। সেই দিনই। একজন যোদ্ধা হিসেবে যুধিষ্ঠির যে কত অসহায়, তা আমরা যুধিষ্ঠিরের শত স্বীকারোক্তিতেই বুঝেছি। কিন্তু একজন অস্ত্র-শিক্ষিত ক্ষত্রিয় একটি বিশেষ যুদ্ধে যতই অবসন্ন হন, তিনি যে একেবারে অশিক্ষিত নন, সেটা বোঝানোর জন্যই কি মহাভারতের কবি শল্যপর্বে তাঁকে নায়ক বানিয়ে দিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যরাজ কম যোদ্ধা ছিলেন না। কিন্তু অনেক আগে থেকেই শল্যকে তিনিই হত্যা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন কৃষ্ণকে, বুদ্ধিমান কৃষ্ণ শল্য বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকেই উত্তপ্ত করে রেখেছিলেন। শল্যকে তিনি ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের থেকেও বড় যোদ্ধা বলে প্রতিপন্ন করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছিলেন— আপনি ছাড়া শল্যের কোনও প্রতিযোদ্ধা আমার চোখে পড়ছে না— তস্যাদ্য ন প্রপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে।

বস্তুত এ শুধুই যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসার মাধ্যমে উত্তেজিত করা। কৃষ্ণ খুব ভালই জানতেন শল্য অন্তত ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ নন। অন্যদিকে ভীম, অর্জুনের মতো ভয়ঙ্কর যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে করতে রীতিমতো ক্লান্ত। কিন্তু এই সত্যটাকে তিনি পরিবর্তন করে যুধিষ্ঠিরের উত্তেজনায় পরিণত করলেন। তিনি বললেন— ভীম-অর্জুনের ক্ষমতা হবে না শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার— তস্যাদ্য ন প্রপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে। একমাত্র তুমিই পার শল্যকে হত্যা করতে। যুধিষ্ঠির কি কৃষ্ণের বাষ্প-স্ফীত উক্তি কিছু বোঝেননি? নিশ্চয় বুঝেছেন। কারণ প্রশংসা বা নিন্দায় কাতর হওয়ার মতো ব্যক্তি তিনি নন।

এই একবার মাত্র যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্র-তেজে ভূষিত করেছেন মহাভারতের কবি। শল্যকে বধ করবার সময় যুধিষ্ঠিরের সে কী চেহারা! শল্যের উদ্দেশে মহাশক্তি নিক্ষেপ করার সময়

ক্রোধদ্দীপ্ত-নয়নে বাহু প্রসারণ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রায় নাচছিলেন— প্রসার্য বাহুং সুদৃঢ়ং সুপাণিং/ ক্রোধেন নৃত্যন্নিব ধর্মরাজঃ।

শল্য যে শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের হাতে মারা গেলেন, যুধিষ্ঠির চরিত্রের এটা কোনও বৈশিষ্ট্যই নয়। মহান যোদ্ধারা সব হত হবার পর এই শল্যপর্বেই যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবের মতো পাণ্ডবদের যুদ্ধ-প্রদর্শনীর অবসর তৈরি করেছেন মহাভারতের কবি। কিন্তু তবু আবারও বলি— যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে এই শল্য-হত্যার গৌরব কোনও নতুন মর্যাদা যোগ করে না। সত্যি কথা বলতে কি, এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, অথচ সেখানে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের কোনও অবদান থাকবে না, এটা যেমন 'মহাভারত-সূত্রধার' কৃষ্ণও মানতে পারেননি, তেমনই মানতে পারেননি মহাভারতের কবি। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অভিষিক্ত এক মহাবীর নায়ককে যুধিষ্ঠির মারলেন— এই ঘটনা বলে মহাকাব্যের কবি যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয়-জন্মের সার্থকতা যতটুকু নির্ণয় করেছেন, তার চেয়ে বেশি তাঁর ক্ষত্রিয়-জন্মের ঋণ শোধ করার সুযোগ দিয়েছেন। সারা জীবন একটি শত্রুও হত্যা করলাম না— এটা যেন কোনও ক্ষত্রিয়ের পরিচয় হতে পারে না— হয়তো এই কথা ভেবেই কবি এই যুদ্ধ-যজ্ঞের শেষ লগ্নে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হাতে ভল্ল-মুষল তুলে দিয়ে শল্য-বধের আহুতি রচনা করেছেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির হয়তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম শত্রুনাশ এবং প্রজাপালনের স্বধর্মে স্থিত হলেন।

অথচ যুধিষ্ঠির যে ক্ষত্রিয়োচিত কথাবার্তা মোটেই বলেন না, তা মোটেই নয়। উদ্যোগপর্বে সঞ্জয়ের সঙ্গে কথোপকথনে আমরা সেই পরিচয় পেয়েছি, আবারও সেই পরিচয় পাব যখন সমস্ত সৈন্য-সামন্ত হারিয়ে দুর্যোধন হ্রদে প্রবেশ করেছেন। দুর্যোধন যখন জল থেকে উঠতে বিলম্ব করছেন, তখন কঠিন ভাষায় যুধিষ্ঠির আক্রমণ করেছেন দুর্যোধনকে। বলেছেন— এখন কোথায় তোমার সেই অহঙ্কার, কোথায় তোমার সেই পৌরুষ, আর কোথায় তোমার সর্বক্ষণের হু-হুঙ্কার— ক্ব তে তৎ পৌরুষং যাতং ক্ব চ মানঃ সুযোধন। নিজেকে এত বড় বীর বলে জাহির কর তুমি, তো এই হ্রদের মধ্যে শুয়ে আছ কেন ? হয় তুমি আমাদের হত্যা করে রাজ্য ভোগ কর, নয়তো আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ কর তুমি। এই তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম— উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব ক্ষত্রিয়ো'সি কুলোদ্ভবঃ।

দুর্যোধন সঙ্গে সঙ্গেই উঠলেন না। বললেন— ভয় নয় যুধিষ্ঠির ! আমি বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া যাঁদের জন্য আমি রাজ্য চেয়েছি, তাঁরা সকলেই এই মহাযুদ্ধে শেষ হয়ে গেছেন। সমস্ত ক্ষত্রিয়-বীর নিঃশেষ, পৃথিবী ক্ষীণরত্না, হতভাগ্য বিধবার মতো এই পৃথিবীকে ভোগ করার আর কোনও উৎসাহ নেই আমার— নাভ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্। এই অসহায় বীরহীনা-পৃথিবী এখন তোমারই হোক যুধিষ্ঠির। আমি বনে চলে যাব, এ রাজ্য এখন তুমিই ভোগ কর— গচ্ছ ত্বং ভুঙ্ক্ষ রাজেন্দ্র পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্।

যুধিষ্ঠির এই কথার প্রতিক্রিয়া জানালেন যথেষ্ট তীক্ষ্ণভাবেই। বললেন— মেলা বকবক কোরো না, দুর্যোধন— আর্তপ্রলাপান্মা তাত। তোমার দয়ার দান আমি নিতে যাব কেন। দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের নয়। তোমাকে যুদ্ধ-জয় করেই এই বসুন্ধরা ভোগ করতে পারব আমি— ত্বান্তু যুদ্ধে বিনির্জিত্য ভোক্তাস্মি বসুধামিমাম্। এই তুমি আগে আমাদের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়তেও রাজি হওনি, কিন্তু এখন সহায়-সম্বল হারিয়ে সমস্ত পৃথিবী চাইছ— এর অর্থ কি আমি বুঝি না ভেবেছ— সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূর্বং স কথং ত্যজতি ক্ষিতিম্ ? আসলে তুমি বাঁচার চেষ্টা করছ, দুর্যোধন। সেটা হবে না। আজ তোমাকে মরতেই হবে।

কথা-প্রতিকথা আরও খানিকক্ষণ চলল। দুর্যোধনও আর কটুকথা সইতে না পেরে জল থেকে উঠলেন এবং ভীম-দুর্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল আমরা জানি। ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি অসহায় অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলেন, তখনও তাঁর জ্ঞান আছে পরিষ্কার। ঠিক এই অবস্থায় মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন ভূমিশায়িত দুর্যোধনকে চরম অপমান করতে লাগলেন। সমস্ত পুরনো কথা তুলে— দুর্যোধনের পূর্বকৃত সমস্ত অন্যায়ের কথা পুনরুচ্চারণ করে ভীম তাঁর মাথায় বা-পায়ে সামান্য আঘাত করলেন— পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ।

যুদ্ধিষ্ঠির কিন্তু ভীমের এই আচরণ সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মধ্যে জেগে উঠল সেই

সর্বভূতৈষিণী বৃত্তি, সেই নীতিবোধ, সেই ধর্ম-সংস্কার। নৃত্যপর, ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন— তোমার শত্রুতার ঋণ শেষ হয়ে গেছে, ভাই! তোমার যে প্রতিজ্ঞা ছিল— দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবে— সে প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হয়ে গেছে— গতো'সি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া। কিন্তু এখন এঁর মাথায় এমন করে লাথি মেরো না, ভীম! তুমি মর্যাদা অতিক্রম করছ। মনে রেখ, ইনি একজন রাজা। ইনি আমাদের জ্ঞাতি তার ওপরে ইনি এখন শক্তিহীন হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। যিনি এক অক্ষৌহিনী সেনার নায়ক, সেই রাজার মাথায় লাথি মারা যায় না—মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ। এঁর যা অবস্থা তাতে এঁকে হত্যাও করা যায়, কিন্তু অপমান করা যায় না।

দুর্যোধনের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের চোখে জল এসেছে। দুর্যোধনের কাছে গিয়ে তিনি সান্ত্বনা-বাক্য উচ্চারণ করেছেন— বৎস! দুঃখ কোরো না। তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছ। লোভ আর অহঙ্কারে তুমি তোমার মৃত্যু ডেকে এনেছ বটে, তবু এই মৃত্যু বীরের মৃত্যু। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু হারিয়ে আমরা রইলাম দুঃখভোগের জন্য। তুমি বীরের মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে যাও, আর আমরা কুরুবাড়ির বিধবাদের অভিশাপে ক্লিষ্ট হতে হতে ভোগ করে যাব।

এই করুণ সুর যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে বেজেছে আজীবন। পুত্রহারা গান্ধারীর দিকে তিনি তাকাতে পারেননি। তাঁর কাছে গিয়ে বলেছেন— আমাকেই অভিশাপ দাও মা। আমিই তোমার পুত্রহন্তা, এই বিশাল ধ্বংসের জন্য আমিই দায়ী। যুদ্ধের শেষে অতি সংবেদনশীল যুধিষ্ঠির দেখলেন— একটি মানুষও সুখে নেই। যুদ্ধে অবশিষ্ট এমন একটি মানুষ নেই যে বলতে পারে— আমি আমার কোনও স্বজন হারাইনি। অথবা আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। এই ভয়ঙ্কর ক্ষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কী করে একটা মানুষ রাজা হবার কথা ভাবতে পারে, সে-কথা যুধিষ্ঠিরের ভাবনায় আসে না। অথচ এই ধ্বংসস্তূপের ওপরেই পাণ্ডবদের রাজপ্রাসাদ রচনা হবে, যুধিষ্ঠিরকে হতে হবে রাজা। সময়কালে রাজা হওয়াটাও যে কেমন নিয়তির অভিশাপের মতো, তা যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কে এমন করে বুঝবেন।

সারা জীবন অনেক দুঃখ সয়েছেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু তিনি বুঝি সবচেয়ে বড় আঘাত পেলেন নিজের মায়ের কাছেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে মৃত-জনের উদ্দেশে জল-তর্পণ করার জন্য গঙ্গায় নামতেই যুধিষ্ঠির শেষ ধাক্কা খেলেন। জননী কুন্তীর মুখে সেই দুরুচ্চার শব্দ শুনতে পেলেন— ওরে কর্ণের উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দিস তোরা। সেই তোদের সবচেয়ে বড়ভাই— স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত।

কথাটা শুনে মায়ের ওপর যতটা রাগ হয়েছে যুধিষ্ঠিরের, ঠিক ততটাই দুঃখ হয়েছে তাঁর। রাগ এইজন্য যে, কুন্তী আগে কেন বলেননি, আর দুঃখ এইজন্য যে, কর্ণকে আগে ভাই বলে বুঝতে পারলে কুরুক্ষেত্রের এত বড় যুদ্ধটাই বোধহয় আর হত না। অন্তত অনেক কিছুই অন্য রকম হত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরের মতো অসুখী মানুষ বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। যুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষ হতাহত হয়েছে, তাতে যুধিষ্ঠির সুখী ছিলেন না মোটেই। এখন সেই দুঃখের ওপরে কর্ণের যথার্থ পরিচয় তাঁকে আরও কষ্ট দিচ্ছে। এক দিকে তিনি ভাবছেন— কর্ণের মতো কাউকে বড় ভাই হিসেবে পেলে তাঁর জীবনে অপ্রাপ্য কিছু থাকত না, অন্য দিকে একান্ত আপন ভাইটির শোচনীয় মৃত্যুর পর তিনি এখন নিজেকে স্বার্থপর, লোভী বলে মনে করছেন— অজানতা ময়া ভ্রাতা রাজ্যলুব্ধেন ঘাতিতঃ। বলছেন— আমি না জেনে রাজ্যের লোভে নিজের ভাইকেই মেরেছি।

বস্তুত যুধিষ্ঠিরের এই অনুতাপ কর্ণকে দিয়েই শুরু হয় বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে সমস্ত মৃত মানুষের মুখগুলিই তাঁর অন্তরে ছায়া ফেলতে থাকে, এবং তিনি সকলের জন্যই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একশো ভাইয়ের কলরব-সমন্বিত কুরুবাড়িটি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় যুধিষ্ঠির আর সেদিকে তাকাতে পারছেন না। কৌরবদের কাছ থেকে পাওয়া শত অপমান মাথায় রেখেও তিনি নিজেকেই এই ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য দায়ী করছেন। বলছেন— আমি মথুরা-দ্বারকায় গিয়ে ভিক্ষে করতাম, সেও ভাল ছিল, তা হলে জ্ঞাতিদের পরিবার এইভাবে নিষ্পুরুষ হয়ে যেত না, আর আমিও এমন দুর্গতি

লাভ করতাম না। ধিক্ আমাদের ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম, ধিক আমাদের শক্তিমত্তা আর পৌরুষ— ধিগস্তু ক্ষত্রিয়াচারং ধিগস্তু বল-পৌরুষম্।

ঠিক এই রকম কথা আমরা আগেও যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনেছি। এখনও আবার শুনছি। যুদ্ধের উদ্যোগ যখন চলছে, তখন এ সব কথা শুনেছি, আবার শুনছি যুদ্ধশেষের পর। মাঝখানের ওই আঠারো দিন যুদ্ধের সময়টুকু যুদ্ধিষ্ঠির যেন সামান্য ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণের মতো যোদ্ধাদের কীভাবে হত্যা করা যায়, সে ব্যাপারে তিনি যেমন মাথা ঘামিয়েছেন, তেমন কর্ণকে তাড়াতাড়ি বধ করার জন্যও তিনি যথেষ্ট উন্মাদনা তৈরি করেছেন। দুর্যোধনকে শেষ করার ব্যাপারেও তিনি যে সব কথা-বার্তা বলেছেন, তাও যথেষ্ট ক্ষত্রিয়োচিত।

কিন্তু আঠারো দিনের এই ক্ষত্রিয়সুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা যুধিষ্ঠিরের আন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। একটি লম্বা-চওড়া সুন্দর মানুষকে যদি পুলিশের ইউনিফর্ম তথা বুট-জুতো পরিয়ে দেওয়া যায়, তবে সাময়িকভাবে সে যেমন পুলিশের মতো গট-মট করে চলে, যুধিষ্ঠিরের এই আঠারো দিনের আচরণও প্রায় সেই রকম। এমনকী যুদ্ধ চলা-কালীন ভীষ্মের বধ-রহস্য জেনে নেওয়া, দ্রোণের মৃত্যুর জন্য মিথ্যা-শব্দ উচ্চারণ করা, তথা কর্ণের তেজে ভীত হয়ে অর্জুনকে অপমান করা— এগুলির মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থৈষণার পরিচয় থাকলেও যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত স্বভাবের নিরিখে আমরা এগুলিকে তাঁর যুদ্ধকালীন অস্থিরতার মধ্যেই গণ্য করতে চাই এবং এই অস্থিরতা এসেছে যুদ্ধের মতো দ্রব্যগুণে। নইলে এটা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নয়।

রাজধর্মের মতো বঞ্চনাময় তথা ছলনাময় বস্তু কখনও যুধিষ্ঠিরের আদর্শ নয়। যে কারণে যুদ্ধশেষের পরম-লগ্নে যখন তাঁর হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভ করে উৎফুল্ল হওয়ার কথা, তখন তিনি ক্ষাত্রধর্মকে ধিক্কার দিয়ে বনচারী ঋষি-মুনির ক্ষমা, অহিংসা সত্যের জয়গান গাইছেন। একেকটি মানুষের জন্মের পিছনে পিতা-মাতার কত তপস্যা, কত স্বার্থত্যাগ জড়িত আছে, তার পালন-পোষণ এবং স্নেহের মধ্যে মাতা-পিতার কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়। যুধিষ্ঠির এখন শত্রু-মিত্র সকল মানুষের কথা চিন্তা করছেন— যারা এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এসে তাদের জন্মলাভের সামান্য সার্থকতাও খুঁজে পেল না— ন তে জন্মফলং কিঞ্চিদ্ ভোক্তারো জাতু কর্হিচিৎ। মহাযুদ্ধে মানুষের এই ভয়ঙ্কর ক্ষয় দেখে, বিশেষত জ্ঞাতি ভাইদের কুল একেবারে উৎসন্ন হয়ে যাওয়ায় যুধিষ্ঠির আর রাজা হতেই চাইলেন না।

যুধিষ্ঠিরের স্বভাব এবং স্বরূপ এটাই। যে উত্থানশক্তি এবং যে নির্মমতা একজন রাজার প্রয়োজনীয় গুণের মধ্যে পড়ে, যুধিষ্ঠির নিজেকে তার যোগ্য মনে করেন না এবং সেটা তাঁর স্বভাবও নয়। তিনি অর্জুনকে বললেন— এখন রাজ্যে আমার কোনও প্রয়োজনই নেই ভাই। মায়া-মমতা ত্যাগ করে আমি বনে চলে যেতে চাই। বরঞ্চ এই নিষ্কণ্টক রাজ্য তুমি ভোগ কর— প্রশাধি ত্বমিমামুর্বীং ক্ষেমাং নিহতকণ্টকাম্। অর্জুন বললেন— এ তুমি কী বলছ, দাদা। এই অমানুষিক কষ্ট করে আমরা রাজ-ঐশ্বর্য লাভ করলাম, আর তুমি বলছ কিনা সব ত্যাগ করে বনে চলে যাবে— যৎ কৃত্বামানুষং কর্ম ত্যজেথা শ্রিয়মুত্তমাম্।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রাজার ধর্ম বোঝানোর চেষ্টা করলেন। চতুর্বর্গ-সাধনের মধ্যে চতুর্থ-বর্গ মোক্ষসাধনের পথ যে রাজার জন্য নির্দিষ্ট নয়, তাঁকে যে প্রজা-পালন এবং রাজ্য-বিস্তারের জন্য সদা-সর্বদা সমৃদ্ধিকামী হতে হবে, অর্থলাভের চেষ্টা করতে হবে— এসব অর্থশাস্ত্রীয় তত্ত্ব যুধিষ্ঠিরকে খুব করে বোঝালেন অর্জুন। যুধিষ্ঠির যে একটুও বুঝলেন, তা কিন্তু নয়। ভীম এবং অন্যান্য ভাইদের কথা, দ্রৌপদীর কথা, এমনকী কৃষ্ণ এবং ব্যাসের সান্ত্বনাবাক্যেও তিনি রাজা হতে রাজি হলেন না। যুধিষ্ঠিরের এই রকম মানসিক অবস্থায় কৃষ্ণের পরামর্শে তাঁকে মহামতি ভীষ্মের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সম্পূর্ণ শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্ব জুড়ে রাজধর্ম এবং তৎসংক্রান্ত বিষয় যুধিষ্ঠিরকে শোনানো হল।

যুধিষ্ঠির শুনলেন, অনুধাবন করলেন, প্রশ্ন করলেন, রাজধর্মের নানান কুটিল বক্তব্য শুনে আঁতকেও উঠলেন বহুবার। ভীষ্ম এবং বিভিন্ন ঋষি-মুনির বিশাল জ্ঞানগর্ভ উপদেশ যুধিষ্ঠিরের কী

কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা এই অল্প পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায়— রাজধর্মের মধ্যে ঐহিক সুখৈষণা আছে, তার সঙ্গে প্রজাপালনের মতো মহদ্‌বৃত্তি জড়িত থাকলেও সেই-রকম সুখ যুধিষ্ঠির চান না এবং সে সুখ তাঁর মনোমতও নয়। তবু সব কিছুর পরে এটা তিনি বুঝলেন যে, রাজা তাঁকে হতেই হবে। রাজা তিনি হলেনও। রাজাদের বিধিবদ্ধ পথে তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞও করলেন। দান-দক্ষিণা, মান-পরিচর্যার দীক্ষা নিয়ে যে বিরাট যজ্ঞ তিনি সম্পন্ন করলেন, তাতে তাঁর আত্মতুষ্টি কিছু ঘটল বটে, তবে তিনি যে শান্তি পেলেন তা বলা যায় না।

যুধিষ্ঠির রাজা হবার পর তাঁর দিক থেকে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর ব্যবহার। এই বৃদ্ধের কাছ থেকে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উত্তর-পর্বে হত-পুত্র এই বৃদ্ধের প্রতি তিনি করুণা কিম্বা মায়া-মমতাই শুধু দেখাননি, ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি এমন সম্মানে রেখেছিলেন যেন তিনি নিজেই তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র— ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য পৃথিবীং পর্য্যপালয়ন্‌। বিদুর এবং সঞ্জয় সদা-সর্বদা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক এমন কোনও বিষয়ই ছিল না যে ব্যাপারে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু করেছেন— পাণ্ডবাঃ সর্বকার্যানি সংপৃচ্ছন্তি স্ম তং নৃপম্‌। জননী গান্ধারীর মর্যাদাও ছিল অনুরূপ। স্বয়ং কুন্তী তাঁর দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন এবং রাজরানি দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা নজর রাখতেন এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অশন, শয়ন এবং পরিধানের ওপর— শয়নানি মহার্হানি বাসাংস্যাভরণানি চ।

যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্ত ভাইদের তথা আত্মীয়-পরিজনদের কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে কেউ কোনওভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অবমাননা না করে। যুধিষ্ঠিরের ভয়ে কেউ এই অবমাননা করার সাহসও পাননি এবং কেউ কোনওদিন ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের সম্বন্ধে একটি কটু কথাও বলার সাহস দেখাননি— উবাচ দুষ্কৃতং কশ্চিদ্‌ যুধিষ্ঠিরভয়ান্নরঃ।

একমাত্র মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন। যুধিষ্ঠির যেমন বলতেন তেমনই তিনি করতেন বটে, কিন্তু আড়ালে-আবডালে তিনি বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে দুঃখ দিতে ছাড়তেন না। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সামনে তিনি বেশ কয়েকবার শুনিয়ে-শুনিয়েই বলেছেন যে, কীভাবে তিনি আপন ভুজবলে দুর্যোধনকে বধ করেছেন। যুধিষ্ঠির এ সব কিছুই জানতেন না— নান্ববুধ্যত তদ্‌রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও কোনওদিন লজ্জায় যুধিষ্ঠিরকে এ কথা জানাননি। কিন্তু এই দুঃখ ধৃতরাষ্ট্রকে সংসারে নির্বিণ্ণ করে তুলছিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল পনেরো বছর কেটে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র এই সময়ে একদিন যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি চাইলেন বানপ্রস্থে যাবার জন্য। যুধিষ্ঠির ভীষণ রকমের দুঃখ পেলেন। পুত্রহারা এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য তাঁর সমব্যথা ছিল এতটাই যে, তিনি কোনওভাবেই এই বিদায়-যাত্রা ভালভাবে নিতে পারলেন না। শোকে দুঃখে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। এই পনেরো বছর পর রাজ্য, রাজসমৃদ্ধি আবারও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হল। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি অনেক অনুনয় করেছেন, দুঃখ করে এমনও বলেছেন— আমরা কার কাছে আর যাব বলুন। আপনিই তো আমাদের মাতা-পিতা —ভবতা বিপ্রহীণা বৈ কং নু তিষ্ঠামহে বয়ম্‌ ।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বনযাত্রা করেছেন। গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তীও যাচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে নিয়ে। যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন— জননী কুন্তী তাঁদেরই মতো ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে এগিয়ে দিচ্ছেন বুঝি। কিন্তু মাঝপথে কুন্তীও যখন বললেন— তিনি আর রাজধানীতে ফিরবেন না, তখন যেন বাজ পড়ল যুধিষ্ঠিরের মাথায়। তিনি কোনওভাবেই আর নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী, বিদুর-সঞ্জয় এবং সর্বোপরি জননী কুন্তীর এই বনপ্রস্থান যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্বিতীয় আঘাত। বার বার তিনি এঁদের জন্য রাজধানী ছেড়ে বনে গেছেন এবং এক সময় কালের নিয়মে এঁদের মৃত্যুশোকও সহ্য করেছেন।

মাত্র ছত্রিশ বছর হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেছেন যুধিষ্ঠির। মহাকাব্যের কবিরা একেক রাজাকে যেখানে হাজার-দশ-হাজার বছরের রাজত্ব দিয়ে সুখী করেছেন, সেখানে যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছেন মাত্র ছত্রিশ বছর। তাও সে রাজত্বকাল সুখে কাটেনি। যুদ্ধোত্তর শোক-পর্ব, বিশ্বস্ত বৃদ্ধদের বিদায়,

প্রিয়-সুহৃৎ কৃষ্ণের লীলা-সম্বরণ— এই সব কিছু তাঁকে দেখে যেতে হয়েছে।

আর নয়, এবার যুধিষ্ঠির নিজেই মহাপ্রস্থানে উদ্যত। উত্তরা-গর্ভজাত পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে ভাইদের নিয়ে সস্ত্রীক তিনি মহাপ্রস্থানে বেরিয়েছেন। পথের মধ্যে দ্রৌপদী এবং ভাইদের মৃত্যু হল, একক যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গে রইল শুধু ধর্ম। মানুষের মৃত্যুকালে যে শ্লোক উচ্চারিত হয়— জায়া-জননী, ভাই-বন্ধু কেউ তোমার সঙ্গে নেই, আছে শুধু তোমার ধর্ম। আজ এই স্বর্গারোহণের পথে তিনি চিরান্বিষ্ট ধর্মকে সঙ্গে পেয়েছেন। সেই শতশৃঙ্গ পর্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্মলগ্নে যিনি অলক্ষিতে যুধিষ্ঠিরের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, সেই ধর্ম আজ যুধিষ্ঠিরের অনুযায়ী। যাকে সামনে রেখে, যে ধর্মের আদর্শ সামনে রেখে যুধিষ্ঠির তাঁর সম্পূর্ণ জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন, সেই ধর্ম আজ প্রভুভক্ত কুকুরের মতো তাঁর অনুযায়ী। যখন ভাই-বন্ধু, পুত্র-পরিবার কেউ তাঁর সঙ্গে নেই, তখন তাঁর একাকিত্বের সঙ্গী হয়েছেন স্বয়ং ধর্ম। স্বর্গের আধিপত্যের মূল্যেও তিনি ধর্মকে ত্যাগ করতে পারেন না।

প্রথমেই বলেছিলাম— যুধিষ্ঠির সবাইকে দেখতে পান। ভগবদ্গীতায় স্থিতধী মুনির যে সম-দৃষ্টির মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, সেই সম-দৃষ্টির কারণেই শত্রুবৎ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিও তাঁর পিতার মতো শ্রদ্ধা এবং একটি আশ্রিত কুকুরের প্রতিও তাঁর অত্যাগ-দৃষ্টি। শাস্ত্রকার যে বলেছিলেন— কুকুর আর চণ্ডালের প্রতিও পণ্ডিতের দৃষ্টি দেবতা-ব্রাহ্মণের চেয়ে কিছু কম হয় না— শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ। আজ এই স্বর্গারোহণের মুহূর্তে যুধিষ্ঠির দেখালেন যে, তিনি সেই যোগারূঢ় ব্যক্তি, যিনি সম-দৃষ্টির মাহাত্ম্যে একাকী স্বর্গারোহণ করেন, অথচ তিনি সেই সাধারণ মানুষও, যিনি লোকধর্মে মিথ্যা উচ্চারণ করতেও বাধ্য হন। যুধিষ্ঠির হলেন সেই মূর্তিমান প্রয়াস, যিনি জীবনের জটিল-কুটিল চক্রের মধ্যেও যথাসম্ভব সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চান। তিনি সম্পূর্ণ সত্য নন, তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার মূর্তিমতী চেষ্টা, তিনি স্বয়ং ধর্ম নন, তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার আজীবন প্রয়াস।

যার সমস্ত জীবনের ওপর দিয়ে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং এত বড় একটা যুদ্ধ বয়ে গেছে, সেই সঙ্কুল জীবনের মধ্যেও ন্যায়-নীতি-ধর্মকে সামনে রেখে চলা যে কত কঠিন, তা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের দার্শনিক পটভূমিকায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বলে পরিচিত, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমি ধর্মক্ষেত্র বলে পরিচিত এবং যুধিষ্ঠির নিজে ধর্মরাজ। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতেই হবে।

মহাভারতের আদিপর্বে একবার, উদ্যোগপর্বে আরেকবার যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে— যুধিষ্ঠির এক ধর্মময় মহাবৃক্ষের মতো এবং এই মহাবৃক্ষের কাণ্ড হলেন অর্জুন। মহাবলী ভীমসেন এই বৃক্ষের শাখা, নকুল-সহদেব এই বৃক্ষের পুষ্প-ফল, আর বৃক্ষের মূল-স্বরূপ হলেন কৃষ্ণ, যিনি জ্ঞান (গো=পৃথিবী, জ্ঞান) এবং ব্রাহ্মণ্যের ধারক— গোব্রাহ্মণহিতায় চ। লক্ষণীয় অন্য সকলে, এমনকী কৃষ্ণও এই বৃক্ষের একটি অঙ্গ মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ মহাবৃক্ষটিই হলেন যুধিষ্ঠির অর্থাৎ ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং কৃষ্ণও ধর্মময় যুধিষ্ঠিররূপী মহাবৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

ভারতবর্ষের 'ধর্ম' অথবা আরও পরিষ্কার করে বলি হিন্দুধর্ম— ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্যের ধর্ম নয়, শাক্ত-বৈষ্ণব অথবা পাশুপতের ধর্ম নয়, এই ধর্ম হল জীবন, যা সমস্ত মানুষকে ধারণ করে, সমস্ত মানুষের মঙ্গল করে। স্মরণ করুন যুধিষ্ঠিরের কথা। যুদ্ধোদ্যোগের পূর্বে তিনি সঞ্জয়ের মাধ্যমে কুরুবাড়ির সবার উদ্দেশে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রথমে দুর্যোধন-দুঃশাসন ইত্যাদি সবার কুশল প্রশ্ন করেছেন, কর্ণ শকুনিও এই শুভেচ্ছার অন্তর থেকে বঞ্চিত নন। ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারী মন্ত্রী, অমাত্য, গজারোহী, অশ্বারোহী পুরুষ থেকে আরম্ভ করে দারোয়ান পর্যন্ত সবার মঙ্গল কামনা করেছেন যুধিষ্ঠির।

আমরা এখনও পর্যন্ত এই মঙ্গলপ্রশ্নে আশ্চর্য হচ্ছি না। এমনকী আশ্চর্য হচ্ছি না— যুধিষ্ঠির যখন সঞ্জয়কে বললেন— কুরুবাড়ির বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যাঁরা, তাঁদের আমরা মায়ের সমান দেখি। সঞ্জয় তুমি সেই বৃদ্ধা মায়েদের জিজ্ঞাসা কর— তাঁদের ছেলেরা তাঁদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করে তো? তাঁদের ছেলেরা সবাই সুখে বেঁচে আছে তো? তারপর বোলো— যুধিষ্ঠির তার ছেলেপিলে নিয়ে ভালই

আছে। লক্ষণীয়, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সংসারে কীসের আশায় বেঁচে থাকেন, যুধিষ্ঠির তা জানেন। একই রকমভাবে জানেন রাজরানিরা কীসের আনন্দে বেঁচে থাকে। যুধিষ্ঠির বলেছেন— সঞ্জয়! রাজরানিদের কুশল জিজ্ঞাসা করে বোলো— তাঁরা তাঁদের বিলাসদ্রব্য প্রসাধন-সুরভি ঠিকঠাক পান তো ? শ্বশুরদের সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক আছে তো ? যুধিষ্ঠির জানেন, অত্যন্ত আধুনিকভাবে জানেন যে, ওই একটি জায়গায় রাজরানিদেরও অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে। কিন্তু পুত্রবধূ-স্থানীয়দের কাছে শ্বশুরপ্রতিম যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত— মায়েরা সব। যুধিষ্ঠির তোমাদের ওপর খুব খুশি আছেন।

সংসারের এই বড় বড় সম্পর্কগুলি সম্পর্কে সবারই খেয়াল থাকে বলে যুধিষ্ঠিরের কুশল-পৃচ্ছায় এ পর্যন্তও আমরা আশ্চর্য হইনি। কিন্তু কুরুবাড়ির উঠোনে খেলে বেড়ায় সেই বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলি। যুধিষ্ঠিরের কল্পনার চোখে এখন তারা বড় হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন— তুমি তাদের ঘরে গিয়ে আমারই মতো জড়িয়ে ধরে বলবে— তোমরা সবাই একটা করে মনের মতো বর পাও— কল্যাণা বঃ সন্তু পতয়ো'নুকূলাঃ। কিন্তু এবার কী বলব ? কী সাংঘাতিক পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এই ধর্মশুদ্ধ ব্যক্তিটির ! কীরকম সর্বাশ্লেষী তাঁর হৃদয়বৃত্তি ! এবার যুধিষ্ঠির বললেন— যাদের দেখতে ভাল লাগে, যাদের কথা শুনতে ভাল লাগে, খুব গয়না পরে, খুব সাজে, সেই সুখশালিনী সেই বেশ্যাদের কাছে গিয়েও আমার হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা কোরো— বেশস্ত্রিয়ঃ কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ।

যেখানে রাজবাড়ির দারোয়ানদেরও খবর নিয়েছেন যুধিষ্ঠির, সেখানে কুরুবাড়ির দাস-দাসীদের শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ জানানোটাও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু রাজধানী ছেড়ে চলে আসবার সময় যে সমস্ত অঙ্গহীন, কানা, খোঁড়া, বামন আর গরিব লোকদের ঝোপড়ি বেঁধে রাজপথের প্রান্তে পড়ে থাকতে দেখেছেন যুধিষ্ঠির, তারা সবাই তাদের পুরনো জায়গাতেই বহাল আছে কিনা, দুর্যোধনের কাছ থেকে তারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান লাভ করে কিনা, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ চিন্তা আছে যুধিষ্ঠিরের— কচ্চিদ্ বৃত্তির্বর্ততে বৈ পুরাণী, কচ্চিদ্ ভোগান্ ধার্তরাষ্ট্রো দদাতি। অন্ধ যারা, বধির যারা— রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, চর্মকার— যারা হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে— অন্ধাশ্চ সর্বে বধিরাস্তথৈব/ হস্তাজীবা বহবো যে'ত্র সন্তি— তাদের উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য— তোমাদের কুৎসিত কাজ করতে হয় বলে কোনও দুঃখ যেন মনে না থাকে। হয়তো পূর্বজন্মের পাপ ছিল কিছু তার শোধ দিতে হচ্ছে তোমাদের। কিন্তু তাই বলে দুঃখ রেখো না মনে— মা ভৈষ্ট দুঃখেন কুজীবিতেন।

ভাবতে পারেন, যে যুধিষ্ঠিরকে আমরা ব্রাহ্মণ্য, জ্ঞানচর্চা আর সত্যের মহিমায় ভাস্বর দেখেছি, তাঁর কাছে অন্ধ, বধির, বেশ্যাদের দুঃখও কিছু কম নয়। এই সর্বাশ্লেষী দৃষ্টিই কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ধর্ম। যুধিষ্ঠির এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে চান জগতে। বিপ্রতীপভাবে দুর্যোধন হলেন লোভ, অহঙ্কার আর অভিমানের প্রতীক। যুধিষ্ঠির সেই সর্বনাশা বৃত্তিগুলো রোধ করে সর্বাশ্লেষী মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু মুশকিল হল— লোভ-মোহ-অহঙ্কারের রাজ্যটাকে মিষ্টি কথা আর সাধুবাদে বিধ্বস্ত করা যায় না। তারা মঙ্গলের রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থটাও পাশার চালে দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে গেলেও একটা প্রলয়ের মতো ধ্বংস দরকার। সেই ধ্বংসই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে যুধিষ্ঠির আছেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতে পারেন না। তাঁর ধর্মরাজ্যের বিস্তার সুগম করে দেয় অনুরূপ ক্ষাত্রশক্তি, যে শক্তি কল্যাণের জন্য লড়াই করে। এই যুদ্ধের মূল অবলম্বন তাই অর্জুন এবং ভীম। অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সম্পর্ক শুধু ভ্রাতার নয়, শিষ্যের— ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। অহঙ্কারের প্রতীক দুর্যোধনকে ধ্বংস করতে গেলে অর্জুনের মতো পরিশীলিত ক্ষাত্র-শক্তিতে কাজ হয় না, তার জন্য দরকার উদ্দাম প্রলয়— যা ভীমের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। লক্ষ করে দেখবেন— ভীম যেমন যুধিষ্ঠিরকে মেনে চলেন, তেমনই তিনি অর্জুনকেও মেনে চলেন। তিনি উদ্দাম রাজদণ্ড— রাশ ছেড়ে দিলেই ছারখার করে দেবেন সব। ধর্মশুদ্ধ যুধিষ্ঠির তাই ভীমকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, তাঁর নিয়ন্ত্রণ বাঁধা আছে পরিশীলিত ক্ষাত্রশক্তির

প্রতীক মহাভারতের নায়ক 'রাজা' অর্জুনের হাতে। অর্জুনের মাধ্যমেই জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। অর্জুন নিজে তথাকথিত রাজা হবেন না, তিনি ধর্ম ফিরিয়ে এনে ধর্মকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন— রাজা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সৈনিক চলতে থাকে সেই ধর্মের শাসন অনুসারে।

কৃষ্ণ হচ্ছেন ধর্মময় যুধিষ্ঠিবরূপী বৃক্ষের মূল। দুষ্টের বিনাশ আর শিষ্টের পালনের জন্য তাঁর আবির্ভাব। রাজসূয়যজ্ঞের আগে থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ পর্যন্ত তিনি বৃক্ষমূলের রস-সঞ্চার করেন সমস্ত ধার্মিক লোকের অন্তরে। শান্তি-সন্ধির বার্তা বহন করেন শত্রুর কাছেও। কারণ তাঁরও কাজ অধর্মের গতি রুদ্ধ করে ধর্ম ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তিনি নিজের হাতে তা করেন না, রাজা বা নায়কের মাধ্যমে তা করেন। অর্জুন সেই রাজার স্বরূপ, নায়কের স্বরূপ। ক্ষাত্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃষ্ণ সেই রাজাকে উপদেশ দেন ভগবদ্গীতা। তাঁর সারথি হয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন যুদ্ধ করবার জন্য। সমাজকে ধারণ করার কাজ ব্রাহ্মণদের। তাঁরা ধর্মের কথা বলেন, ধর্মকে রক্ষা করতে চান। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তাই এত মাখামাখি। জাতিবর্ণের বিচারেও যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয় না বলে ব্রাহ্মণই বলা উচিত। তবে দোহাই আপনাদের এখানে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ একটি পৈতে এবং সমাজের চরম সুবিধা-ভোগী শ্রেণীমাত্র বুঝবেন না। এখানে ব্রাহ্মণ্যের অর্থ সর্বাশ্লেষী সেই ধর্ম, বিশ্বজনের হিতবৃত্তি।

'গো' মানে পৃথিবী এবং জ্ঞান, দুয়ে মিলে ব্রাহ্মণ্য। ব্রাহ্মণ্যের হিতের জন্য কৃষ্ণ অর্জুনের মতো পরিশীলিত ক্ষাত্র-শক্তিকে ব্যবহার করেন। আর অর্জুন তাঁর পরিশীলনের মাধ্যমে অপরিশীলিত ক্ষাত্র-শক্তি ভীমকে নিয়ন্ত্রণও করেন আবার প্রয়োজনে তার রাশ ছেড়ে দেন ধ্বংসের জন্য— যে ধ্বংসের মধ্য থেকে নতুন এক সমাজ, নতুন এক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সেই রাষ্ট্র এবং সমাজের আদর্শ হল ধর্ম। ধর্মময় যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হয় সেই রাষ্ট্রে— যেখানে রাজরানি থেকে কিশোরী বালিকাটি তার প্রার্থিত বস্তুটি লাভ করবে, যেখানে রাজ্যের সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে অন্ধ-বধির পর্যন্ত সক্ষমতা এবং অক্ষমতার বৃত্তি লাভ করবে, যেখানে পুরাতন ধ্বংসের সজীব-অবশিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের জন্যও এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তাঁরও মনে হয়— তিনি আগের মতোই আছেন— বিজহার যথা পূর্বং ঋষিভিঃ পর্যুপাসিতঃ। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের পরম্পরা যুধিষ্ঠিরেব দৃষ্টিতে এই রকমই। যুধিষ্ঠির তাই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে ধর্মময় এক মহীরুহ।

ভীম

মহাভারতের একটি পুণ্য চরিত্র-বিশ্লেষণ করতে যাব, অথচ কেন যে আমার এমন একটা কুকথা মনে এল! সজ্জন পাঠকেরা আমার দু'গালে দুটো চড় কষিয়ে বলতে পারেন—তোমার কি মহাভারতের মতো বিশাল মহাকাব্যের গাম্ভীর্য এবং মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনও বোধ নেই? কোথায় মহাভারতের এক অতি প্রিয় চরিত্র সম্বন্ধে তোমার গভীর শব্দ-রাশি ব্যবহার করবে, তা না যত সব চটুল কথাবার্তা আমদানি করে বিষয়ের অমর্যাদা ঘটাচ্ছ! এসব কথা আপনারা বলতেই পারেন। কিন্তু আমিও বা কী করি? আসলে চরিত্র হিসেবে ভীমের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তার জন্যই আমাকে এই চটুল উপমাটি ব্যবহার করতে হচ্ছে।

আমার কলেজ জীবনের এক শিক্ষিত মারোয়াড়ি বন্ধু একটা ভারী মজার কথা বলেছিল।- উল্লেখ্য, সে খুব চটুল হিন্দি সিনেমা দেখতে ভালবাসত। সাধারণ হিন্দি সিনেমার মূল 'ফর্মুলাটা' বোঝানোর জন্য সে আমাকে তার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চারণে বলেছিল—বুঝেছিস! প্রথম দিকে নায়কের নানা ঝামেলা থাকে, তখন ভিলেন খুবসে ঢিসুম-ঢাসুম চালায়, আর ধর্মিন্দর মার খায়। তারপর ঘটনার জাল যখন গুটিয়ে আসে, তখন মারে, আর ভিলেন মার খায়। পাবলিক তখন খুশি হয়। তাদের ইচ্ছা পূরণ হয়, তাই তারা হাততালি দেয়।

বাস! আমার উপমান-উপমেয় ভাব এইটুকু বই নয়। ভীমের মহান চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার যে হিন্দি-সিনেমার 'ফর্মুলা' মনে পড়ল—তার কারণ একটাই। ভীমের চরিত্র এত বেশি ইচ্ছাপূরক, এতই বেশি জনপ্রিয় যে, মহাভারতের বিশাল এবং জটিল প্রেক্ষাপটে কৌরবদের দাপট যখন বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে, তখন সেই বিষম পরিস্থিতি থেকে অবস্থা আপন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং শেষ বিজয়ীর হাসিটি হাসা—এর জন্য ভীমের ওপর আপনার পক্ষপাত থাকবেই এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপের জন্য হাততালি আপনাকে দিতেই হবে।

ভীমের জন্মলগ্নেই এমন একটা 'স্টান্ট' আছে, যা মহাভারতের পাঠক-শ্রোতা পাবলিককে ভীমের সম্বন্ধে পৃথক কোনও চেতনায় অবহিত করে রাখে। মহারাজ পাণ্ডু তখন বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যভার দিয়ে দুই সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে হিমালয়ের আকুল-শোভায় বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুত্র উৎপাদন করার শক্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু নিজের পরকাল এবং বয়সোচিত স্নেহে তিনি পুত্রমুখ দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। পাণ্ডুর অনুরোধে এবং উপরোধে কুন্তী শেষ পর্যন্ত দুর্বাসা মুনির মন্ত্রে দেবতাদের আহ্বান করে পুত্র লাভ করতে চাইলেন।

প্রথমেই ধর্মকে আহ্বান করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পেলেন কুন্তী। আকাশবাণী হল—এ ছেলে ভারী ধার্মিক হবে, সত্যের পথ থেকে এ কখনও বিচ্যুত হবে না। বস্তুত এমন একটি ধার্মিক এবং জ্ঞানবান পুত্র যদি কোনও মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণ-সজ্জনের ঘরে জন্মাত, তাহলে তাঁর আর দ্বিতীয় কোনও কামনা থাকত না। প্রথম একটি ধার্মিক এবং ধর্মজ সন্তান লাভ করে পাণ্ডুও নিশ্চয় আনন্দ

পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ঘরে, রাজার ঘরে ধর্ম এবং সত্যের যত মূল্যই থাকুক, সেই বেদের আমল থেকে ক্ষত্রিয়-বধূরা বীরপুত্রের জননী হতে চায়। পাণ্ডুও কি সে কথা বোঝেন না? বোঝেন। বোঝেন বলেই ধার্মিক ধর্মরাজ পুত্রলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কাল বিলম্ব না করে পাণ্ডু কুন্তীকে বলেছেন—ক্ষত্রিয়ের কাছে শক্তি আর বলই সব, তুমি তাই মহাশক্তিধর এক পুত্র কামনা করো দেবতাদের কাছে—প্রাহুঃ ক্ষত্রং বলজ্যেষ্ঠং/বলশ্রেষ্ঠং সুতং বৃণু।

যা ভেবে পাণ্ডু বললেন, কুন্তীর মনেও বুঝি তাই ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করলেন বায়ু-দেবতাকে। বেদ-পুরাণ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা জানেন যে, বৈদিক দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে বায়ু-দেবতার গুরুত্ব সাংঘাতিক। তাঁর শক্তি, বল, বীর্য দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে কোনও অংশে কম নয়। আর পুরাণে বায়ুদেবতা যেভাবে কীর্তিত হয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—শক্তি এবং বলবত্তার দিক দিয়ে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। বায়ু যখন দেবমাতা অদিতির গর্ভে, তখনই তাঁর শক্তিবৃদ্ধির এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, ইন্দ্র নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে বায়ুকে খণ্ড খণ্ড করে কেটেও তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি। বায়ুর শক্তি কমেনি, যদিও ইন্দ্রের তুলনায় তিনি সামান্য ক্ষীণ হয়েছেন মাত্র।

এহেন বায়ু মনুষ্যলোকে কুন্তীর আহ্বান শুনেই উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। কুন্তী সলজ্জে বললেন—পুত্রং দেহি সুরোত্তম—এমন পুত্র, যে দেখতেও যেমন বিশাল, তেমনই শক্তিতে ক্ষমতায় সবার সব অহঙ্কার চূর্ণ করে দিতে পারে। ভীম জন্মালেন। অতিবল, অতিকায়, ভীম-পরাক্রম ভীম মায়ের কোলে শিশুর মূর্তিতে ধরা দিলেন বায়ু দেবতার আশীর্বাদের মতো।

পাণ্ডু তখন বনে-বাদাড়ে ঘুরছেন, কুন্তীও বসে ছিলেন ছেলে কোলে নিয়ে। ছেলেটি ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই কোথা থেকে এক বাঘ দেখা গেল এবং তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার তাগিদে কুন্তী লাগালেন দৌড়। কথায় বলে মায়ের কোল থেকে ছেলে পড়ে না। কিন্তু প্রাবাদিক স্নেহের নিরিখে কথাটা যতই সত্য হোক, বাস্তবে মায়ের হাত ফসকে ছেলে মাটিতে পড়েও যায় কখনও। কুন্তীর ছেলেও পড়ে গেল। হঠাৎ করে বাঘের উৎপাত, কুন্তী ঘুমন্ত ভীমকে কোলের মধ্যে খেয়াল করেননি। অতএব শিশু ভীম পড়ে গেলেন মাটিতে। মাটিও নয়, পড়লেন একটা পাথরের ওপর। কিন্তু কী আশ্চর্য, ভীমের তো কিছু হল না, উলটে যে পাথরটার ওপর ভীম পড়ে গিয়েছিলেন, সেই পাথরটাই গেল ভেঙে—শিলা গাত্রে- র্বিচূর্ণিতা।

আপনারা মানুষের মধ্যে এমন লোক দেখেছেন কিনা জানি না, তবে আমি—না, না, আমিও দেখিনি—তবে একটা ঘটনা বলতে আমি কৌতুক বোধ করি। আমাদের বাড়িতে একটি উড়িয়া ঠাকুর ছিল—বিশাল তার চেহারা, ছ'ফিটের ওপর লম্বা, উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে অমন চেহারা প্রায় দেখিনি। বিশেষত তাঁর হাতের তালু এবং পায়ের তালু ছিল এমন খড়খড়ে যে, বাটনা-বাটা শিলও তাঁর কাছে বোধহয় কিছু নয়। টগবগে ভাতের হাঁড়ি সে কোনওদিন কিছু দিয়ে ধরত না, উনুন ঠিক করার জন্য উত্তপ্ত গরম কয়লা সে হাত দিয়েই নামাত। কোনওদিন সে মশারি টাঙাত না, বলত—আমার মশা লাগে না। আমি পড়ে গিয়ে একবার পায়ের একাংশে ব্যথা পেয়েছিলাম বলে আমাকে সেই ঠাকুর একবার 'আয়োডেক্স' মালিশ করে দিয়েছিল। ফল হয়েছিল এই—ব্যথার সঙ্গে জ্বলুনি শুরু হয়েছিল এবং পায়ের একাংশ সাময়িকভাবে লোমহীন হয়ে গিয়েছিল।

এই ঠাকুরের অসীম শক্তি এবং দৈহিক ক্ষমতা নিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে এবং অন্যের সঙ্গেও অনেক রঙ্গ-রসিকতা করতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাদের এই পুরাতন ঠাকুরটি গল্প বলেছিলেন যে, তাঁর যৌবনকালে তিনি একটি মাঠে ক্ষেতি করছিলেন। জমিতে নিড়ানি দেবার সময় তাঁকে একটি সাপে কামড়ায় এবং এই কামড়ে তাঁর একটু সামান্য লেগেছিল বটে, তবে সাপটি শেষপর্যন্ত মারা যায়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছিলাম। বলেছিলাম—আপনার পায়ে কামড় দিয়ে ওই হতভাগ্য সাপটির বিষদাঁত ভেঙে যায় এবং সে লজ্জায় আত্মহত্যা করে। কিন্তু ঠাট্টা-ইয়ার্কি যতই করি, আমাদের পুরনো বাড়িতে পঁচিশ বছরের ঠাকুর-জীবনে এই ভদ্রলোককে অন্তত চার-পাঁচবার কাঁকড়া-বিছে কামড়াতে দেখেছি ; বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, একটু গরম ঘিয়ের প্রলেপ এবং একটু

উঃ-আঃ ছাড়া এই ঠাকুর প্রায় নির্বিকার থাকতেন।

কাজেই এক্ষেত্রে ভীমের ব্যাপারেও আজগুবি কথা শোনার হাসিটুকু হেসেই আমাদের আরও বৃহত্তর গল্পের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ ঘটনায় ব্যাসের ইঙ্গিত এইটুকুই যে, পাঁচ পাণ্ডবভাইদের মধ্যে ইনি একটু আলাদা। জন্মলগ্নেই সে যেহেতু পিতা পাণ্ডুকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে জন্মেছে, অতএব মহাভারতের পাঠক-শ্রোতাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিটির যে কোনও অমানুষিক কাজের জন্য, যে কোনও অতিমানুষিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য। ভীমের জন্মলগ্নে আরও একটা ইঙ্গিত ব্যাসের আছে। তিনি বললেন—ঠিক যেদিন ভীম জন্মালেন, সেইদিনই জন্মালেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধন। আমাদের মতো বাঙালদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে—রাশিতে পাড়া দিয়ে জন্মেছে। একই বাড়িতে দুই ভাইতে বনছে না অথবা ছেলে জন্মানোর পর পরই মায়ের মৃত্যুরোগ ধরল অথবা বাপ-ছেলেতে বনিবনা হচ্ছে না মোটেই—এইসব ক্ষেত্রে গেঁয়ো লোকেরা বলেন—রাশিতে পাড়া দিয়ে জন্মেছে।

বাঙাল ভাষায় 'পাড়ানো' অর্থ পা দিয়ে মাড়ানো। মহাভারতের অবশেষ যেহেতু আমরা জানি, তাই ভীম-দুর্যোধনের সম্পর্ক নিয়ে এখনই আমরা কথা বলব না। কিন্তু দুর্যোধন যে ভীমের জন্মরাশিতে পা দিয়েই জন্মেছিলেন—সেটার একটা প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে। মহাভারতের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণগুলিতে অতিরিক্ত একটি শ্লোক দেখা যায়, তাতে লেখা আছে—সূর্য তখন আকাশের ঠিক মাঝখানটায়। চৈত্র মাস। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। মঘা-নক্ষত্রাশ্রিত সিংহরাশিতে ভীম জন্মালেন।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বহু পরিশ্রম স্বীকার করে হয়তো প্রায় নির্ভুল গণনায় ভীম এবং দুর্যোধনের রাশিচক্র সহ জন্ম-পত্রিকা তৈরি করেছিলেন। তাতে দেখা যাচ্ছে—মঘা-নক্ষত্রযুক্ত সিংহরাশিতে ভীম জন্মেছিলেন দুপুরবেলায়, আর দুর্যোধন জন্মেছিলেন ওই সিংহরাশিতেই। তবে তাঁর জন্ম-নক্ষত্র ছিল পূর্বফাল্গুনী এবং তিনি জন্মেছিলেন রাত্রে। ভীমের মিথুন লগ্ন, আর দুর্যোধনের তুলা। রাশিচক্রের বিশদ বিবরণে আমি যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, দুই সিংহরাশির জাতক শুধু দিন আর রাত্রির প্রভেদে জন্ম লাভ করে গ্রহ-নক্ষত্রের বিষম সমাবেশে পরস্পরের জন্মশত্রু হয়ে রইলেন। দ্বৈপায়ন ব্যাস ভীমসেনের জন্ম-চিত্র দেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক লহমার জন্য দুর্যোধনের ওপর আলো ফেলেছেন। ভবিষ্যতে যিনি ভীমের চরম প্রতিস্পর্ধী হবেন—এক মুহূর্তের জন্য, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও, তাঁকে চিনিয়ে রাখলেন ব্যাস। বললেন—ভীম যেদিন জন্মালেন সেদিনই জন্মালেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম পুত্র দুর্যোধন।

দিনে দিনে অন্যান্য পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে ভীমও বেড়ে উঠতে লাগলেন। পিতা পাণ্ডু যখন মারা গেলেন ভীমের বয়স তখন পনেরো বছর। মায়ের সঙ্গে ভাইদের হাত ধরে, শতশৃঙ্গ পর্বতের সরল প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে, ভীম যখন হস্তিনাপুরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে পৌঁছলেন, তখন শুধু বড় বড় চোখে শহর দেখা ছাড়া তাঁর আর কোনও জটিলতা ছিল না। মায়ের কাছে গল্প শুনেছেন নিশ্চয়ই যে, তাঁদের বাবা পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজত্ব ছেড়ে বনে এসে বাস করেছিলেন। তাঁর বাবার রাজত্ব অন্ধ জ্যাঠা ধৃতরাষ্ট্র সামলাচ্ছেন, আসলে তিনি রাজা নন।

মুনি-ঋষিদের সঙ্গে সাদা-মাটা জামা-কাপড় পরে পাণ্ডবরা যখন পাণ্ডুর ছেলের পরিচয়ে হস্তিনাপুরে পৌঁছলেন, তখন গোটা শহর ভেঙে পড়েছিল তাঁদের দেখতে। বাপ-মরা রাজা-বাপের ছেলেদের যখন এই অবস্থা, তখন ধৃতরাষ্ট্রের একশো ছেলে সোনার হার-মুকুট গায়ে-মাথায় চড়িয়ে খুড়তুতো ভাইদের দেখতে এসেছিল। পনেরো বছরের ছেলে, কিছুই কি আর বোঝে না! ঋষিরা পাণ্ডবদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভীমের পরিচয় দিয়ে বললেন—বায়ু দেবতার ঔরসে এই ছেলেটির জন্ম। ইনি মহাবল ভীমসেন।

পিতা পাণ্ডুর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেল। পাণ্ডবভাইরা হস্তিনাপুরে আশ্রয় পেলেন। হ্যাঁ, খাওয়া-পরার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু জ্যাঠার ছেলে দুর্যোধন ইত্যাদি একশো ভাইদের তুলনায় তাঁদের রাজপুত্রোচিত স্বাভাবিকতার অভাব ছিল। আসছি সে কথায়। উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজার

ছেলের প্রাধান্য যাঁরা পাচ্ছেন না, তাঁরা অন্যভাবে তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন—তাতে আশ্চর্য কী ! ছোটবেলায় খেলাধুলোর আসর থেকে পাণ্ডবদের এই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা শুরু হল ।

ব্যাস লিখেছেন—সব রকমের খেলাধুলোয় পাণ্ডবভাইরাই ছিলেন বেশি ওস্তাদ—বালক্রীড়াসু সর্বাসু বিশিষ্টাস্তে তদাভবন্। আর ভীমসেন ? ভাইদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে শক্তিশালী, শরীরের ওজনও তাঁর সবার চেয়ে বেশি। কুরুভাইরা কথায় কথায় হিরে-মুক্তো গায়ে ছড়ায়, মুঠো মুঠো পয়সা ওড়ায়। পনেরো বছরের ছেলে কি কিছুই বোঝে না ! তার ওপরে ভীমের স্বভাবটাই একটু ক্ষমাহীন, নৃশংস গোছের। অতএব খেলার আসরেও যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত, সেখানেও কৌরব-ভাইরা ভীমের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। না, এই খেলার মধ্যে হয়তো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোনও বৃত্তি ভীমের ছিল না। মহাভারতের কবি অন্তত সেই দ্বেষ, সেই হিংসা কিছু দেখতে পাননি। তাঁর মতে—ভীমের দিক থেকে সবটাই ছিল বালকসুলভ চপলতা, হিংসা-দ্বেষ কিছু নয়—বাল্যান্ ন দ্রোহচেতসা ।

আসলে ভীমের বিশাল শরীরে এতই শক্তি, এতই তাকত যে, অন্যান্য রাজপুত্রদের মতো শুধু ক্রীড়া-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করে সে শক্তি ক্ষান্ত হত না। এই বিশাল শক্তির একটি নির্গম-পথের প্রয়োজন ছিল এবং কৌরব-ভাইদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই ছিল সেই শক্তির একমাত্র নির্গম পথ। এই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বিষম বলেই ভীমের দিক থেকে যা ছিল খেলা, অন্যের পক্ষে সেটাই ছিল নৃশংসতা ।

আর তখনকার দিনের খেলায় তো অত কিছু বৈচিত্র্য ছিল না, কাজেই খেলার মধ্যে দুষ্টুমিটাই ছিল প্রধান। আর দুষ্টুমির প্রতিযোগিতায় ভীমের সঙ্গে অন্যেরা পারবে কেন। যেমন ধরুন—দৌড়নো। ভীম নাকি ঝড়ের গতিতে দৌড়তে পারতেন। বায়ু দেবতার ছেলে বলে কথা, এই ক্ষমতা তো তাঁর থাকবেই। খেলার মধ্যে আর ছিল 'লক্ষ্যাভিহরণ' অর্থাৎ ধরুন—দূরে কোনও জায়গায় তালগাছ থেকে তাল পড়ল—কে আগে তুলে আনতে পারে ? খাওয়া—খাওয়াটাও একটা খেলার মধ্যেই ছিল—কে কত খেতে পারে। দৌড়নো আর খাওয়ার খেলায় ভীমকে হারাবে—এমন ক্ষমতা কোনও ছেলেরই ছিল না। খেলা হিসেবে আর যেটাতে ভীম ভীষণ রকমের ওস্তাদ ছিলেন—ব্যাসের মতে সেটা খেলা, আধুনিক শহুরে মতে সেটা নোংরা দুষ্টুমি। শহুরে বললাম এইজন্যে যে, আমাদের ছোটবেলায় গাঁয়ে-গঞ্জে আমরা এই খেলা খেলেছি। এ খেলাটা হল ঢিল ছোড়া ।

শহরের লোকেরা নাক সিটকে বলতেই পারেন—অও ন্যাস্টি ! কিন্তু গাঁয়ে-গঞ্জের খ্যাপা হাওয়ায় আমবাগানে যাঁরা ঢিল ছুড়ে বা গুলতি ছুড়ে আম পেড়েছেন, পেয়ারা পেড়েছেন, তাঁরা এই খেলার মাধুর্য এবং গুরুত্ব দুটোই উপলব্ধি করতে পারবেন। মহাভারতের খেলার মধ্যে অবশ্য ঢিল ছোড়ার সঙ্গে ধুলো ছোড়াও আছে এবং ব্যাস লিখেছেন—এই সব খেলায় ভীম ছিলেন ফার্স্ট—জবে লক্ষ্যাভিহরণে ভোজ্যে পাংশুবিকর্ষণে। কিন্তু কৌরবকুমারদের সঙ্গে এই সব সাধারণ খেলায় অসংখ্যবার জিতে যাওয়ায় এই সব খেলা তাঁকে আর আকর্ষণ করত না। অতএব খেলার মধ্যে আপন বৈচিত্র্য আবিষ্কার করে তিনি নিজের তৃপ্তি ঘটাতে আরম্ভ করলেন আর তখনই এই খেলাই হয়ে উঠল কৌরবকুমারদের উৎপীড়নের বিষয় ।

দুর্যোধনরা একশো ভাই। তাঁদের বেশ কয়েকজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলা আরম্ভ করেছেন। খেলা বেশ জমেও উঠেছে। এমন সময় ভীম এলেন হয়তো। খেলায় কোনও অংশ নেওয়া তাঁর কাছে পুরনো হয়ে গেছে। তিনি এসেই ঝপাঝপ কয়েকজন কৌরবকুমারকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়লেন—গৃহ্য রাজন্ বিলীয়তে। এদিকে তো খেলা মাটি হয়ে গেল, আবার অন্যদিকে যেগুলিকে ভীম তুলে নিয়ে গেছেন, তাদের একজনের সঙ্গে আরেক জনের মাথার ঠোকাঠুকি করে দিয়ে বড়ই মজা পেতেন ভীমসেন—শিরঃসু বিনিগৃহ্যৈতান্ যোধয়ামাস পাণ্ডবঃ। গায়ে অসম্ভব জোর, অতএব কৌরবকুমারদের মাটিতে ফেলে তাদের ওপর চেপে বসে কারও মাথা, ঘাড় বা শরীরের অন্য কোনও অংশ ঘষে দিতেন মাটিতে। তারা কাঁদছে, এই অবস্থাতেও ঘষে

দিতেন—চকর্ষ ক্রোশতো ভূমৌ ঘৃষ্টজানুশিরো'ংসকান্‌।

জলের মধ্যে খেলা হচ্ছে। জল ছোড়াছুড়ি, জলের মধ্যে সাঁতার, দাপাদাপি সবই চলছে। ভীম এসে একসঙ্গে দশ জন কৌরবকুমারকে, কাউকে হাতে, কাউকে চুলের মুঠি ধরে, কাউকে বগলে চেপে ধরে জলের তলায় বেশ খানিকক্ষণ চুবিয়ে রেখে দিলেন। তারপর যখন তাঁদের দম আটকে প্রায় মরার মতো অবস্থা হত, তখন তাঁদের ছেড়ে দিতেন ভীম—মৃতকল্পান্‌ বিমুঞ্চতি। কৌরব কুমারেরা গাছে উঠেছেন ফল পাড়তে, ভীম গিয়ে সেই গাছে এমন ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করলেন যে, গাছ থেকে ফলের সঙ্গে কৌরবকুমাররাও ঝুপঝুপ করে মাটিতে পড়তে আরম্ভ করলেন—সফলাঃ প্রপতন্তি স্ম দ্রুতং ত্রস্তা কুমারকাঃ।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে কোনও কৌরবকুমারই ঘুসোঘুসি, দৌড়দৌড়ি বা কুস্তিতে ভীমের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। আর পেরে উঠতেন না বলেই ভীম তাঁদের আরও বেশি 'চ্যালেঞ্জ' করতেন—স্পর্ধমানো বৃকোদরঃ। ব্যাস লিখেছেন—ভীমের মনে কোনও হিংসা বা দ্বেষ ছিল না কৌরবদের প্রতি, তিনি এমনিই, দুষ্টুমি করেই এইসব কাণ্ডকারখানা করে বসতেন—বাল্যান্‌ ন দ্রোহচেতসা। আমাদের ধারণা—কুরুকুমারদের প্রতি হিংসা-দ্বেষ ভীমের সচেতন মনে না থাকলেও অবচেতনে ছিল। কারণ একই ধরনের ক্রীড়া-ব্যবহার ভীম তো তাঁর পিঠোপিঠি ভাই অর্জুন অথবা নকুল-সহদেবের সঙ্গে করতেন না।

আসলে পাণ্ডু মারা যাবার পর ধৃতরাষ্ট্রই তাঁর রাজ্য চালাচ্ছিলেন এবং দুর্যোধন-দুঃশাসন ইত্যাদি কৌরবকুমারদের ব্যবহারও হয়ে গিয়েছিল রাজপুত্রের মতো। পাণ্ডবদের প্রথম রাজধানী-প্রবেশের পর তাঁরা সালংকারে মৃতপিতৃক ভাইদের দেখতে এসেছিলেন এবং এর পরেও দুর্যোধনের যে সব ব্যবহার আমরা দেখতে পাব, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যাবে যে, নিজেদের ভোগ-সুখের জন্য তাঁরা রাজকোষ এবং রাজযন্ত্র ব্যবহার করছিলেন—যা পাণ্ডবরা পারেননি। ভীম অসাধারণ শক্তিশালী অথচ কূটনৈতিক বুদ্ধিতে অতটা পোক্ত নয় বলেই তাঁর পনেরো-ষোলো বছরের খেলার কৌশলগুলির মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বঞ্চনার ছায়াপাত ঘটছিল। তাঁর অবচেতন মনে কৌরবকুমারদের প্রতি তিনি ক্রমেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলেন এবং এই নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটছিল খেলার মধ্যে, ইচ্ছাকৃত রেষারেষির মধ্যে।

দিনের পর দিন ভীমের হাতে নাকানি-চোবানি খেয়ে কৌরবরাও ভীমের ওপর ক্ষেপে গেলেন এবং ভীমও তাঁদের এমন কিছু প্রিয় কার্য করছিলেন না। তা ছাড়া দেখুন—দুর্যোধন কিন্তু সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই নিজের আখের খুব ভালই বুঝতেন। কারণ ব্যাস লিখেছেন—দুর্যোধন যখন দেখলেন যে, কুন্তীর এই মেজ ছেলেটাই সবচেয়ে শক্তিশালী তখন তাঁর মন বলল—এটাকে ছলনা করে শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মবোধ অথবা ন্যায়-অন্যায়ের চিন্তা দুর্যোধনের ছিল না এবং ভবিষ্যত ঐশ্বর্যের লোভ এবং মোহ তাঁর মনে এই দুষ্ট বুদ্ধির জন্ম দিয়েছিল যে, ভীমই তাঁর পথের কাঁটা—মোহাদ্‌ ঐশ্বর্য-লোভাচ্চ পাপা মতিরজায়ত। দুর্যোধনের এই ঐশ্বর্য-লোভ কি ভীমের অবচেতনে কিছুই ক্রিয়া করেনি?

ব্যাসের এই কথাটা থেকে বোঝা যায়—দুর্যোধন সেই বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের নয়। পাণ্ডবরা বড় হলে রাজ্য দাবি করবেনই। অতএব ভীম একাই যেখানে একশো ভাই কৌরবদের সব সময় 'চ্যালেঞ্জ' করছেন—স্পর্ধতে চাপি সহিতান্‌ অস্মান্‌ একো বৃকোদরঃ—সেখানে ভীম বড় হলে একটা ফ্যাকটর হয়ে দাঁড়াবেন। অতএব ওটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কীভাবে সরিয়ে দিতে হবে—সে সিদ্ধান্তও তিনি একাই নিলেন। ঠিক করলেন—নগরীর উদ্যানে ভীম যখন ঘুমিয়ে পড়বেন—হয়তো মাঝে মাঝেই এই ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস তাঁর ছিল—তখন ভীমকে গঙ্গার অতল জলে ফেলে দিতে হবে। আর ভীমকে এইভাবে শেষ করে দিয়েই যুধিষ্ঠির আর অর্জুনকে কারাগারে বন্দি করে রাখব। তারপর আর কী—সমস্ত রাজ্যই তখন আমার হাতের মুঠোয়—প্রসহ্য বন্ধনে বধ্বা প্রশাসিষ্যে বসুন্ধরাম্‌।

এত দূর পর্যন্ত যাঁর মনোবাসনা, তাঁর কি কিছুই প্রকাশ ঘটত না? আরে-ঠারে নিশ্চয়ই ঘটত;

অতএব সচেতন মনে ভীমের হিংসা-দ্বেষ না থাকলেও অবচেতনে একটা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ছিল। তার ফলেই ভীমের ক্রীড়া-ব্যবহারে নিষ্ঠুরতার আভাস। আর সেই নিষ্ঠুর খেলা আর দুষ্টুমির জের টেনেই দুর্যোধনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত—ভীমকে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে হবে।

যদি পাণ্ডবরা এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে তাঁদের সমস্যা ছিল। কারণ, রাজযন্ত্র তাঁদের হাতে ছিল না। পাণ্ডু বনে যাবার পর সপুত্রক কুন্তী যখন হস্তিনাপুরে ফিরেছেন, তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো আর দুর্যোধনের বয়স পনেরো। অর্থাৎ এই পনেরো বছর ধরে দুর্যোধন রাজপুত্রের মর্যাদায় মানুষ। দুর্যোধনের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ কম ছিল, অতএব নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য রাজযন্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে তাঁর কোনও নীতির বালাই ছিল না। দুর্যোধন ভীমের ছিদ্র খুঁজতে লাগলেন এবং ছিদ্র পাওয়ার আগেই তিনি যে কাজটা করে ফেললেন, সেটা হল—আশ্চর্য রকমের ভাল কতগুলি চাঁদোয়া বানিয়ে ফেললেন।

জলবিহার করার জন্য একটা জায়গা ঠিক হল গঙ্গার ধার ঘেঁষে। জায়গাটার নাম প্রমাণকোটি। সেখানে লোক-লস্কর লাগিয়ে অস্থায়ী কতগুলি ঘর তৈরি করা হল। এগুলি নিঃসন্দেহে এখনকার 'টেন্ট', তবে জবরদস্ত এবং সুন্দর 'টেন্ট'। রঙবাহারি কাপড় আর এখনকার 'ক্যাম্বিসে'র মতোই মোটা কম্বলের কাপড় দিয়ে 'টেন্ট'—চেল-কম্বল-বেশ্মানি বিচিত্রাণি মহান্তি চ। 'টেন্ট'গুলো তৈরি করা হল এমনভাবে যেন তার অধিকাংশটাই থাকে জলে এবং খানিকটা স্থলে—অনেকটা খুঁটিপোতা 'জেটি'র মতো। সব 'টেন্টে'র ভিতর সযত্নে সাজিয়ে রাখা হল লোভনীয় সব 'গিফট'—ইচ্ছে করলেই নেওয়া যেতে পারে। 'টেন্টে'র ওপরে পতাকা তুলে দেওয়া হল। দুর্যোধন এই অস্থায়ী নীরাবাসের নাম দিলেন—উদকক্রীড়ন। ভীমের কথা মাথায় রেখে দুর্যোধন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার ক্রটি রাখলেন না। পাকা রাঁধুনি দিয়ে রান্না করিয়ে—চর্ব্য-চোষ্যের পাক সাজিয়ে রাখা হল স্থলাংশের 'টেন্টে'।

সব যখন রেডি, তখন দুর্যোধন পাণ্ডবভাইদের বললেন—চল সবাই, জলবিহার করব গঙ্গায়। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ ভোলেভালা যুধিষ্ঠির বললেন—ঠিক আছে—এবম্ অস্তু। পাণ্ডব-কৌরবরা তখন রথে আর হাতিতে করে নগরের বাইরে চললেন—প্রমাণকোটিতে। আগে ঠিক ছিল—নগরের উদ্যান-ভূমি থেকেই ঘুমন্ত ভীমকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হবে—তস্ত সুপ্তং পুরোদ্যানে গঙ্গায়াং প্রক্ষিপামহে। এখন কিন্তু ভীষ্ম-বিদুর ইত্যাদি বড় মানুষদের চোখ এবং ঝামেলা এড়ানোর জন্য তিনি নগরীর বাইরে নিয়ে চললেন পাণ্ডবদের—নির্যযু-র্নগরাচ্ছূরাঃ।

আজ প্রমাণকোটির নীরাবাসে অঢেল মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। দালান-বাড়িতে থাকা মানুষের অস্থায়ীভাবে 'টেন্টে' থাকতে বেশি ভাল লাগে। বিরাট ফুলের বাগান তৈরি হয়েছে সেখানে, দরবার-হল, চিলেকোঠা, ফোয়ারা—জলৈঃ সাঞ্চারিকৈরপি, সিজিনাল ফ্লাওয়ার—পুষ্পৈ-র্যথর্তুকৈঃ—কী নেই সেখানে! বাগানে বসেই খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হল। দুর্যোধনের অর্ডারে একটার পর একটা খাবার আসছে। এ ওর মুখে দিচ্ছে, সে তার মুখে দিচ্ছে—ভারী অন্তরঙ্গ এবং আনন্দময় পরিবেশ। এরমধ্যেও দুর্যোধনের মাথাটা কিন্তু ঠিক আছে। হৃদয়ে জিঘাংসার ক্ষুরধারা, মুখে মিষ্টি কথা। কাজের লোকের উদ্দেশেই যেন চেঁচিয়ে বললেন—আরে সেই ভাল খাবারটা ভীমকে দিলিনে। ব্যবস্থা করার জন্য দুর্যোধন নিজেই উঠে গেলেন। সকলের অলক্ষে খাবারে বিষ মিশিয়ে তিনি কারও ওপরে বিশ্বাস না রেখে নিজের হাতে ভীমকে খাইয়ে দিলেন সেই খাবার। খাবারটা বাইরে থেকে দেখতে অমৃতকল্প—দুর্যোধনের মুখের মিষ্টি কথার মতো, কিন্তু খাবারের ভিতরে বিষ—দুর্যোধনের হৃদয়ের মতো।

ভীম অবিশ্বাস করলেন না। প্রথমত, খাবার বলেই। দ্বিতীয়ত, আপন জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ব্যাপারে কি এতটা আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত ছিল? ভীম খেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন মনে মনে সফলকাম হয়ে বাইরে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন জলক্রীড়ায়। যাতে ভীমের বিষ-বিকার বসে বসে দেখার সুযোগ কেউ না পায়। তা ছাড়া এরই মধ্যে জলক্রীড়া হয়ে গেলে বিষক্রিয়ায় ভীমের মূর্চ্ছা অথবা ঘুমের ভাবটাকে অতিরিক্ত জলক্রীড়ার ক্লান্তি বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে—মনে মনে এই বুদ্ধি

করে দুর্যোধন সবাইকে জল-খেলায় আহ্বান জানালেন।

খুব খেলা হল। জল-ছোড়াছুড়ি, সাঁতার, ডুব-সাঁতার—সব কেরামতি শেষ করে শ্রান্ত-ক্লান্ত কৌরবভাইরা ঠিক করলেন—রাত্রে থেকেই যাবেন প্রমাণকোটির নীরাবাসে। ওদিকে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে প্রচুর জল-খেলার ব্যায়াম এবং পরিশ্রম যখন শেষ হয়ে গেল, তখন ভীম তাঁর বালক-বাহিনী নিয়ে গঙ্গার তীরে উঠলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তিনিও বললেন—রাত্রে আমি এখানেই থাকব। একটা জায়গা দেখে শুয়ে পড়লেন ভীম। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। ভাবলেন—এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিকটা ঘুমোলেই সব যন্ত্রণার উপশম ঘটবে।

কৌরবভাইরা যে প্রমাণকোটিতে থেকে গেলেন, তার কারণ যতটা পরিশ্রম, তার চেয়ে অনেক বেশি হল দুর্যোধনের নির্দেশ। দুর্যোধনের সব ভাইরা হয়তো তাঁর মনের অসদিচ্ছাটুকু জানতেন না। কিন্তু এইটা জানতেন নিশ্চয়ই যে,—থাকব—এ-কথা বলতে হবে। তা ছাড়া প্রমাণকোটির সাময়িকঃ আবাসগুলিও তৈরি করা হয়েছিল থাকবার জন্যই। ভীম অবশ্য অতদূর পৌঁছতে পারেননি, তীব্র বিষক্রিয়ায় গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় তিনি শরীর এলিয়ে দিলেন খোলা মাঠে, নীল আকাশের নীচে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রমাণকোটির নীরাবাসে কৌরবভাইরা দারুণ দারুণ জামা-কাপড় পরে নতুন কোনও মজার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন—ক্রীড়াবসানে তে সর্বে শুচিবস্ত্রাঃ স্বলংকৃতাঃ। শুধু একটিমাত্র লোককে এই ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে সাময়িকভাবে দেখা গেল না। তিনি দুর্যোধন। দুর্যোধন একা চলে গেলেন গঙ্গার তীরভূমির সেই প্রান্তে—যেখানে প্রথম রাত্রির অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন ভীমসেন।

দুর্যোধন শুকনো লতার বন্ধনে বেশ করে বাঁধলেন সংজ্ঞাহীন ভীমকে, যাতে ইচ্ছে করলেই বাঁধন খুলে কিছু করা না যায়। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ভীমকে গঙ্গার গভীরে ফেলে দিয়ে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিলেন প্রমাণকোটির সান্ধ্য কৌতুকে, মজলিসে, আড্ডায়। মাত্র পনেরো-ষোলো বছর বয়সে একটি জল-জ্যান্ত খুন করার পরেও তাঁর রক্তচাপ একটুও বাড়ল না, মুখে ধরা পড়ল না এতটুকু বিকৃতি।

ভীম ডুবতে থাকলেন। জলের তলায় ডুবতে-ডুবতে, ডুবতে-ডুবতে একেবারে পাতালে নাগলোকে এসে পৌঁছলেন। মহাভারতের সমাজে মানুষের বিশ্বাস ছিল—জলের তলায় আছে নাগলোক। সেখানে সাপেরা থাকে। আর থাকেন সাপেদের রাজা বাসুকি। নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে ভীম এসে পৌঁছলেন নাগ-ভবনে যেখানে নাগ-শিশুরা খেলা করছিল। ভীম তাদের গায়ের ওপর চেপে গেলেন, তারা তখন কামড়াতে আরম্ভ করল। বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেল। সিদ্ধান্তবাগীশ টীকায় লিখেছেন—আগুনে পুড়ে সীসা যেমন সোনার ময়লা নষ্ট করে এবং নিজেও উবে যায়, তেমনই সাপেদের বিষ দুর্যোধনের কালকূট বিষ নষ্ট করে দিয়ে নিজেও শক্তিহীন হয়ে গেল—বিষস্য বিষমৌষধম্।

মহাভারতের এই নাগলোকের কল্পনায় আমার নিজের দুটো কথা আছে। বস্তুত ইতিহাসের প্রমাণ দিয়ে বলা যায় যে, মহাভারতের কালে নাগ একটি প্রধান উপজাতি ছিল। আধুনিককালের হাজারো উপাধির মধ্যে 'নাগ' উপাধি এখনও যথেষ্ট আছে। হয়তো এই নাগেরা সাপের 'টোটেম' ব্যবহার করত। সেকালের আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে নাগদের অনেক মারামারি, লাঠালাঠি হয়েছে। নাগরা শেষপর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে, কতক জায়গায় আপোষ-মীমাংসাও হয়েছে। শেষে ভালবাসাও হয়েছে। কৃষ্ণ এবং কালীয়-নাগের দৃষ্টান্ত, অর্জুন এবং নাগকন্যা উলূপীর দৃষ্টান্ত এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

আমাদের ধারণা—ভীম জলের তলায় সম্পূর্ণ ডুবে যাননি। দুর্যোধন তাঁকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন ঠিকই, ভীমও লতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জলে ডুবেছিলেন, নিঃশ্বাসও তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসছিল কিন্তু যে কোনও ভাবেই হোক—তাঁর উষ্ণীষ-বন্ধনের প্রান্তভাগ দেখে অথবা রঙিন উত্তরীয় দেখে নাগ-জাতির মানুষেরা তাঁকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। উদ্ধারের পর উপজাতীয় মানুষের ঘরোয়া প্রাচীন চিকিৎসা—ছ্যাঁকা-দাগা জড়ি-বুটির সাহায্যে ভীমের শারীরিক বিষ নাশ হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই ভীম চেতনা লাভ করেছেন এবং তিনি তাদের মারতে আরম্ভ করেছেন।

নাগেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখিয়া বা প্রধান বাসুকির কাছে—নাগেদের মধ্যে যে যখনই প্রধান হত সেই 'বাসুকি' উপাধি পেত—অতএব সেই বাসুকির কাছে 'রিপোর্ট' করল। বাসুকি দলবল নিয়ে গিয়ে দেখলেন—ভীম। যেহেতু বাসুকি তাঁকে চিনতে পেরেছেন, তাতে ধারণা হয়—ভীমের কৌলিক গোষ্ঠীর সঙ্গে এই নাগগোষ্ঠীর পূর্ব-পরিচয় ছিল এবং তাদের জনপদও খুব দূরে ছিল না। বাসুকি তো বরেন্দ্র অথবা বৈদিক ব্রাহ্মণদের মতো ভীমের সঙ্গে রীতিমতো এক আত্মীয়তার সূত্রও আবিষ্কার করে ফেলেন। ভীম নাকি তাঁর নাতির নাতি—তদা দৌহিত্র-দৌহিত্রঃ পরিম্বক্তঃ সুপীড়িতম্।

কুন্তীর বাবা শূরের মাতামহ নাকি বাসুকি। সেই সম্বন্ধে নাতির নাতি ভীমকে দেখে বাসুকি এতই খুশি হলেন যে, তিনি ভীমকে টাকা-পয়সা, মণি-রত্ন উজাড় করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ওই যে বলেছি—নাগরা হয়তো সাপ-টাপ নন, তাঁরা হয়তো কোনও প্রাচীন উপজাতির মানুষ। বাসুকির কথা শুনে তাঁর অনুচর তাঁর নিজের স্বভাবসিদ্ধ চালে বলল—এই ছেলেটাকে দেখে আপনার যখন এত খুশ্ পয়দা হয়েছে, তবে ইয়াকে আমরা রস খাওয়াব, রস—রসং পিবেৎ কুমারোঽয়ং ত্বয়ি প্রীতে মহাবলঃ।

লোকটি নিজেদের আনন্দ এবং উৎসবের প্রতীক হিসেবে অতিথি ভীমকে 'রস' খাওয়াতে চায়। উপজাতি অথবা আর্যগোষ্ঠীর বাইরে এই জনপদে অভ্যর্থনার সব চাইতে বড় অঙ্গ হল এই 'রস'। বাসুকি রাজা মানুষ এবং আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যাতায়াত তথা পারিবারিক সম্পর্কও আছে। অতিথি আপ্যায়নের জন্য তিনি তাই আর্যপ্রথা অনুসরণ করে ধন-রত্নের উপহার দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুচর তাঁর মালিককে খুশি হতে দেখে নিজেদের পরিচিত প্রথা অনুযায়ী ভীমকে রস-পান করাতে চায়। সে বলে—টাকা-পয়সা উপহার দিয়ে কী হবে—কিমস্য ধনসঞ্চয়ৈঃ—ইয়াকে রস খাওয়াব।

এই 'রস' অবশ্যই মদ্য যা এক পাত্তর খেলে হাজার হাতির বল পাওয়া যায় শরীরে—বলং নাগসহস্রস্য যস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্। এরা রাজা-মহারাজার মতো শোভন সুরাপাত্রে রস পান করে না। কড়া মদ গলাধঃকরণের জন্য এদের জালার মতো কতগুলি পাত্র আছে, যাকে ভদ্র ভাষায় বলে 'কুণ্ড'। বিষে পীড়িত, শক্তিহীন শরীরে টাকা-পয়সার চেয়ে রস-পানের প্রস্তাবই ভীমের বেশি ভাল লাগল। ভীম একেবারে পুজো করার মতো পুব-মুখ করে বসে এক এক নিঃশ্বাসে এককে পাত্তর মদ চড়াতে লাগলেন। এইভাবে আট পাত্তর শেষ করে বাসুকির দেওয়া বিছানায় একটি প্রগাঢ় ঘুম দিলেন ভীমসেন।

আসলে এ সব জায়গা ভীমের খারাপ লাগার কথা নয়। তিনি নিজে বড় আর্যোচিত ভদ্রতা-শৃঙ্খলার ধার ধারতেন না। তাঁর শক্তি, মেজাজ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভবগুলিও খুব আর্যোচিত নয়। পরে সে সব কথা আসবে। কিন্তু এখন দেখুন—এই যে তিনি কোথায় এসে আট-পাত্তর সুরা পান করে বাসুকির বিছানায় শুয়ে পড়লেন—নিশ্চিন্ত মনে—তাঁর একটুও মনে হল না যে, তাঁর ভাইয়েরা, তাঁর মা কত চিন্তা করছেন, কত খুঁজছেন ভীমকে।

প্রমাণকোটিতে জলের খেলা শেষ হতেই পাণ্ডবরা বাড়ি ফিরলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দুর্যোধন ফিরলেন সবার পরে। একেবারে নিশ্চিত হয়ে যে, ভীম মারা গেছেন। সরলমতি যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের প্যাঁচপোচ কিছুই বুঝতে পারেননি। ভীমকে না দেখে তিনি ভাবলেন—সে নিশ্চয় আগেই বাড়ি চলে গেছে অথবা কোথাও শুয়ে ঘুম লাগিয়েছে। ভীমের হয়তো এই অভ্যাস ছিল—যেখানে সেখানেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন।

ঘুমের কথাটা মাথায় রেখেই পাণ্ডবভাইরা ভীমকে মাঠে, ঘাটে, বনে সব জায়গায় খুব খানিকটা খুঁজলেন। তারপর বাড়ি ফিরেই মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, ভীম এখানে ফিরে আসেনি তো? বাগান, বন—যত জায়গা আছে, সবই তো দেখলাম। কিন্তু তাকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তার কাপড়-জামা, জিনিস-পত্তর কিছুই তো দেখছি না। যুধিষ্ঠির ব্যস্ত হয়ে বললেন—ভীম এখানে ফিরে এসে কোথায় গেল? আপনি কি তাকে কোথাও পাঠিয়েছেন?

কুন্তীর মাতৃ-হৃদয় হা-হা করে উঠল। বললেন—সে তো এখানে ফেরেনি। তোমরা আবার যাও। চারদিকে খুঁজে দেখো। কুন্তী সঙ্গে সঙ্গে ছোট দেওর বিদুরকে ডাকিয়ে বললেন—কৌরব-পাণ্ডব সবাই মিলে নগরের বাগানবাড়িতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে শুধু ভীমকেই দেখা যাচ্ছে না। তুমি পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে গিয়ে একবার খুঁজে দেখো। বিদুর গেলেন, পাণ্ডবরাও অনেক খুঁজলেন ভীমকে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও। ভীমের বলবত্তা এবং দুঃসাহস নিয়ে জননী কুন্তীর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বিশেষত কৌরব-জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন যে তাঁর এই মেজ ছেলেটিকে কখনওই ভাল চোখে দেখে না—সেটা কুন্তী এই মুহূর্তে বলেও ফেললেন। রাজ্যলোভী দুর্যোধন যে যখন তখন ভীমকে মেরে তাঁর পথের কাঁটা সরিয়ে দিঁতে পারেন—সেই কথা ভেবে কুন্তীর হৃদয় আকুল হয়ে উঠল।

বিদুর কুন্তীকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি গেলেন বটে, কিন্তু কুন্তী তাঁর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ভীষণ আশঙ্কায় দিন কাটাতে লাগলেন। এদিকে ভীম বাসুকির জলপুরীতে আদরে আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে এমন ঘুম ঘুমোলেন যে, সাতদিন কেটে গেল, তবে তার হুঁশ হল। প্রভূত পরিমাণ রসপান করে গায়ে যখন হাতির মতো বল ফিরে পেয়েছেন তিনি, তখন তাঁর ঘুম ভাঙল। মনে নিশ্চিন্দি না থাকলে কি এমন ঘুম আসে! আট দিনের দিন নাগরাজ বাসুকিরই মনে হল—এবার ভীমের যাওয়া দরকার। তিনি ভীমকে বলেই ফেলেন—তোমাকে না দেখে তোমার মা-ভাইরা ভীষণ দুশ্চিন্তা করছেন নিশ্চয়, তুমি স্নান-খাওয়া সেরে এক্ষুনি রওনা হও—গচ্ছাদ্য স্বগৃহং স্নাতঃ।

আমি বেশ জানি—এ যদি যুধিষ্ঠির কিংবা অর্জুন হতেন, তাহলে তাঁদের অবচেতন মনের দুশ্চিন্তাই তাঁদের অত ঘুমোতে দিত না, অথবা ঘুম ভাঙলে অতিথি-পরায়ণ গৃহস্বামীকেও বলতে হত না যে, এবার তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত। আসলে ভীমের প্রকৃতিটাই এইরকম। বাসুকির কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রওনা হলেন না। স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পরে, ভাল রকম খাওয়া-দাওয়া করে, নাগদের দেওয়া ভূষণ-অলংকারে সেজে তিনি নাগদের সঙ্গে রওনা দিলেন নিজের দেশে। নাগেরা তাঁকে একেবারে হস্তিনাপুর নগরের প্রান্তে—যেখান তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন সেই নগরপ্রান্তে বনের কাছে রেখে গেল। ভীম সেখান থেকে সোজা চলে এলেন মা-ভাইদের কাছে। আনন্দ-মিলনের মধ্যে প্রণাম, নমস্কার আর আলিঙ্গনের পালা যখন মিটল, ভীম তখন দুর্যোধনের সমস্ত কুক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন মা-ভাইদের কাছে।

ভীমের কথার মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের স্পষ্টতা ছিল। দুর্যোধনের ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ এবং রাগ কোনওটাই নিশ্চয়ই চাপা থাকছিল না। ভীমের প্রতি শত-স্নেহ থাকা সত্ত্বেও ভীমের এই স্পষ্টতা যুধিষ্ঠিরের ভাল লাগছিল না। তিনি একটু রেগেই বললেন—চুপ করো ভীম! এ সব কথা এত স্পষ্ট করে তুমি বোলো না—তূষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্য্যং কথঞ্চন।

আসলে রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাণ্ডবভাইরা বড়ই দুর্বল। তাঁদের বাবা রাজা ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। হস্তিনাপুরে তাঁরা তখন ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন মাত্র। বাবা রাজা ছিলেন বলে—তাঁর ছেলেকে রাজ্য দেওয়া দূরে থাক—রাজযন্ত্রের ওপরে তাঁদের তখনও কোনও অধিকারই জন্মায়নি। যেখানে দুর্যোধনের মুখের কথায় গঙ্গার ধারে তাঁর খেলার জন্য ঘর-বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে পাণ্ডবভাইরা তখনও অস্তিত্বের যন্ত্রণায় ব্যস্ত। এই অবস্থায় শুধু মাত্র গায়ের জোর আছে বলেই ভীমের এই স্পষ্টবাদিতা যুধিষ্ঠিরের ভাল লাগেনি। কিন্তু ভীম এত সব বুঝতেন না। বুঝতেন না বলেই দুর্যোধনের অপব্যবহার তিনি সবিস্তারে বলেছেন এবং তাঁর বলার মধ্যে এমন আভাস নিশ্চয় ছিল যে, ওই ঘটনা পাঁচ কান করতেও তিনি দ্বিধা করবেন না। যুধিষ্ঠির সেই জায়গাটায় ভীমকে আঘাত করেছেন। ভীম নত-মস্তকে দাদার কথা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, পাণ্ডবভাইদের মধ্যে ভীমই ছিলেন প্রথম, যিনি দুর্যোধনের প্রতিহিংসার প্রথম বলি হয়েছিলেন। দুর্যোধনের ওপর ভীমের আমৃত্যু আক্রোশের নিরিখে পনেরো ষোলো বছরের একটি জ্ঞাতিভাইয়ের ওই বিষম আচরণ ভুলে গেলে চলবে না।

খেলাধুলো অনেক হল। এবারে একটু পড়াশুনো না করলে অভিজাত ক্ষত্রিয়-ঘরে চলে কী করে ? পুঁথিগত বিদ্যার পালা অল্পদিনেই শেষ হল। তারপর আরম্ভ হল ক্ষত্রিয়দের আসল যে বিদ্যা—অস্ত্র শিক্ষা। গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে ভীম এবং দুর্যোধন—দুজনেই গদাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। দ্রোণাচার্য প্রধানত তীর-ধনুকের প্রযুক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু অস্ত্রশিক্ষার আসরে যেহেতু সব বিদ্যাই শিখতে হয়, তাই ভীম এবং দুর্যোধনকে যেমন দ্রোণাচার্য গদাঘাতের শিক্ষা দিলেন, তেমনই ভীম-দুর্যোধনরাও প্রধানত গদায় নিপুণ হওয়া সত্ত্বেও তীর-ধনুকের প্রযুক্তিটাও শিখে নিলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। এই শিক্ষার মধ্যে গভীরতা তত ছিল না বলেই দ্রোণাচার্যের পাখির চোখ-বিঁধানোর পরীক্ষায় ভীম এবং দুর্যোধন—দুজনেই ফেল করেছিলেন এবং দ্রোণাচার্যের কাছে বকুনিও খেয়েছিলেন।

মুশকিল হল দ্রোণাচার্য গদাশিক্ষার কোনও পরীক্ষা নেননি। তীর-ধনুকের সূক্ষ্ম প্রযুক্তি নিয়েই তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন, অতএব তীর-ধনুকের পারদর্শিতাই তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষার শেষ কথা বলে মনে হত। ভীম আর দুর্যোধন দুজনেই তাই গালাগালি খেলেন গুরুর কাছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্ত্রের প্রয়োগ যেমন অনেক সময় জরুরি হয়ে ওঠে, তেমনই অস্ত্রের ভারবত্তাও একেক সময় দারুণ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। গদা এইরকমই একটি অস্ত্র এবং ভীমের গায়ে অমানুষিক শক্তি ছিল বলেই প্রধানত তিনি গদার মতো একটা বিশাল এবং ভারী অস্ত্রের ব্যবহারে আকর্ষণ বোধ করেছিলেন।

ভীম এবং দুর্যোধন গদাবিদ্যায় কতটা পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, সেটা তাঁর সেই পক্ষিবেধের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়নি বলেই আমাদের সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে হল, যেদিন বিশাল প্রান্তরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন রাজবাড়ির ছেলেদের শিক্ষাসিদ্ধির বিবরণ শোনার জন্য। ধারা-বিবরণী দিচ্ছিলেন বিদুর। সভা পরিচালনা করছিলেন কৃপাচার্য।

রথ-চালানো, ঘোড়া-চালানো কি হাতি-চালানোর মতো সাধারণ বিষয়ে রাজকুমারেরা খানিকটা কেরামতি দেখিয়েই তলোয়ার-চালানোর মতো কঠিন বিদ্যায় নিজেদের ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করলেন। ঠিক তারপরেই ভীম আর দুর্যোধন দুজনে এক সঙ্গে উঠলেন নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য।

লক্ষণীয় বিষয় হল—সেই জন্মের সময় থেকে খেলাধুলোর সময় এবং খেলা থেকে এই অস্ত্র পরীক্ষার প্রদর্শনী পর্যন্ত মহাভারতের কবি প্রায় এক নিঃশ্বাসে ভীম আর দুর্যোধনের প্রসঙ্গ টানছেন, প্রায় একই সঙ্গে তাঁদের নাম উচ্চারণ করছেন। এই দুয়ের জন্ম-শত্রুতা দেখানোর জন্য আজ এই অস্ত্র-প্রদর্শনীর দিনে কবি মন্তব্য করেছেন—দুজন একই সঙ্গে তাঁদের মঞ্চ থেকে নেমে এলেন অস্ত্র-প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে। দুজনেই পরস্পরের প্রতি সদা-বিদ্বেষী। দুজনের হাতেই গদা। দুজনেই নিজের নিজের পৌরুষে এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে, দুজনেই ভাবছেন—জয় হবে আমারই—পৌরুষে পর্যবস্থিতৌ।

দুজনকে দেখাচ্ছিল যেন চূড়া-সমেত দুটো পাহাড় নেমে এসেছে ভুঁয়ে। আর দুজনেই এমন পরস্পর-বিধ্বংসী হাঁক-ডাক করছিলেন যেন মনে হচ্ছিল—একটা মাদি হাতি তার কামনার সুগন্ধ ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর পরস্পর-বিদ্বেষী দুটি মদ্দা হাতি সবৃংহনে আক্রোশ প্রকাশ করছে মাদিটার দখলদারির জন্য—বৃংহন্তৌ বাসিতাহেতোঃ সমদাবিব কুঞ্জরৌ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এঁদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হল সেই মাদি হাতিটি—যার জন্য যে কোনও সময়, যে কোনও পরিবেশে ভীম আর দুর্যোধন কোমর বেঁধে নেমে পড়তে পারেন যুদ্ধের জন্য। নেমে পড়লেনও।

দুজনে দুটো গদা হাতে পরস্পরকে আঘাত করার জন্য ডাইনে-বামে এমন দুর্মদভাবে ঘুরতে লাগলেন যে দর্শকদের মধ্যেও একটা ভাগাভাগি হয়ে গেল। যারা দুর্যোধনের পক্ষে, তারা বলতে লাগল—জিও দুর্যোধন, জিও। আর যারা ভীমের পক্ষে, তারা বলতে লাগল—জিও ভীমসেন, জিও—জয় হে কুরুরাজেতি জয় হে ভীম ইত্যুত। এই দুইজনের পারস্পরিক গদাপ্রহারের নিরিখে

রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকদের মধ্যেও একটা 'টেনশন' তৈরি হচ্ছিল। দ্রোণাচার্য সেটা অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলেন। শেষে এই দুজনকে কেন্দ্র করে যদি সাধারণ সমর্থক জনের মধ্যে একটা ছোট-খাটো লড়াই লেগে যায়—সেই আশঙ্কায় পুত্র অশ্বত্থামাকে তিনি ডেকে বললেন—অশ্বত্থামা! এই দুজনকেই তুমি থামাও। এদের গায়ের শক্তিও যেমন, অস্ত্রের শিক্ষাও তেমনই। শেষে এদের কেন্দ্র করে সাধারণ সমর্থকদের মধ্যেও একটা খণ্ডযুদ্ধ না হয়ে যায়—মা ভূদ্ রঙ্গ-প্রকোপো'য়ং ভীম-দুর্যোধনোদ্ভবঃ।

অশ্বত্থামা গুরুপুত্র এবং ব্রাহ্মণ। বায়ুক্ষুব্ধ তরঙ্গসংকুল দুটি সমুদ্রের মতো ভীম আর দুর্যোধন যখন পরস্পরের ওপর আছড়ে পড়ছিলেন, তখন অশ্বত্থামা তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। থামল পরস্পরের সংঘাত। অসীম শক্তি সম্পন্ন এই দুই বীর এই মুহূর্তে থেমে গেলেও একটু পরেই তাঁদের আর আটকানো যায়নি। মহারথী কর্ণ যখন উন্মুক্ত রঙ্গস্থলে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন, কৃপাচার্য তখন সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন সামান্য অছিলায়। কর্ণ সূতপুত্র, অতএব রাজবংশের ছেলে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার তিনি যোগ্য নন।

দুর্যোধন কর্ণকে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের রাজত্বে অভিষিক্ত করেন এবং অভিষেক-আর্দ্র-শির কর্ণ যখন সূত-পিতা অধিরথকে সেই রঙ্গস্থলের মধ্যেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, তখন ভীমকে আর বাগ মানানো গেল না। একে দুর্যোধনের ওপর তাঁর জাতক্রোধ, তাতে সভ্য-ভব্য মানুষের সূক্ষ্ম রুচিও তাঁর ছিল না। কর্ণ আর অধিরথের সম্পর্কটি আবিষ্কার হওয়া মাত্রই ভীমের মুখ ছুটে গেল। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি—ভীম কর্ণকে যা বলেছেন, তা দুর্যোধনের ওপর রাগেই বলেছেন; কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দেওয়ার উদারতা তাঁর কাছে আদেখলেমির মতো ঠেকেছে। রঙ্গভূমিতে কর্ণ অর্জুনকে সবার সামনে অপমান করেছেন—তাও ভীমেব সহ্য হয়েছিল, কিন্তু অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দুর্যোধন যে কর্ণকে খানিকটা তোল্লাই দিয়ে তাঁকে রাজা করে দিলেন—এটা তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি লেগেছে। আর বাড়াবাড়ি যখন হয়েছে, সেখানে ভীম চুপ করে থাকবেন কী করে? পিতা অধিরথের সামনেই তাই ভীম কর্ণকে অপমান করে বললেন—ওরে সারথির পো! অর্জুনের হাতে তুই মরবি, এমন ভাগ্যি তোর হবে না। বরং তোর জাত-বংশে যা চলে, সেই ঘোড়া-চালানোর চাবুক ধরাটাই তোর বেশি ভাল হবে—কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া। ভীম থামলেন না। বললেন—ওরে নরাধম! কুত্তা যেমন যজ্ঞের ঘি খাবার উপযুক্ত হয় না, তুইও তেমন অঙ্গরাজ্য ভোগ করার উপযুক্ত নয়।

জাত-বংশ নিয়ে এইসব কথাবার্তা কর্ণের মর্মে গিয়ে বিঁধেছিল। তিনি কোনও রকমে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিজের ক্রোধ শান্ত করেছেন। ভীম যে দুর্যোধনকেও এক হাত নিয়েছেন—সে কথা পরিষ্কার হয়ে গেল অঙ্গরাজ্যের কথায়। দুর্যোধন অবশ্য ভীমকে ছেড়ে দেননি। কর্ণকে পুরো সমর্থন করে অনেক উদাহরণ দিয়ে তিনি ভীমকে বলেছেন—তোদের জন্ম কীভাবে হয়েছে, আমি জানি—ভবতাঞ্চ যথা জন্ম তদপ্যাগমিতং ময়া। আরও পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিয়ে দুর্যোধন প্রধানত ভীমের উদ্দেশ করেই একটা হুঙ্কার আকাশে উড়িয়ে দিলেন—আমার এই কাজ যদি কারও পছন্দ না হয়, তো সে রথে উঠে ধনুকের ছিলায় টান দিক একটা।

সমর্থক জনগণের সাধুবাদ অথবা বিপদের সম্ভাবনায় অনেকের হাহাকারের মধ্যেই সেই দিনটা শেষ হয়ে গেল। কারণ সূর্য অস্ত গেছে। যুদ্ধ লাগার কোনও সম্ভাবনাই রইল না। কিন্তু এই প্রতিস্পর্ধী দুই বীর যুদ্ধের অপূর্ণ সাধ মনে রেখে কোমর বেঁধেই রইলেন।

৩

বৈদিক ইন্দ্র দেবতা এবং বায়ু দেবতা সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা জানেন যে, বেদে ইন্দ্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়েছে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। বেদে বায়ু দেবতা সব সময়েই ইন্দ্রের সাহায্যকারীর ভূমিকায় আছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শত্রুর ওপর আঘাত হানার সময় বায়ু ইন্দ্রকে

সাহায্য করেন—এটাই ইন্দ্রের আর বায়ুর বৈদিক পরিচিতি।

মাদাম বিয়ার্দো নামে এক ফরাসি বিদুষী ইন্দ্র আর বায়ুর এই বৈদিক ভূমিকাটি মহাভারতের অর্জুন এবং ভীমের ওপর চাপিয়েছেন। অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র, ভীম বায়ুর পুত্র। মহাভারত যেহেতু বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই লেখা হয়েছে, তাই মহাকাব্যের অর্জুন চরিত্রের মধ্যে বৈদিক বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের এবং ভীমের মধ্যে বায়ুর সাহায্যকারীর ভূমিকার ছায়াপাত ঘটাটা অসম্ভব কিছু নয়। অন্তত এই বিদুষী ফরাসিনীর তাই ধারণা।

মহাভারতের মধ্যে অর্জুন প্রথম যে প্রকাশ্য যুদ্ধটি জয় করেছিলেন, সেই যুদ্ধটা হয়েছিল অর্জুন আর দ্রুপদের মধ্যে। দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা হিসেবে শিষ্যদের কাছে চেয়েছিলেন—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে তারা জ্যান্ত ধরে আনুক, অন্য কিছু নয়। দুর্যোধন-কর্ণ সহ সমস্ত কৌরব দ্রুপদকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই সময়ে অর্জুন, নকুল এবং সহদেবকে সাধারণ সাহায্যে লাগিয়ে ভীমকে প্রধান সহায় করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ভীম গদা হাতে সৈন্যদের আগে আগে চললেন—সেনাগ্রগো ভীমসেনঃ।

ভীমকে দেখাচ্ছিল দণ্ডধারী যমের মতো। জলজন্তু যেমন স্বচ্ছন্দে সমুদ্রের একান্তে প্রবেশ করে ভীমও তেমনই স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়লেন পাঞ্চাল-সৈন্যের মধ্যে। এলোপাথাড়ি গদা চালিয়ে যুদ্ধ-দুর্মদ হাতিগুলির মাথা ফাটিয়ে দিলেন। ঘোড়া আর রথগুলিও ভীমের গদার বাড়ি থেকে রেহাই পেল না। রাখাল যেমন পাচনি হাতে করে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে গরুগুলিকে চাবুক মারতে মারতে এগিয়ে যায়, ভীম ঠিক ততটাই সহজে গদার বাড়ি কশাতে কশাতে এগিয়ে চললেন শত্রু সৈন্যের মাঝখান দিয়ে—গোপাল ইব দণ্ডেন যথা পশুগণান্ বনে।

ভীমের সঙ্গে দণ্ডধারী যম আর দণ্ডধারী গোপালকের তুলনাটা আমার কাছে খুবই অর্থবহ। তবে সে কথা বলার আগে সেই বিদেশিনী মাদাম বিয়ার্দোর আরও একটা কথা বলে নিই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে বর্ণবিভাগ পদ্ধতি চালু ছিল, মাদাম তারও একটা প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন পাঁচ পাণ্ডবের মধ্যে।

এটা মানতে কোনও বাধা নেই যে, যুধিষ্ঠির খাতায়-কলমে যতই ক্ষত্রিয় হন না কেন, স্বভাবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। ইতিহাসে-পুরাণে ব্রাহ্মণের যে সব গুণ বা ক্রিয়াকলাপ সচরাচর দেখা যায়—তা সবই প্রতিষ্ঠিত দেখি যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। মাদাম বিয়ার্দোর ভাষায়—Yudhisthira, though a Ksatriya on the most superficial level of the story, represents some characteristic features of the brahmana. ভীম আর অর্জুনের সঙ্গে একদিকে যেমন তাঁদের বড় ভাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পার্থক্য আছে, তেমনই পার্থক্য আছে ছোট দুই ভাই নকুল-সহদেবের সঙ্গেও। আবার ওই যে দুই ভাই ভীম আর অর্জুন—তাঁরাও কিন্তু শক্তি আর ক্ষমতার চরিত্রভেদে পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা।

যুধিষ্ঠির যেখানে ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, ধৈর্য এবং সর্বোপরি ধর্মের প্রতীক, সেখানে আসলে তিনি একজন ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি। কারণ উপরিউক্ত গুণগুলি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণেরই গুণ। বলা বাহুল্য—যে, ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ্য বলতে আমি অদ্যকালের মহামহিম ঐতিহাসিকদের 'ব্রাহ্মণ' বা 'ব্রাহ্মণ্য' বোঝাচ্ছি না। কারণ ব্রাহ্মণ শব্দটি উচ্চারণমাত্রেই এঁরা সমাজের নিপীড়নকারী এক উচ্চ বর্ণ বোঝেন অথবা ব্রাহ্মণ্য বলতে শুধুই 'বুর্জোয়াসি'। আমি ওপরে যে গুণগুলির কথা বলেছি সেই গুণগুলি একান্তভাবে ব্রাহ্মণোচিত বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে বলে সেই নিরিখেই যুধিষ্ঠিরকে আমরা ধর্মের প্রতীক এক ব্রাহ্মণের লক্ষণে ভূষিত দেখতে পেয়েছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার অর্থ তাই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সত্য, ক্ষমা বা ন্যায়ের প্রতীকী প্রতিষ্ঠা।

এই ব্রাহ্মণোচিত ধর্মকে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করেন না ; করেন ক্ষত্রিয়, করেন রাজা। ভীম আর অর্জুন সেই ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক, রাজার প্রতীক। পৃথিবী কর্মভূমি। স্বর্গ বা অন্তরীক্ষলোকে সত্য বা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন ইন্দ্র। তিনি দেবতাদের রাজা। বেদে ইন্দ্র এবং বায়ু—দুজনেই যুদ্ধবীর, যুদ্ধের

দেবতা। 'ক্রুড' যে ক্ষাত্রশক্তি, তারই প্রতীক হলেন ভীম। আর 'রিফাইনড' রাজার যে ক্ষাত্রশক্তি, তার প্রতীক হলেন অর্জুন। রাজা যতই 'রিফাইনড' হন অন্যায়ের চূড়ান্ত হলে নৃশংস ক্ষাত্রশক্তি ছাড়া তাঁর পক্ষে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। ভীষণ যুদ্ধের সময়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানার সময় ভীমকে তাই সব সময়েই অর্জুনের পাশে দেখেছি সাহায্যকারীর ভূমিকায়। ভীম যেমন যুধিষ্ঠিরের বশংবদ তেমনই—ছোট ভাই হওয়া সত্ত্বেও—অর্জুনেরও বশংবদ।

এই যে দুই ভাই মিলে দ্রোণাচার্যের মান রক্ষার জন্য পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে শাসন করতে চললেন—এখানে অর্জুন রথে চড়ে চলেছেন রাজার মতো। অস্ত্রপরীক্ষার দিনের সেই পাখির চোখের মতো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য দ্রুপদকে জ্যান্ত ধরা। কিন্তু 'ক্রুড' ক্ষাত্র শক্তির প্রতীক, নৃশংসতার প্রতীক ভীম, যুদ্ধের প্রান্তরে নেমে এলোপাথাড়ি গদা চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিরীহ অথবা দোষী—এসব বিচার তাঁর কাছে নেই, তাঁর মূল কথা তাঁকে বাধা দেওয়া চলবে না। অর্জুন হয়তো এই এলোপাথাড়ি ভাবটা পছন্দ করেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে তার প্রয়োজন আছে বলে বাধাও দেন না। ফলে ভীম বাড়তেই থাকেন, এগিয়ে যেতে থাকেন বিনা বিচারে। কারণ শত্রু সৈন্যের মধ্যে সাময়িক বিভীষিকা তৈরি করার প্রয়োজন অর্জুনেরও আছে।

কিন্তু যে মুহূর্তে রাজ-স্বভাব অর্জুনের কার্যসিদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ দ্রুপদকে তিনি ধরে ফেলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে সবিনয় আদেশ নেমে আসে বড়ভাই ভীমের উদ্দেশে। তিনি বলে ওঠেন—আর্য ভীম! মহারাজ দ্রুপদ, বংশ-সম্বন্ধে কুরুবীরদের আত্মীয়। আপনি আর অযথা তাঁর সৈন্যক্ষয় করবেন না—মা বধীস্তদ্বলং ভীম গুরুদানং প্রদীয়তাম্—আপনারা গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা করুন।

ঠিক এই মুহূর্তে আমরা ভীমের সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত সেই উপমা দুটি স্মরণ করব। দণ্ডধারী যমের মতো, আর দণ্ডধারী গোপালকের মতো। আমার মতে অর্জুন যদি রাজপ্রতিম হন তবে ভীম তাঁর দণ্ডের মতো। মনুমহারাজের মতো স্মৃতশাস্ত্রকারেরা লিখেছেন—রাজদণ্ড এমনই একটা প্রখর বস্তু যা দণ্ড-প্রণেতার অনবধানে সমস্ত কিছু ছারখার করে দিতে পারে। রাজা সব সময় বিপক্ষ ব্যক্তির শক্তি, বিদ্যা এবং অন্যান্য গুণাগুণ মাথায় রেখে দণ্ড প্রয়োগ করবেন। ভীম যেহেতু 'ক্রুড' ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক, তাই তাঁর দণ্ড-বিধানের মধ্যে পরিমিতির বোধ থাকে না। তাঁর দণ্ড একবার মুক্ত হলে, তা সব কিছু শেষ না করে নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না। রাজা বা পরম যুদ্ধবীর হিসেবে অর্জুনের কাজ হল এই 'ক্রুড' ক্ষাত্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। নৃশংসতা বা সাময়িক বিভীষিকা দেখানোর প্রয়োজন মিটতেই পরিণত ক্ষাত্রশক্তি তাই যমদণ্ড-স্বরূপ নৃশংস ক্ষাত্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে—আপনি অযথা দ্রুপদের সৈন্যক্ষয় করবেন না। মহাভারতের মধ্যে ভীমকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা বারবার অর্জুনকে এই নিয়ন্তার ভূমিকায় দেখতে পাব। এসব কথা পরে আবার আসবে।

আপাতত ভীমকে দেখুন। অর্জুনের আদেশের মতো অনুরোধে ভীম থামলেন বটে,—কারণ, অর্জুনের ওই বিশাল ব্যক্তিত্ব তাঁর পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না—কিন্তু ভীম তাঁর যুদ্ধ-ধর্মে তৃপ্ত না হয়েই যুদ্ধে ক্ষান্তি দিলেন—অতৃপ্তো যুদ্ধধর্মেষু ন্যবর্তত মহাবলঃ। অপরিশীলিত ক্ষাত্রশক্তি পরিণত রাজশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে সে ভীমের মতো থামতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তার দুর্দম মনোলোকের নৃশংসতা যেহেতু বল্গাহীনভাবে নৃশংসতার আনন্দেই মুক্ত হয়েছিল তাই হঠাৎ নিয়ন্ত্রিত হলে ছুটন্ত ঘোড়া যেমন বিকট শব্দে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে খানিকটা দাপিয়ে থেমে যায়, ভীমও সেই রকম থেমে গেলেন। কিন্তু মনের মধ্যে ছোটাটা রয়েই গেল, সুযোগ পেলেই সে ছুটবে।

বলা বাহুল্য, অপরিশীলিত অথবা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। বস্তুত এই ধরনের শক্তির মধ্যে যে বিশাল উৎসাহ, বিপুল দৈহিক শক্তি এবং বিরল কর্মক্ষমতা থাকে, তাকে কাজে লাগালে কী অসাধারণ ফল পাওয়া যেতে পারে মহাভারতের ভীমই বোধহয় তার প্রথম এবং শেষ উদাহরণ। আমরা একে একে তাঁর নিয়ন্ত্রণের জায়গাগুলিও দেখাব, অনিয়ন্ত্রণের জায়গাগুলিও দেখাব।

একটা কথা এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, প্রধানত ভীম আর অর্জুনের শক্তির নিরিখেই দ্রুপদ

শাসনের এক বছরের মাথায় ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজের পদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভীম অবশ্য এই সময়ে একটু 'হায়ার স্টাডিজে' মন দিলেন। তিনি নিয়মিত গদাশিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন বলরামের কাছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—দ্রোণাচার্য যেহেতু প্রধানত তীর-ধনুকের শিক্ষাতেই কৃতবিদ্য ছিলেন, তাই ভীমের দিক থেকে গদা-শিক্ষার নূতনতর কৌশল আয়ত্ত করার একটা তাগিদ ছিল। এই কারণেই বলরামের কাছে তিনি নিয়মিত গদাঘাতের পাঠ নিতে আরম্ভ করলেন—সংকর্ষণাদ্ অশিক্ষদ্ বৈ শশ্বচ্ছিক্ষাং বৃকোদরঃ।

ভীমের অমানুষিক শক্তি এবং অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার পরাকাষ্ঠায় দুর্যোধন যেমন জ্বলে-পুড়ে মরছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রও তেমনই জ্বলে যাচ্ছিলেন। ফলে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়ে দুর্যোধন যখন তাঁদের পুড়িয়ে মারবার পরিকল্পনা করলেন, ধৃতরাষ্ট্রও তাতে বাধা দিলেন না। পাণ্ডবরা বারণাবতে পৌঁছে দশ দিন একটা অন্য বাড়িতে থাকলেন। দুর্যোধনের চর পুরোচন বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার ভার নিয়েছিল। সে দশ দিন পাণ্ডবদের অন্য বাড়িতে রেখে বেশ সাধু-সাধু ভাব করে বললে—এখানে 'শিবভবন' বলে একটা দারুণ বাড়ি তৈরি হয়েছে—সেইখানেই আপনাদের পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

পুরোচনের কথায় পাণ্ডবভাইরা কুন্তীকে নিয়ে শিবভবনে ঢুকলেন। যুধিষ্ঠির বিদুরের কাছে অনেক আগেই এই আগুন-ঘরের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। এখন বাড়িতে ঢুকেই ঘি-গালা আর চর্বির গন্ধ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন—যত রকম দাহ্য পদার্থ আছে, তা সবগুলি মিশিয়ে এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। সাধাসিধে ভীম বললেন—তা হলে আমরা ভালয় ভালয় সেই বাড়িতেই ফিরে যাই—যেখানে আমরা আগে ছিলাম—তত্রৈব সাধু গচ্ছামো যত্র পূর্বোষিতা বয়ম্। যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ ভীমকে দুর্যোধনের প্যাঁচ-পয়জার সব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—এই বাড়িতেই আমরা থাকব এবং সময় মতো আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যাব।

জতুগৃহের বিস্তৃত বিবরণে আমরা যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু এখানে বলব যে, বিদুরের পরামর্শমতো যে সুড়ঙ্গটি কাটা হয়েছিল জতুগৃহ থেকে বন পর্যন্ত, সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে মা-ভাইদের আগে বের করে দিয়ে ভীমই সেই জতুগৃহে আগুন লাগালেন এবং নিজে বেরিয়ে গেলেন সবার শেষে। রাত্রির অন্ধকারে মা-ভাইরা পথ চলতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভীম সেই অবস্থায় মাকে তুলে নিলেন কাঁধে আর ছোট যমজ ভাই দুটিকে নিলেন কোলে। যুধিষ্ঠির আর অর্জুনও ভীমের হাতে ভর দিয়েই চললেন। হয়তো এই বর্ণনার মধ্যে সামান্য অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এটা মিথ্যে নয় যে, অন্য ভাইরা পর্যায়ক্রমে ভীমের শরীরে ভর দিয়েই বনের পথটুকু পাড়ি দিয়েছিলেন।

বিদুরের পরিকল্পনামতো নির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গার এক ঘাটে নৌকো বাঁধাই ছিল। সকলে নৌকোয় উঠে অন্য পারে এলেন বটে কিন্তু সেটাও একটা বন এবং রাত তখনও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাতের তারা চিনে তাঁরা দক্ষিণ দিকে চললেন বটে কিন্তু পথ চলার ক্ষমতা প্রায় কারওই নেই। অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির আবার ভীমকে বললেন—তুমি যেভাবে আমাদের নিয়ে পথ চলছিলেন ভীম সেইভাবেই আমাদের নিয়ে চল। আবার কুন্তী উঠলেন কাঁধে, ভাইরাও চললেন ভীমকে জাপটে ধরে।

ভীম পথ চলতে পারতেন খুব জোরে আর চলার পথে গাছের ঘষা কি কাঁটা-গাছের কাঁটায় ভীমের কিছুই হয় না। শরীরে যেমন বল, চেহারাও তেমনই দশাসই। মহাভারতের বর্ণনামত—ফরসা তাল গাছের মতো লম্বা তাঁর চেহারা, অর্জুনের থেকেও তিনি বারো আঙুল লম্বা—গৌরস্তাল ইবোন্নতঃ, প্রাদেশেনাধিকো'র্জুনাৎ! তাই বলে রোগা ঢ্যাঙা নয়, ভীমের কাঁধটা সিংহের মতো, বুকের ছাতি এই বিশাল, গায়ে মত্ত হাতির শক্তি।

ফলে মা-ভাইদের পর্যায়ক্রমে কাঁধে-পিঠে নিয়ে জোরে হাঁটতে তাঁর কোনও সমস্যাই হল না। তবু কষ্ট হল সেই সব জায়গায় যেখানে পথ সমতল নয় আর পাহাড়ের চড়াই-উতরাই যেখানে। এসব জায়গায় ভাইদের ছেড়ে দিলেও মাকে তিনি কাঁধ থেকে নামাননি, নিজের কষ্ট হলেও মাকে কষ্ট পেতে দেননি—কৃচ্ছ্রেণ মাতরঞ্চৈব সুকুমারীং যশস্বিনীম্। এইরকম ভাবে চলতে চলতে এক বনের

কাছে এসে তাঁরা থামলেন।

কথায় বলে—ঘোড়া পেলে খোঁড়া হয়। এক জায়গায় যখন তাঁরা সবাই বসার জায়গা পেলেন, তখন পরিশ্রমে পিপাসায় আর ঘুমে তাঁদের চোখ জড়িয়ে এল। জননী কুন্তী বললেন—পাঁচ ছেলের মা হয়ে আজ আমি পিপাসার জল জোটাতে পারছি না। কথাটা হয়তো তিনি অন্য ছেলেদের লক্ষ করেই বলেছেন, কিন্তু তাঁদের তখন নড়বার ক্ষমতা নেই। আর মায়েরা যেমন হন, মাঝে মাঝে বেবুঝের মতো একই কথা বার বার বলতে থাকেন—পুত্রান্ ভৃশমথাব্রবীৎ।

এইসব জায়গায় ভীমের কোনও তুলনা নেই। মায়ের জন্য ভাইদের জন্য তাঁর বড় মায়া হল। একটা বটগাছের তলায় মা-ভাইদের বসিয়ে ভীম জল আনতে ছুটলেন। সে কি একটুখানি পথ! প্রায় দুই ক্রোশ পথ গিয়ে ভীম দেখলেন—বিশাল জলাশয়। তাঁর নিজের তখন কী অবস্থা! জল দেখা মাত্র আগে ঝাঁপিয়ে খানিকটা স্নান করে নিলেন। তারপর পদ্ম-পাতার পাত্রে জল নিয়ে চারদিক মুড়িয়ে পদ্মের পুটক বেঁধে অনেকগুলি পুটক নিয়ে এলেন গায়ের চাদরে ফেলে।

দুই ক্রোশ পথ! এসে দেখলেন—সব ঘুমিয়ে পড়েছে। মা-ভাইদের এই বিজন বনে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে ভীমের যেমন কষ্ট হল, মায়া হল, তেমনই রাগ হল দুর্যোধনের ওপর। রাজমাতা কুন্তী মাটিতে শুয়ে আছেন, রাজা হবার যোগ্য বড় ভাই যুধিষ্ঠির মাটিতে শুয়ে আছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যোদ্ধা ছোট ভাই অর্জুন মাটিতে শুয়ে আছেন অথবা এখনও কোলে-ওঠা সুন্দর যমজ ভাই দুটি মাটিতে শুয়ে আছেন—এই বিপরীত অবস্থাটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

মনের যন্ত্রণায় তিনি মনে মনেই বলে উঠলেন—ব্যাটা ধৃতরাষ্ট্র! ব্যাটার গণ্ডায় গণ্ডায় বদমাস কতগুলো ছেলে, তার মধ্যে রাজ্যের লোভ, খল স্বভাব, আর স্বার্থসিদ্ধি করতে ওস্তাদ—দুষ্টেনাধর্মশীলেন স্বার্থনিষ্ঠৈকবুদ্ধিনা। ব্যাটা আমাদের নির্বাসন দিয়ে পুড়িয়ে মারবার কৌশল করেছিল। শুধু ভাগ্যিবলে বেঁচে গেছি—কথঞ্চিদ্ দৈবসংশ্রয়াৎ। ভীম মনে মনে বলেই চললেন—আর ওই ব্যাটা দুর্যোধন! তোর ভাগ্যি ভাল এখনও দাদা যুধিষ্ঠির তোকে মেরে ফেলতে বলছে না। নইলে তোর ওই কর্ণ, শকুনি আর ছোট ভাইগুলির সঙ্গে তোকেও আমি কবেই যমালয়ে পাঠাতাম।

রাগের চোটে ভীম হাতে হাত ঘষতে আরম্ভ করলেন। তাঁর নিঃশ্বাস দীর্ঘতর হল। মাটিতে শুয়ে-থাকা শ্রান্ত ক্লান্ত ভাইদের দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে তাঁর রাগ কমেও এল। তাঁর দায়িত্ববোধ এমনই যে, অতটা পথ মা-ভাইদের কোলে পিঠে টেনে এনে তিনি নিজে যখন চরম পরিশ্রান্ত, সেই অবস্থায় তিনি সবার জন্য জল আনতে গেলেন দুই ক্রোশ পথ হেঁটে। আবার এসে যখন দেখলেন—সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন তিনি বিনা কোনও অভিমানেই, সবার সুরক্ষার জন্য জেগে বসে রইলেন— জজাগার স্বয়ং তদা।'

৪

ভীমের এই জাগরণ একেবারে ব্যর্থ গেল না। এই একটা রাতের মধ্যে ভীমের জীবনে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে গেল, যাতে বাচ্চাদের আবার তৈরি হতে হবে হাতে তালি বাজানোর জন্য। সঙ্গে অবশ্য যুবকদেরও তৈরি থাকতে হবে—রমণীর মুখে প্রথম শারীরিক আহ্বান ভীমের মতো পুরুষের কাছে কেমন লাগে—সেটা শোনার জন্য।

বনের যে জায়গাটায় কুন্তী আর অন্য পাণ্ডবভাইরা ঘুমিয়ে ছিলেন, তার কাছেই এক শাল গাছে বাস করত এক রাক্ষস। তার নাম হিড়িম্ব।

গল্পটা বাচ্চাদের মনোমত করে লিখতে পারলে বেশ হত। কিন্তু সে উপায় কোথায়? আমাকে এখন বিশ্লেষণ করে বলতে হবে যে, রাক্ষস বলতে আমরা যেমনটি কল্পনায় দেখতে পাই আমাদের মতো বুড়োদের তেমনটি ভাবা মোটেই উচিত নয়। মহাভারতের কবি ভীমের প্রতিতুলনায় সত্যের

সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হিড়িম্বকে একটা রাক্ষসের আকার দিয়েছেন বটে, কিন্তু হিড়িম্বের শারীরিক গঠনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের হাতে পড়লে তাঁরা পরিষ্কার বলে দেবেন—হিড়িম্ব কোন ধরনের মানুষ।

হ্যাঁ, সে বনে বাস করে, তার প্রকৃতিও বন্য এবং নরমাংস খাওয়াও তার অভ্যাস আছে। কিন্তু তার কালো গায়ের রঙ, পিঙ্গল চোখ, দীর্ঘ উরুমূল, দীর্ঘ উদর, লালচে চুল-দাড়ি, বিশাল গলা এবং স্কন্ধদেশ, অপিচ কান দুটি পেরেকের মতো আস্তে আস্তে সরু হয়ে গেছে—এই সব লক্ষণ পেলে নৃতাত্ত্বিকরা আর্যেতর কোনও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই যে হিড়িম্বকে চিহ্নিত করে দেবেন—সে কথা প্রায় নিঃসন্দেহেই আমি বলতে পারি।

যাই হোক, বিশাল-শরীর সেই তথাকথিত রাক্ষস মানুষের গন্ধ পাওয়া মাত্রই হাত দুটি উঁচু করে মাথার তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলি চুলকোতে আরম্ভ করল। তারপর সে তার বোন হিড়িম্বাকে বলল—আহা, কতদিন পর নরমাংসের গন্ধ পেলাম। এই গন্ধেই আমার জিবে জল আসছে—জিঘ্রতঃ প্রস্রুতা স্নেহাৎ জিহ্বা পর্যেতি মে মুখাৎ। মাংস খাওয়ার আনন্দে রাক্ষস হিড়িম্বাকেই আদেশ দিল—যা, তুইই ওগুলোকে মেরে নিয়ে আয়। ওরা যেখানে শুয়ে আছে সেটা আমাদেরই এলাকা, অতএব কোনও ভয় নেই তোর—অস্মদ্-বিষয়-সুপ্তেভ্যো নৈতেভ্যো ভয়মস্তি তে।

এই যে সভ্য সমাজের বাইরে এই বিশেষ জন-জাতির একটি নির্দিষ্ট এলাকাও আছে—এই খবরটা নৃতাত্ত্বিকের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি করবে। যাই হোক, হিড়িম্বের কথায় হিড়িম্বা-বোন চলল পাণ্ডবদের মারতে। চার ভাই আর মা ঘুমোচ্ছেন, জেগে আছেন শুধু ভীমসেন। হিড়িম্বার বড় ভাল লাগল। ওই শালখুঁটির মতো লম্বা, বিশালদেহী পুরুষ, ফরসা রাঙা রাঙা চেহারা, পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ—হিড়িম্বা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, রাক্ষসের কূলে কলঙ্ক দিয়ে সে এই বলিষ্ঠ মানুষটিকে কামনা করল স্বামীর উপযুক্ততায়—রাক্ষসী কাময়ামাস...ভর্তা যুক্তো ভবেন্মম।

ভীমের সম্বন্ধে রাক্ষসীর এই স্বামী-কল্পনা এক মুহূর্তের মধ্যে তাকে এই সার-সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল যে, ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার থেকেও স্বামীর প্রতি ভালবাসাটা অনেক বেশি তীব্র হয়—পতিস্নেহো' তিবলবান্ তথা ন ভ্রাতৃসৌহৃদম্। হিড়িম্বা ভাবল—আজ যদি ভাইয়ের কথায় এঁদের মেরে ফেলি তাহলে যতটুকু আনন্দ হবে, তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ হবে যদি এঁরা বেঁচে থাকেন, অর্থাৎ ভীম বেঁচে থাকেন।

আমার ধারণা—ভীমের বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা দেখেই হিড়িম্বা বুঝেছিল যে, তার পক্ষে ভাইয়ের আদেশ পালন করা অসম্ভব। তারমধ্যে সে প্রেমেও পড়ে গেল। মহাভারত বলছে—মায়াবিনী রাক্ষসী। সে নানা রূপ ধারণ করতে পারে। হিড়িম্বা তাই সুন্দরী মানুষী রমণীর বেশে ভীমের সামনে এল—কৃত্বা মানুষম্ উত্তমম্। আমি আবারও বলি—হিড়িম্বা মানুষী নয়—এটা আমার কল্পনার বাইরে। তবে কী, নগরের প্রত্যন্ত দেশ বনের মধ্যে যে জন-জাতির বসতি, তারা সাজে না গোজে না, মনুষ্য-সমাজের সভ্য অলঙ্কৃতি তারা ব্যবহার করে না। আমাদের মা-ঠাকুমারা রুক্ষকেশী অব্যবস্থিতবাসা কিশোরী মেয়েটিকে বলতেন—কেমন রাক্ষুসীর মতো চেহারা হয়েছে দেখ না, চুলে তেল নেই, গায়ে ময়লা ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এই মেয়ে একটু সেজে এলেই তাঁরা বলতেন—এই তো, এবারে ঠিক মানুষের মতো দেখাচ্ছে। এখানেও ওই একই ব্যাপার। আমার ধারণা—ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়েই হিড়িম্বা অনেক সাজল। এতই সাজল যে—যেহেতু সে কোনওদিনই সাজেনি, তাই অনেক সেজে তার ভীষণ লজ্জাই করতে লাগল। সাজগোজের লজ্জায় সে নুয়েই পড়ল—বিলজ্জমানেব নতা দিব্যাভরণভূষিতা।

আর্য গোষ্ঠীর বাইরে যে জনজাতিরা আছেন, তাঁদের মধ্যে সুন্দরীও আছেন অনেক। অসম্ভব সারল্য থাকার ফলে সামান্য অলঙ্করণেই এঁদের লজ্জা হয়, নইলে স্বভাবে এঁরা খুব অপ্রতিভ বা সলজ্জ হন না। মনের কথাও প্রকাশ করেন অকপটে। অনেক সেজেগুজে হিড়িম্বার একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব হয়েছিল বটে তবে স্পষ্ট ভাষা-ব্যক্তিতে নিজের মন প্রকাশ করার ব্যাপারে তার কোনও লজ্জা

ছিল না। তার কথাবার্তাও যথেষ্ট সভ্য মানুষোচিত।

হিড়িম্বা ভীমকে বলল—পুরুষের মধ্যে পুরুষ আমার! তুমি কে? কোত্থেকে আসছ তুমি? এত সুন্দর মানুষ—এঁরা সব শুয়ে আছেন এখানে, এঁরাই বা কে? এই যে সুন্দরী মহিলাটি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন—ইনিই বা কে? তোমরা কি জান না—এখানে হিড়িম্ব রাক্ষস থাকে। সে তোমাদের মেরে মাংস খেতে চায়, আমাকে সেই জন্যেই সে এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু দেবতার মতো সুন্দর তোমার এই চেহারা দেখে অন্য কোনও মানুষকে আর আমার স্বামী হিসেবে পাওয়ার অভিলাষ চলে গেছে। আমার মনের কথা আমি পরিষ্কার জানালাম, এখন তোমার যা মনে হয় কর তোমার জন্য কামনায় আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তুমি আমাকে গ্রহণ কর—ভজমানাং ভজস্ব মাম্। আমি এই নরখাদক রাক্ষসের হাত থেকে তোমায় বাঁচাব। তারপর চলে যাব দুর্গম কোনও গিরিগুহায়, যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না—বৎস্যাবো গিরিদুর্গেষু ভর্ত্তা ভব মমানঘ।

অসীম দাম্পত্য-রস অনুভব করার জন্য হিড়িম্বা সুরম্য আরামস্থলীর কথা চিন্তা করতে পারে না। আপন জনগোষ্ঠীর জ্ঞান-বিচারে পর্বতের দুর্গম স্থানগুলিই তার কাছে যৌবনের বিহারভূমি। আরও বেশি আনন্দের জন্য সে ভীমকে লোভ দেখায়—আমি আকাশচারিণী, অতএব আমি ইচ্ছা করলেই যেখানে সেখানে যেতে পারি—কামতো বিচরামি চ। অতএব তুমি আমার সঙ্গে গেলে অনেক অনেক আনন্দ পাবে—অতুলাম্ আপ্নুহি প্রীতিং তত্র তত্র ময়া সহ!

আসলে হিড়িম্বা যে জনগোষ্ঠীর স্ত্রীলোক তাতে সে যেমন একটি পুরুষ মানুষকে সটান পছন্দ করার মধ্যে কোনও লজ্জা বোধ করে না তেমনই সবার সামনে দিয়ে প্রিয়তম ব্যক্তিকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতেও তার কোনও লজ্জা নেই। আমরা আর্যেতর জনগোষ্ঠীর আরও এক রমণী উলূপীকেও একই ভাবে অর্জুনকে মোহিত করতে দেখেছি। কিন্তু পাঁচজন ঘুমন্ত প্রাণীকে রাক্ষসের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে কামনার তৃপ্তি ঘটাবেন—এমন মানুষ ভীম নন। তিনি হিড়িম্বাকে বললেন দ্যাখো হে রাক্ষসী। তোমার ভাইয়ের ভয়ে আমি এই সুখ-শায়িত মা-ভাইদের নিদ্রার ব্যাঘাত করব না। আর ওই রাক্ষসের এমন ক্ষমতা হবে না যে, আমার শক্তি সহ্য করতে পারবে।

'রাক্ষসী' বলে ডেকেই ভীমের বোধহয় একটু খারাপ লাগল। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিতা এক সুন্দরী রমণীকে 'রাক্ষসী' বলে ডাকাটা তাঁর উচিত হয়নি। একটু নরম হয়ে ভীম বললেন—তুমি যাও বা থাক—যা ইচ্ছে কর অথবা তোমার ভাইকেই পাঠিয়ে দাও এখানে—গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু। ভীম হিড়িম্বাকে পুরো আমল দিলেন না বটে, তবে তাকে ডাকলেন 'ভদ্রে' 'তন্বঙ্গী' ইত্যাদি সম্বোধনে। কিন্তু ভীম যত ভাল সম্বোধনই করুন, ভীমের বকা খেয়ে হিড়িম্বার সম্বোধন পরিবর্তিত হল অর্থাৎ 'তুমি' থেকে 'আপনি' হল।

হিড়িম্বা অনেকক্ষণ আসছে না দেখে তার ভাই নরমাংস খাওয়ার লোভে নিজেই হুড়মুড়িয়ে রওনা দিল পাণ্ডবদের দিকে। ভাইয়ের আগমন-শব্দে সচকিত হিড়িম্বা ভীমকে বলল—ওই আসছে হিড়িম্ব। এখন আমি যা বলি শুনুন। আপনি আমার এই নিতম্বদেশে আরোহণ করুন, আমি আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাব। অথবা জাগান আপনার ভাইদের। জাগান মাকে। আপনাদের সবাইকে আমি পিঠে করে নিয়ে যাব।

হিড়িম্বা হয়তো বনের পথঘাট বিশেষভাবে জানত, তাই এমন একটা প্রস্তাব দিয়েছে। ভীম অবশ্য গেলেন না। বরঞ্চ সাদর সম্ভাষণে—একেবারে মহাকাব্যের নায়ক পুরুষেরা অভীপ্সিতা নায়িকাকে যেভাবে সম্ভাষণ করে, সেই—ভিতু মেয়ে কোথাকার, চারুলোচনে—ইত্যাদির পালা শেষ করে কথার মাত্রায় নিজের লিপ্সা এবং নৈকট্য দুইই প্রকট করে ফেললেন। সুন্দরী রমণীর কাছে নিজেকে একটু জাহির করার লোভও সম্বরণ করতে পারলেন না ভীম। বললেন—ওহে বিপুলনিতম্বে—বলতেই পারেন, কারণ স্বয়ং হিড়িম্বাই ভীমকে বলেছিলেন—আপনি আমার নিতম্বদেশে আরোহণ করুন—আরুহেমাং মম শ্রোণিং—অতএব যথেষ্ট সচেতনভাবেই ভীম বললেন—আমার জন্য ভয় কোরো না। আমি থাকতে তোমার ওই রাক্ষস আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তোমার সামনেই আমি ওকে মেরে ফেলব।

ভীম এবার এই সরলা রমণীর কাছে নিজের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় দেওয়ার জন্য একটু ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এই রাক্ষসী রমণীটিকে তাঁর ভাল লাগছে। ভীম বললেন—এই যে আমার হাত দুটো দেখছ, হাতির শুঁড় যেমন লম্বা আর গোল এ-দুটিও তেমনই। এই উরু দেখছ ? পাথর, পাথর। আর এই বিশাল আমার বুক। অপরিচিতা রমণীর কাছে নিজের এই প্রত্যঙ্গ বর্ণনায় কোনও লজ্জা পাননি ভীম। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব—পাশাখেলার আসরে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উরু দেখিয়ে ভীমের দিক থেকে উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলেন ; কিন্তু এখন এই নবীনা রমণীকে ভীম যে বাহু, উরু, বুক সবই দেখাচ্ছেন তার কী ? উত্তর একটাই। হিড়িম্ব-বধের সামর্থ্য তাঁর আছে কি না—শুধু এটা দেখানোই ভীমের উদ্দেশ্য। হিড়িম্বার প্রতি রসের কোনও ইঙ্গিত করার কোনও প্রয়োজনই নেই তাঁর, কারণ, হিড়িম্বা মোহিত হয়েই আছে।

ভীমের সাহসে বুঝি আরও মুগ্ধ হল হিড়িম্বা। সসম্ভ্রমে এবং সলজ্জে সে বলল—না, না, আমি আপনাকে একটুও খাটো করছি না। আমার কাছে আপনি দেবতার মতো—নাবমন্যে নরব্যাঘ্র। ত্বামহং দেবরূপিনম্। তবে কী, রাক্ষসদের অমানুষিক শক্তি আমি দেখেছি তো, তাই বলছিলাম আর কি।

হিড়িম্ব রাক্ষস দেখল—সময় অনেকটা চলে গেছে, অথচ হিড়িম্বা ফিরছে না। সে এবার নিজেই রওনা দিল। খানিকটা দূর থেকেই সে তার বোন এবং ভীমের কথাবার্তা শুনতে পেল। আর একটু এগিয়েই সে হিড়িম্বাকে দেখতেও পেল। দেখতে পেল—তার চেহারা ঠিক মানুষের মতো।

এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। হিড়িম্বাকে নিয়ে পরশুরাম অথবা লীলা মজুমদার অথবা আরও অনেকেই যথেষ্ট রসিকতা করেছেন। সাহিত্যরসের পুষ্টিতে হিড়িম্বার এই সাহায্য আমি ছোট করে দেখছি না কিংবা এই স্বনামধন্য সাহিত্যিকদেরও কোনও ত্রুটি ধরছি না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হিড়িম্বার চরিত্র আমার কাছে অংশত 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র মতো। হিড়িম্বার একমাত্র দোষ, সে রাক্ষসী বলে পরিচিত।

আবারও বলি—দেবতা আর রাক্ষসে মূলত বেশি ভেদ নেই। ইতিহাস-পুরাণে এঁরা একই বাপের ছেলে, তবে মা আলাদা এই যা। রাক্ষসদের কারও দশটা মাথা, কারও বারোটা হাত, ইয়া দাঁত, ইয়া গোঁফ—এগুলি বর্ণনা মাত্র। ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতি বোঝানোর জন্যই কবিদের এই কল্পনা। কিন্তু এটা ঠিক—রাক্ষসদের সংস্কৃতি, আচার এবং বেশ-বাস দেবতা বা মানুষের থেকে আলাদা এবং তারমধ্যেও একটা ভয়ঙ্কর ভাব আছে। হিড়িম্বা যখনই মানুষের রূপ ধরে ভীমের কাছে এল, তখনই বুঝতে হবে—সে সাধারণ মানুষের রীতিনীতি মেনে, সভ্য মানুষ যেভাবে সাজে, সেইভাবে সেজে এসেছে ভীমের মন ভোলানোর জন্য। রামায়ণেও আমরা শূর্পণখাকে একই ভাবে রামের কাছে সেজে আসতে দেখেছি।

হিড়িম্ব রাক্ষস দেখল—তার বোন হিড়িম্বা মানুষের সাজে সেজেছে। তার মুখখানা চাঁদের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। মাথায় ফুল গুঁজে দারুণ খোঁপা বেঁধেছে। ভুরু, নাক, চোখ—সব কিছুর মধ্যেই একটা সজ্জার স্পর্শ আছে। এমন কী আধুনিক যুবতীদের মতো সে তার গায়ের চামড়াকে কোন যাদুতে আরও নরম করে তুলেছে যেন। নখগুলি পরিষ্কার করে আরও সুন্দর করে তুলেছে—সুভ্রূ-নাসাক্ষি-কেশান্তাং সুকুমার-নখত্বচম্। সোনার গয়নার সঙ্গে এমন একখানা কাপড় পরেছে সে, যাতে তার সুন্দর প্রত্যঙ্গ-সংস্থান ভীমের চোখ না এড়ায়—সুসূক্ষ্মাম্বরধারিণীম্। ভীম যে মুগ্ধ হয়েছেন, তা আমরা আগেই টের পেয়েছি, আর হিড়িম্বা তো আগেই মুগ্ধ ছিলেন। তার ভাই পর্যন্ত তাকে ডেকেছে 'বিপ্রমোহিতা' বলে—মানে বিশেষ এবং প্রকৃষ্টভাবে মোহিতা।

শুধু তাই নয়, হিড়িম্ব রাক্ষস তার বোনের এই সাভিলাষ পুরুষাভিসার মোটেই পছন্দ করেননি। তার মতে এই ব্যবহার অসতীসুলভ শুধু নয়, এ ব্যবহার তার পূর্বজ রাক্ষস-প্রধানদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছে—পূর্বেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং সর্বেষাং অযশস্করি। জানি না—কোন বিশাল কীর্তিশালী রাবণ-বংশ বা বিভীষণ-বংশে এই হিড়িম্বের জন্ম, কিন্তু সুসভ্য নগরের কাছাকাছি বাস করে—কেননা, ভীম জল নিয়ে এসে দেখেছিলেন কাছেই এক নগর—নাতিদূরেণ নগরং বনাদস্মাদ্ধি লক্ষয়ে—হিড়িম্ব

যে নাগরিক বৃত্তির অনুকরণে তার বোনকে 'অসতী, পুরুষকামী' বলে গালাগালি দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ দেখি না।

যাই হোক, হিড়িম্ব ঠিক করল—এই মানুষগুলির সঙ্গে তার অপ্রিয়কারী বোনকেও সে মেরে ফেলবে। কিন্তু ওই অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে কতক সময় কথা বলেই ভীমের এত ভাল লেগেছিল, এতটুকু সময়ের মধ্যেই ওই রাক্ষস-রমণীর সম্বন্ধে তাঁর এতটাই অধিকার জন্মেছিল যে, তিনি সক্রোধে হিড়িম্বকে বললেন—তুই আমাকে আগে মার, তারপর তোর বোনকে মারবি। বিশেষত সে তোর অপকার করেনি, করেছি আমি।

আমার ধারণা—হিড়িম্বার বয়স ছিল কম। তাই জীবনের প্রথম পুরুষ সমাগর্ম তাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। ভীম বলেছেন—এই বালিকা আমাকে দেখে নিজেকে সংযত করতে পারেনি। মনুষ্যশরীরে অন্তর-চারী ভালবাসার দেবতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমার কাছে—নহীয়ং স্ববশা বালা কাময়ত্যদ্য মামিহ। আমার চেহারা দেখে ও মুগ্ধ হয়েছে, ও আমাকে চায়—তাতে ওর অপরাধ কী? অন্যায় যদি কেউ করে থাকে তবে সে সেই ভালবাসার দেবতা অনঙ্গ, তুই ওকে বকছিস কেন—অনঙ্গেন কৃতে দোষে নেমাং গর্হিতুমর্হসি।

কতটা সরল আমাদের এই ভীম! তাঁর এই সরলতার নিরিখে হিড়িম্বার মতো সরলা রমণীই যে তাঁর সবচেয়ে উপযুক্ত স্ত্রী হবেন—এ কথা বলাই বাহুল্য। হিড়িম্বা যেমন স্পষ্ট ভাষায় ভীমের রূপমুগ্ধতা স্বীকার করেছে, ঠিক তেমনই স্পষ্টভাবে ভীমও তাঁর স্বীকারোক্তিতে 'এলিভেটেড' বোধ করেছেন। বলেছেন—ও আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাকে কামনা করেছে, এতে ওর দোষ কী—কাময়ত্যদ্য মাং ভীরুস্তব নৈষাপরাধ্যতি। ভীম আত্মবোধে সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিচিতা রমণীর অধিকারিত্ব অঙ্গীকার করে নিয়ে হিড়িম্ব-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন।

নিজের শক্তির ওপর গভীর বিশ্বাসে এই যুদ্ধটা ভীম এতই সহজে নিয়েছেন যে, যুদ্ধ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার আগেই ভীম হিড়িম্বকে অন্তত বত্রিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। এই আকালিক মুহূর্তেও তাঁর খেয়াল আছে—তাঁর মা-ভাইরা সব পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। মহাভারত বলেছে—ভীম হিড়িম্বকে এমনভাবে টেনে নিয়ে গেলেন, ঠিক যেন বনের মধ্যে একটা সিংহ ধরে নিয়ে গেল হরিণকে।

'বক্সিং রিং'-এ আমরা দেখেছি—যে বেশি ঘুসি চালাতে পারে না, সেই দুর্বলপক্ষ আত্মরক্ষার জন্য বলবত্তর পক্ষকে চেপে জড়িয়ে ধরে। হিড়িম্বও তাই করল। ভীমকে চেপে ধরে সে চেঁচাতে লাগল। পাণ্ডবভাইরা সব ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন সেই চেঁচানিতে। জেগে উঠলেন কুন্তীও। সবাই জেগে উঠে সামনে দেখলেন—অপরূপা এক সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে। কুন্তী অবাক হয়ে বললেন—কে গো তুমি—বনদেবতা, না, অপ্সরা? এখানে এই বনের মধ্যে কোথা থেকে এলে তুমি—কুতশ্চাগমনং তব।

হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী হলেও এখন কাব্যের ছোঁয়া লেগেছে তার মনে। সে বলল—এই যে নীল মেঘের মতো বিশাল বন দেখছেন—এ হল হিড়িম্ব রাক্ষসের বন, আমিও এইখানেই থাকি। আমি তার বোন। হিড়িম্ব তোমার ছেলেদের মারতে পাঠিয়েছিল আমাকে। কিন্তু সোনার বরণ তোমার বলবান ছেলেটিকে দেখে আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লাগে। আমি তোমার ছেলেটিকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলাম—ততো ময়া বৃতো ভর্ত্তা তব পুত্রো মহাবলঃ।

হিড়িম্বা সব আনুপূর্বিক বলল। বক্তব্য সরল, লজ্জাহীন, ঋজু এবং ভয়ঙ্কর রকমের আত্মবিশ্বাসী। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রীতিনীতি সে জানে না। তার স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাণ্ডব-জননীর মতামতের কোনও মূল্য আছে কি না জানে না। সে বলে—হিড়িম্বর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি তোমার ছেলেকে হেথা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে যায়নি। এতক্ষণ হিড়িম্বা কুন্তীকে যে বিবরণ দিচ্ছিল, তাতে বারবার—তোমার ছেলেকে এই বললাম, তোমার ছেলে এই বলল—এইভাবে কথা বলছিল। কিন্তু ঘটনার বিবরণের শেষে ভীমের কথা বলার সময় এবার কুন্তীর পুত্র-পরিচয়ের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটাও সগর্বে যোগ করল। সে বলল—আমার স্বামী অর্থাৎ কিনা

তোমার ওই ছেলে এখন ওই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে—স তেন মম কান্তেন তব পুত্রেণ ধীমতা। সে এখন নিশ্চিন্ত—তার স্বামীর সঙ্গে তার ভাই পারবে না।

হিড়িম্বার এই অকপট কথাগুলির মধ্যে, ভীমের সম্বন্ধে তার সরল আন্তরিকতার মধ্যে আমি ভারতবর্ষের আদিম জনজাতীয় স্ত্রীলোকের হৃদয়খানি খুঁজে পাই। হিড়িম্বার কথায় আবার পরে আসছি। আপাতত দেখছি—মানুষ রাক্ষসের যুদ্ধের খবর শোনা মাত্র—পাণ্ডবভাইরা ভীমের কাছে ছুটে গেলেন।

ভীম এমন একজন যুদ্ধবীর, যিনি যুদ্ধকালে বড়ই একরোখা এবং একাগ্র। এই সময়ে যে তাঁকে বিরক্ত করে বা একাগ্রতা নষ্ট করে তার ওপরেও তিনি রেগে যান। যুদ্ধের মত্ততা তাঁর এমনই যে, এই সময় তাঁকে থামতে বলাও বড় সাহসের পরিচয়। যুধিষ্ঠির বা অন্য কোনও ভাইই এ সাহস করলেন না। শুধু অর্জুন—অত্যন্ত সুনিপুণভাবে অন্য কথায় ভুলিয়ে যিনি চিরকালই ভীমকে শান্ত করেছেন, সেই অর্জুন ভীমকে বললেন—এই রাক্ষসটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ কি না, সেটা আমরা সঠিক বুঝতে পারছি না দাদা। আমি কিন্তু প্রস্তুত, দরকার হলে আমিও এটাকে মারতে পারি।

অর্থাৎ অর্জুন ভীমকে বাজিয়ে নিলেন—তিনি ঠিক কী চান অর্জুনের কাছ থেকে। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হলেও দাদা ভীমকে তাঁর একথা বলার সাহস নেই যে, তুমি ওই রাক্ষসকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি এক বাণে ওটাকে সাবাড় করে ফেলছি। অর্জুন সবিনয়ে বললেন—আমি আপনার সাহায্যে প্রস্তুত—সাহায্যে'স্মি স্থিতঃ পার্থঃ। ভীম বললেন—তুমি ব্যস্ত হয়ো না, অর্জুন। তুমি নিরপেক্ষভাবে দেখে যাও শুধু—উদাসীনো নিরীক্ষস্ব—অর্থাৎ আমি তোমার দাদা বলে আমার ওপর পক্ষপাতী হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই তোমার। তুমি শুধু দেখে যাও।

হিড়িম্ব তখন ভীমের দুই হাতের মধ্যে এসে গেছে। এই পেশিবহুল পাথরের মতো হাত দুটির ওপর ভীমের নিজেরই অনেক বিশ্বাস আছে। অতএব বাহুবন্দি রাক্ষসকে ভীম এক লহমায় মেরে ফেলতে চান না, তাকে তিনি খেলাতে লাগলেন। এই একবার একটু চাপ দিচ্ছেন, হিড়িম্ব চেঁচিয়ে উঠছে, আবার একটু আলগা করছেন, হিড়িম্ব নিঃশ্বাস নিচ্ছে—এই খেলাটায় ভীম বেশ মজা পাচ্ছেন। ছোট ভাই অর্জুন কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারে 'প্রোফেশনাল'। যাকে মারতে হবে, তাকে তিনি সময় দিতে চান না। ওদিকে ভীমের সম্মানেও আঘাত দেওয়া চলবে না। অতএব অন্য পন্থায় অর্জুন বললেন—আমাদের যে এখান থেকে যেতে হবে দাদা, বেশি দেরি করলে কি চলে? তুমি বরং একটু তাড়াতাড়ি করো, রাক্ষসটার সঙ্গে আর খেলা কোরো না, মারো ওকে—ত্বরস্ব ভীম মা ক্রীড় জহি রক্ষো বিভীষণম্।

ভীম আর দেরি করেননি। সমস্ত শরীরের বল যেন নিজের হাত দুটিতে সংগৃহীত করে কালো কদাকার হিড়িম্বকে মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে লাগলেন। বস্তুত এটাও কিন্তু খেলাই ছিল। ভীম নৃশংস স্বভাবের মানুষ, তিনি শত্রুকে তারিয়ে তারিয়ে শেষ করতে চান। কিন্তু পরিশীলিত ক্ষত্রিয় অর্জুন আবার তাঁকে অনুরোধ করেন। এবারে তাঁর ভাষাটা আরও ঋজু, আরও সোজা। অর্জুন বললেন—তোমার কাজ তুমি করেছ দাদা, তুমি পরিশ্রান্ত। এটাকে এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি মারি। ভীম অর্জুনের কথা শুনে রেগে গেলেন। অর্জুন এইটাই চাইছিলেন। অর্জুনের কথা ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে ভীম হিড়িম্বকে মাটিতে ফেলে পশুর মতো মেরে ফেললেন। মারাটা কেমন? মাথাটা দুপায়ের মাঝখানে ঢুকিয়ে কোমর ভেঙে একবারে তালগোল পাকিয়ে তবেই ভীমের নৃশংসতার শান্তি হল।

হিড়িম্ব মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন বললেন—সামনেই শহর। এখানে আর একটুও দেরি নয়। দুর্যোধন যাতে খুঁজে না পায় আমাদের সেই চিন্তা করতে হবে না? পাঁচ ভাই পাণ্ডব আর কুন্তী অর্জুনের কথায় সায় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের পিছন পিছন চলল হিড়িম্বা—অযাচিতা, অনুল্লিখিতা—প্রযযুঃ পুরুষব্যাঘ্রা হিড়িম্বা চৈব রাক্ষসী।

হঠাৎই ভীমের মনটা কেমন ঘুরে গেল। এই একটু আগে যে রাক্ষসী সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলতে

বলতে ভীম একটু সরসই হয়ে উঠেছিলেন, সেই ভীমের মনটা হঠাৎই কেমন ঘুরে গেল। আসলে এইটাই ভীমের স্বভাব। একটা 'অবসেশন' রয়ে গেছে। এই যে এতক্ষণ ধরে পরিশ্রম করে, হিড়িম্ব রাক্ষসকে মারতে হয়েছে, সেই মারামারির মধ্যে যে একটা 'ইনারশিয়া' তৈরি হয়েছিল, সেইটাই ভীমকে এখনও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অতএব যেই তিনি দেখলেন হিড়িম্বা তাঁদের পিছন পিছন চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন—রাক্ষসেরা অনেক মোহিনী মায়া জানে, তাই ভাইয়ের মতো তোমারও মরাই উচিত।

আমার ধারণা—ভীমের মনে হিড়িম্বার সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ ছিল, তার চেয়ে লজ্জা ছিল বেশি। এই একটু আগে ভাইদের নিদ্রার অনুকূলতায় যে রমণীর সঙ্গে নির্জন রহস্যালাপ করেছেন, নিজের শারীরশক্তির বিবরণ দিয়েছেন, তারই ভাই পাণ্ডবদের খেতে এসেছিল, তাঁকে মারতে হয়েছে, অথচ তার ভগিনী বড় ভাল—এ-কথাটা সোজাসুজি বলা ভীমের পক্ষে সম্মানজনক ছিল না। বরঞ্চ লোক-দেখানো বা ভাই-দেখানোভাবে যেই তিনি বলে উঠলেন—তোমারও মরাই উচিত, সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে তাঁরই অভীপ্সিত বাধাটি এসেছে—রাগের বশে মেয়েদের গায়ে হাত তুলো না। তুমি মহাবল হিড়িম্বকে মেরেছ, তার ভগিনী যদি ক্রুদ্ধাও হয়, তবু সে আমাদের কী করবে ?

কথাটা কি ভীমও জানতেন না ? জানতেন। জানতেন বলেই অমন একটা অগভীর অসংকল্পিত উক্তি আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাতেই কাজ হয়েছে। সেই বিশাল বনভূমির মধ্যে হিড়িম্বা স্বয়ং এবার যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করে জননী কুন্তীর উদ্দেশে সুগভীর সরলতায় বলে উঠল—ভালবাসলে মেয়েদের কত কষ্ট হয়, তা আপনি জানেন—আর্যে জানাসি যদ্‌দুঃখমিহ স্ত্রীণামনজঙ্গম্।

প্রাচীনেরা উপরিউক্ত সংস্কৃত পংক্তিটির অর্থ করেছেন—আর্যে! স্ত্রীলোকের কামজনিত যে কী দুঃখ হয়, তাহা আপনি জানেন। যেন কুন্তী এই বেদনার বড় সমঝদার। আমার ধারণা—'অনঙ্গজ দুঃখ' অর্থ 'কামনাজনিত দুঃখ' না করে ভালবাসার দুঃখই করা উচিত। কেননা, মদনভস্মের পর গভীর রতিবিলাপ-সঙ্গীত আর শিবের আশীর্বাদের মধ্যেই অনঙ্গের পুনর্ভবতার তাৎপর্য। সেটাকে ভালবাসা বলাই ভাল, শারীরিক অভিসন্ধি তার মধ্যে যতটুকুই থাকুক, হয়তো হিড়িম্বার ক্ষেত্রে সেটা বেশিই আছে, তবু সেটা ভালবাসার অঙ্গই বটে। কুন্তীকে দেখে যে ভাবেই হোক, হিড়িম্বার মনে হয়েছে—মেয়েদের চরম অভীপ্সার কথাটি তিনি সহ-অনুভবে বুঝবেন। ভীমসেনকে চেয়ে না পাওয়ার দুঃখ আর কেউ না বুঝুক কুন্তী অন্তত বুঝবেন।

আর সত্যিই তো হিড়িম্বা মিথ্যা কথা কিছু বলেনি। চরম অসবর্ণ বিয়েতে যেভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজন, কুলাচার এবং নিজের বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে মেয়েদের অন্যতর অতি পৃথক এক কুল-ধর্ম এবং কুলাচারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়, হিড়িম্বার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে—ময়া হি উৎসৃজ্য সুহৃদঃ স্বধর্মং স্বজনং তথা—আমি আমার সুহৃদ-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি। তাছাড়া ভীমকে প্রথম দেখেই সে এমন প্রেমে পড়েছে যে, কুন্তীকে হিড়িম্বা বলেছে—প্রত্যাখ্যান তাকে মৃত্যুর পথ দেখাবে। রাক্ষসী হলে কি হবে হিড়িম্বা ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম সম্বন্ধেও দু-চার কথা শুনিয়ে দিয়েছে তার হবু শাশুড়িকে। বলেছে—বিপদের সময় যে পরের ধর্ম রক্ষা করে, সেই না ধর্ম ব্যাপারটা বোঝে। আমাকে যদি এখন এই ভীম ছাড়া অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে মানতে হয় তো পাতকী হব না আমি। এই ধর্মচ্যুত হওয়ার মধ্যেই তো আমার বিপদ।

রাক্ষসীর মুখে এত ধর্মাধর্মের কথা শুনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পক্ষে চুপ করে থাকাই কঠিন হল। যুধিষ্ঠির হিড়িম্বাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এই মিলনোৎসুকা রমণীকে মিলনের সুযোগ দিয়েছেন। অবশ্য এই মিলনের মধ্যে তাঁর একটি শর্ত ছিল। সেটা বোধহয় খানিকটা ভীমের জন্যই। হয়তো যুধিষ্ঠিরের ভয় ছিল—অজ্ঞাতকুলশীলা এই রমণী সরল ভীমকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ভালবাসার রসে একেবারে মজিয়ে দেয় যদি। হিড়িম্বার আত্মনিবেদনের মধ্যে মানসিক মোহ যত ছিল, শারীরিক তাড়না ছিল তার চেয়ে বেশি। যুধিষ্ঠির তাই হিড়িম্বাকে বলেছেন—দিনের বেলায় তুমি এর সঙ্গে যত ইচ্ছে বিহার করো, মনে যা চায় তাই করো—অহঃসু বিহরানেন যথাকামং মনোজবা—কিন্তু রাতের বেলায় আমাদের ভাইকে তুমি ফিরিয়ে দেবে আমাদের কাছে।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীম ভাবলেন ধর্মের নীতি-নির্ধারণে তিনিই বা কম কীসে ? ভীম দাদাকে টেক্কা দিয়ে বললেন—সুন্দরী ! যতদিন না তোমার ছেলে হবে, ততদিন তোমার বাসনা পূরণ করব আমি। ভীম জানেন—পুত্রজন্মের মধ্যে একটি রমণীর চরম প্রাপ্তি সূচিত হয়। ভোগ-বিলাস এবং শারীরবৃত্তিরও খানিকটা নিবৃত্তি ঘটে পুত্রজন্মের সার্থকতার মধ্যে। অন্তত পুরাতন শাস্ত্রকারেরা সেই রকমই ভাবতেন। ভাইদের দুশ্চিন্তা এবং হিড়িম্বার দ্ব্যর্থহীন মিলন-কামনার মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানোর জন্য ভীমের ব্যবস্থা-পত্র ছিল যতখানি শাস্ত্রানুসারী, ততখানিই বাস্তব।

আবার সরলতার প্রশ্ন যদি আসে, সেদিক দিয়েও ভীমকে দেখুন। তিনি একবারও কায়দা করে বললেন না—দাদা যুধিষ্ঠির থাকতে আমার পক্ষে কি এই বিবাহ সম্ভব ? তিনি দেখেছেন—হিড়িম্বা শুধু তাঁর ব্যাপারেই উৎসুক, অতএব দ্বিধা না করে তিনি হিড়িম্বার হাত ধরে চলে গেছেন উপযুক্ত বিহারভূমির খোঁজে। বন-জঙ্গল-পাহাড়, সাগর-সরোবর-গুহা এমনকী মুনির আশ্রমও আছে এই তালিকায়—এমনি করে কোনও সুন্দর-নির্জন স্থানই বোধহয় বাদ গেল না, যেখানে হিড়িম্বার সঙ্গে রতি-সুখ-সার অভিসার বাদ পড়ল ভীমের। এই সময়ে ভীমকে দেখে বোঝা যায় না যে রাক্ষসী বলে এই আর্যপুত্রের অসুবিধা হয়েছে কোনও। রাক্ষসী হিড়িম্বা বিচিত্র বেশে বিচিত্র রতি-কৌতুকে ভীমকে একেবারে মোহিত করে রেখেছিল—বিভ্রতী পরমং রূপং রময়ামাস পাণ্ডবম্।

সময়ে ভীম-হিড়িম্বার ছেলে হল। চেহারাটা দেখতে তত সুবিধের নয়, মাতুল হিড়িম্বের আভাসটাই চেহারার মধ্যে বেশি। আর তার নিজের বৈশিষ্ট্য হল—মাথাটা যেন একটা ঘটের মতো, তারমধ্যে আবার চুল নেই, যদি বা থাকে তাও আবার কেমন খাড়া খাড়া। কচ মানে চুল। এই ঘটের মাথায় খাড়া চুলে বাবা-মার কাছে তিনি ঘটোৎকচ নাম পেলেন। মনস্বিনী কুন্তী কিন্তু রাক্ষসীর গর্ভজাত এই উৎকট চেহারার পুত্রটিকেই কুরুবংশের মর্যাদায় সম্মান দিয়েছেন। বলেছেন—তুমি কুরুবংশের ছেলে। আমার কাছে তুমি ভীমেরই মতো—ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ভীম সমো হ্যসি। পঞ্চপাণ্ডবের তুমিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই সম্মান যতখানি ঘটোৎকচের ততখানিই ভীমের। বোঝা যায় রাক্ষসী-বিবাহ সত্ত্বেও জননী কুন্তী ভীমের ওপর যথেষ্ট প্রীত ছিলেন।

পাণ্ডবরা তখনও বনেই রয়ে গেছেন। এ-বন সে-বন ঘুরে পাণ্ডবরা এসে পৌঁছলেন একচক্রা নগরে। এখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হল। অবশ্য খাবার জোটানোর একমাত্র উপায় ছিল মৃগয়া এবং ভিক্ষা। এতে যা জুটত, তা আবার ভাগ হত দুই ভাগে। এই দুই ভাগের এক ভাগ কুন্তী তাঁর অন্য চার ছেলের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। আর এক ভাগ পুরো ভীমের। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনই তাঁর খোরাক। এমন খোরাকি ছিল বলেই হয়তো অমানুষিক দৈহিক শক্তির অধিকারী রাক্ষস-নামধারী অতিবল ব্যক্তিদের সঙ্গে লড়াই করাটা একমাত্র ভীমের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

সেদিনও পাণ্ডবরা সবাই ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। দুর্যোধনের নজর এড়ানোর জন্য সকলেই ব্রহ্মচারীর বেশে আছেন। ভীম সেদিন ভিক্ষায় যাননি। জননী কুন্তীর সঙ্গে সেদিন তিনি বাড়িতেই রয়ে গেছেন। হঠাৎই তাঁদের বাড়িওয়ালা ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে কান্নার রোল উঠল। আর্তনাদ এবং বিলাপের যতটুকু শোনা গেল তাতে কুন্তী বুঝলেন ব্রাহ্মণের বিপদ কম নয়। অজানা বিদেশ-বিভুঁইতে এই ব্রাহ্মণ সবাইকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন বলে কুন্তীর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। বাড়িওয়ালা ব্রাহ্মণকে খানিকটা প্রত্যুপকার করার বাসনা নিয়েই তিনি তাঁর বাড়িতে গেলেন। কুন্তী যা শুনলেন,. তাতে বোঝা গেল—সে বাড়িতে আত্মবলিদানের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছে রীতিমতো। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—বক-রাক্ষস বলে এক রাক্ষসের কাছে একেকবারে একেকটি পুরুষমানুষকে নানা উপহার নিয়ে যেতে হয়। রাক্ষস পশুর সঙ্গে মানুষটাকেও খায়। এবারে ওই বাড়িওয়ালা ব্রাহ্মণের পালা পড়েছে। অতএব সংসারে চারটি প্রাণীর মধ্যে অন্তত তিনজন প্রত্যেকেই আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে এবং অন্যদের বাঁচাতে চাইছে। সব শুনে কুন্তী বিনা দ্বিধায় বললেন—আপনাদের কাউকে যেতে হবে না। আমার তো পাঁচটি ছেলে, তাদের মধ্যে একজন ওই দুষ্ট রাক্ষসের কাছে যাবে—মম পঞ্চ সুতা ব্রহ্মণ্ তেষামেকো গমিষ্যতি।

জননী কুন্তী তাঁর অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন না, নিজেও দু'বার ভাবলেন না, অথচ ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে দিলেন—আমার এক ছেলে যাবে। ব্রাহ্মণ নিজেও স্বার্থপরের মতো পরের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাননি। তবু কুন্তী মানেননি। তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের কাছে এসেছেন এবং ভীম সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছেন। নিজের বাহুবলের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ভিক্ষা সেরে এসে যুধিষ্ঠির জননী কুন্তীকে যাচ্ছেতাই করে বলেছেন। বলেছেন—মা! তোমার কি দুঃখে-কষ্টে জ্ঞান-বুদ্ধি সব লোপ পেল? নইলে, যার ভরসায় আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমই, যার ভরসায় আমরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চিন্তা করি, যার ভয়ে দুর্যোধন-শকুনিরা ত্রস্ত হয়ে আছে, তুমি কি না মা হয়ে কার না কার ছেলের জন্য নিজের ছেলেকে মেরে ফেলতে চাইছ—কথং পরসুতস্যার্থে স্বসুতং ত্যক্তুমিচ্ছসি?

কুন্তী ছেলের ওপর কেন এত ভরসা করেছেন, তা আমরা জানি। হিড়িম্ব রাক্ষসের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছেন। জতুগৃহ থেকে কী কষ্টে ভীম মা-ভাইদের বয়ে এনেছেন, তাও দেখেছেন। ভীমের সাহস এবং অতিমানবিক শক্তিই তাঁর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে, আর কেউ না পারুক, আমার ভীম ঠিক পারবে। যুধিষ্ঠিরকে তিনি শান্ত করে বলেছেন—ওরে তুই কী বুঝবি, ওর কত ক্ষমতা! ও যখন জন্মেই আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, সেদিন ওর শরীরের চাপে গোটা পাথরটাই ভেঙে গিয়েছিল। আমি সেদিন থেকেই জানি—ও কতটা পারে, আর কতটা পারে না। অতএব আমি যা করেছি, জেনে বুঝেই করেছি—যা বলেছি, বুঝেশুনেই বলেছি—তদহং প্রজ্ঞয়া জ্ঞাত্বা বলং ভীমস্য পাণ্ডব।

আসলে যে ছেলে পারে, তার ওপরে বাবা-মায়ের চাপ চিরকালই বেশি। বাপ-মায়ের মনের মধ্যে ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে একটা 'এগ্‌জিবিশনিজম্' কাজ করে। যে ভাল লেখা-পড়া করে বাবা-মা তাঁকে আরও পড়াশুনোর চাপের মধ্যে রাখেন, যে মেয়ে সুন্দরী, তাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেও সময় বুঝে মানুষ দেখে মাঝে মাঝে তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেন। একইভাবে হিড়িম্ব রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ দেখেই কুন্তী বুঝেছেন বক-রাক্ষসটাও এর কাছে কিছুই নয়—হিড়িম্বস্য বধাচ্চৈব বিশ্বাসো মে বৃকোদরে।

আর সত্যিই তো ভীমের ভাব-সাব দেখে কুন্তীমায়ের অনুকারে আমাদের তো হাততালি দিতে ইচ্ছে হবে আবার। ভীম খাবার-দাবার নিয়ে বনে পৌঁছলেন সকালবেলা। পোঁটলা-পাটলি খুলে খাবার অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে বক-রাক্ষসের নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন এবং বকের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্যসম্ভার তিনি নিজেই খেতে আরম্ভ করলেন। বক এল। তার চেহারা হিড়িম্ব রাক্ষসের মতোই এবং তাঁর গোত্রও এক—যেমনটি আগে বলেছি। তার খাবার ভীম খাচ্ছেন দেখে সে তো কড়া ভাষায়—তোর মরার ইচ্ছে হয়েছে,—ইত্যাদি বলে ভীমকে খানিকটা শাসানি দিল।

ভীম ভ্রূক্ষেপ না করে হিন্দি সিনেমার নায়কের কায়দায় খেয়ে চললেন। বক ধেয়ে এল, ভীম তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিপাতে একবার তাকে দেখে নিয়ে আবার খেতে লাগলেন। বক এবার রেগে ভীমের পিছনে এসে তাঁর পিঠে একটা ঘুসি চালাল। ভীম তাকিয়েও দেখলেন না। নারায়ণ দেবনাথের বাঁটুলের মতো—কে রে পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে—এইভাবে খাবারের দিকেই মন দিলেন—নৈবাবলোকয়ামাস রাক্ষসং ভুঙ্‌ক্ত এব সঃ। বক এবার গাছ-টাছ তুলে আনতে গেল। কিন্তু ভীমের যেন কোনও তাড়া নেই। মারামারি শুরুর তুঙ্গ-মুহূর্তেও হিন্দি সিনেমার নায়ক যেমন নির্বিকার চিত্তে সিগারেট টানে, শেষ সুখটান দেয়, তারপর একটু কেশেও নেয়, ভীমও তেমনই তাঁর খাওয়া শেষ করলেন, হাত ধুলেন, তারপর হাত মুছে বেশ হৃষ্টমনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই রাক্ষসের ছোঁড়া গাছটা লুফে নিলেন বাঁ হাতে, মুখে কিন্তু এখনও তাঁর খাবার তৃপ্তিটুকু লেগেই আছে।

আপনারাই বলুন, 'হলে' থাকলে এই সময় সামনের সিটগুলো থেকে হাততালি পড়ত কিনা। আমরা এই যুদ্ধের অবধারিত ফল জানি। বকের গলা টিপে, কোমর ভেঙে, তাকে তালগোল না পাকানো পর্যন্ত ভীম তাকে ছাড়বেন না—এ আমরা জানি। বক-রাক্ষসকে কাঁধে বয়ে নিয়ে নগরের দ্বারে ফেলে রেখে এলেন ভীম। বুঝিয়ে দিলেন—পাড়ার লোকের হাড় জ্বালিয়ে বক আর তোলা

তুলতে আসবে না। এরপরে যেটা মহাভারতে অনুল্লিখিত, সেটা হল—বকের মৃত শরীর ফেলে দিয়ে—যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে হাতের ধুলো ঝেড়ে চলে এলেন নিজের বাড়িতে। মা-ভাইদের খবর দিলেন—ব্যাপারটা মিটে গেছে।

এক্ষুনি যে নগরের কথা বললাম, এই নগরের নাম একচক্রা। এখানে অনেকদিন থাকার ফলে পাণ্ডবদের ভিক্ষা পাওয়ার অসুবিধে হচ্ছিল। জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে ফেরার পরেই পাণ্ডবরা দুর্যোধনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তিতেই তাঁদের জীবন কাটছিল। কিন্তু এক জায়গায় আর কত ভিক্ষা মেলে। তা ছাড়া ওই ছোট্ট নগরের দর্শনীয় স্থান থেকে সবকিছুই তাঁদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। জননী কুন্তীও প্রস্তাব দিলেন—চল, এবার পাঞ্চালরাজ্যে যাই। সেখানে ভিক্ষাও ভাল মিলবে আর শহরটাও বেশ বড়। এরমধ্যে নানা জনের মুখে দ্রৌপদীর রূপ-গুণ, স্বয়ম্বরের আয়োজনের খবরও তাঁদের কানে এসে পৌঁছল। তাঁরা এবার সবাই মিলে চললেন পাঞ্চাল-রাজ্যে নতুনত্বের আশায়।

ভীমকে এবার একটা অদ্ভুত পরিবেশে আমরা দেখতে পাব। দেখতে পাব, চার ভাইয়ের সঙ্গে তিনি বসে আছেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায়। ব্রাহ্মণের বেশ। কেউ তাঁকে চেনে না।

দ্রৌপদীকে বিয়ে করা বা লক্ষ্যভেদ করা—এসব কোনও 'প্ল্যান' কোনও পাণ্ডবের মনেই ছিল না। কিন্তু রাজসভায় দ্রৌপদীকে দেখার পর প্রত্যেকেই যে অপলক নয়নে তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন এবং তাঁকে যে সব পাণ্ডবভাইদেরই বেশ পছন্দ হচ্ছিল, সে কথা মহাভারতের কবি লুকোননি। যাই হোক, দ্রুপদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে সবাই যখন একে একে অসফল হলেন, তখন অর্জুন গেলেন লক্ষ্যভেদ করতে। তিনি লক্ষ্যভেদ করলেন এবং দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করলেন। এতাবৎ আমাদের ভীমের কোনও 'ফাংশন' নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে দ্রৌপদীকামী বিফল রাজারা দ্রুপদরাজাকে ছেড়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন সেই মুহূর্তেই ভীমকে দেখছি—তিনি একটি প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে নিয়ে বাড়ি মেরে তার পাতা সাফ করে নিয়েছেন। কৃষ্ণ বলরামকে ভীমের পরিচয় দিয়ে বললেন—ওই যে গাছ নিয়ে রাজাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যিনি, উনি ভীমসেন। কেন না, ভীম ছাড়া পৃথিবীতে আর কারও এইভাবে যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই—বৃকোদরান্নান্য ইহৈতদদ্য/কর্তুং সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্।

আমরা জানি—এই যুদ্ধেও ভীম আবারও অর্জুনের সাহায্যকারীর ভূমিকায়, যে ভূমিকা মাদাম বিয়ার্দো ঠিক করে দিয়েছেন ইন্দ্রের সাহায্যকারী হিসেবে বায়ুর রূপকল্পে। এই যুদ্ধও অর্জুন জিতেছিলেন ভীমের অমানুষিক ক্ষমতায়। যুদ্ধশেষে অর্জুন যখন নব-পরিণীতা বধূকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন, তখন একমাত্র ভীমই ছিলেন তাঁর সঙ্গে। অন্য তিন ভাই যুদ্ধের আগেই যুদ্ধভূমি থেকে বাইরে চলে গেছেন। দিন পরিণত হয়েছে প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায়। নববধূর প্রথম হৃদয়-পাওয়া অর্জুন যখন দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন কি ভীমের একবারও মনে হয়নি যে, দ্রৌপদীকে লাভ করার ব্যাপারে তাঁরও হক অন্তত পঞ্চাশ ভাগ। তবু এই ভাগের প্রশ্নে তাঁর সন্দেহও নিশ্চয়ই ছিল, কেন না দ্রুপদের কন্যাপণ মীনচক্ষু তিনি ভেদ করেননি।

সত্যি সত্যি অধিকার যাকে বলে তা হয়তো দ্রৌপদীর ওপর ভীমের জন্মাল না, কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় প্রথম দেখেই যে রমণীকে ভাল লেগেছিল তাঁকে তিনি অস্বীকার করবেন কী করে? অর্জুন-ভীম দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে সেই কুম্ভকার-গৃহে প্রবেশ করার মুখে দু'জনে যুগপৎ উচ্চারণ করেছিলেন একই কথা—মা! কেমন ভিক্ষা এনেছি দেখো? মা বলেছিলেন—যা এনেছ, সবাই মিলে ভাগ করে নাও। কথাটা দ্রৌপদীর পক্ষে রুচিরোচন নাই হোক, অর্জুনের দিক থেকেও কথাটা তত সুখকর নয়, বিচারসহও নয়, কিন্তু আর সব ভাইদের কাছে কথাটা যে হঠাৎ হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো হল—সেটা আর কেউ না বুঝুন, পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ঠিক বুঝেছিলেন।

মায়ের কথা ঠিকমতো বিচার করে একটা সুব্যবস্থা করার ভার পড়ল মহামতি যুধিষ্ঠিরের ওপর। তিনি অর্জুনের লক্ষ্যভেদের নিরিখে তাঁকেই বলেছিলেন একা দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে। কিন্তু অর্জুন সবিনয়ে বললেন—আগে যুধিষ্ঠিরের বিয়ে হোক, ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি। যুধিষ্ঠির

আর দ্বিতীয়বার অর্জুনকে সাধেননি। কারণ, অর্জুন ছাড়াও দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর অন্যান্য ভাইদের—ভীমও তার মধ্যে আছেন—যেরকম সরসতা লক্ষ করলেন যুধিষ্ঠির, তাতে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না, ভাইদের মধ্যে একজনও যদি অসামান্য দ্রৌপদীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে যাতে কোনওদিন কোনও কারণে বিভেদ সৃষ্টি না হয় সেই ভয়েই যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত নিলেন—সুকুমারী দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই স্ত্রী হবেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আলাদা করে ভীমের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, মহাভারতের কবি তা পরিষ্কার করে লেখেননি। কিন্তু সমস্ত ভাইরা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অবধি ওই কথাটাই শুধু ভেবে যাচ্ছিলেন—তমেবার্থং ধ্যায়মানা মনোভিঃ। সবাই ভাবছিলেন বললেও সবার ভাবা একরকম হয় না। অনুমান করা যায়, নকুল যা ভাবছিলেন, ভীম তা ভাবছিলেন না। এমনকী অর্জুন যা ভাবছিলেন ভীম নিশ্চয় তাও ভাবেননি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাণ্ডবভাইদের মধ্যে সমাংশে প্রতিষ্ঠিত করার পর যুধিষ্ঠির যদি মহা-স্থির থেকে থাকেন—কারণ, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও স্থির থাকতেন, তবে অর্জুন ছিলেন মহান দানের গৌরবে কৃতার্থ। কিন্তু ভীমের কী হয়ে থাকতে পারে?

মহাভারতের শেষ পর্বটা যেহেতু আমরা জানি, তাই কথা বাড়িয়ে লাভ নেই কোনও। কিন্তু ভীমের জীবনের শেষের দিনটি পর্যন্ত সব কথা ভেবেও বলতে পারি—সংসারে কতগুলি লোক থাকে যারা ভালবাসার ক্ষেত্রে 'রেসিপ্রোসিটির' ধার ধারে না। এক পঞ্চমাংশ মাত্র দ্রৌপদীর অধিকার লাভ করেই ভীম অন্তত ভেবেছিলেন—এই যথেষ্ট। যাঁকে এত ভাল লেগেছিল (কেন ভাল লেগেছিল, তাও বুঝি তিনি জানেন না)—, ন্যায় অনুসারে যাঁর ওপরে কোনও অধিকারই ছিল না, তার ওপর এই আকস্মিক অধিকার পেয়ে ভীম বুঝি ভেবেছিলেন—এঁকে আমার সব দিতে চাই, প্রতিদানে কী পাচ্ছি, সে হিসেবে আমার দরকার নেই কোনও। কুড়ি শতাংশ হৃদয়ের আইনি পথ বেয়ে একশো ভাগ পুরুষ-হৃদয় উজাড় করে দেওয়ার যে কারণ—তা ভীম তত ভাল করে না জানলেও দ্রৌপদী জানতেন। সে সব কথায় আমরা পরে আসব।

৫

অকারণে পাণ্ডব-মধ্যমকে বিষ দিলেন দুর্যোধন। ভীম রক্ষা পেলেন। জতুগৃহে পুরোচনের সুব্যবস্থায় সমস্ত পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে চাইলেন দুর্যোধন। পাণ্ডবরা সেই বিপদ থেকেও উদ্ধার পেলেন প্রধানত ভীমের ক্ষিপ্রতা এবং শক্তির কারণে। যুধিষ্ঠির অন্তত কুন্তীর কাছে এই কথা বলেছেন। বলেছেন—যার জন্য আমরা জতুগৃহের আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছি, যার জন্য পুরোচন মারা পড়েছে—যস্য বীরস্য বীর্যেন মুক্তা জতুগৃহাদ্‌বয়ম্—সেই ভীমকে তুমি বক-রাক্ষসের কাছে পাঠিয়ো না। বস্তুত মা-ভাইদের সুরঙ্গ-পথে পাঠিয়ে দিয়ে পুরোচনের ঘরে আগুন দেওয়া, অন্য সব ঘরগুলিতে আগুন লাগানো এবং পরিশেষে অগ্নিত্রস্ত থমকে যাওয়া পাণ্ডবদের বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়া—এ সবই তো ভীমের কাজ।

এর মধ্যে হিড়িম্ব-বকের মতো কুখ্যাত শক্তিশালী বীরদের ধ্বংস করে ভীম তাঁর অমানুষিক শক্তির জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত খবর এক-এক করে দুর্যোধনের কানে পৌঁছেছিল। ভীমকে জন্ম থেকেই তিনি তাঁর উচ্চাশার একমাত্র অন্তরায় মনে করতেন এবং এখন দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিয়ের খবর যখন হস্তিনায় এসে পৌঁছল, তখনও পাণ্ডবদের ওপর তাঁর যত না রাগ হল, তার থেকেও বেশি রাগ হল ভীমের ওপর। দ্রৌপদীর বিয়ের পর কুরুসভায় পাণ্ডবদের নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল, তাতে দুর্যোধনের অনেক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ভীমের চিন্তাই ছিল সবচেয়ে আশঙ্কাময়। ভীমের সম্বন্ধে দুর্যোধনের এই আশঙ্কা পিতা ধৃতরাষ্ট্রের পরম্পরাসূত্রে পাওয়া।

ছোটবেলায় যখন থেকে তাঁর প্রিয় পুত্রগুলি ভীমের হাতে ক্রীড়াচ্ছলে পর্যুদস্ত হত, তখন থেকেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে দেখতে পারতেন না। ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন প্রায় লাগ-লাগ,

তখনও ভীমের চিন্তাই ধৃতরাষ্ট্রকে চিন্তিত করেছে। শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শান্ত হওয়ার পরেও শুধু ভীমকে মেরে ফেলার জন্য এই অন্ধ পিতা লৌহ-ভীম গুঁড়ো করে ফেলেছিলেন। ভীমের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের এই হিংসাই রূপ ধারণ করেছে দুর্যোধনের মধ্যে।

যে দ্রৌপদীকে বিয়ে করার জন্য দুর্যোধন কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে পাঞ্চাল-সভায় গিয়েছিলেন, সেই দ্রৌপদীকে তো পাওয়াই হল না, উপরন্তু তিনি শুনলেন—বারণাবতের আগুন থেকে পাণ্ডবরা বেঁচেছেন এবং দ্রৌপদী মালা দিয়েছেন তাঁদেরই গলায়। সেদিন কুরুসভায় মিটিংয়ের পর মিটিং চলল। পাণ্ডবদের মধ্যে কী করে ভাঙন ধরানো যায়, এই নিয়ে দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনির সঙ্গে দুর্যোধনের একান্ত আলোচনা চলল। দুর্যোধনের প্রস্তাব-গুচ্ছের মধ্যে চর লাগিয়ে পাণ্ডবদের ওপর দ্রৌপদীর মন বিষিয়ে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সুন্দরী বেশ্যা পাঠিয়ে প্রত্যেক পাণ্ডবকে প্রলুব্ধ করার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু এই সবগুলি প্রস্তাবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল—ভীমকে কোনওরকমে মেরে ফেলা। দুর্যোধন বলেছিলেন—পেশাদার খুনেরা গুম খুন করুক ভীমকে। কেন না পাণ্ডবদের সবার মধ্যে ওই ওটার শক্তিই সবচেয়ে বেশি, পালের গোদা—স হি তেষাং বলাধিকঃ।

রাগের মুখে দুর্যোধনের মুখে অনেক সত্যি কথা বেরিয়েছে। ভীমের সম্বন্ধে যা তিনি ভাবেন, অথচ মুখে বলেন না ; নিজের অহঙ্কারে যাকে তিনি প্রায়ই তুচ্ছ করেন, অন্তত মৌখিকভাবে যাঁকে তিনি লঘু করেন, সেই ভীমের সম্বন্ধে দুর্যোধন এই মুহূর্তে অনেক মনের কথা বলে ফেলেছেন। দুর্যোধন বলেছেন—এই যে যুধিষ্ঠির এতকাল আমাদের গ্রাহ্যির মধ্যে আনেনি, তার কারণও ওই ভীম—তমাশ্রিত্য হি কৌন্তেয়ঃ পুরা চাস্মান্ ন মন্যতে। আরও একটা কথা। আসলে ওই ভীমটাকে যদি মেরে ফেলা যায়, তবে পাণ্ডবরা সবাই এতটাই নিরুৎসাহ এবং নিস্তেজ হয়ে যাবে যে, ওরা আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ-টুদ্ধর মধ্যে যাবেই না। কারণ ভীমই ওদের প্রধান অবলম্বন—স হি তেষাং ব্যপাশ্রয়ঃ।

ভীমের সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে দুর্যোধন অর্জুনেরও মূল্যায়ন করে ফেলেছেন। দুর্যোধনের কাছে ভীমের গুরুত্ব এতটাই যে, ভীম ছাড়া অর্জুন কোনও 'ফ্যাক্টর'ই নন। তিনি বলেছেন—ভীম যদি পেছনে থাকে তবে অর্জুনকেও যুদ্ধে জয় করা মুশকিল। আর ভীম ছাড়া অর্জুন আমাদের কর্ণের নখের যুগ্যিও নয়—রাধেয়স্য ন পাদভাক্।

দুর্যোধনের কথাটাও সেই মাদাম বিয়ার্দোর কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। দুর্যোধন নিজে যেহেতু অপরিশীলিত ক্ষাত্রশক্তির প্রতিরূপ, অতএব তাঁর বিশ্বাসটাও তাঁর স্বরূপেরই প্রতিফলন। শুদ্ধ এবং মহান ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক অর্জুনকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। অর্জুনের থেকেও ভীমের শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস বেশি। তাঁর মতে—ভীমকে কোনওমতে মেরে ফেলা সম্ভব হলে পাণ্ডবদের কারও ট্যাঁফোঁ করার শক্তি হবে না—ন যতিষ্যন্তি দুর্বলাঃ।

আমাদের দৃষ্টিতে দুর্যোধনের কথার মধ্যে তাঁর নিজের বুঝটুকুই হয়তো প্রতিফলিত হয়েছে, হয়তো ভীমের সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রেরও এই বোধই ছিল, কিন্তু যাই হোক দুর্যোধনের কথামতো ভীমকে গুম খুন বা অন্য কিছু করা হয়নি। কুরুসভায় ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে পাণ্ডবদের উত্তরাধিকার সমস্যা মেটাতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়ে দিলেন। তবে এই দেওয়ার পেছনে তাঁর বদান্যতা ছিল না বিন্দুমাত্র। যা ছিল, তা হল ভীম এবং অর্জুনের শক্তির অপ্রতিরোধ্যতা এবং ভীতি।

আমরা ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। কিন্তু রাজসূয়ের আগে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দুর্ভাবনা দূর করার ব্যাপারেও ভীম যে কতখানি সহায় হয়েছিলেন সেটা না বললে অন্যায় হবে। মুনি-ঋষিদের প্রস্তাবে নেচে উঠে যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয়যজ্ঞ করবেন বলে ভাবলেন, সেই সময় মহামতি কৃষ্ণ তাঁকে জরাসন্ধের কথা বলে ভয় দেখালেন। মগধরাজ জরাসন্ধ তখন সমগ্র পূর্বাঞ্চলের একচ্ছত্র সম্রাট। ভারতের অন্যত্রও তখনও এমন কোনও রাজা ছিলেন না, যিনি জরাসন্ধকে ভয় না পেতেন বা সমীহ না করতেন। ধান-মাড়াইয়ের জন্য পোঁতা

মধ্যদণ্ডটিকে ঘিরে যেমন গরুগুলি চারদিকে ঘোরে, সেকালের ভারতীয় রাজমণ্ডলে জরাসন্ধ ছিলেন সেই মধ্য-স্তম্ভটির মতো। সমস্ত রাজমণ্ডল তাঁকেই কেন্দ্র করে আপন ক্রিয়াকলাপ চালাত। স্বয়ং কৃষ্ণ পর্যন্ত তাঁর ভয়ে আত্মীয়স্বজন নিয়ে সমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বারকাপুরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণের কাছে জরাসন্ধের বিস্তৃত বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত উৎসাহ প্রায় চলে যায় আর কি! তিনি বললেন—তুমি যেমনটি বলছ কৃষ্ণ তাতে বুঝি আর রাজসূয়যজ্ঞ করা হল না। এত ঝামেলার চেয়ে আমার কাছে বাপু শান্তির মূল্য অনেক বেশি, আর শান্তি পেলেই আমার মঙ্গল—শমমেব পরং মন্যে শমাৎ ক্ষেমৎ পরং মম। যুধিষ্ঠির যখন জরাসন্ধের ব্যাপারে প্রায় হাত গুটিয়ে নিলেন, তখন যে মানুষটি প্রথম তাঁকে চাঙ্গা করে তুললেন, তিনি কিন্তু ভীম। অন্য একজনের শক্তিমত্তার প্রশংসা, তাও আবার সেই শক্তিমত্তা দাদা যুধিষ্ঠিরের আকাঙ্ক্ষাকে পীড়িত করছে, সে শক্তিমত্তা কৃষ্ণকে দ্বারকায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে—অতএব এই শক্তির প্রশংসা ভীম চুপ করে বসে শুনবেন না।

তবে হ্যাঁ, অন্য ক্ষেত্রে তিনি একা যে যুদ্ধের দায়িত্ব নিতেন, এখানে সেই, দ্রুত প্রতিক্রিয়া তাঁর হল না। কৃষ্ণের মুখে জরাসন্ধের বিরাট রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কথা শুনে তিনি যেমন একদিকে প্রতিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে নিজের সামর্থ্যেও তিনি অবিচল। অর্থাৎ একজনের প্রবল শক্তি আছে বলেই সে অপ্রতিরোধ্য এবং অজেয়—এই ভেবে ভীম কখনই তাঁর আত্মবিশ্বাস হারান না। জরাসন্ধের কথায় যুধিষ্ঠির যখন একটু গুটিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভীম বলেছেন—দাদা! যে রাজা শত্রুর বিরুদ্ধে কোনও চেষ্টা না করেই গুটিয়ে বসে থাকে, তাকে দেখতে লাগে ঠিক একটা উইয়ের ঢিবির মতো। এতই পলকা, এতই শক্তিহীন অথচ একজন রাজার প্রতিরূপে রাজার আকারে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

কথাটা বলেই হয়তো ভীমের মনে হল যে, জরাসন্ধ, বক রাক্ষস অথবা হিড়িম্ব নন। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যে পিছিয়ে আসছেন তার পেছনেও যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ এ অন্য কেউ নন, ইনি জরাসন্ধ। ভীম সুর পালটিয়ে তর্কের খাতিরে জরাসন্ধকে প্রায় অজেয় ধরে নিয়েই বললেন—দুর্বল লোকও যেভাবে বলবান লোককে পর্যুদস্ত করতে পারে, তার একমাত্র রাস্তা হল কৌশল। নিরলস ভাবে সদা সর্বদা চেষ্টা করে গেলে একটা দুর্বল লোকও কৌশলের মাধ্যমে বলবানকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে।

বস্তুত কৌশলের কথা ভীমকে মানায় না। কৌশলের ধারও তিনি ধারেন না। তবে তিনি বোকা তো নন, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে তিনি বুঝেছেন যে, জরাসন্ধের মতো প্রবল-প্রতাপ শত্রুকে ধ্বংস করতে গেলে কৌশলের প্রয়োজন। তবে কৌশলের ব্যাপারে যে তাঁর মাথাটা বড় কাজ করে না, সেটা জানাতে ভীমের কোনও লজ্জা নেই। একই সঙ্গে শক্তির প্রয়োজন যেখানে, সেখানে জরাসন্ধের মতো শত্রুর মুখোমুখি হতেও যে তাঁর কোনও ভয় নেই সেটাও তিনি গর্ব করে বলেছেন। বলেছেন—কৌশল! কৌশলের ব্যাপারটা কৃষ্ণের এক্তিয়ার, আমার নয়। তবে আমার আছে শক্তি, সেটাও ফেলনা নয়। আর অর্জুন যে কোনও যুদ্ধকে জয়ে পরিণত করতে পারেন—কৃষ্ণে নয়ো ময়ি বলং জয়ঃ পার্থে ধনঞ্জয়ে। এই কৌশল, শক্তি আর জয়ের সূত্রেই আমরা জরাসন্ধকে বিনাশ করব।

কৃষ্ণ ভীমের কথা মেনে নিয়েছেন। জরাসন্ধের বিরুদ্ধে ভীমকে একটু উসকেও দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন—সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করার পরেই যেটা দরকার হবে, সেটা হচ্ছে অমানুষিক দৈহিক শক্তি, যেটা ভীমের ছিল। কৃষ্ণ বলেছিলেন—ব্যূহ রচনা করে, যুদ্ধযাত্রা করে জরাসন্ধের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। জরাসন্ধকে ধরতে হবে একাকী এবং তাও সবার সামনে নয়। ধরব আমরা তিনজন। কিন্তু জরাসন্ধের আত্মসম্মানের বোধ এতটাই বেশি যে, একক যুদ্ধে আমাদের মতো দোহারা লোকের সঙ্গে সে লড়বেই না। নিজের অপমানের ভয়ে, নিজের যশের লোভে এবং সবচেয়ে বড় কথা—নিজের শক্তি দেখানোর জন্যই সে ভীমকে বেছে নেবে। আর তা হলেই কেল্লা ফতে। কৃষ্ণ বললেন—ভীম একমাত্র লোক যে তাকে যমের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত—নিধনায়ান্তকো যথা।

কৃষ্ণ যা যা বলেছিলেন, তাই তাইই ঘটেছিল, ঠিক অঙ্কের ছকের মতো। চোরা পথে ব্রাহ্মণের বেশ ধরে তাঁরা যখন জরাসন্ধের সম্মুখীন হলেন, তখন যত কৌশলই করা হয়ে থাক, জরাসন্ধ তাঁদের সন্দেহ করেছিলেন। একক যুদ্ধের আহ্বান যখন এল তখন সুযোগ থাকতেও তিনি প্রধান মল্ল ভীমকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে পছন্দ করলেন। কারণ হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারার ভীমকেই একমাত্র বীর বলে জরাসন্ধের পছন্দ হয়েছিল। ভীম-জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। মল্লবীর হিসেবে জরাসন্ধের যথেষ্ট সুনাম ছিল। অন্যদিকে হিড়িম্ব-বককে শাস্তি দিয়ে ভীমও তখন মল্লপ্রধানদের অন্যতম। মল্লযুদ্ধে প্যাঁচ-পয়জার দু'জনেই যত রকম জানেন, সবই প্রয়োগ করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল কবে সেই কার্তিক মাসের প্রথম দিনে। দুই মল্লের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ; অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলছে—অনাহারং দিবারাত্রম্ অবিশ্রান্তমবর্তত। দুই বীরের শক্তি এবং কুস্তি করার দক্ষতা প্রায় একইরকম দেখা গেল, অন্তত তেরোদিন ধরে। চতুর্দশীর দিনে জরাসন্ধ বেশ খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

অনেকেই আছেন যাঁরা এই সুযোগে ভীমকে খানিকটা নিরেট বোকা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। রামায়ণ-মহাভারতের বাংলাভাষী কবিরা গল্প-কথায় নতুন রূপ দেবার জন্য ভীমকে একজন মোটা-সোটা, মোটা বুদ্ধির শক্তিমান লোক বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটা ভুলে যান যে, গায়ে অমানুষী শক্তি থাকলে, যত্রতত্র সেই প্রতিফলন ঘটতেই পারে কিন্তু, তাই বলে গায়ে-গতরে লম্বা-চওড়া হলেই তার বুদ্ধিটাও মোটা হবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। নতুন গল্পের মোহে এবং ভীমের প্রতিতুলনায় কৃষ্ণকে বেশি চালাক দেখানোর জন্য নতুন কবিরা লিখেছেন—দুই মল্লবীরের সমানে-সমানে যুদ্ধ চলছে এবং ভীম জরাসন্ধের ওপরে কিছুতেই টেক্কা দিতে পারছেন না। এইরকম একটা সময়ে কৃষ্ণ নাকি একটি দুব্বোঘাস তুলে নিয়ে হাত দিয়ে সেই দূর্বাদল দু'ভাগ করে ভীমকে ইশারা করতে লাগলেন। অর্থাৎ জরাসন্ধের জন্মরহস্যে তাঁর দেহের দুই অর্ধাংশ যেভাবে জোড়া দেওয়া হয়েছিল, সেই জোড়া খুলে ফেলার ইঙ্গিত আর কি! কাশীরামের ভাষায় :

যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥
আশ্চর্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥
ইহার মরণে আমি, না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায় ॥
পূর্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেইরূপে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণীপাত ॥

এখানে মনে রাখতে হবে, ব্যাসের মহাভারত ক্ষত্রিয় যুদ্ধবীরের কাহিনী। সেই কাহিনীর অন্যতম নায়কের পূর্বের কথা এত 'বিস্মরণ' হয় না যে, 'বেণীপাত' চিরে তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হবে। কৃষ্ণকে কৌশলী প্রমাণ করার জন্য ভীমকে এত জড় এবং বোকা ভাবার কারণ নেই। হ্যাঁ, বিস্মরণ একবার হয়েছিল। সে দুর্যোধনের বেলায়। তার কারণ পরে বলব। কার্তিক মাসের চতুর্দশ দিনে নিজের অর্ধেক বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন জরাসন্ধ। তাঁর হাত আর চলে না, পা চলে না। ক্ষত্রিয়-বীরের যুদ্ধনীতিতে একটি ক্লান্ত বা অত্যন্ত আহত প্রতিপক্ষকে আঘাত করা খুবই অনৈতিক বলে গণ্য হত। হয়তো সেই কারণে ভীম জরাসন্ধকে একটু-আধটু ছেড়ে দিচ্ছিলেন। তাঁকে হয়তো অতটা আঘাত করছিলেন না, যতটা ভীম পারেন।

মহাভারতে দেখছি—ঠিক এই সময়ে সুচতুর কৃষ্ণ ভীমকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—ওরকম করে মেরো না, ভাই। শত্রু ক্লান্ত হলে তাকে অমন করে মারতে নেই। কেন না জানই তো—এই অবস্থায় এত মার দিলে শত্রু যে প্রাণে মারা যাবে—জহ্যাজ্ জীবিতমাত্মনঃ। অতএব তুমি ভাই অমন

কৃষ্ণের এই সম্পূর্ণ কথাগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনাটা ঠিক উলটো। অর্থাৎ শত্রু ক্লান্ত হয়ে গেছে। ঠিক এই অবস্থায় তোমার যত শক্তি আছে কাজে লাগিয়ে জরাসন্ধকে মেরে ফ্যালো। কৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝতে ভীমের এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। কারণ জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন এবং শত্রুর করুণ অবস্থা দেখে তাঁর হয়তো মায়াও লাগছিল। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় এবার তিনি দ্বিগুণ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জরাসন্ধের ওপর। শক্তি প্রদর্শনের তুঙ্গ মুহূর্তে জরাসন্ধকে তিনি হাতে তুলে মাথার ওপর দিয়ে বাঁই-বাঁই করে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন—উৎক্ষিপ্য ভ্রাময়ামাস বলবন্তং মহাবলঃ।

আমরা এই কিছুদিন আগেও দারা সিংকে এইসব কাণ্ডকারখানা করতে দেখেছি। ভীম জরাসন্ধকে মাথার উপর ঘুরিয়ে মাটিতে ফেললেন। প্রথমেই তাঁর পিঠের শিরদাঁড়া দিলেন ভেঙে ; তারপর দুই পায়ে ধরে একেবারে মাঝ-বরাবর ফেঁড়ে ফেললেন জরাসন্ধকে। জরাসন্ধের জন্মরহস্য তাঁর স্মরণেই ছিল অতএব যুদ্ধের অন্তিম কল্পে জরাসন্ধের শরীরের সন্ধি-বিচ্ছেদে তাঁর ভুল হয়নি। জরাসন্ধকে মেরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভীমের জয়-গর্জন চরমে উঠল। মুষ্টি-যুদ্ধ, ক্যারাটে বা এইরকম দৈহিক যুদ্ধে গর্জন একটি অঙ্গ। অতএব বাচ্চালোগ ফির তালি বাজাও—যুদ্ধজয় করে ভীম এমনই চেঁচাতে লাগলেন যেন হিমালয় ভেঙে পড়ল, যেন বিদীর্ণ হল পৃথিবী।

মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে জয় করার সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক দিয়ে ভীমের মর্যাদা চর্তুগুণ বেড়ে গেল। একদিকে দৈহিক শক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় বলে গণ্য হলেন। অন্যদিকে জরাসন্ধকে মারার একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ জরাসন্ধের কৃপাপ্রার্থী ছিল। এমনকী তাঁর মধ্যে দুর্যোধনও ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা। এ সব ব্যাপার নিয়ে আমি 'মহাভারতের ভারত-যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ' নামের বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে যেটা বলার, সেটা হল—গোটা পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি জরাসন্ধকে ভীম বধ করেছিলেন বলেই বোধহয় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ভীমকেই পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলি জয় করতে পাঠানো হয়েছিল। জরাসন্ধ-বিজেতা ভীম—শুধু এই একটি বিশেষণের মধ্যেই যে 'টেরর' তৈরি হয়েছিল, সেটাকে রাজা হিসেবে যুধিষ্ঠির কাজে লাগিয়েছেন।

পূর্বদিক বলতে আমাদের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, আসাম, সূহ্মদেশ—এইসব জায়গাগুলিকে ভীম করদ রাজ্যে পরিণত করলেন। অপিচ এসব দেশ থেকে ধন-রত্ন, জিনিস-পত্র যা পেলেন, সব এনে নিবেদন করলেন যুধিষ্ঠিরের পায়ে। পরম সমারোহে রাজসূয়ের শেষ পর্ব আরম্ভ হল। গণ্য-মান্য সব রাজারা এসেছেন। কিন্তু এইখানেও একটা গণ্ডগোল বেঁধে গেল চেদিরাজ শিশুপালকে নিয়ে। তিনি স্বর্গত জরাসন্ধের পুত্রপ্রতিম ছিলেন। রাজসূয়যজ্ঞের সম্মান-অর্ঘ্য যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিবেদন করায় শিশুপাল রেগে-মেগে অস্থির হলেন। কৃষ্ণকে এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্ডবদেরও তিনি যথেচ্ছ গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। গালাগালি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন ভীমকে আরও একবার দেখলাম সেই রুদ্র মূর্তিতে দাঁতে দাঁত ঘষে, পেশী ফুলিয়ে শিশুপালের দিকে ধেয়ে আসতে। আমরা মুহূর্তের মধ্যে আরও একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই। কারণ ভীম লাফিয়ে এসে শিশুপালকে ধরে ফেলেছিলেন আর কি ! কিন্তু ঠিক ওই অবস্থাতেই তাঁকে ধরে ফেলেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম। যজ্ঞের শেষ পর্বে তাঁরই বাড়ির একজন, নিমন্ত্রিত অতিথিকে মেরে ফেলবে—এটা হয়তো তিনি চাননি। ভীষ্মের কথায় এবং যুক্তিতে ভীম শান্ত হয়েছেন, তাঁকে অতিক্রমও করেননি—নাতিচক্রাম ভীষ্মস্য।

যুধিষ্ঠিরের এই রাজসূয়যজ্ঞের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বীজ ছিল। সে বীজ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কীভাবে উপ্ত হয়েছিল, সে কথা অন্যত্র বলেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং ঈর্ষার যে কদর্য ভাবনা দুর্যোধনের মনের মধ্যে লুকিয়েছিল, তা নতুন রূপ নিল এই রাজসূয় থেকেই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মিটে গেলেও হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধন আরও কদিন কাটিয়ে গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। উদ্দেশ্য খুব সৎ ছিল না। তিনি আগে ইন্দ্রপ্রস্থে আসেননি। কিন্তু রাজসূয়ে এসে

দেখলেন—যুধিষ্ঠির তথা পাণ্ডবভাইরা তাঁকে টেক্কা দিয়েছেন। এরকম অসাধারণ রাজপুরী শুধু হস্তিনাপুর কেন, অন্য কোথাওই নেই। ময়দানব কারুকৃত্তম। তাঁরই প্রযত্নে নির্মিত হয়েছে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ। মনের মধ্যে ঈর্ষার আগুনে পুড়তে পুড়তে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের স্ফটিক-স্থাপত্য দেখছিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব এমনই স্ফটিক-মায়ার ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন যে, দুর্যোধন তার কোনওটাই ঠিক কী, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যজ্ঞশেষের মন্থর মুহূর্তে কারও কোনও কাজ নেই। পাণ্ডবরাও তাই এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অকারণে অলস মুহূর্ত কাটাবার জন্য। দুর্যোধন হাঁটতে হাঁটতে স্ফটিকের বিভ্রান্তিতে—যেখানে জল নেই, সেখানে জলের সম্ভবনা করে, কাপড়-চোপড় উঁচু করে জলের মধ্যে নামতে গিয়ে দেখলেন, কিছুই নেই। আবার পূর্বের অভিজ্ঞতায়, যেখানে সত্যিসত্যিই জল আছে সেখানে ভীষণ 'স্মার্টলি' পদক্ষেপ করতে গিয়ে দুর্যোধন বিনা প্রস্তুতিতে ধপাস করে জলে পড়ে গেলেন।

পাণ্ডবভাইরা স্বাভাবিকভাবেই দুর্যোধনের গতিবিধি দেখছিলেন। বিশেষত ভীম। যেখানে সেখানে অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধনের সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা, পাণ্ডবরা দেখছেন জেনেও তাঁদের পাত্তা না দিয়ে একা একা চলা—এগুলি ভীম অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দুর্যোধন একেবারে জলেই পড়ে গেলেন, তখন তাঁর এই নাকাল অবস্থা দেখে, ভীম আর হাসি চাপতে পারলেন না। আর ভীমের হাসি তো বুঝতেই পারছেন। যেমন তার আওয়াজ, তেমনই তার দমক। ভীমের দেখাদেখি অন্য পাণ্ডবভাইরাও হাসতে থাকলেন।

ভীমের এই হাসির মধ্যে অপমান করার ব্যঞ্জনা ছিল না কোনও। সব সময় ওস্তাদি-দেখানো যার স্বভাব, সে হঠাৎ এই ধরনের অস্বস্তিতে পড়লে হাসি পাবেই। যাই হোক দুর্যোধন এই হাসির কথা ভোলেননি এবং সাতকাহন করে এই হাসিকে এক চূড়ান্ত গল্পের রূপ দিয়েছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর কাছে। এর পেছনে অবশ্য শকুনির বুদ্ধিও কাজ করেছে। আসলে ভীমের হাসির বাহানা দিয়ে দুর্যোধন-শকুনিরা পাণ্ডবদের ঈর্ষনীয় রাজসম্পদ আত্মসাৎ করতে চাইলেন—যার ফল পাশা-খেলা এবং শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের বনবাস।

৬

দুর্যোধনের পাশা-চক্রান্ত পাণ্ডবদের জীবনে এমনই একটা ঘটনা, যা থেকে প্রত্যেক পাণ্ডব-চরিত্র সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হয়। পাশাখেলার সর্বনাশা ফল সমস্ত পাণ্ডবভাই এবং দ্রৌপদীর ওপরেও নেমে এসেছে। এই নিরিখে যুধিষ্ঠির অথবা অর্জুনের চরিত্র যেমন নতুন ভাব-ভাবনায় প্রকাশিত, তেমনই ভীমের চরিত্রেও আমরা এখন থেকে নতুন এক মাত্রা লক্ষ করতে থাকব। বস্তুত পাশাখেলা যদি না হত, তা হলে বড় জোর কী হত ? যুধিষ্ঠিরের শাসনে পাণ্ডবরা আরও আরও রাজসম্পদ বৃদ্ধি করতেন। তাঁরা বড় সুখে থাকতেন। কিন্তু মহাকাব্যের কবি শুধু সুখে সন্তুষ্ট নন। মানুষের মনের মধ্যে যে অনির্বাণ দ্বন্দ্ব চলে, সেই দ্বন্দ্ব কেমন করে একজনকে কাছে আনে, অন্যকে দূরে ঠেলে দেয়, কেমন করে একজনকে মাহাত্ম্য দেয় অন্যকে অবহাস—সেই সব বিচিত্র ভাব-কৌতুকের ততোধিক বিচিত্র পরিণতি দেখানোর জন্যই মহাকবি পাশাখেলার আয়োজন করেছেন।

পাশাখেলার মধ্যে অনন্ত কুটিলতা আছে, কপটতাও আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যেও যে কুটিল-কপট বৃত্তিগুলি আছে, সেগুলিরও একটা বিষয় চাই প্রকাশ হবার জন্য। মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তরালে থাকা মৌন-মূক ভাব, সাধারণ অবস্থায় যা প্রকাশ করলে হয়তো বিপরীত শোনাত, সেইগুলি প্রকাশের জন্যও একটা কুটিল পরিস্থিতি দরকার, নইলে সে ভাব চিরকাল না জানাই থেকে যেত। মানুষগুলিও হয়ে থাকত অচেনা।

কে ভেবেছিল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এমন মানুষ ? এই এতদিন নিত্য উঠতে-বসতে যাঁকে ধর্মের প্রতিরূপে দেখতে পেয়েছি, সেই যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় এমন প্রমত্ত হয়ে উঠবেন—কে জানত ? কে

জানত—পাকা জুয়াড়ির মতো দানের পর দান চেলে একে একে তিনি প্রিয়তম ভাইদের পণ রাখবেন পাশা খেলায় ? পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে পাশার পণে বাঁধা দিয়ে নিজেকে নিম্নতা-নীচতার শেষ স্তরে নিয়ে আসবেন, তাই বা কে জানত ? অন্যদিকে এই যে ভীম, যাকে অন্যেরা খানিকটা বুদ্ধিহীন এবং অনেকটাই হৃদয়হীন ভেবে এসেছেন এতকাল, তাঁর মধ্যেও যে পঞ্চপাণ্ডবের এক-পঞ্চমাংশ রমণীর জন্য এত বড় একটা সম্পূর্ণ হৃদয় একেবারে সাজানো থাকতে পারে—সেটাই কি একটুও বোঝা যেত ওই পাশাখেলা না হলে ? তাই বলি, অন্য কারও কথা থাক অন্তত দ্রৌপদীর জীবনে যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলাটা যতই অভিশাপের মতো নেমে আসুক, এর মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো লুকিয়ে ছিলেন ভীম।

একটা সাদামাটা কথা এখানে আগেই বলে নিই। নারদ ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় এসে পাণ্ডবদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তোমরা বাপু ! দ্রৌপদীকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই কোরো না। পাঁচ ভাই অথচ বউ একটা। তোমরা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দ্রৌপদীর অধিকারসুখ ভোগ কোরো, নচেৎ এই সুন্দরী রমণীকে নিয়ে তোমাদের বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী। পাণ্ডবভাইরা সবাই এ কথার সারবত্তা মেনে নিয়েছিলেন। তদবধি দ্রৌপদীকে তাঁরা লাভ করছিলেন একেক বছরের জন্য। জীবন বয়ে যাচ্ছিল রুটিন-মাফিক মন্দাক্রান্তা তালে। এর মধ্যে দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থের রানি হয়েছেন। স্বামীদের একেক জনকে সঙ্গ-সুখ দিয়ে যাচ্ছেন নারদের প্রথামাফিক। এর মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না।

শরীরের ওপর স্বামীর অধিকার—বিবাহিতা রমণীর এই স্বতঃসিদ্ধ অধিকার দিয়ে দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রূপসীর বড় কিছু যায় আসে না। কিন্তু মন ? দ্রুপদের রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে যে বীর লক্ষ্যভেদ করে তাঁকে জিতে নিয়েছিলেন, যাঁকে তিনি শুভদৃষ্টির প্রথম লগ্নে একমাত্র স্বামী বলে ভেবেছিলেন, তাঁর জন্য দ্রৌপদীর অনেক অপেক্ষা ছিল। কিন্তু অর্জুনকে সে ভাবে পাওয়া আর হল কই ? একে তো কুন্তীর বাক্য সামলাতে পাঁচ পাঁচটি পুরুষ তাঁর স্বামী হলেন। তার মধ্যে নিজেদেরই নিয়মের ফাঁদে পড়ে অর্জুনকে যেতে হল আকালিক বনবাসে। কিন্তু বনবাসের ব্রহ্মচর্য ভেঙে যাদবনন্দিনী সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন যেদিন বাড়ি ফিরলেন, সেদিনও অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর অপেক্ষা আছে। তিনি অভিমান করেছেন, কেঁদেছেন কিন্তু অর্জুনকে হৃদয় থেকে মুক্ত করেননি।

অথচ যে বেচারা অর্জুনের সঙ্গে এক তালে যুদ্ধ জয় করে দ্রুপদ-সভা থেকে একই সঙ্গে অর্জুন এবং দ্রৌপদীর পেছন পেছন সেই কুম্ভকারের পর্ণশালায় ফিরে এলেন, তাঁর জন্য কি দ্রৌপদীর এতটুকু সরসতা ছিল ? ভীম ধীরোদাত্ত নায়ক তো নন, বরঞ্চ ধীরোদ্ধতই তাঁর সংজ্ঞা হওয়া উচিত। বিদগ্ধতা তাঁর মধ্যে যত, সরলতা তার চেয়ে বেশি। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের একতমা নায়িকাকে—আমিই তোমাকে একমাত্র ভালবাসি—এ কথাটা সরলভাবেও বলার উপায় ছিল না ভীমের। অথচ কী আশ্চর্য, পাশাখেলার মতো এক কুটিল পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠির যখন একের পর এক বাজি রেখে হারছেন এবং শেষ চালে পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীকেও হেরে বসলেন, সেই সময় থেকে যুধিষ্ঠির অথবা তাঁর লক্ষ্যভেদী স্বামী অর্জুনকে দ্রৌপদী যেভাবে চিনলেন, তার থেকে অন্যতর এক বৈশিষ্ট্যে তিনি চিনলেন ভীমকে।

বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠির যখন বিদুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কুরুসভায় পাশা খেলতে এলেন, তখন যুধিষ্ঠির কোনও ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেননি, এবং ভীমও আগ বাড়িয়ে তাঁকে একটিও উপদেশ দেননি। এমনকী যুধিষ্ঠির যখন ভীমকে বাজি রাখলেন তখনও যুধিষ্ঠিরকে তিনি একটুও অতিক্রম করেননি। ভীমকে বাজি রাখার সময় পণ হিসেবে ভীম যে কতটা মূল্যবান, তার একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বলছেন—ভীম এই পঞ্চপাণ্ডবের নেতা, আমাদের সমস্ত যুদ্ধেও তিনি নেতা। ইন্দ্র যেমন একা সমস্ত দৈত্য-দানবের সঙ্গে লড়াই করতে পারেন, এই আমাদের ভীমও তেমনি। সিংহের মতো তাঁর কাঁধ-জোড়া, হাতে ওই ভারী গদা, ওঁর সমান বীর নেই এই ত্রিভুবনে। হ্যাঁ, ভীম তাকান একটু তেরছাভাবে এবং সব সময়ই তিনি ক্ষেপে থাকেন—সদাত্যমর্ষী।

এই অতিসংক্ষিপ্ত পণ-গুণবর্ণনার মধ্যেও যুধিষ্ঠির এটা বুঝেছিলেন যে, ভীমকে কোনও ভাবেই বাজি রাখা উচিত নয়—অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন দিব্যামি। তা ছাড়া ভীমকে অত রাগী জেনেও যুধিষ্ঠিরের কিন্তু এমন কোনও অবিশ্বাস ছিল না ভীমের ওপর যে, ওই পণ রাখার মুহূর্তে ভীম তাঁকে অতিক্রম করবেন। অতিক্রম করেনওনি, কারণ নিজের জন্য তিনি সামান্যই ভাবেন। গায়ে অসীম শক্তি, অতএব যে অবস্থাতেই পড়ুন, তিনি নিজের জন্য ভাবেন না। এমনকী দ্রৌপদীকে পণ রাখার সময়েও তিনি কিছু বলেননি। কারণ, যে যুধিষ্ঠির নিজের কাছেই নিজে করুণার পাত্র—তিনি তো নিজেকেই হেরে বসে আছেন—সেই যুধিষ্ঠিরকেই বা বলে কী লাভ ? ভীম কিছুই বলেননি।

কিন্তু একসময় দুর্যোধন, কর্ণ এবং দুঃশাসনের ঔদ্ধত্য অত্যন্ত বেড়ে গেল। পাণ্ডব-কুলের রাজবধূকে নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ করলেন। তাঁদের একজন দ্রৌপদীকে কুরুসভায় টেনে আনতে বলছেন। অন্যজন তাঁর বস্ত্র কেড়ে নেবার সুপরামর্শ দিচ্ছেন। আর আরেকজন তাঁর বস্ত্র উন্মোচন করা আরম্ভ করলেন সবার সামনে। একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী রাগে, দুঃখে, অপমানে যখন জর্জরিত, কুরুসভার বৃদ্ধরা যখন লজ্জায় মাথা তুলতে পারছেন না, এবং পাণ্ডবভাইরা যখন দ্রৌপদীর কোপ-কটাক্ষে ভস্মীভূত হচ্ছেন—তখন যে-কজন লোকের মুখ দিয়ে কথা বেরনো উচিত ছিল অথবা কথা বেরলে হয়তো কাজ হত, তাঁদের মধ্যে তিনজনকে আমরা চিহ্নিত করতে চাই। এক ভীষ্ম, দুই ধৃতরাষ্ট্র এবং তৃতীয়—খানিকটা নিরুপায় হলেও, যুধিষ্ঠির। কেন, তার কারণ বলতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত হবে।

কিন্তু এই তিন জনের কেউই যখন রা' কাড়লেন না, তখন একমাত্র যাঁর মুখ দিয়ে একরাশ কথা বেরিয়ে এল, তিনি ভীম। কথাগুলির মধ্যে যে খুব যুক্তির তীব্রতা ছিল, তা মোটেই নয়, ছিল না কোনও রাজনৈতিক মাহাত্ম্যও। এমনকী যুধিষ্ঠির পাণ্ডবভাইদের নিয়ে যেভাবে পণের জালে জড়িয়ে পড়লেন, তার মধ্যে থেকে বেরতে গেলে যে ধরনের যুক্তিসিদ্ধি থাকা দরকার, সে সিদ্ধিও তাঁর কথার মধ্যে ছিল না। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে কখনও কখনও যেমন যুক্তি-তর্কের থেকেও পেশিপ্রদর্শন কার্যকরী হয়ে পড়ে—বিশেষত অন্য উপায় না থাকলে—ভীম সেই কাজটিই করলেন। যাঁরা বলেন, ভীমের বুদ্ধি বড় মোটা দাগের, তাঁদের জানাতে চাই—দ্রৌপদী যে শেষ পর্যন্ত তাঁর অপমান-জাল থেকে মুক্ত হলেন, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিলেন ভীম। ভীম যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই সূত্র ধরে অনেক কথা এসেছে কুরুসভায়। তার ওপরে এখনকার গণতন্ত্রেও যেমন রাজনৈতিকভাবে কার্য-সিদ্ধি না হলে পিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়, ঠিক তেমন করেই ভীমের মাধ্যমে আমরা একটা 'ক্রুড়' ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ দেখতে পাই। সে মুহূর্তে রাজনৈতিক দিক দিয়েও এই পেশিপ্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

দুঃশাসনের বস্ত্র-হরণের দুরাগ্রহ যখন চরমে পৌঁছল, তখন ভীম কিন্তু কুরুসভার কাউকে কিছুটি বললেন না। শুধু বড়ভাই যুধিষ্ঠিরকে এক হাত নিলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরের থেকে মাত্র এক বছরের ছোট। কিন্তু তবুও যুধিষ্ঠিরকে কোনওদিন তিনি লঙ্ঘন করেননি। কিন্তু আজ এই পাণ্ডববধূর চরম অপমানের মুহূর্তে ভীম আর থাকতে পারলেন না। বললেন—দাদা! বদমাশ লোকেরা বেশ্যা রমণীকেও কখনও বাজি রাখে না। তুমি রাজ্য-সম্পদ, হাতী-ঘোড়া বাজি রেখেছ এবং হেরেছ, তাতে আমার রাগ হয়নি একটুও। তুমি আমাদের বাজি রেখে হেরেছ, নিজেকে হেরেছ, তাতেও আমার কিছু বলার নেই। কারণ তুমি আমাদের সবারই অধিকারী। কিন্তু দ্রৌপদীকে বাজি রেখে তুমি নিজের অধিকারকেই অতিক্রম করেছ—ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে।

ভাবটা এই, দ্রৌপদী শুধু তোমার একার স্ত্রী নন। আমার স্ত্রীকে তুমি বাজি রাখ কোন অধিকারে ? ভীম এতই রেগে গিয়েছিলেন যে অনুজ সহদেবকে তিনি আগুন নিয়ে আসার 'অর্ডার' দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলাার হাতটি পুড়িয়ে দেবার জন্য। ঠিক এই মুহূর্তে 'রিফাইনড' ক্ষাত্র-শক্তির প্রতীক অর্জুনের হস্তক্ষেপে 'ক্রুড' ক্ষাত্র-শক্তির প্রতিরূপ ভীম নিবারিত হন। শত্রুপক্ষের সামনে এটা যে অত্যন্ত লোক-হাসানো ব্যাপার হয়ে যাবে এবং সবার সামনে ধার্মিক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অপমান করা যে উচিত নয়—এটা ভীমকে বুঝতে বাধ্য করেন অর্জুন।

অর্জুন তাঁর পরিশীলিত বুদ্ধিতে ভীমকে বুঝিয়ে ছাড়েন যে, যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসারেই আহূত হয়ে পাশা খেলতে আসেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তঞ্চকতা করা হয়েছে কপট-পাশার বাজিতে। ভীম শান্ত হন। অর্থাৎ অর্জুন কিন্তু 'ক্রুড়' ক্ষাত্রশক্তিকে শুধুমাত্র একটু মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেন শত্রুপক্ষের দিকে। সে কথায় আবার পরে আসছি।

যাই হোক, ভীমের কথার সূত্র ধরে দ্রৌপদীকে প্রথম লজ্জামুক্ত করার চেষ্টা করেন দুর্যোধনেরই ছোট ভাই বিকর্ণ। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা কর্ণের দাপটে এবং বক্তৃতায় দাঁড়াতে পারেনি। দুঃশাসন নির্লজ্জভাবে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ আরম্ভ করলেন। তারপর দ্রৌপদীর আর্তি, কাতরতা এবং সৌভাগ্যে অত্যন্ত অলৌকিকভাবে এই বস্ত্রমোচন বন্ধ হল। কুরুসভার সাধারণ রাজমণ্ডলীর মধ্য থেকে ধিক্কারধ্বনি উঠল কৌরবদের বিরুদ্ধেই। দ্রৌপদীর অসহায় অবস্থা দেখে অনেক আগে থেকেই ভীম দাঁতে দাঁত ঘষছিলেন এবং হাতে হাত নিষ্পেষণ করছিলেন ক্রোধে, অপমানে। কিন্তু সমবেত রাজমণ্ডলীর ওই অনুকূল ধিক্কার কাজে লাগিয়ে ভীম বলে উঠলেন—ক্ষত্রিয় রাজারা সব শুনুন মন দিয়ে। এমন কথা আগে কেউ বলেনি, ভবিষ্যতেও কেউ বলবে না। আর আমি যা বলছি, তা যদি আমি না করতে পারি, তবে জানবেন, আমি আমার বাপ-ঠাকুরদার ছেলে নই—পিতামহানাং পূর্বেষাং নাহং গতিমবাপ্নুয়াম্। বাংলার 'ইডিয়মে' কথাটার যেমন অনুবাদ হওয়া উচিত, তাই করলাম।

ভীম বললেন—আমি যদি যুদ্ধে এই ভরত-বংশের কলঙ্ক পাপী দুঃশাসনটার বুক চিরে রক্ত না খাই, তবে যেন আমি বাপ-ঠাকুরদার পথে না যেতে পারি। ভীমের এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে কুরুসভার সর্বত্র ধিক্কার শব্দ উচ্চতর হয়েছে। বিদুর দ্রৌপদীর পক্ষ নিয়েছেন কর্ণ-দুর্যোধনদের কঠোর প্রতিপক্ষতায়, ভীমের আস্ফালন, রাজমণ্ডলীর ধিক্কার এবং বিদুরের প্রতিবাদ—এই তিনটি বিরুদ্ধতার নিরিখে কর্ণ-দুর্যোধনেরা দ্রৌপদীকে কিন্তু সবার সামনে আর অপমান করার সাহস দেখাননি। কর্ণ দুঃশাসনকে প্রায় কানে কানে বলেছেন—ঝি-টাকে ঘরে নিয়ে যাও দুঃশাসন—কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয়।

দুঃশাসন আবারও দ্রৌপদীকে টানাটানি আরম্ভ করলে, দ্রৌপদী এবার নিজেই বাধা দিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন কুরুসভার বৃদ্ধ মন্ত্রীদের। যুধিষ্ঠির নিজেকে হেরে গিয়েও তাঁকে বাজি রাখতে পারেন কি না—এই প্রশ্নের বৈধতা নিয়ে দ্রৌপদী কুরুসভার বিশাল কক্ষকে উত্তাল করে দিয়েছেন। মহামতি ভীষ্ম প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে নিজের ঝামেলা ছেড়ে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের ওপর।

ভীষ্মের এই দ্বৈধভাবের সুযোগ নিয়েছেন দুর্যোধন। তিনি বলেছেন—হ্যাঁ, বলুন না যুধিষ্ঠির, বলুন তিনি। শুধু যুধিষ্ঠির কেন, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—দ্রৌপদীর সব স্বামীরাই বলুন—আমরা যুধিষ্ঠিরের রাখা পণেই তাঁকে জিতেছি কিনা? দুর্যোধন খুব ভালভাবেই জানতেন—যুধিষ্ঠির তাঁর ধর্মত্যাগ করে মিথ্যাভাষী হবেন না। এমনকী ভীম-অর্জুনরাও যে যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করে তাঁর অপমান করবেন না, সেটাও দুর্যোধন জানতেন। কিন্তু নীতিগত দিক দিয়ে কথার দাম অথবা এই সত্য ছাড়াও আরও এক মানবিক সত্য যে জীবনের ক্ষেত্রে থেকে যায়—সে কথাটা যুধিষ্ঠির অথবা অর্জুনের মতো লোকেরা না বললেও ভীম সেই কথাটাই ধরে বসলেন।

যুধিষ্ঠিরের পণ অথবা সত্যের ধার দিয়েও ভীম গেলেন না। তাঁর ভাবটা এই—হ্যাঁ, দ্রৌপদীকে না হয় বাজিতে হেরেছেন যুধিষ্ঠির, কিন্তু তাই বলে একটি বিবাহিতা রমণীর নারীত্ব নিয়ে সবার সামনে ছিনিমিনি খেলবি তোরা? এখানে সত্য-ফত্য বৃথা, তোরা যেমন লোক, তোদের দরকার শুধু বেদম পেটানি। যুধিষ্ঠির যে সভ্যতায় সত্যরক্ষা করেছেন, সেই সভ্যতার বোধ তোদের থাকলে পাণ্ডবের কুলবধূকে তোরা অন্য মর্যাদায় দেখতিস। ভীমের ভাবটা এই। মনে আছে নিশ্চয়ই, একটু আগেই অর্জুন তাঁর কথার মোচড়ে ভীমের রাগ যুধিষ্ঠিরের ওপর থেকে শত্রুপক্ষের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ভীম কিন্তু সেই মোচড়েই কথা বলছেন।

দুর্যোধনের কথার উত্তরে কেউ একটি কথাও বললেন না। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, সবাই চুপ করে বসে

আছেন। কৌরবদের হর্ষ-বৃদ্ধি হচ্ছে। এবার সমস্ত শব্দ থেমে গেলে ভীম উঠে দাঁড়ালেন। উঁচু করে ধরলেন তাঁর চন্দন-চর্চিত দীর্ঘ বাহু—আদিম দণ্ডের প্রতীক। বললেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদের গুরুর মতো। তিনি যদি পাণ্ডবকুলের প্রভু না হতেন, তাহলে আজ এই অপমান আমরা কোনওভাবেই সহ্য করতাম না—ন প্রভুঃ স্যাৎ কুলস্যাস্য ন বয়ং মর্ষয়েমহি। ভীম আরও বললেন—ধর্মরাজ যদি নিজেকে পরাজিত মনে করেন, তবে নিশ্চয় আমরাও পরাজিতই বটে। তবে হ্যাঁ, আমার যদি কোনও প্রভুত্ব থাকত, তাহলে দ্রৌপদীর চুলে হাত দিয়ে এখনও কোনও ব্যাটা বেঁচে থাকত না এখানে—ন হি মুচ্যেত স জীবন্ পদা ভূমিম্ উপস্পৃশন্।

এই যে নিরুপায় এক অবস্থা—যে অবস্থায় আইন বা নীতিগতভাবে কিছু করা যাচ্ছে না, অথচ অন্যায়টা রুখতে হবে—এ অবস্থায় ভয় দেখানোটাই সব চেয়ে বড় নীতি। ভীম দুটো কথা বলেছেন খুব বুদ্ধি করে। এক, ধর্মরাজ যদি নিজেকে পরাজিত মনে করেন, অর্থাৎ ভীম আশা করছেন—যদি একবারও যুধিষ্ঠির বলতেন—এটা কি কোনও পাশা-খেলা হল ? তোমরা বলেছিলে—সুহৃদ্-দ্যূত অর্থাৎ আপোসে মজায় খেলা হবে। তা এ তো দেখছি চরম কপটতা। এমনকী জোর করে আমাকে দিয়ে বাজি রাখিয়েছ ?—এসব কথা যদি একবারও বলতেন যুধিষ্ঠির, তাহলে আর ভীমকে আটকায় কে ? দুই, ভীম বলেছেন—'যদি আমার প্রভুত্ব থাকত' অর্থাৎ এর মধ্যে অর্জুনের সেই মোচড়টাও রয়েছে অর্থাৎ আমি ধর্মরাজকে অতিক্রম করছি না। আবার চরম ভয় দেখাতেও ছাড়ছি না।

নিরুপায় অবস্থায় একটা 'কন্ডিশন' দিয়ে ভয় দেখানোটা একটা 'আর্টে'র মধ্যে পড়ে। আমি একজনকে বলতে শুনেছিলাম—নেহাত আপনি বলে ছেড়ে দিলাম। অন্য কেউ এ কাজ করলে আমি তাকে শুয়োরের বাচ্চা বলতাম। ভীমের কায়দাও প্রায় এই রকম। ভীম বলছেন—আমি ধর্মরাজকে অতিক্রম করছি না বটে, তবে এই হাত দুটো শুধু দেখে রাখ। মুগুর দেখেছিস তো, এও তাই—পশ্যধ্বং বিপুলো বৃত্তৌ ভুজৌ মে পরিঘাবিব। এই হাত দুটোর মাঝখানে পড়লে দেবরাজ ইন্দ্রের বাবারও ক্ষমতা নেই যে, বেরিয়ে যাবে। যুধিষ্ঠির একবার চোখের পলকে ইঙ্গিত করুন আমাকে, আমি ধৃতরাষ্ট্রের এই বদমাশ ছেলেগুলোকে শুধু এই হাতের থাবড়া মেরে পিষে দেব—ধার্তরাষ্ট্রান্ ইমান্ পাপান্ নিষ্পিষেয়ং তলাসিভিঃ।

এই ভয় দেখানোর ফল কতটা হয়েছিল, পরে বলছি। যুধিষ্ঠির যেহেতু চুপ করেই থাকলেন, তাই কর্ণ-দুর্যোধনদের কথার মাত্রা যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই একটু চড়ে গেল। দুর্যোধন তো অতিরসে নিজের উরুটাই দ্রৌপদীকে দেখিয়ে কদর্য ইঙ্গিত করলেন। আর যায় কোথা ? ভীমের চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। গলার জোরে সভা কাঁপিয়ে ভীম বললেন—শুনে রাখুন রাজারা সব। যুদ্ধ যেদিন লাগবে, সেদিন ওই উরু যদি আমি গদার বাড়িতে ভেঙে গুঁড়িয়ে না দিই তবে আমি বাপ-ঠাকুরদার বংশে জন্মাইনি।

ভীমের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুসভার মধ্যে ভয়ের বাতাস ঢুকে গেল। মহামতি বিদুর চেঁচিয়ে বললেন—বড় ভয়ের কথা, রাজারা সব। ভীম যা বললেন, বড়ই ভয়ের কারণ ঘটল তাতে—পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ। ভাল করে বুঝুন সবাই। ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে কুরুদের মাথার ওপর। বিদুর কৌরবদের উদ্দেশে বললেন—এ তো পাশা নয়, অতি-পাশার ফল—অতিদ্যূতং কৃতমিদং ধার্তরাষ্ট্রা—তোমাদের সব যাবে। তোমরা আজ রাজসভার মাঝখানে স্ত্রীলোক নিয়ে কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করেছ, তোমাদের সব যাবে—যস্মাৎ স্ত্রিয়ং বিবদধ্বং সভায়াম্।

বিদুরের এই আক্ষেপ-ভাষণের পর কুরুসভায় নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা গেল। শেয়ালের ডাক, গাধার ডাক—এইসব দুর্নিমিত্তের ছবি এঁকে মহাভারতের কবি সেকালের বিশ্বাসকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করলেও আমরা বেশ জানি—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গাধা-শেয়ালের ডাকের থেকেও ভীমের ডাকের মূল্য দিয়েছেন বেশি। ধৃতরাষ্ট্র নিজে ভীমকে ভয় পেতেন এবং আজ যখন পরম ক্রোধাবেশে ভীম চরম দুটি প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন অপিচ বিদুরও যখন ভীমের ভয় দেখালেন, তখন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে একেবারে 'অ্যাব্রাপ্‌টলি' দ্রৌপদীকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। নিজে যেচে বর

দিয়ে দ্রৌপদীকে অথবা পাণ্ডবদের মুক্ত করে দিয়েও তাঁর ভয় যায়নি, তিনি আরও বর দিতে চেয়েছেন, যাতে পাণ্ডবদের বিশেষত ভীমের গভীর অসন্তোষ দূরীভূত হয়।

ভীমের অসন্তোষ দূর হয়নি। অন্তরের অন্তরে তাঁর প্রিয়া পত্নীর অপমানের জ্বালা তুষের মতো জ্বলতে লাগল—খিদত্যেষ মহাবাহুরন্তর্দাহেন বীর্যবান্। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র কুরুসভার উত্তাপ বুঝে সাময়িকভাবে পাণ্ডবদের মুক্তি দিলেও ছেলের চাপে যুধিষ্ঠিরকে আবার পাশা খেলতে বাধ্য করেছেন। অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে ধৃতরাষ্ট্র আবারও শকুনিকে ব্যবহার করেছেন এবং বারো বচ্ছরের বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাত বাসের পণ চাপিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডবদের ওপর। নিশ্চুপে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যায়নি। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমবার পাণ্ডবদের মুক্তি দেওয়ার পর কর্ণের সঙ্গে ভীমের কথা কাটাকাটি হয়। কারণ ভীম উত্তর না দিয়ে থাকেন না। থাকতে পারেন না। যখন পাণ্ডবরা মৃগচর্ম পরে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আবার দুঃশাসনের সঙ্গে ভীমের গরম গরম উতোর-চাপান আরম্ভ হল।

দুঃশাসন অত্যন্ত অভদ্রভাবে পাণ্ডবদের নীচতা এবং দারিদ্র্য ঘোষণা করে দ্রৌপদীকে সুপরামর্শ দিয়েছেন কৌরবদের কাউকে স্বামিত্বে বরণ করার জন্য। অন্য কেউ এ কথার উত্তর দেননি। কিন্তু ভীম এসব কথা সহ্য করতে পারেন না। তিনি বলেছেন—আজকে শকুনির কপট-বিদ্যায় পাশায় জিতে আমার মর্মছেড়া কথাগুলি বলতে তোর মুখে বাধল না।' কিন্তু যেদিন যুদ্ধে তোর মর্ম ছিঁড়ে দেব আক্ষরিক অর্থে, সেদিন তোকে এই কথাগুলিই স্মরণ করিয়ে দেব—তথা স্মারয়িতা তে'হং কৃন্তমর্মাণি সংযুগে। সেদিন যারা তোকে বাঁচাতে আসবে, তাদের সবার সঙ্গে আমি তোর বাস করার জায়গা বানিয়ে দেব যমের বাড়িতে।

দুঃশাসন থামেননি। তাঁর ভাব—পরাজিত ব্যক্তির মুখে কথা সাজে না কোনও। দুঃশাসন কুরুসভার মধ্যে ভীমকে 'গরু গরু' বলে ডাকতে লাগলেন। স্বয়ং দুর্যোধন ভীমের হাঁটা-চলা নকল করে ভাইদের মধ্যে নতুন হাস্যরসের অবতারণা করলেন। বস্তুত ভীম যেহেতু অতি সরল, তাই তাঁর কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে ফেলতেন। এটা বুদ্ধির অভাব যতটা, অভ্যাস তার থেকে বেশি। কর্ণের সঙ্গে যখন ভীমের কথা কাটাকাটি হয়, তখন অর্জুন পই-পই করে ভীমকে বলেছিলেন—দাদা, নীচ লোকের সঙ্গে কথা বোলো না, নোংরা কথার উত্তর দিয়ো না। আমরা যা করব বা যা আমাদের করা উচিত, তা আমরা করেই দেখাব এবং আমরা জানি কী করতে হবে—ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে দ্রষ্টারো যদ্ ভবিষ্যতি।

কিন্তু ভীম থাকতে পারেননি। কথায় কথা বেড়েছে। দুঃশাসনরা তাঁকে যা-তা অপমান করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর শরীর বিশাল বলে তাঁর চলাফেরার ভঙ্গি অনুকরণ করে দুর্যোধন ভীমকে চরম অপমান করলেন। দুঃশাসন তাঁকে নেচে নেচে চেঁচিয়ে ডাকলেন 'গরু-গরু' বলে। অথচ সেইমুহূর্তে মারামারি করার মতো যথেষ্ট কারণও ছিল না, যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়নি। ফলত ভীম শুধু একই কথা বারবার বলে যেতে লাগলেন—লাগুক যুদ্ধ। দুঃশাসনের রক্ত যদি না খাই, দুর্যোধনের উরু যদি না ভাঙি, তো আমার নাম ভীম নয়। দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ—এই দুষ্ট-চতুষ্টয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে কে মারবেন, কীভাবে মারবেন—তার একটা ছক শুনিয়ে দিয়ে ভীম শুধু বিশাল, পেশিবহুল, দর্পিত হাত দুটি দেখাতে দেখাতে বনের পথে চললেন। ইঙ্গিত করে গেলেন—তেরো বছরের শেষে যে মহাযুদ্ধ লাগবে, সেদিন শুধু এই হাতের খেলা দেখবি। প্রতিজ্ঞা করে গেলেন—দুর্যোধন। তোকে যেদিন গদার বাড়িতে মাটিতে ফেলে আমার পায়ের তলা দিয়ে ঘষব তোর মাথা, সেদিন তোর এত কথা আর নাচন-কোঁদন কোথায় থাকে, দেখব?

ভীমের এত প্রতিজ্ঞা—যে প্রতিজ্ঞাগুলিকে তাঁর নিরুপায় মুহূর্তগুলিতে অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষা বলে মনে হতে পারে—কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাগুলিই তাঁর বনবাসের বহমান কালটুকুকে সহনীয় করে তুলেছিল।

যুধিষ্ঠির-শকুনির দ্যূতক্রীড়া দ্রৌপদীর কাছে যত অভিশাপের মতোই নেমে আসুক, কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে এই দ্যূতক্রীড়ার আবিষ্কার হলেন ভীম। তাঁর এই মধ্যম-স্বামীটিকে তিনি রাগী বলে জানতেন—সেটা বড় কথা নয় ; কিন্তু যে স্বামীদের, বিশেষত যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনকে তিনি যত ন্যায়পরায়ণ বলে জানতেন, ওই দ্যূতসভার পরিসরে চরম অপমান এবং লজ্জার মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের যথার্থতা অথবা ন্যায়পরায়ণতার মাহাত্ম্যে দ্রৌপদীর কাছে ধরা দেননি।

অথচ কী আশ্চর্য, বিদগ্ধা রমণীর অভিমান-মঞ্চ থেকে যে স্বামীটিকে তাঁর শুধুই রুক্ষ, ক্রোধী এবং সরল বলে মনে হত, দ্রৌপদী সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন যে, সেই ভীমের অসহিষ্ণুতা শুধু যুদ্ধ অথবা শত্রুশাতনে নয়, প্রেমেও তাঁর একই রকম অসহিষ্ণুতা আছে। দ্রৌপদী বুঝলেন—ভীম তাঁর কাছে বিকিয়েই আছেন। নইলে দেখুন, নীতির দোহাই, আইনের দোহাই এবং সর্বোপরি সত্যের দোহাই নিয়ে যে ধর্মরাজ স্বামী অথবা নীতিপরায়ণ অর্জুন দ্রৌপদীর অপমানে চুপটি করে বসে থাকলেন, সেখানে অসঙ্গত জেনেও, যথেষ্ট নীতিসিদ্ধ নয় জেনেও ভীম তো বসে থাকতে পারলেন না। অন্তত দ্রৌপদীর ওই চরম লজ্জার মুহূর্তে ভীমের ওই আইন-বহির্ভূত অনীতির শব্দরাশি একদিকে যেমন দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনদের পরোক্ষে ভয় দেখিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে আরও পরোক্ষভাবে এক বিদগ্ধা রমণীর চোখ খুলে দিয়েছে—ভীম তাঁকে অতিশয় ভালবাসেন।

এই অসহিষ্ণু ভীমের ভালবাসা, যা বার বার অন্য পাণ্ডবদের ছাপিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল, সেই ভালবাসার উত্তরে দ্রৌপদীও তাঁকে ভালবাসা দিয়েছেন কিনা, সে প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না, কারণ তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য আমাদের সময় দিতে হবে আরও। তবে দ্রৌপদী যে ভীমকে তাঁর চিরভক্তের মতো আবিষ্কার করলেন—এটা নিশ্চয়ই দ্যূতসভার চরম অভিজ্ঞতার মধ্যেও তাঁকে আনন্দ দিয়েছে। যদিও পঞ্চস্বামীর মধ্যে একতম ভীমের প্রতি ব্যবহারেও তিনি এতটাই বিদগ্ধা যে, তিনি ভীমকে আলাদা করে তাঁর আবিষ্কারের রহস্যটা মোটেই বুঝতে দেননি। নইলে দেখুন, বনবাসের প্রথম লগ্নেই যখন কৃষ্ণ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন, তখন ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে নিজের অপমানের কথা বলবার সময় দ্রৌপদী অর্জুনকে যেমন ধিক্কার দিয়েছেন, তেমনই ধিক্কার দিয়েছেন ভীমকে—ধিগ্‌বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য গাণ্ডীবম্। অথচ সেই অপমানের সময় অর্জুন তাঁর জন্য কিছুই করেননি, অথচ ভীম করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন তীব্রস্বরে, ভয় দেখিয়েছেন এবং যুধিষ্ঠিরের একটি আদেশ-বাক্যের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছেন। তাতে কাজও হয়েছে অনেক। কিন্তু দ্রৌপদী ভীমের সেই আর্তির মূল্য দেননি। তাঁকে সমান জায়গায় মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্তরের নায়ক অর্জুনের সঙ্গে। তার মানে—অর্জুন যা করেননি, ভীম তা করেছেন—এটা স্বীকার করে নিতে যেন দ্রৌপদীর ইচ্ছে করে না। অথচ এই মহানুভব বীর শুধু দ্রৌপদীর ওপর ভালবাসায় কৌরবদের শত মুখরতা সহ্য করেও তাঁর প্রিয়তমার কাছে কোনও মূল্য পেলেন না।

থাক সে কথা। বনবাসের রুক্ষ-শুষ্ক দিনগুলি দ্রৌপদীর কাছে মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। বিশেষত বিনা কারণে দুর্যোধন-শকুনির চক্রান্ত তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছিল। দ্রৌপদী আর থাকতে পারলেন না। সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় অন্যান্য পাণ্ডবস্বামীদের সঙ্গে বসে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরও সামনেই বসে। দ্রৌপদী আস্তে আস্তে কথাটা তুললেন। প্রথমে ভালভাবে, তারপর অল্প রেগে, তারপর বেশি রেগে। প্রথম দিকে তাঁর বক্তব্য রচিত হয়েছিল স্বামীদের জন্য ভাবনায়। অর্থাৎ এই যে ভীম-অর্জুনের মতো বীরেরা, যাঁরা অন্য রাজাদের কাছে যমের মতো, তাঁরা সব এখানে এসে বনের ফল কুড়োচ্ছেন, লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের বাকল জোগাড় করছেন—এও কি সহ্য করা যায় ? নাকি যে যুধিষ্ঠির আগে রাজা হয়ে হেমপীঠে পা রেখে অন্য রাজাদের প্রণাম গ্রহণ করতেন, তাঁকে এই উদ্‌ভ্রান্ত বনবাসীর বেশ মানায় ?

এসব কথা থেকে রাজনীতির কথা এল এবং রাজনীতির কথায় দ্রৌপদী বেশ প্রমাণ করে দিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা বলে কোনও জিনিস নেই। নিজের সত্য-নিষ্ঠার বাড়াবাড়িতে

তিনি যে স্ত্রী এবং বশম্বদ ভাইদের যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছেন—সে-কথা বলতেও দ্রৌপদীর দ্বিধা হল না। যুধিষ্ঠিরও কিছু কম যান না। নরমে-গরমে তিনি দ্রৌপদীকে এক হাত নিলেন এবং বলে দিলেন—দরকার থাকে তো অন্য ভাইরা দ্রৌপদীকে নিয়ে রাজ্য অধিকার করার চেষ্টা করুক, আমাকে তোমরা একা থাকতে দাও। কথা কাটাকাটির চরম মুহূর্তে তখনকার দিনের ভীষণ গালাগালি 'নাস্তিকে'র সংজ্ঞাতেও দ্রৌপদীকে চিহ্নিত করলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু দ্রৌপদী তো কিছু কম যান না। তিনি 'পণ্ডিতা মনস্বিনী'। অতএব যখন একে একে রাজনীতি শাস্ত্রের সারকথাগুলি তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, তখন যুধিষ্ঠির একটু থমকেই গেলেন।

ঠিক এই অবস্থায় দ্রৌপদীর সঙ্গে সুর মেলালেন ভীমসেন। এতক্ষণ যা উতোর-চাপান চলছিল, তাতে অর্জুন, নকুল, সহদেব—সবাই চুপ করে বসেছিলেন। কিন্তু সবাই চুপ করে থাকলেও তো ভীম চুপ করে থাকবেন না। দ্রৌপদীকে যে তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসেন। দ্রৌপদীর অপমান হলে তাঁর শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ থাকে না। দুঃশাসন-দুর্যোধনের অসভ্যতায় তিনি যেমন রক্তপান বা উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তেমনই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলার হাতটিও তিনি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজ আবার যখন যুধিষ্ঠিরের পরুষ তর্কে দ্রৌপদী যৎকিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত, তখন আবারও তাঁর রাগ হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের ওপর—ক্রুদ্ধো রাজানমব্রবীৎ।

ভীম বললেন—এই বনবাসে এসে আমাদের কোন লাভটা হচ্ছে শুনি ? ধর্ম, অর্থ, কাম—কোনটা পাচ্ছি এই বনবাসে ? আপনি তো দুর্যোধনের সঙ্গে খুব ধর্ম করলেন, কিন্তু দুর্যোধন কি আমাদের রাজ্যটা ধর্ম দিয়ে জিতেছে ? শেয়াল যেরকম সিংহের খাবার নিয়ে যায় চোরি-চোরি, কুত্তা যেমন সবলের খাদ্য চুপিসারে নিয়ে যায়, আপনার বেখেয়ালে আমাদের রাজ্যটা সেইভাবেই আমরা খুইয়েছি দুর্যোধনের কাছে। আপনার শাস্তর্ শুনে আমরা নিজেদের আটকে রেখেছিলাম বলে—আত্মানং ভবতাং শাস্ত্রৈর্নিয়ম্য ভরতর্ষভ—আমাদের কী হল জানেন—নুলো মানুষের হাত থেকে লোকে যেমন এটা-ওটা নিয়ে যায়, ল্যাংড়া লোকের হাতে গরু থাকলে যেমন সে গরু লোকে টেনে নিয়ে যায়—আপনার শাস্ত্র শুনে আমরাও তেমন ল্যাংড়া আর নুলো হয়ে রইলাম। আমাদের সব গেল—হৃতমৈশ্বর্যম্ অস্মাকং জীবতাং ভবতঃ কৃতে।

দ্রৌপদী যেভাবে জ্যেষ্ঠস্বামীকে দুষলেন, ভীমও একইভাবে দুষলেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে। রাজনীতির বাচস্পত্যও ভীম কম জানতেন না। তাঁর মতে শুধু ধর্ম নয়—তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেছ, অতএব অর্থ-কাম, প্রজাপালন, আপন স্বার্থ—সেও তোমাকে বুঝতে হবে। যদি না বোঝো তাহলে আর রাজা হয়ো না, মুনি-ঋষিদের মতো বনে বসে মোক্ষ-সাধনা কর। বাঁকা-চোরা নানা কথা বলে ভীম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কীভাবে হৃত রাজ্য উদ্ধার করা যায়, সেই পরামর্শ দিলেন। কড়া করে বললেন—আপনি এটা ভাববেন না যে, আপনি দুর্বলের মতো বনবাসের ব্রতচর্যা গ্রহণ করেছেন, সে কাজ কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন, নকুল কিংবা সহদেব অথবা আমি কোনও ভাবেও সমর্থন করি। আপনি পুরোদমে যুদ্ধ আরম্ভ করুন। মনে রাখবেন, অর্জুনের গাণ্ডীব দিয়ে যে বাণগুলি বেরয়, সেগুলি সহ্য করার ক্ষমতা কারও নেই। আর আমার কথা বলি—পৃথিবীতে এমন কোনও বীর অথবা কোনও হাতিও জন্মায়নি যে ক্রুদ্ধ ভীমের গদার বেগ সহ্য করতে পারে। আমি বলি—আমাদের ওপর ভরসা রেখে আজই চলুন হস্তিনাপুরে—অদ্যৈব গজসাহ্বয়ম্।

ভীমের কথায় যুধিষ্ঠির একটু রেগেই গেলেন, যদিও রাগটা প্রকাশ করলেন নিজেকেই আরও হেয় করে। যুধিষ্ঠির বললেন—তখন বললেই পারতে। ক্ষত্রিয়ের নিয়ম মেনে পাশা খেলতে গিয়েছিলাম। কই তখন তো বাপু কিচ্ছুটি বলোনি। আগে কোনও কথা না বলে, এখন আমাকে সত্য থেকে সরে আসতে বলছ, এ কি ভদ্রলোকের কথা ? যুধিষ্ঠির ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি যখন আগুন দিয়ে আমার হাত পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে, তখন কেবল অর্জুন তোমাকে বারণ করেছিল। কিন্তু তুমি যদি সেদিন ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলতে, অর্থাৎ নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে সবাইকে মেরে ধরে ঠাণ্ডা করে দিতে, তাহলে, আজকে কিছুই ঝামেলা হত না—কিং দুষ্কৃতং ভীম তদাভবিষ্যৎ।

ভীমের হঠাৎ ক্রোধ, তাঁর শারীরিক শক্তি, তাঁর বাঁধ-ভাঙা উৎসাহ—এগুলির প্রতি যুধিষ্ঠিরের কটাক্ষ যতই থাকুক, তিনি কিন্তু দ্রৌপদীর কথাটা ফেলতে পারলেন না। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকের স্ত্রী যেহেতু, তাই আগ বাড়িয়ে তাঁর কথাটা যিনিই বলবেন সেই স্বামীর দিক থেকেই পৃথক এক সরসতা প্রকাশ পায়। প্রত্যেকেই সে সরসতা চেপে রেখেছেন, কিন্তু ভীম তা পারেননি। ভীম সজোরে তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন দ্রৌপদীর পক্ষ নিয়ে। শুধু তাই নয়, সমস্ত লজ্জা কাটিয়ে উঠে দ্রৌপদীর জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে মুরুব্বি করতেও তাঁর বাধেনি। দ্রৌপদীর চরম অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা যে জরুরি ছিল এবং সেই প্রতিবাদ করে যে ভীম ঠিক কাজই করেছেন—সেটা যুধিষ্ঠির মেনে নিলেন। বললেন—এক সময় বিষ খেয়ে কতক দিন তার জ্বালা সহ্য করলে যেমন লাগে, যাজ্ঞসেনীর সেই কষ্ট-অপমান দেখে তবুও দুর্যোধনদের যে আমি ক্ষমা করেছি, তার জন্য আমার বিষ-জ্বালা আছে এই বুকে—দূয়ে বিষস্যেব রসং হি পীত্বা। তুমি আর কিছু কাল মাত্র অপেক্ষা করো।

ভীম বললেন—অপেক্ষা ? এই তেরো বছরের অপেক্ষা মানে মূল্যবান এই আয়ুষ্কালের অপচয়। তারপর আর মরতে কত দিন—আয়ুষো'পচয়ং কৃত্বা মরণায়োপনেষ্যতি। এই মুহূর্তে শত্রুদের মেরে রাজ্যের দখল নিন আপনি। যে রাগে আমি জ্বলছি, সে রাগের উত্তাপ আগুনের থেকেও বেশি। দিন যায়, রাত যায় আমি ঘুমতে পর্যন্ত পারি না—ন নক্তং ন দিবা শয়ে। এর থেকে খারাপ বিপদ আর নেই, যাতে আপনার রাজ্য অন্যে কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে। অথচ আপনি বলছেন অপেক্ষা করতে। আপনার এই বুদ্ধি বেদ মুখস্থ করা শ্রোত্রিয় পুরোহিতের মতো বোকা-বোকা। যারা শুধু 'গুরুদেব এই বলেছেন, মনু-বাবা এই বলেছেন—এই বুদ্ধিতে চলেন, তাঁরা আর যাই বুঝুন, করণীয় কার্যের তত্ত্বটিই বোঝেন না—অনুবাকহতা বুদ্ধি র্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী। আমি ভেবে অবাক হই—বামুন-ঠাকুরদের মতো দয়ালু একজন মানুষ আমাদের এই ক্ষত্রিয় বংশে কী করে জন্মাল ? ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে যারা জন্মায়, তাদের বুদ্ধি হয় ক্রূর নৃশংস। এমনকী মনু মহারাজও তাই বলেছেন। অতএব সব ভেবেচিন্তে যুদ্ধের ব্যাপারেই সংকল্প করুন—তস্মাচ্ছত্রুবধে রাজন্ ক্রিয়তাং নিশ্চয়স্ত্বয়া।

বস্তুত বাংলা ভাষায় যে 'ধর তক্তা মার পেরেক' বলে কথাটা আছে, ভীমের নীতিটা প্রায় তাই। রাজনীতির নৈতিক জ্ঞান তাঁর যথেষ্টই আছে, কিন্তু যে 'পোলিটিক্যাল ট্রেনিং' থাকলে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, অথবা কৃষ্ণ হওয়া যায়, সেই 'ট্রেনিং' তাঁর ছিল না। আমরাও তাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ, আমরা দ্রৌপদীর কথা বলছিলাম। ভীমের ভাষণে যুধিষ্ঠিরের নীতি বদলায়নি, সেটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু দ্রৌপদীর দিক থেকে এর মূল্য আছে অনেক। দ্যূতসভায় যে মুখর স্বামীকে তিনি একান্ত পক্ষপাতী বলে আবিষ্কার করেছিলেন, যাঁকে তিনি রমণীয় বিগন্ধতায় অর্জুনের সঙ্গে সমানভাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন, সেই স্বামীটি যে অন্যদের থেকে আলাদা, সেটা ভীমের ভাষণে দৃঢ় হল। অর্জুন, নকুল, সহদেব কেউ নয়, যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ আক্ষরিকভাবে সমর্থন করেছেন একমাত্র ভীম। রমণীর বিচক্ষণতায় দ্রৌপদী বুঝলেন—ভীম অন্য স্বামীদের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালবাসেন। ভাগের বউয়ের গঙ্গা পাওয়ার প্রবাদ নেই বটে, তবে ভীমের মধ্যে তিনি বিশ্বস্ত চিরভক্তটিকে খুঁজে পেলেন।

দ্রৌপদী যে অর্জুনকে অর্থাৎ স্বয়ম্বরসভার সেই মৎস্যচক্ষুভেদী নায়কটিকে মনে মনে বেশি পছন্দ করতেন অথবা তাঁর জন্য যে তাঁর প্রেমিকার অপেক্ষা ছিল, সে-কথা আমি আমার 'অর্জুন' প্রবন্ধে যথাসম্ভব ব্যক্ত করেছি। কিন্তু ভীম কীভাবে দ্রৌপদীকে দেখেন অথবা দ্রৌপদী ভীমকে কী চোখে দেখেন, সেটাও আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে। ভীম-যুধিষ্ঠিরের তর্কাতর্কির অবসান ঘটল ব্যাসদেবের আগমনে। তিনি কৌরবদের যোগ্য প্রতিপক্ষতার জন্য দেবতাদের তুষ্ট করে দিব্য-অস্ত্র জোগাড় করার ওপর জোর দিলেন। অবশ্যই দেবতা এবং মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র বা অন্যান্য দিব্য-অস্ত্র জোগাড় করার ভার পড়ল অর্জুনের ওপর। যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যাসের বলা 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা নিয়ে অর্জুন চলে গেলেন তপস্যায়।

দ্রৌপদী অনেক কাঁদলেন অর্জুনের জন্য। অনেক শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন অর্জুনের সফলতা কামনা করে। অর্জুন চলে গেলেন দ্রৌপদীর হৃদয় শূন্য করে। অর্জুনের জন্য দ্রৌপদী নিজেই এই শূন্যতা ব্যক্ত করেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীর কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভীমও। দ্রৌপদী বলেছিলেন—এই সমস্ত পৃথিবী আজ আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে—শূন্যামিব প্রপশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্। আমি শুধু ভাবি—এসব কথা শুনে যুধিষ্ঠির কি নকুল-সহদেবের যাই প্রতিক্রিয়া হোক, কী ভেবেছিলেন তাঁর সেই চিরভক্ত—ভীমসেন ?

অর্জুন তপস্যা করে অস্ত্র নিয়ে ইন্দ্রসভা থেকে ফিরে আসতে পারছেন না, অতএব বনবাসের বসন্ত-বাহার দ্রৌপদীর কাছে তিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কী বলবো সেই প্রেমের সম্বন্ধে—যেখানে অর্জুনকে ছাড়া দ্রৌপদীর যেহেতু ভাল লাগছে না, অতএব সেটা ভীমেরও ভাল লাগছে না। নিজের ভাল লাগা নয়, তার ভাল লাগছে না বলে ভীমেরও ভাল লাগছে না। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভবিষ্যতে এই প্রেম নিয়ে গান লেখা হয়েছে জানি: ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর কবি এই প্রেমের উত্তরাধিকারে—তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো—লিখবেন, তাও জানি। কিন্তু ভীম মনে-প্রাণে অত 'রোম্যান্টিক' ছিলেন না। অথচ যেই না দ্রৌপদী বললেন, অর্জুনকে ছাড়া ভাল লাগছে না, অমনই ভীমও বললেন—অর্জুনকে ছাড়া, সত্যিই তো, যেন সব অন্ধকার হয়ে গেছে—পশ্যামি চ দিশঃ সর্বা স্তিমিরেণাবৃতা ইব।

অর্জুনকে ভীম কম ভালবাসতেন না—জানি। শুধু ভীম কেন, কেউই তাঁকে কম ভালবাসতেন না। অতএব ভীম সেই সুরে কথা বলতেই নকুল-সহদেবও সুর মেলালেন ভীমের সঙ্গে। কিন্তু সে ছিল শিশুদের কান্না মেলানোর সামিল। আমি তার খুব বেশি মূল্য দিই না। মূল্য দিই ভীমের সেই গদ্যজাতীয় কবিতাটিকে, যাতে দ্রৌপদীর দুঃখ-সূত্রপাতেই সরল কথা সুর হয়ে ওঠে—সুন্দরী আমার! তুমি যা বললে, তাতে মন আরও ভরে উঠল আমার। তোমার কথা, সে যেন অমৃতের আস্বাদ দিল আমার হৃদয়ের গভীরে—তন্মে প্রীণাতি হৃদয়ম্ অমৃতপ্রাশনোপমম্। দ্রৌপদী যা বলেছিলেন, তা কিন্তু অর্জুন সম্বন্ধেই বলেছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র দ্রৌপদী বলছিলেন বলেই তা অমৃতের স্বাদ বয়ে আনে ভীমের হৃদয়ে। অর্জুনের ভাগ্য নিয়ে ঈর্ষা নয়, অসূয়া নয়, কোনও পরশ্রীকাতরতাও নয়, শুধুমাত্র দ্রৌপদীর জন্য ভীমের এই আবেগ-আর্তি, তাঁর ক্রূর-নৃশংস গদ্যমূর্তিকে আমার কাছে পদ্যময় করে তোলে। হয়তো এই সরলতাই কবিতা বা প্রেমের শ্রেষ্ঠ ভাষা।

অথচ উলটো দিকে দ্রৌপদীকে দেখুন। অর্জুন আসবেন জেনে সবাই মিলে তখন গন্ধমাদন পর্বতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পাহাড়ের রাস্তা, দ্রৌপদী হাঁটতে পারেন না। চলতে চলতে সংজ্ঞা হারান। ভীমই তাঁকে নিয়ে এসেছেন পুত্র ঘটোৎকচের কাঁধে চড়িয়ে। ভীম তাঁকে বলেছিলেন—বাছা! তোমার মা শ্রান্ত, ক্লান্ত, তুমি তাঁকে কাঁধে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো—হৈড়িম্বেয়ং পরিশ্রান্তা তব মাতাপরাজিত। আমার ধারণা—এই কাঁধে চড়ানোর কষ্টটুকু ভীম নিজেই স্বীকার করতেন। এ অভ্যাস তাঁর আগেই দেখেছি। কিন্তু দ্রৌপদীর চতুঃস্বামীর মধ্যে দ্রৌপদীর গাঢ়-প্রত্যঙ্গস্পর্শ ভীমের দেহে-মনে যদি কোনও চিৎকার করার মতো আনন্দ দিয়ে ফেলে, তবে ভীম, অন্তত ভীম সে আনন্দ চেপে রাখতে পারবেন না বলেই বোধহয় প্রিয় পুত্রকে তিনি অনুরোধ করেছেন—কাঁধে বয়ে নিয়ে চলো তোমার মাকে। দ্যাখো এমনভাবে পথ চলো যাতে কোনও কষ্ট না হয় তাঁর—গচ্ছনীচিকয়া গত্যা যথা চৈনাং ন পীড়য়েঃ।

দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে সবাই গন্ধমাদনে এলেন। বড় মনোরম পর্বত এই গন্ধমাদন। যেমন তার প্রকৃতির শোভা, তেমনই স্বর্গীয় সব অনুভূতি। এমন জায়গায় এসে, যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি এত শুষ্ক ছিলেন দ্রৌপদী, তাঁকে পর্যন্ত হাওয়ায় উড়ে আসা সুর-সৌগন্ধিক পদ্ম একগাছি উপহার দিয়ে বসলেন। আর ভীমকে বললেন—আমাকে যদি তুমি একটুও ভালবাস ভীম, তাহলে আরও, আরও অনেক এমন পদ্ম আমাকে এনে দাও—যদি তে'হং প্রিয়া পার্থ বহুনীমান্যুপাহর।

হায়! ভীম জানেন—কত দুর্গম সেই পদ্মবনের পথ! হয়তো মানুষের প্রেমের যে পদ্মবন আছে, সেখানে পৌঁছনোর পথও ততখানিই কঠিন ভীমের কাছে, যতখানি কঠিন এই পথ। দ্রৌপদী

অর্জুনকে ছাড়া পৃথিবী শূন্য দেখেছিলেন—ভীমের কাছে দ্রৌপদীর সেই দুঃখপাত ছিল অমৃতের স্বাদ, কারণ অর্জুনকে ভীমও ভালবাসেন। আজ একটি মাত্র সৌগন্ধিক পদ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়ে তাঁর তৃপ্তি হল না। তিনি আরও পদ্ম চান যুধিষ্ঠিরকেই দেবার জন্য, কিন্তু সেই উপহারের পদ্ম এনে দেবেন ভীম, তাও সে দ্রৌপদীকে ভালবাসার জন্য ধন্য হয়ে—তুমি যদি আমায় একটুও ভালবাস ভীম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভীম যাবেন, দ্রৌপদীর জন্যই যাবেন। দ্যূতসভার অপমানের মধ্যে যাঁর পক্ষপাত আবিষ্কার করেছিলেন দ্রৌপদী, বনবাসের তর্কে-বিতর্কে যে আবিষ্কার সযৌক্তিক অথবা বিশ্বাসের পর্যায়ে এসেছিল, অর্জুনের ওপর নিজের প্রেম জানিয়েও ভীমের মতো ভক্তের আরও এক অন্যতর প্রেমে যিনি আস্থা রাখতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই বিদগ্ধা রমণী তাঁর চিরভক্তকে পরীক্ষা করবেন না?

ভীম চললেন দ্রৌপদীর জন্য সুর সৌগন্ধিক আহরণ করতে। ভীমের কথাই যখন বলছি, তখন কত দুর্গম সে পথ, কত ক্রোশ দূরে, পথে কত শত বাধা—এসব মহাভারতের কবির কারুণ্য নিয়ে আমারও বর্ণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করছি না। কারণ পথক্লেশ, বাধা, যক্ষ-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ—এসব ভীম যেভাবে দমন করতে পারেন, সেভাবে তিনি শুধু নিজের গভীর অন্তরশায়ী প্রেমকেই দমন করতে পারেন না। তিনি দ্রৌপদীর জন্য যাচ্ছেন। পদ্মবনের রক্ষক কুবের পর্যন্ত জেনে গেছেন সেই উদগ্র প্রেম কী রকম? যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্তরে তিনি বলেছেন—নিয়ে যাও বাপু, যত চাও পদ্মফুল, আমি যখন বুঝেছি দ্রৌপদীর জন্য তোমাকে এই ফুল নিয়ে যেতে হবে, অতএব তা নিতেই হবে, নাও তুমি যত চাও—গৃহ্নাতু ভীমো জলজানি কামাৎ/কৃষ্ণা-নিমিত্তং বিদিতং মমৈতৎ।

অথচ যুধিষ্ঠির কী ভাবনাতেই না পড়েছিলেন ভীমের জন্য। এদিক দেখেন, সেদিক দেখেন, ভীমকে আর পাওয়া যায় না। শেষে অধৈর্য হয়ে নকুল-সহদেব, দ্রৌপদী—সবাইকেই জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় ভীম, তাকে তো দেখছি না। সলজ্জে দ্রৌপদী বললেন—আমিই তাকে পাঠিয়েছি। সেই যে তখন তোমাকে দিলাম সেই পদ্মফুল—কী সুন্দর গন্ধ, হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল আমার সামনে, আর আমি অমনি দিয়ে দিলাম তোমার হাতে। তো সেই পদ্মফুল আরও অনেকগুলো আমি ভীমকে আনতে বলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভাল লাগবে বলেই—প্রিয়ার্থং মম পাণ্ডব—ভীম সেই ফুল আনতে চলে গেছেন আরও উত্তরে, কয়েক ক্রোশ দূরে। যুধিষ্ঠির আর দেরি করলেন না। মাথা-গরম লোক, হঠাৎ হঠাৎ কোথায় কী করে বসে—কৃতবানপি বা বীরঃ সাহসং সাহসপ্রিয়ঃ! সবাই মিলে চললেন, ভীম যেদিকে গেছেন সেই দিকে।

পদ্ম-সরোবরের কাছে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন—যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। এখানে ওখানে কুবেরের অনুচর যক্ষ-রাক্ষসেরা সব কেউ হাত ভেঙে, কেউ পা ভেঙে এদিক-ওদিক পড়ে আছে আর সেই পদ্ম-পুষ্করিণীর পারে ভীম গদা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—উদ্যম্য গদাং দোর্ভ্যাং নদীতীরে ব্যবস্থিতম্। কষ্টার্জিত সৌগন্ধিক পদ্ম আবার ফিরে গিয়ে দ্রৌপদীকে আর দেওয়া হল না ভীমের। কারণ দ্রৌপদী নিজেই ভীমের কাছে চলে এসেছেন যুধিষ্ঠিরের চাপে পড়ে। কিন্তু তাঁর পরীক্ষাও হয়ে গেছে। দ্রৌপদী বুঝে গেছেন—ভীমকে তিনি যা বলবেন, ভীম তাই করবেন। তাঁর প্রণয়-মালঞ্চের এক নতুন মালাকর, যে সর্বদা শশব্যস্ততায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—নতুন কোন কর্ম দেহ অকর্মণ্য দাসে।

দ্রৌপদীর ঈপ্সিত প্রিয়তম স্বামীটি স্বর্গ থেকে ফিরে এলেন গন্ধমাদনের সানুদেশে। কাঁধে দিব্য অস্ত্রভার, ধনুর্বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বে কিঞ্চিৎ লজ্জিতও বা। যুধিষ্ঠির, ভীম, পাঞ্চালী-কৃষ্ণা—সবাই আনন্দে আত্মহারা হলেন অর্জুনের আগমনে। অর্জুন ফিরে আসার পর যুধিষ্ঠিরের বনবাসের আবাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—দুর্যোধনের ঘোষ-যাত্রা। কৌরবদের অধিকারে কত গরু আছে, তা গুনে নেবার অছিলা করে দুর্যোধন নিজের বৈভব দেখাতে এলেন বনে। থানা গাড়লেন ঠিক পাণ্ডব-কুটীরের কাছেই। কিন্তু দুর্যোধনের পরিহাসে বাদ সাধলেন গন্ধর্ব চিত্রসেন। জায়গাটি নাকি গন্ধর্বদের এলাকার মধ্যে।

দুর্যোধনের সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্রসেনের ঝগড়াঝাটি মারামারি আরম্ভ হল। দুর্যোধন এবং তাঁর বাহিনী চিত্রসেনের হাতে বন্দি হলেন। কৌরবদের বাড়ির বউ-ঝিদের সোনায় মুড়ে দুর্যোধন পাণ্ডবদের দমক দেখাতে এসেছিলেন বনে, তাঁদের ধরে নিয়ে গেল গন্ধর্বরা। কুরুসভার বৃদ্ধ মন্ত্রীরা সাধারণ সৈনিকরা বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্যোধনের বিপত্তির কথা জানাল। যুধিষ্ঠির সব কথা ভাল করে শুনবার আগেই ভীম সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন—আরে ইয়াঃ। কত যত্ন করে হাতি-ঘোড়া সাজিয়ে আমাদের যা করতে হত, গন্ধর্বরাই তো তা করে দিয়েছে—অস্মাভি র্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্।

যে মন্ত্রীরা এতদিন দুর্যোধনের পাশে ছিলেন, যাঁরা দুর্যোধনের মুক্তি ভিক্ষা চাইতে এসেছিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, ভীম তাঁদের ছাড়লেন না। আচ্ছা করে শুনিয়ে বললেন—ঠিক হয়েছে। ব্যাটা ভেবেছে একরকম, হয়েছে আরেকরকম। আরে এই হয়। কপট পাশা খেলায় যার হাত ছিল, এও সেই ধৃতরাষ্ট্রের দুর্মন্ত্রণা। বোঝা যাচ্ছে, এমন লোক এখানেও আছে, যারা আমাদের ভাল চায়, নইলে, আমরা এখানে মেজাজে বসে রইলাম, আর কাজ হাসিল করে দিল অন্য লোক—যেনাস্মাকং হৃতো ভার আসীনানাং সুখাবহঃ। আরে তোরা হস্তিনাপুরে আরামে বসে ভেবেছিলি—আমরাই শুধু বনবাসে শীত বর্ষা আর গরমে কষ্ট পাব, আর তোরা বসে বসে দেখবি—দ্রষ্টুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ। এখন যা করেছিলি তার ফল বোঝ।

যুধিষ্ঠির ভীমকে থামালেন। ভীমকে বোঝালেন কুলের মর্যাদা—দুর্যোধন যাই করুক, তবু সে আমাদের জেঠতুতো ভাই। অন্য শত্রুর হাত থেকে তাকে না বাঁচালে, আমাদের মর্যাদা থাকে না। যুধিষ্ঠিরের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন ভীম। শেষে অর্জুনের সঙ্গে একত্রে গিয়ে দুর্যোধন এবং তাঁর স্ত্রীদের মুক্ত করলেন। দুর্যোধনকে মুক্ত করার ব্যাপারে অর্জুনের ভূমিকাই বড় ছিল, ভীম ছিলেন সাহায্যকারীমাত্র। অর্জুনের মর্যাদায় তিনি অর্জুনের পাশে আছেন মাত্র, নইলে দুর্যোধনকে বাঁচানো তাঁর মনঃপূত ছিল না।

অর্জুন ফিরে আসার পর বনবাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ধৃতরাষ্ট্রের জামাই জয়দ্রথের আগমন এবং দ্রৌপদীকে হরণের চেষ্টা। পাণ্ডবভাইরা সবাই তখন ক্ষুধার অন্ন জোগাতে শিকারে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়িতে দ্রৌপদী একেবারে একা। বনবাসের পর্ণকুটীরে থাকা সত্ত্বেও এই বিদগ্ধা রমণীর রূপে আলোকিত হয়ে ছিল বনতল। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জয়দ্রথ বনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দ্রৌপদীকে দেখে মোহিত হলেন। তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন জয়দ্রথ।

জয়দ্রথের ভাব-ভঙ্গি, কথা-বার্তা শুনে দ্রৌপদীর হৃদয়, কেঁপে উঠল। প্রথমে গালাগালি, তারপর স্বামীদের ক্ষমতার কথা বলে ভয় দেখানো, এবং পরিশেষে আবারও গালাগালি দিয়ে দ্রৌপদী বাক্য শেষ করলেও জয়দ্রথ সিংহের ঘরে এসে সিংহী চুরি করার মতো দ্রৌপদীকে জোর করে রথে চড়িয়ে নিলেন। দ্রৌপদী বেশি বাধা দিলেন না, ধস্তাধস্তি অথবা শারীরিক কুস্তাকুস্তির চেয়ে তিনি জয়দ্রথের রথে ওঠা অনেক বেশি সম্মানজনক মনে করলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, পাঁচ স্বামী পাঁচ দিকে শিকারে গেছেন—একজন না একজনকে ঠিক পাওয়া যাবে বনভূমির কোনও এক পথে। আর তখন জয়দ্রথের নিস্তার নেই।

পাণ্ডবরা খবর পেয়ে গেলেন দ্রৌপদীর এক পরিচারিকার কাছে এবং আরও সবিস্তারে ধৌম্য পুরোহিতের কাছে। ভীম এবং অর্জুন ছুটলেন জয়দ্রথকে ধরার জন্য। সঙ্গে নকুল-সহদেব এবং যুধিষ্ঠির। জয়দ্রথ সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছেন বনে। কাজেই বেরতে তাঁর সময় লাগছে। জয়দ্রথ সেনা-বাহিনীর মাথার ওপর দিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের রথের ধ্বজা দেখতে পেলেন। যেন কিছুই হয়নি, এমন একটা ভঙ্গিতে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে বললেন—পাঁচখানি রথ চোখে পড়ছে কৃষ্ণা। মনে হচ্ছে, তোমার স্বামীরা এল বুঝি—মন্যে চ কৃষ্ণে পতয়স্তবৈতে। তুমি একটু চিনিয়ে দেবে—কে কেমন, কী তাদের পরিচয়।

দ্রৌপদী বললেন—পরিচয়? মরবার ফন্দি করেছ এতক্ষণ, এখন পরিচয় দিয়ে কী হবে—কিং তে জ্ঞাতে মূঢ়, অনায়ুষ্যং কর্ম কৃত্বাতিঘোরম্। তবে কিনা মুমূর্ষু লোকের শেষ ইচ্ছেতে বাধা দেব না। বলাটা আমার ধর্ম, তাই বলছি—আখ্যাতব্যং ত্বেব সর্বং মুমূর্ষোঁ/ময়া তুভ্যং পৃষ্টয়া ধর্ম এবঃ। দ্রৌপদী

পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের পরিচয় দেওয়া শেষ হল। এবার ভীমের কথা।
দ্রৌপদী বললেন—ওই যে দেখছ—শালখুঁটির মতো চেহারা, ইয়া লম্বা দুটো হাত, রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছে বারবার, ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে—ওই হচ্ছে আমার স্বামী বৃকোদর ভীম। ওর কাজকর্ম কোনওটাই মানুষের মতো নয়। মানুষ যা করতে পারে না, সেটা ও করতে পারে বলেই ওর 'ভীম' নামটি সার্থক। দ্রৌপদী এবার জয়দ্রথকে একটু অবহিত করে বললেন—মনে রেখো, ওর কাছে দোষ করে কারও আর বাঁচার আশা থাকে না। কেউ ওর সঙ্গে শত্রুতা করলে, ও সেটা জীবনে ভোলে না এবং শত্রুকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত ওর মনে কোনও শান্তিও থাকে না—বৈরস্যান্তং সংবিধায়োপযাতি/পশ্চাচ্ছান্তিং ন চ গচ্ছত্যতীব—এমনকী মেরে ফেলার পরেও যে খুব শান্তি পায়, তা নয়, শত্রুর ছেলে, তার নাতি পর্যন্ত ওর মারণ-সীমার মধ্যে থাকে।

ভীমের সম্বন্ধে এমন মূল্যায়ন বোধহয় আর কেউ করেননি। করলেও হয়তো তা এত সঠিক হবে না। যাই হোক, যুদ্ধ বাধল। জয়দ্রথের আদেশমূলক নানা চিৎকার—অ্যাই। আটকে দাও, মারো এবার, তেড়ে এগিয়ে যাও—এরই মধ্যে ভীম হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁর সোনা দিয়ে মিনে করা লোহার গদাখানি। জয়দ্রথের প্রধান বন্ধু কোটিকাস্য। তিনিই প্রথম দ্রৌপদীকে দেখে এসে দ্রৌপদীর রূপের বর্ণনা করেন জয়দ্রথের কাছে। সেই কোটিকাস্য ভীমের ওপর নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করে বেশ কিছু সৈন্য নিয়ে পথ আটকালেন তাঁর।

ভীম অবশ্য চোখের সামনে ভিড়-ভাট্টা বেশি পছন্দ করেন না। নিমেষে গোটা কয়েক হাতি এবং চোদ্দো জন পদাতিক সৈন্য গদার বাড়িতে উড়িয়ে দিয়ে তিনি পৌঁছলেন কোটিকাস্যের কাছে। কোটিকাস্যের সারথিটিকে তিনি পিটিয়ে না মেরে একটি ধারালো ক্ষুরের সাহায্যে কুচ করে নামিয়ে দিলেন মাথাটা। ব্যাপারটা এত 'স্মুদ' ছিল যে, কোটিকাস্য বুঝতেও পারলেন না কী হল—ন বুবোধ হতং সূতং স রাজা বাহুশালিনা। হঠাৎ করে রথ থেমে যাওয়ায় ভীম কোটিকাস্যের চুলের মুঠি ধরে এমন একখানা থাপ্পড় কষালেন যে, সেটাই তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে গেল। তারপর একটা সামান্য অস্ত্রের ছোঁয়ায় কোটিকাস্য দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনার পরম ফল লাভ করলেন ভীমের কাছে।

বেগতিক দেখে জয়দ্রথ রথ থেকে নেমে দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিলেন এবং উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলেন পালানোর জন্য, কারণ এ অবস্থায় পালালেই একমাত্র বাঁচোয়া। দ্রৌপদীকে রথে চড়িয়ে নিলেন যুধিষ্ঠির। ওদিকে জয়দ্রথ পালালেন। ভীম কিন্তু কোনও দিকে না তাকিয়ে একের পর এক জয়দ্রথের সৈন্য শেষ করে যাচ্ছেন। মনে পড়ে তো—পাণ্ডবদের সেই প্রথম যুদ্ধের কথা। গুরুদক্ষিণার কারণে দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ। ভীম সেখানেও শুধু সৈন্য-শাতন করে যাচ্ছিলেন। সেই 'অপরিশীলিত' ক্ষাত্রশক্তির তাণ্ডব, যার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে প্রাসঙ্গিক। এখানেও ঠিক তাই চলছিল। ভীম মেরেই যাচ্ছেন, মেরেই যাচ্ছেন। এবং একসময় দেখা গেল—অর্জুন তাঁকে ডেকে বলছেন—যার অসভ্যতার জন্য আমরা কষ্ট পেলাম দাদা, সেই তো পালাল। তুমি শুধু শুধু এই নির্দোষ সৈন্যগুলিকে মেরে যাচ্ছ, তুমি তাকে খোঁজো—তমেবাম্বিষ্ব ভদ্রং তে কিং তে যোধৈ র্নিপাতিতৈঃ।

সেই এক মোচড়। 'ক্রুড্' ক্ষাত্রশক্তিকে ঠিক ঠিক খাতে বইয়ে দেওয়া। অর্জুনের চতুর্দিগ্‌দর্শী পরিশীলিত দণ্ডচালনার কাজই এই—প্রয়োজনে দণ্ডকে নির্মমভাবে ব্যবহার করা, প্রয়োজনে তাকে নিয়ন্ত্রণ করাও। অর্জুনের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে বিশাল শক্তি অকারণে ক্ষীণ হচ্ছিল, সেই শক্তির লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল এক দিকে—জয়দ্রথকে ধরতে হবে। তবু এই বিপন্ন ত্বরিত মুহূর্তে—যে মুহূর্তে ভীমের অন্য কোনও কিছু খেয়াল থাকে না, যেমন মূল জয়দ্রথের পালানোটাই তাঁর চোখে পড়েনি—সেই মুহূর্তেও কিন্তু আরও গভীরতর এক অনুভূতি কাজ করছে ভীমের মধ্যে। আমি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাই না।

অর্জুনের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীমের নজর পড়েছে দ্রৌপদীর দিকে। না, জয়দ্রথ তাঁকে নিয়ে পালাতে পারেনি। তিনি সুরক্ষিত রয়েছেন যুধিষ্ঠিরের রথে। ভীম আস্তে-ব্যস্তে যুধিষ্ঠিরের সামনে গিয়ে বললেন—যারা যুদ্ধ করতে এসেছিল, তারা মরেছে। অবশিষ্ট যারা আছে, তারা

পালাতে ব্যস্ত। আপনি দ্রৌপদীকে নিয়ে নকুল-সহদেবের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে চকিত-বিপর্যস্ত দ্রৌপদীকে আপনি সান্ত্বনা দিন—প্রাপ্যাশ্রমপদং রাজন্ দ্রৌপদীং পরিসান্ত্বয়।

যেন এ কাজটা তাঁরই করার কথা ছিল। শুধু জয়দ্রথকে ধরে আনার ব্যস্ততায় এই কাজটুকু তাঁর করা হল না। বস্তুত আমরা দ্রৌপদীর প্রতি ভীমের এবং ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর পারস্পরিক সরসতা পরিমাপ করতে বসেছি। শৃঙ্গার-রস এখানে গৌণ হলেও বীর-রসের প্রাঙ্গণেও সে যেহেতু উঁকি দিয়ে গেছে, তাই সেটা না বললে ভীমের মতো যুদ্ধবীরের এই লঘুতা সপ্রমাণ তো হয়ই না, সদর্থক তো নয়ই। বরঞ্চ এই সাংঘাতিক মুহূর্তে ভীমের এই লঘুতাই প্রমাণ করে—দ্রৌপদীর জন্য তিনি কতটা আচ্ছন্নবোধ করেন মনে মনে। জয়দ্রথের অভব্যতায় দ্রৌপদীর মতো ক্ষত্রিয় রমণীর হৃদয় কতটা আতপ্ত হয়ে উঠতে পারে—সেটা ভীম যথেষ্টই জানেন। আর জানেন বলেই দ্রৌপদীকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে যে সান্ত্বনাটা তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিতে বললেন, সেটাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন ব্যঞ্জনায়। দ্রৌপদীকে এই সান্ত্বনা যুধিষ্ঠির দিতে পারবেন না বলেই ভীম নিজেই সেটা দ্রৌপদীকে শুনিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আপনি দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরে যান। বেঁচে থাকলে ওই মাথামোটা জয়দ্রথ আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না—ন হি মে মোক্ষতে জীবন্ মূঢ়ঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ। ও যদি পাতালেও গিয়ে লুকিয়ে থাকে, যদি দেবরাজ ইন্দ্রও তার রথের সারথি হয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে আসেন জয়দ্রথকে, তবু সে বাঁচবে না।

ভীম কথাটা বলেছিলেন দ্রৌপদীকে শুনিয়ে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে। এবারে ভীমের কথা শুনে দুজনেরই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমার লক্ষ করব। ভীমের মারণ-পণ বক্তব্য শুনে যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন—না বাপু! আর যাই করো প্রাণে মেরে ফেলো না দুরাত্মা জয়দ্রথকে। ভেবে দেখো—ভগিনী দুঃশলা বিধবা হবে। আর ভেবো জননী গান্ধারীর কথা।

যুধিষ্ঠিরের কথা শেষ হতে না হতেই দ্রৌপদী ফেটে পড়লেন। তাঁর বক্তব্য তিনি ভীমকেই শোনালেন—ভীমম্ উবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া—কারণ, তিনি জানেন—তিনি যা চাইবেন, ভীম তাই করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ভীমের সঙ্গে যেহেতু অর্জুনও আছেন—যে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ভাই শুধু নয়, শিষ্যও বটে, অতএব অর্জুনকেও জড়িয়ে নিতে হল ভীমের সঙ্গে। দ্রৌপদী বললেন—আমার প্রিয় কাজ যদি করতে চাও, তাহলে একেবারে শেষ করে দেবে পুরুষাধম জয়দ্রথকে—কর্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ। যে একজনের বউকে তুলে নিয়ে যায়, যে নাকি রাজার ধন চুরি করে, সে যদি বিপাকে পড়ে তার জীবন ভিক্ষেও চায়, তবুও তার মুক্তি হওয়া অনুচিত।

দ্রৌপদীর কথা শুনে ভীম চললেন, অর্জুনও চললেন জয়দ্রথকে ধরতে। এক ক্রোশ যেতে না যেতেই জয়দ্রথকে পাওয়া গেল। তাঁর ঘোড়া জখম হয়েছে, তিনি পায়ে হেঁটে পালাচ্ছেন। অর্জুন বললেন—তিষ্ঠ জয়দ্রথ! ফিরে এসো এখানে, পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। তুমি এই বীরত্ব নিয়ে কী করে একজন স্ত্রীলোককে কামনা কর?

ভীম দেখলেন—ভদ্রাভদ্র শব্দের অপমান-ব্যঞ্জনায় জয়দ্রথ মোটেই ফিরবে না। তিনি তখন—অ্যাই দাঁড়া বলছি, যাচ্ছিস কোথায় কথার উত্তর না দিয়ে—এই ভঙ্গিতে সোজা তাড়া করলেন জয়দ্রথকে—তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ভীমঃ সহসাভ্যদ্রবৎ বলী। অর্জুনের কোনও অপেক্ষা না করে ভীম তাড়া করলেন জয়দ্রথকে আর ভীম তাড়া করলেন মানেই সেখানে কী ঘটবে কেউ বলতে পারে না। কারণ ভীমের শত্রুতা পরপক্ষকে মৃত্যুর শাস্তি না দিয়ে শেষ হয় না। অতএব ভীম ছোটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পরিশীলিত দণ্ডধরের মুখ থেকে শেষ সাবধান-বাণী উচ্চারিত হল—দাদা! একেবারে মেরে ফেলো না কিন্তু—মা বধীরিতি।

ভীম ছুটে গিয়ে জয়দ্রথের চুলের মুঠি ধরলেন। এবার তাকে মাটিতে ফেলে একেবারে পিষে দিলেন হাতের চাপে। মারামারির সময় ভীম শত্রুকে একটু-আধটু ছেড়ে দেন। কেন না ছেড়ে দিলে পুনরায় মারার গতিটা দ্বিগুণতর হয়। জয়দ্রথ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আবার যেই উঠতে যাবেন—পুনঃ সঞ্জীবমানস্য তস্যোৎপতিতুমিচ্ছতঃ—অমনই তাঁর মাথার ওপর ভীমের লাথি পড়তে লাগল। তারপর জয়দ্রথকে মাটিতে ফেলে তার পেটে হাঁটুর গোত্তা চালালেন খানিকক্ষণ, মুখের

ওপর পড়ল ঘুসির পর ঘুসি—তস্য জানু দদৌ ভীমো জঘ্নে চৈনমরত্নিনা।

এই ধরনের 'অ্যাকশন সিন' আপনারা হিন্দি সিনেমায় অনেক দেখেছেন। তবে ভীমের এই মারগুলো কিন্তু একেবারে নীতিশাস্ত্র-ছাঁকা মার। নীতিশাস্ত্র বলে—ক্ষত্রিয় যদি অন্যায় করে, তবে তাকে চার কিসিমে মারতে হবে। আবার ওই ক্ষত্রিয়ই যদি পরের বউ তুলে নিয়ে যাবার মতো অন্যায় করে, তবে মারের কিসিম হবে পাঁচ রকম। ভীম ঠিক সেই ভাবেই মারের ব্যাকরণ মেনে প্রত্যেকটি মার দিয়েছেন জয়দ্রথকে—

বামপাণি-কচোৎপীড়া ভূমৌ নিষ্পেষণং বলাৎ।
মূর্ধ্নি পাদ-প্রহরণং জানুনোদরমর্দনম্।
মালুরাকারয়া মুষ্ট্যা কপোলে দৃঢ়তাড়নম্॥

অর্থাৎ বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানো, মাটিতে ফেলে ঘষা, মাথায় লাথি, পেটে হাঁটুর গোত্তা এবং মুখে ঘুসি—পরের বউ-তোলা ক্ষত্রিয়াধমের এই হল 'স্পেশাল' মার। ভীম তাই করেছেন। জয়দ্রথ মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তবু ভীমের মার থামছে না। অর্জুন বললেন—দাদা! যুধিষ্ঠিরের কথা মনে আছে তো? এবার থামো। ভগিনী দুঃশলার কথাটা মাথায় রাখো একটু।

অর্জুন জানেন—জয়দ্রথ যা করেছেন, তাতে ভীমের হাতে এই বেদম মার তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু চরম দণ্ড দিতে গেলেও দণ্ডনীতির নিয়মে দোষী ব্যক্তির পাত্রত্ব বিচার করতে হয়। সুনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তি যুধিষ্ঠির-অর্জুনের মতো নেতার মাধ্যমেই প্রকটিত হয় বলেই দোষীর পাত্রাপাত্র-জ্ঞান তাঁদের স্মরণে থাকে। অর্জুন তাই ঠিক সময়ে ভীমকে বলেছেন—দাদা! মহারাজ যুধিষ্ঠির যেমনটি বলেছিলেন—ভগিনী দুঃশলার কথা মনে রেখো। এবার ছেড়ে দাও—দুঃশলায়াঃ কৃতে রাজা যত্তদাহেতি কৌরব।

অর্জুন 'দাদা যুধিষ্ঠিরে'র কথা বললেন না, 'রাজা যুধিষ্ঠিরে'র কথা বললেন। উত্তেজনার এই চরম মুহূর্তে বাধা-বন্ধহীন, লাগামছাড়া, মোটা দাগের ক্ষাত্রশক্তিকে সুচিন্তিত রাজশক্তির দ্বারা আবারও নিয়ন্ত্রিত করা হল। এবং তা করলেন অর্জুন। ভীম মোটেই খুশি হলেন না। খুশি হলেন না, কারণ রাজার আদেশে নয়, অর্জুনের তর্কযুক্তিতেও নয়, তিনি জয়দ্রথকে ধরতে এসেছেন শুধু দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য। দ্রৌপদী বলে দিয়েছেন—যদি আমার প্রিয় চাও, তবে একেবারে শেষ করে দেবে ওটাকে—বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।

দ্রৌপদী যা বলেছিলেন, ভীম ঠিক তাই করছিলেন। অতএব সেই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে অর্জুন তাঁকে বাধা দেওয়ায় ভীমের অসম্ভব রাগ হয়ে গেল। তিনি বললেন—আমার হাত থেকে আজ এই বদমাশের রেহাই নেই। ও কৃষ্ণা দ্রৌপদীর সঙ্গে অসভ্যতা করেছে, আমার হাত থেকে ও ছাড়া পাবে না—নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি। ভীম এ-কথা বললেও যুধিষ্ঠির অথবা অর্জুনের ধীর-গম্ভীর নির্দেশটুকু তিনি উড়িয়ে দিতে পারলেন না। একদিকে চরম ক্রোধ, অন্যদিকে 'নামিল আদেশ'। একেবারে নিরুপায় হয়ে তিনি নিজের চুল ছেঁড়ার মতো করে বলে উঠলেন—কী যে করি? আমাকে কি তোমরা কিছুই করতে দেবে না। ওদিকে ওই এক রাজা, সব সময় তিনি দয়া দেখাচ্ছেন—যদ্রাজা সততং ঘৃণী—আরেক দিকে আছে তোমার মতো কতগুলো বোকা-বুদ্ধু, যারা সব সময় আমাকে আটকে রাখছ—ত্বঞ্চ বালিশয়া বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মান্ প্রবাধসে।

তবু ভীম অর্জুনের কথাটা একেবারে উলটে দিতে পারলেন না। রাগের চোটে তিনি জয়দ্রথের টেরি-কাটা মাথার পাঁচটি জায়গায় অর্ধচন্দ্র বাণের ক্ষুর দিয়ে চেঁছে দিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এটা মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢালার চেয়েও অনেক বেশি অপমান। মাথার চুল চেঁছে দিয়ে ভীম এবার খানিকটা গালাগালি দিয়ে জয়দ্রথকে বললেন—তোর বাঁচার উপায় আছে একটাই। তুই সবার মধ্যে নিজের পরিচয় দিবি—পাণ্ডবদের দাস বলে। যদি তাই করিস, তবেই শুধু প্রাণে বাঁচবি, নইলে নয়।

জয়দ্রথ রাজি হলেন। তখন ভীম তাঁকে রথে চাপিয়ে নিয়ে চললেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, কারণ সেখানে দ্রৌপদীও আছেন। জয়দ্রথের অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির আর কী করেন! ভীমের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন—এবার ছেড়ে দাও ভাই। ভীম বললেন—উঁহু আপনার কথায় একে

ছাড়ব না, আপনি দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন—দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি। তাঁকে বলুন—এ ব্যাটা এখন আমাদের দাস হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব মান-মর্যাদার ঢং একটু আলাদা। তিনি দ্রৌপদীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। শুধু আরও মধুর করে ভীমকে বললেন—আমাদের যদি কোনও মূল্য থাকে তোমার কাছে, তবে জয়দ্রথকে এবার ছেড়ে দাও—মুঞ্চেমম্ অধমাচারং প্রমাণা যদি তে বয়ম্।

যুধিষ্ঠিরের এই ভাষা থেকে প্রমাণ হয়ে যায়—ভীম শুধু দ্রৌপদীর কথারই মূল্য দিচ্ছিলেন। বিদগ্ধা দ্রৌপদী দেখলেন—ব্যাপারটা এখন অন্য দিকে গড়াচ্ছে। একরোখা ভীম দ্রৌপদীর কথার মূল্য দিতে গিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রায় অপমানই করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় যদি দ্রৌপদীও গোঁ ধরে বসে থাকেন, তাহলে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন রীতিমতো আহত বোধ করবেন। ভীমের ভালবাসার উগ্রতাও তাতে বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠবে। এককভাবে ভালবাসার এই প্রকট প্রকাশ তাঁকে অস্বস্তিতেও ফেলে দেবে। বিশেষত যুধিষ্ঠির যেভাবে বলেছেন, তারপরেও যদি ভীম তাঁর কথা না শোনেন, তবে তার দায় আসবে দ্রৌপদীর ওপরেই।

অতএব যুধিষ্ঠির যেই বললেন—আমাদের কথার যদি কোনও মূল্য থাকে—প্রমাণা যদি তে বয়ম্—সঙ্গে সঙ্গেই দ্রৌপদী আর ভীমকে কথা বলতে দেননি। তিনি তাঁর পূর্বের আদেশ প্রত্যাহার করে ভীমকেই বলেছেন—ছেড়ে দাও ভীম। লোকটা তো আমাদের দাসত্ব স্বীকারই করেছে। আর, তা ছাড়া ওর মাথার পাঁচ জায়গায় ন্যাড়া করে দিয়ে ক্ষত্রিয়ের অপ্রাপ্য চরম অপমানও ওকে করা হয়েছে।

দ্রৌপদী কথাটা বললেন ভীমকে, কিন্তু সেটা বললেন, যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে—দ্রৌপদী চাব্রবীদ্ ভীমম্ অভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্। ভাবটা এই—যুধিষ্ঠির! তুমি যে আমাকে না পুছেই নিজেদের মূল্যে জয়দ্রথকে ছেড়ে দিতে বললে তাতে মোটেই কাজ হবে না, যদি না আমি ভীমকে অনুরোধ করি। অর্থাৎ আমি বলছি ছেড়ে দিতে, তাই ভীম তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে, তোমার কথায় কিছু হচ্ছে না।

বস্তুত দ্রৌপদী জয়ী হলেন। বড় দাদার ওপর যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আরও গভীরতর এক প্রেমে ভীম যে বলেছিলেন—তুমি বললে হবে না, দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা কর—দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি—এই অতিক্রমটুকু দ্রৌপদীকে আবারও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল যে, অন্তত পঞ্চস্বামীর একতম এক বীর তাঁর অঙ্গুলী-সংকেতে চলবেন। দ্রৌপদীর ওপর ভীমের সপ্রেম পক্ষপাত এই ঘটনা থেকে এতটাই প্রকট হয়ে পড়ে যে, এখন আর সেটা মহাভারতের কবির শব্দব্যূহ ভেদ করে পদে পদে দেখিয়ে দিতে হবে না।

৮

বারো বছর বনবাসের পর এক বছরের অজ্ঞাতবাসে অসামান্য রূপবতী দ্রৌপদীকে কী করে লুকিয়ে রাখা যাবে—তা নিয়ে ভীমের বড় ভাবনা ছিল। ভীমের ভয়—'পুণ্যকীর্তি রাজপুত্রী' সাধারণের মতো সেজে সাধারণের মধ্যে থাকলেও তাঁর মনস্বিতা, তাঁর অলোকসামান্য ভাব-ব্যঞ্জনা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে দেবে—বিশ্রুতা কথমজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি। ভীম একথা বলেছিলেন সেই দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঝগড়ার সময়। অবশ্য নিজের সম্বন্ধেও তাঁর বিশ্বাস এবং ভাবনা কম ছিল না এবং সে ভাবনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন দ্রৌপদীর সম্বন্ধে কথা বলার অব্যবহিত পরেই। ভীম বলেছিলেন—প্রজারা সব আমাকে ছোট বয়স থেকে জানে। পাহাড়কে যেমন চেপেচুপে লুকিয়ে রাখা যায় না, তেমনই আমার পক্ষেও নিজেকে লুকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব—নাজ্ঞাতচর্যাং পশ্যামি মেরোরিব নিগূহনম্।

তবে এসব হল ঝগড়ার সময়ের কথা। বাস্তবে যখন অজ্ঞাতবাসের সময় এল, তখন ভীম এটাকে বেশ মজা হিসেবেই নিলেন। যুধিষ্ঠির যখন অজ্ঞাত-বাসের সময় রাজার সান্নিধ্যে পাশা খেলে

নিজেকে লুকোতে চাইলেন, তখন ভীম বললেন—আমি সাজব রান্নার ঠাকুর। আমার নাম হবে বল্লব। অন্ন-ব্যঞ্জন নানা রকম রাঁধব। জ্বালানির কাঠ কুড়িয়ে আনব নিজের কাঁধে। রাজা দেখে খুশি হবেন। আর আমি যদি একবার রাজার রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াই তবে সেখানে আর যত ঠাকুর-চাকর আছে, সবাই আমাকে রাজা বলে মেনে নেবে—রাজ্ঞস্তস্য পরিপ্রেষ্যা শংসন্তে মাং যথা নৃপম্। আসলে ভীম নিজে প্রচণ্ড খেতে ভালবাসেন আর ভালবাসেন বলেই রান্নাও জানতেন ভালই। তা ছাড়া বারো বছর বনবাসে শশ-মৃগ-বরাহ পুড়িয়ে খেয়ে তাঁর অরুচি ধরে গেছে। অতএব রাজার রান্নাঘরের আধিকারিক হয়ে ভীম বোধহয় নিজের দুঃখও ঘোচাতে চান, সঙ্গে রাজাকেও খাওয়াতে চান ভাল-মন্দ নানান কিসিমের রান্না। বারো বছরের বনবাসী পেটের স্বপ্ন তাই চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র নিরঙ্কুশ অধিকার পাওয়া—ভক্ষ্যান্ন-রসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ।

তবে কিনা, ওই বিশালকায় যুদ্ধপ্রিয় মানুষটি শুধু রান্নাঘরে দিন কাটাবেন, তা হতেই পারে না। ভীম নিজেও সেটা মনে মনে জানেন। তাই রন্ধনশালার আধিকারিক হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেই ভীম বলেছেন—এমন যদি হয়, রাজবাড়িতে কোনও হাতি ঘোড়া ষাঁড় খেপে উঠেছে, তবে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে আমি সাহায্য করব। যদি বিরাটরাজার মল্লযোদ্ধারা যুদ্ধের প্রদর্শনীতে আত্মশক্তি প্রদর্শন করে, তবে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের শুধু প্রাণে মারতে বাকি রাখব। রাজাকে দেখাব আমার খেল, তাতে তাঁর আনন্দ বাড়বে, আমার ওপর তিনি খুশি হবেন—রতিং তস্য বিবর্ধয়ন্। ভীমের কথা শুনে বোঝা যায়—অন্যদের মতো তিনি নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারবেন না। রান্নার ফাঁকে-ফুরসতে একটু-আধটু যুদ্ধের ব্যায়াম না করে তিনি বসে থাকতে পারবেন না।

পাঁচ পাণ্ডবভাই আত্মগুপ্তির নানা পরিকল্পনা নিয়ে একে একে বিরাটনগরে ঢুকলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে আগেই বিরাটের রাজসভায় দ্যূতকরের জায়গা পেয়ে গেছেন। এবার ভীমের পালা। ভীম ঠিক রান্নার ঠাকুরের মতো সাজলেন। খালি গা। একহাতে একটা উনুন-খোঁচানো শিক—সে শিকের এক পাশটা দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারও তোলা যায়। ভীমের অন্য হাতে বড়সড় একটা হাতা। অবশ্য এর সঙ্গে একটা কুটনা-কোটা বঁটিও আছে। রান্নার সরঞ্জাম হাতে নিয়ে ভীম রাজবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন—এমন ভাবে, যাতে তিনি রাজার চোখে পড়েন।

আজকে যদি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এক বিশালদেহী গৌরবরণ পদস্থ সুপুরুষ হাতে হাতা-খুন্তি নিয়ে পথ চলেন, তাহলে তিনি যেমন সবার চোখে পড়বেন, সেই রকম ভীমও বিরাটরাজার নজরে পড়লেন। অবশ্য ভীমও দর্শনার্থী হয়েই রাজদ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভীমের চেহারা দেখে বিরাটরাজার খুব পছন্দ। দর্শনার্থীদের মধ্যে সবার আগে তাঁর ডাক পড়ল। ভীম বিরাটের উদ্দেশে বললেন—মহারাজ! আমি সূপকার। রাঁধতে জানি ভাল। নাম বল্লব। আমাকে যদি রান্নার কাজ দেন, তবে আপনার মন-পসন্দ নানা রকম রেঁধে খাওয়াব—ভজস্ব মাং ব্যঞ্জনকারমুত্তমম্। বিরাট বললেন—ধুর! তোমাকে দেখে মোটেই রান্নার লোক বলে মনে হচ্ছে না। যা তোমার চেহারা, যেমন শক্তিমান তোমার গঠন, তাতে রান্নার লোক বলে তোমায় বিশ্বাসই হয় না, তুমি বিনয় দেখাচ্ছ—ন সূদতাং মানদ শ্রদ্দধামি তে।

ভীম বললেন—কী যে বলেন কত্তা! আমি যা জানি, তার মধ্যে প্রথম কথাটাই হল রান্না। ইন্দ্রপ্রস্থে সেই যে মহারাজ যুধিষ্ঠির-মশায় ছেলেন, তিনি জানতেন আমার রান্নার স্বাদ। তবে হ্যাঁ, আপনি যা বললেন, আমার মতো শক্তপোক্ত লোক কমই আছে হেথায়। হাতি বলুন, সিংহ বলুন কি বড় বড় কুস্তিগিরই বলুন—আপনার যদি খুশি লাগে, তো—তাদের আমি ঠাণ্ডা করে দিতে পারি এক নিমেষে। বিরাট বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যখন রান্নার কাজ চাইছ, তোমায় সেই কাজই দিলাম আমি। তবে যাই বলো রান্নার কাজ তোমাকে মানায় না—ন চৈব মন্যে তব কর্ম তৎ সমম্। তবে তুমি যখন বলছ, মেনে নিলাম। আমার পাকশালায় যত ঠাকুর আছে, আমি তাদের মধ্যে তোমাকে আমার প্রধান পাচক এবং আধিকারিক নিযুক্ত করলাম—তেষাম্ অধিপো ময়া কৃতঃ।

ভীম রাজবাড়ির প্রধান পাচক নিযুক্ত হলেন। আর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই। বেশ মেজাজেই আছেন। মাঝে মাঝে রাজার মাইনে করা অথবা বাইরের মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের

অভ্যাস ঠিক রাখেন। রাজবাড়ির বউ-ঝি-পরিচারিকারাও সে সব যুদ্ধ দেখেন। সেখানে সৈরন্ধ্রী দ্রৌপদীও রানি সুদেষ্ণার পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধ দেখেন। নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে তিনি ভীমের তারিফও করে ফেলেন। সেই দেখে রাজবাড়ির মেয়েরা হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠে। বলে—ওই জওয়ান পাচকটির ওপর সৈরন্ধ্রীর ইয়ে আছে, মানে হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ।

ভীম এসব খবর জানেন না। তিনি সরল মানুষ। তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে কেউ যেন আমাদের না চিনতে পারে। বাস্। তিনি আর কারও দিকে তাকান না, দ্রৌপদীর দিকেও না। কিন্তু তিনি না তাকাতে চাইলেও ঘটনা-প্রবাহ এমনই এক জিনিস, যা তাঁকে একভাবে বিরাটের রাজবাড়ির এক উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে দিল।

বিরাটরাজার শালা কীচক দ্রৌপদীকে দেখে একেবারে মোহিত হয়ে পড়ল। দ্রৌপদীকে দেখলেই সে একথা-সেকথার টানে আপন আকর্ষণ প্রকাশ করতে থাকে। প্রেমের থেকে তার শারীরিক আকর্ষণই বেশি এবং এই আকর্ষণ প্রকট শব্দরাশিতে দ্রৌপদীর সামনে প্রকাশ করতেও তার দ্বিধা হয় না। দ্রৌপদী নিজে তাকে যথেষ্টই নিরাশ করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে তাকে ভয়ও দেখান যে, তাঁর পঞ্চ গন্ধর্ব-স্বামী কীচকের সর্বনাশ করে ছাড়বে। কামোন্মত্ত কীচক এসব কথায় ভয় পায় না। সৈরন্ধ্রী দ্রৌপদীকে কব্জা করতে সে তার বোন রানি সুদেষ্ণাকে হাত করে। কীচক তাঁকে বলে—যে উপায়ে সৈরন্ধ্রী আমার দিকে আকৃষ্ট হয়—তুমি সেই ব্যবস্থা কর—যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী।

সুদেষ্ণা ভাইয়ের কথায় ভুলে তাকে বাড়িতে অন্ন-পানের ব্যবস্থা করতে বলেন। ভাইকে বলে দেন—আমি ফিকির করে সৈরন্ধ্রীকে তোমার বাড়িতে মদ আনতে পাঠাব। সেই সুযোগে তুমি যা পার কর। ব্যবস্থা পাকা হল। সুদেষ্ণা ভাইয়ের বাড়ি থেকে সুরা নিয়ে আসতে বললেন সৈরন্ধ্রীকে। সৈরন্ধ্রী কিছুতেই রাজি নন। তিনি কীচকের কুমতবল বুঝে গেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে কীচকের বাড়িতে যেতে বাধ্য হলেন দ্রৌপদী।

যা হবার ছিল তাই হল। দ্রৌপদীকে দেখেই কীচক তাঁর আঁচল চেপে ধরল। দ্রৌপদী ধস্তাধস্তি করে কোনও রকমে কীচককে মাটিতে ঠেলে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে উপস্থিত হলেন রাজসভায়। সেখানে বিরাট এবং যুধিষ্ঠির দুজনেই বসে আছেন। হয়তো দৈবক্রমে অথবা রাজাকে অন্ন-পান কিছু জোগাবার জন্য ভীমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দৌড়নো অবস্থাতেই দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে ফেলে কীচক, এবং বিরাটরাজার সামনেই দর্পিতা সৈরন্ধ্রীকে সে লাথি মারে। বিরাট তাকে কিছুই বলতে পারেন না। একে শালা, তায় সেনাপতি, বিরাট নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন।

ভীমের রাগ চড়তে থাকে। তিনি দাঁত কিড়মিড় করতে থাকেন এবং মনে মনে তখনই কীচককে মেরে ফেলার জন্য প্রস্তুত হন। ভ্রূকুটী-কুটিল ললাটের মধ্যে হাত ঘষতে ঘষতে ভীম একখানি গাছ দেখতে থাকেন। অর্থাৎ গাছের বাড়িতে কীচককে এখনই শেষ করে দিতে চাইলেন তিনি। যুধিষ্ঠির দেখলেন—মহা বিপদ। অজ্ঞাতবাস চলছে। কোনওক্রমে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে আবার পাক্কা বারো বচ্ছর বনে। যুধিষ্ঠির বিরাটকে দেখছেন না, দ্রৌপদীকে দেখছেন না, কীচককে দেখছেন না, শুধু ভীমকে দেখছেন। ভীম বসেছিলেন, একটি গাছ লক্ষ্য করে তিনি এখন ওঠার উপক্রম করছেন তাড়াতাড়ি—ভূয়শ্চ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোত্থাতুমৈচ্ছত।

যুধিষ্ঠির কাল বিলম্ব না করে ভীমের দিকে আঙুল তুলে বললেন—হ্যাঁগো পাচক-ঠাকুর তুমি এমন করে গাছের দিকে তাকাচ্ছ কেন—আলোকয়সি কিং বৃক্ষং? বুঝতে পারছি রান্নার জন্য তোমার কাঠের দরকার। তো কাঠের জন্য বাইরে যাও, গাছ কেটে নিয়ে এসো বাইরে থেকে—যদি তে দারুভিঃ কৃত্যং বহির্বৃক্ষান্নিগৃহ্যতাম্। ভীম যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিত বুঝলেন। তাঁর চৈতন্য হল, খেয়াল হল অজ্ঞাতবাসের কথা, চলেও গেলেন রাজসভা থেকে। সৈরন্ধ্রী দ্রৌপদীকেও যুধিষ্ঠির নরমে-গরমে নানা কথায় বুঝিয়ে রানি সুদেষ্ণার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার ঘরে গেলেন বটে, তবে ক্ষত্রিয়াণীর রাগ কমল না। রানির সঙ্গেও তাঁর কথা কাটাকাটি হল। সুদেষ্ণা বললেন—আমার ভাই কীচক যদি তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করে থাকে, তবে

নিশ্চয়ই আমি তাকে শাস্তি দেব। দ্রৌপদী বললেন—তোমাকে আর অত চিন্তা করতে হবে না। যে মানুষদের সে রাগিয়ে দিয়েছে, তাতে তার শাস্তির চিন্তা তাঁরাই করবেন। তা ছাড়া আজকে যা ঘটল, তাতে এটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কীচকের মৃত্যু আসন্ন—মন্যে চাদ্যৈব সুব্যক্তং পরলোকং গমিষ্যতি। দ্রৌপদীর এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ ভীম, যিনি স্বচক্ষে কীচকের ব্যবহার দেখেছেন।

দ্রৌপদী নিজের ঘরে এলেন। স্নান-টান করে ভাবতে বসলেন। কার কাছে যাবেন, কীই বা করা উচিত—এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল। দ্রৌপদী বুঝলেন—যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলে কোনও ফল হবে না। তিনি এতই স্থির এবং এতই বেশি ভাবেন যে, তাঁর কাছে গেলে আশু ফল পাওয়া বোধহয় সম্ভবই নয়। অর্জুনও তেমনই, তিনি যুধিষ্ঠিরের শুধু ভাই নয়, শিষ্যও বটে—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। অজ্ঞাতবাসের কথা মাথায় রেখে দ্রৌপদীর এই সমস্যায় তিনি কতটা সাড়া দেবেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তার ওপরে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একটুও আলোচনা না করে অর্জুন শুধু নিজের তাগিদেই দ্রৌপদীর সমস্যা মেটাতে আসবেন—এমন আশা দ্রৌপদী করেন না।

একমাত্র লোক হলেন ভীম। দ্রৌপদী ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন—এই অবস্থায় ভীম ছাড়া অন্য দ্বিতীয় কোনও লোক, তাঁর মনের ইচ্ছে অনুসারে চলবেন না—নান্যঃ কশ্চিদ্ ঋতে ভীমান্মমাদ্য মনসঃ প্রিয়ম্। পূর্বের অভিজ্ঞতায় দ্রৌপদী জানেন—তাঁর ব্যক্তিগত কোনও সমস্যায় ভীম 'না' বলেননি। এবার তো কীচকের দুর্ব্যবহার ভীম নিজের চোখেই দেখেছেন। অতএব তাঁকে বোঝাতে দেরি হবে না।

কেউ যাতে তাঁকে না দেখতে পায় সেই ভাবে, রাতের আঁধারে নিজের সুখশয্যা ছেড়ে দ্রৌপদী গুটি-গুটি ভীমের কাছে চললেন। বিরাটের রান্নাঘরে পৌঁছে দ্রৌপদী দেখলেন ভীম ঘুমোচ্ছেন। কত দিন পরে এই শক্তিমান বীর স্বামীর তাঁর সঙ্গে দেখা! মহাভারতের কবি লিখেছেন—তিন বছর বয়সের গরু যেমন পূর্ণ-যৌবনের পীড়ায় কামাতুরা হয়, এতদিন পর সেই মধ্যম-স্বামীটিকে দেখে দ্রৌপদীও তেমনই ভীমের আসঙ্গ-লিপ্সায় আবিষ্ট হলেন। ঘুমন্ত ভীমকে জড়িয়ে ধরলেন উষ্ণ-বক্ষে বাহুর ডোরে। তাঁকে জাগিয়ে তুললেন আলিঙ্গন-চুম্বনের তীব্রতায়—বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা।

বনের মধ্যে সুপ্ত সিংহকে সিংহী যেমন জাগিয়ে তোলে, সেইভাবে দ্রৌপদী জাগিয়ে তুললেন ভীমকে—মৃগরাজবধূরিব। এরপর আধো ঘুমে আধো জাগরণে থাকা ভীমের সঙ্গে যখন কথা আরম্ভ করলেন দ্রৌপদী, তখনও তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরে আছেন—মত্ত হস্তীকে যেমন জড়িয়ে ধরে হস্তিনী, সেইরকম—ভীমসেনমুপাশ্লিষ্যদ্ হস্তিনীব মহাগজম্।

লক্ষণীয়, ভীমের সঙ্গে দ্রৌপদীর এই আকস্মিক নিশীথ-মিলনের চিত্রে মহাভারতের কবি অন্তত চারটি বন্যপ্রাণীর উপমা দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি বাদে তিনটিই আমি বলেছি। প্রথমে দ্রৌপদী যখন ভীমকে দেখলেন তখন গাভী আর বলীবর্দের উপমা। দীর্ঘদিনের পর স্বামীর সঙ্গে নিভৃত মিলনে যেহেতু আবেগের তাড়নাই ছিল প্রধান, অতএব ইন্দ্রিয়-তাড়িত গাভীর উপমা এসেছে কবির মনে। এই তাড়না বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দ্রৌপদী রাজবধূ, অতএব হৃদয়ের সমস্ত আবেগ এক মুহূর্তে সংযত করে তিনি 'মৃগরাজবধূ' অর্থাৎ সিংহীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে। সুপ্ত ভীম-সিংহকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন রাজোচিত গাম্ভীর্যে। কিন্তু ভীম জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদী তাঁকে আবারও বিমোহিত করেছেন শারীরিক সৌন্দর্যে, লঘু শৃঙ্গারে—হস্তিনী যেমন শুণ্ডে-শুণ্ডে প্রতি অঙ্গে জড়িয়ে ধরে মত্ত হস্তীকে। হস্তিরাজের তখন কিছুতে 'না' বলবার মানসিকতা থাকে না। ভীমের অবস্থাও তেমনই হল।

দ্রৌপদীর ওপর সমস্ত অধিকার যেন ভীমেরই—এইভাবেই দ্রৌপদী তাঁকে বললেন—তুমি জেগে ওঠো ভীম। তুমি এমন মরার মতো ঘুমোচ্ছ কেমন করে—কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ? একেবারে মরে না গিয়ে থাকলে কোনও জীবিত স্বামীর বউকে ওই পাপিষ্ঠ এই রকম অপমান করতে পারে? দ্রৌপদী সোজাসুজি কীচকের কথার সূত্রপাত করলেন। ভীম উঠে বসলেন চিন্তার

ভঙ্গিতে। কীচকের ঘটনা তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতবাহী তর্জনীটিও তাঁর স্মরণে আছে। ফলে যে উত্তেজনা, যে দ্রুততা তাঁর সার্বিক আচরণে চিরকাল লক্ষিত, সেই উত্তেজনা এখন দেখা গেল না। তাই বলে দ্রৌপদীর কোনও ব্যাপারেই তিনি উদাসীন নন। ভীম কথা আরম্ভ করলেন একটু সংযত ভঙ্গিতে, একটু নরম ভাবে, কারণ কীচকের 'ডিটেইলস' তিনি জানেন না।

ভীম বললেন—এত তাড়াহুড়ো করে কী জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ? তোমার গায়ের রঙ যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একটু রোগাও হয়ে গেছ দেখছি—ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃকৃশা পাণ্ডুশ্চ লক্ষ্যসে। কী ব্যাপার? সব খুলে বলো তো দেখি ; ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রিয়-অপ্রিয় যাই হোক, সব খুলে বলো। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভীম নিজের কথাটা আখ্যাপন করতে ভুললেন না। আমি অর্জুন এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে পূর্বে যখন প্রবন্ধ লিখেছি, তখন বারবার বলেছি—অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর কী পরিমাণ দুর্বলতা ছিল। নিজের প্রয়োজনে ভীমকে দ্রৌপদী বারবার ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মন তিনি বাঁধা দিয়ে রেখেছিলেন অর্জুনের কাছে।

ঠিক এই মুহূর্তে লক্ষ করবেন—ভীম কেমন বুঝতেন যে, তিনি ব্যবহৃত হচ্ছেন ; কিন্তু ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এই বিদগ্ধা রমণীকে ভাল না বেসে থাকতে পারতেন না তিনি। ঠিক সেই কারণেই এই বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বলো, কৃষ্ণা। তুমি তো জানো—তোমার সমস্ত কাজে আমিই শুধু কেমন করে তোমার বিশ্বাস রেখেছি, কথা রেখেছি—অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু। এমন কী যত বিপদ তোমার জীবনে এসেছে, সবগুলি থেকে আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছি। এখনও যা বলবার তা বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। তারপর শুতে যাও, এই অজ্ঞাতবাসে কেউ যদি তোমায় দেখে ফেলে? যেভাবেই হোক, অজ্ঞাতবাসের কথাটা এখনও ভীমের মাথায় আছে।

তোমার সমস্ত কাজ আমি করে দিই, সমস্ত বিপদে আমিই তোমাকে রক্ষা করি—এই কথাগুলির মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যেন—কাজের বেলায় এই শর্মা, আর প্রেমের বেলায় অর্জুন। অর্জুনের ব্যাপারে দ্রৌপদীর সততাটা ভীম বুঝে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমনই এক বেচারা পুরুষ, যিনি দ্রৌপদীকে কিছুতেই না ভালবেসে পারেন না। দ্রৌপদী অবশ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। ভীমের কথা, ভাষা এবং ভাব বুঝে তিনি প্রথমেই খানিকটা গালাগালি দিয়ে নিলেন যুধিষ্ঠিরকে। কীচকের ঘটনাটাও অবশ্য সেইসঙ্গে ভীমকে সবিস্তারে বললেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদী আপন জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ করে শুধু বোঝাতে চাইলেন যে, যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলার জন্যই জীবনে তাঁর যত দুঃখ। দ্রৌপদী এইবার তাঁর নিজের দুঃখের সঙ্গে ভীমের দুঃখটাও মিলিয়ে নিলেন। বোঝাতে চাইলেন—আমার নিজের জন্য আর কতটুকু, তোমার দুঃখ দেখে দেখে আমি আর সইতে পারি না।

দ্রৌপদী বললেন—আমার দুঃখ একটাই। এই যে তোমার মতো একজন মানুষ হীন রাঁধুনে বামুনের কাজ করে দিন কাটাচ্ছ—এর থেকে বড় কষ্ট আর আমার কাছে কী আছে? রান্নার কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি যখন বিরাটের সেবা কর, লোকে তোমাকে বিরাটরাজার চাকর বলে ভাবে। এ কষ্ট আমি কী করে সইব? বিরাটরাজা যখন খুব খুশি হয়ে তোমাকে হাতির সঙ্গে লড়াই করান, তখন আমাদের অন্তঃপুরের নচ্ছার মেয়েগুলো দাঁত বার করে হাসে আর ওদিকে ভয়ে আমার বুক কাঁপে—হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্য্যঃ মম তূদ্বিজতে মনঃ। তুমি যখন বুনো মোষ আর বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়তে থাক, তখন বিরাটরানি সুদেষ্ণা কী মজাই না পান, আর ওদিকে আমার যেন মাথার মধ্যে কেমন করতে থাকে। রানি তখন তাঁর দাসীদের কী বলে জানো? ওই রান্নার ঠাকুর আর এই সৈরন্ধ্রী প্রায় একই সময় এই বাড়িতে কাজে লেগেছে তো,—অস্মিন্ রাজকুলে চোভৌ তুল্যকালনিবাসিনৌ—তা ছাড়া একসঙ্গে এতকাল এই বাড়িতে আছে, ওকে দেখে দেখে একটু ভালবাসাও জন্মেছে সৈরন্ধ্রীর—তাই ওই রান্নার ঠাকুরটা লড়াই করতে নামলেই সৈরন্ধ্রীর মনে কষ্ট হয়। তা বাপু! ওই রান্নার ঠাকুর বল্লবও বেশ সুন্দর দেখতে, আর আমাদের সৈরন্ধ্রীও বেশ দেখতে—দুজনকে বেশ মানায়—যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ।

দ্রৌপদী বলে চললেন—শুধু এইটুকু হলেও হত। এত কথার পরে বলে কিনা—মেয়েদের মনের

কথা কে জানে বাবা—স্ত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ম্—কার মন কোথায় মজে ? এমন ধারা কথা শুনলে কার না রাগ হয়, বলো ? কিন্তু আমি যেই রেগে যাব, অমনই ওরা আরও বলবে—ওই রান্নার ঠাকুরটার ওপর সৈরন্ধ্রীর একটু ইয়ে আছে—সমশঙ্কত মাং ত্বয়ি। তুমিই বলো, তোমার মতো একটা মানুষকেও যদি এই নরকে পড়ে থাকতে হয় যে নরক তৈরি করেছেন রাজা যুধিষ্ঠির, তবে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী ? দ্রৌপদী অর্জুনের জন্যও ভীমের কাছে দুঃখ করলেন বিস্তর ; নকুল-সহদেবও এই সময় তার বিলাপের পরিসর থেকে বাদ গেলেন না। এটা হয়তো ভীমের সামনেই ভীমকে ভোলানোর মতো কোনও স্বামী-সাম্যবাদ।

সব কথার পরে আবার তাঁর নিজের কথা এল। কত হীন কাজ তাঁকে করতে হয়, কেমন করে কত কষ্টে রাজপত্নী সুদেষ্ণার ঝিগিরি করতে হয়—সব বলে দ্রৌপদী ভীমের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বার বার দুঃখের নিঃশ্বাস ছেড়ে, বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দ্রৌপদী ভীমের হৃদয় যেন একেবারে ঘেঁটে তুললেন—হৃদয়ং ভীমসেনস্য ঘট্টয়ন্তীদমব্রবীৎ। দ্রৌপদী শেষ কথা বললেন এমনভাবে যাতে ভীমের পুরুষকারে আঘাত লাগে। বললেন—আমি হয়তো অনেক অপরাধ করেছি বিধাতার পায়ে, যার জন্য এখনও আমার মতো অভাগার মরণ নেই কপালে—অভাগ্যা যত্র জীবামি কর্তব্যে সতি পাণ্ডব।

দ্রৌপদীর মুখে এমন কষ্টের কথা শুনে ভীম আস্তে আস্তে দ্রৌপদীর হাত দুটি নিয়ে স্পর্শ করালেন নিজের গালে। চেঁচিয়ে উঠলেন নিজের ওপর ধিক্কারে—বৃথাই আমার বাহুবল, বৃথাই অর্জুনের গাণ্ডীব-টঙ্কার। নইলে তোমার যে হাত দুটি ছিল কোমল, রক্ত-লাল, সেই হাতে আজ কাজ করে করে কড়া পড়েছে। ভীম হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্ত হলেও এই মুহূর্তে ধৈর্য হারালেন না। যে যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী খুব করে গালাগালি দিয়েছেন, সেই যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ টেনে ভীম বললেন—যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের অবসান প্রতীক্ষা করছেন দ্রৌপদী ! নইলে সেইদিনই আমি লাথি মেরে কীচকের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতাম।

ভীম যতই রাগ করুন, সভার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সেই কটাক্ষপাত তিনি ভোলেননি। সরল মানুষ, অজ্ঞাতবাসের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি সুস্থির যুধিষ্ঠিরের কথার মূল্য দিচ্ছেন বেশি। যে করেই হোক, এটা তাঁর মাথায় ঢুকেছে যে, কীচকের দৌরাত্ম্য সাময়িক। এই ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে পাণ্ডবরা যদি লোকচক্ষে প্রকট হয়ে পড়েন, তবে যুধিষ্ঠির পুনরায় বারো বছরের বনবাসে যাবেন। তিনি কিছুতেই সত্যভ্রষ্ট হবেন না। দ্রৌপদীকে ভীম বোঝালেন—দ্যাখো, যাদের জন্য আজকে রাজ্যচ্যুত হয়ে দিশাহারার মতো ঘুরছি, সেই দুর্যোধন, দুঃশাসন শকুনি অথবা কর্ণের গলা যতক্ষণ না কাটতে পারছি, ততক্ষণ আমার মনের কাঁটা যাবে না। তুমি একটু ধৈর্য ধরো, অত রাগ কোরো না।

অজ্ঞাতবাসের শেষ পর্যায় থেকে যুদ্ধের উদ্যোগ-কাল পর্যন্ত ভীমকে আশ্চর্যভাবে মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে দেখছি। এমন কী যে যুধিষ্ঠিরের ব্যাপারে তিনি সর্বক্ষণ দ্রৌপদীর সহমত পোষণ করেন, সেই যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে তিনি দ্রৌপদীকে বলছেন—এত রাগ কোরো না, প্রিয়া আমার। তুমি যুধিষ্ঠিরকে যেভাবে গালাগালি দিলে, এই গালাগালি যদি তাঁর কানে যায় তবে তিনি আত্মহত্যা করবেন, দ্রৌপদী ! —শৃণুয়াদ্ যদি কল্যাণি নূনং জহ্যাৎ স জীবিতম্। দ্রৌপদীও বুঝলেন। বললেন—আমি যে কষ্ট পেয়েছি তাতে আমার মাথার ঠিক ছিল না ভীম—তাই অমন করে বলেছি। কিন্তু এটাও তো ভাবতে হবে যে, কীচক আমাকে নির্লজ্জভাবে কামনা করছে। সভার মধ্যে বিরাটের সামনে, যুধিষ্ঠিরের সামনে, এমন কী তোমার সামনেও সে আমাকে লাথি মারল। আবার তার সঙ্গে দেখা হলে, আমার দিক থেকে বাধা এলে, আবারও সে আমাকে মারবে—দর্শনে দর্শনে হন্যাৎ। কাজেই ভীম এর একটা বিহিত না করলেই নয়। দ্রৌপদী ভীমকে আবার চেতিয়ে তুললেন। বললেন—ভীম ! জটাসুরের হাত থেকে তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ। ভাইদের সঙ্গে নিয়ে জয়দ্রথের হাত থেকেও তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ। আজ এই বিপদে কীচকেরও একটা ব্যবস্থা করো। যেমনি পাথরের ওপর বাড়ি মেরে কলসী ভাঙে, তেমনি কীচকের মাথাটাও তুমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। কীচক বেঁচে থাকতে কাল যদি সূর্য ওঠে, তবে জেনো আমি বিষ খেয়ে মরব। ভীম

বুঝলেন—দ্রৌপদী শারীরিক এবং মানসিক দুই দিক দিয়েই বিপর্যস্ত। স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রৌপদী কখনও এই ব্যবহার করেন না। ক্রন্দনরতা দ্রৌপদী ভীমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—ভীমস্যোরঃ সমাশ্রিতা। সান্ত্বনায়, সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে ভীম আবারও জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। বললেন—ঠিক আছে। যেমনটি তুমি বলছ, তেমনটিই হবে। আজকের সন্ধ্যাবেলার মধ্যেই কীচককে আমি শেষ করে দেব। কথা দিলাম। তুমি কীচককে নিভৃত মিলনের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসো বিরাটরাজার নৃত্যগৃহে। দিনের বেলায় সেখানে নাচ গান হয় বটে কিন্তু রাতের বেলায় কেউ সেখানে থাকে না। সেখানে একটা বিছানাও পাতা আছে। আমি ওই বিছানাতে শুয়েই কীচককে তার মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।

যে রাত্রে দ্রৌপদী ভীমের সঙ্গে কথা বলে এলেন, তার পরদিন সকালেই কীচক এল দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করতে। নিজের সম্বন্ধে নানা রকম দম্ভোক্তি করে সে আবারও দ্রৌপদীর কাছে তার কুপ্রস্তাব ব্যক্ত করল। যেন ভয় পেয়েছেন, যেন একটু গলে গেছেন—এই রকম একটা ভাব করে দ্রৌপদী কীচককে নিভৃত-মিলনের প্রস্তাব দিলেন বিরাটরাজার নৃত্যগৃহে। কীচক সানন্দে রাজি হল এবং সেই সন্ধ্যায় অপরূপ সাজে সেজে নাগরক-বৃত্তির সমস্ত সরসতা নিয়ে দ্রৌপদীর কাছে উপস্থিত হওয়ার তোড়জোড় আরম্ভ করল।

কীচকের সঙ্গে কথা সেরেই দ্রৌপদী আরও একবার ভীমের কাছে ছুটে গেছেন রান্নাঘরে। বলেছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে। এবার শুধু কীচককে মেরে তুমি আবারও আমার চোখের জল মুছিয়ে দেবে—অশ্রুদুঃখাভিভূতায়া মম মার্জস্ব ভারত। দ্রৌপদী বাক্-বৈদগ্ধ্যে ভীম আর গতরাত্রের ভীম রইলেন না। দ্রৌপদী আত্মত্রাণের জন্য আর কোনও ভাইয়ের কাছেই যে যাচ্ছেন না, শুধু একান্তভাবে তাঁর ওপরেই নির্ভর করছেন—এই দুরূহ সৌভাগ্য তাঁকে এতটাই উচ্ছ্বসিত করে তুলল যে, ভীম তাঁর পূর্বরাত্রের সংযত প্রশান্তিটুকু ভুলেই গেলেন। তার ওপরে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ পেয়ে—এবং সে যুদ্ধও শুধু দ্রৌপদীর জন্যই যেহেতু—ভীম একেবারে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন দ্রৌপদীর কাছে।

ভীম বললেন—হাতি দেখেছ দ্রৌপদী ? হাতি যেমন পা দিয়ে বেল ফাটায়, ঠিক তেমন করেই আমি কীচকের মাথা ফাটাব। আমি হিড়িম্বকে মেরে যেমন হাতের সুখ করেছিলাম, সেই সুখই তুমি আজ আবার আমাকে এনে দিলে—সা মে প্রীতিঃ সমাখ্যাতা কীচকস্য সমাগমে। আজকে আমি তাকে শেষ করে ছাড়ব। যদি এ কাজ গুপ্তভাবে সম্পন্ন হয়, তো ভাল কথা। যদি না হয় তো প্রকাশ্যেই কীচককে মারব। তারপর দরকার হলে বিরাটরাজার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তারপর ফিরে যাব দেশে। সেখানে দুর্যোধনকে মেরে আমাদের রাজ্য কেড়ে নেব। থাকুন এখানে যুধিষ্ঠির, তিনি বসে বসে মৎস্যরাজ বিরাটের সেবা করুন—কামং মৎস্যমুপাস্তাং হি কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

কল্পনার যুদ্ধে ভীম অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছেন। দ্রৌপদীকে খুশি করার জন্য ভীম এখন যুধিষ্ঠিরকে ছাড়তেও রাজি। দ্রৌপদী দেখলেন—পাগলা ঘোড়া খেপেছে। যিনি আগের দিন যুধিষ্ঠির দুঃখ পাবেন বলে দ্রৌপদীকে পর্যন্ত শান্ত হতে বলেছেন, তিনি আজকে উলটো কথা বলছেন। দ্রৌপদী বুঝলেন—গতিক মোটেই সুবিধের নয়। ভীম যদি হুঙ্কারে-টঙ্কারে এমন কিছু করে বসেন, যাতে লোক-জানাজানি হয়ে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়, তবে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কেউ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। তখন পুরো ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। দ্রৌপদী তাই ভীমের কাছে অনুনয় করে বললেন—না বাপু! তুমি গুপ্তভাবে লোকচক্ষুর আড়ালেই কাজটা সারো। আমার জন্য অজ্ঞাতবাসের শপথ নষ্ট কোরো না—নিগূঢ় স্ত্বং তথা বীর কীচকং বিনিপাতয়। ভীম স্বীকার করলেন—ঠিক আছে তাই হবে। যেমন তুমি বলবে, তাই করব—যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।

সব ঠিকঠাক হয়ে রইল। সন্ধ্যাবেলায় নৃত্যপরা বালিকারা সব বিদায় নিয়েছে বিরাটের নৃত্যগৃহ থেকে। ভীম নিশ্চুপে শুয়ে রইলেন নৃত্যশালার সুসজ্জিত শয্যায়। সেজে-গুজে মাথায় মালা জড়িয়ে, গন্ধভরা চিনাংশুকের উত্তরীয় উড়িয়ে কীচক শয্যা-শায়িত ভীমকে স্পর্শ করল। কীচক ভীমরূপী মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলল—সুন্দরী! বাড়ির সব মেয়েরাই আমার বসন-ভূষণ আর

রূপের প্রশংসা করে। ভীম বললেন—তা যা বলেছ ; এমন স্পর্শসুখ আমি জীবনে অনুভব করিনি। ভীম এবার কীচকের চুলের মুঠি ধরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কীচকের শক্তি কম নয়, কিন্তু ভীমের শক্তি যেহেতু তার থেকে বেশি, অতএব লড়াই হল অনেকক্ষণ এবং যুদ্ধের পরিণতি ঘটল ভীমের অনুকূলে। যুদ্ধের অন্তকালে কীচক একটি গোলাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত হল। তাকে দেখে মনে হল যেন একটা জলের কচ্ছপ ডাঙায় উঠেছে—কূর্মং স্থলে ইবোদ্ধৃতম্। ভীম দ্রৌপদীকে কীচকের অবস্থাটা দেখিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেলেন।

দ্রৌপদী প্রহরীদের খবর দিলেন সেই রাত্রেই। তারা মশাল জ্বালিয়ে কীচকের মৃত শরীর পরীক্ষা করল। মৃত কীচকের একশো ভাই উপকীচকেরা এসে লায়েক দাদার পরিণতি দেখে প্রথমে অনেক কাঁদল। তারপর এই অপঘাত-মৃত্যুর জন্য তারা দ্রৌপদীকেই দায়ী করে তাঁকে বেঁধে নিয়ে চলল শ্মশানে। তারা ঠিক করল—মৃত কীচকের সঙ্গে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী চেঁচামেচি শুরু করলেন, স্বামীদের ছদ্মনাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন শ্মশানযাত্রার পথে। সেই আর্ত চিৎকার বিরাটের রান্নাঘরে পৌঁছল।

ভীম রান্নার ঠাকুরের সাজগোজ পালটে, খাটো ধুতি ফেলে দিয়ে একটা বারো হাতি কাপড় পরে—ততঃ স ব্যায়তং কৃত্বা বেশং বিপরিবর্ত্য চ—অপরিচিত রাস্তায় রাজধানীর প্রাচীর টপকে শ্মশানে পৌঁছলেন। সেখানে একটা শুকনো গাছ উপড়ে নিয়ে একটার পর একটা বাড়ি মেরে একশো-পাঁচ ভাই উপকীচকের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। ফিরবার সময় দ্রৌপদীকে শুধু বললেন—যারা বিনা অপরাধে তোমার সঙ্গে এই রকম অসভ্যতা করে তাদের আমি এইভাবেই মারি, —এবং তে ভীরু বধ্যন্তে যে ত্বাং হিংসন্ত্যনাগসম্। ভীম বুঝিয়ে দিলেন ভবিষ্যতে দুর্যোধন-দুঃশাসনের ব্যাপারেও তিনি কথা রাখবেন। ভীম সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাস্তায় পাকশালায় ফিরে গেলেন।

ভীম যে কাণ্ড করলেন, তাতে সৈরন্ধ্রীর গন্ধর্ব-স্বামী সম্বন্ধে একটা সার্বত্রিক ভয় ছড়িয়ে গেল বিরাটের রাজধানীতে। দ্রৌপদীর দিক থেকে ভীমের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না। শ্মশান থেকে ফিরে চলার পথে জনসাধারণের ভীতত্রস্ত ভাব দেখতে দেখতে এক সময় তিনি রাজধানীতে ঢুকলেন। ঘরে ফেরার আগে তিনি ভীমের কাছে একবার না গিয়ে পারলেন না। কীচকের ঘটনা আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে পঞ্চস্বামীর একতম ভীমকে তিনি যে ভাবে ভালবেসেছেন, যত তাঁর ওপর নির্ভর করেছেন—সেগুলি যে মিথ্যা নয়, সেটা বোঝাবার জন্যই যেন দ্রৌপদী আবারও গেলেন বিরাটের পাকশালায়। ভীমকে বললেন—আমাকে যে এমনি বিপদে বাঁচিয়েছে, আমার সেই গন্ধর্ব-রাজাকে নমস্কার—গন্ধর্বরাজায় নমো যেনাস্মি পরিমোক্ষিতা।

ভীম সব বোঝেন। দ্রৌপদীর এই উচ্ছ্বাস-বাক্য—সে যত মধুরই লাগুক তাঁর কানে, যতই তা তাঁর আত্মতুষ্টির কারণ ঘটাক—তবুও ভীম জানেন—দ্রৌপদীর এই উচ্ছ্বাস-বাক্য যতখানি তাঁর কাজের পুরস্কার, যতখানি কৃতজ্ঞতা, প্রেম ততখানি নয়। ভীম জানেন—পঞ্চপাণ্ডবের একতম স্বামী হিসেবে যে ভালবাসা তাঁর প্রাপ্য ছিল, এ সে ভালবাসা নয়—'মনে কি করেছ, বঁধু,/ ও হাসি এতই মধু/ প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ॥তবু থাক, কৃতজ্ঞতা হলেও তা এত শুষ্ক নয় যা ভীমের অভিমান তুঙ্গে তুলে দিতে পারে। ভীম নিজে তাঁকে ভালবেসেই পরম তৃপ্ত, কিন্তু এইসব 'শিভ্যালরি'র মুহূর্তে যখন প্রিয়তমা রমণী এসে বলে—নমস্কার গন্ধর্বরাজাকে, তখন কোথায় কোন অভিমানে যেন খোঁচা লাগে। ভীম বলে ওঠেন—না, না, সেসব কিছু নয়, আমি যা করেছি, তাতে তোমার বশম্বদ অন্য পাণ্ডব-পুরুষেরা এখন নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁদের কিছু করণীয় ছিল বলে, তাঁরা যদি মনে মনে লজ্জিত হয়ে থাকেন, তবে আমি তাঁদের সেই লজ্জা নিবারণ করলাম মাত্র। তাঁরা এখন দায়মুক্ত বোধ করবেন, এর বেশি আর কী—তস্যাস্তে বচনং শ্রুত্বা অণৃনা বিচরন্ত্যত।

কথাগুলির মধ্যে যে অভিমানই থাকুক, অন্তত ভীমের এই অভিমানটুকু যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ—দ্রৌপদী ভীমের সঙ্গে দেখা করেই বিনা কারণে অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং

একটু মান-অভিমানের পালাও চালিয়ে গেছেন। ভীম যে বলেছিলেন—'তোমার বশম্বদ অন্য পাণ্ডব-পুরুষেরা'—এই ইঙ্গিত হয়তো অর্জুনের দিকেই, যদিও উলটো ব্যঞ্জনায় অর্জুন দ্রৌপদীর বশম্বদ না হলেও, দ্রৌপদী যে তাঁরই বশম্বদ—সেটাই হয়তো ভীমের ইশারা।

আমরা ভীম এবং দ্রৌপদীর পরস্পর-সম্পর্কে পরে আবার আসব। আপাতত জানানো দরকার—কীচকের মতো বীর যোদ্ধার মৃত্যু এত অস্বাভাবিকভাবে হয়েছে বলে, একটা সন্দেহ কুরুরাজ্য পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কুরুবৃদ্ধেরা কীচক-বধে কোনও একক বাহুবলের প্রমাণ দেখে ভীমের অবস্থান সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিন্তই হয়ে গিয়েছিলেন। মহাভারতে এ-কথা এত স্পষ্ট করে বলা না থাকলেও আদি নাট্যকার ভাস এই অনুমানটুকু কাজে লাগিয়েই তাঁর বিখ্যাত 'পঞ্চরাত্র' নাটক রচনা করেন। কীচকের মৃত্যুর পর ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা দুর্যোধনের সঙ্গে জোট বাঁধেন বিরাটরাজ্য আক্রমণ করার জন্য। বিরাটের গোশালা লুণ্ঠন করাটা দুর্যোধনের একটা চাল হলেও, তাঁর মনেও যে পাণ্ডবদের অবস্থান সম্পর্কে একটা সংশয় এবং অনুমান ছিল, এটা বোঝা দুরূহ নয়।

ঠিক হল, আক্রমণ হবে দুটো সেক্টরে। সুশর্মা আগে গিয়ে বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করবেন এবং বিরাট যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে গেলেই কৌরবরা বিরাটের গোশালা আক্রমণ করবেন। কিন্তু যুদ্ধ এমন এক জিনিস, ভাবা যায় এক রকম, হয় আর এক রকম। সুশর্মা যে অসফল হবেন—এ তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। বিরাট যুদ্ধযাত্রায় বেরুলে তিনি নব-নিযুক্ত কর্মচারী ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির, ভীম এবং নকুল-সহদেবকেও সঙ্গে নিয়ে নেন। প্রথম দিকে এঁরা বিরাটরাজার পিছন-পিছনই যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে সুশর্মা বিরাটের অশ্ব, রথ, সারথি সব শেষ করে দিয়ে তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির ভীমকে নির্দেশ দিলেন বিরাটকে মুক্ত করার জন্য—এত কাল সুখ-বাসের প্রতিদান।

যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে ভীম ভারী খুশি। বললেন—দাদা! সামনে যে সরল-সোজা গাছটা আছে, এটাই আমার গদার কাজ করবে। যুধিষ্ঠির বললেন—করো কী, করো কী? গাছ দিয়ে গদার কাজ সারলে লোকে তোমাকে সন্দেহ করবে, কারণ এমন অসাধারণ ক্ষমতা যে ভীম ছাড়া অন্য কারও নেই! লোকে তোমাকেই ভীম বলে বুঝে নেবে—জনাঃ সমববুধ্যেরন্ ভীমো'য়মিতি ভারত। তুমি ভাই গতানুগতিক ধনুর্বাণ, ঢাল-তলোয়ার নিয়েই যুদ্ধ করো। যেমন অন্য মানুষে করে, সেইভাবেই বিরাটকে ছাড়িয়ে আনো। ভীম গেলেন এবং একে তাকে মেরে-ধরে শেষ পর্যন্ত সুশর্মাকে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁধে নিয়ে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। ভীম মেরেই ফেলতেন সুশর্মাকে, কিন্তু সেই এক কথা—দয়ালু যুধিষ্ঠির তাঁকে ছেড়ে দিলেন। সুশর্মা বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করে পালিয়ে বাঁচলেন।

এর পর বিরাটরাজ্যে আর একটি সাংঘাতিক যুদ্ধ হল। অর্জুনবেশী বৃহন্নলার সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে ভীমের কোনও অংশ নেই বটে, কিন্তু যুদ্ধ-জয়ের শেষে পাণ্ডবরা যখন আত্মপরিচয় দিয়ে রাজসভায় দাঁড়ালেন, তখন বিরাটরাজাকে আমরা ভীমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে দেখছি—সুশর্মার হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে আনার জন্য। বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোদ্যোগ শুরু হয়ে গেল। বিরাটের বাড়িতে পাণ্ডব, যাদব, পাঞ্চাল, মৎস্যদের 'মিটিং' বসল। দ্রুপদের দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এলেন সঞ্জয়। দেশ-বিদেশের রাজাদের কাছে দু-পক্ষ থেকেই চিঠি গেল পাণ্ডব-কৌরবের একতর পক্ষ অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়ে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

৯

বনপর্বে দ্রৌপদী যখন জয়দ্রথকে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন—তাঁর কোন স্বামীর চরিত্র কেমন, আমরা তখন একটি স্ত্রীর মুখে তাঁর পঞ্চ স্বামীর আচার-ব্যবহারের এক এক রকম মূল্যায়ন লক্ষ করেছি। আজ যখন কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রায় লাগো-লাগো, তখন আরও একবার ভীমের মূল্যায়ন শুনতে

পাচ্ছি এবং তা শুনতে পাচ্ছি এক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর পিতার মুখে। আমরা অনেক আগে বলেছিলাম যে, দুর্যোধন সমস্ত পাণ্ডবদের মধ্যে একমাত্র ভীমকে বেশি মূল্য দিতেন এবং তাঁর এই ভাবনা পরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে তাঁর পিতার কাছ থেকে। কথাটা সত্যি কি না, তা এখন যাচাই করে নেবার মতো সময় এসেছে।

সঞ্জয় পাণ্ডবদের কাছ থেকে ঘুরে এসে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেসব শক্তিশালী নরপতি যোগ দিয়েছেন, তাঁদের বলাবল সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করলেন। পাণ্ডবদের সম্মিলিত শক্তির কথাও বাদ গেল না। ধৃতরাষ্ট্র সব ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর ভেবেচিন্তে বললেন—সঞ্জয়! তুমি যাঁদের নাম করলে এঁরা যদি সব একদিকেও দাঁড়ান আর ভীম আর এক দিকে—তবুও বলব আমার ভয় ভীমকেই—ভীমসেনাদ্ধি মে ভূয়ো ভয়ং সঞ্জায়তে মহৎ। বাঘের থেকে যেমন হরিণের ভয়, এ ভয় তেমনই। তুমি জানো সঞ্জয়! শুধু ভীমের জন্য রাতে আমার ঘুম হয় না—জাগর্মি রাত্রয়ঃ সর্বাঃ। আমার পক্ষে একটা লোকও নেই, যে ভীমের শক্তি সহ্য করতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র এবারে যা বললেন, সে কথাগুলি আমাদের জানা। দ্রৌপদী ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন জয়দ্রথকে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ভীম কখনও ক্ষমা করতে জানে না আর শত্রুতা মনে রাখে চিরকাল। হাসির সময়েও ভীম হাসে না, সব সময় তাকায় বাঁকা ভাবে, স্বভাবে ভীষণ উদ্ধত আর কথা বলে গম্ভীর স্বরে—অনর্মহাসী সোন্মাদ-স্তির্যক্‌প্রেক্ষী মহাস্বনঃ। এমন যে ভীম, সে আমাদের বদমাশ ছেলেগুলিকে শেষ না করে ছাড়বে না। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাচ্ছেন, ভীষণ ভয় পাচ্ছেন ভীমকে। এই বিরাট যুদ্ধের আগে দুর্নিবার ভীম-ভয় তাঁকে ভীমের বাল্যকালের কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয়! ভাবলে আমার বুক কেঁপে ওঠে—উদ্বেপতে মে হৃদয়ম্। ছোটবেলাতেও তার তেজ ছিল সাংঘাতিক। যেমন খেতে পারত, তেমন ছিল নিষ্ঠুর। আমার ছেলেগুলিকে সেই ছোটবেলাতেও সে হাতির মতো পিষে দিত। সব সময় আমার ছেলেরা ভীমের কাছে কষ্ট পেত, সঞ্জয়! আর জানো তো, এই কষ্ট থেকেই কৌরবের শত্রুতা বদ্ধমূল হয়ে গেল পাণ্ডবদের ওপর—স এব হেতুর্ভেদস্য ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। খেলার ছলে ভীম ছোটবেলাতেও যে পীড়া সৃষ্টি করেছেন কৌরবদের ওপর, সেই পীড়া দুর্যোধন কখনও ভোলেননি। সেই ছোটবেলাতেই দুর্যোধন ভীমকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছেন? যাতে তাঁর পথে কোনও কাঁটা না থাকে। অন্য দিকে ভীমও দুর্যোধনের কাছে উপর্যুপরি লাঞ্ছনা লাভ করে তাঁর শত্রুতাটাই শুধু মাথার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কোনওভাবেই তিনি তাঁদের ক্ষমা করতে পারেন না। কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধে তাই ভীমও নিজে ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণ—স এব হেতুর্ভেদস্য। তবে সেই কারণে দুর্যোধন তালি বাজানোর কাজ করেছেন। বিষপান, অগ্নিদান থেকে আরম্ভ করে সভায় দ্রৌপদীকে এবং ভীমকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করে সেই যুদ্ধের কারণ গভীরতর করে ফেলেছেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এসব জানেন। আর জানেন বলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর ভয়ও গভীর হয়ে উঠছে। সঞ্জয়কে তিনি বলেছেন—সেই পাশাখেলার সময়েই যে সে আমার ছেলেগুলিকে মেরে ফেলেনি, এই আমার পরম লাভ—অতিলাভস্তু মন্যে'হম্। ভীম ছোটবেলাতেও আমার কথা শোনেনি, তার ওপরে আমার বদমাশ ছেলেগুলো তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। অতএব সে কেন এখন আমার কথা শুনবে—কিং পুনর্মম দুষ্পুত্রৈঃ ক্লিষ্টঃ সম্প্রতি পাণ্ডবঃ।

মনে রাখা দরকার—ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে মায়ের হাত ধরে পাঁচ ভাই পাণ্ডব যেদিন হস্তিনাপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় তাঁদের ওপর একের পর এক যে অত্যাচার হয়েছে, ভীম ছিলেন সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ। হয়তো সেদিন থেকেই তাঁর মুখ থেকে হাসি চলে গেছে, কোনও কিছুই তিনি আর সোজা চোখে দেখতে পান না। যুধিষ্ঠির-অর্জুনরা শুধু এই পাগলা ঘোড়ার রাশ টেনে রেখেছেন। কিন্তু আজ কালের পরিণতিতে যে যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠেছে, সেখানে কাল-রাত্রির অস্পষ্ট নক্ষত্র-আলোকে প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছেন—তাল-গাছের মতো লম্বা গৌরবর্ণ এক যুবকের হাতে আটকোণা অথবা

ছয়কোণা, চার হাত পরিমাণ একটি গদা, চারদিকে তার লোহার শিক লাগানো, আর সেই গদা এসে ঘুরে ঘুরে পড়ছে তাঁর ছেলেদের মাথায়—ভীমসেনো গদাপাণিঃ সূদয়িষ্যতি মে সুতান্। রাগে চোখ দুটি লাল, জিহ্বার সমস্ত রস আক্রোশে শুষে নিয়ে অসহনীয় বেগে ভীম ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে—ধৃতরাষ্ট্র যেন চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন– পশ্যামীব অতিতাম্রাক্ষম্ আপতন্তং বৃকোদরম্।

ভীমের এই সাংঘাতিক রূপ যা ভেবে শত্রুপক্ষের সবাই আতঙ্কিত, এই রূপের হঠাৎ এক পরিবর্তন আমরা লক্ষ করব। যদিও এই পরিবর্তন হঠাৎ উল্কার মতো এসে ধূমকেতুর মতো চলে গেছে, তবুও এই পরিবর্তনের কারণ একটা আছে বলে আমরা মনে করি। পাণ্ডব-কৌরবের পক্ষ থেকে সন্ধি-শান্তির প্রস্তাব যখন ব্যর্থ হল, তখন কৃষ্ণ শেষ চেষ্টা করার জন্য 'পিস মিশন' নিয়ে হস্তিনায় যাবেন ঠিক করলেন। এই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম—সবাই একবাক্যে শান্তির ওপরেই গুরুত্ব দিলেন বেশি—কৃষ্ণ জানতেন সন্ধি-শান্তি কিছুতেই হবে না, অন্তত দুর্যোধন বেঁচে থাকতে হবে না। কিন্তু দুর্যোধনকে শেষ বারের মতো শান্তির চেষ্টা প্রত্যাখ্যানের সুযোগ দিয়ে তিনি যুদ্ধের দায়টা সম্পূর্ণ দুর্যোধনের ওপর চাপাতে চাইছিলেন, কারণ তাতে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক ফায়দা বেশি।

যাই হোক, শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর মতামত জানালেন। আশ্চর্য হল, যুধিষ্ঠির অন্য সময় যত 'কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিচুড' দেখিয়েছেন, এই সময়ে ততটা দেখাননি। ভাল কথায় হলে ভাল, না হলে যুদ্ধ—এইটাই ছিল যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য। সবার ওপরে অবশ্য শান্তির দিকে যুধিষ্ঠিরের ঝোঁক ছিল স্বভাবতই বেশি। কিন্তু বড় বিপ্রতীপভাবে যুধিষ্ঠিরের থেকেও এখানে আশ্চর্য ছিল ভীমের ব্যবহার। যে ভীম ছোটবেলা থেকে আজকের দিনটির জন্য মুখিয়ে ছিলেন, সেই ভীম কৃষ্ণকে বললেন—তুমি শান্তির কথাই বোলো, কৃষ্ণ ! শুধু শুধু যুদ্ধের কথা বলে ওদের ভয় পাইয়ে দিয়ো না—মাস্ম যুদ্ধেন ভীষয়েঃ। অসহিষ্ণু উদ্ধত দুর্যোধনের সঙ্গে তুমি মিষ্টি করে কথা বোলো।

ভীম দুর্যোধনের চরিত্র জানেন, ঠিক যেমন দুর্যোধনও সবচেয়ে ভাল জানেন ভীমের চরিত্র। অতিক্রোধী মানুষকে যে মেজাজ দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করা যাবে না—সেটা ভীম বোঝেন বলেই দুর্যোধনের মতো 'অদীর্ঘদর্শী নিষ্ঠুরী' মানুষের সঙ্গে ভীম শান্ত সুরে কথা বলবার উপদেশ দিচ্ছেন কৃষ্ণকে। বললেন—দুর্যোধন মরবে, তবু নিজে যা বুঝবে, সে মত ছাড়বে না—নৈব জহ্যাৎ স্বকং মতম্। কাজেই তুমি যা বলবে, কৃষ্ণ তা দুর্যোধনের ভাব বুঝে বোলো। ধীরে ধীরে বোলো, আস্তে আস্তে বোলো, রুক্ষভাবে খবরদার বোলো না—তস্মান্মৃদু শনৈর্ব্রূয়াঃ...নোগ্রমুগ্রপরাক্রম।

ভীমের হল কী ? এ যে একেবারে উলটো গাইছেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি—যাঁদের নাম শোনামাত্র যিনি শতবার হত্যার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেন—সেই ভীম শান্তি চাইছেন, সেই ভীম দুর্যোধনের সঙ্গে ধীরে-মধুরে কথা বলার উপদেশ দিচ্ছেন এবং সেই ভীম বলছেন—আমরা না হয় দুর্যোধনের কাছে নিচু হয়েই থাকব—সর্বে বয়মধশ্চরাঃ।

ভীমের মুখে এই শান্তির বাণী যে কতটা অপ্রত্যাশিত, তা মহাভারতের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই জানেন। ভীমের এই উলটো গাওয়ার একটা কারণ মহাভারতেই স্পষ্ট বলা আছে, সেটা পরে বলছি। আগে জানাই যে, কারণটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আপনারা দুর্গাপুজোর ভাসানের সময় বিভিন্ন সমিতির আয়োজক যুবক-পুরুষদের রাস্তায় নাচতে-নাচতে যেতে দেখেন। সবাই এখানে নাচে না, কতিপয় নাচে। কোমর দুলিয়ে, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে, নানা ছাঁদে নাচে। এইসব উৎসব-প্রিয় যুবক-শ্রেণীর মধ্যে অনেক মুখচোরা যুবক আমি দেখেছি, যারা সহজে নাচতে চায় না, কিন্তু সঙ্গ দেয়, হাততালি দেয়। কিন্তু এক-একটা তুঙ্গ মুহূর্তে আসে ; কোনও চতুষ্পথের মিলন-স্থানে যখন তাসা-পার্টির বাজনা বেদম জমে ওঠে, দলের সমস্ত নাচিয়েরা উদ্দাম নাচতে-নাচতে মুখচোরার হাত ধরে টানাটানি করে, তখন সে আর থাকতে পারে না, সে নেচে ফেলে, ভালই নেচে ফেলে।

তুলনাটা কিন্তু এখানে উৎসবপ্রিয়তা বা আনন্দের সঙ্গে নয়, অথবা নয় মুখচোরা যুবকের সঙ্গেও। তুলনাটা হল অধিকাংশের চাপে পড়ে নেচে ফেলার সঙ্গে। বিরাটের রাজধানীতে বসে যাঁরা যুদ্ধের

উদ্যোগ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাকা-মাথা যাঁরা, তাঁরা সবাই মোটামুটি শান্তির প্রস্তাবে সামিল হয়েছিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন—এঁরা সকলেই চেষ্টা করছিলেন যাতে যুদ্ধটা অন্তত এড়ানো যায়। যুদ্ধে লোকক্ষয়ের ভাবনাটাই শুধু নয়, এঁদের বড় ভয় ছিল যে, যুদ্ধ লাগলে প্রসিদ্ধ কুরুবংশটাই একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। যে বংশে পুরু, দুষ্মন্ত, ভরত, কুরুর মতো রাজারা জন্মেছেন, সেই বংশ ঈর্ষা-দ্বেষে, জ্ঞাতিবিরোধে নষ্ট হয়ে যাবে—এটা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কৃষ্ণ—কেউই চাইছিলেন না। সবাই যখন ভরত-বংশ যাতে নষ্ট না হয়, কুলের মর্যাদা-ভঙ্গের কারণ যেন আমাদের ওপর না বর্তায়—এই ভাবনায় মরছিলেন, তখন এই উদার বৈরাগ্যময় ভাবনার মধ্যে—আমি দুঃশাসনের রক্ত খাব, দুর্যোধনের উরু ভাঙব—ভীমের এই সব আসুরিক এবং রাজসিক প্রতিজ্ঞা নিতান্তই বেমানান হয়ে যায়। বরঞ্চ সবাই যেখানে ওই একই কথা বলে উত্তম হওয়ার চেষ্টা করছেন, সেখানে ভীমই বা অধম হয়ে থাকবেন কেন ? অতএব তিনিও বলে উঠলেন—আমরা বরং অবনত হয়ে দুর্যোধনের কথাই মেনে চলব, আমাদের ভরত-বংশটা যেন নষ্ট না হয়—নীচৈর্ভূত্বা অনুযাস্যামো মাস্ম নো ভরতা নশন্। কৌরবদের সঙ্গে বরং কোনও সংস্রব না রেখেই আমরা চলব, কিন্তু এই বিখ্যাত কুরুবংশের গায়ে যেন কালি না লাগে—ন কুরূন্ অনয়ঃ স্পৃশেৎ।

একই কথা এর আগে যুধিষ্ঠিরও বলেছেন। কিন্তু আজ ভীম যে যুধিষ্ঠিরের তালে নেচে ফেললেন, অনেকের সঙ্গে মত মেলালেন—এটা সেই বিরাটসভার মধ্যে এতটাই বেসুরো লাগল যে, মহামতি কৃষ্ণ রীতিমতো কটাক্ষ করে বসলেন ভীমকে। বললেন—হল কী দাদা ! এরপর যে শুনব—ওজনদার পাহাড়ও বড় হালকা ; শুনব—আগুন তো গরম নয়, বড় ঠাণ্ডা—গিরেরপি লঘুত্বং তচ্ছীতত্বমিব পাবকে। চিরটাকাল ধরে তুমি দাদা—'হ্যান্ করেঙ্গা ত্যান্ করেঙ্গা' বলে যুদ্ধের প্রশংসা করে এসেছ। কৌরবদের ওপর রাগে তুমি ভাল করে ঘুমোও না পর্যন্ত, যদি বা ঘুমোও, তো উবুত হয়ে শোও। ঘুমের মধ্যেও তুমি কত না বকর-বকর করো, আর লোকে তোমাকে পাগল বলে। এক সঙ্গে অনেক লোকের সঙ্গে তুমি থাকতেও ভালবাস না। তোমার রাগ তোমাকে নির্জনে বসিয়ে রাখে। কখনও হাস, কখনও কাঁদ, কখনও বা মাথাটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে চোখ বন্ধ করে বসে থাক। তুমি ভুরু কুঁচকে থাক সব সময়, ঠোঁট কামড়াও যখন তখন। আমি কি বুঝি না ? এগুলো সব তুমি কর রাগে, দুর্যোধনের ওপর রাগে—সর্বং তৎ মন্যুকারিতম্। এত যে গদা স্পর্শ করে দুর্যোধনের উরু ভাঙার প্রতিজ্ঞা করেছিলে সেই তোমার বুদ্ধি হঠাৎ বড় শান্ত হয়ে গেল। হয়, এমনই হয়—যুদ্ধ যখন সামনে এসে পড়ে, তখন হাঁক-ডাক করা অনেক মানুষেরই ভয় হয়। তোমারও তাই হয়েছে। নইলে তোমার মতো লোক শান্তির কথা বলছে মানে, স্থাবর পর্বতও চলমান হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে—ইদং মে মহদাশ্চর্যং পর্বতস্যেব সর্পণম্।

কৃষ্ণের কথা শুনে ভীমের এত রাগ হল যে, তিনি ঘোড়ার মতো খানিকটা এদিক-ওদিক ছুটে নিলেন—সদশ্ববৎ সমাধাবৎ। বললেন—তুমি অন্তত আমাকে ভালই চেন কৃষ্ণ ! অনেককাল আমাকে দেখছ, ভালই চেন তুমি আমাকে—বেৎসি দাশার্হ সত্যং মে দীর্ঘকালং সহোষিতঃ। তুমি যা বলছ, বলে যাও। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে নেই তাই ; নইলে জেনে রেখো—আমার এই পাথরের মতো হাত দুটো দেখছ না, আর এই যে হাতের মাঝখানে মুগুরের মতো দুটো গুলি—এই হাতের জাঁতাকলে পড়েও কেউ বেরিয়ে যাবে, এমন লোক তো দুনিয়ায় দেখি না—য এতৎ প্রাপ্য মুচ্যেত ন তৎ পশ্যামি পুরুষম্। এর আগে যারা আমার পাল্লায় পড়েছে, তাদের আমি কী করেছি, তা তুমি জানো না, এমন তো নয়—ন হি ত্বং নাভিজানাসি—কাজেই সময় এলে দেখতেই পাবে। তুমি শুধু শুধু কটাক্ষ করছ আমাকে। যুদ্ধে আমার শরীরে ক্লান্তি আসে না, বুক কাঁপে না একটুও। বস্তুত আমি আমার নিজের সম্বন্ধে যতটুকু বললাম, আমি তার থেকে একটু বেশিই বটে—বিদ্ধি মামধিকং ততঃ। আর এতক্ষণ যে আমি শান্তির কথা শুনালাম, সে শুধুই এই প্রখ্যাত ভরতবংশের ওপর ভালবাসায়, আর অবশ্যই খানিকটা দয়ায়—কিন্তু সৌহৃদমেবৈতৎ কৃপয়া মধুসূদন।

মহামতি কৃষ্ণ আর কথা বাড়াননি। বললেন—রাগ কোরো না, দাদা। তোমাকে উসকে দিয়ে একটু মজা করছিলাম মাত্র—প্রণয়াদিদমব্রুবম্। আসলে—কৃষ্ণ জানতেন যে, যুদ্ধ লাগবেই।

বিরাটের সভায় বসে সবার মতো তিনিও সবার কথা শুনছিলেন। তিনি জানতেন—কারা যুদ্ধের কথা বলবেন, আর কারা শান্তির প্রস্তাব দেবেন। ভীম যা বলেছিলেন, সেটা কৃষ্ণের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। শান্তির পত্র-পুষ্প সমারোহে শেষ পর্যন্ত যদি অবধারিত যুদ্ধের মেজাজটুকু আগে থাকতেই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যুদ্ধ লাগলে যে অপ্রস্তুত হতে হবে—সেটা কৃষ্ণ জানতেন বলেই ভীমের অপ্রত্যাশিত শান্তির বাণীতে তিনি খানিকটা বিব্রতই হয়েছেন। তিনি মজা করেননি মোটেই, তিনি ভীমের আসল ভাবটা সভার মধ্যেই যাচাই করে নিলেন—তস্মাদাশঙ্কমানো'হং বৃকোদর মতিং তব।

ভীমের মুখে ধর্ম-কথা শুনে আরও একজন বড় আঘাত পেয়েছিলেন মনে। তিনি দ্রৌপদী। ক্রোধে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন—আমি যদি দুঃশাসনের কালো হাতখানা কাটা অবস্থায় মাটিতে ধুলো-ময়লায় মলিন হয়ে যেতে না দেখি—দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংচ্ছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্—তাহলে আমার কীসের শান্তি? আজকে এই ভীমের মুখে শান্তি-সন্ধির কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আজকে ভীমও ধর্মের কথা শোনাচ্ছেন—যো'য়মদ্য মহাবাহু ধর্মং সমনুপশ্যতি। 'কালো হাত' ভেঙে দেবার প্রবাদ আজকের নয়, বহুকালের—দুঃশাসনভুজং শ্যামং।

সত্যি কথা বলতে কী, ভীম তো এরকম নন। কিন্তু ওই যে বললাম, তিনি সবার সঙ্গে নেচে ফেলেছেন। মহামতি কৃষ্ণ অবশ্য দ্রৌপদীর সামনে ভীমের কথাটা খানিকটা 'মেক্-আপ' করে দিয়েছেন এবং সেইটাই যা ভীমের বাঁচোয়া। ভীম স্বরূপে ফিরে এলেন কৃষ্ণের দৌত্যকর্ম ব্যর্থ হবার পর। কৌরব সভায় কৃষ্ণ যখন সন্ধি-শান্তির কথা বলছিলেন, তখন তাঁর অনুক্রমে ভীষ্ম-দ্রোণরা দুর্যোধনকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং তার মধ্যে ভীমের ভয় দেখাতেও তাঁরা ছাড়েননি। কৃষ্ণ ফিরে আসবার সময় জননী কুন্তীও বারবার ভীমের উদ্দেশে জানিয়েছেন যে, সে যেন দ্রৌপদীর অপমানের কথাটা খেয়াল রাখে। কুন্তীর বিশ্বাস ছিল অর্জুনের মতো ধনুর্ধরের সঙ্গে যদি একবার ভীমের যোগ হয়, তবে কৌরব-কুলের ধ্বংস অনিবার্য—ভীমসেন-দ্বিতীয়শ্চ কুলমুদ্‌বর্তয়িষ্যতি।

যুদ্ধের ঠিক আগে আগে শকুনির ছেলে উলূক পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন দুর্যোধনের দূত হয়ে। অবধ্য দূত দুর্যোধনের জবানীতে যেসব কথা পাণ্ডবদের বলেছিল, তা শুনে ভীম দাঁতে দাঁত ঘষে যেভাবে তাঁর বাহু দুটি উত্তোলন করেছিলেন, তাতে তার মৃত্যু আসন্ন ছিল। শুধুমাত্র অর্জুনের হস্তক্ষেপে উলূক তার বিপন্ন অবস্থা থেকে বেঁচে যায় বটে, কিন্তু দুর্যোধনের কাছে ফিরে যাবার সময় কৃষ্ণ তাকে পরিষ্কার বলেই দিলেন যে,—বাপু! দুর্যোধন যদি মনে করে থাকেন—ভীমের প্রতিজ্ঞা মাঠে মারা যাবে, তবে সেটা চরম ভুল হবে। দুর্যোধন যেন নিশ্চিত ধরেই নেন যে, দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করার কাজটা আজই হয়ে গেছে—দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতমদ্যাবধারয়।

আসলে এ সবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। ভীম এমনিতে বেশি কথাই বলেন না, কিন্তু কী করতে হবে সেটা তিনি জানেন। কুরুক্ষেত্রের সম্পূর্ণ যুদ্ধখণ্ডে ভীম কী করেছিলেন, কত যুদ্ধ করেছিলেন, কটা হাতিকে গদার ঘায়ে ধরাশায়ী করেছিলেন—সে সব তথ্যপঞ্জীতে আমার খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম যে প্রায় অনন্য—সেই সব চিত্র যদি দু-একটা তুলে না ধরি, তা হলে ভীম যে কারণে ভীম—সেই যুক্তিটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ যুদ্ধ-খণ্ডের মধ্যে ভীমকে যেমন আমরা মাঝে মাঝেই জ্বলে উঠতে দেখব, তেমনই নানান জায়গায় তাঁর স্থিরতাও আমাদের আন্দোলিত করবে। সবচেয়ে বড় কথা—যুদ্ধের মধ্যে যে 'টোটাল্' ব্যাপারটা আছে, যেখানে প্রতিনিয়তই অহং-মম এবং ব্যক্তিগত মায়া-মোহের ওপরে উঠতে হয়—সেই 'প্রোফেশনালিজম্' অত্যন্ত আধুনিক অর্থেই আমরা ভীমের মধ্যে লক্ষ করব।

১০

যুদ্ধের জন্য ভীমের একখানি রথ ছিল। দূর থেকে দেখে যাতে সেটা ভীমের রথ বলে চেনা যায়, তার জন্য একটা সোনার সিংহ আটকানো ছিল রথের ধ্বজায়—ভীম-বিক্রমের প্রতীক। সিংহের

চোখে বসানো হয়েছিল বৈদূর্যমণি—সব সময় জ্বলছে। সিংহের যদি খাবার ইচ্ছে না থাকে, তবে তার সামনে দিয়ে গেলেও সে খায় না। কিন্তু সিংহের চোখ এমনই এক ঐশ্বর্যে চিহ্নিত যে তার সামনে এমনিতেই কেউ ঘুরে বেড়ায় না। কিন্তু যে ভাবছে—আমি তো নিরাপদ দূরত্বেই আছি, তার দিকেও যদি সিংহের হিংসার চক্ষুটি পড়ে তবে আর রক্ষা নেই, সে গেল। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ যেদিন যুদ্ধের ঘোষণা করলেন, সেদিন সেই যুদ্ধারম্ভকে স্বাগত জানিয়ে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত অথবা যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয় শঙ্খ বেজে উঠেছিল। মহাভারতের কবি এঁদের প্রত্যেকের শঙ্খ-বাদনের জন্য আধখানা করে শ্লোক নির্ধারিত করেছেন। কিন্তু ভীমের কথা যখন এল তখন আর 'শঙ্খ' শব্দটা শঙ্খমাত্র রইল না, সেটি মহাশঙ্খে পরিণত হল। যেমন অনার্য নাম সেই শঙ্খের তেমনই বিশাল তার আকৃতি, আর সেটাই বাজাচ্ছেন ভীম—পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।

আমি এই ভীম শঙ্খ-নাদকে সিংহের গর্জন বলে মনে করি। তিনি গর্জনে বুঝিয়ে দিয়েছেন—তাঁর খাদ্যের দিকে তাঁর চোখ পড়েছে, আর মুক্তি নেই। ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যেদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হল, সেদিন ভীষ্মের অসম্ভব রণশক্তি দেখে যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পর্যন্ত সেদিন ছিলেন নিষ্প্রভ। সৈন্যক্ষয় হয়েছে অজস্র। কিন্তু যুদ্ধের সেই প্রারম্ভিক পর্বেও যুধিষ্ঠির স্বীকার করেছেন—একমাত্র, একমাত্র ভীমই ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা রেখে যুদ্ধ করতে পেরেছে, আর কেউ নয়—একো ভীমঃ পরং শক্ত্যা যুধ্যত্যেষ মহাভুজঃ। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ভীম ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণের কাছে একবারও হারেননি। যুদ্ধে হার-জিতের নিয়মে কখনও তিনি হেরেছেন আবার কখনও বা জিতেছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ কি কর্ণ—এঁরা তাঁর লক্ষ্যের মধ্যেও ছিলেন না। কিন্তু ভীমের সিংহচক্ষু যাঁর যাঁর ওপরে নিশ্চিতভাবে পড়েছে তাঁরা, তাঁর হাত থেকে রেহাই পাননি।

যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনে ভীম তাঁর বিক্রম স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় দিনে সেই বিক্রম নিশ্চিত ফল প্রসব করেছে। কলিঙ্গ দেশের রাজা, রাজপুত্র এবং সৈন্যেরা, যাঁরা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মেরে ফেলাটা ছিল ভীমের যুদ্ধ-বিদ্যার গৌণ ফল। মুখ্য জিনিসটা কী অথবা যুদ্ধটা তিনি কীভাবে করবেন সেই 'মার্শাল আর্ট'টা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন এই যুদ্ধে। 'স্টেজে' 'থিয়েটার' করা যাঁদের অভ্যাস আছে, তাঁদের কাছে চলচ্চিত্রের অভিনয় যেমন আরও সহজ হয়ে যায়, সেই রকম ভীম প্রধানত মল্লযোদ্ধা বলেই, কৌশলের নানা মারপ্যাঁচের সঙ্গে 'ইম্প্রোভাইজ' করে গদার বাড়ি বা তরোয়াল চালানোটা তিনি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধকালে ভীমের নানান গতি-কৌশল নিয়ে মহাভারতের কবিকেও দু-চার লাইন লিখতে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের ছুটে যাওয়ার মধ্যেও অন্তত তিন-চার রকমের কায়দা ছিল। 'ভ্রান্তমাবিদ্ধমুদ্‌ভ্রান্ত'—মল্লযুদ্ধের এইসব পারিভাষিক শব্দ আপনারা নাই বা বুঝলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ছোটা বা লাফানোর ব্যাপারে ভীম যেহেতু ছিলেন অনবদ্য, তাই গদা বা তরোয়াল হাতে তিনি যেমন শেষ মারটি দিতে পারতেন তেমনই প্রতিপক্ষের শেষ মারটি বাঁচাতেও পারতেন। আবার মল্লযুদ্ধে পশ্চাত অপসরণ করাটা যেহেতু লজ্জার নয়, অতএব Two steps forward and one step back—এই গরিলা রণনীতির জোরে হঠাৎ আক্রমণ বা মল্ল পরিভাষায় 'সম্পাত'-এর কৌশলে তিনি সমস্ত কলিঙ্গ-সৈন্যকে তাঁদের রাজার সঙ্গে যমালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ভীষ্মের সেনাপতিত্ব-কালে যুদ্ধের চতুর্থ দিনেই ভীম ধৃতরাষ্ট্রের আট ছেলেকে মৃত্যুর মুখ চিনিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রগুলিকে মেরে ফেলাটা তাঁর প্রধান লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছবার প্রস্তুতিমাত্র। দুর্যোধনকেও তিনি এর মধ্যে কয়েকবার বাগে পেয়েছেন, তবে সেই যুদ্ধের তেমন গুরুত্ব কিছু ছিল না। সংকল্পও তেমন দৃঢ় ছিল না, ফলে দু' পক্ষেই পতন ও মূর্ছার মধ্য দিয়ে যুদ্ধগুলি শেষ হয়েছে। তবে এও মানতে হবে যে, ভীম তাঁর শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রস্তুতি হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তত পঁচিশটি পুত্রকে মহারথী ভীষ্মের সেনাপতিত্ব-কালের মধ্যেই শেষ করে দিয়েছেন। অবশ্য আর আমি এই যুদ্ধের বর্ণনায় যেতে চাই না। তার কারণ, মহাভারতের কবির অমানুষী ভাষা আমার জানা নেই এবং এককালীন ভীম-চরিত্র বর্ণনায় এই যুদ্ধের অন্তহীন বর্ণনা আমার লেখনীতে

ক্লান্তিকর হয়ে পড়বে।

তবু ভীষ্মের সময়টা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি একলাফে দ্রোণ-পর্বে চলে আসি, তাহলে দুটো প্রধান ঘটনা আমাদের চোখে পড়বে। একটি অভিমন্যু-বধের পর-পর্যায় এবং অন্যটি দ্রোণ-বধের পর-পর্যায়। সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে মারার পর পাণ্ডব-শিবিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। অর্জুন জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করলেন, কারণ সপ্তরথীর মারণব্যূহের প্রবেশ-পথ জয়দ্রথই আগলে রেখেছিলেন। জয়দ্রথকে বাঁচানোর জন্য দ্রোণাচার্য অভেদ্য দুর্গের মতো ব্যূহ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ব্যূহ যতই অভেদ্য হোক, পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান শক্তি অর্জুন-ভীমও তো কিছু কম নন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুনকে বাধা দেবার জন্য সেদিন সবাই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ভীম যে এমন কাণ্ড বাধাবেন, তা কেউ ভাবেননি। কৌরবদের স্বার্থে স্বয়ং কর্ণ নেমে এসেছিলেন ভীমকে বাধা দিতে। কিন্তু ভীমের মেজাজ সেদিন এমন তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মহারথ কর্ণ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ভীমের কাছে।

এই যে জয়দ্রথ-বধের প্রাক্কালে অর্জুনের সহায় হিসেবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন ভীম, তখন তাঁর শ্যালক ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন—দ্রোণাচার্য আজ দুর্যোধনের কথা মনে রেখে যুধিষ্ঠিরকে জ্যান্ত ধরবেন বলে ঠিক করেছেন। তুমি শুধু এটা মনে রেখো অর্জুনকে জয়দ্রথ-বধে সহায়তা করার থেকেও যুধিষ্ঠিরকে বাঁচানোর কাজটা আমার কাছে অনেক বড়—যাদৃক্ সংরক্ষণং দ্রোণাদ্রাজ্ঞঃ কৃত্যতমং হি নঃ। শ্রদ্ধা নয়, ভোলেভালা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ভীম যে কতখানি স্নেহ করতেন—তা এই সব মুহূর্তে বোঝা দায়। বড় দাদা হলে কী হবে, ধর্মবুদ্ধি থাকলে কী হবে, দাদা যে যুদ্ধে বড় কাবু, যে কোনও মুহূর্তে শত্রুপক্ষ যে তাঁকে কব্জা করে ফেলবে—এটা ভীমের বোধ ছিল। যাই হোক ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন বললেন যে—আমার প্রাণ থাকতে যুধিষ্ঠিরকে ধরার সাধ্য নেই কারও, সেই সান্ত্বনায় নিশ্চিন্ত হয়ে ভীম চললেন অর্জুনকে সাহায্য করতে।

যুদ্ধে যাবার আগে ভীমের কিঞ্চিৎ মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। বললে বাড়াবাড়ি হবে না—এ অভ্যাস তাঁর ছোটবেলা থেকেই। তা ছাড়া সে মদও যে 'গৌড়ী মাধ্বী বা পৈষ্টী'র মতো অভিজাতের মদ নয়, তা বলতে আমার দ্বিধা নেই। সেই ছোটবেলায় দুর্যোধনের বিষমাখা মিষ্টি খেয়ে তিনি যে নাগলোকে পৌঁছেছিলেন, সেখানে জালা-জালা মদ খেয়ে হজম করেছিলেন তিনি। নাগেরা আপন জাতি-মর্যাদায় সে মদকে যতই অমৃতের মার্কা দিন, কিন্তু আমরা জানি নাগেরা অনার্য কৃষ্টি বহন করতেন, অতএব তাঁদের মদও মোটামুটি তাল-মার্কা বা ধেনোজাতীয়ই হবে।

এক্ষেত্রেও ভীমকে দেখছি—দাদা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে দেব-দ্বিজের আশীর্বাদ নিয়েই ভালরকম যুদ্ধোন্মাদনার জন্য তিনি খানিকটা মদ্যপান করে নিলেন এবং সে মদ বেশির ভাগ সময় শিকারী ব্যাধেরা খায়—পীত্বাং কৈরাতকং মধু। এই মদ খেয়ে তাঁর শক্তি বাড়ল দ্বিগুণ, চোখটাও হয়ে উঠল যুদ্ধের উপযোগী—লাল টক্‌টকে—দ্বিগুণদ্রবিণো ধীমান্ মদবিহ্বল-লোচনঃ। ভীম যুদ্ধে চললেন।

প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্রের দু-একটা ছেলেকে মেরে প্রকৃত যুদ্ধের প্রস্তুতি করতেই মহারথ কর্ণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভারী আশ্চর্য, ভীম তাঁর প্রধান হাতিয়ার গদা ছেড়ে বাণ-যুদ্ধ আরম্ভ করলেন কর্ণের সঙ্গে এবং আরও আশ্চর্য কর্ণের মতো অসাধারণ যোদ্ধা ভীমের কাছে একেবারে হেরে বসলেন। যুদ্ধ জেতার সিংহ-গর্জন চলল বহুক্ষণ ধরে। ভীম অবশ্য কর্ণকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা দিয়েই অর্জুনকে সাহায্য করার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণ দূর থেকে তাঁকে পালিয়ে যাবার দুর্নাম দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলেন যুদ্ধে। যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং আবার সেই বাণ-যুদ্ধ। কর্ণ দ্বিগুণ বেগে বাণ-বর্ষণ আরম্ভ করলেন, তাঁর সূচীমুখ বাণের ফলায় ভীমের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ভীমের তেজ রইল অম্লান। বসন্তের পুষ্প-সম্ভারের মধ্যে লাল লাল অশোক ফুল যেমন ফুটে থাকে, ভীমের দীপ্র বপুষ্মত্তার মধ্যে রুধির-ক্ষতগুলি সেই অশোক ফুলের রক্তিম অলংকার তৈরি করেছিল—সমৃদ্ধ-কুসুমাপীড়ো বসন্তে'শোকবৃক্ষবৎ। এই অবস্থাতেও কর্ণ কিন্তু ভীমের শক্তি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পালিয়ে বাঁচলেন। পালালেন বটে, তবে আবার

এলেন এবং আবারও পালালেন ঘোড়াগুলিকে জোরে ছুটিয়ে—প্রাদ্রবজ্জবনৈরশ্বৈ রণং ত্যক্ত্বা মহাযশাঃ। ভীমের কাছে কোনও ভাবেই দাঁড়াতে পারলেন না কর্ণ।

প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তো অবাক হয়ে গেলেন, শুধু অবাক নয় খানিকটা আশাহতও। বললেন—কী বাজে কথাটাই না আমাকে বলেছে দুর্যোধন। মাথামোটা কোথাকার। বলে কিনা কর্ণ একাই সমস্ত পাণ্ডবদের জিতে আসতে পারবে। এখন দেখুক সে, কর্ণ যে এইভাবে পালিয়ে গেল, এখন সে কী বলবে ? যুদ্ধের রীতিনীতি এক ফোঁটাও বোঝে না দুর্যোধন। নইলে নিজেরা ফড়িং হয়ে এই রকম আগুন ডেকে এনেছে নিজেদের পুড়িয়ে মারবার জন্য—প্রাবেশয়দ্ধুতবহং পতঙ্গমিব মোহিতঃ।

ভীমের নামে ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ের কথা আগেই বলেছি। এতদিন যে ভয় কল্পনায় ছিল এখন তা রূঢ় সত্যে পরিণত। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর কোনও না কোনও পুত্রের মৃত্যু হচ্ছে এবং কর্ণের মতো বীর যখন আজ বারংবার যুদ্ধ করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ভয় তখন সর্বনাশের আশঙ্কায় চিহ্নিত। তিনি সঞ্জয়কে বললেন—লোকে যমের বাড়ি গিয়েও ফিরে আসতে পারে হয়তো কিন্তু ভীমের হাত থেকে নয়। যা শুনলাম আজকে, তাতে অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ—সব যদি এক জায়গাতেও জোটে তবু ভীমের সঙ্গে পারবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, কর্ণ নতুন রথসজ্জা করে আবার ফিরে এসেছিলেন। যুদ্ধও স্থায়ী হয়েছিল অনেকক্ষণ। সময় এসেছিল যখন কর্ণের বিক্রমে ভীমের রথ ভেঙে গিয়েছিল। ভীম এই অবস্থাতেও সুযোগ পেয়েছিলেন খালি হাতে কর্ণকে পিটিয়ে মারার। আবার কর্ণও সুযোগ পেয়েছিলেন নিরায়ুধ ভীমকে মেরে ফেলার। কিন্তু ভীম সুযোগ নেননি—কর্ণ অর্জুনের হন্তব্য শত্রু বলে। আবার কর্ণও ভীমকে মারেননি কুন্তীর কাছে কথা দিয়েছিলেন বলে। এই দুই মহাবীর পারস্পরিক হত্যা থেকে বিরত থাকলেও কর্ণকে সাহায্য করতে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের আরও কতগুলি ছেলে বেঘোরে ভীমের হাতে মারা গেল। ভীমের লাভ এইটুকুই এবং ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষোভও সেইখানেই।

দ্রোণাচার্য যখন প্রায় অদম্য হয়ে উঠলেন, তখন কৃষ্ণ বললেন—কৌশল করে এই বৃদ্ধকে যদি তাঁর প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া যায় তবেই দ্রোণাচার্য থামবেন, নইলে নয়। কথাটা অর্জুনের একেবারেই পছন্দ হল না, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও নিমরাজি হয়ে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। এবার সেই চরম মিথ্যেটা ঘোষণা করার ভার পড়ল ভীমের ওপর। পাণ্ডবদের নিজস্ব গজ-বাহিনীর মধ্যেই অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি ছিল। ডাহা মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য ভীম তাঁর গদার বাড়িতে সেই হাতিটিকে মেরে মহানাদে ঘোষণা করলেন—অশ্বত্থামা মারা গেছেন। মারা গেছেন অশ্বত্থামা—অশ্বত্থামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ।

শেষ পর্যন্ত দ্রোণ কীভাবে মারা গেছেন, আপনারা জানেন। কিন্তু মুশকিলটা হল দ্রোণ-বধের পর। দ্রোণকে চুলের মুঠি ধরে ধৃষ্টদ্যুম্ন যেভাবে হত্যা করেছিলেন, তাতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অর্জুন। যেমন তিনি গালাগালি করলেন যুধিষ্ঠিরকে, তেমনই গালাগালি করলেন শ্যালক-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে। অর্জুনের বিলাপ-ধ্বনির সঙ্গে যুধিষ্ঠির এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যেভাবে ঘৃণা মিশ্রিত হচ্ছিল, তাতে ভীমও জড়িয়ে যাচ্ছিলেন। অর্জুন সরাসরি ভীমের উদ্দেশে কোনও কটূক্তি না করলেও, ভীমই যেহেতু হাতি মেরে মিথ্যাচারের শুরুটা করেছিলেন, অতএব পরোক্ষভাবে তিনিও জড়িয়ে যাচ্ছিলেন ওই চক্রান্তের মধ্যে। এতক্ষণ ঝিকে মেরে বউ-শেখানোর কায়দা দেখছিলেন ভীম। অর্জুন যখন বললেন—এইভাবে যখন আমার আচার্যকে হত্যা করা হল, তখন আর আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই।

এসব কথা শুনে ভীম আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বাচিক ভাষায় যাকে বলে 'ন্যাকামি', ভীম যেন অর্জুনের মধ্যে সেই ন্যাকামি দেখতে পেলেন। গুরুর প্রতি অর্জুনের শ্রদ্ধাটা যদিও মিথ্যা ছিল না, কিন্তু সেই দুর্বলতায় বারংবার ঘা খেয়ে ভীম সেটাকে কথার জোরে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। ভীম বললেন—আহা বনবাসী মুনিরা যেমন ধর্মকথা বলে, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে তুমিও সেই রকম বলতে আরম্ভ করেছ। মনে রেখো অর্জুন, ক্ষত্রিয়ের ভাবটাই তোমাকে শোভা

পায়, কিন্তু সমস্ত ক্ষত্রিয়-গুণের অধিকারী হয়ে আজকে এমন বোকার মতো সব কথা বলছ, এটা তোমাকে মানায় না অর্জুন—অবিপশ্চিদ্ যথা বাচং ব্যাহরন্নাদ্য শোভসে।

এই কটূক্তির পিঠে-পিঠে ভীম অবশ্য অর্জুনের ধর্মবোধ এবং নীতি-যুক্তির প্রশংসাও করলেন যথেষ্ট। কিন্তু সেই প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ভীম এটাও বলতে ছাড়লেন না যে, অর্জুনের কথাগুলি তাঁর মোটেই সহ্য হচ্ছে না। তিনি বললেন—ধর্মবোধ আমরা কম দেখাইনি অর্জুন। কিন্তু দ্রৌপদীকে ওরা যেভাবে সভায় নিয়ে এসেছিল, আমাদের যেভাবে বনবাসে পাঠানো হয়েছে, গাছের বাকল পরে যেভাবে এই তেরো বচ্ছর সহ্য করেছি—এগুলো কি আমাদের রাগের বস্তু নয়? তবু এসব আমরা সহ্য করেছি এবং এখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে একে একে সেই সব রাগের প্রতিশোধও নিচ্ছি। কিন্তু আজ যেভাবে তুমি আমাদের অপমান করছ তাতে আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ছে—বপন্ ব্রণে ক্ষারমিব ক্ষতানাং শত্রুকর্ষণ। তোমার যদি এত এ হয় তাহলে অন্য ভাইদের নিয়ে চুপ করে বসে থাকো তুমি; আমি একাই আমার গদাটি হাতে নিয়ে বেরব এবং এই যুদ্ধ জয় করে আসব—অহমেনং গদাপাণি-র্জেষ্যাম্যেকো মহাহবে।

ভীমের এই কথাগুলির একটা অন্য মূল্য ছিল। কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য কেউ যদি মনে মনে শাস্তি পেতে থাকে, তখন যদি কেউ ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে জবরদস্তি করে অপরাধীর অপরাধ অপ্রমাণ করে দেয়, তাহলে অপরাধী সান্ত্বনা পেতে থাকে। সে ভাবতে থাকে—তা হলে বোধহয় খুব অন্যায় হয়নি। এত যখন কারণ আছে, স্বপক্ষে এত যখন যুক্তি রয়েছে, তা হলে বোধহয়, তা হলে আমি বোধহয় বেশি বেশি ভাবছি। ভীমের কথায় পরোক্ষে অর্জুন শান্তি পেয়েছেন মনে মনে। তিনি এবার সুস্থির হয়ে তাঁর প্রধান শত্রু কর্ণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কারণ দ্রোণ মারা যাবার পর কর্ণই ছিলেন কৌরব-সেনাপতি।

দুর্যোধন কর্ণের কাছে বড় বেশি আশা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণের সেনাপতিত্ব কালে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ভীমের হাতে দুঃশাসনের মৃত্যু এবং তাঁর রক্তপান। ব্যাপারটা আচম্বিতেই ঘটে গেল। প্রধানত কর্ণের বিরুদ্ধে অর্জুনকে সাহায্য করার জন্যই ভীম তাঁর পৃষ্ঠরক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় কোথা থেকে দুঃশাসন ভীমকে দেখতে পেলেন এবং হঠাৎ তাঁর সমস্ত বীরত্ব যেন উথলে উঠল। ভীমের উদ্দেশে তিনি খুব বাণ-টান ছাড়তে আরম্ভ করলেন। আর যায় কোথা! ক্ষুধার্ত সিংহ যেমন হরিণ দেখলে দ্রুত ধাবিত হয়, ভীমও সব ছেড়ে দুঃশাসনকে ধাওয়া করলেন। দুঃশাসন যোদ্ধা কম ছিলেন না। দু-একটা বাণ যা ছাড়লেন, তাতে ভীমের মতো বীরকেও অন্তত একবার মাথায় ঝিম ধরে রথের ওপর শুয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু ঝিম-ঝিম ভাবটা কেটে যেতেই তিনি এমন একটা গর্জন দিয়ে উঠলেন যে, সেটাই ছিল দুঃশাসনের মৃত্যুঘণ্টা। দুঃশাসনের শরে অতিরিক্ত বিদ্ধ হয়ে শেষমেষ তাঁর অষ্টায়সী গদাখানি ঘুরিয়ে ছুঁড়লেন দুঃশাসনের দিকে। গদাটা সোজা গিয়ে আঘাত করল দুঃশাসনের মাথায়।

দুঃশাসন সঙ্গে সঙ্গে রথ থেকে পড়ে গেলেন। ভীম তখন অন্য একখানি গদার বাড়িতে দুঃশাসনের রথ, ঘোড়া, সারথি—সব একেবারে চুরমার করে ভেঙে দিলেন। ভূমিলুণ্ঠিত, মৃত্যু যন্ত্রণায় তখনও কম্পমান দুঃশাসনের দিকে তাকাতেই এবার ভীমের মনে পড়ল দ্রৌপদীর কথা। এই সেই দুঃশাসন—যে এক সময় চুলের মুঠি ধরে তাঁর পরান-পুতলী দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় উন্মুক্ত সভার মধ্যে নিয়ে এসেছিল এবং তাঁর লজ্জাবস্ত্র খুলে দিয়েছিল। ভীমের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। তিনি বলে উঠলেন—যার সাধ্যি থাকে এগিয়ে আসুক, এই আমি দুঃশাসনকে মারতে যাচ্ছি, তোদের সাধ্যি থাকে তো বাঁচা। যাঁদের সামনে অথবা যাঁদের উদ্দেশে এই হুঙ্কারটি ছাড়া হল, তাঁরা হলেন কর্ণ এবং দুর্যোধন। দুঃশাসন যে ভীমের গদার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন—এটা তাঁরা দেখেছেন। কিন্তু ভীমের আক্রোশ-বাক্য শুনেও তাঁরা যে কেউ সেদিন এগোলেন না, তার কারণ—ভীম সেদিন তাঁর ক্রোধের তুঙ্গবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন।

দুর্যোধন-কর্ণের সামনে দিয়েই ভীম সবেগে ধাবিত হলেন দুঃশাসনের দিকে—সুযোধনস্যাধিরথেঃ সমক্ষম্। তাঁর চোখটা শুধু দুঃশাসনের দিকে। দুঃশাসনের শরীরে তখনও প্রাণ আছে। গদার

আঘাতে মুহ্যমান, দেহের আবরণ বর্ম ভেঙে পড়েছে। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে পরা পরিধান, গলার মঙ্গল-মালা বিস্রস্ত, হাত দিয়ে শুধু কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছেন, বাঁচবার শেষ সদিচ্ছা—বিধ্বস্ত-বর্মাভিরাণাম্বর-স্রক্ বিচেষ্টমানো ভৃশবেদনার্তঃ। ভীম দুঃশাসনের সামনে এসে কোষ থেকে ক্ষুরধার তরবারি মুক্ত করলেন। তারপর পা দিয়ে চেপে ধরলেন দুঃশাসনের কণ্ঠদেশ আর স্পন্দমান অসিটি দিয়ে চিরে ফেললেন দুঃশাসনের বুক—উৎকৃত্য বক্ষঃ পতিতস্য ভূমৌ। ফিনকি দিয়ে দুঃশাসনের কবোষ্ণ রক্ত বেরিয়ে এল পাদ-পিষ্ট দেহ থেকে। ভীম অঞ্জলি পূরণ করে দুঃশাসনের রক্ত ছোঁয়ালেন ঠোঁটে। এই একবার।

সেই মর্মচ্ছিন্ন অবস্থাতেও দুঃশাসন আরও একবার চেষ্টা করলেন ওঠার। এবার উদ্যত তরবারির এক কোপে ভীম দুঃশাসনের মাথাটা আলাদা করে দিলেন ধড় থেকে। এবার দ্বিতীয়বার তাঁর উদ্গত শোণিত অঞ্জলি-বদ্ধ করে ভীম লেহন করতে লাগলেন রীতিমতো ; চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতে পরম নিশ্চিন্তে লেহন করলেন দুঃশাসনের রক্ত—আস্বাদ্য চাস্বাদ্য চ বীক্ষমাণঃ। রক্তাস্বাদের প্রতিতুলনায় সুস্বাদু লেহ্য-পেয়র বর্ণনাও বাদ গেল না এখানে। ভীম বললেন—আহা! ছোটবেলায় মায়ের দুধ খেয়েছি, ভালই লেগেছিল নিশ্চয়। মধু খেয়েছি কত, তাও বেশ ভাল। দইয়ের মাঠা, দুধ, ঘি—সেও বেশ। ফুলের মধু থেকে নানা মশলায় তৈরি করা মদ—মাধ্বীকপানস্য চ সৎকৃতস্য—তাও আমার বেশ লাগে। কিন্তু যত যাই বল, ঘি-মধু, মধু-মদ—যত রকম সুস্বাদু পানীয়ই আমি পান করে থাকি, সে সবগুলির চেয়ে এই শত্রু-শোণিতের আস্বাদ আমার কাছে অনেক বেশি, অনেক বেশি—সর্বেভ্য এবাভ্যধিকো রসো'য়ং মতো মমাদ্যাহিতলোহিতস্য।

আপনারা বলতেই পারেন—এ একেবারে নৃশংসতার চরম ; আর্য সভ্যতার পরিপন্থী এই অসভ্য ব্যবহার। আমি বলি—আপনারা কী বলবেন ? পণ্ডিতেরাই তো এ সব কথা কতই বলেছেন। সাহেব-সুজনরা তো মহাভারতের এই জায়গাটা দেখে সদয় হয়ে অন্তত মহাভারতের এই অংশটুকুর রচনাকাল বেশ পুরনো বলে মনে করেন। গবেষণা বড় বিষম বস্তু। মহাভারতের অনেকাংশই তাঁদের মতে অর্বাচীন, কিন্তু এই জায়গায় তাঁরা 'ক্যানিবালিজমে'র গন্ধ পেয়ে দয়া করে বলেন—হ্যাঁ এটা ঠিক যে, ভীমের রক্তপানের মধ্যে যেহেতু প্রাগৈতিহাসিক সভ্যেতর মানুষের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে, অতএব মহাভারতের মূল কিছু অংশ খ্রিস্টজন্মের বহু পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

এই সব বিচিত্রবুদ্ধি গবেষকের খুরে আমার দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানাই। আরও জানাই যে, সেকালে ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার ধর্ম যে কতটা বড় ছিল, সেটা এই মহা-পণ্ডিতদের বোঝাব কেমন করে ? প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কত ক্ষত্রিয় রাজা-মহারাজা কত হীন কাজ করেছেন, কত ঘৃণিত ব্যবহার করেছেন—সেই ফিরিস্তি যদি মাথায় থাকত, তাহলে এই অপোগণ্ড গবেষণার দরকার হত না। তা ছাড়া ভীমের নৃশংসতা, অক্ষমা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে 'ইন্‌স্টিংক্টে' চলাটা সম্পূর্ণ মহাভারত জুড়ে এইভাবে চিত্রিত। মহাভারতের কবি তাঁকে জনমনের ইচ্ছাপূরকভাবেই গড়েছেন। ফলে এই রক্তপানের সময় তাঁর নৃশংসতার চেয়েও, বার বার সারা জীবন ধরে যে প্রতিশোধের কথা বলেছেন, সেইটাই এই নৃশংসতার যুক্তি হওয়া উচিত।

হ্যাঁ, আজকাল সভ্য মানসিকতায় এই রক্তলেহন বর্বরতা বলে মনে হতেই পারে। সেদিনও যারা ভীমের রুধির-ধারা-লাঞ্ছিত মুখখানি দেখেছিল, তারা কেউ ভয়ে পালিয়েছিল, কেউ সীমাহীন বর্বরতার নিরিখে অসহ্য ঘৃণায় চোখ বন্ধ করেছিল, আর কেউ বলেছিল—ব্যাটা মানুষ নয়, রাক্ষস—নায়ং মনুষ্য ইতি ভাষমাণাঃ। পণ্ডিতরাও তাই বলেন। বলেন—ভীমের ব্যবহারটা রাক্ষসের মতো। কিন্তু এটা কেউ ভাবেন না যে, আজকের সভ্য জগতেও কেউ যদি রাজযন্ত্র ব্যবহার করে যে কোনও ছুতোয় সমস্ত লোক-সমক্ষে আপনার স্ত্রীর পরিধান খুলে নেয়, তবে আপনারও সেই দুর্মতিকে হত্যার ইচ্ছা করবে না কি ? যদি না করে, তবে হয় আপনি পশু অথবা পশুপতি, বোমভোলা মহাদেব। আজকের সভ্য আইনে সর্বসমক্ষে আপনার স্ত্রীর পরিধেয় বসন খুলে নিলেও আপনি তাকে মারতে পারেন না ; আপনাকে থানায় যেতে হবে, আদালতে যেতে হবে এবং তারপরেও বস্ত্র-মোচনের জন্য আপনার শত্রুর শাস্তি কতটুকু হবে বলে আপনি মনে করেন ? বড়

জোর কিছুদিনের হাজত-বাস অথবা কিছু জরিমানা। কিন্তু আপনার মনে কী থাকবে মশাই মনে-মনে আপনি এই শত্রুকে খুন না করে থাকবেন কি ? গায়ে জোর থাকলে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি থাকলে খুন করেও ফেলতেন হয়তো।

কিন্তু মনে রাখবেন—গায়ে অমানুষিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভীম তাঁর দাদার রাজনৈতিক শিক্ষায় তেরো বচ্ছর চুপ করে বসেছিলেন। ভাগ্যিস তাঁকে পুলিশ কিংবা জজ-সাহেবের এজলাসে যেতে হয়নি, অতএব তেরো বচ্ছর পরে তাঁর ক্ষত্রিয়ের বচন সার্থক করে ভীম রক্তপানের যুক্তি দিয়েছেন—তোরা আমাকে প্রমাণকোটির বাগান-বিহারে বিষ খাইয়েছিলি, বারণাবতে লাক্ষা-গৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলি, পাশা খেলে আমাদের রাজ্য কেড়ে বনবাসে পাঠিয়েছিলি, প্রাণপ্রিয়া পত্নীর চুলের মুঠি ধরে সভায় অপমান করেছিলি, বিরাটরাজার ঘরে চাকরগিরি করতে বাধ্য করেছিলি—এইরকম, ঘরে-বাইরে যত কষ্ট আছে সব দিয়েছিস আমাকে। আর সেই বনবাসে যাবার আগে আমার হাঁটা দেখে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলেছিলি—গরু চলেছে, ব্যাটা ! গরু—আজ তোর রক্ত খেয়ে সেই 'বলা'টাও ফিরিয়ে দিলাম। আজকে আমি বলছি—ব্যাটা ! তোরাই গরু, গরু কোথাকার—তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।

ভীমকে কেউ কিচ্ছুটি করতে পারেননি। দুর্যোধন-কর্ণের মতো বীর ভ্রাতৃশোকে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন—এ কথা মানি না। আসলে ভীমের ভয়ঙ্কর উগ্র রূপ দেখে কারও এক পা এগোবার সাহস হয়নি। রক্তপানের উল্লাসের পর কৃষ্ণ আর অর্জুনকে সামনে পেয়ে ভীম বলেছেন—আমি যা বলেছিলাম, তা করেছি, কথা রেখেছি—তদ্ বৈ সত্যং কৃতমদ্যেহ্ বীরৌ। আরও একটা কথা-রাখার কথা ছিল। মহাভারতের কবি সে কথা আগেও বলেননি। পরেও বলেননি অর্থাৎ ভীম সে প্রতিজ্ঞা মহাভারতের পাতায় করেননি অতএব সে প্রতিজ্ঞা রাখারও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু মহাভারতের কাহিনী উপজীব্য করে যাঁরা কাব্য-নাটক লিখেছেন, তাঁরা রুধিরাপ্লুত ভীমকে ছোটাতে ছোটাতে দ্রৌপদীর ভবনে নিয়ে এসেছেন। দুই অঞ্জলিতে রক্তপূর ভীমসেন ক্ষত্রিয়ের আস্ফালনে ছুটে গেছেন ক্ষত্রিয়াণী দ্রৌপদীর কাছে। রক্তের সিঞ্চনে দ্রৌপদীর কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশদামে আবার বেণী বেঁধে দিয়েছেন ভীমসেন—বেণীসংহার নাটকের পালা জমেছে এইভাবেই।

১১

কৃষ্ণের যেমন সুদর্শন চক্র, অর্জুনের যেমন গাণ্ডীব, শিবের যেমন ত্রিশূল, তেমনই ভীমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল একখানি গদা। শত্রু যাকে বলে, অর্থাৎ ভীম যাঁদের চিরদিন জন্মশত্রু বলে ভেবেছেন, তাঁদের ওপর এই গদার ব্যবহার এখনও তেমন করে হয়নি। এমনকী এই যে দুঃশাসন মারা গেলেন, তাঁর সঙ্গেও গদা-যুদ্ধ যাকে বলে, তা কিছুই হয়নি। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের সেনাপতিত্বকালে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অধিকাংশই ভীমের হাতে মারা পড়েছেন এবং তার মধ্যে দুঃশাসন প্রধান। শল্য যখন সেনাপতি, তখন বাকি আর পুত্রগুলিও মৃত্যু-বরণ করলেন, কিন্তু তার মধ্যে ভীমের গদার মাহাত্ম্য কিছু ছিল না। দুঃশাসন মারা যাবার পর তাঁর দিকে আঙুল তুলে, ভীম কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে বলেছিলেন—আমার এই যুদ্ধ-যজ্ঞের শেষ পশু হল দুর্যোধন, আমার রণদেবতার কাছে তাকে বলি দিয়ে তবেই আমার শান্তি—শান্তিং লপ্স্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্।

সকলেই জানেন—দুর্যোধন গদা-যুদ্ধের আরও এক কারিগর। দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের যে শেষ গদা-যুদ্ধটি হবে, মহাভারতের কবি তার প্রস্তুতি নিয়েছেন শল্যের সেনাপতিত্বের সময় থেকে। মনে রাখা দরকার—ভীম যেমন মল্লবীর, শল্যও তেমনই প্রধানত এক মল্লবীর। ভীম যেমন গদা-যুদ্ধে নিপুণ, শল্যও তেমনই গদা-যুদ্ধে বড়ই নিপুণ। দুর্যোধনের সঙ্গে শেষ-যুদ্ধ হবার আগে মহাভারতের কবি তাই শল্যের সঙ্গে ভীমের একটি গদা-যুদ্ধের ব্যবস্থা করেছেন। তুমুল এই গদা-যুদ্ধ অনেকটা শেষ যুদ্ধে যাবার মক-প্র্যাকটিস বলা যেতে পারে। ভীমের গদার চরম মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য কবিকে এখন থেকে বেশি শ্লোক খরচা করতে হচ্ছে এবং সেটাও সেই শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতিই বলব।

শল্য যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন এবং বাণে বাণে তাঁকে কিছুটা কাবুও করে ফেলেছিলেন—শিতৈ-র্বাণৈ র্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ। ভীম দাদার এই কাহিল অবস্থা দেখে খানিকক্ষণ ঠোঁট কামড়ালেন রাগে। তারপর ভাবলেন—এঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ভাবটা এই যে,—*আমার ধর্মপুত্তুর দাদাকে পেয়ে খুব খেলা দেখাচ্ছ, না? দেখছি তোমাকে এবার।* রাগ উঠলে ভীমের যা হয়। ভাবলেন—মেরেই ফেলব এটাকে। যোদ্ধারা যখন ভাবেন, তখন চরমটাই ভাবেন। তো, ভীম শল্যকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্য তাঁর সেই ভীম-গদাখানি বাগিয়ে ধরলেন হাতে।

বাস্! মহাভারতের কবি ভীমকে ছেড়ে এবার তাঁর গদার বর্ণনা আরম্ভ করলেন। বললেন—গদাটা ছিল যমদণ্ডের মতো। প্রহারোদ্যত সেই গদাটি দেখলে মনে হবে যেন কালরাত্রি ঘনিয়ে এসেছে জীবনে। ভীমের কাছে অতি পছন্দের এই গদাটি রাখবার যত্নও কিছু কম নয়। যন্ত্রশিল্পীরা যেমন তাঁদের বাজনার যন্ত্রটি সযত্নে বাক্সের মধ্যে রাখেন, ওস্তাদজিরা যেমন সেতার-সরোদ ঢাকা দিয়ে রাখেন দামি কাপড় দিয়ে, ভীমের গদার যত্নও সেইরকম। আগেকার দিনে দই-রসগোল্লার হাঁড়ি রাখবার জন্য যেমন বিড়ে বানানো হত, ভীমের গদাটিও তেমনই মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে তৈরি করা সাপের কুণ্ডলীর মতো রজ্জুর আধারে রাখা থাকত, যাতে উঁচু-হওয়া গদা-মুখের কঠিন অংশগুলি ঘষটে না যায়। আগেকার দিনের বেনারসী কাপড়ে যেমন সোনা থাকত, তেমনই এক সোনার কাপড়ে জড়ানো ভীমের গদা।

গদা 'বজ্রকল্পা লৌহময়ী' বটে, তবে তার আদর প্রিয়া রমণীর মতো। চন্দন আর অগুরু মাখিয়ে গদাটির মধ্যে এমন সৌগন্ধ্য ঘনিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, সে গদা হাতে নিলেই ভীম যেন রমণীর স্পর্শসুখ লাভ করেন—প্রমদাম্ ঈপ্সিতামিব। বড় পছন্দের অস্ত্র বলেই এই রমণীয় স্পর্শসুখ, নইলে সেই গদার মধ্যে কোমলতার স্থান নেই কোনও। গদার উচ্চতর লৌহ-কোণগুলিতে এখানে ওখানে লেগে আছে শত্রুদেহের মজ্জা-মেদ-রক্ত, গজমস্তক বিদারণের চিহ্ন। যমের জিহ্বার মতো সেই গদাটি হাতে নিয়ে ভীম যখন ঝাঁকুনি দেন, অমনই গদার পরিমণ্ডলের আট কোণে লাগানো ঘণ্টাগুলি বেজে ওঠে—বসামেদো'স্রদিগ্ধাঙ্গীং জিহ্বাং বৈবস্বতীমিব/পটুঘণ্টারববতীম্। ভীমের এই গদাখানি যুদ্ধে বহুবার পরীক্ষিতই শুধু নয়, তাঁর বহুকালের সঙ্গীও বটে। দ্রৌপদীর জন্য সৌগন্ধিক পদ্ম আনতে গিয়ে এই গদার ভরসাতেই তিনি যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন শিব-সখা কুবেরকে। এই গদা দিয়েই নিধন করেছিলেন কত শত যক্ষকে। সেই গদা, মদ্ররাজ শল্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই বজ্রমণিখচিত গদাখানি ভীম তুলে নিলেন হাতে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। সমানে সমানে যুদ্ধ। কারণ মদ্ররাজ শল্য এবং কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম ছাড়া ভীমের গদা-ভার সহ্য করেন এমন মানুষ প্রায় নেই—ন হি মদ্রাধিপাৎ শল্যাদন্যো বা যদুনন্দনাৎ। আবার ভীম ছাড়া শল্যের গদা-প্রহার সহ্য করেন এমন লোকও নেই—নান্যো যোধো বৃকোদরাৎ। ভীম আর শল্যের গদার হানাহানিতে চারিদিকে শুধু আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। মানুষের চোখের বিষয় হল শুধু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর শ্রবণের বিষয় হল শুধু গদা-ঠোকাঠুকির বজ্রশব্দ। একটা সময় এল, যখন দু'জনেই আঘাত পেলেন বুকে এবং দুজনেই পড়ে গেলেন মাটিতে—যুগপৎ পেততু-র্বীরৌ উভাবিন্দ্রধ্বজাবিব। কিন্তু এই সুযোগে কৃপাচার্য এসে শল্যকে নিজের রথে চাপিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। ভীম দ্বিগুণ বেগে গদা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন এবং দেখলেন—শল্য নেই। অনেক ডাকাডাকিও করলেন শল্যকে, কিন্তু কোথায় তিনি?

এই যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়ে গেল, এই যুদ্ধ ভীমের শেষ গদা-যুদ্ধের মহড়ামাত্র। মহাভারতের কবি শল্যকে রণক্ষেত্র থেকে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে ভীমের অতৃপ্ত যুদ্ধ-বাসনাটুকু জিইয়ে রাখলেন। শল্যের মৃত্যুর পর পরই ধৃতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট পুত্রেরা ভীমের সাহায্যে যমরাজের দর্শন পেলেন। বাকি রইলেন শুধু দুর্যোধন। এদিকে কৌরব-পক্ষের নির্বাচিত সেনাপতি শল্য পূর্বাহ্নেই নিহত হয়েছেন যুধিষ্ঠিরের হাতে। দুরাত্মা শকুনি তাঁর পুত্র উলূক দু'জনেই মারা গেছেন সহদেবের হাতে। কৌরব-সৈন্যেরা অধিকাংশই মৃত। বাকি একা দুর্যোধন পালাবার পথ খুঁজছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কৌরব-সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত। পাণ্ডবদের অবস্থা তত ভাল না হলেও তাঁদের সৈন্য-সামন্ত তখনও বেশ কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত। শকুনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোধন জয়ের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে রণক্ষেত্র থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে। চিরসঙ্গী গদাখানি নিতে অবশ্য তাঁর ভুল হয়নি। কৌরব-পক্ষের জীবিত মহারথীদের মধ্যে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্যোধনের পালিয়ে যাবার খবর জানতেন এবং তাঁরা গোপনে এসে দুর্যোধনের সঙ্গে দেখাও করলেন। বিশেষত অশ্বত্থামা, যিনি অন্যায়ভাবে পিতা দ্রোণের মৃত্যু হতে দেখে শোক সম্বরণ করতে পারছিলেন না, তিনি দুর্যোধনের কাছে তখনও প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছেন যে, অন্তত পাঞ্চালদের শেষ না করে তিনি ছাড়বেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন যেহেতু দ্রোণের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন, অতএব তাঁর ব্যাপারে অশ্বত্থামার ক্রোধ ছিল সাংঘাতিক। তা ছাড়া পাণ্ডবদের সৈন্য বলতে যা অবশিষ্ট ছিল, তাও মোটামুটি পাঞ্চাল-সৈন্য। এইজন্যই অশ্বত্থামার যুদ্ধ করার সদিচ্ছাটা আরও অর্থবহ ছিল।

এই যে দুর্যোধনের সঙ্গে তিন মহারথীর কথাবার্তা চলছিল, ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। কতগুলি ব্যাধ, যারা তৎকালীন সামাজিক নিয়মে নগর-গ্রামের প্রান্তদেশে থাকত, তারা বনে-বনে নানা পশু শিকার করে কাঁধে মাংসভার নিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরছিল। মৃত পশুগুলি তাদের কাঁধের ওপর আরও ভারী হয়ে উঠছিল এবং সেইজন্য তাদের ক্লান্তিও বাড়ছিল। দ্বৈপায়ন হ্রদের পাশে এসে টলটলে জল দেখে তারা কাঁধের মাংসভার নামিয়ে রাখল এবং হাত-মুখ ধুয়ে জল খেতে আরম্ভ করল প্রাণ ভরে। হ্রদের ধারে অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধনের যে বাক্যালাপ চলছিল, সেটা পরিষ্কার কানে এল তাদের। ব্যাধেরা দুর্যোধন রাজার নাম জানে এবং পাণ্ডবকুমারদের সঙ্গে যে তাদের মারামারি হচ্ছে, তাও তারা জানে। দুর্যোধন যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং তাকে অন্য এক মহারথী যে যুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইছে, সেটাও তারা বেশ বুঝতে পারল। ব্যাধেরা ভীমকে খুব ভাল চেনে।

ব্যাধেরা ঠিক করল—যদি এই গোপন খবর তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অথবা ভীমের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে প্রচুর পারিতোষিক পাওয়া যাবে তাঁদের কাছ থেকে। ব্যাধেরা নিজেরা-নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল—দিন-রাত শিকারের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, এই কি একটা জীবন? শিকার করা আর শুকনো মাংস ঘাড়ে করে প্রতিদিন বাড়ি ফেরা—এই কষ্টে আর আমাদের দরকার কী—কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা? ব্যাধেরা নানা আলোচনা করে যুধিষ্ঠিরের শিবিরের দিকে রওনা দিল।

এইবারে আসল কথাটা বলি। আগেই উল্লেখ করেছি—রীতিমতো আর্যপুত্র হওয়া সত্ত্বেও ভীমের ভাব-সাব, ব্যবহার ছিল একটু অনার্যরীতি-সম্মত। আগে আরও বলেছি—ভীম ছোটবেলা থেকে যে মদ খাওয়া অভ্যাস করেছিলেন, সে মদ খুব অভিজাত নয়। বিশেষত শবর কিংবা কিরাত জাতীয় ধেনো-হাড়িয়াই যে তাঁর পছন্দসই মদ ছিল—পীত্বা কৈরাতকং মধু—সে কথা আর না বললেও চলবে। এই প্রসঙ্গে এবারে পরিষ্কার জানাই যে, কিরাত-জাতির মদ যখন তাঁর এত পছন্দ, তখন সেই কিরাত বা ব্যাধদের সঙ্গে তাঁর একটা জান-পহেচান থাকবে না, ওঠাবসা থাকবে না—এও কি হয়? বিশেষত নিঃসঙ্গ মদ্যপান কোনও দেশে কোনও মানুষের কাছেই বড় আদরণীয় নয়।

ব্যাপারটা আমি যা বলছি, তার থেকেও গভীরে। ভীম পেটুক মানুষ, খাদ্য-রসিকও বটে। বিচিত্র খাদ্য, কারা কেমন খায়—এই বিচিত্রতা খুঁজতে গিয়েই হয়তো এই ব্যাধদের সঙ্গে ভীমের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাদের শিকারে পাওয়া তাজা মাংস অথবা বাড়িতে 'প্রসেস' করা শুকনো মাংস ভীমের বেশ পছন্দসই ছিল। ফলে এই ব্যাধেরা প্রতিদিন শিকার করে যা পেত, তার বেশ খানিকটা ভীমকে দিয়ে আসত—তে হি নিত্যং মহারাজ ভীমসেনস্য লুব্ধকাঃ/মাংসভারানুপাজহ্রুঃ। বদলে, হয়তো ভীমের কাছে টাকা-পয়সাও পেত ব্যাধেরা। এখানে সংস্কৃত শব্দগুলি লক্ষ করার মতো। কবি বলেছেন 'ভীমসেনস্য লুব্ধকাঃ'—মানে, ভীমের ব্যাধেরা। ভীমের সঙ্গে তাদের এতটাই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল যে তারা এখন ভীমের লোক বলে পরিচিত। তারা দুর্যোধনের খবর নিয়ে চলল ভীমের

কাছে।

যুধিষ্ঠির যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষের মুখে অথচ পাণ্ডবদের প্রধান শত্রু দুর্যোধন একেবারে নিপাত্তা হয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠিরের চরেরা পর্যন্ত নানা দিক ঘুরে এসে তাদের ব্যর্থতা নিবেদন করেছে। ঠিক এই রকম একটা সময়ে ভীমের মদ্য-মাংসের জোগানদার বন্ধুরা এসে পৌঁছল ভীমের কাছে। দ্বার-রক্ষকেরা তাদের কিছুতেই ঢুকতে দিতে চায় না। বন্য ব্যাধ, কাঁধে মাংসভার, রাজপুত্র ভীমের সঙ্গে তাদের কীসের রিস্তা ? ভীম কিন্তু তাঁর ব্যাধ-বন্ধুদের দেখতে পেয়েই দ্বারবানের বকা-খাওয়া লোকগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে দিয়েছেন—বার্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ। ব্যাধেরা যা যা দেখেছিল, যা যা শুনেছিল—সব আদ্যোপান্ত বলল ভীমকে।

ভীম তো ভারী খুশি হলেন। এমন অকল্পনীয়ভাবে দুর্যোধনের শেষ অবস্থানের সংবাদ পেয়ে যাওয়ায় ভীম তাঁর পরিচিত লুব্ধক-শবরদের প্রচুর টাকা-পয়সা দিলেন। তারপর নিজে গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তথাকথিত অন্ত্যজ শবরদের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘোষণা করার ব্যাপারে ভীম একটুও সংকোচ করলেন না। বললেন—যার জন্যে তুমি এত ভাবনা করছ, সেই দুর্যোধনের সম্বন্ধে আমার ব্যাধ-বন্ধুরা খবর এনে দিয়েছে—অসৌ দুর্যোধনো রাজন্ বিজ্ঞাতো মম লুব্ধকৈঃ। তিনি এখন দ্বৈপায়ন হ্রদের তলায় জলস্তম্ভন করে শুয়ে আছেন।

দুর্যোধন জায়গাটা ভালই বেছেছিলেন। যোগের সাহায্যে জলস্তম্ভন করে কতক্ষণ তার মধ্যে থাকা যায়, আমার জানা নেই। কিন্তু যোগাভ্যাসে অনেকক্ষণ যে থাকা যায়—উত্তমোত্তম যোগি-পুরুষেরা সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। যাই হোক, ব্যাধদের কাছে খবর পেয়ে পাণ্ডবরা সকলেই তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মহামতি যুধিষ্ঠির দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে দুর্যোধনের উদ্দেশে নানা কটূক্তি বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের বংশমর্যাদা, তাঁর ক্ষত্রিয়-ধর্ম, যুদ্ধে এত লড়াই করার শখ—এই সব দুর্বল জায়গাগুলি একে একে উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির তাঁকে প্ররোচিত করতে সমর্থ হলেন। দুর্যোধন গদা কাঁধে করে জল থেকে উঠে এলেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠির তাঁকে যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণগুলি—বর্ম, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি দিয়ে সাহস দেখিয়ে বললেন—আমাদের যে কোনও ভাইকে তুমি বেছে নাও যুদ্ধের জন্য।

কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধ জয় করে যুধিষ্ঠির বোধহয় একটু আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—দাদা এটা একটু বেশি সাহস হয়ে যাচ্ছে না কি ? দুর্যোধন এই তেরো বছর ধরে একটি লোহার পুরুষের ওপর গদা চালিয়ে নিজেকে গদাযুদ্ধে অপ্রতিম করে তুলেছে। তুমি তোমার অন্য ভাইদের কথা ছেড়েই দাও, স্বয়ং ভীমেরও দুর্যোধনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। কেন জানেন ? কৃষ্ণ তখন ভীম আর দুর্যোধনের পারস্পরিক বলাবলের একটা চুলচেরা বিচার করলেন। কেননা আজ সেই চরম যুদ্ধ-কাল উপস্থিত, যখন ভীমকে নিজের সর্বাতিশায়িনী শক্তির সঙ্গে নিজের দুর্বলতার জায়গাটির খেয়াল রাখতে হবে। এই দুর্বলতা নিজে বোঝা যায় না, কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শক অথবা শত্রুপক্ষ সেটা বোঝেন বলেই কৃষ্ণের সাবধান-বাণী।

কৃষ্ণ বললেন—প্রথম কথা হল—'প্র্যাকটিস'। এই তেরো বছর ধরে দুর্যোধন লৌহ-পুরুষের ওপর যে গদা হানার অভ্যাস করেছেন, ভীম সেই অনুশীলনের মধ্যে নেই। এই তেরো বছর বনবাস আর অজ্ঞাতবাসের ঝামেলায় ভীম তাঁর গদার পেছনে সেই পরিশ্রম করতেই পারেননি—স চ নাতিকৃতশ্রমঃ—যা দুর্যোধন করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য সময়েও ভীম যে গদার পিছনে খুব পরিশ্রম করেছেন, তা নয়। তার কারণও আছে। ভীমের দৈহিক উচ্চতা, গায়ের অমানুষিক শক্তি, বিশাল দেহের ভার—এই সব কিছুই ভীমকে এমনিতেই এত সুবিধে দিত, যে তার সঙ্গে গদা যোগ হলে সব সময়েই যুদ্ধের ফল হত তাঁর অনুকূলে। গদা-যুদ্ধের কৌশল বেশি করে শেখার কোনও তাগিদই অনুভব করেননি তিনি। কিন্তু দুর্যোধনের যেহেতু দৈহিক দিকে সেই সুবিধে ছিল না, তাই তিনি ভারের চেয়ে ধারের দিকে নজর দিয়েছেন বেশি।

কৃষ্ণ ঠিক এই কথাটাই বলেছেন। বলেছেন—ভীম দুর্যোধনের থেকে অনেক বেশি দৈহিক শক্তি ধারণ করেন এবং তাঁর মতো কষ্টসহিষ্ণুও দুনিয়ায় নেই। কিন্তু দুর্যোধন হলেন নিপুণ। কখন, কোন

সময় দেহের কোন অংশে মারতে হবে—এটা দুর্যোধন বেশি বোঝেন। বলবান আর শিক্ষা নিপুণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হলে, নিপুণ ব্যক্তিরই সুবিধে বেশি—বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ বিশিষ্যতে। আমরা যদি ভীমকে নিয়ে সম্পূর্ণ ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করি তবুও যুদ্ধ-জয়ের ব্যাপারে আমার সন্দেহ থেকে যায়।

ভীম এতক্ষণ সব শুনছিলেন। এবার তিনি নিজে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণকে আশ্বস্ত করার জন্য। কৃষ্ণ যেটা বলেননি, সেটা হল জন্মাবধি দুর্যোধনের ওপর তাঁর প্রতিহিংসা-স্পৃহা। দিনের পর দিন দুর্যোধন তাঁকে যে লাঞ্ছনা দিয়েছেন, সেই লাঞ্ছনাই তাঁকে বিপুল শক্তি জুগিয়েছে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার জন্য। কৃষ্ণ কি সেটা জানেন? সেই সাংঘাতিক মারণ-প্রতিজ্ঞা মাথায় রেখে ভীম বললেন—তোমার এত ভয় পাবার কিছু নেই কৃষ্ণ! যুদ্ধে আমি দুর্যোধনকে মারবই—অহং দুর্যোধনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ভীম বললেন—আমার এই গদাটা দেখছ তো? এটা দুর্যোধনের গদার চেয়ে দেড়গুণ ভারী—গদা গুরুতরী মম। তুমি শুধু দেখে যাও, কৃষ্ণ—আমি কী করি। কৃষ্ণ খুশি হলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে অখণ্ড মনোবল দরকার, সেটা ভীমের আছে জেনে খুশি হলেন কৃষ্ণ। বার বার ভীমকে তিনি সাবধান করে বলে দিলেন—তবু মনে রেখো দুর্যোধন কিন্তু গদার চালে ভীষণ কুশলী, আর তোমার সেই উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞাটা কিন্তু মনে রেখো—ত্বমস্য সক্থিনী ভঙ্ক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যষি। অর্থাৎ অন্যায় যুদ্ধের ইঙ্গিতটা এখনই দিয়ে দিলেন কৃষ্ণ, যদিও ভীম সেটা হয়তো সেইভাবে খেয়াল করলেন না।

ভীম-দুর্যোধনের গদা-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্ত। দু'জনেই নিজে নিজে গদা ঘুরিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পারস্পরিক গালাগালিও চলছে যুদ্ধে প্রস্তুতির মধ্যে মধ্যে। এই সময়ে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম এসে উপস্থিত হলেন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে। ভীম এবং দুর্যোধন দু'জনেই তাঁর শিষ্য। তিনি প্রস্তাব দিলেন—যুদ্ধটা ওখানে নয়, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় যুদ্ধ হোক। তাঁর কথামতো সরস্বতী নদীর তীরে একটা পরিষ্কার জায়গা দু'জনেরই বেশ পছন্দ হল—তস্মিন দেশে সুনির্মুক্তে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্।

দু'জনেই গদা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলেন এবং এই যুদ্ধের লোকোত্তর ব্যাস-বর্ণনায় আমি যাচ্ছি না বা যাওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। রাম-রাবণের যুদ্ধ যেমন রাম-রাবণের মতোই, অন্য উপমান দিলে সে যুদ্ধের যেমন অলংকার-দূষণ ঘটে, তেমনই ভীম-দুর্যোধনের যুদ্ধ ভীম-দুর্যোধনের মতোই। মহাভারতের কবি নানা উপমায় অমোঘ যত শব্দরাশিতে এই দুই মহান যোদ্ধার প্রয়োগ-নিপুণতা দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি শুধু বলব—যুদ্ধ হয়েছে মহামতি কৃষ্ণের দুর্ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে। তবে সুবিধে ছিল এই যে, অসামান্য দক্ষতায় দুর্যোধন যে নিদারুণ গদা-প্রহারগুলি করেছেন—যেগুলি ভীমকে অকস্মাৎ ধরাশায়ী করবে বলে কৃষ্ণ ভেবেছিলেন—সেই আঘাতগুলি ভীম সইতে পেরেছিলেন অসামান্য শারীরিক ক্ষমতায়। দুর্যোধন হঠাৎ করে গদা প্রহার করার পরেও ভীম যে এক পাও নড়লেন না—এটা দুর্যোধনের কাছেও বড় আশ্চর্যের ছিল—নাকম্পত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ। অন্যদিকে ভীম যখন বিপুল বেগে গদা ঘুরিয়ে দুর্যোধনের দিকে ছুড়ছেন, সেই সময় মাথাটি পুরো ঠাণ্ডা রেখে দুর্যোধন যে শেষ মুহূর্তে সামান্য সরে গিয়েই গদাঘাতটি বাঁচিয়ে নিলেন—এটাও ছিল বড় আশ্চর্যের—তত্রাভূদ্ বিস্ময়ো মহান্।

শক্তি ও নিপুণতার বিনিময় এবং অবশ্যই পারস্পরিক আক্রোশে ভীম এবং দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, যাতে মাঝে-মধ্যে উভয় পক্ষেরই ভূমিতে পতন কিংবা সাময়িক ঝিম মেরে যাওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ব্যাসের বিশাল এই যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে যেটা ভীষণভাবে লক্ষণীয়, সেটা হল—অভ্যাসের জন্যই হোক বা নিপুণতার জন্যই হোক, ভীমের গদার বাড়ি বাঁচিয়ে ওপর দিকে লাফিয়ে উঠে আবার মারা অথবা সরে গিয়ে পাশ থেকে বাড়ি কষানোটাই দুর্যোধনের যুদ্ধ-কৌশলের প্রধান অঙ্গের মধ্যে পড়ে—চরত্যূর্ধ্বঞ্চ তির্য্যক্ চ ভীমসেন-জিঘাংসয়া। ভীমের শরীর অনেক ভারী, তাঁর পক্ষে উঁচুতে লাফিয়ে উঠে গদার বাড়ি বাঁচানোর চেয়ে গদা খাওয়াটা অনেক বেশি সহনীয় ছিল।

এই যে উর্ধ্বে উল্লম্ফন এবং সরে গিয়ে পাশ থেকে মারাটা যেমন দুর্যোধনের মস্ত কৌশল কিন্তু এই কৌশলের মধ্যেই ছিল তাঁর দুর্বলতা। যুদ্ধের মত্ততায় ভীমের যেমন উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞাটি মনেই ছিল না, তেমনই দুর্যোধনেরও মনে ছিল না যে, ভীম তাঁর উরুতেই আঘাত করবেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে নানা অন্যায় অত্যাচার করতে যাঁর বাধেনি, তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল যে, ভীম তেরো বছর আগেই তাঁর উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞাটা, সে যুদ্ধ অন্যায়-যুদ্ধ হলেও, সে প্রতিজ্ঞাটা করে রেখেছেন।

ঘোর যুদ্ধের মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে অর্জুন নিজের উরুতে থাপ্পড় মেরে ভীমকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ঠিক এইসময় থেকে ভীমের যুদ্ধের 'স্ট্রাটিজি'টা একটু পালটে গেল। তিনি কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে থেকে চক্রাকারে দুর্যোধনকে ধাওয়া করতে লাগলেন, কখনও বা 'গোমূত্রবৎ' থেমে থেমে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণে যেতে লাগলেন। এই আক্রমণেও দুর্যোধন খুব অসফল হননি এবং এর মধ্যেও ভীম কয়েকবার পদাঘাত সহ্য করেছেন। কিন্তু একটা সময় এল ভীম ধেয়ে যাচ্ছেন দুর্যোধনের দিকে এবং দুর্যোধন দেখালেন যেন তিনি দাঁড়িয়েই থাকবেন। শেষ মুহূর্তে আঘাত হানার আগে ভীমকে ধোঁকা দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন উঁচুতে সবেগে। ভীমের দিক থেকে সুবিধে ছিল তিনি তখনও আঘাতটা করে ফেলেননি। করে ফেললে তাঁর গদার আঘাতটা পড়ত গিয়ে মাটিতে এবং ওপর থেকে নেমে আসা দুর্যোধনের বাড়িটা পড়ত তাঁর ঘাড়ে। ওপরে লাফিয়ে ওঠা দুর্যোধনের কায়দাটা বুঝে ফেলেই ভীম নীচ থেকে শেষ এবং চরম গদাঘাত করলেন দুর্যোধনের উরুর ওপর।

মরণান্তিক আর্তনাদ করে উরু-ভাঙা অবস্থায় দুর্যোধন মাটিতে শুয়ে পড়লেন। পাণ্ডবরা দূর থেকে দেখছেন এই অবস্থায় ভীম ত্বরিতে উপস্থিত হলেন দুর্যোধনের সামনে। কোনও মায়া নয়, কোনও মমতা নয়, চরম শত্রুতার চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য ভীম ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের মাথার ওপর তুলে দিলেন তাঁর বাম চরণখানি। পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথা ঘষে ভীম বললেন—আমাকে যারা ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে 'গরু' বলেছিল, আজ তাদের আমি 'গরু' বলে ডাকছি। এই প্রসঙ্গে ভীমের শেষ কথাটা ছিল অপূর্ব। ভীম বললেন—যারা রজস্বলা অবস্থায় একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে পাশা-খেলার আসরে ধরে এনে বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করেছিল, আজ সেই দুর্যোধন ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা দ্রৌপদীর তপস্যার প্রভাবে পাণ্ডবদের হাতে মারা গেল—আপনারা সবাই দেখুন—তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈ র্ধার্তরাষ্ট্রান্ রণে হতাংস্তপসা যাজ্ঞসেন্যাঃ।

১২

দুর্যোধনের মৃত্যুর অব্যবহিত আগে এবং পরে ভীম বহুতর তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁর আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ঠিক এক্ষুনি যে কথাটা ভীমের মুখে আমরা শুনলাম, তার মধ্যে দু'টি কথা আমি খুব জরুরি বলে মনে করি। এক, পাণ্ডবদের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা নিহত হয়েছেন ; দেখো। দুই, যাজ্ঞসেনীর তপস্যায় পাণ্ডবদের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা নিহত হয়েছেন, দেখো।

মনে রাখা দরকার, ভীম যে দুর্যোধনের মাথাটা পা দিয়ে ঘষে দিয়েছিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তা অনুমোদন করেননি। তাঁর মায়ার শরীর, তিনি অসীম দয়ালুতায় ভীমকে বলেছিলেন—এত অপমান কোরো না ভীম, হাজার হলেও তিনি রাজা, আমাদের জ্ঞাতি, জনসমাজে তাঁর একটা সম্মান আছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভীম থেমেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের মনে হয়—সদা ক্রোধী, ক্ষমাহীন ভীমের দিক থেকে এই ব্যবহার কতটাই বা অন্যায় ছিল! একজন ব্যক্তি হিসেবে যদি বিবেচনা করেন, তবে দেখবেন—দুর্যোধনের অবিচার, অন্যায়, অত্যাচার, ভীম কতটা সহ্য করেছেন, আর যুধিষ্ঠিরই বা কতটুকু ? যে বয়সে ভীমকে বিষ খাইয়েছিলেন দুর্যোধন, যেভাবে বারণাবতের ভার ভীমকে বইতে হয়েছিল, যেভাবে যুধিষ্ঠির ভাইদের পণ রেখে পাশা খেলেছিলেন, যেভাবে দ্রৌপদীকে রাজসভায় অপমানিত হতে হয়েছিল, এবং যেভাবে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গি করে কৌরবরা ভেঙিয়েছিলেন, তাতে একজন সম্মানী লোকের পক্ষে দাদাকে অতিক্রম করাটা অস্বাভাবিক ছিল

না। কিন্তু তবু তিনি অতিক্রম করেননি। নিজের সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং অহংবোধ থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে যদি তিনি বিনত থেকে থাকেন, তো সে ব্যক্তি যুধিষ্ঠির। কিন্তু এও তো ঠিক যে, বছরের পর বছর যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্বে নিজেকে দমন করা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ক্রোধগুলি তাঁর জমেই ছিল। দুর্যোধনকে নিজে হাতে মেরে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশটুকুই শুধু মিটিয়ে নিয়েছেন তাঁর মাথায় বাম চরণ তুলে দিয়ে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই ভীম জানেন যে, এই বিশাল যুদ্ধ তিনি একা জেতেননি। প্রত্যেক পাণ্ডবভাইয়ের এখানে অবদান আছে এবং 'টোটালিটি' দিয়েই সেই যুদ্ধের বিচার করা যায়। উপরন্তু দ্রৌপদী শুধু তাঁর একার স্ত্রী নন, প্রত্যেক পাণ্ডবের সেখানে সমান অধিকার। দৈবাৎ দুর্যোধনের সঙ্গে এই শেষ যুদ্ধ তাঁরই মাধ্যমে শেষ হল, কিন্তু তিনি নিজে তার 'ক্রেডিট' নিতে চান না। সম্পূর্ণ জয় তাই তিনি উৎসর্গ করেছেন পাণ্ডবদের নামে এবং সেই জয়ের কারণ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক ক্ষত্রিয়াণীর সাধনাকে, অলৌকিক ভাষায় যার নাম দ্রৌপদীর তপস্যা। দ্রৌপদীর সাধনার মূর্তিময় সাধন হলেন ভীম। কৌরবদের নিগ্রহে ভীম যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সে তাঁর ব্যক্তিগত ক্রোধের জন্য যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর ভাইদের জন্য এবং তার থেকেও বেশি দ্রৌপদীর জন্য। ভীমের বক্তব্যে বার বার দেখা যাবে যে, তিনি তাঁর নিজের কারণে যতটা ক্ষুব্ধ, তার চেয়ে শত-গুণ বেশি ক্ষুব্ধ হন দাদা যুধিষ্ঠিরের অপমানে এবং ততোধিক, তাঁর প্রিয়া দ্রৌপদীর অপমানে।

ভীমের চরিত্র-আলোচনার শেষ পর্বে এসে আবারও আমাদের দ্রৌপদীর কথাই স্মরণ করতে হবে। দ্রৌপদী, দ্রৌপদী এবং দ্রৌপদী। সেই সভাপর্বের প্রথম থেকে আমরা ভীমের মধ্যে দ্রৌপদীর চির ভক্তটিকে দেখতে পেয়েছি। আজ এই যুদ্ধ-পর্বের শেষে এসে ভীমকে আরও একবার দ্রৌপদীর ইচ্ছা-পূরক এক পুরুষ হিসেবে দেখতে পাব।

অশ্বত্থামা পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য দুর্যোধনের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা আরও একবার তিনি ঝালিয়ে নিলেন মৃত্যুপথযাত্রী ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের সামনে। পাণ্ডবদের শিবিরে যখন জয়ের উল্লাস চলছে, ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে তিনজন মহারথী স্বার্থ সাধনের তাড়নায় বেরিয়ে পড়লেন পাণ্ডব-শিবিরের উদ্দেশ্যে। রাত আরও ঘনিয়ে এল। সুখসুপ্ত হলেন পাঞ্চালের রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রেরা। অশ্বত্থামা বিনা দ্বিধায় পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সমস্ত পাঞ্চালদের মেরে রেখে এলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দুর্যোধন বড় সুখী হলেন এই সংবাদ পেয়ে। বংশে বাতি দিতে পাণ্ডবদের কেউ রইল না—এই যা তাঁর শান্তি।

অশ্বত্থামার চক্রান্তে সমস্ত পাণ্ডব-শিবির বিহ্বল হয়ে পড়ল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মনের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। নকুলকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বিরাটরাজার নগরী থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে। প্রিয় পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শুনে দ্রৌপদী আর স্থির থাকতে পারলেন না। বিশেষত যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে প্রায় মাটিতে পড়ে যাবার মতো হলেন। অশ্বত্থামার ব্যবহারে ভীম ক্রোধে আরক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্রৌপদীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে তিনি এক লাফে গিয়ে দ্রৌপদীকে ধরে ফেললেন—বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ। দ্রৌপদী ঢলে পড়লেন ভীমের কোলে। ভীম তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, অনেক বোঝালেন। কিন্তু দ্রৌপদীর মতো এক ক্ষত্রিয়াণীর পুত্রশোক ধর্মপ্রবচনে শান্তি লাভ করে না। উপযুক্ত প্রতিহিংসার মধ্যেই এই শোকের তবু কিছু শান্তি।

দ্রৌপদী প্রকৃতিস্থা হয়েই যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তুমি যদি সবিক্রমে অশ্বত্থামার জীবন না হরণ করো অথবা যদি কোনওক্রমে এই পাপিষ্ঠ বেঁচে থাকে, তবে আমি এই তোমার সামনে উপোস করে মরব। যুধিষ্ঠির সামান্য এটা-ওটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন—হ্যাঁ অশ্বত্থামা পালিয়ে গেছে, বড্ড দূর সেই পথ, দুর্গম বনের মধ্যে কোথায় তাঁকে খুঁজব—ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্রৌপদী বললেন—ওসব বুঝি না। শুনেছি অশ্বত্থামার মাথায় তার জন্মের সময় থেকেই একটি সহজাত মণি আছে, তুমি ওই পাপিষ্ঠকে মেরে ওই মণি এনে দেবে আমাকে এবং সেই মণি আমি তোমার মাথায় দেখব, তবেই

আমি বাঁচব, নইলে নয়—জীবেয়মিতি মে মতিঃ।

দ্রৌপদী দেখলেন—ধর্মপুত্রকে বেশি বলে লাভ নেই। তিনি নানান সুযুক্তি দেবেন আর চিন্তা করবেন, তার থেকে বরং তাঁর সাধনার সাধন ভীমকে ধরা ভাল। দ্রৌপদী যা বলবেন, তাই তিনি করবেন। অতএব দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে ভীমকে বললেন—তুমিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারো, ভীম—ত্রাতুমর্হসি মাং ভীম। তুমিই ওই পাপিষ্ঠকে মেরে দেখাও, ঠিক যেমন ইন্দ্র মেরেছিলেন শম্বরাসুরকে। শুধু এইটুকু বলেই দ্রৌপদী থামলেন না। বিপন্না রমণীর সমস্ত রমণীয়তার সঙ্গে বিদগ্ধতার মিশ্রণ ঘটিয়ে দ্রৌপদী ভীমের ওপর আবারও সেই আস্থা, সেই বিশ্বাস জ্ঞাপন করলেন, যে আস্থা এবং বিশ্বাস তাঁর অন্য পাণ্ডবস্বামীরা লাভ করেননি। দ্রৌপদী বললেন—কি সাধারণ, অবস্থায়, কি বিপদে, তুমি যেমন তোমার সমস্ত বিক্রম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো—এমনটি দ্বিতীয় কেউ নেই—ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ পুমান্ অস্তীহ কশ্চন। বারণাবতের জতুগৃহে যখন আগুন দেওয়া হয়েছিল, তখন তুমিই পাণ্ডবদের আশ্রয় ছিলে, হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করার সময়েও সেই তুমি। আবার ওই বিরাটনগরে বদমাশ কীচক যখন আমার পিছনে লেগেছিল, তখন তুমিই সেই বিপদে থেকে আমায় রক্ষা করেছিলে, ঠিক যেমন ইন্দ্র তাঁর প্রিয়া পত্নী শচীদেবীকে সব সময় রক্ষা করেন—পৌলোমীং মঘবানিব। আজ সময় এসেছে, আবার তুমি অশ্বত্থামাকে মেরে নিজে সুখী হও—বিনিহত্য সুখী ভব। 'তুমি সুখী হও' মানে, আমি যেহেতু সুখী হব অতএব তুমি সুখী হবেই—দ্রৌপদী এটা ধরেই নিয়েছেন।

ভীমের বুকটা নিশ্চয়ই ফুলে উঠল। কৃষ্ণা-পাঞ্চালী যে শুধু যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কথা জানিয়েই ছেড়ে দেননি, ভীমকে যে তিনি আলাদা করে এই নির্দিষ্ট কাজের জন্য চরম বিশ্বাসভাজন মনে করেছেন—এটা ভীমকে নিশ্চয় পুলকিত করেছে। যুধিষ্ঠির নয়, অর্জুন নয়, ভীমকে তিনি নিজের কাজের জন্য, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য অদ্বিতীয় বলে মনে করেছেন। তা ছাড়া 'শচীকে যেমন রক্ষা করেন ইন্দ্র' এই কথাটি বলে ভীমের মর্যাদা এক মুহূর্তে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্রৌপদী। শচীর যেমন ইন্দ্র, দ্রৌপদীর তেমনই ভীম—বিপৎ-ত্রাণের ব্যাপারে এই একতম অধিকার, এই একান্ত আস্থা ভীমকে বুঝিয়েছে যে, দ্রৌপদী যেন তাঁকেই একমাত্র ভরসা করার মতো স্বামী বলে মনে করেন। নিজেকে ভীম নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে দেবরাজ ইন্দ্রের সাজাত্যে অনুভব করেছেন। শচীকল্প দ্রৌপদী যেন তাঁর একার—ভীমের বুক ফুলে উঠল।

ভীম মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশের অপেক্ষা করলেন না। নকুলকে সারথি নিয়ে সোজা রথ হাঁকিয়ে দিলেন অশ্বত্থামার সম্ভাব্য গতিপথ লক্ষ্য করে। ভীম দ্বিতীয়বার কিছু ভাবলেন না, কিন্তু ভাববার মতো কিছু ছিল। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যথেষ্ট অস্ত্রনিপুণ বটে, তবে তাঁর সংযম বস্তুটা বড় কম ছিল। মনের সংযম তাঁর যেমন কম, তেমনই অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর সংযম ছিল না, বিশেষত মারণাস্ত্রের প্রয়োগে। সেকালের গুরুরা শিষ্যকে মারণাস্ত্রের প্রয়োগ শেখালে শতাধিকবার তার যথাযুক্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত করতেন। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে 'ব্রহ্মশির' নামে এক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র দিয়েছিলেন কিন্তু গুরুর এই অহৈতুকী কৃপা পুত্র হিসেবে অশ্বত্থামার সহ্য হয়নি। তিনিও পিতার কাছে এই অস্ত্রের জন্য বায়না ধরেছিলেন। স্নেহ প্রবল হওয়ায় দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকে ওই মারণাস্ত্র দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু খুশি মনে দেননি—নাতিহৃষ্টমনা ইব। দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্রের বুদ্ধি-চাঞ্চল্যের খবর রাখতেন যথেষ্ট—বিদিতং চাপলং হ্যাসীদত্মজস্য মহাত্মনঃ—এবং সেইজন্যই তাঁকে এই অস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব বড় পালটায় না।

কিচ্ছু না ভেবে ভীমকে ছুটে যেতে দেখেই কৃষ্ণ ভয় পেলেন এবং অর্জুনকে নিয়ে ছুটলেন ভীমের পিছন-পিছন। কারণ অশ্বত্থামা যদি কোনওক্রমে সেই দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মশির প্রয়োগ করেন তা হলে এক মুহূর্তে ভীম নিশ্চিহ্ন হবেন। ভীম রথ নিয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় গঙ্গাতীরে দেখলেন—অশ্বত্থামা কৌপীন-টৌপীন পরে ব্যাসদেবের সামনে-বসা ঋষিদের সঙ্গে বসে আছেন। ভীম তাঁকে দেখেই 'দাঁড়া ব্যাটা, দাঁড়া'—এমনটি বলতেই অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির তুলে নিলেন হাতে, কারণ অশ্বত্থামা কৃষ্ণ এবং অর্জুনকেও ভীমের পিছনে আসতে দেখেছেন।

এর পরের ঘটনা সবার জানা। অর্জুনও তাঁর ব্রহ্মশির ত্যাগ করলেন এবং মহর্ষি বেদব্যাস এবং নারদ এসে দাঁড়ালেন উভয়ের মাঝখানে। ঋষিদের অনুরোধে অর্জুন তাঁর অস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন বটে কিন্তু অশ্বত্থামা তা পারলেন না। বেদব্যাস অশ্বত্থামাকে মাথার মণিটি দিয়ে দিতে বললেন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে। অশ্বত্থামা মণি দিতে বাধ্য হলেন এবং সেটি নিয়ে পাণ্ডবরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরলেন দ্রৌপদীর কাছে। ভীম মণিটি হাতে নিয়ে দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন—এই নাও তোমার মণি—অয়ং ভদ্রে তব মণিঃ—তোমার পুত্রহন্তা পরাজিত। দ্রৌপদীর একটা কথায় ভীমের একটু অভিমান ছিল। আজকে দ্রৌপদীর কাছে তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূরণ করে ভীম সেই পুরনো কথাটা তুললেন। ভীম বললেন—কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনায় যাচ্ছিলেন, তখন তুমি দুঃখ করে বলেছিলে—'আমার স্বামী নেই, আমার ছেলে নেই, এমনকী তুমিও নেই কৃষ্ণ'। আজকে দেখো—দুর্যোধনকে মেরে আমি আমার কথা রেখেছি। দুঃশাসন যখন মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল, সেই অবস্থায় আমি তার রক্ত পান করেছি, আমি কথা রেখেছি।

এক নিঃশ্বাসে স্বামিত্বের এতগুলি প্রমাণ দিয়েও ভীমের মনে হল—দ্রৌপদী যে বলেছিলেন অশ্বত্থামাকে মেরে তার মণি ছিনিয়ে আনবে তুমি। কিন্তু ব্যাসের মধ্যস্থতায় তাকে মারা তো হয়নি ; দ্রৌপদী যদি আবারও রেগে যান ? ভীম তাই—অশ্বত্থামা কতটা বিধ্বস্ত হয়েছেন, ক্ষত্রিয়ের ধর্মে কতটা লাঞ্ছিত হয়েছেন—সেগুলি বলে পরোক্ষে অশ্বত্থামার যে মৃত্যুই হয়েছে—সেটাই বোঝাতে চাইলেন। ভীম বললেন—অশ্বত্থামার কীর্তি একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি, দ্রৌপদী—যশোস্য পাতিতং দেবি শরীরং ত্ববশেষিতম্—ওকে শুধু বাকি রেখেছি প্রাণে মারতে। নইলে, মণি তো কেড়েই নিয়েছি, উপরন্তু ওকে বাধ্য করেছি সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের সামনে মাটিতে নামিয়ে রেখে আত্ম-সমর্পণ করতে।

দ্রৌপদী ভীমের এই অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, গুরুপুত্র গুরুই বটে। এই কাজটি করে দিয়ে তুমি অন্তত আমাকে আমার পুত্রদের কাছে ঋণমুক্ত হবার সুযোগ দিয়েছ। অশ্বত্থামার সঙ্গে যা ঘটেছিল, তাতে ভীমের থেকে অর্জুনের 'ক্রেডিট'ই বেশি। কিন্তু এও ঠিক ভীম যদি দ্রৌপদীর কথা শোনামাত্র বেরিয়ে না পড়তেন, তাহলে যুধিষ্ঠিরের ঔদাসীন্যে অর্জুনও উদাসীন হয়ে পড়তেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যে ঝড় বয়ে গেল পাণ্ডব-শিবিরে এবং পুত্রশোকে দ্রৌপদীর যে অবস্থা হয়েছিল, তা থেকে ভীমই তাঁকে উদ্ধার করেছেন এবং পরিশেষে তিনি যেন দ্রৌপদীর কাছে সেই স্বামিত্বের অধিকার দাবি করেছেন, যাতে দ্রৌপদী আর পাণ্ডব-বন্ধু কৃষ্ণকে ঠোঁট ফুলিয়ে সাভিমানে না বলতে পারেন—আমার স্বামীরা নেই, এমনকী তুমিও নেই কৃষ্ণ ! নইলে এমন পোড়া কপাল হয় আমার ! কুঞ্চিত ভুরুতে কৃষ্ণের কাছে এই কথা বলার সময় দ্রৌপদীকে নিশ্চয় এতটাই সুন্দর দেখিয়েছিল যে, ভীম কি একটু ঈর্ষান্বিত বোধ করেছিলেন ? আজ সবগুলি প্রতিজ্ঞা-পূরণের পর দ্রৌপদীর কাছে ভীম তাই সানুযোগে বলতে চেয়েছেন—কী দ্রৌপদী ! সত্যিই কি তোমার স্বামী নেই বলে মনে হচ্ছে ?

আমরা আবারও দ্রৌপদীর অঞ্চলছায়া থেকে ভীমকে সরিয়ে আনব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনায় চললেন ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। পারস্পরিক সান্ত্বনার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন—ভীম কোথায় ? তাকে তো দেখছি না ? সরলমতি ভীম এগিয়েই যাচ্ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, কিন্তু কৃষ্ণ সেই সময় এক ঝটকায় তাঁকে সরিয়ে দিয়ে একটি লৌহ-ভীম এগিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দুর্যোধন এক সময়ে এই লোহার ভীমটি বানিয়ে তার ওপরে গদার বাড়ি মারার অভ্যাস করতেন। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভীমের ক্ষতি করার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রহন্তা ভীমকে খুঁজছেন। ধৃতরাষ্ট্রের গায়ে অসাধারণ শক্তি ছিল এবং সেই শক্তিতে লৌহ ভীমও তিনি চূর্ণ করে ফেললেন। এই ঘটনার পর ধৃতরাষ্ট্রের মনে অবশ্য অনুশোচনাও হল। ভীমকে মেরে ফেলেছেন ভেবে তিনি কাঁদতেও আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই ব্যবহার লোক-দেখানোও হতে পারে। কৃষ্ণ অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে লৌহ-ভীমের কথা প্রকাশ করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও খানিকটা শান্ত হলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবহারের একটা প্রভাব অবশ্যই ভীমের ওপর পড়েছিল এবং

নানাভাবে এই বিরূপ ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে ভীম ছাড়েননি। আমি আসছি সে কথায়।

ধৃতরাষ্ট্রের পর পাণ্ডবরা জননী গান্ধারীর মুখোমুখি হলেন। তাঁর শতপুত্রের হন্তা বলে এখানে ভীমের কিছু জবাবদিহিও করার ছিল। ভীমকে আমরা এই জননীর সম্মুখে অন্য এক রূপে দেখি। পুত্রশোকাতুরা এক জননীর হৃদয় তিনি এতটাই বুঝেছিলেন যে, দুর্যোধন-দুঃশাসনের মৃত্যু ভীমের মুখে অন্যতর একটা মাত্রা লাভ করে গান্ধারীর সামনে। গান্ধারী বলেছিলেন—দুর্যোধন ভীমের চাইতে গদাযুদ্ধে বেশি নিপুণ কিন্তু ভীম তাঁকে নাভির নীচে গদা মেরে যে অন্যায় করেছে, তাতে আমার বড় রাগ হচ্ছে—তন্মে কোপমবর্ধয়ৎ।

মুখ কাঁচুমাচু করে ভীম যখন গান্ধারীর সামনে এসে বললেন—অধর্মই হোক আর ধর্মই হোক, আমি দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করেছি, সেটা ভয়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য—আত্মানাং ত্রাতুকামেন ত্রাসাত্তত্র ময়া কৃতঃ। নইলে, ওপরে যেভাবে লাফিয়ে উঠে গদা বাগিয়ে ধরেছিলেন দুর্যোধন, তাতে উরুতে আঘাত না করলে ভীমের মৃত্যু ছিল অবধারিত। ভীম তাঁর কৃতকর্মের একটু অন্যরকম ব্যাখ্যা করেই গান্ধারীর হৃদয় জয় করেছেন। যে পুত্রের বীর্যবত্তা এবং নিপুণতা সম্বন্ধে মায়ের গর্ব ছিল গান্ধারীর মনে, সেই বীর্য এবং নিপুণতাকেই তার হত্যাকারী ভয় পেয়েছে এবং সেই ভয়ে সে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছে—এই কথাটা পুত্রশোকাতুরা জননীকে যে খানিকটা সান্ত্বনা দেবে এটা ভীম বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই অথবা হয়তো বা গান্ধারীর মতো অমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলেই ভীম অকপটে স্বীকার করেছেন—এটা ঠিকই ; তোমার ছেলেকে আমি ন্যায়-যুদ্ধে মারতে পারিনি। কিন্তু এমন কে আছে এই পৃথিবীতে, যে তাঁকে ন্যায় যুদ্ধে মারতে পারত ? সেই জন্য আমিও অন্যায়ই করেছি—ন শক্যঃ কেনচিদ্ধন্তুমতো বিষমমাচরম্।

গান্ধারীর সামনে এই অকপট স্বীকারোক্তি ভীমের মাহাত্ম্য এখানে শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। অন্যদিকে লক্ষণীয় এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্যোধনের সারা জীবনের অন্যায়, অত্যাচার এবং প্রবঞ্চনার ঘটনাগুলিও গান্ধারীর সামনে পুনরুক্তি করতে ছাড়েননি। ভীম তার প্রত্যেকটি অন্যায়ের উল্লেখ করেছেন আর বলেছেন—সেই জন্য আমি এই অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছি—ততো বিষমমাচরম্। গান্ধারী যেহেতু নিজ পুত্রের গভীর অন্যায়গুলি সব জানেন, কাজেই ভীমের কথাগুলি তাঁর কাছে অগ্রাহ্য হয়ে যায়নি। ভীম তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—তোমার ছেলে আমাদের সঙ্গে কত অভব্যতা করেছে, তা তো তুমি সবই জানো মা—ভবত্যা বিদিতং সর্বমুক্তবান্ যত সুতস্তব।

গান্ধারীও এই প্রত্যুত্তরের যোগ্য ব্যক্তি। ভীম অন্যায় স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝেছেন যে, ভয় এবং আত্মরক্ষার তাগিদেই ভীম এই অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন—ঠিক আছে, এটা না হয় বুঝলাম। তা ছাড়া তুমি তো আমার ছেলের প্রশংসাই করছ—যৎ প্রশংসসি মে সুতম্। কিন্তু দুঃশাসনের ব্যাপারে তুমি কী বলবে ? দুঃশাসনের বুক চিরে তুমি রক্ত খেলে রণক্ষেত্রে ? এমন অনার্য ব্যবহার কেউ কোনওদিন করেছে ? গান্ধারীর মন বুঝে ভীম যুক্তি দিলেন—কী বলছ তুমি মা ? অন্যের রক্ত তো কেউ খায়ই না, তাতে আবার নিজের রক্ত। আমার রক্তের সঙ্গে আমার ভাইয়ের রক্তের তফাত আছে কোনও—যথৈবাত্মা তথা ভ্রাতা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ? তা ছাড়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি মাত্র। দুঃশাসনের রক্ত পান করা দূরের কথা, সে রক্ত আমার দাঁত বা ঠোঁটের নীচে যায়নি—রুধিরং ন ব্যতিক্রামদ্ দন্তোষ্ঠাদ্ অম্ব মা শুচঃ। তা ছাড়া তোমার ছেলেরা চিরকাল আমাদের অপকার করার চেষ্টা করেছে, যদিও আমরা আগে কোনওদিন তাঁদের অপকার করিনি। এই অবস্থায় তুমি যখন তাঁদের বারণ করতে পারনি তখন শুধু তুমি আমার দোষটাই দেখছ—এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না—ন মামর্হসি কল্যাণি দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।

ভীমের এই যুক্তিটাও গান্ধারী স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু গান্ধারীর শেষ কথাটা ছিল অকাট্য এবং ভীমের সেখানে উত্তর দেওয়ার কিছু ছিল না। গান্ধারী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিয়ে করুণার প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন—ভীম! তুমি এই বৃদ্ধের একশোটা ছেলের মধ্যে অন্তত একজনকেও তো

বাঁচিয়ে রাখতে পারতে। আমাদের রাজ্য চলে গেল, তাতে কিছু নয়, কিন্তু অন্তত একটা ছেলে বেঁচে থাকলেও তো সে আমাদের এই দুই বুড়ো-বুড়ির হাতের নড়ি হত—নাশেষয়ঃ কথং যষ্টিমেকাং বৃদ্ধ-যুগস্য বৈ। ভীম এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারেননি। কারণ, এ-কথার কোনও উত্তর হয় না। গান্ধারী যে বৃদ্ধের প্রতি ভীমকে করুণা করতে বলেছিলেন, সেই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি পছন্দ করতেন না মোটেই। তবুও একশোটার মধ্যে অন্তত একটি নিরীহ পুত্রকে তিনি প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন, যদিও তা তিনি পারেননি, এবং হয়তো সেটা ধৃতরাষ্ট্রের জন্যই।

সেই ছোটবেলা থেকে পাণ্ডবদের ওপর, বিশেষত ভীমের ওপর দুর্যোধন-শকুনিদের যে অত্যাচার হয়েছে, সেই অত্যাচারের সম্বন্ধে ভীমের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ভীম মনে করতেন—স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র ইচ্ছে করলে কৌরবপুত্রদের অন্যায়গুলি বারণ করতে পারতেন। সেই বারণ তো তিনি করেনইনি, উপরন্তু দুর্যোধন-দুঃশাসনদের চক্রান্তের পিছনে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পক্ষপাত ছিল। পাণ্ডবদের নিজস্ব ঘরোয়া আলোচনায়, সভাগৃহের নানা তর্ক-যুক্তিতে ভীম বার বার ধৃতরাষ্ট্রের কুচক্রী ভাব প্রকাশ করেছেন। কথা-প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে—বুড়ো এই করেছে, সেই করেছে—বলতেও ভীমের কোনও দ্বিধা ছিল না। কাজেই গান্ধারীর 'বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র' ভীমের কাছে 'কুচক্রী বুড়ো' ছাড়া আর কিছুই নয় আর সেই বুড়োর একটি সন্তানও অবশিষ্ট রাখা মানে,—ভীমের কাছে চক্রান্তের শেষটুকু জিইয়ে রাখা। ভীম তা চাননি এবং সেই কারণেই গান্ধারীর শেষ বক্তব্যে তিনি সাড়া দেননি।

যুদ্ধ-বীরদের শ্রাদ্ধ-শান্তি সব মিটে গেলে পাণ্ডবদের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন স্বয়ং পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। শত শত মহাবীরদের মৃত্যু বরণ করতে দেখে যুধিষ্ঠিরের মন ভোগ-বিমুখ হয়ে উঠল। তিনি সিংহাসনে বসতেই চাইলেন না। এ অবস্থায় যিনি প্রথম মুখ খুললেন, তিনি ভীম। সমস্ত শত্রু-পাতন করার পর যুধিষ্ঠিরের এই রাজ্য-বিমুখতা তাঁর কাছে অতিনাটকীয়তা ছাড়া কিছু মনে হল না। তিনি সেই কথাগুলি আবারও যুধিষ্ঠিরকে বলতে আরম্ভ করলেন, যা একবার তিনি বলেছিলেন বনবাসে।

ভীম বললেন—তোমার বুদ্ধিটা একেবারে বোকার মতো ; বেদ মুখস্থ করা বামুনদের মতো তোমার বুদ্ধিটা একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে। রাজা হওয়ার ব্যাপারে তোমার যে এত অনীহা, এটা আসলে তোমার অলস স্বভাবের জন্য, অন্য কিছু নয়—আলস্যে কৃতচিত্তস্য রাজধর্ম্মানসূয়তঃ। তা বাপু! তোমার এই জড় বুদ্ধির কথাটা আগে জানালেই পারতে, তা হলে আর আমরা কষ্ট করে যুদ্ধও করতাম না, এত সব লোকও মারা যেত না। সারা জীবন যেমন ভিক্ষে করে কেটেছে, তেমনই ভিক্ষে করেই এই জীবন কাটিয়ে দিতাম—ভৈক্ষমেবাচরিষ্যাম।

ভীম আবারও কৌরবদের অন্যায়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তারা যে অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গও জানাতে ভোলেননি। হৃত রাজ্য নিজেদের বাহুবলে সম্পূর্ণ অধিকার করার পর আজকে যুধিষ্ঠিরের এই বৈরাগ্য-ভাব ভীমের কাছে পুরো 'ন্যাকামি'র মতো লাগছে। ভীম বললেন—তোমার ভাবটা কী রকম জানো? কুয়ো খুঁড়ে যারা জল পায় না, তারা যেমন গায়ে খানিকটা কাদা মেখে শেষে তৃপ্তি পায়, তুমিও সেই রকমই করছ। গাছে উঠে মধু না পেয়ে যারা গাছ থেকে পড়ে মরে, তোমার অবস্থাও সেই রকম। কামুক পুরুষ স্ত্রীলোক হাতে পেয়েও যদি ভোগ করতে না পারে, তাদের যেমন অবস্থা হয়, তোমার অবস্থাও সেইরকম।

ভীম খুব গালাগালি দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। মনের সাধ মিটিয়ে গালাগালি দিলেন। এমনকী এটা বলতেও ছাড়লেন না যে,—আমরাই বোকা, শুধু শুধু আমরা তোমাকে দাদা বলে একটা বোকা-বুদ্ধি লোকের পেছনে পেছন ছুটেছি—বয়মেবাত্র গর্হ্যা হি যদ্ বয়ং মন্দচেতসম্। আমাদের শক্তি ছিল, বিদ্যা ছিল, বুদ্ধির গভীরতাও ছিল, কিন্তু তবু অক্ষম লোকের মতো এক নপুংসকের আদেশ পালন করে চলেছি—ক্লীবস্য বাক্যে তিষ্ঠামো যথৈবাশক্তয়স্তথা।

ভীম যুধিষ্ঠিরের পিঠোপিঠি ভাই বলেই বোধহয় এতটা বলতে পারেন। শত্রুতার গভীর পারাবার পার হয়ে এসে আজ নিজের লোকই অন্য সুরে কথা কইছে, ভীমের এই সব দ্বিমুখতা সহ্য হবার

নয়। অতএব গালাগালি যা দিলেন, চরমভাবেই দিলেন। শুধু ভীম নয়, যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন গ্রহণ করার জন্য অর্জুন, যমজ দু-ভাই এবং দ্রৌপদী—প্রত্যেকেই যথেষ্ট অনুরোধ করলেন। অবশ্য কাজ হল শুধু অর্জুন আর কৃষ্ণের জোরালো বক্তব্যে। যুধিষ্ঠির রাজা হলেন শেষ পর্যন্ত।

মানুষ যখন কষ্ট করে, ঈপ্সিত বস্তু পাবার জন্য জীবনভর সংগ্রাম করে, তখন তার মন একরকম থাকে। কিন্তু দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ সংগ্রামের পর যদি বিজয় লাভ করা যায়, তবে একটা নির্বিণ্ণ-ভাব মনের মধ্যে আসে, যুধিষ্ঠিরেরও তাই এসেছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মানসিক গঠন এবং ভীমের মানসিক গঠন এক নয়।

দ্রৌপদী একসময় বলেছিলেন—ভীম কখনও অপরাধ ক্ষমা করেন না। অপরাধী যদি নিহত হয়, তবে তার পুত্র-পৌত্র পর্যন্ত তাঁর ক্রোধের অনুভূতি জাগ্রত থাকে। যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করার পর ভীম যথেষ্ট সুখেই ছিলেন। রাজার ঘরের খাবার-দাবার আর অনুপম ভোগ-বিলাস যখন ভীমকে বড় তৃপ্তি দিয়ে ফেলেছে, ভীম তখনও কিন্তু কৌরব পক্ষের সেই জীবিত বৃদ্ধটির ওপর তাঁর রাগ ভোলেননি। দুর্যোধনের পুত্র-পৌত্র সবই গতায়ু হওয়ার ফলে ভীমের সীমাহীন অক্ষমা এখানে ঊর্ধ্বগামী হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ওপর গিয়ে পড়েছে। যুধিষ্ঠির অথবা অর্জুন-নকুলেরা হত পুত্র এবং হৃত রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রকে পরম ক্ষমায়, আদরে এবং শ্রদ্ধায় নিজেদের অভিভাবকের মতোই সম্মান করতেন। এমনকী কুন্তী এবং দ্রৌপদী, যাঁরা নানাভাবে চরম লাঞ্ছনা লাভ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, তাঁরাও কিন্তু একান্তভাবে বধূর কর্তব্য পালন করে গেছেন ধৃতরাষ্ট্রের সেবায়। কিন্তু ভীম এখানে বিরল ব্যতিক্রম। অথচ কী আশ্চর্য, গান্ধারীর ব্যাপারে ভীমের কিন্তু কোনও অভিযোগই ছিল না এবং আমরা দেখেছি—নিজেকে হীন করেও তাঁকে তিনি কীভাবে খুশি করার চেষ্টা করেছেন।

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের রাজ্যশাসনকালে যত সুখে ছিলেন, তার চেয়ে বেশি সুখে ছিলেন যুধিষ্ঠিরের সময়। ভীম সর্বক্ষেত্রে দাদার কথা মেনে চলতেন বটে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাপারে মনে মনে তিনি সব সময় ক্ষুব্ধ থাকতেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় যুধিষ্ঠিরের কথাও মানতেন—অন্ববর্তত সংক্রুদ্ধো হৃদয়েন পরাঙ্মুখঃ। উলটো দিক দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রও এই ক্রোধের ব্যতিক্রম নন। দুর্যোধনের কথা মনে হলেই ভীমকে তাঁর নিজের চরম শত্রু বলে মনে হত। ফলত পরস্পরে একটা মানসিক শত্রুতা দু'জনেই নিয়ত বহন করতেন সমস্ত ভোগবিলাসের মধ্যেও।

ভীম ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বের অন্যায়গুলি ভুলতে পারেন না। তার ওপরে সবার সামনে লৌহ-ভীম চূর্ণ করে ধৃতরাষ্ট্র যে আক্রোশ দেখিয়েছেন ভীমের ওপর, সেখানে ভীমের মতো ব্যক্তি যে ধৃতরাষ্ট্রের চরণ চুম্বন করে তাঁকে মস্তকে স্থান দেবেন—এ আশা ভীমের কাছে না করাই ভাল। ভীম মহামতি যুধিষ্ঠিরের আড়ালে সব সময় তাই করতেন, যা ধৃতরাষ্ট্র পছন্দ করেন না—অপ্রকাশান্যপ্রিয়াণি চকারাস্য বৃকোদরঃ। তা ছাড়া তখন যেহেতু রাজযন্ত্র পাণ্ডবদের হাতেই, অতএব নিজের দলের লোক দিয়েও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাজ এবং আদেশের ব্যাঘাত করতেন। এর ফলে বুড়ো ধৃতরাষ্ট্র কখনও হয়তো বেড়াবার লাঠি খুঁজে পেতেন না, হয়তো কখনও তাম্বুল-বীটিকায় দুর্গন্ধ পেতেন, আবার হয়তো সুস্বাদু ফলের রস ভেবে নিম্ব-রসের মিশ্রণ সেবন করতেন। মোট কথা ভীম তাঁকে যুধিষ্ঠিরের আড়ালে সুস্থ থাকতে দিতেন না।

শুধু এটুকু হলেও হত। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র হয়তো গান্ধারীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে বসে পূর্বের সুখস্মৃতি চর্বণ করছেন। সেই সময় কোনও প্রাসাদ-স্তম্ভের আড়ালে বেশ দূরত্ব রেখেই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়াবেন ভীম। ওই দূর থেকে তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে এবং ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে শুনিয়েই তিনি হাতের গুলিতে ফাঁপা শব্দ করবেন আর বলবেন—দেখেছিস তো এই মুগুরের মতো হাত দুটো, এই হাত দিয়েই আমি অন্ধ রাজার ছেলেগুলোকে যমের বাড়ি পাঠিয়েছি—অন্ধস্য নৃপতেঃ পুত্র ময়া পরিঘবাহুনা। আরে আমার এই চন্দন-মাখা হাত দুটোকে পুজো কর তোরা, এই হাতেই আমি সাবাড় করেছি দুর্যোধনকে আর তার পরাণের বন্ধুদের।

ভীম এমনভাবেই কথাগুলি বলতেন, যাতে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী তাঁর কথা ভালভাবে শুনতে পান—সংশ্রবে ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্য্যাশ্চাপ্যমর্ষণঃ। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুবই আঘাত পেতেন এসব কথায়,

কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং তাঁর অন্যান্য ভাইরা এতটাই ধৃতরাষ্ট্রের কথা মেনে চলতেন যে, যুধিষ্ঠিরের কাছে ভীমের সম্বন্ধে অভিযোগ করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ঘুণাক্ষরেও এটা বোঝা সম্ভব হয়নি যে ভীম এই সব কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর আড়ালে। পনেরো বছর এই ভাবে গেছে, কিন্তু ক্রমাগত ভীমের কথাগুলি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রহারা হৃদয়ে এতই বেশি করে বাজছিল যে, তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হয়েই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন বলে ঠিক করলেন—রাজা নির্বেদমাপেদে ভীম-বাক্‌বাণপীড়িতঃ। যুধিষ্ঠির অবশ্য আপন ধর্মবুদ্ধির কারণে এই বানপ্রস্থ-ধর্মে খুব বেশি আপত্তি করেননি, এবং একবারের তরেও তিনি ধারণা করেননি যে, ধৃতরাষ্ট্রের এই নির্বেদের কারণ স্বয়ং ভীম।

বানপ্রস্থে যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পূর্বজ ভীষ্ম, বাহ্লীক এবং অন্যান্য মৃত আত্মীয়-স্বজনদের শ্রাদ্ধ-শান্তি করে কার্তিক পূর্ণিমার দিন কিছু দান-ধ্যান করতে চেয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত খুশি হয়ে—যত টাকা দরকার, আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন রাজকোষ থেকে—এই ধরনের উদারতা দেখিয়ে পুত্রহারা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মর্যাদার চূড়ান্ত করেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বানপ্রস্থে যাবার সংকল্পও ভীমের ক্রোধ বিন্দুমাত্র লঘু করেনি। ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রাদ্ধ করতে দিতেও তিনি রাজি ছিলেন না, দানধ্যান তো দূরের কথা। তিনি বলেছিলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ—এঁদের শ্রাদ্ধ-কার্য আমরাই করতে পারব—বয়ং ভীষ্মস্য দাস্যামঃ—কুন্তী কর্ণের শ্রাদ্ধ করতে পারবেন। ওঁর দরকার কী ? উনি যেন কারও শ্রাদ্ধ না করেন—শ্রাদ্ধানি পুরুষব্যাঘ্র মা প্রাদাৎ কৌরবো নৃপঃ।

আসলে ভীম আগাগোড়াই নিজের ভাইবন্ধু-মা-বউ নিয়ে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর উদারতা যা ছিল, তাও এই পাণ্ডবসংসারের গণ্ডিকে ঘিরে। এমনকী যেদিন থেকে কর্ণকে তিনি নিজের ঘরের লোক বলে জানতে পেরেছেন, সেদিন থেকে, তাঁর ওপরেও তাঁর রাগ চলে গেছে। নিজের ভাই, নিজের স্ত্রী এবং অবশ্যই মায়ের জন্য এমন কোনও কষ্ট নেই যা তিনি করতে পারেন না। কিন্তু কোনওভাবেই তাঁর শত্রুপক্ষের একটি লোকও কখনও আনন্দে থাকুক—এ তিনি মোটেই চাইতেন না—মা নো নন্দন্তু শত্রবঃ। সেই যেদিন যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্যোধনের প্রথম চক্রান্ত, বিষ খাওয়ানোর কথা ভীম প্রকাশ করেছিলেন, সেদিনও যুধিষ্ঠির তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—চুপ করো ভীম, এ সব কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। আবার আজ যখন ধৃতরাষ্ট্রের শ্রাদ্ধ-শান্তির কথা শুনে তিনি পূর্বানুভূত বনবাস-কষ্ট আর কৌরবদের তঞ্চকতার কথা তুললেন তখনও আবারও সেই যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁকে ধমক শুনতে হল—চুপ করো ভীম আর নয়—জোষমাস্বেতি ভর্ৎসয়ন্।

বস্তুত ভীম তাঁর মনের মধ্যে বৈরিতা চেপে রেখে মহান হতে পারেন না, মহান হতে চানও না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর শেষ বয়সে পাণ্ডবদের অনুগ্রহে বেঁচে আছেন—পূর্ব শত্রুর এই পর-নির্ভরতাই যেখানে যুধিষ্ঠির বা অর্জুনকে শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়েছে, ভীম কিন্তু শুধু এতেই সন্তুষ্ট নন। শত্রুর প্রতি কৃপা করার মহত্ত্ব থেকে, তারা কষ্ট পাচ্ছে—এই ক্ষুদ্র সুখেই ভীমের আনন্দ। আমরা ভীমের ব্যবহার সব সময় যে অনুমোদন করতে পারি, তা নয়, কিন্তু মা, ভাই এবং প্রিয়া পত্নীর জন্য তাঁর মতো কষ্টও কেউ করেননি। শত্রুতার বন্ধুর পথে হাঁটতে হাঁটতে যাঁরা এই বলবান ভাইটির কাঁধে উঠে পড়তেন মাঝে মাঝেই, শত্রুরা যাঁর অঙ্গ-ভঙ্গি নকল করে রসিকতা করে, বনবাসের শীত, গরম আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যিনি ভাইদের আর স্ত্রীকে পাহারা দিতেন, তিনি আর যাই চান, মহৎ হতে চান না। বরঞ্চ পরিবারের প্রত্যেকটি লোক সুখী হয়েছে, খুশি হয়েছে—এই ক্ষুদ্র সরল আনন্দটুকুই তাঁকে আনন্দিত করে। যুধিষ্ঠির অথবা অর্জুনের বিশাল ত্যাগ এবং বিশাল মহত্ত্বের পরিবর্তে ভীম যা চাইতে পারেন, তা হল—গোগ্রাস-যোগ্য ভাল কিছু খাবার, পদ্মপাতার পাত্রে কড়া ধাতের কৈরাতক মদ্য, দ্রৌপদীর সামান্য কটাক্ষ, একখানি লৌহময়ী গদা, আর শত্রুর মাথায় লাথি মারার একটা সুযোগ। বাস্! ভীম এইটুকুই, এইরকম কোনও পঞ্চভূতেই ভীমের দেহ-মনের গঠন এবং তুষ্টি।

অর্জুন

অর্জুনের কথা মনে হলেই আমার পুব-বাংলা থেকে আসা সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে। ছেলে জলপানি পেয়েছিল বলে তাকে তার মা-বাবা কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছিল। মনে আশা—এই ছেলে বড় হয়ে, বড় চাকরি করে সংসারের সাত-আটটা প্রাণীর অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করবে, বাড়ি করবে, স্থায়ী আবাস দেবে, আর বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেবে উদ্বৃত্ত কিছু পয়সা—যা ইচ্ছে করো। হ্যাঁ, বড় হওয়া, বড় চাকরি, পাকা বাসা—সব তার হয়েছে। কিন্তু সে এককালীন সব পারেনি, তারই মধ্যে কালচক্রে কারও প্রস্থান, সংসার-চক্রে কারও আগমন, এটা, ওটা, সেটা—শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কেউই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন না—না পিতাঠাকুর, না স্নেহময়ী জননী, না গৃহিণী, না ভাই-বোন। কোথায় যেন খোঁচ রয়েই গেল। অথচ মনের গহনে সবাই পরিষ্কার জানে—এই মানুষটি না থাকলে কবে কে কোথায় ভেসে যেত।

মহাপ্রস্থানের পথে যেদিন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অক্লান্ত নায়ক অর্জুন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল—সবার কথা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এই ইন্দ্রের মতো ভাই আমার অর্জুন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—এর কারণটা কী ? কই, কোনও অন্যায় তো তাকে কোনওদিন করতে দেখিনি, তা হলে হলটা কী ? যুধিষ্ঠির অম্লানবদনে উত্তর দিলেন—অর্জুন মরল দুটি কারণে। এক—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে যখন প্রশ্ন উঠেছিল—কে কতদিনে শত্রুদের বিনাশ করতে পারবে, তখন অর্জুন মেজাজে বলেছিল—আমি একদিনে সমস্ত শত্রু বিনাশ করতে পারি। কিন্তু এ-প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারেনি। অতএব এই মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দায় তার এক নম্বর অপরাধ। তার দ্বিতীয় অপরাধ—সে নিজেকে এত বড় ধনুর্ধারী মনে করত যে, অন্য কোনও ধনুর্বেদী পুরুষকে সে গণ্যই করত না। উচ্চাভিলাষী কোনও মানুষের এমনটি করা উচিত নয়, অতএব নিতান্ত আপন এই বীরত্বমুগ্ধতা—তার দ্বিতীয় অপরাধ।

হায় ! উচ্চাভিলাষীতার সংজ্ঞা সম্বন্ধে এমন একটা ব্যাখ্যা যাঁর কাছে শুনতে হল—তাঁর জীবনে উচ্চাভিলাষ বলে কিছু ছিল না। নিরন্তর অভ্যাস এবং অধ্যয়নে যে ধনুর্বিদ্যার চরম পুরস্কারটি অর্জুন মনে মনে পেয়েছিলেন তার সম্বন্ধে কটূক্তি শুনতে হল এমন একজনের কাছে, যাঁকে পরীক্ষার সময় গুরুদেব কান মুলে বার করে দিয়েছিলেন—তম্ উবাচ অপসর্পেতি। গালাগালি দিয়ে বলেছিলেন—তোমার দ্বারা আর যাই হোক, এই ধনুক-বাণের লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয়—নৈতচ্ছক্যং ত্বয়া বেদ্ধুং লক্ষ্যমিত্যেব কুৎসয়ন্। হায় ! যুধিষ্ঠির এমন সময়ই কথাগুলি বললেন—যখন অর্জুন বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে কী হত তা কিন্তু বলা যায় না। অথবা যুধিষ্ঠিরকে দোষ দিয়ে লাভ কী ? যে যার নিজের মতো দেখে। নীতিশাস্ত্র বলে—বিদ্যালাভ বা টাকা-পয়সা উপায় করা যার কাছে প্রধান সে যেন নিজেকে অজর-অমর ভেবে নেয়। কেননা বিদ্যা কিংবা অর্থের জন্য প্রধান প্রয়োজন অনলস উদ্যোগ। আর যার কাছে ধর্মাচরণই প্রধান, তার ভাবা উচিত—আমার সময় আর নেই,

জীবনটা পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু ; ধর্ম-আচরণ কালকের জন্য ফেলে রাখলে আর হয় কি না হয়, অতএব এখনই সবচেয়ে ভাল সময়। আমাদের মতে—বিদ্যা এবং অর্থের ব্যাপারে অর্জুন আর ধর্মের ব্যাপারে যুধিষ্ঠির আমাদের নীতিশাস্ত্রীয় উদাহরণ।

আপনারা বলবেন—তোমার নীতিশাস্ত্রীয় উপমার প্রয়োজনটা কী ছিল এখানে? আমি বলব—প্রয়োজন অল্পই। তা হল—একজন আরেকজনের মনের কথা বোঝে না। যে মানুষ ছোটবেলা থেকে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রবিদ্যায় অবহেলা করে জটাধারীর মোক্ষবিদ্যায় মন দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে ধনুর্ধরীর অন্তরবেদনা বোঝা কতটা সম্ভব। বেদনা এতটাই যে, অর্জুন তো শুধু 'অ্যাপ্রিসিয়েশন' চেয়েছিলেন, নইলে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতই নিষ্কাম যে, তাঁর পক্ষে বড়ভাইকে টপকে রাজা হওয়াও সম্ভব ছিল না অথবা সে ইচ্ছেও ছিল না। অথচ দেখুন—তাঁর কাছে চাওয়া হয়েছে কতটা? অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের দক্ষিণা দিতে হবে—শেষ ভরসা অর্জুন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ করতে হবে—এগিয়ে আসবেন অর্জুন। বিরাটরাজার রাজ্য আক্রান্ত—অর্জুনকে দৌড়তে হবে। ভীষ্ম-কর্ণের মতো মহা মহা যোদ্ধা নিপাত করতে হবে—অর্জুন সামনে যাও। এ তো গেল বড় বড় জায়গা, সম্পূর্ণ মহাভারতের এই বিরাট এবং গভীর অরণ্যে যদি কোনও বামুনের একটা গরুও হারায় তো সেটা খুঁজে বার করতে হবে অর্জুনকেই।

এতটা যাঁর কাছে চাওয়া হয় এবং এতটাতেই যিনি সফল—তিনি কিন্তু মহাভারতের নায়ক নন। পুনশ্চ, এত বড় সফল মানুষ যদি যুদ্ধোন্মাদনার চরম মুহূর্তে অথবা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ-বিস্ফোরণের প্রান্তিক মুহূর্তে একবার বুক বাজিয়ে বলেন—এই কুরুসৈন্য নিকেশ করতে আমার একদিনের বেশি সময় লাগবে না—তাহলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে! দ্বিতীয়ত, তাঁর সমসাময়িক ধনুর্ধরীদের যে অর্জুন একটুও গণ্য করতেন না—এটা তো অহঙ্কার নয়, বারংবার বিজয়ের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ একটি আত্মবিশ্বাসমাত্র। আর যদি প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞায়, বারবার তাদের যুদ্ধে হারিয়ে এমন একটা ধারণা তাঁর মনের মধ্যে বাসা বাঁধে যে, আমিই শ্রেষ্ঠ, আমার সঙ্গে কে লড়বে—তাহলে বলব সেটা তো ঘটনা। অর্জুনের সময়ে অর্জুনের মতো কে ছিলেন? এ অহঙ্কারও কিন্তু আমাদের মতো পোকা-বাছা লোকের নজরে পড়েনি, পড়েছে যুধিষ্ঠিরের চোখে। কেন বলুন তো? ধরিত্রীর মতো সর্বংসহ যাঁর হৃদয়, শত্রুরও পর্যন্ত দোষ যিনি দেখতে পান না, স্বয়ং শত্রুপক্ষ পর্যন্ত যাঁকে 'অজাতশত্রু' উপাধি দিয়েছে—সেই যুধিষ্ঠির কিন্তু অর্জুনের এই মৃত্যুকালেও তাঁর একটিমাত্র অপমানবাক্য ভুলতে পারেননি। অথচ সেদিনটা ছিল অর্জুনের কাছে অন্তহীন চাওয়ার এক অতি প্রকট প্রকাশ। ফল যা হয়—সংসারের অফুরান চাহিদার জোগান দিতে দিতে সেই পুব বাংলার ছেলেটি যেমন একদিন সামান্য কারণেই রাগে ফেটে পড়ল, অর্জুনও ঠিক তাই করলেন। কিন্তু অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে একটুখানি না পেলে সে দোষটুকুই যেমন সংসার মনে রেখে দেয়, যুধিষ্ঠিরও তাই অর্জুনের অনিচ্ছাকৃত অপমানটুকুই মনে রেখে দিলেন শেষের দিনটি পর্যন্ত, তার অন্য হাজার পাওয়াগুলি মনে রাখলেন না।

না, ঘটনাটি আমি এখনই উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা যেভাবে হল, তাতে ভয় আছে—শেষে শুধু চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বেই অর্জুনের জীবন সূচিত না হয়। সমস্ত মহাভারত জুড়ে অর্জুন যেমন সর্বব্যাপী যেমন সর্বতোগামী কার্যসাধক, তাতে তাঁর সুখ-দুঃখ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, পাওয়া-না-পাওয়া এবং সর্বোপরি তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বগুলি যদি একটু আধটু তুলে না ধরতে পারি, তাহলে অর্জুন সম্বন্ধে কিছু লেখাটাই আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবু এরই মধ্যে তাঁর কাছে পাণ্ডব-সংসারের প্রত্যাশার হিসেবটিও আমরা রাখব, কারণ সেই সুরেই আমাদের কথারম্ভ হয়েছে।

এ-কথাটা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, মহাভারতে অর্জুনই হচ্ছেন একমাত্র সুষম চরিত্র, যাঁর মধ্যে কোনও কিছুরই বাড়াবাড়ি নেই, আবার কোনও কিছুরই কমতি নেই। জানি না—মহামতি ব্যাস তাঁকে এই কারণেই পাঁচ পাণ্ডবভাইদের মাঝখানে রেখেছেন কিনা। অর্থাৎ এদিকে যুধিষ্ঠির-ভীমের

মতো বিরাট চরিত্র, আবার ওদিকে নকুল-সহদেবের মতো নমনীয় চরিত্র—এই দুয়ের মাঝখানে ঠিক মানদণ্ডের কাঁটাটির মতো দাঁড়িয়ে আছেন অর্জুন। যা কিছুই তাঁকে করতে হয়েছে সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে করতে হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—সমস্ত কিছুই তাঁর জীবনে একান্ত সুষমতায় চিহ্নিত। কোনও কিছুর মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই, আবার খামতিও নেই।

অর্জুন যখন জন্মালেন, তখন বিশাল বা অসামান্য কিছু ঘটেনি। অর্থাৎ জন্মলগ্নেই অলৌকিক কোনও ক্রিয়াকলাপ তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেনি, যেমন করেছিল তাঁরই অগ্রজ ভীমকে। জন্মের অব্যবহিত পরেই ভীম মায়ের হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন একটি পাথরের ওপর। তাতে শিশু ভীমের হাড়-গোড় ভাঙা দূরে থাক, সেই পাথরটাই নাকি ভেঙে গিয়েছিল। জন্ম-সময়েই এমন কোনও চমৎকারিতা দেখানো অর্জুনের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবে একটা জিনিস তাঁর ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তাঁর জন্মের আগে পিতা পাণ্ডু উপযুক্ত পুত্রের জন্য তপস্যা করেছিলেন, যা তিনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্যও করেননি, বায়ুপুত্র ভীমের জন্যও করেননি। প্রাচীনদের মতে জনক-জননীর হৃদয়-বিকার মাত্রেই যে পুত্রের জন্ম হয়, সেই কামজ পুত্রের মধ্যেও কোনও বিকার থাকবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করতেন। সুস্থ, স্বাভাবিক, বলবান পুত্রের জন্য তাই জনক-জননীর তপস্যা বা সাধনা বিহিত ছিল। অর্জুন কিন্তু পিতা পাণ্ডুর সাধনার ধন। বস্তুত যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্ম পর্যন্ত পাণ্ডুর পুত্রলাভের চমকটাই ঘোচেনি। তাঁর নিজের সন্তান উৎপাদন করার শক্তি ছিল না। কাজেই কুন্তীর কাছে যখন তিনি শুনলেন যে, কুন্তী পুত্রলাভের ব্যাপারে দুর্বাসার বরলাভ করেছেন, অপিচ নির্দিষ্ট দেবতাকে আহ্বান করে তখনই গর্ভধারণ করতে পারেন, পাণ্ডু তখনই কুন্তীকে বললেন—আজকেই তুমি সেই ববপুত্র লাভের চেষ্টা করো—অদ্যৈব ত্বং বরারোহে প্রযতস্ব যথাবিধি। তোমার মন্ত্রবলে আজই আহ্বান কর ধর্মকে, কারণ ধর্মই তো আমাদের জীবনে সব।

আমাদের ধারণা—এইভাবে কুন্তীর পুত্রলাভের ব্যাপারে তখনও পাণ্ডুর মনে শঙ্কা ছিল। অথবা রাজা হিসাবে তখনও যে তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী নেই—এই ভাবনাও পাণ্ডুকে পীড়িত করছিল। ফলে কুন্তীর কাছে পুত্রলাভের উপায় শোনামাত্র তিনি আর দেরি করতে চাননি। বৎসরান্তে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে লাভ করলেন এবং চমৎকৃত পাণ্ডু বলোদ্ধত পুত্রের জন্য দ্বিতীয়বার বায়ুকে আহ্বান করতে বললেন। ভীম জন্মালেন। এইবার বুঝি পাণ্ডু আশ্বস্ত হলেন। বংশরক্ষার চিন্তা নেই, সিংহাসনের অধিকার নিয়ে চিন্তা নেই, এমনকী সিংহাসন রক্ষার ব্যাপারেও চিন্তা যেন অনেকটা কমল। দুর্বাসার আশীর্বাদের প্রাথমিক চমক ভাঙার পর এই প্রথম পাণ্ডুর মনে হল—মানুষের শ্রেষ্ঠতা আসে দৈব এবং পুরুষকার একসঙ্গে যুক্ত হলে। আমার সেইরকম একটি শ্রেষ্ঠ পুত্র চাই এবং এ পুত্র চাইতে হবে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। মনে মনে অমিত শক্তিধর এক পুত্রের কামনায় তিনি কুন্তীকে তপস্যায় মন দিতে বললেন। তিনি নিজেও বসে গেলেন উগ্র তপস্যায়। আরাধনা করতে লাগলেন দেবরাজ ইন্দ্রের। উপযুক্ত পুত্রলাভের সাধনার পর অর্জুনের জন্ম। ইচ্ছা হয়ে যে এতকাল জনক-জননীর হৃদয়ের মধ্যে ছিল, সে এবার অর্জুনের রূপ নিয়ে জন্মাল। দেবতারা আশীর্বাদ করলেন—শিবের মতো শক্তি হবে এই ছেলের, যুদ্ধে ইন্দ্রের মতো অজেয় হবে, কুরুরাজার ঘরের লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনবে এই অর্জুন—কুরুলক্ষ্মীং বহিষ্যতি।

কিন্তু অর্জুনের এত কিছু গুণের পরিচয় তখন পাওয়া যায়নি। জন্মলগ্নেই ভীমের মতো তিনি পাথর গুঁড়ো করে দেননি, অন্যদিকে পাঁচ রাজপুত্রের মধ্যে তিনিই হলেন সবচেয়ে কালো। এইজন্যই কি তাঁকে অদ্ভুতদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন কবি। যাই হোক, পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ ভাইয়ের ঠিক মাঝখানটিতে যে ছেলেটি মুখ শুকনো করে ঋষিদের হাত ধরে এসে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দাঁড়িয়েছিল, সে দিনও তাঁর কোনও বিশেষত্ব ছিল না। ঋষিরা পরিচয়ের সময় যুধিষ্ঠিরের কথা বলেছিলেন—ইনি ধর্মের ঔরসে জাত, ভীমের কথা বলেছিলেন—ইনি বায়ুর ঔরসে জাত। কিন্তু পাঁচ ভাই পাণ্ডবের মধ্যে অন্যরকম কালো ছেলেটিকে দেখিয়ে তাঁরা বলেছিলেন—এ হল অর্জুন, কুন্তীর গর্ভে দেবরাজ ইন্দ্রের তেজে এর জন্ম। সমস্ত বড় মানুষের কীর্তি-যশ এই ছেলে ম্লান করে দেবে—যস্য কীর্তি র্মহেষ্বাসান্ সর্বান্ অভিভবিষ্যতি।

ঋষিরা বলেছিলেন, কারণ, এই পুত্রলাভের জন্য তাঁরা পিতা পাণ্ডুর সাধনাটুকু জানতেন। জানতেন, যেহেতু বীরপুত্র লাভের জন্য পাণ্ডু তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন—মন্ত্রয়িত্বা মহর্ষিভিঃ। কিন্তু তাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কী ? ঋষিরা বললেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনলেন—এই পর্যন্ত। বিশেষত ঋষিরা পাণ্ডুর প্রত্যেকটি ছেলে সম্বন্ধেই ভাল কথা বলেছেন। তার মধ্যে থেকে অর্জুনকে বিশেষ করে আমল দেবার মতো কিছু হয়নি ধৃতরাষ্ট্রের। তাঁকে নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তাও ছিল না। বরঞ্চ মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন, যাঁর বাল্যক্রীড়ার শক্তিতে এবং বাহুল্যে কৌরবেরা প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা ছিল বেশি। অর্জুনকে তখন কে চেনে ? এরই মধ্যে ভীমকে বিষ খাওয়ানো নিয়ে কত হই হই হয়ে গেল, তবু অর্জুনকে কেউ রা কাড়তে দেখল না। অর্জুনের প্রথম কথাটি কবে শোনা গেল জানেন ? কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সমস্ত কুরু-রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য সঁপে দিলেন যুদ্ধবিদ দ্রোণাচার্যের কাছে। দ্রোণাচার্য তাঁদের সবাইকে শিষ্যত্বে স্বীকার করে নিয়ে বললেন—বাছারা ! আমার একটা গুরুতর কাজ আছে, যা আপাতত আমার মনেই রইল। কিন্তু তোমরা যখন সবাই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়ে যাবে, সেদিন তোমরা আমাকে সেই কাজটি করে দেবে। কুরু-কুমারেরা আচার্যের কথা শুনে সবাই মাথা নিচু করে চুপটি করে রইল। একমাত্র অর্জুন, যে কখনও কোনও কথা বলে না, সেই অর্জুন গুরুর কথা শুনে বললেন—আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই করে দেব, গুরুদেব ! একশো পাঁচজন বালকের মধ্যে সেই মুহূর্তে একজন হয়ে গেলেন অর্জুন। অস্ত্রশিক্ষার আগেই নিজের ওপর এই আস্থাটুকু গুরুরা চান, আর সেই আস্থাতেই অর্জুন বলেছিলেন—আমি করে দেব। শতাধিক পঞ্চ মৌনমূক বালকের মধ্যে মাত্র একজনের মুখে নিজের আশাপূর্তির সম্ভাবনা দেখে আচার্য দ্রোণ সেদিন আনন্দে অর্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করলেন, অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেললেন—প্রীতিপূর্বং পরিষ্বজ্য প্ররুরোদ মুদা তদা।

ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর উপন্যাসে নায়কের চরিত্র আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়ে নায়কের স্বভাব অনুযায়ী ঘটনার বিস্তার করেন, অর্জুনের ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসেবে মহাভারতের কবিও তাই করেছেন। অর্জুন যদি ইতিহাসের সত্য-চরিত্রও হন, অথবা কবির কল্পনা—তা হলেও এমন হতে পারে না যে, এই আচার্য দ্রোণের সামনে কথা বলার আগে অর্জুন কোনওদিন কথা বলেননি। দাদা, ভাই, মায়ের সঙ্গে কারণে অকারণে নিশ্চয়ই তিনি কথা বলেছেন, কিন্তু মহাভারতের কবি সে সব কথা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করেছেন। ভীমকে বিষ খাওয়ানোর প্রসঙ্গে ভীমের শক্তি, সাহস এবং খামখেয়ালিপনার সঙ্গে দুর্যোধনের কথা, যুধিষ্ঠিরের কথা এসেছে, কিন্তু অর্জুন সেখানে একটি কথাও বলছেন না। মহাভারতের কবি যেখানে প্রথম অর্জুনকে দিয়ে কথা বলালেন, তখন অন্য সবাই মৌনমূক, নিরুত্তর। অর্জুন সেখানে একা উত্তর দিচ্ছেন, একশো পাঁচজনের মধ্যে একা উত্তর দিচ্ছেন। সে উত্তরও কী রকম ? অন্য সবাইকে অপ্রতিভ করে মহাবীরের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে, নিজের গুরু পর্যন্ত যা পারেননি, সেই কাজ করার আশ্বাসে উত্তর দিচ্ছেন। এই যে মর্যাদা, এই যে heroic isolation, এই যে স্বাতন্ত্র্য—এটা মহাভারতের কবি অন্য কোনওভাবে দেখাতে চাননি, দেখাতে চেয়েছেন অস্ত্র-শিক্ষার আসরে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি বালকের দৃঢ় প্রত্যাশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে—আপনি যা চান, তাই আমি করব—অর্জুনস্তু ততঃ সর্বং প্রতিজজ্ঞে পরন্তপ। মহাভারতের কবি যাঁকে প্রথম কথা বলিয়েছেন প্রতিজ্ঞার ছলে সে তখনও অস্ত্রবিদ্যায় কৌতূহলী বালকমাত্র। কিন্তু গুরুর সামনে তাঁর প্রথম কথা এবং প্রতিজ্ঞার মধ্যে শুধুমাত্র গুরুভক্তিই ছিল না, ছিল—পিতার মৃত্যুর পর ঋষিদের হাত ধরে এসে কুরুসভায় পরিচয়-প্রমাণ করা ভিখারী বালকের হাহাকার, ছিল নিজের মাথার ওপর পদে পদে কৌরব-ভাইদের আপন উচ্চতা ঘোষণার যন্ত্রণা, ছিল—নিজের বড়দাদা যুধিষ্ঠির এবং জননী কুন্তীর সসংকোচ ব্যবহার—যে ব্যবহারে ভীমকে বিষ খাওয়ানো হলেও কুন্তী সে-কথা রাজ্যের পরিচালক ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে পারেননি, যে ব্যবহারে যুধিষ্ঠির ভীমের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—চুপ করো ভীম, কাউকে এসব কথা বোলো না, এরা যে এ-সব কাজ করেছে, কাউকে যেন বোলো না—তুষ্ণী ভব ন তে জল্প্যম্ ইদং কার্যং কথঞ্চন।

মহাভারতের কবি এই সব কঠিন সময়ে অর্জুনকে দাঁতে দাঁত চাপিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছেন, তাঁর দুই হাতের মুষ্টি অপমানে দৃঢ়তর করেছেন, কিন্তু যেদিন দ্রোণাচার্য অস্ত্র-শিক্ষা করাতে এলেন, সেদিন থেকে দৃঢ়তর দন্তপংক্তি থেকে বেরিয়ে এল একটি বাক্য—আপনি যা বলবেন, আমি সব করব। আর সেই দৃঢ়তর দুই বাহু-মুষ্টিতে আবদ্ধ হল একটি তীর এবং ধনুক। ভাবটা এই—আপনি যা বলেন, সব করব ঠিকই, কিন্তু তার বদলে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্যা আমার চাই। আমি একা যেহেতু আপনার প্রত্যাশাপূরণ করব বলেছি, অতএব ওই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশিক্ষাও আমারই চাই, আমার, শুধু আমার একার। বাস, দ্রোণাচার্য রাজপুত্রদের সবার হাতে শিক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র দিলেন, কিন্তু সবার মধ্যেও নিজের আকাঙ্ক্ষিত কাজটির মতো তাঁর মনে আঁকা থাকল সেই কৃষ্ণবর্ণ দৃঢ়মুষ্টি বালকটি—যে বলেছিল—আপনি যা চান, আমি সব করব।

২

হই হই করে দ্রোণাচার্যের ইস্কুল আরম্ভ হয়ে গেল। চারদিকে বেশ রটেও গেল কথাটা—দ্রোণাচার্য ইস্কুল খুলেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে লাগল। মহামতি কৃষ্ণ যে বংশের মানুষ, সেই বৃষ্ণি-অন্ধক কুলেরও অনেক ছেলে এসে জুটল অস্ত্রশিক্ষার আশায়। কিন্তু বহিরাগত ছাত্র না হলেও অস্ত্রশিক্ষার আসরে আরও একটি ছেলেকে দেখা গেল, শিক্ষার উদ্দেশ্য তার কতটা ছিল জানি না, কিন্তু সে এল শুধু অর্জুনের সঙ্গে টক্কর দিতে। এই ছেলেটি কর্ণ। ক্লাসে প্রথম হওয়া ছাত্রটির সঙ্গে সামান্য নম্বরের জন্য দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতার মনোভাবে কিন্তু কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে আসেননি। তিনি এসেছেন অর্জুনের প্রতি অদ্ভুত এক ঘৃণা নিয়ে। অথচ তাঁর দিক থেকে এই ঘৃণার কোনও কারণ নেই। দুই ছাত্রের প্রতিযোগিতায় অন্তরে অন্তরে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকে, সে শ্রদ্ধা তো তাঁর নেই-ই, আছে শুধুই রাগ। এই রাগ আর ঘৃণা তাঁর তৈরি হয়েছে দুর্যোধনের সঙ্গে পড়ে। কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার জন্য এবং দুর্যোধনও তাঁকে কাজে লাগাচ্ছেন নিজের প্রয়োজনে। ভবিষ্যতে এই দুই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব যতই দৃঢ় হোক, দুর্যোধন প্রথম থেকেই কিন্তু কর্ণকে এটা সম্পূর্ণ বোঝাতে পেরেছিলেন যে, পাণ্ডবরা অতি ঘৃণ্য জীব এবং কিছুতেই তাদের বাড়তে দেওয়া যাবে না। মনে রাখবেন—এরই মধ্যে দুর্যোধনের দিক থেকে ভীমকে বিষ খাওয়ানোর অকাজটি হয়ে গেছে এবং ভীম বেঁচে ফিরেছেন। তারপর যখন ওই অস্ত্রশিক্ষার আসরে প্রথম দিনেই অর্জুন গুরুর আকাঙ্ক্ষিত কাজটি করে দেবেন বলে কথা দিলেন, আর আচার্য দ্রোণও তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন কর্ণের ঈর্ষা হল সবচেয়ে বেশি ; কারণ তাঁর ধারণা ছিল—অবশ্য অন্যের তুলনায় অস্ত্রবিদ্যায় নিজের 'ন্যাক' বেশি দেখেই তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে, ধনুক-বাণের আসরে তাঁর ওপর দিয়ে কেউ যেতে পারবে না। কিন্তু আজকে যখন দ্রোণাচার্যের মতো অস্ত্রগুরু অর্জুনের ওপর প্রথমেই প্রীত হয়ে পড়লেন, তখন থেকেই কর্ণ অর্জুনকেই তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে আরম্ভ করলেন। এর সঙ্গে জুড়ে গেল দুর্যোধনের পরম্পরায় আসা হিংসা। ফলে অস্ত্রশিক্ষার জন্য তিনিও বেছে নিলেন দ্রোণকেই। অর্জুন বুঝতেও পারলেন না যে, তাঁরই এক সতীর্থ তাঁকে বেছে নিল জীবনের প্রথম এবং শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।

যাই হোক দ্রোণাচার্যের ইস্কুল আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই শিখছে—কেউ ধনুকের কেরামতি শিখছে, কেউ গদা শিখছে, কেউ বা খড়্গের কেরামতি শিখছে। কিন্তু একদিন দেখা গেল অর্জুনই সবার থেকে আলাদা। তার কারণ অবশ্য কিছু অলৌকিক নয়। মহাভারতকার অর্জুনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—যে কোনও ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ হতে গেলে আপন ক্ষমতার সঙ্গে যোগ করতে হয় অভ্যাসকে। অভ্যাসের সঙ্গে চাই উৎসাহ এবং বারংবার, দিনের পর দিন অভ্যাস করতে করতে যদি উৎসাহেও কখনও ভাঁটা পড়ে, তবে শেষ জিনিস যেটা দরকার, সেটা হল, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ—যা একজনকে আবারও অভ্যাসে নিযুক্ত করে। অর্জুনের এই শিক্ষা এবং অনুরাগের ফলে

দ্রোণশিষ্যেরা সবাই এক অস্ত্রবিদ্যা শিখেও অর্জুনের থেকে ছোট হয়ে রইলেন। দ্রোণও বুঝতে পারলেন—অর্জুনই সবার সেরা এবং উপযুক্ত শিক্ষক যেমন যোগ্য ছাত্রকে বিশেষ নজর দিয়ে পড়ান, দ্রোণও অর্জুনের ব্যাপারে সেই সব ব্যবস্থা নিলেন, যাতে অর্জুন আরও পোক্ত হয়ে ওঠেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—অর্জুন যেদিন থেকে দ্রোণাচার্যের কাছে নাড়া বাঁধালেন, সেদিন থেকেই শিষ্য হিসেবে অর্জুনের নজর ছিল—তাঁর থেকে কেউ বেশি এগিয়ে যাচ্ছে কিনা। একটা ঘটনা এখানে বলা দরকার। দ্রোণের নিজের ছেলে অশ্বত্থামাও দ্রোণের কাছেই অস্ত্রশিক্ষা করতেন। কিন্তু অর্জুনের নিরন্তর অভ্যাসের জ্বালায় তাঁকে আলাদা করে কিছু শেখানোর উপায় ছিল না। কিন্তু স্নেহ যেহেতু বিষম বস্তু, তাই অন্য শিষ্যদের মধ্যে আপন পুত্রের বিষমতা রাখার জন্যই দ্রোণ শেষ পর্যন্ত কায়দা বার করলেন। বস্তুত সেকালের শিষ্যদের সবাইকে অল্পবিস্তর গুরুসেবা করতে হত। দ্রোণ অর্জুন সহ সমস্ত শিষ্যদেরই বলতেন—যাও জল ভরে নিয়ে এসো। কিন্তু জল ভরে আনার জন্য তিনি প্রত্যেক শিষ্যকে বড় বড় কমণ্ডলু দিয়ে দিতেন, যেগুলির মুখ ছোট। কমণ্ডলুতে গুব গুব করে জল ভরতে অনেক সময় চলে যেত। কিন্তু দ্রোণ অশ্বত্থামাকে দিতেন একটি বিরাট ছড়ানো মুখের কলসি। জলাধারে গিয়ে অশ্বত্থামা ঘপাৎ করে কলসী ডুবিয়ে জল নিয়ে আসতেন এবং তখন অন্যদের কমণ্ডলুতে কিন্তু গুব গুব করে জল উঠছে। অশ্বত্থামা দ্রোণের কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসতেন, এই সময়ে দ্রোণ তাঁকে অস্ত্রবিদ্যার বিশেষ কিছু কায়দা শিখিয়ে দিতেন।

ক'দিনের মধ্যেই অর্জুন ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। অর্জুন কিচ্ছুটি বললেন না, কিন্তু নিজের কমণ্ডলুটি অস্ত্রের সাহায্যে পূরণ করে অশ্বত্থামার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণের কাছে ফিরতে লাগলেন। ফলে অশ্বত্থামার 'স্পেশাল লেসন' অর্জুনকেও শেখাতে হল একই সঙ্গে—বলা বাহুল্য, অন্য শিষ্যেরা তখন সবাই মিলে কমণ্ডলুতে গুব গুবির খেলা খেলছে। আসলে ছাত্র-শিষ্য যদি শিক্ষার ব্যাপারে এতটাই উৎসাহী, এতটাই সতর্ক হয়, তাহলে গুরু তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে দিতে বাধ্য। এমন ছাত্রের ওপর সর্বকালের গুরুদের মমতা পুত্রাধিক। অশ্বত্থামার পক্ষে তাই অন্য কিছুই জানা সম্ভব হল না, যা অর্জুনের অজ্ঞাত। শুধু তাই নয়, অস্ত্রশিক্ষার ব্যাপারে অর্জুনের যত্ন এবং উদ্যোগ সবাইকে এমনভাবে ছাপিয়ে গেল যে, দ্রোণ তাঁকে আরও ভালবাসতে বাধ্য হলেন। মহাভারতের কবি স্বয়ং মন্তব্য করে বলেছিলেন—অর্জুন এতটাই মেধাবী যে, আচার্য-পুত্র অশ্বত্থামার থেকে কোনও অংশে কম রইলেন না—ন ব্যহীয়ত মেধাবী পার্থোঽস্ত্রবিদুষাং বরঃ। কিন্তু এবার যে অর্জুন সবাইকে ছাড়িয়ে স্বীয় সাধনার চরম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন—সে-কথা আর মন্তব্য করে বললেন না, গল্প করে বললেন। অর্জুনকে নিরন্তর ধনুক-বাণের লক্ষ্যাভ্যাস করতে দেখে—তং দৃষ্ট্বা নিত্যমুদ্‌যুক্তমিষ্বস্ত্রং প্রতি ফাল্গুনম্—দ্রোণাচার্য একদিন নির্জনে রান্নার ঠাকুরটিকে ডেকে বললেন—দেখো বাপু! অর্জুনকে যেন কখনও অন্ধকারের মধ্যে খেতে দিয়ো না, আর আমি যে তোমাকে এই কথাটি বললাম—সেটাও অর্জুনকে বোলো না।

ব্যাপার হল—ধনুকবাণের সব কৌশল শেখার পর শেষ শিক্ষা হল—চোখে দেখে নয়, শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করা। অর্জুনের এখন সেটাই শুধু বাকি। যে বিদ্যায় ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথ, রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ পারদর্শী ছিলেন, অর্জুনের এখন সেইটা শুধু শিখতে বাকি। এরই মধ্যে দ্রোণ পাচককে বললেন—অন্ধকারে অর্জুনকে খেতে দিয়ো না এবং এ-কথা যে আমি বলেছি—সেটাও তাঁকে বোলো না। টীকাকার নীলকণ্ঠ দ্রোণাচার্যের এই উপদেশটি বড় সরলভাবে নিয়েছেন এবং এই উপদেশের মর্মকথা যা প্রকাশ করেছেন, তাতে কিছুরই উপপত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায় ঠিক ধরেছেন। আসলে যে বস্তুতে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে চায়, তার সাধন সম্বন্ধে সে সব সময়ই চিন্তা ভাবনা করে। ধনুক-বাণ যেহেতু অর্জুনের ধ্যান-জ্ঞান, অতএব তিনি সব-সময়েই চিন্তা করছেন—কী করে লক্ষ্য ভেদের কৌশলে আরও উৎকর্ষ আনা যায়। এখন কোনওক্রমে যদি রান্নার ঠাকুরটি অন্ধকারে অর্জুনকে খেতে দেয়, তাহলে অন্ধকারে খেতে খেতেই ধনুক-ধ্যানী অর্জুনের ধারণা হবে—আরে! এই অন্ধকারেও তো চিরন্তন অভ্যাসে মুখের গ্রাস ঠিক মুখেই গিয়ে পড়ছে, অন্য কোথাও তো হাত সরে যাচ্ছে না, তাহলে উপযুক্ত অভ্যাসে বাণও ছাড়া যাবে অন্ধকারে এবং

শব্দমাত্রেই সে বাণ লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারবে। এখন এই সম্পূর্ণ ভাবনাটাই যাতে অর্জুনের মনে না আসে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'অকার' না করে—সেজন্যই দ্রোণাচার্য পাচককে বলেছিলেন—অন্ধকারে অর্জুনকে খাবার না দিতে।

কিন্তু কেন এই গোপনীয়তা ? সিদ্ধান্তবাগীশ জানিয়েছেন—গোপনীয়তা এই জন্য যে, ওই একটা জিনিসই বাকি ছিল—যেটা দ্রোণ ভেবেছিলেন নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে শেখাবেন। কমণ্ডলু আর কলসির পরীক্ষা মাঠে মারা গেছে ; এবং অর্জুনের ইনটুইশনে'র ওপর দ্রোণের আস্থা এত বেশি যে, তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন—একটা বিপর্যয় হলেই অর্জুন নিজেই না এর কৌশল উদ্ভাবন করে ফেলে। তাই তিনি পাচককে সাবধান করেছেন, যাতে ওই এক শব্দভেদী অস্ত্রশিক্ষার ব্যাপারে অন্তত নিজপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুনকে ছাড়িয়ে যায়। এই গোপনীয়তার অর্থ আমরা বুঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয় গোপনীয়তা ! অর্থাৎ অর্জুন যদি কোনও ভাবে শব্দভেদের উপায় আবিষ্কার করেও ফেলেন আর অবোধ পাচক তখন যদি বলে—তাই তো বলি মহামান্যি দ্রোণাচাজ্জি আমাকে আগেই বলেছিলেন—অন্ধকারে আপনাকে খাবার না দিতে। তা হলে গুরু হিসাবে দ্রোণাচার্যের মানসম্মান আর কিছু থাকবে না। অতএব ওই দ্বিতীয় গোপনীয়তা—আমি যে বলেছি—সেটা বোলো না। বেশ বোঝা যায়—আপন পুত্রের কারণে দ্রোণের এই স্বার্থ সন্ধানের মধ্যেও তাঁর পাপবোধ কাজ করছিল, দ্রোণের দ্বিতীয় গোপনীয়তা সেই কারণেই।

কিন্তু বিপর্যয় যা ঘটার তা ঘটেই গেল ; অবশ্য বিপর্যয়টা দ্রোণের কাছে, অর্জুনের কাছে এটা নিমিত্তমাত্র। নব নব উন্মেষশালিতার মধ্যেই প্রতিভার বীজ থাকে এবং সেই উন্মেষশালিতার জন্য সাধারণ নিমিত্তই যথেষ্ট। এবার সেই নিমিত্তটা জানাই। সারা দিনের অস্ত্রশিক্ষার পর সবাই তখন 'ক্যাম্পে' ফিরে এসেছে। সাঁঝের প্রদীপ দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ। এবার শ্রান্ত ক্লান্ত শিক্ষার্থীদের খাবার দেওয়া হবে। ঠাকুর যখন সবাইকে খাবার দিল, তখন ঘরের প্রদীপখানি সুন্দর জ্বলছিল। কিন্তু সবাই যখন বেশ জাঁকিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে, ঠিক তখুনি হঠাৎ হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিভে। অবোধ পাচক ভাবল—আমি তো আর অন্ধকার দেখে অর্জুনকে খাবার দিইনি, কাজেই আমার দোষ নেই কিছু। অন্যেরা ভাবছে—আলোটা নিভেছে তো নিভেইছে, আবার জ্বালাও। অতএব ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি—ওরে, করভক ! ওরে খর্বটক ! কিন্তু এত শব্দ, হাঁকডাক, অন্ধকারের মধ্যে যিনি নির্বিকারে খাওয়া সেরে চলেছেন—তিনি অর্জুন। তিনি ভাবছেন—ওঃ তৃতীয় তীরটা লক্ষ্যে পৌঁছেছে বটে, কিন্তু ছিলাটা আরও এক প্যাঁচ জড়িয়ে নিলে আরও জোরে যেত তীরটা ; আর দশম তীরটা ছোঁড়া উচিত ছিল আরও একটু বসে, নিচু হয়ে—অর্জুন কিন্তু খেয়ে চলেছেন—আর ত্রয়োদশ তীরটা লক্ষ্যের মধ্যেই গিয়ে পড়ল। আমি চাই, ওটা এক ইঞ্চি মাত্র সরে যাক, কারণ এখানে আমি লক্ষ্যভেদ করতে চাইছি না। লক্ষ্যের এক ইঞ্চি পাশ দিয়ে যেতে চাইছি এবং সেটাই আমার লক্ষ্য। সময়কালে গুরুস্থানীয়দের বাণমুখে প্রণাম জানাতে হলে লক্ষ্যের কান ঘেঁষে নতুন একটা লক্ষ্য চাই আমার। অর্জুন কিন্তু খেয়ে চলেছেন। হঠাৎ মনে হল—আরে ! সবাই এত হাঁক-ডাক করছে, আমি তো এই অন্ধকারের মধ্যে দিব্যি খেয়ে নিলাম। কিন্তু খেলাম কী করে ? পর-পর ঠিক তো খেয়েছি ! অভ্যাসে এতটা হয় ? ঘন অন্ধকারে যদি মুখের গ্রাস মুখেই পড়ে, তা হলে অন্ধকারে অভ্যস্ত মহাবীরের বাণই বা কেন লক্ষ্যমুখে পতিত হবে না। বাস, এই জিজ্ঞাসা এবং অন্তর্গত উচ্চাশার তাড়নায় সেই রাত্রেই অর্জুন উপস্থিত হলেন অস্ত্র অনুশীলনের নির্জন প্রান্তরে। একেবারে একা, সমস্ত রাজপুত্র যখন স্বপ্নের ঘুম ঘুমোচ্ছে, তখন অন্ধকারের মধ্যে এক অতন্দ্র বালক একাকী নিরলসভাবে বাণ ছুঁড়ে চলেছে শুধু শব্দ লক্ষ্য করে। প্রত্যেকটি বাণ এমনভাবে ছুঁড়ছেন অর্জুন, যেন অন্ধকারই তাঁর প্রথম শত্রু, আর দ্বিতীয় শত্রু লক্ষ্য। আধো ঘুমে আধো জাগরণে দ্রোণাচার্যের কানে সেই অন্ধকারের নৈঃশব্দ্যভেদী বাণের শব্দ ভেসে এল শন্...শন্...শন্—তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং দ্রোণঃ শুশ্রাব ভারত।

নিজে ভাল ছাত্র এবং ভাল শিক্ষক হিসেবে দ্রোণ জানতেন—সব বিদ্যা, সব কৌশল ভাল ছাত্রকে শেখাতে হয় না। শিখতে শিখতে আপন প্রতিভায় সে আপনি শেখে। যখন জটিলতার জায়গাটা

শিষ্য আপনিই ধরে ফেলে, তখন গুরুর আনন্দ হয় দুগুণ। প্রথম আনন্দ হয় স্বার্থে, নিজের ওপর আস্থায় ; মনে হয়—এ ছেলে আমার কাছে এসেছিল বলেই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। আর দ্বিতীয় আনন্দ হয় পরার্থে, শিষ্যের ওপর আস্থায় ; মনে হয়—এ ছেলে 'জিনিয়াস', আমার শিক্ষা সে এতটাই নিয়েছে যে, এখন নিজেই নিজের পথ বার করে নিয়েছে। গুরুর কাছে এই আনন্দ এতটাই যে, তখন তাঁর পুত্র-পরিজন, আত্মীয়ের কথা মনে থাকে না, কোনও স্বার্থের কথা মনে থাকে না। শিষ্যের মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পান, এবং আত্মলাভের আনন্দে গুরু তখন ঠিক দ্রোণাচার্যের মতো রাত্রের অন্ধকারে ছুটে যান অর্জুনের মতো শিষ্যের কাছে। তাঁকে আলিঙ্গন দেন বুক ভরে। আর পুত্রের স্বার্থ ভুলে গুরু তখন আপন অন্তরের সমস্ত স্বার্থপরতা এবং পাপবোধের ক্ষালন করেন কঠোর প্রতিজ্ঞায়—অর্জুন ! আমি তোমার শিক্ষার জন্য এতটাই চেষ্টা করব, যাতে অন্য কোনও ধনুকধারী তোমার ধারে-কাছে না আসতে পারে—যথা নান্যো ধনুর্দ্ধরঃ। সত্যি বলছি—আমি এতটাই করব যাতে কেউ আর তোমার সমান হবে না।

বলা বাহুল্য, মহাভারতের কবি দ্রোণাচার্যের মুখে এমন অন্তিম-মুহূর্তে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাতে বোঝা যায়—এর মধ্যে তাঁর উদারতার চেয়েও নাচার অবস্থাটা বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। দ্রোণ বুঝেছিলেন—অর্জুনের মতো শিষ্যের কাছে মন্ত্রগুপ্তি করে কোনও লাভ নেই—সে আপনিই যে কোনও সূত্রে নিজের প্রতিভায় সব অধিগত করবে, মাঝখান থেকে গুরু হিসেবে তাঁর গৌরবটাই ক্ষুণ্ণ হবে। অস্ত্রবিদ্যার নতুন কৌশল শেখানোর ক্রেডিটটাই তখন আর দ্রোণাচার্য পাবেন না, যেমন শব্দভেদ শিক্ষার ব্যাপারে হল। দ্রোণকে তখন তাই বলতেই হয়—সত্যি বলছি, তোমার মতো আর কাউকে এমন করে তৈরি করব না—সত্যমেতদ্‌, ব্রবীমি তে। মনের ভাবটা এই—সত্যি বলছি—আর হবে না, শব্দভেদিতার ক্ষেত্রে যেমনটি হল, তেমনটি আর হবে না। অন্তত এইবার দ্রোণ কথা রেখেছিলেন। অস্ত্রচালনায় নিষাদপুত্র একলব্যের ক্ষিপ্রতা এবং শব্দমাত্রে লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অর্জুনের থেকেও বেশি ছিল এবং সে ক্ষমতা অর্জুনের কাছে ছিল ঈর্ষণীয়। স্বভাবতই অর্জুন এসে গুরুকে নিবেদন করেছিলেন—গুরুদেব ! আপনিই সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—আমার শিষ্যদের মধ্যে আর কেউ তোমার থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে না—ন মে শিষ্যঃ ত্বদ্‌বিশিষ্টো ভবিষ্যতি। অথচ এই তো দেখে এলাম নিষাদপুত্র একলব্যকে। সে আমার থেকেও নিপুণ। অন্য সমস্ত বীরের মধ্যেই সে শ্রেষ্ঠতম। এটা কেমন হল গুরুদেব ?

আপনারা সকলে জানেন যে, এর উত্তরে দ্রোণাচার্য একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি গুরুদক্ষিণা হিসেবে চেয়েছিলেন এবং একলব্য তা কেটেও দেন। আঙুল কাটার পর যখন একলব্যের ছোঁড়া বাণগুলির ক্ষিপ্রতা কমে গেল অর্জুনের তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, তিনি ভারী খুশি হলেন—ততোর্জুনঃ প্রীতমনা বভূব বিগতজ্বরঃ। দ্রোণ কথা রাখলেন।

পাঁচজনে এ-কথা শুনলে বলবে—এ আবার কেমনধারা বীরত্ব ? তুমি যখন অন্য একজনের থেকে বড় নও, তুমি তা হলে তার থেকে বড় হওয়ার চেষ্টা করো। তুমি তার আঙুল কেটে নিয়ে বড় হবে—এ কি বীরত্ব, না, কাপুরুষতা ? এই আক্ষেপের উত্তরে আমরা আবার জানাই যে,—মহাভারতের কবি অর্জুনকে কোনও অলৌকিকতার মধ্যে দিয়ে বড় করেননি। প্রচণ্ড খাটুনি, অভ্যাস, প্রতিভা এবং সর্বোপরি 'প্রোফেশনালিজম্‌'-এর মাধ্যমে যে মানুষটা ধাপে ধাপে চরম হয়ে উঠেছে সেটাই অর্জুন। বিশেষ করে শেষ যে কথাটা বললাম—'প্রোফেশনালিজম্‌'—এ-কথাটা অর্জুনের ক্ষেত্রে এত বেশি প্রযোজ্য যে, বড় হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি একলব্যের মতো চরম বাধাটিকে সেই বৃত্তিতেই প্রতিহত করেছেন, যদিও এতে যে তাঁর বীরজনোচিত লজ্জা ছিল সেটা মহাভারতের কবি লুকোননি। লজ্জা ছিল বলেই অর্জুন দ্রোণাচার্যের কাছে একলব্যের সম্বন্ধে অনুযোগ করেছেন গোপনে এবং একটু বায়না করে—রহো দ্রোণং সমাসাদ্য প্রণয়াদিদম্‌ অব্রবীৎ। কিন্তু তাঁর 'প্রোফেশনালিজম্‌' বোঝা যায়—একলব্যকে দেখা ইস্তক তিনি তাঁর কথা ভেবে যাচ্ছেন—একলব্যমনুস্মরন্‌, এর জন্য গুরুর সঙ্গে দরবার করেছেন নির্জনে, সপ্রণয়ে, একাই গুরুর সঙ্গে একলব্যের কাছে পুনরায় গেছেন এবং দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের বাণাকর্ষণের

আঙুলটি কেটে দিতে বললে তাতে তিনি বাধা দেননি এবং শেষমেষ আঙুল কাটার পর তিনি খুশি হয়েছেন—যতটা না গুরু-গৌরবে, তার থেকেও বেশি এই ভাবনায় যে—তাঁকে প্রতিহত করার মতো দ্বিতীয় কেউ রইল না—নান্যো'ভিভবিতা'র্জুনম্।

ব্যাস লিখেছেন—দ্রোণাচার্য সবাইকেই সমান শিক্ষা দিতেন, কিন্তু বুদ্ধি, লেগে থাকবার ক্ষমতা, শক্তি এবং উৎসাহ—বুদ্ধিযোগবলোৎসাহৈঃ—এগুলির দ্বারাই অর্জুন সবার থেকে বড় হয়ে উঠেছেন—বিশিষ্টো'ভবদর্জুনঃ। যে গুণগুলির দ্বারা অর্জুন বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি, সেটিকে ব্যাস আলাদা করে কোনও গুরুত্ব দেননি। কিন্তু আমরা যেটিকে বিশেষ বলে মনে করি, সেটি—ওই ব্যাস যাকে বলেছেন 'যোগ'। সাধারণভাবে আমরা এই শব্দের মানে বলেছি—লেগে থাকবার ক্ষমতা। কিন্তু এই শব্দটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সময় আমরা যোগ বলতে মনঃসংযোগই বুঝব। সবকিছুর মধ্যে বিশেষত সমস্ত আলোড়নের মধ্যেও এই মনোঃসংযোগের ব্যাপারটা অর্জুনের এতই বেশি ছিল যে, প্রথিতযশা গুরুদেব দ্রোণাচার্য পর্যন্ত কোনও বিশ্রাম পাননি। প্রকৃত ছাত্রের ক্ষমতাই হল মাস্টারমশাই তার জন্য খেটে পরিশ্রম করে আনন্দ পাবে। অর্জুন দ্রোণকে সেই আনন্দ দিয়েছেন।

অর্জুনের মনঃসংযোগ কতটা—সেটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে সেই পাখির চোখ-বেঁধার পরীক্ষায়। বুদ্ধদেব বসু থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এই পরীক্ষায় একা যুধিষ্ঠিরকে বোকা সাজিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু দ্রোণের প্রশ্নের উত্তরে শুধু যুধিষ্ঠিরই বলেননি যে,—আমি এই গাছ, এই আপনি, ওই ভাইদের এবং ওই পাখি—সব কিছুই দেখছি ; একই কথা অন্যেরাও বলেছিলেন—দুর্যোধন ভীম এবং দ্রোণের অন্যদেশী ছাত্ররাও একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—সব দেখতে পাচ্ছি। যুধিষ্ঠির যেমন এ-কথায় দ্রোণের কাছে তিরস্কার লাভ করেছিলেন, অন্যেরাও ওই একই কথা বলে, একই ভাবে তিরস্কার লাভ করেছিলেন—তথা চ সর্বে তৎ সর্বং পশ্যাম ইতি কুৎসিতাঃ। কিন্তু অর্জুন তো আর সব দেখছি বলার লোক নয়। যে বীর পুরুষ দুদিন পরে পাঞ্চালের রাজসভায় সর্বসমক্ষে ঘূর্ণি-যন্ত্রের মাঝখানে রাখা মৎস্যচক্ষু ভেদ করবেন, তিনি যে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় শুধু লক্ষ্যবস্তু, অর্থাৎ পাখিটাই দেখবেন তাতে আশ্চর্য কী ?

দ্রোণ একইভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি পাখি, এবং আমি—সবাইকে ঠিক দেখছ তো ? অর্জুন বললেন—না গুরুদেব ! আমি শুধু পাখিটাই দেখছি—পশ্যাম্যেকং ভাসমিতি। দ্রোণ বললেন—যদি পাখিটাই দেখছ, তবে পাখির কোন অঙ্গ দেখছ ? অর্জুন বললেন—শুধু পাখিটার মাথাই দেখছি, আর কিছুই আমার চোখে পড়ছে না।

দ্রোণ প্রথমে সাধারণভাবে সমস্ত শিষ্যদের বলেছিলেন—তোমরা সকলেই ওই পাখিটাকে তাক করে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর আমি এক একজন করে বলব এবং আমার বলামাত্র ওই পাখিটার মাথা কেটে ফেলতে হবে। এই সাধারণ উপদেশের পর যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষাভূমিতে দ্রোণের প্রশ্ন, একেক-জনের একেকরকম উত্তর—এই বিচিত্রতা এবং সর্বোপরি শিষ্যদের ক্রমিক অকৃতকার্যতার মধ্যে দিয়ে যে ঘটনাগুলি ঘটছিল, তাতে সমবেত শিষ্যদের সবারই মনোযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই যে দ্রোণ বলেছিলেন—তোমরা সবাই ওই পাখিটার দিকে তীর তাক্ করে দাঁড়িয়ে থাকো—সেই আদেশমাত্র অর্জুন পাখি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কে কী বলল, কার কী হল—সে-সবে অর্জুনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ তখন পাখির দিকে। শেষে যেই চরম আদেশ নেমে এল—অর্জুন ! পাখির কোন অঙ্গ দেখছ তুমি—সেটা মিলিটারি ভাষায় অর্জুনের কাছে 'অ্যাটেনশান' বলার মতো। এই মুহূর্ত থেকে তিনি আর পুরো পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন না, শুধু পাখির মাথা দেখছেন—শিরঃ পশ্যামি ভাসস্য ন গাত্রমিতি সো'ব্রবীৎ।

এমন শিষ্য পেয়ে এবং সেই শিষ্যের চরম মনোযোগের খবর জেনে দ্রোণের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—দ্রোণো হৃষ্টতনূরুহঃ। তাঁর মুখ দিয়ে শেষ আদেশ বেরিয়ে এল—শর ত্যাগ কর। মুহূর্তমধ্যে সেই পরীক্ষাভূমির প্রশস্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য গাছ, শুকনো পাতা, আর উদ্বেলিত রাজপুত্রদের সমস্ত

অনীপ্সা—অর্থাৎ আমরা পারিনি, অর্জুনও পারবে না—এই না-চাওয়ার মুহূর্তটা কাটতে না কাটতেই পাখির মাথাটা শুধু মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। বলা যায় 'থিওরেটিক্যাল' পরীক্ষা হয়ে গেল, এবার 'প্র্যাক্‌টিক্যাল'। এ যেমন বলে-কয়ে ছাত্রদের অবহিত করে একটা পরীক্ষা হল, তেমনি হঠাৎ বিপদ এলে ছাত্রদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অস্ত্রত্যাগের ক্ষিপ্রতা কতখানি—এটাও সেকালের গুরুরা বুঝে নিতেন। দ্রোণ শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। বালক-বয়সের ছেলেরা তখনও গঙ্গায় নামেনি, নানারকম ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন ছিল সবাই। দ্রোণাচার্য একাই নেমেছিলেন গঙ্গায়। এমন সময় হাঙর-কুমির জাতীয় কোনও জলজন্তু তাঁর পা কামড়ে ধরল। দ্রোণাচার্য নিজেই সেটাকে মেরে মুক্ত হতে পারতেন, কিন্তু সে-চেষ্টা না করে যন্ত্রণা সহ্য করে গঙ্গার তীরে দাঁড়ানো রাজকুমারদের ডেকে বললেন—হাঙর-কুমির কিছু একটা কামড়ে ধরেছে আমার পা। তোমরা এটাকে মেরে আমায় বাঁচাও।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রত্যেকটি রাজকুমার আপন কর্তব্য ভুলে গেলেন। হতচকিত, বিমূঢ় কুমারদের মধ্যে যিনি নিমেষে জলের মধ্যে শরসন্ধান করে জল-জন্তুটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন, তিনি অর্জুন। দ্রোণ আর দেরি করেননি। উপযুক্ত ছাত্রের চরম কৃতকার্যতার পুরস্কার হিসেবে নিজের কাছে সযত্নে রাখা 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র অর্জুনকে দান করলেন। শিখিয়ে দিলেন—এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং দরকার হলে কীভাবে এই অস্ত্র সম্বরণ করতে হবে।

অর্জুনের এই পুরস্কার অর্থাৎ ব্রহ্মশির অস্ত্রলাভের প্রসঙ্গে দুটি কথা বলতে চাই। মনে রাখা দরকার, মহামতি কর্ণ, যিনি ভবিষ্যতে অর্জুনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, তিনি বেশ কিছুদিন দ্রোণাচার্যের পাঠশালায় অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন। বস্তুত এই অস্ত্রশিক্ষার শেষ-পর্বে যে ব্রহ্মশির অস্ত্র অর্জুন পেলেন, এই অস্ত্রটির ওপর সবচেয়ে বেশি লোভ ছিল কর্ণের। প্রতিদিনের সুচিন্তিত অভ্যাস, লেগে থাকা, মনঃসংযোগ—এগুলি ছাড়াই কর্ণ চেয়েছিলেন ব্রহ্মাস্ত্র তাঁর হোক। কর্ণ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন—যে উদ্যম এবং অনুশীলনে অর্জুন হওয়া যায়, সেই উদ্যম এবং অনুশীলন তাঁর নেই। অথচ রণক্ষেত্রে অর্জুনকে ঠেকাতে হলে এমন কিছু তাঁর চাই যার কাছে অর্জুনের অতীত অভ্যাস, মনঃসংযোগ—সব ব্যর্থ হবে। এর জন্য চাই সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, যার কাছে বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা রণনীতির জারিজুরি খাটে না। দ্রোণাচার্যের পাঠশালাতেই কর্ণ বুঝে নিয়েছিলেন—অর্জুন তাঁর চেয়ে বেশি কৌশলী—সর্বথাধিকমালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ম্। কিন্তু অর্জুনকে যে হারাতেই হবে—শুধুমাত্র এই প্রতিস্পর্ধিতায়—যখন পাণ্ডব-কৌরবের একজন রাজকুমারও কাছে-ভিতে নেই, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা নিজগৃহে অনুপস্থিত এবং দ্রোণাচার্য একা—ঠিক সেই সময় কর্ণ এসে বললেন—গুরুদেব! আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়বার উপায় শিখিয়ে দিন এবং সেই সঙ্গে শিখিয়ে দিন কী করে ওই অস্ত্র সম্বরণ করতে হয়। কর্ণ মনের মধ্যে কিছু না লুকিয়ে পরিষ্কার জানালেন—আমি এই ব্রহ্মাস্ত্রের অভিসন্ধি জানতে চাই শুধুমাত্র অর্জুনের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করবার জন্য—অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ।

নিজের অভিজ্ঞতায় এবং অর্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্যের মমতার নিরিখে কর্ণ জানেন—অর্জুনের ব্যাপারে আচার্যের পক্ষপাত আছে। বস্তুত বুদ্ধিমান, উদ্যমী তথাচ বিনয়ী ছাত্রের প্রতি কোন গুরুর পক্ষপাত না থাকে? এই পক্ষপাত ধরে নিয়েই কর্ণ কৌশলে বললেন—গুরুদেব! সমস্ত শিষ্যের ক্ষেত্রেই আপনার সমদৃষ্টি। এমনকী আপনি আপনার নিজের ছেলের সঙ্গেও শিষ্যদের ভেদ করেন না—সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্। অতএব আমিও ব্রহ্মাস্ত্র চাই।

কর্ণের এই বাচনভঙ্গীর মধ্যেই চাতুর্য ছিল। তিনি আগেভাগেই অর্জুনের ওপর আচার্যের নিশ্চিত পক্ষপাত ভাষার কৌশলে নিবৃত্ত করতে চান। মহাভারতের কবি দেখিয়েছেন—যত বড় সমদর্শী গুরুই হোন না কেন, সবার ওপরে তিনি মানুষ। অসাধারণ তথাপি শ্রদ্ধালু শিষ্যের প্রতি মনুষ্যধর্মে পক্ষপাত অনিবার্য। দ্রোণাচার্যও তাই অর্জুনের ব্যাপারে দুর্বল—সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি। তার ওপর কর্ণ এমন একটি অস্ত্রের কৌশল শিখতে চায়, যার মারণ-ক্ষমতা পূর্বাহ্নেই নিশ্চিত এবং সর্বজনবিদিত, বিশেষত কর্ণ সেই অস্ত্র অর্জুনের ওপরেই প্রয়োগ করতে চায়। দ্রোণাচার্য জেনেশুনে কেমন করে

এই প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধী যুবকের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র তুলে দেবেন ?

অনেকে বলেন—কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র না দেওয়ার জন্য দ্রোণ যে ওজর আপত্তি তুলেছেন, তা ভারী অভব্য হয়েছে। সমাজ-সচেতন ঐতিহাসিকের কাছে এই ওজর আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং তা এই কারণে যে, দ্রোণ বলেছিলেন—ব্রহ্মাস্ত্রের কৌশল জানতে পারেন ব্রাহ্মণ, জানতে পারেন চরিত্রবান, ব্রতচারী ক্ষত্রিয়, এমনকী সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করতে পারেন, কিন্তু আর কেউ নয়।

বলতে পারেন—এ আবার কেমন ধারা কথা ? ব্রহ্মাস্ত্র লাভের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে দ্রোণ যাঁদের কথা উল্লেখ করলেন—তাদের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র থাকাও যা, না থাকাও তাই। ব্রাহ্মণ, ব্রতচারী, সন্ন্যাসী—এরা কি কেউ অস্ত্র হানার লোক ? সত্যি কথা বলতে কি—দ্রোণের কথাটা যে কতটা জরুরি, সেটা অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র দেওয়ার সময়েই বোঝা যাবে। অর্থাৎ অর্জুনকে ব্রহ্মশির-অস্ত্র দান করার সময় দ্রোণ কী কথাগুলি বলেছিলেন, সেটাই আমাদের লক্ষ করতে হবে। প্রথম কথা—অর্জুন গুরুর কাছে ব্রহ্মাস্ত্র চাননি, গুরুই সেটা তাঁকে দিয়েছেন শিষ্যত্ব সিদ্ধির চরম পুরস্কার হিসেবে, দিয়েছেন স্বেচ্ছায়, সানন্দে। আর কর্ণ ? কর্ণ নিজেই গুরুর কাছে ব্রহ্মাস্ত্র চেয়েছিলেন এবং সে চাওয়ার পিছনে প্রতিহিংসার আগুন ছিল। তা ছাড়া কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র চেয়েও ফেলেছিলেন বড় তাড়াতাড়ি এবং তিনি যে কী কূটবুদ্ধি নিয়ে দ্রোণের পেছন-পেছন ঘুর-ঘুর করছেন—সেটা দ্রোণ ধরে ফেলেছিলেন—দৌরাত্ম্যঞ্চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ। ব্রহ্মাস্ত্র লাভের বিষয়ে অর্জুন এবং কর্ণ—দুজনের ব্যবহারের তারতম্যটুকু লক্ষ করলেই দ্রোণাচার্য কর্ণকে যা বলেছিলেন এবং অর্জুনকে যা বলেছিলেন—সেই দুটি বক্তব্যই তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে। কর্ণকে দ্রোণ যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে বলেছি। এবার অর্জুনকে কী বলেছিলেন সেটা শুনি।

দ্রোণ বলেছিলেন—প্রয়োগ এবং সম্বরণের কৌশল-সহ এই ব্রহ্মশির অস্ত্র তুমিই নাও অর্জুন। এই অস্ত্র কখনও যেন মানুষের ওপর প্রয়োগ কোরো না, কারণ সাধারণ অল্পপ্রাণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করলে এই অস্ত্র সমস্ত জগৎ ধ্বংস করে দিতে পারে—জগদ্ বিনির্দহেদেতদ্ অল্পতেজসি পাতিতম্। দ্রোণ অর্জুনকে সাবধান করে আবারও বললেন—এই অস্ত্র কোনও সাধারণ অস্ত্র নয়। অতএব যথেষ্ট সংযত হয়ে এই অস্ত্র ধারণ করবে।

দ্রোণ যে কথাগুলি বললেন, আধুনিক উন্নতমানের যে কোনও পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধেই সে-কথা খাটে। বস্তুত ব্রহ্মাস্ত্রও সেকালের দিনের অত্যাধুনিক কোনও অস্ত্র যা চরম মারণাস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। 'ব্রহ্মাস্ত্র' শব্দটাও বাংলাভাষায় চরম এবং পরম উপায় হিসাবে রূঢ় হয়ে গেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের অপব্যবহারে আধুনিককালে যে আশঙ্কাগুলি করা হয়, ব্রহ্মাস্ত্রের ক্ষেপণেও সেই চিন্তা বরাবর ছিল। ফলে এই অস্ত্রের অধিকারীর সংযম ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। কর্ণের এই সংযম ছিল না। কারণ প্রথমত, তিনি এই অস্ত্র অর্জুনের ওপর প্রয়োগ করার জন্যই চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রের ব্যবহারে তাঁর যে স্থান, কাল, পাত্রের বোধ কম ছিল—তা ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচের ওপর একাঘ্নী বাণের ব্যবহারেই বোঝা যায়। অন্যদিকে অর্জুনের সংযম এবং স্বার্থহীনতা এতটাই, যে সারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহারথ যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করার সময়েও ব্রহ্মাস্ত্রের কথা ভাবেননি। অপিচ ব্রহ্মশির অস্ত্রের মতো সাংঘাতিক অস্ত্রও তিনি ব্যবহার করেছিলেন অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু সে অস্ত্রও তিনি সময় মতো সম্বরণ করেছিলেন সাধারণ নাগরিকের প্রতি অনুকম্পায়, পাণ্ডব-বংশের সন্তানবীজ পরীক্ষিতের প্রাণের মূল্যে। বস্তুত অর্জুনের এই যে স্বার্থত্যাগ, এই যে নিষ্কাম উদাসীনতা, এই যে আপন মূল্যে পরের অস্তিত্ব চিন্তা—এগুলি সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা ব্রতচারী ক্ষত্রিয়কে মানায় বলেই ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী হিসেবে দ্রোণ এদেরই নাম করেছেন। অপিচ অর্জুনের মধ্যে এত সব গুণ ছিল বলেই একমাত্র তাঁকেই দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের উপযুক্ত অধিকারী মনে করেছেন। এর মধ্যে তাই পক্ষপাতের প্রশ্ন তো ওঠেই না, বরঞ্চ দ্রোণের দিক থেকে পাত্র নির্বাচনের ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র দেবার সময় দ্রোণ আরও বলেছিলেন—আমি মহাত্মা অগ্নিবেশের শিষ্য এবং আমার অস্ত্রগুরু অগ্নিবেশ ছিলেন অগস্ত্যের শিষ্য। এই ব্রহ্মশির অস্ত্র অগস্ত্য অগ্নিবেশকে দিয়েছিলেন

এবং অগ্নিবেশ দিয়েছিলেন আমাকে। তবে আমি কিন্তু রীতিমতো তপস্যা করে এই অস্ত্র পেয়েছিলাম—তপসা যত্ময়া প্রাপ্তম্। এই যে অস্ত্রের জন্য তপস্যা, এই তপস্যার মধ্যে অভ্যাস, উৎসাহ, অনুরাগের থেকেও সবার ওপরে সত্ত্বগুণের মাত্রাটা বেশি। অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহারের সময় ব্যক্তিগত হিংসার থেকেও সামগ্রিক পরিস্থিতি যেন বড় হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই মাত্রা-বোধ কর্ণের থেকে অর্জুনের অনেক বেশি ছিল। বড় বড় বনেদি বাড়িতে এক একটি গয়না—সে হার, অঙ্গদ, কেয়ূর—যাই হোক, শাশুড়ি বউমার হাতে তুলে দেন। আবার বউমা যেদিন পক্ককেশী শাশুড়িটি হন, সেদিন তিনি সেটি তুলে দেন পুত্রবধূর হাতে। এইভাবে পরম্পরাক্রমে সে-গয়না নামে কত অধস্তন পুরুষে। সে-গয়নার মধ্যে সোনা ছাড়া আরও যেটা থাকে, সেটা পূর্বতন পুরুষ এবং ঐতিহ্যের প্রতি মর্যাদা। কিন্তু অনুপযুক্ত বধূটির হাতে পড়লে সে-গয়না যেমন মর্যাদা হারিয়ে সোনার মূল্যে ধরা দেয়, পরম্পরাক্রমে পাওয়া অস্ত্রের ব্যাপারটাও সেইরকম। দ্রোণ বলেছিলেন—এক পরম গুরু থেকে আরেক গুরুতে সঞ্চারিত করার জন্যই আমি এই অস্ত্র তোমাকে দিয়েছি অর্জুন—তীর্থাৎ তীর্থং গময়িতুম্ অহমেতৎ সমুদ্যতঃ। খেয়াল করা দরকার, দ্রোণ এখানে অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যার পরবর্তী তীর্থস্বরূপ বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের তিনিই গুরু। আবারও বলছি—কর্ণের কাছে গুরুতর অস্ত্রের কোনও আলাদা মূল্য নেই। অনুপযুক্ত বধূর কাছে বংশ-পরম্পরায় নেমে আসা গয়না যেমন ঐতিহ্য অতিক্রম করে শুধুমাত্র সোনার মূল্যে ধরা দেয়, কর্ণের কাছেও তেমন সাধনার ধন পরম এবং চরম অস্ত্রটিও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার মূল্যে ধরা দেয়। দ্রোণাচার্যের ব্রহ্মাস্ত্র, পরশুরামের অমোঘ অস্ত্র—সবই তিনি চেয়েছিলেন অর্জুনের ওপর প্রতিহিংসায়। অনুপযুক্তের হাতে মারণাস্ত্র পড়লে সে যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করে স্বল্প প্রয়োজনেই তার অপব্যবহার করে, কর্ণ ঘটোৎকচের ওপর একাঘ্নী প্রয়োগ করে সেই অনুপযুক্ততাই প্রমাণ করেছেন। এই অনুপযুক্ততার আরম্ভ সেই দিন থেকে, যেদিন এক কিশোর-শিষ্য দ্রোণাচার্যের কাছে অর্জুন-হত্যার মোক্ষম অস্ত্রটি চেয়েছিল। অল্পবয়স থেকেই প্রতিহিংসা-মুখর সেই কর্ণের ওপর গুরু হিসেবে দ্রোণাচার্যের পক্ষপাত কী করে থাকবে?

তবু এইরকম একটি মানুষকেই মহাভারতের কবি অর্জুনের প্রথম প্রতিযোগী করে তুললেন, অস্ত্র-প্রদর্শনীর আসরে। বিরাট মঞ্চ সাজানো হয়েছে। এই মুহূর্তে পাণ্ডব এবং কৌরব কিশোররা সকলেই নিজের নিজের অস্ত্রশিক্ষার ওপর যতখানি আস্থাশীল, ঠিক ততখানিই সংশয়ান্বিত। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে প্রথম ফাংশনে গান গাইবার সময় কিশোর-কিশোরীর যে দ্বিধা থাকে, কিশোর-বীরদের হয়তো সেই দ্বিধাই ছিল। বিরাট মঞ্চের একদিকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী—সবাই বসে আছেন। ভীষ্ম প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য আসর পরিচালনা করছেন। মহামতি বিদুর ধারাভাষ্য দিচ্ছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। আর বীরের বীর অর্জুন তাঁর অস্ত্রশিক্ষার কেরামতিও প্রায় সবটাই দেখিয়ে ফেলেছেন। মাথার ওপর কোথাও লোহার শুয়োর ঘুরছিল, অর্জুন তার মুখে পাঁচখানি বাণ একের পর এক গেঁথে রেখেছেন, কোথাও দড়িতে গরুর শিং দুলছিল অর্জুন তার ভিতর একুশটি বাণ ঢুকিয়ে রেখেছেন। এতসব কেরামতি আর চমক দেখে জ্যাঠামশাই ধৃতরাষ্ট্র যখন প্রায় স্থির করে ফেলেছেন যে, এমন বীর বোধহয় হয়নি, আর হবেও না, জননী কুন্তী যখন পুত্রগর্বে পাণ্ডব-রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন, ঠিক তখুনি মঞ্চের দুয়োর থেকে তাচ্ছিল্যের হাততালি শোনা গেল। কর্ণ প্রবেশ করলেন। আমি বলব—মহাভারতের কবি কর্ণকে প্রবেশ করালেন। এই মুহূর্তে সমবেত জনগণ, দুর্যোধন এবং জননী কুন্তীর কী প্রতিক্রিয়া হল—আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি শুধু অর্জুনের অবস্থাটা বলতে চাই। প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে চরম অস্ত্রনৈপুণ্য দেখানোর পর অর্জুন যখন নিজের নৈপুণ্যে নিজেই প্রায় বিস্মিত ঠিক সেই সময়ে মহাভারতের কবি কর্ণকে এনে উপস্থিত করলেন অর্জুনের সামনে। এমন কর্ণ, যিনি গুরুশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের শিষ্য নন, এমন কর্ণ যিনি একা নিজের ভার নিজেই বহন করতে পারেন।

কর্ণ এসে কোনওমতে দ্রোণাচার্য আর কৃপাচার্যকে একটা সেলাম ঠুকে (কারণ দ্রোণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন) অর্জুনকে বললেন—অর্জুন তুমি যা যা কারসাজি দেখিয়েছ, তাতে অন্য লোক

চমকালেও চমকাতে পারে, কিন্তু তুমি নিজে যেন চমকে যেয়ো না—মাস্মনা বিস্ময়ং গমঃ। সত্যি কথা বলতে কি—অস্ত্রের নিপুণতা তুমি যা দেখিয়েছো, আমি তার থেকে বেশি করে দেখাব। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল—তারা মজা দেখতে চায়। অস্ত্রশিক্ষার চরম নিপুণতা দেখার পরও আরও কিছু! লজ্জা এবং ক্রোধ একসঙ্গে অর্জুনের সমস্ত সত্তা জর্জরিত করে তুলল—হ্রীশ্চ ক্রোধশ্চ বীভৎসুং ক্ষণেনাম্বাবিবেশ হ।

এতক্ষণ ধরে অর্জুনের ধৈর্য, সহ্য আর অস্ত্রনৈপুণ্যের পারম্য ঘোষণা করার পর এই যে মহাভারতের কবি অর্জুনকে লজ্জায় ফেলে দিলেন—এটা হল বাস্তবের সম্মুখীন করা। মহা-মহা বীরকে ভবিষ্যতে যে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে, সেই বাস্তবকে মহাভারতের কবি অর্জুনের সামনে প্রথমেই এনে দিয়েছেন এমন একটা মুহূর্তে, যখন অর্জুন আত্মতৃপ্তির পারে এসে পৌঁছেছেন। কর্ণের মুখে নিজের কথা বসিয়ে কবি বলেছেন—তুমি নিজের কেরামতিতে নিজে বিস্মিত হয়ো না—মাস্মনা বিস্ময়ং গমঃ। কবির এও এক ধরনের মমতা, আপন-সৃষ্ট নায়কের প্রতি মমতা। যাঁরা মহাভারতের এই জায়গায় কর্ণের দাপট দেখে অভিভূত হন, তাঁরা ব্যাসের কবিহৃদয়টুকু বোঝার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, এইখানে কর্ণের তেজ দেখে আপ্লুত হবার কারণ আছে। কর্ণ বলেছিলেন—অর্জুন তুমি যা যা করে দেখিয়েছ, তা সবই, এমনকী তার চেয়ে বেশি আমি করে দেখাব—পার্থ যত্তে কৃতং কর্ম বিশেষবদহং ততঃ। করিষ্যে...। কর্ণ সব করেও দেখালেন। দ্রোণাচার্যও কর্ণকে তাঁর অস্ত্রকৌশল দেখানোর অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন, কারণ সার্থক গুরু হিসেবে তিনি জানেন যে, অর্জুনকে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতেই হবে। এইখানে মহাকাব্যের কবির ক্ষমতা। তিনি বুঝিয়ে দিলেন—এতদিন ধরে অস্ত্রগুরুর আসন থেকে দ্রোণাচার্য যাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়ে আসছেন, অস্ত্রপরীক্ষায় যাঁকে তিনি প্রথম বলে ঘোষণা করেছেন, একনিষ্ঠ একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে যে-গুরু অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করে তুলেছেন, আজ পিতামহ ভীষ্ম, জ্যাঠামশাই ধৃতরাষ্ট্র এবং জননী কুন্তীর সামনে সেই অর্জুন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। অর্থাৎ জগতে দ্রোণাচার্য ছাড়াও আরও গুরু আছে, একলব্য ছাড়াও আরও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, দ্রোণের শিক্ষাশ্রম ছাড়াও আরও বড় একটি জায়গা আছে—যেখানে অর্জুনকে একাকী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন মহাভারতের কবি। আজ এই বাহ্য-জগৎ থেকে অর্জুনকে শিক্ষা নিতে হবে। এখানে কর্ণের ক্ষমতা দেখানোতে কবির উদ্দেশ্য যতটুকু, তার থেকে অনেক বড় উদ্দেশ্য অর্জুনকে লজ্জায় ফেলে বাহ্য-জগতের সম্মুখীন করা।

কর্ণ বলেছিলেন—আমি অর্জুনের সঙ্গে সরাসরি লড়তে চাই। আর এই কথার উত্তরে অর্জুন বাচ্চা ছেলের মতো অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করে বললেন—সেধো কোথাকার! এই আসরে তোমাকে ডাকা হয়নি, তোমাকে কথা বলতে কেউ বলেনি, তবু কথা বলছ। কবি গুরুগম্ভীর করে যা অর্জুনের মুখে বলেছেন, তার মানে এই হয়। অর্থাৎ চিরকাল প্রথম হওয়া মহাবীর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে সমকক্ষ প্রতিভার সামনে কতটা অপ্রতিভ হয়ে যেতে পারেন সেটা অর্জুনের কথা দিয়ে সপ্রমাণ করলেন কবি। অর্জুনের কথার উত্তরে কর্ণ যা বললেন তার আধুনিক রূপান্তর করলে দাঁড়ায়—আরে! এতক্ষণ যে বাণের খেলা দেখাচ্ছিলি, সেই বাণের মুখে কথা বল ব্যাটা—শরৈঃ কথয় ভারত। কেন, এই আসর কি তোর বাপের সম্পত্তি, এখানে সবার অধিকার সমান—রঙ্গোঽয়ং সর্বসামান্যঃ কিমত্র তব ফাল্গুন। কর্ণ আরও বললেন—তোর গুরুর সামনেই আজকে তোর মাথা কাটব।

এই যে এক মুহূর্তে উপযুক্ত গুরুর সমস্ত সুশিক্ষা উড়িয়ে দিয়ে মহাবীরের সমস্ত অভিমান তাচ্ছিল্য করে কর্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, এর মধ্যে কর্ণকে উজ্জ্বল করার থেকেও মহাকাব্যের কবি অন্তরে-অন্তরে অর্জুনকে আরও গভীর পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করেছেন। কবি শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ হতে দেননি। যুদ্ধের আহ্বানে অর্জুনকে এগিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছেন গুরু দ্রোণাচার্য। যুদ্ধও প্রায় লেগেই যাচ্ছিল, কিন্তু কর্ণের কুলশীলের তুচ্ছ বাহানায় এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত থেমে গেছে। কবি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন যুদ্ধের জন্য, কারণ তাতে কর্ণের চরিত্র উজ্জ্বল হয়; আর যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন কর্ণকে কুলেশীলে লজ্জায় ফেলে, এবং এইখানে অর্জুনের প্রতি তাঁর মমতা। তিনি তাঁকে

যথেষ্ট অপ্রস্তুত করে কঠিন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেছেন। ভাবটা এই—কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে কী হত বলতে পারি না, অর্জুন! তবে শুধু দ্রোণগুরুর অস্ত্রবিদ্যা নিয়ে অথবা শুধু গুরুর মুখে আপন শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা শুনে কোনও সুশিষ্য যদি আত্মতৃপ্ত হয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, তবে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। জগতে অন্য আরও উপযুক্ত গুরুর সুশিষ্যরাও আছেন, তাঁদের কথা ভেবে নিজেকে তৈরি করা দরকার। অস্ত্রশিক্ষা-প্রদর্শনের চরম মুহূর্তে অর্জুনের সামনে কর্ণের অবতারণা এই কারণেই।

অর্জুনের প্রতি মহাভারতের কবির আপাত-কঠিন এই পরোক্ষ মমতাটুকু না থাকলে ঠিক পরের অধ্যায়ে মহারথী দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমরা কর্ণকেই বিজয়ী হিসেবে দেখতাম, অর্জুনকে নয়। দ্রোণাচার্য সমস্ত কৌরব-ভাইদের এবং পাণ্ডবদের বলেছিলেন—তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জ্যান্ত বেঁধে আনবে। এই তোমাদের গুরুদক্ষিণা। লক্ষ করে দেখবেন—এই যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত থেকেই অর্জুনের মুন্সিয়ানা আরম্ভ হল। দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা দেওয়ার কথা প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কৌরবরা দুর্যোধনের নেতৃত্বে হই হই করে বেরিয়ে পড়লেন দ্রুপদকে শিক্ষা দিতে। এঁদের সঙ্গে মহাবীর কর্ণও ছিলেন। দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণেরা—আরে আমি আগে যাচ্ছি—আরে তুমি বোসো, আমিই যথেষ্ট—এইরকম তাচ্ছিল্যে দ্রুপদের রাজ্যে ছুটলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে অর্জুন কী করলেন? একটুও উত্তেজনা প্রকাশ না করে, নায়কোচিত দৃঢ়তায় দ্রোণাচার্যকে বললেন—এঁদের পরাক্রম প্রকাশ করা শেষ হোক, তারপর আমরা যাব—এষাং পরাক্রমস্যান্তে বয়ং কুর্যাম সাহসম্।

এও এক ধরনের 'হিরোয়িক আইসোলেশন'—ব্যাস কর্ণকে দুর্যোধন, দুঃশাসন জলসন্ধ অথবা যুযুৎসুর গড্ডালিকায় ভিড়িয়ে দিয়েছেন; আর অর্জুনকে রেখেছেন একা—যিনি এই মুহূর্তে—বরং বলা উচিত কর্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংঘাতের পর-মুহূর্ত থেকেই অন্য এক মানুষ, যিনি হঠাৎ কিছু করে বসবেন না। অর্জুনের চিন্তার কারণ তিনটি। এক, দ্রুপদের সঙ্গে কৌরব-ভাইদের আগেই একটা যুদ্ধ হয়ে গেলে দ্রুপদের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুই, কর্ণের দম্ভ এবং কার্যকালে তার কার্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে সবার সামনে। তিন, একই দলে থেকে কর্ণের সঙ্গে একযোগে দ্রুপদকে আক্রমণ করার পর দ্রুপদ যদি শেষমেশ ধরাও পড়েন, তা হলে 'ক্রেডিট' ভাগাভাগি হয়ে যাবে। এত সব ভেবেই—পূর্বমেব তু সংমন্ত্র্য—অর্জুন এঁদের সঙ্গে গেলেন না। তিনি বুঝেছিলেন—যে উন্মাদনা নিয়ে দুর্যোধন-কর্ণরা লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুপদকে ধরতে গেল, অত লাফালাফি করে দ্রুপদের মতো বিরাট যোদ্ধাকে ধরা যায় না। কারণ, তিনি দ্রোণাচার্যের সতীর্থ—অস্ত্র-বিদ্যা শিখেছিলেন একই গুরুর কাছে।

অর্জুন যা ভেবেছিলেন, তাই হল। দুর্যোধন-কর্ণরা দ্রুপদের বাণের মুখে ভেসে গেলেন। যে ব্যক্তি কিছু কাল আগে অর্জুনকে বাণের মুখে কথা বলতে বলেছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ দুর্যোধন, দুঃশাসনের সঙ্গে দ্রুপদের বাণ খেয়ে পালিয়ে গেছেন। মহাভারতের কবি তাঁর জন্য পৃথক কোনও শ্লোক ব্যবহার করেননি। গুরুগৃহ, পরীক্ষা এবং প্রদর্শনীর পর কৌরব, কর্ণ এবং পাণ্ডবদের এই ছিল প্রথম এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ, যেখানে সমস্ত কৌরব ভাইরা এবং কর্ণ অকৃতকার্য হলেন। শুধু নায়কোচিত একাকিত্বের পরিসরে যে মানুষটি নিজের মহিমায় জ্বলজ্বল করতে লাগলেন—তিনি অর্জুন। কর্ণ যা পারলেন না, অর্জুন তাই পারলেন। ভাবে বুঝি—একটু আগে যে কবি প্রতিনায়কের মহিমা প্রকাশ করে আপন সৃষ্ট নায়ককে লজ্জায় ফেলে তাঁকে দিয়ে আবোল-তাবোল বকাচ্ছিলেন, এখন ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত রণক্ষেত্রের মধ্যে তাঁকে সমস্ত নিন্দাপঙ্ক থেকে উদ্ধার করে আনলেন সবার সামনে। জীবনের প্রথম সত্যিকারের যুদ্ধ অর্জুন জিতে ফিরলেন, কর্ণ পারলেন না।

এই যে অর্জুন শুধুমাত্র ভীমকে সহায় করে দ্রুপদকে জ্যান্ত ধরে আনলেন দ্রোণের সামনে—এই ঘটনার আরও কতগুলি গভীর তাৎপর্য আছে। মনে রাখা দরকার—দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধের পরেই দ্রোণ বুঝেছিলেন—কর্ণ অর্জুনের সমকক্ষ নন এবং কর্ণ কেন, কেউই তাঁর সমান নন—বীভৎসুসদৃশো লোকে ন্যান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার পরেই দ্রোণ তাঁকে গুরু-পরম্পরায় নেমে আসা ব্রহ্মশির অস্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার উপদেশ দেন। কারণ,

অর্জুন-এর মধ্যে যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধমাত্রেই তিনি ব্রহ্মশিরের কথা স্মরণে আনেননি। শুধু অস্ত্র হানা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অস্ত্রহানার সংযমও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সংযম দ্রোণাচার্য অর্জুনের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তৃতীয়ত, অস্ত্রপ্রদর্শনীর সময় কর্ণের আস্ফালনের পর জনসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা একদল কর্ণকে এবং অন্যদল অর্জুনকে শ্রেষ্ঠতার আসন দিয়েছিল। কিন্তু দ্রুপদের পরাজয়ের পর সারা ভারতবর্ষে স্বাভাবিকভাবেই ধনুর্বেদে অর্জুনের অদ্বিতীয়তা চাউর হয়ে গিয়েছিল—স্বভাবাদ্ অগমচ্ছব্দো মহীং সাগরমেখলাম্। চতুর্থত, দ্রুপদ শাসনের এক বছরের মধ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজপদে অভিষেক করেছেন। আমি অবশ্য 'অভিষেক করেছেন' বলব না, বলব অর্জুনের ক্ষমতা দেখে পাণ্ডবভাইদের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। পঞ্চমত, যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন যে ভাবে একা একাই বিভিন্ন রাজ্য জয় করে, রাজ্যের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুললেন, তাতে হঠাৎই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন পাণ্ডবদের ওপরেই বিষিয়ে গেল—দুষিতো সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে এবং ক্ষমতায় বড় হয়েও পাণ্ডবদের ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার মূল কারণ বস্তুত একটাই। অলৌকিকভাবে নয়, দেবতার বরে নয়, মণি-মন্ত্র-মহৌষধে নয়—সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতায়, পরিশ্রম, অভ্যাস আর অভিজ্ঞতায় অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

৩

আমি বেশ জানি—অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা এবং মৌন-মূক বালকটি থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বমহিম আত্মপ্রকাশ নিয়ে আমি বড় বেশি কথা বলে ফেলেছি। অবশ্য এই বিস্তর বিবরণের কারণও আছে। মহাভারতের আলোচক, পাঠক এবং সমালোচকদের মধ্যে তাবড় তাবড় ব্যক্তিরা আছেন। তবে মহাভারতের নায়ক কে—এই প্রশ্ন উঠলে, তাঁরা কেউ মহাভারতের মহত্ত্ব এবং কেউ বা ভারবত্তার প্রসঙ্গ তুলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কেউ বা অতি চতুরতায় মনোরম শব্দব্যূহ সৃষ্টি করে যুক্তির ইন্দ্রজালে যুধিষ্ঠিরকেই নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সে যুগের প্রতিস্তরে ধর্মের প্রাধান্য এবং মহাভারতের যুদ্ধান্তিম শান্তরস আপাতত যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব অনেক বেশি সদর্থক করে তোলে। জানি এবং মানি—মোক্ষধর্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের আজীবন আগ্রহ ছিল। এও মানি—সংসারের সমস্ত পঙ্কিলতার মধ্যেও তিনি সংসার থেকে পালিয়ে যাননি। মহাভারতের ধর্মপ্রধান প্রেক্ষাপটে এই না-পালানোটা মোক্ষনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বানিয়ে দিতে রসসিক্ত যুক্তির অভাব ঘটার কথা নয়। আর এও তো ঠিক, সংস্কৃত আলংকারিকেরা মহাভারতকে যেখানে শান্তরস-প্রধান মহাকাব্য বলেছেন, সেখানে শম-প্রধান যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বলে প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তি-বুদ্ধিরও অভাব ঘটবে না। একই কারণে মহাভারতের শেষাংশে বিরহকাতর পরিবেশ, স্ত্রীলোকের আর্তনাদ এবং আরও পরে সন্তানদের হানাহানিতে ভগবান বলে চিহ্নিত কৃষ্ণের অন্তর্ধান মনুষ্যজীবনের পরিণাম-শূন্যতা প্রকাশ করে বলে সব কিছুর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের চিরায়ত মোক্ষভাবনাই শেষ সত্য হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে যুক্তির জাল বুনতে থাকলে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্বই তর্কগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। কেন না, মহাভারত মোক্ষধর্ম উপদেশক ধর্মশাস্ত্র হিসেবেই অগ্রগণ্য।

কিন্তু আমার সহৃদয় পাঠককুল! আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো—আপনারা যখন মহাভারত পড়েন, তখন কি এই মহাকাব্যের যুদ্ধান্তিম পটভূমিকায় জাগতিক শূন্যতা হৃদয়ে উপলব্ধি করে শান্তরসে সমাহিত হন? নাকি, সারা জীবন ধরে পাণ্ডবরা যে বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছেন, তার প্রতিশোধ কীভাবে পাণ্ডবেরা নিলেন—তার জন্য আপনাদের আত্যন্তিক ভাবনা থাকে? বলুন তো—সারা মহাভারত জুড়ে যুধিষ্ঠির তাঁর একান্ত ধর্ম-ভাবনায় উপদেশধর্মী যে-সব কথা বলেছেন—তাতে আপনারা বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন, নাকি, যে-সব জায়গায় ভীম-অর্জুনের বীরত্ব ব্যঞ্জক কথাগুলি—যা নাকি সব সময় সযৌক্তিক বা পরিণাম-রমণীয় নাও হতে পারত—সে কথাগুলির সঙ্গে আমরা পাঠক হিসেবে বেশি মানসিক যোগ উপলব্ধি করেছি। আমি জানি মানুষের

মধ্যে দেবত্ব বড় দুর্লভ কিন্তু দেবোপম মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন ঘর করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণেই মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুঃখ এবং দৈনন্দিনতার মধ্যে আমরা যুধিষ্ঠিরের মতো শম-প্রধান মানুষের ওপর ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ি। আর এই সব জায়গায় ধৈর্য, সহ্য আর দেবতার গুণে ভারতবর্ষের মতো ধর্মক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির ধীরপ্রশান্ত নায়কটি হয়ে ওঠেন। অর্থ, লোভ, কামনা, প্রতিহিংসা—এ-সবের বিরুদ্ধ ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ যে 'কাউন্টার-কালচার' তৈরি করেছিল, সেখানে বৈরাগ্যপ্রধান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ঘোষণা করতে অসুবিধে কিছু নেই। অসুবিধে নেই—সেই নিরিখে যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বলতেও। কারণ ভারতবর্ষের সর্বজনীন ধর্মবোধ শম-দমসম্পন্ন লোকাতীত ব্যক্তিত্বকে নীতিগতভাবে নায়ক ভেবে নিতে কী-ই বা অসুবিধে আছে ?

কিন্তু বলুন তো—অর্জুনের অলোকসামান্য বীরত্ব, ভীমের বলদর্পিতা—এগুলি যদি মহাভারতের নিতান্ত গৌণ-রস হয় এবং স্বয়ং ব্যাসও যদি এই গৌণতাকে নির্মূল করে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের স্বভাব-মহিমায় নতুন কোনও মহাভারত লিখতেন, তা হলে সে মহাভারত কে পড়তেন ? অথবা পড়তেন যোগী, মুনি, ঋষিরাই। যদি বলেন—ভীম, অর্জুন আছেন শুধু প্রতিতুলনায় যুধিষ্ঠিরকে মহত্ত্ব দান করার জন্য, তাহলে বলব—এ-বিষয়ে দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা আরও ভাল কাজ করতেন। আবার দুর্যোধনও যুধিষ্ঠিরের প্রতিনায়ক নন, যাতে করে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। ভীম-অর্জুন দুর্যোধনের থেকে ভাল মানুষ, আর যুধিষ্ঠির আরও ভাল এই যুক্তিই বা কতটা পরিণত ?

মহা মহাপণ্ডিতরা—যাঁরা বিশ্বজগতের সাহিত্য মন্থন করে, অপ্রতিম বাকশৈলীতে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমি তাঁদের যুক্তিতে অপ্রতিভ বোধ করি, কিন্তু অভিভূত হই না। অভিভূত হই না, কারণ, এক-কথায় নায়ক শব্দটি সাহিত্য-জগতে যে ভাব, যে অনুভূতির সৃষ্টি করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। একটি নারীকে আপন গুণরাশিতে মোহিত করা—এ-গুণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মহাভারতের বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার ওপরেও তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। নেই এমন কোনও নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা—যাতে বলা যায় তিনি ঘটনাগুলিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এক চরম মুহূর্তের দিকে। এই মুহূর্তটি মহাভারতের যুদ্ধ রূপেও চিহ্নিত হতে পারত, কিন্তু এই যুদ্ধ তিনি ঘটাননি, যতখানি ঘটিয়েছেন মহাভারতের প্রতিনায়ক। যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব খণ্ডন করার জন্য আর বেশি যুক্তি আমার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর নায়কত্বের যুক্তিগুলি প্রায়ই তর্কাতীত নয়। আমরা বরং এ-বিষয়ে অর্জুনের কথাটা ভাবতে পারি, অবশ্য তারও আগে আমাকে দু-চারটে কথা বলে নিতে হবে।

অনুভূতিশীল পাঠকদের ধৈর্য শেষ হওয়ার আগেই আমি অর্জুনের চরিত্র-বিশ্লেষণে ফিরে আসব। শুধু তাঁকে বুঝবার জন্য আরও একটু স্থিরতা আমাদের প্রয়োজন। আমি এই মুহূর্তে আপনাদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে নিয়ে যাব। তবে যুদ্ধ এখনও আরম্ভ হয়নি। যুদ্ধ লাগবে। দুই পাশে দুই পক্ষের অজস্র সেনা সাজানো হয়েছে এবং অর্জুন তাঁর রথের সারথি কৃষ্ণকে বললেন—গোবিন্দ, এই দুই সেনাদলের মাঝখানে আমার রথটি নিয়ে রাখো। আমি একটু দেখে নিই—কার কার সঙ্গে আমাকে লড়তে হবে—কৈ র্ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ অস্মিন্ রণসমুদ্যমে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষের নিত্যপাঠ্য সেই ভগবদ্গীতার আরম্ভ এইখানেই। অর্জুন দেখলেন—শিশুকালে যাঁর কোলেপিঠে মানুষ হয়েছেন সেই কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। গোঁফদাড়ি পাকা, সাদা কাপড় পরা, সত্ত্বের প্রতিমূর্তি যেন। দাঁড়িয়ে আছেন দ্রোণাচার্য, যিনি পুত্রের স্নেহে হাত ধরে শর-সন্ধান শিখিয়েছেন অর্জুনকে। দাঁড়িয়ে আছেন আরও কত পিতৃকল্প মানুষ, অতি আপন জন—কেউ সম্পর্কে মামা, ভাই, শালা, শ্বশুর, অথবা ছেলের মতো। অর্জুন ভাবলেন—কী করে এই সমস্ত লোকের গায়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার অস্ত্র আমূল বসিয়ে দেব ? এ-যে অন্যায়, এ-যে একেবারেই মানুষের মতো নয়। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—আমার রাজ্য চাই না, ধন-সম্পদ চাই না, চাই না শত্রু জয় করতে। অতি আপন নিকটজনের গায়ে হাত তোলার থেকে, ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল। অর্জুন ধনুক-বাণ নামিয়ে রাখলেন। বললেন—আমি এই যুদ্ধ করব না—ন যোৎস্যে ইতি।

কৃষ্ণ দেখলেন—মহাবিপদ। প্রধানত অর্জুনের ভরসাতেই পাণ্ডবরা যুদ্ধ করতে নেমেছেন। এতকালের অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, না হয় অর্জুন যুদ্ধ নাই করলেন, কিন্তু যুদ্ধ তো তবু হবেই। রাজ্যের অংশ নিয়ে পাণ্ডব-কৌরবের গৃহবিবাদ, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা, আক্রোশ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব—এইসব কিছুরই চরম নিষ্পত্তি হতে চলেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। সেই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে অর্জুন শরাসন ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের জন্য মমতায় ব্যাকুল হলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের এই মমতা-মূঢ় মানসিক বিপর্যয় লক্ষ করে নানা উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। সকলেই জানেন—এই উপদেশের মধ্যে ভারতীয় আস্তিকদর্শনের সমস্ত মূল সূত্রগুলি এসে পড়েছে, যে কারণে গীতাকে উপনিষৎ বলা হয়। আমি কিন্তু আপাতত গীতার দার্শনিক তথ্যগুলি—কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—এ-সব কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী নই। আমার বক্তব্য অল্পই।

আমি শুধু আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভগবদ্গীতা ব্যক্ত করেছেন ভগবান-রূপে বর্ণিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং এই গীতা শোনানো হচ্ছে সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনকে। শোনানো হচ্ছে ধনুঃশর ত্যাগের জন্য নয়, গীতা শোনানো হচ্ছে—হৃদয়ের ক্লীব দুর্বলতা ত্যাগ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ধনুঃশর ধারণ করার জন্য—ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। হ্যাঁ গীতার মধ্যে মোক্ষজ্ঞানের উপদেশ আছে। যথেষ্টই আছে সাংখ্য-বেদান্তের চরম এবং পরম-তত্ত্বের সারকথা। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—পরম-তত্ত্বের এই ত্রিবিধ স্বরূপ এখানে মনুষ্য-জীবনের সাধ্য হিসেবে নিরূপিত। একেবারে শেষ অধ্যায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে ঈশ্বরে শরণাগতির শ্রেষ্ঠতা আমাদের হাজার হাজার বছর ধরে পরমা ভক্তির মাহাত্ম্য শিখিয়েছে। অথচ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই যে, এই সমস্ত মহান দার্শনিক উপদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার যিনি হতে পারতেন সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশগুলি দেওয়া হয়নি। উপদেশ দেওয়া হয়েছে অর্জুনকে।

এমন নয় যে, বয়োজ্যেষ্ঠ বলে যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ কোনও দিন কোনও উপদেশ দেননি। ছোট হওয়া সত্ত্বেও বহুবার তিনি ধর্মরাজকে বহু ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন এবং যুধিষ্ঠিরও বহুবার কৃষ্ণের বহুদর্শিতা তথা ধর্মবোধ নিয়ে চরম প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শরসন্ধান এবং প্রজাপালনের থেকেও ধর্মরাজ মোক্ষসন্ধান বেশি পছন্দ করতেন। মোক্ষধর্ম শ্রবণ করার জন্য যুধিষ্ঠির বারংবার মুনি-ঋষিদের কাছে উপনিষণ্ণ হয়েছেন। মুমুক্ষুত্ব এবং শমদমাদি সাধন সম্পদ, যা নাকি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রধান উপায়, তাতেও তাঁর একান্ত অধিকার ছিল। এই যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ করা হল না, করা হল অর্জুনকে। এমনও নয় যে, যুধিষ্ঠির গীতা শোনেননি। বামদেব গীতা, ঋষভ গীতা, হারীত গীতা—ইত্যাদি কত গীতাই তো তাঁর শান্তির জন্য উপদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভগবদ্গীতা নয়। গীতার মধ্যে যে জ্ঞান যোগ, ভক্তির কথা কতশতভাবে বলা হয়েছে—সে-সব দর্শন সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরেরই অনুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল। তিনি সত্ত্বের প্রতিমূর্তি, ধর্মের আধার। অথচ তাঁকে ভগবদ্গীতার উপদেশ দেননি কৃষ্ণ, দিয়েছেন অর্জুনকে। মনে মনে ভাবি—এর মধ্যে কি কোনও রহস্য আছে ? যদি থাকে, তা একটু হলেও বোঝা দরকার।

বলতে পারেন—অর্জুন কৃষ্ণের সখা, তাঁর জীবন-রথের সারথিও বটে। তাই হয়তো সময় বুঝে কৃষ্ণ সুহৃৎ-সম্মিত উপদেশ দিয়েছেন অর্জুনকে। কিন্তু না, ভগবদ্গীতার মধ্যে অর্জুনকে যতখানি সখার মতো কথা বলতে শুনেছি, তার থেকে অনেক বেশি দেখেছি শিষ্যের মতো, পদানত ভক্তের মতো। ভগবদ্গীতার আরম্ভে—অর্জুন সে-কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন যে, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে সেই উপদেশ কর যাতে আমার ভাল হয়—শিষ্যস্তে'হং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। এই মুখের কথাটি ছাড়াও বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুনকে আমরা কৃষ্ণের পায়ে সবিনয়ে লুটিয়ে পড়তেও দেখেছি—নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণম্, অথবা—তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং—অর্থাৎ একেবারে দণ্ডবৎ প্রণাম।

তাই বলছিলাম—এ তো সখা-বন্ধুর ব্যবহার নয়। একেবারে ভক্তের ওপর ভগবানের কৃপার মতো গীতার উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে অর্জুনের ওপর। আরও আশ্চর্য, অর্জুনের সাময়িক দুর্বলতার

সুযোগে অর্জুনের প্রাণপ্রিয় সখা কৃষ্ণও কেমন যেন গুরুর মতো উপদেশ দিচ্ছেন অর্জুনকে। বলছেন—আমি খুশি হয়ে তোমাকে আমার এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছি, নইলে তুমি ছাড়া আর কেউ আমার এমন রূপ দেখেনি—যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্। অথবা একেবারে গীতার শেষে কৃষ্ণ বলেছেন—তোমাকে সবচেয়ে গোপন তত্ত্বের কথা বলছি অর্জুন! তুমি আমার ভালবাসার লোক, তাই আবার সেই কথা বলছি, যাতে তোমার ভাল হয়। কিন্তু সেই হিতের কথাটি কী ? না, তুমি সব ত্যাগ করে আমার শরণ নাও। তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্তি দেব আমি—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ।

ভালবাসার লোকের কাছে এ কেমন কথা! সব ত্যাগ করে আমার শরণ নাও—এ তো বন্ধুর কাছে বন্ধুর কথা নয়! আসলে আমার যুক্তি দিয়ে আমি যেটা বলতে চাই, তা হল—বন্ধুত্ব অসম হলেও উন্নততর মননের অধিকারী নিকৃষ্টতর ব্যক্তির কাছেও নিজের অনুভূত তত্ত্বজ্ঞান ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু অর্জুনের ক্ষেত্রে কি তাই ঘটেছে ? তিনি কি গীতার মতো তত্ত্ব উপদেশের যোগ্য নন ? আমার মতে শুধুমাত্র কৃপাপরবশ হয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ করেননি। অর্জুনের মধ্যে সেই অসাধারণ বীজ ছিল যাতে গীতার উপদেশ করা যায়। আমি এক-কথায় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি না। যদি সেই চেষ্টা থাকত তা হলে প্রথমেই বলতাম—পাণ্ডবভাইদের মধ্যে যুধিষ্ঠির-ভীম কি নকুল-সহদেবের থেকে অর্জুনকে বেশি যোগ্য মনে করেন বলেই কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ করছেন। এ-কথার যুক্তিও আছে। কারণ, গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ প্রকাশ করার সময় এক একটি বিশিষ্ট জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে কৃষ্ণ নিজের একাত্মতা স্থাপন করছিলেন। বলছিলেন—গাছের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, পাহাড়ের মধ্যে আমি হিমালয়, পশুর মধ্যে আমি সিংহ, ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত। এইরকম আরও শত শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। (যাঁরা নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন, তাঁরা লক্ষ করবেন—কবি একান্ত দ্রোহসূচক ব্যক্তি বা বস্তুকেই আপন একাত্মতার জন্য বেছে নিয়েছেন। স্পষ্টতই গীতার বিভূতিযোগ নজরুলের মনে একভাবে কাজ করেছে।)

আমি শুধু বোঝানোর জন্য নজরুলের কথা তুললাম। কিন্তু এইরকম এক একটা জাতি বা বস্তুর শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণার সময় কৃষ্ণ বলেছিলেন—পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় অর্জুন—পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। আমি এক-কথায় বলতে পারতাম—কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন বলেই গীতার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমি তা বলব না। আমার বক্তব্য—অর্জুনকে তিনি নানা কারণে শ্রেষ্ঠ, এমনকী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের থেকেও শ্রেষ্ঠতর মনে করেছেন বলেই গীতার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কী সেই কারণগুলি যাতে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আসে ?

পাঠকের কাছে দুঃখের কারণ হবে কি না জানি না, কিন্তু এর উত্তরও খুঁজতে হবে ভগবদ্‌গীতার মধ্যেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এই মুহূর্তে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি অথবা ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রকৃতি-পুরুষ—এত সব গম্ভীর আলোচনার মধ্যে যাব না। আমার বক্তব্য অতি সামান্য। গীতা আরম্ভের মোদ্দা কথা হল, অর্জুন যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আত্মীয়স্বজন দেখে মমতায় ভেঙে পড়েছেন। আর 'ভগবান রূপে' চিহ্নিত মানুষটি তাঁকে তাৎক্ষণিক কর্তব্য উপদেশ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করছেন। তাঁর উপদেশের প্রধান তাৎপর্য হল মানুষকে আপন কর্মে প্রবৃত্ত করা। তবে হ্যাঁ, এই কর্মের একটা দার্শনিক তাৎপর্যও আছে। অর্থাৎ কাজটা করতে হবে বটে, তবে তাতে লিপ্ত হওয়া চলবে না। খুব সোজা করে বলতে গেলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—যেমন সংসারের নিয়ম অনুসারে তুমি বিয়ে করতে পারো বটে, কিন্তু তাই বলে তুমি রমণীর রমণীয় গুণে মুগ্ধ হয়ে ভোগে লিপ্ত হবে না। সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ করা তোমার কর্তব্য বটে, কিন্তু স্নেহে মমতায় তুমি যেন অন্ধ হয়ে যেয়ো না। এইরকম আরও কতই না উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নির্লিপ্তির সবচেয়ে বড় উদাহরণ দিয়েছেন বোধহয় রামকৃষ্ণদেব—তুমি পাঁকাল মাছের মতো থাকো।

বলতে পারেন—এ বড় 'প্যারাডক্সিক্যাল' কথাবার্তা। কিন্তু আমাদের দার্শনিক-মন এই 'প্যারাডক্স'

বুঝতে সাহায্য করে। বস্তুত এই নিষ্কাম কর্মের পরিণতিই হল বিশুদ্ধ জ্ঞান, যোগ, ভক্তি। সব কিছুর মূল ভিত্তি ওই নিষ্কাম কর্ম। আমি আর কোনও কঠিন কথার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—এত সব বিশিষ্ট দার্শনিক উপদেশের শেষেও একেবারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে গীতার শিক্ষককে বলতে হচ্ছে—যিনি সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং নিস্পৃহ তিনিই কাজটা করতে পারেন কর্মফলের আশা না করে—অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। বস্তুত অনাসক্ত হয়ে আপন কাজটি করার কথাটাই ভগবদ্‌গীতার মূল সুর, যে সুর জ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ—ইত্যাদি বিভিন্ন কূট দার্শনিক-তত্ত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝেই আমাদের সচেতন করে বলেছে—তুমি শুধু কাজটাই করতে পারো, কাজের ফলে তোমার যেন আঠা না থাকে। অর্থাৎ সংসারের শত কর্মে আবৃত থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে আলাদা করে রাখা—এই অসংসৃষ্ট নির্লিপ্ত ভাবটিই গীতার মুখ্য উপদেশ—অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র।

অর্জুনের প্রতি গীতার শিক্ষকের এই উপদেশের নিরিখে আমি খুব জোর দিয়ে বলতে চাই যে, অর্জুনের আপন স্বভাবের মধ্যেই গীতার এই নির্লিপ্তবুদ্ধির বীজ ছিল। হয়তো সেইজন্যই গীতার উপদেশের পূর্বাহ্নেই তিনি এই উপদেশের একমাত্র উপযুক্ত আধার বিবেচিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, বিরাট রণক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের সামনে অর্জুনের বুদ্ধি বিচলিত হয়েছিল বটে এবং হ্যাঁ, এইরকম বিচলন তাঁর জীবনে আরও কয়েকবার ঘটেছে। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, অর্জুনের স্বভাব নির্লিপ্ততার বিরোধী ছিল। অন্তত দার্শনিকভাবে যে নির্লিপ্ততার কথা আমরা বলেছি, মনুষ্যজীবনের নানান সংবেদনশীলতায় অর্জুন হয়তো সেখানে প্রাথমিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এই দুর্বলতাও তো মানুষের ধর্মে, সমাজের ধর্মে একান্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু। মায়া, মোহ, মমতা, স্নেহ এমনকী চরম শত্রুতাও বড় মানুষকে একান্ত মনুষ্যোচিতভাবেই বিচলিত করে। কিন্তু এই বিচলন-যুক্তির সিদ্ধিতে কাটিয়ে উঠে যিনি দার্শনিকের বিচারে নিজেকে আস্তে আস্তে ঘটনার পরম্পরা থেকে মুক্ত করতে পারেন, তিনি অর্জুন। জীবনের ধর্ম এবং দার্শনিকের নির্লিপ্ততা অর্জুনের জীবনে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাঁর দার্শনিক-সত্তাটি খুঁজে বার করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাঙ্‌মুহূর্তে যে ঘটনাটা ঘটল—অর্থাৎ অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছেন না—এই ঘটনাটাই আরেকবার ধরুন না।

আত্মীয়স্বজনকে সামনে দেখে তিনি যে ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন, এর মধ্যেও আমার মতে এক চরম নিরাসক্তি আছে। আপনারা ভাবুন, অন্যের তরফ থেকে কত সামান্য বিদ্বেষ, কত সামান্য শত্রুতাও আমরা কত দিন মনে রাখি। অথচ সারা জীবন বঞ্চিত হয়ে—তাও কি অর্জুনের মতো মহাবীর, যিনি ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু স্বেচ্ছায় সংগ্রহ করতে পারতেন—সেই অর্জুন সমস্ত জীবন ধরে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দুর্যোধনের দ্বারা চরম-শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হলেন। শত্রুতার লিপ্তি বন্ধুত্বের চেয়ে হাজার গুণ বেশি, যে কারণে নিরবচ্ছিন্ন শত্রু-ভাবনায় ভগবানকে পর্যন্ত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। আর কে না জানে—জীবনের শত্রুকে হাতের সামনে পেয়ে তাকে চরম তৎপরতায় আঘাত হানাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে অর্জুন কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের পথে চললেন না। তিনি শত্রুর প্রতি কৃপাবিষ্ট হলেন, তাঁর চোখে জল এল, মন হয়ে উঠল উদাসীন—এই রাজ্য, এই সুখ, এই জীবন নিয়ে আমি কী করব ? যাদের জন্য বাঁচা, তাঁরা সবাই তো মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে—কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ, কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।

আমার জিজ্ঞাসা—দুর্যোধন এবং দুর্যোধনপক্ষের প্রতি পাণ্ডবপক্ষের জ্ঞাতি-শত্রুতার নিরিখে অর্জুনের এই ভাবটাও কি চরম নির্লিপ্ততা নয় ? শত্রুকে সামনে পেয়েও এই যে উদাসীন আচরণ করছেন অর্জুন—একে দুর্বলতা অথবা মায়া-মমতা না বলে অনাসক্তি বলাই ভাল। পরবর্তীকালে অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরে যে চরম নিরাসক্তির উপদেশ দেওয়া হবে, যুদ্ধকালীন প্রত্যাঘাতের পূর্ব-মুহূর্তে সেই নিরাসক্তি অদ্ভুতভাবে অর্জুনের মধ্যে ফুটে উঠেছে বলেই গীতার কথকঠাকুর তাঁকে গীতার দার্শনিক-তত্ত্ব শ্রবণের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বলে মনে করেছেন। হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে আমরা যাকে অর্জুনের দুর্বলতা বা মমতা বলছি, আমাদের সাধারণ মন্দবুদ্ধি প্রসন্ন করার জন্য গীতার শিক্ষকও

তাকে ক্লীবত্ব বা হৃদয়ের দুর্বলতাই বলেছেন। কিন্তু অর্জুনের সামগ্রিক জীবনের বিভিন্ন বিষম-পরিস্থিতিগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বাহ্ণে অর্জুন কৃষ্ণের কাছে গীতোক্ত ধর্ম শ্রবণের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আধার বলে বিবেচিত হয়েছেন। সেদিন ওই চরম মুহূর্তে অর্জুনের কাছে জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ—এই দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুগুলির সমতা সম্পন্ন হয়েছিল বলেই কৃষ্ণ তাঁকে ফলের ভাবনা না করে আপন ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশ দিতে পেরেছিলেন।

বেদান্তসূত্রের টীকাকার লিখেছেন—যে বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই অথবা যে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান আছে, সেখানে জিজ্ঞাসা হয় না। জিজ্ঞাসা তখনই হয়, যখন বিষয় সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ধারণা নেই—কিঞ্চিদ্ জ্ঞাতে, কিঞ্চিদজ্ঞাতে জিজ্ঞাসা ভবতি। অর্জুন যে মুহূর্তে ধনুক-বাণ ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণকে বললেন—আপনি আমাকে শিক্ষা দিন, যাতে আমার ভাল হয়—সেই মুহূর্তেই আমরা জানি গীতোক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই অর্জুনের কিছু জ্ঞান আছে অর্থাৎ তাঁর অধিকার আছে, এখন সম্পূর্ণটা জানার অপেক্ষা।

দেখুন, গীতোক্ত ধর্মের অধিকারী নিয়ে দার্শনিক আলোচনার অবসর আর নেই। আমি এতক্ষণ এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি শুধু একটি কারণে। যাঁরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধ এবং মোক্ষলিপ্সার মাহাত্ম্য মাথায় রেখে মহাভারতের নায়ক অনুসন্ধান করেন, আমি কেবল তাঁদের জানাতে চাই যে, সেটা একমাত্র যুধিষ্ঠিরের কোনও অসামান্য গুণ নয়। বরঞ্চ তাঁর থেকে অনেক বেশি দার্শনিকতা অর্জুনের মধ্যে আছে। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় এইসব ক্ষেত্রে যে সমতাবোধ দার্শনিকের বোধ তৃপ্ত করে, সাধারণ ভাষায় তাকে একভাবে বলা যায় 'ব্যালান্স'। অর্জুনের জীবনে প্রায় প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি বিষয়ে 'ব্যালান্স' জিনিসটা এত বেশি যে, তা অনায়াসে যুধিষ্ঠিরকেও ছাপিয়ে যাবে।

ধর্ম, ধর্ম এবং ধর্ম—এই ধর্মের মাত্রা যে যুধিষ্ঠিরকে প্রতি-মুহূর্তে সোচ্চারভাবে উচ্চকিত করে রেখেছে, সেই ধর্ম অর্জুনের অন্তরেও কম ক্রিয়া করে না, যদিও এ-বিষয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং ভাষণ অল্প। ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলেছিলেন—ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের ভাবনার মধ্যে যেন সমতা থাকে। এর যে কোনও একটা নিয়ে যে বেশি মাথা ঘামায় সে ব্যক্তি জঘন্য—ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ, যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ। আমি যুধিষ্ঠির মহারাজকে জঘন্য বলছি না, এমনকী ধর্মশাস্ত্রের ধর্ম এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধের তফাত আছে, কিন্তু এই মহামানবের মধ্যে ধর্মানুসন্ধানের মাত্রা হয়তো এতটাই অতিরিক্ত, যা আমার মতে তাঁর নায়কত্ব-পদবীর প্রতিবন্ধক হতে পারে। কিন্তু অর্জুনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখুন—তার মধ্যে তাঁর বীরত্ব ছাড়া মাত্রাতিরিক্ত কিছুই নেই, যা তাঁকে কখনও অব্যবস্থিত করেছে। আনন্দ, দুঃখ, ক্রোধ, ঘৃণা—কোনওটাই তাঁর এমন অতিরিক্ত নয়, যা সশব্দে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বস্তুত এই অতিরিক্ততার অভাবই তাঁকে যেমন আমার কাছে মহাভারতের ধীরোদাত্ত নায়কটি করে তুলেছে, অপরদিকে এই অতিরিক্ততার অভাবই অর্জুন-চরিত্রকে দার্শনিক দিক থেকে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মযোগের সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র করে তুলেছে। সম্ভবত এই কারণেই অর্থাৎ অর্জুনের এই 'ব্যালান্সড' স্বভাবের জন্যই ভগবদ্গীতার শিক্ষক পর্যন্ত তাঁর শ্রোতা-শিষ্যের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে বলেন—পাণ্ডবভাইদের মধ্যে আমি অর্জুন—পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। এবারে আসুন, আমরা আবার আমাদের পূর্ব প্রস্তাবে ফিরে যাই, কারণ অতি অল্পবয়স থেকেই আমরা অর্জুনের মধ্যে সেই সুনিয়ন্ত্রিত আচরণ দেখতে পাব, যা পরিণতিতে একজনকে নায়ক করে তোলে।

আমরা সেই জায়গা থেকে প্রসঙ্গ বদলেছি, যেখানে দক্ষিণাকামী গুরুর আদেশে অর্জুন পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে আনলেন। লক্ষ করে দেখবেন—দ্রোণাচার্যের আদেশের মধ্যে যথেষ্ট জোর ছিল, এবং কৌরব-পাণ্ডব ভাইরা সকলেই প্রবল উন্মাদনায় দ্রুপদের রাজ্য পর্যুদস্ত করতে বেরিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধে কৌরব-কুমারেরা এবং কর্ণ পালিয়ে বাঁচলেন বটে,কিন্তু অর্জুনের বিজয় লাভের পর আবার তাঁরা বিজয়ীর সম্মান আত্মসাৎ করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। কারণ অর্জুন দ্রুপদের রথের সারথি এবং ঘোড়াগুলিকে বিদ্ধ করে যেই-না দ্রুপদকে ধরে ফেলেছেন তখনই আমরা সমস্ত কুমারদের আবার যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হতে দেখছি। কারণ তাঁরা সবাই একসাথ হয়ে—কুমারাঃ সহিতা স্তদা—অন্যকৃত যুদ্ধজয়ের আনন্দে দ্রুপদের রাজধানী একেবারে উথাল-পাথাল করে তুললেন।

ব্যাপারটা অর্জুনের কাছে মোটেই ভাল লাগল না। এই যুদ্ধজয়ের মুহূর্তেও সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ আছে। অতএব ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর ভঙ্গিতে অর্জুন ভীমকে উদ্দেশ করে বললেন—আর্য ভীম! এখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে মহারাজ দ্রুপদ অন্যতম। তা ছাড়া কৌরবকুলের সম্বন্ধে তিনি আমাদের আত্মীয়। অতএব শুধু শুধু দ্রুপদের সৈন্য ধ্বংস করবেন না। আপনারা গুরুদক্ষিণা দিন—গুরুদানং প্রদীয়তাম্।

এই যে গুরুগম্ভীর স্বরে আদেশের মতো একটি মাত্র বাক্য নির্গত হল অর্জুনের মুখ দিয়ে—এর মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব, এর মধ্যেই তাঁর যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ এবং এর মধ্যেই অনাসক্তভাবে কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করার অভ্যাসটি কিন্তু লক্ষ করার মতো। পাঞ্চাল-দ্রুপদের সঙ্গে কৌরবদের বংশগত সম্বন্ধ খুব দূরগত নয়। বস্তুত কয়েক পুরুষ আগে একই পিতৃপুরুষ থেকে কৌরব এবং পাঞ্চালদের জন্ম হয়েছে। বর্তমান লেখক এ সব আলোচনা 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ-গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে করেছে। কিন্তু কথাটা হল—এই যুদ্ধজয়ের উন্মাদনার মধ্যেও অর্জুনের সে-কথা স্মরণ আছে। 'দ্রুপদ কুরুবীরদের আত্মীয়—সম্বন্ধী কুরুবীরাণাম্'—এখানে কৌরবদের কথা উল্লেখ করে অর্জুন প্রকারান্তরে কৌরব-কুমারদের তিরস্কার করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ঘটনার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এতখানি যে, প্রায় একার কৃতিত্বে এই যুদ্ধ জয় করেও তিনি ভীমকে বলছেন—আপনারা গুরুদক্ষিণা দিন। অর্থাৎ ওই কাজটার সঙ্গেই দ্রুপদ-জয়ের সম্পর্ক, তার বেশি কিছু নয়। তাঁর ভাবটা হল—দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে আনার প্রয়োজন ছিল। সেই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ এবং সৈন্যক্ষয়ের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, অতএব ফিরে চলুন। ব্যাস লিখেছেন—অর্জুন বারণ করলে ভীম যুদ্ধে তৃপ্তি লাভ না করেই শান্ত হতে বাধ্য হলেন—অতৃপ্তঃ যুদ্ধধর্মেষু। এর মানে হল—ভীম যুদ্ধের উন্মাদনায়, জয়ের আনন্দে সংপৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে অর্জুনের বাধায় তিনি অতৃপ্ত রয়ে গেলেন। এখানে শুধু ভীমের প্রতিতুলনায় দেখানো হল যে, অর্জুন কিন্তু গুরুদক্ষিণার মতো কর্তব্য কর্মের ব্যবস্থা হওয়া মাত্রেই তৃপ্ত। এই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আর কোনও কারণ নেই তাঁর। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ-কালে ভারতযুদ্ধের নায়ক হবেন, যিনি ভবিষ্যৎ-কালে ভগবত্তার লক্ষণে ভূষিত কৃষ্ণ ভগবানের কাছ থেকে উপনিষৎসার গীতা শুনবেন, তিনি যে জীবনের প্রথম এবং প্রকাশ্য যুদ্ধেই তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত আত্মশক্তি এবং নির্লিপ্ত কর্মাভ্যাসের পরিচয় দেবেন—তাতে সন্দেহ কী?

নির্লিপ্ততার এই আরম্ভ এবং এই নির্লিপ্ততাই অর্জুনের সমস্ত কর্ম, ধর্ম, এমনকী বীরত্ব এবং প্রেমকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমরা একে একে সে-সব কথায় আসছি। এই মুহূর্তে যে মানুষটি দ্রুপদ রাজার সারথি, রথ—সব ধ্বংস করে দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে ফেললেন, সেই মানুষটির মুখেই শত্রুর সম্বন্ধে যে সম্ভ্রমবাণী শোনা গেল—তা আমরা যতখানি খেয়াল করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি খেয়াল করেছিলেন স্বয়ং মহারাজ দ্রুপদ। সেই মুহূর্তে অর্জুনের বাহুবন্দি অবস্থায় দ্রুপদ বুঝেছিলেন—এ কোনও সাধারণ যোদ্ধার কাজ নয়। পরাজিত অবস্থাতেও তিনি বুঝলেন—অর্জুন

তাঁর ব্যক্তিগত কোনও শত্রু নন, তিনি দ্রোণাচার্যের প্রতিহিংসার নিমিত্তমাত্র। নানা কারণে অর্জুন ছেলেটিকে তিনি মনে রেখে দিলেন।

দ্রুপদের পরাজয়ের পর, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনটি বড় ঘটনা ঘটল। প্রথমত দ্রুপদ-শাসনের ঠিক এক বছরের মধ্যেই হস্তিনাপুরের অস্থায়ী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হলেন। এই অভিষেকের পর আমরা দেখছি—অর্জুন একটার পর একটা রাজ্য জয় করে বিপুল ধনসম্পত্তি নিয়ে এসেছেন হস্তিনাপুরে। বীরত্বের দিক দিয়েও এই জয়ের মূল্য কম নয়। কারণ হস্তিনাপুরের পূর্বতন রাজা পাণ্ডু পর্যন্ত যাঁদের বশে আনতে পারেননি, তাঁদের অনায়াসে আয়ত্ত করে নিলেন অর্জুন। প্রধানত অর্জুনের ক্ষমতাতেই সমস্ত পাণ্ডব-ভাইদের শক্তি এত বিখ্যাত হয়ে পড়ল—ততো বলম্ অতিখ্যাতম্—যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ওপর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের কাছে অপমানিত হয়ে উপযুক্ত পুত্রলাভের ইচ্ছায় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞবেদি থেকে উৎপন্ন হলেন কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, যিনি ভবিষ্যতে দ্রোণবধের জন্য চিহ্নিত হলেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নর জন্ম থেকেও যে ঘটনার মূল্য অনেক বেশি, তা হল—দ্রৌপদীর জন্ম। দ্রৌপদীর আবির্ভাবে যজ্ঞবেদির অলৌকিকতা থাকায় তিনি সম্পূর্ণ যৌবনবতী, অসামান্যা সুন্দরী হয়েই জন্মালেন। তাঁর জন্মলগ্নে দৈববাণী হল—তিনি কৌরবকুলের ভয়ের কারণ হবেন—অস্যা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্। এই আকাশবাণী শুনে পাঞ্চালরা সিংহের মতো কোলাহল করল। বোঝা যায়—কৌরবদের হাতে দ্রুপদের অপমানের স্মৃতি পাঞ্চালদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ জাগরূক আছে এবং দ্রোণ যেহেতু কৌরবদের আশ্রয় করেই রয়েছেন, তাই কৌরবকুল ধ্বংসের দৈববাণী পাঞ্চালদের আশ্বস্ত করল।

তৃতীয় ঘটনা—ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষায় এবং দুর্যোধনের আগ্রাসী রাজনীতিতে পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়া। বারণাবতে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্য বহুতর দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন-ঘর তৈরি হল। অবশ্য বিদুরের পরামর্শে এবং পাণ্ডবদের বুদ্ধিতে দুর্যোধনের চক্রান্ত ব্যর্থ হল। পাণ্ডবরা তখন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বেশে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একসময় পাঞ্চাল রাজ্যে যাওয়ার কথা ভাবলেন। প্রস্তাবটা অবশ্য এসেছিল কুন্তীর কাছ থেকে। যুধিষ্ঠির মায়ের কথা শুনে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন পাঞ্চালদেশে। সেখানে নাকি ভাল ভিক্ষে মিলবে। জায়গাটাও নাকি সুন্দর।

যাওয়ার পথে অর্জুনকে একটু বিক্রম-প্রকাশ করতে হল। সন্ধ্যার পর প্রথম রাত্রির আরম্ভে পাণ্ডবরা গঙ্গার পারে এসে পৌঁছলেন। একে রাত্রি, তাতে জায়গাটা নির্জন। অর্জুন একটা মশাল জ্বালিয়ে সবার আগে আগে গঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে এক গন্ধর্ব গঙ্গার মনোরম নির্জনতার সুযোগ পেয়ে মেয়েদের নিয়ে জলবিহার করছিল। অর্জুনের মশাল আর পাণ্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে সে গন্ধর্ব ভারী রেগে গেল। গন্ধর্বরা পুরোপুরি দেবতা নয় বটে, তবে ক্ষমতায় আর শক্তিতে আধা-দেবতা। সে রেগেমেগে অর্জুনের ওপর দু-একটা কড়া কড়া বাণ ছুঁড়তেই অর্জুন তাকে সাবধান করে দিলেন। কিন্তু তাতে যখন কোনও কাজ হল না, তখন দ্রোণের কাছ থেকে পাওয়া এক আগুন-ছড়ানো বাণে গন্ধর্বকে প্রায় অজ্ঞান করে ফেললেন। শেষে গন্ধর্বের বউ কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের হাতে-পায়ে ধরে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে থামতে বললেন এবং অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশ মান্য করলেন। এর ফল হয়েছিল অসাধারণ। এই গন্ধর্বের সঙ্গে অর্জুনের চিরকালের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, যে বন্ধুত্বের প্রতিদান অর্জুন এবং পাণ্ডবরা সমবেতভাবে ভোগ করবেন।

পাণ্ডবরা পাঞ্চালরাজ্যে এসে কুমোরপাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। ওদিকে ছদ্মবেশ ঠিক রাখার জন্য ব্রহ্মচারীর বেদপাঠ, ভিক্ষাবৃত্তি—সব ঠিকঠাক চলতে থাকল। পাঞ্চালে আসবার আগে এবং পরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ঘোষণা পাণ্ডবরা বহুবার শুনেছেন। কাজেই সেখানে যাবার লোভ তাঁদের ছিলই। তা ছাড়া অর্জুনকে লুকোনো যাচ্ছিল না। রাজসভায় যাবার আগে ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মচারী-বেশ পাণ্ডবদের দেখে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—যা সুন্দর চেহারা আপনাদের। আপনাদের

একজনকে দ্রৌপদী বর হিসেবেও পছন্দ করতে পারেন। তা ছাড়া, এই ভাইটি তো আপনার যেমন দেখতে, তেমনি শক্তপোক্ত এর হাত-জোড়া। আপনি একবার বললে ধনসম্পত্তি অনেক কিছুই জিতে আনতে পারে। যুধিষ্ঠির আর কী বলবেন ? বললেন—চলুন আমরাও যাচ্ছি।

দ্রুপদ যেদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের ক্ষমতা দেখেছিলেন, সেদিন তাঁর মেয়ে ছিল না। কিন্তু আজ যখন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, অভিরূপ পাত্রের হাতে কন্যা-সম্প্রদান করতে হবে, তখন সেই পরাক্রমশালী ছেলেটির কথা তাঁর মনে পড়ছে। সমস্ত কৌরব-রাজপুত্রদের মধ্যে সেই একক বীর, অথচ একান্ত বিস্মৃতির যোগ্য মুহূর্তেও যাঁর সম্মানবোধ অব্যাহত আছে, আজ মেয়ের বিয়ের আগে তাঁর কথা বারবার মনে পড়ছে দ্রুপদের। বলা বাহুল্য—বারণাবতে পাণ্ডবদের মৃত্যু-রটনা দ্রুপদ বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস করেননি—অর্জুনের শক্তির নিরিখেই। তাঁর দৃঢ় ধারণা—অর্জুনের মতো শক্তিধরকে পুড়িয়ে মারা সম্ভব নয়। অর্জুন এবং তাঁর মা-ভাইরা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের খবর কানে গেলেই অর্জুন চলে আসবেন স্বয়ম্বর-সভায়।

এত কথা মাথায় রেখেই দ্রুপদ লক্ষ্যভেদের ধনুকটি বিশেষভাবে তৈরি করালেন, যাতে অর্জুনের মতো মহাবীর ছাড়া অন্য কেউ সে ধনুক নোয়াতেই না পারে। তৈরি করালেন—শূন্যমার্গে রাখা সেই মৎস্য-চক্ষুর যন্ত্র, যাতে অন্য কেউ নীচে জলের দিকে তাকিয়ে ওপরে সেই মৎস্যচক্ষুতে বাণ ছোঁয়াতেই না পারে। মহাভারতের কবি আগেভাগেই আমাদের জানিয়েছেন যে, দ্রুপদের ভারী ইচ্ছে ছিল যাতে কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে অর্জুনের হাতে তুলে দেওয়া যায়, অথচ এ-কথা তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি। কারণ তাতে স্বয়ম্বরসভার রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু স্বয়ম্বরে আসবেন এমন রাজা এবং তদানীন্তন রাজপুত্রদের বলাবল মাথায় রেখে দ্রুপদ মেয়ের বিয়ের জন্য এমন কঠিন একটা শর্ত স্থির করলেন, যাতে অর্জুন ছাড়া আর কেউ তার ধারে কাছে না যেতে পারে। কারণ তাঁর একমাত্র অভিলাষ—পুরুষপ্রবীর অর্জুনের হাতে সুন্দরী কৃষ্ণাকে তুলে দেওয়া। দ্রোণাচার্যের হাতে অপমান এবং কৃষ্ণার মতো সুন্দরী মেয়ে পাবার পর থেকেই দ্রুপদ শুধু অর্জুনকে খুঁজে যাচ্ছেন—সোঽন্বেষমানঃ কৌন্তেয়ম্। সব সময় ভাবছেন—মেয়েটিকে তাঁর হাতে তুলে দেব—কৃষ্ণাং দদ্যামিতি সদা।

সব-সময় তিনি এই কথা ভাবছেন, অথচ মহাভারত বলছে—দ্রুপদ তাঁর ভাবনা কোথাও প্রকাশ করেননি—এটা কতটা সম্ভব ? হয়তো বাইরে এ-কথাটা কাউকে বলেননি দ্রুপদ, কারণ তাতে স্বয়ম্বরের নীতি-যুক্তি পালিত হত না। কিন্তু ভিতরবাড়িতে নিজের মেয়েটির কাছেও কি তিনি কখনও অর্জুনের কথা বলেননি। পিতৃহৃদয়ের অন্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস কি এত সহজে চেপে রাখা যায়, বিশেষত তিনি নিজেই যেখানে অর্জুনের কথা ভেবেই স্বয়ম্বরের শর্ত ঠিক করেছেন। মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে কিছু না বললেও আমাদের বিশ্বাস—দ্রৌপদী পিতার ইচ্ছার কথা জানতেন এবং জানতেন বলেই কি সামান্য, অথবা সত্যিই অসামান্য অজুহাতে তিনি কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেন ! কর্ণ তো দেখতে খারাপ ছিলেন না, দ্রুপদের শর্ত-মতো তিনি তো প্রায় লক্ষ্যভেদ করেই ফেলেছিলেন। খোদ পাণ্ডবরাও কর্ণকে দেখে বুঝে গিয়েছিলেন যে, লক্ষ্যভেদ বুঝি হয়েই গেল, সুন্দরী কৃষ্ণাকে এ-জীবনে আরও পাওয়া হল না। কিন্তু এত বড় যোদ্ধাকেও যে কৌলীন্যের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করলেন দ্রৌপদী, তাতে আমাদের ধারণা হয়—পিতার মনের কথা তিনি জানতেন।

অনেকেই বলেন যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-সভায় এসে দ্রৌপদীর কাছে সমস্ত রাজাদের পরিচয় দেবার পর ঘোষণা করেছিলেন—কল্যাণী ! এই রাজারা তোমার জন্য লক্ষ্যভেদ করতে আরম্ভ করবেন, এঁদের মধ্যে যিনি এই লক্ষ্যভেদ করবেন, তুমি তাঁকে বরণ করবে—বরয়েথাঃ শুভে'দ্য 'তম্।

এই প্রতিজ্ঞাত বচনের অন্যথা ঘটেছিল কর্ণের প্রত্যাখ্যানে, সে কালেই বৈবাহিক প্রথা এবং স্বয়ম্বর-সভার রীতিনীতিতে যে প্রত্যাখ্যান অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমরা যদি স্বীকার করি যে, দ্রৌপদী অর্জুনের কথা, পিতার মনের কথা জানতেন, তা হলে ওই প্রত্যাখ্যান অপ্রত্যাশিত হলেও সযৌক্তিক হয়ে ওঠে। মহাভারতের কবি অবশ্যই পরিষ্কারভাবে জানাননি যে, দ্রৌপদী পিতার হৃদয়লীন মর্মকথা জানতেন অথবা তিনি অপেক্ষা করেছিলেন, অর্জুন লক্ষ্যভেদ

করতে আসবেন বলে। না, কবি এসব কথা পরিষ্কার করে বলেননি। কিন্তু দ্রৌপদী বিদগ্ধা রমণী বটে, তাঁর ব্যক্তিত্বও অত্যন্ত গভীর। সেই নিরিখে প্রথম দর্শনেই লক্ষ্যভেত্তা অপরিচিত পুরুষটির প্রতি তাঁর যে আপ্যায়ন প্রকাশ, মানসিকভাবে তাঁর যেমন তদ্‌গত সম্মোহন ঘটেছে, তাতে অনুমান করি—দ্রৌপদী বুঝেছিলেন—তিনি অর্জুন। যাঁর জন্য তিনি কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যাঁর জন্য তিনি এতক্ষণ স্বয়ম্বরের মালা হাতে অপেক্ষার অন্তভূমিতে দাঁড়িয়ে ভেবেছেন—সে আসিবে আমার মন বলে। পিতার মুখে যদি তিনি অর্জুনের কীর্তিকথা একটুও না শুনতেন, অর্জুন সম্বন্ধে এবং পিতার ইচ্ছে সম্বন্ধে তাঁর যদি পূর্বাহ্নেই কোনও ধারণা না থাকত, তা হলে একদিকে যেমন কর্ণপ্রত্যাখ্যান সযৌক্তিক হয় না, অন্যদিকে লক্ষ্যভেদের পর লক্ষ্যভেত্তা পুরুষের প্রতি বিদগ্ধা তথা ব্যক্তিত্বময়ী দ্রৌপদীর আপাত বিগলন তেমনই মানায় না।

আকাশযন্ত্রে মাছের চোখে যেই অর্জুনের বাণের ছোঁয়া লাগল, অমনই হাজারটা লোক আবার দ্রৌপদীর দিকে তাকাল। তাঁর চোখে সীমাহীন বিস্ময়; মনে হল এ যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র, রাজার রাজা। লোকেরা দেখল—লক্ষ্যভেত্তা পুরুষের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্রৌপদী যেন না হেসেও হাসছেন, এ যেন নিত্য নবায়মান অন্য কোনও দ্রৌপদী—নবেব নিত্যং/বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা। স্বয়ম্বর-সভার এই অন্তিম পর্বে দ্রৌপদীর মুখে যখন কুমারীজীবনের শেষ হাসিটি স্ফুরিত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে মহাভারতের অনেকগুলি সংস্করণ দ্রৌপদীর হাতে-রাখা বরমাল্যখানি অর্জুনের বিশাল বক্ষে দুলিয়ে দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সভাস্থলে এতক্ষণ যিনি লক্ষ্যভেদ না হওয়ার সমস্ত আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সেই রমণী—তিনি যত বিদগ্ধাই হন না কেন—তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতঙ্ক হৃৎকম্পগুলি লক্ষ্যভেদের মুহূর্তে নিশ্চয়ই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। সেই কুমারী-হৃদয় নিশ্চয়ই উদ্বেল হয়ে উঠেছিল অন্য কোনও মধুর গভীর অনুভূতিতে। মহাভারতের আরও কিছু সংস্করণ দ্রৌপদীর এই সানন্দ আপ্লুতির জন্য গোটা তিনেক শ্লোক বেশি খরচ করেছে এবং তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় দ্রৌপদী অর্জুনকে পিতার মুখে চিহ্নিত অর্জুন বলেই চিনেছিলেন। নইলে যতই লক্ষ্যভেদ হোক অপরিচিত পুরুষের প্রতি দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীর এই ভাব সাজে না। দ্রৌপদী কথা বলছিলেন না, কিন্তু চোখের চাহনিতেই কী যেন বলতে চাইছিলেন। বিলাসিনী রাজকুমারীর পক্ষে স্বাভাবিক হলেও তিনি মদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করেননি, অথচ হাবে-ভাবে আপ্লুতিতে তিনি যেন মদস্খলিতা রমণীর মতো নুয়ে নুয়ে পড়ছিলেন—মদাদৃতেপি স্খলতীব ভাবৈঃ। তারপর আর কী ? সাদা বরমাল্যখানি হাতে নিয়ে প্রাপ্তির গৌরবে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত রাজমণ্ডলীর মধ্যপথ দিয়ে হেঁটে গেলেন দ্রৌপদী। আর প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ার মতো মধুর হাসিটি উপহার দিয়ে অর্জুনের গলায় দুলিয়ে দিলেন স্বয়ম্বরা বধূর সারা জীবনের ইচ্ছে দিয়ে গাঁথা মালাখানি।

অর্জুনের ব্যাপারে—অথবা দ্রৌপদী যদি তাঁকে চিনেই থাকেন, তা হলে স্বয়ম্বর-সভায় শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর পুরুষটির ব্যাপারে, দ্রৌপদীর ভাব না হয় খানিকটা বোঝা গেল, কিন্তু অর্জুনকে আমরা কতটুকু চিনলাম ? দ্রৌপদী প্রথম যখন স্বয়ম্বর-সভায় এসেছিলেন তখন তাঁর অলোকসামান্য রূপের ছটায় পাঁচ পাণ্ডব ভাইকেই আমরা বিমোহিত দেখেছি। আলাদাভাবে অর্জুনের কোনও বিক্রিয়া আমরা ব্যাসের জবানীতে পাইনি। অথবা সাধারণভাবে সব পাণ্ডবদের কথা বলতে হচ্ছিল বলেই অর্জুনকে সমস্ত ভাইদের গড্ডালিকায় ফেলে দিয়ে কবি যেন অর্জুনকে পাঁচজনের সমান করে রেখেছিলেন। তারপর যখন সব রাজপুত্রেরা একবার দ্রৌপদীর মুখ, আরেকবার মৎস্য যন্ত্রের দিকে তাকাতে তাকাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন, ঠিক তখনই অর্জুনকে আমরা পৃথক এক বৈশিষ্ট্যে দেখতে পাচ্ছি।

বস্তুত দ্রৌপদীর মুখ দেখে পাঁচভাই পাণ্ডবরা কামপীড়িত হলেন—ব্যাসের এই কথার মধ্যে দ্রৌপদীর রূপ-বৈদগ্ধ্য প্রকাশ করা যতটা ঈপ্সিত ছিল, অর্জুনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা ততটা নয়। ঠিক এই কারণেই এই মুহূর্তে অর্জুনকে ভাইদের সমতা লাভ করতে হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্ত্রশিক্ষার সময় পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি, সেই ব্যক্তি প্রথম দর্শনে দ্রৌপদীর মুখ দেখে যতটা মোহিত হয়েছেন, তার থেকেও মৎস্যচক্ষুর লক্ষ্যভেদ যে তাঁর কাছে অনেক বেশি রোমাঞ্চ নিয়ে ধরা দিয়েছিল—তাতে সন্দেহ কী। এ ছাড়া ব্যাস-বাল্মীকির উত্তরাধিকার পাওয়া এক

কবি ভারী সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—যাঁর জয়ের আশা এখনও একটুও মেটেনি, সেই মহাবীরের পক্ষে কি স্ত্রী-চিন্তা করা সম্ভব ? প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখো—প্রবল-প্রতাপ সূর্য পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আক্রমণ শেষ না করে অনুরাগবতী সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকান না। প্রকৃতির এই নিয়মে চললে অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে বিবাহ করতে হত। কিন্তু এও ঠিক এবং অর্জুন বলেই এ-কথা ঠিক যে, তাঁর মতো মহাবীরের সামনে যখন কষ্টসাধ্য একটি লক্ষ্যভেদের প্রশ্ন ছিল, অপিচ অধম মধ্যম সমস্ত রাজারাও যেখানে নিজেদের প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানে অর্জুন শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়ের বেশে উপস্থিত নেই বলে লক্ষ্যভেদ করতে পারছেন না—এই দুর্দমনীয় পরিস্থিতি তাঁকে দ্রৌপদীর মুখ ভুলিয়ে দিয়ে শেষ ক্ষত্রিয় পুরুষটির শেষ অক্ষম অস্ত্রপাত দেখার ধৈর্য জুগিয়েছিল। তাঁর মাথায় শুধু ছিল যন্ত্রনির্মিত মৎস্যচক্ষু—আর কিছু নয়।

অতএব যে মুহূর্তে মহাভারতের কবি ঘোষণা করলেন—যদা নিবৃত্তা রাজানঃ—অর্থাৎ রাজারা যেই থামলেন, অমনই অর্জুন সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কারও বা ধিক্কার-গঞ্জনা, কারও বা উৎসাহ প্রেরণা শুনতে না শুনতেই নিমেষের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করে মাটিতে ফেললেন। এইটুকুই। এরপর দ্রৌপদীর ভাব-বিগলিত বরমাল্যখানি প্রথমা প্রিয়ার বাহুর মতো তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলেও, তাঁকে শুধু দেখেছি ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে রঙ্গস্থল থেকে বেরিয়ে যেতে, আর দ্রৌপদীকে দেখছি অনুগতা বধূটির মতো তাঁর পেছনে পেছনে চলতে। লক্ষণীয় বিষয় হল—সমস্ত রাজমণ্ডলীর অক্ষমতার মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদেরই একান্ত ঈপ্সিতা, সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠা রমণীটিকে এককভাবে জিতে নেবার পর যে আপ্লুতি, যে উদ্বেলতা একজন বিজয়ীর পক্ষে স্বাভাবিক হত, সেই বাঁধভাঙা-ভাব অর্জুনের মধ্যে আমরা দেখলাম না। যৌবনের কল্পকুঞ্জে প্রথম অতিথির সমাগমে অর্জুনের হৃদয় মথিত হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতির সমস্ত ভাবনা তাঁকে অন্যতর এক ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করল।

ব্রাহ্মণকল্প অর্জুনের হাতে মেয়ে দেওয়ায় সমবেত রাজমণ্ডলীর সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল কন্যার পিতা দ্রুপদের ওপর। সেই অবস্থায় সবাইকে যুদ্ধে প্রতিহত করে অর্জুন এবং ভীম যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। ছেলেরা ফিরছে না, ঝুলি ভরে ভিক্ষার জিনিস আনল না, খাওয়া-দাওয়া হল না—এতসব চিন্তায় যখন কুন্তী আকুল হয়ে আছেন, সেই মুহূর্তে ভীম-অর্জুন দুজনে খুব আনন্দের সঙ্গে একসঙ্গে বলে উঠলেন—মা গো! ভিক্ষা এনেছি। নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে প্রথম ঠাট্টা। সম্পর্কটা সহজ করে নেওয়া। জননীর মন কি আর যুবক ছেলের রসিকতা বোঝে ? ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি—এই তো কুন্তীর প্রথম চিন্তা। অতএব তিনিও বললেন—যা এনেছো, সবাই একসঙ্গে ভোগ করো।

আপনারা জানেন—কুন্তীর এই কথার পর পাণ্ডবদের সামনে সেই বিরাট সমস্যা উপস্থিত হল। মুখ ফসকে বেরোলেই কি, জননী কুন্তী বলেছেন। তাঁর কথার মর্যাদা আছে। ব্যাকুল হয়ে কুন্তী ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরণ নিলেন—বাবা বাঁচাও, এ আমি কী বলে ফেললাম। একটু ভাবনা করতেই যুধিষ্ঠির পথটা পেয়ে গেলেন। পথটা এমনই যাতে অর্জুনের প্রাধান্য সম্পূর্ণ বজায় থাকে অথচ 'বল'টা চলে যায় তাঁর 'কোর্টে'। যুধিষ্ঠির বললেন—অর্জুন। দ্রৌপদীকে তুমিই জিতেছো, অতএব সে তোমারই—ত্বয়া জিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী। অতএব তুমিই তাঁর পাণিগ্রহণ করো। কথাটার মধ্যে কি একটু অক্ষমের অভিমান ছিল ? অর্থাৎ আমাদের তো আর লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা ছিল না, তুমি পেরেছো, তুমিই নাও।

এতে করে সমস্যা সমাধানের কল্পটুকু অর্জুনের দিকেই শুধু ঘুরিয়ে দেওয়া হল না, ওই একটা কথাই অর্জুনের সমস্ত সৌজন্যবোধ মথিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কারণ, এর পরেই অর্জুন বলবেন—দাদা! তুমি আমাকে অধর্মের ভাগী কোরো না। আমি যদি প্রথম বিয়ে করি দ্রৌপদীকে, সেটা কি শিষ্টাচারসম্মত হবে—ন ধর্মোঽয়মশিষ্টদৃষ্টঃ ? নিয়ম অনুসারে আপনি সবার প্রথমে বিবাহ করবেন, তারপর ভীম এবং তারপর আমি। আমরা সকলেই আপনার অনুগত। আপনি সব-দিক বিচার করে সেই কর্তব্য ঠিক করুন, যাতে ধর্ম, যশ এবং দ্রুপদরাজার হিত হয়।

আমরা জানি এবং আমাদের মতো যুধিষ্ঠিরও জানতেন যে, অর্জুন এই কথা বলবেন। তা ছাড়া

এই ব্যবহারই তো অর্জুনের স্বাভাবিক। তা না হলে স্বয়ম্বর-সভায় প্রত্যেক রাজপুত্রের প্রার্থিতা দ্রৌপদীকে লাভ করার পরও তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেননি, আবার আজকে আপন কষ্টার্জিত সরসা রমণীটিকে বড় দাদার হাতে তুলে দিতেও অর্জুন দুঃসহ কষ্ট পাননি, অন্তত বাইরে তাঁর দুঃসহতা দেখাননি। এই লাভালাভের দ্বন্দ্বহীন মানসিকতা প্রথম যৌবনেই অর্জুনকে এমন এক মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যাতে যুধিষ্ঠিরও ম্লান হয়ে যাবেন। অর্জুন বলেছিলেন—ভীম, আমি, আমার ছোটভাই নকুল-সহদেব এবং এই কন্যা দ্রৌপদী—এঁরা প্রত্যেকেই আপনার আজ্ঞাবহ, সকলের ওপরেই আপনার অধিকার আছে—প্রশাধি সর্বে স্ম বশে স্থিতাস্তে। অর্জুন নিজের বীরত্ব এবং গরিমা জানতেন বলেই তাঁর মুখে নিজেকে দমিয়ে রাখার এই সবিনয় অঙ্গীকার বারবার শুনেছি—আমরা সবাই আপনার বশে আছি, আপনি আজ্ঞা করুন। অর্জুনের মতো বিরাট মানুষের এমন প্রহ্বীভূত আচরণে—যিনি নিজেকে দমিয়ে রাখা জানতেন না, সেই ভীমকেও কিন্তু দমিত হতে হয়েছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে অর্জুনের আত্মনিবেদনের এটি দ্বিতীয় ফল এবং সে-কারণেও এই আচরণ অর্জুনের ইচ্ছাকৃত কিনা, তা সুধীদের বিচার্য।

যাই হোক, দ্রৌপদীর ব্যাপারে অর্জুন যে কথাগুলি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। যুধিষ্ঠিরও তাঁকে দ্বিতীয়বার কোনও অনুরোধ করেননি অর্থাৎ আর সুযোগ দেননি। অর্জুনের কথা শোনার পর দ্রৌপদীও সচকিত হয়ে উঠেছেন। যে মহাবীরকে স্বয়ম্বর-সভায় বরমাল্যের সঙ্গে আপন হৃদয়টিও দান করেছিলেন, সেই অর্জুন যে এমন হঠাৎ করে স্বয়ম্বরা রমণীর সমস্ত অন্তর থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবেন—এটা তিনি ভাবেননি। যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্জুনের আত্মনিবেদনের মুহূর্তেই বিদগ্ধা দ্রৌপদী বুঝতে পারলেন তাঁর স্বয়ং পতি-নির্বাচন ব্যর্থ হয়েছে। লহমার মধ্যে তিনি অন্য পাণ্ডব ভাইদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন ; বুঝি বা পরিমাপ করে নিচ্ছিলেন—ব্যক্তি পাণ্ডবদের শৌর্য, বীর্য, অবয়বসংস্থান। যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীর মতোই দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন ভাইদের দিকে। দেখলেন—প্রত্যেকেই দ্রৌপদীকে পাবার জন্যে মনে মনে আকুলিত। যুধিষ্ঠির আর দেরি করেননি। শেষে এক রমণীর কারণে ভাইদের মধ্যে বিরোধ হয়—এই ভেবে যুধিষ্ঠির রায় দিলেন—এই কল্যাণী দ্রৌপদী আমাদের সবারই স্ত্রী হবেন—সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা। অর্জুন একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না, প্রকাশ করলেন না গভীর হৃদয়ের অন্তরতম অনুভূতি। নির্বিণ্ণ মহাপুরুষটির মতো, ভগবদ্‌গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ মহাত্মার মতো অর্জুন স্ববীর্যলব্ধ আপন স্ত্রীর এক-পঞ্চমাংশ লাভ করেও যথালব্ধ অধিকারেই সন্তুষ্ট হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে অর্জুনও দ্রৌপদীর অন্যতম স্বামীমাত্র, আর কিছু নয়।

৫

অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবরা যখন বিরাটরাজার রাজ্যে লুকিয়ে আছেন—আপনাদের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই—সেই সময় রাজার শালা কীচক পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদীর জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাজার প্রশ্রয় এবং রানি সুদেষ্ণার পক্ষপাতে সে বিরাটরাজার সেনাপতি পদ পেয়েছিল এবং এই মর্যাদা চেপে রাখতে না পেরে সে দ্রৌপদীকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠল। এদিকে পাণ্ডবরা তো একেকজন একেক নাম নিয়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশে রাজার কাজ করে যাছেন। ভীম রাঁধুনে বামুন সেজে নিজের শৌর্যবীর্য রান্নার সৌকর্যে পরিবর্তিত করেছেন। আর অর্জুন নপুংসকের চিহ্নে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করে বিরাটরাজার মেয়ে এবং তার সঙ্গীসাথীদের নাচগান শিখিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

দ্রৌপদী যখন কীচকের অত্যুগ্র, বিকৃত প্রেমের সমস্যায় পড়েছিলেন, তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখে মধ্যম-পাণ্ডব ভীমকে এই ঘটনা জানিয়েছিলেন, যাতে তিনি কীচকের ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন। কীচক-সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রৌপদী নপুংসকের ছদ্মবেশী অর্জুনের কাছে যেতে

পারতেন ; তাতে অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবদের পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবার বিপদও কম থাকত। কারণ, রাজরানির পরিচারিকা সৈরন্ধ্রী একজন নপুংসক নৃত্যশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে—এতে কারও সন্দেহ হবার কথা নয়। কিন্তু তবু দ্রৌপদী অর্জুনের কাছে যাননি এবং বেশি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ভীমের কাছেই গেছেন। এর কারণ দুটি। প্রথমত কীচকের অপব্যবহার এবং দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ভীমের আংশিকভাবে জানা ছিল। কীচক একবার দ্রৌপদীর পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে রাজসভায় এসে পৌঁছেছিল এবং দ্রৌপদী রাজার কাছে নালিশ জানালে সে দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে ভীমসেন নিজের কাজে রাজসভায় এসেছিলেন এবং দ্রৌপদীর এই অপমান দেখেছিলেন।

ফলত কীচকের ব্যাপারে ভীমকে বলে তাঁকে বিশ্বাস করানোটা অনেক বেশি সহজ ছিল দ্রৌপদীর পক্ষে। এবং ততোধিক সহজ ছিল ভীমকে এক মুহূর্তে চেতিয়ে তোলা। কিন্তু দ্রৌপদী যদি অর্জুনকে এই লাঞ্ছনার কথা বলতেন—তা হলে তাঁকে বিশ্বাস করানো যেত না—তা বলছি না, কিন্তু দেরি হত। আর যে তৎপরতায় ভীমসেন কীচকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, এই তৎপরতা অর্জুনের কাছে দ্রৌপদী আশা করেননি, অর্থাৎ কিনা তাঁর সংশয় ছিল। কারণ, অর্জুন মানুষটি স্বভাবতই ধীর, তার ওপরে অজ্ঞাতবাস চলছে, বড়দাদা যুধিষ্ঠির কী মত দেন—এত শত চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে হয়তো ক্রিয়া করতই। তা ছাড়া যেটাকে আমরা ভীমের তৎপরতা বলছি—সেটা অর্জুনের কাছে হঠকারিতা বলে গণ্য হবে বলে দ্রৌপদী মনে করেছেন। আর সত্যিই তো ভীম যেভাবে কাজ করেছেন, তাতে দ্রৌপদীর দিক থেকে ব্যাপারটা যতটা বীরজনোচিত এবং স্ত্রীর রক্ষক হিসাবে যতটা স্বামীজনোচিতই হোক না কেন, এ ঘটনায় যে কোনও মুহূর্তে পাণ্ডবদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার ভয় ছিল। আবার এও জানি—যদি ভীমের কারণে এই পরিচয় জানাজানি হত এবং আবারও দুর্যোধনের শর্ত মেনে পাণ্ডবদের বনে যাবার প্রশ্ন উঠত, তা হলে যে যাই বলুন, অর্জুনই ভীমকেও যেমন অনুমোদন করতেন তেমনই অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করার জন্য পুনরায় বারো বছরের বনবাসের প্রস্তুতিও নিতেন।

যাই হোক ভীমের হাতযশ এবং দ্রৌপদীর সৌভাগ্যে এ সব ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু এও ঠিক দ্রৌপদী অর্জুনকে এ ব্যাপারে ভরসা করেননি। কিন্তু ভরসা করলে ভীমের মতো অর্জুন একইরকম তৎপরতায় কীচক বধে উদ্‌যুক্ত হতেন না—এ-কথা আমরা হলফ করে বলতে পারি না। কারণ বিরাট-গৃহে সৈরন্ধ্রীর মুখের এক কথায় তিনি কুমার উত্তরের সারথি হয়ে কৌরবদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তর যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিলেন তখন অর্জুন বলেছিলেন—উঁহু! সেটি হবে না। সৈরন্ধ্রী অমন বড় মুখ করে তোমার সারথি হতে বলেছেন, তুমিও সেটা স্বীকার করেছো, এখন তুমি যুদ্ধ না করেই চলে যাবে—সেটি হবে না—স্তোত্রেণ চৈব সৈরন্ধ্র্যাস্তব বাক্যেন তেন চ।

কিন্তু সৈরন্ধ্রীর লজ্জানত মুখের একটি প্রশংসাবাক্য যেমন এই মুহূর্তে অর্জুনকে বিরাট যুদ্ধের সম্মুখীন করেছে, তেমনই এ-কথাও মনে রাখতে হবে—অজ্ঞাতবাসের শেষ পর্যায়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই তিনি নিজের শরীরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, তিনি আর নপুংসক নেই অর্থাৎ তাঁর অজ্ঞাতবাসের সময়সীমা উত্তীর্ণ। কুমার উত্তরকে তিনি আশ্বস্ত করে বলেছেন—আমি নপুংসক নই,—নাস্মি ক্লীবো মহাবাহো—আজকে আমি আমার অজ্ঞাতবাসের ব্রত থেকে উত্তীর্ণ—সমাপ্তব্রতমুত্তীর্ণং বিদ্ধি মাং ত্বং নৃপাত্মজ।

এই যে প্রিয়া পত্নীর সানুরাগ অনুনয় অর্জুন প্রত্যাখ্যান করছেন না, আবার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক পরিবারের কল্যাণকল্পে অজ্ঞাতবাসের সময়সীমাটাও মাথায় রাখছেন—এইখানেই তিনি অর্জুন। বোধ করি, কীচকের ব্যাপারে দ্রৌপদী যদি অর্জুনের ওপর ভরসা রাখতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই এমন কোনও উপায় বার করতেন যাতে সর্পরূপী কীচকও মরত, অথচ অজ্ঞাতবাসের লাঠিটাও ভাঙত না। কিন্তু যাই হোক দ্রৌপদীও অর্জুনের ওপর ভরসা করেননি, অর্জুনও সে ব্যাপারে নিজেকে জড়াননি। কিন্তু আমি যে পঞ্চপাণ্ডবের বিয়ের পরপরই অর্জুনকে দ্রৌপদীর অংশপতিত্ব দান করেই বিরাটপর্বে দ্রৌপদী-কীচক বা দ্রৌপদী-ভীম সংবাদে চলে এলাম—তার কারণ কী? কারণ একটাই।

এত বড় স্থিতপ্রজ্ঞ, স্বভাবধীর, ওপর-চাপা মানুষটার মনটা একটু জানতে চাই। জানতে চাই—থির-নিথর জলে ছোট্ট একটি ঢিল ফেললে সামান্যতম ঢেউ দেয় কিনা? জানতে চাই—স্থিতধী ব্যক্তিকেও ভালবাসা এবং প্রেমের না-পাওয়াটুকু ক্ষণেকের তরে উদাস করে কিনা?

কীচকবধ এবং শ্মশানভূমিতে ভীমের হাতে তার ভাইদের মৃত্যু হওয়ার পরপরই পাঞ্চালী অতি সুকৌশলে ভীমের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন—গন্ধর্বরাজায় নমঃ। কিন্তু বুক-উজাড়-করা এই কৃতজ্ঞতা জানিয়েও, কেন জানি না, দ্রৌপদী সেই নূপুরের শিঞ্জনমুখর নৃত্য-গৃহটির পাশ দিয়ে ঘরে ফিরছিলেন। নূপুর-পরা মেয়েরা সকৌতুকে দ্রৌপদীকে ছেঁকে ধরল। বলল—ভাগ্যিস সেই অসভ্য লোকগুলোর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছ তুমি সৈরন্ধ্রী! মেয়েদের দেখাদেখি অজ্ঞাতবাসের অভিনয়ে দক্ষ বৃহন্নলাও সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে সেই বদমাশগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেলে, সৈরন্ধ্রী! কেমন করেই বা তারা মারা পড়ল? সব গুছিয়ে বলো তো, আদ্যোপান্ত শুনতে ইচ্ছে করছে।

অভিমানিনী পাঞ্চালী এই সুযোগটাই চাইছিলেন। ঠোঁট ফুলিয়ে সৈরন্ধ্রী বললেন—সৈরন্ধ্রীর কী হল না হল তা শুনে তোমার কী কাজ বৃহন্নলা? কাঁচা বয়সের মেয়েদের মাঝে বেশ তো আলো করে সুখে আছ—যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্। দ্রৌপদী এইটুকুতেই শেষ করলেন না। বললেন—সৈরন্ধ্রী যে কষ্ট পাচ্ছে, তা তুমি পাও না বলেই পোড়াকপালীকে এমন হাসি মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করছ—তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব। এক মুহূর্তে বৃহন্নলার হাসি উবে গেল। অসহায়ের মতো তিনি বলে উঠলেন—বৃহন্নলাও তোমারই মতো কষ্ট পায়, কল্যাণী! কিন্তু সে যে নপুংসক, তাও কি তুমি বোঝো না! এই কথার মধ্যে সব ছিল। অজ্ঞাতবাসের সমস্যা, নিজের ছদ্মবেশ এবং তাঁর অসহায়তা—সব ছিল। অর্জুন বললেন, তোমার সঙ্গে আমি কোনওকালে থাকিনি—তা তো নয়, আবার তুমিও আমাদের সকলের সঙ্গে কোনওকালে থাকনি—তাও তো নয়। তুমি তখন কি কোনওদিন দেখেছ—তুমি দুঃখ পেলে তাঁরা দুঃখ পান না?

এ-সব হেঁয়ালির কথা ঝুমুর-তোলা নাচের মেয়েরা বুঝল না। কিন্তু দ্রৌপদীর চোখ চাওয়া এইরকম বিষাদ-ঘন মুহূর্তে নপুংসক বৃহন্নলা, অর্জুনের সমস্ত অন্তরাত্মা প্রকাশ করে ফেলল; প্রকাশ করে ফেলল অর্জুনের ভূত-ভাবী সমস্ত জীবনের অনুভূতি। বৃহন্নলার বহিরঙ্গের মধ্যে থেকে কোনও এক অজানা অর্জুনের অন্তরঙ্গ-হৃদয় হাহাকার করে বলে উঠল—কেউ কোনওদিন কারও মন বুঝতে পারে না, দ্রৌপদী! সেই জন্য তুমিও আমায় বুঝতে পারলে না গো ভাল মানুষের মেয়ে—ন তু কেনচিদত্যন্তং কস্যচিদ্ হৃদয়ং ক্বচিৎ। বেদিতুং শক্যতে ভদ্রে...।

এই মুহূর্তে আমরা যেন আধুনিক কোনও উপন্যাসের চরম কোনও সংলাপ শুনছি। 'কেউ'—'কোনওদিন'—'কারও'—এই কথাগুলি যতই নৈর্ব্যক্তিক কোনও আবহ তৈরি করুক না কেন, অর্জুন যেন অর্জুনের দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করে নিজের একান্তে জমানো এতকালের হতাশা ক্ষণিকের উত্তেজনায় প্রকাশ করে ফেলেছেন। প্রকাশ করেছেন একটি মাত্র বাক্যে চারটি-পাঁচটি শব্দের নৈর্ব্যক্তিক অর্থগৌরবে—কেউ কোনওদিন কারও মন বোঝে না, ভদ্রে। শব্দগুলির মধ্যে আছে ঝরে-পড়া বকুলের হাহাকার, অনুপভুক্ত বসন্তের মায়া। কী যেন বলিবার ছিল, বলি বলি করিয়া বলা হইল না। অথবা "মনের কথা এ জন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।" 'কেউ' 'কারও' 'কোনওদিন'—এই ভাষায় অসীম নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপন ভাব ব্যক্ত করা যায় বটে, কিন্তু এই ভাষার অধিক কোনও শব্দে পঞ্চপাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদীর কাছে অন্যতম পাণ্ডবের হৃদয় এইভাবে উন্মোচন কতটা যুক্তিযুক্ত হত? তাও অর্জুনের মতো ধীর, বিবেকী মানুষের পক্ষে?

দ্রৌপদী বিদগ্ধা নায়িকা বটে, তিনি আর একটি কথাও বলেননি। শুধু যা বোঝার বুঝে নিয়ে স্বস্বীকৃতিমুগ্ধা ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকাটির মতো আপন ঘরে ফিরে এসেছেন। হয়তো দ্রৌপদীর কাছে স্বয়ম্বর সভার প্রথম বরমাল্য পাওয়া পুরুষের এই হতাশ স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট ছিল, কারণ পঞ্চস্বামিগর্বিতা নায়িকার মনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবের এই সাভিমান খেদোক্তি শুধুই তাঁর আত্মবিশ্বাস

তৈরি করেনি, বরঞ্চ এটা তাঁর বাড়তি পাওনা। কিন্তু অর্জুনের দিক থেকে ব্যাপারটা কোনওভাবেই আশ্বাসের নয়। তাঁর মন উদভ্রান্ত হয়েছে—সে কতকাল ? যে রমণীর হৃদয় তিনি স্বীয় ভুজবলে অধিকার করেছিলেন, যে-হৃদয় একান্তভাবেই তাঁরই সম্পূর্ণ প্রাপ্য ছিল, সে-হৃদয় তিনি না হয় বীরোচিত উদারতায় ভাইদের বিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আপন হৃদয়ের আবেগ তিনি অবরুদ্ধ করবেন কী করে ? অতএব সে মন তার আপন গতিপথ তৈরি করেছে। এই গতিপথের ভাবনায় মনস্তত্ত্ববিদের অঙ্গুলি-সংকেত আছে কি না জানি না, তবে আমরা আমাদের মতো করে দুটো কথা তো বলতেই পারি।

দ্রৌপদীর সঙ্গে যেই পাঁচ পাণ্ডবের বিয়ে হয়ে গেল, অমনই পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এলেন। নিতান্ত রাজনৈতিক কারণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থ নামে এক রুক্ষ জায়গায় পাণ্ডবদের রাজ্য দিয়ে পুনর্বাসিত করতে বাধ্য হলেন। যুধিষ্ঠিরের সভা তখনও ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত হয়নি ; এমনই সময় মহর্ষি নারদ এসে পাঁচ ভাইকে গোপনে ডেকে বললেন—পাঞ্চালী-কৃষ্ণা তোমাদের পাঁচজনেরই পরিণীতা বধূ। যাতে তাঁকে নিয়ে স্বর্গসুন্দরী তিলোত্তমার মতো সুন্দ-উপসুন্দের ঝগড়া না লাগে, তেমন একটা নিয়ম করো। পাঁচ ভাই প্রয়োজন বুঝে নারদকে সাক্ষী রেখে নিজেরাই নিয়ম করলেন—জ্যেষ্ঠের ক্রমানুসারে যে পাণ্ডব যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাসে থাকবেন, সেই সময় যদি অন্য ভাই সেখানে ভুলেও ঢুকে পড়েন, তা হলে বারো বছরের জন্য তাঁকে বনে গিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

নিয়ম তো হল। কিন্তু এই নিয়মের শৃঙ্খলে যুধিষ্ঠির-ভীম কিংবা নকুল-সহদেব—কেউই বাঁধা পড়লেন না। বাঁধা পড়লেন অর্জুনই। সেই যে এক ব্রাহ্মণের গরু চোরে নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। ওদিকে যুধিষ্ঠির প্রথম দ্রৌপদীর সঙ্গলাভ করে বিভিন্ন নির্জন স্থানে তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করে যাচ্ছেন। অর্জুন ব্রাহ্মণের কান্না শুনে কর্তব্যের তাড়না অনুভব করতে লাগলেন বটে, কিন্তু তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র, ধনুক-বাণ—সব জমা রয়েছে সেই অস্ত্রাগারে। আর আজই পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নির্জনতার খোঁজে সেই অস্ত্রাগারে বসেই দ্রৌপদীর সান্নিধ্য অনুভব করছেন। অর্জুন দেখলেন—মহাবিপদ। একদিকে গরিব ব্রাহ্মণের আর্তি, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, অন্যদিকে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর সামনে পৌঁছানো মানেই—বারো বছর বনে। কিন্তু অর্জুনের মতো বীরের কাছে ক্ষত্রিয়ের প্রজা-রক্ষার ধর্মই যে মুহূর্তের মধ্যে বড় হয়ে উঠবে—তাতে সন্দেহ কী ?

অর্জুন গেলেন, চোর ধরলেন, ব্রাহ্মণের গরু ব্রাহ্মণকে ফেরত দিলেন। ব্রাহ্মণের সাধুবাদ এবং ভাইদের অভিনন্দনের মধ্যেই অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে বনে যাবার প্রস্তাব করলেন। সৌজন্যের চূড়ান্ত করে এবার অর্জুন বললেন—আমি নিয়ম ভেঙেছি। যে সময়ে আপনাকে দর্শন না করলেও চলত, সেই সময়ে আপনাকে বিরক্ত করেছি—সময়ঃ সমতিক্রান্তো ভবৎসন্দর্শনে ময়া। এখন আদেশ করুন, আমি আমার বারো বছরের ব্রতের আয়োজন করি। যুধিষ্ঠির বললেন—দূর ! বোকা ছেলে ! বড়রা বউয়ের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছে, সেখানে ছোটরা গেলে কিছু হয় নাকি ! বরঞ্চ ছোটভাই যদি বউয়ের সঙ্গে বসে থাকত আর বড়রা উপস্থিত হত সেখানে, সেইটা একটা ব্যাপার হত। এতে তো তোমার কোনও অন্যায়ই হয়নি। অর্জুন বেশ বুঝতে পারলেন—বড়ভাই তাঁর ওপর মায়া করেই এত যুক্তি-তর্ক সাজিয়েছেন। এই করুণা, এই প্রশ্রয় তিনি গ্রহণ করবেন কেন ? অতএব সঙ্গে সঙ্গে বললেন—দাদা ! আপনার কাছেই না শুনেছি—চালাকি করে কখনও ধর্ম হয় না—ন ব্যাজেন চরেদ্ ধর্মং—এখন কেন তবে আমাকে সত্য থেকে সরে আসতে বলছেন ? যুধিষ্ঠির আর কথা বাড়াননি। অর্জুন বারো বছরের জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে বনবাস করার জন্য দীক্ষিত হলেন।

যেদিন তিনি রওনা হলেন, সেদিন বিদায়-বেলায় রাজবাড়ির অলিন্দের আড়ালে আমরা দ্রৌপদীকে দেখিনি। কারণ অর্জুন ব্রহ্মচারী, তিনি স্ত্রীমুখ দেখবেন না। যাবার সময় তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে অজস্র ব্রাহ্মণকে দেখতে পাচ্ছি। বনবাসের প্রথম আবেশে আকাশ-বাতাস, আলো-ছায়া—সবই ভাল লাগে—রমণীয়ানি চিত্রাণি বনানি চ সরাংসি চ। আবার ব্রহ্মচর্যের প্রথম আবেশে ধর্মচর্যা, যজ্ঞ-হোম, গঙ্গাস্নান—এগুলিরও একটা প্রবল আবেগ তৈরি হয় (যাঁরা পৈতে

নিয়েছেন, তাঁরা ব্রহ্মচর্যের প্রথম দিনগুলি স্মরণ করুন)। বন, পাহাড়, নদী দেখতে দেখতে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ব্রাহ্মণের সাম্রাজ্যে যজ্ঞ, হোম, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বৈদিক উপচার আর হবির্ধূমে অর্জুন কিছুদিন বেশ আমোদিত হয়ে জমে রইলেন। তারপর একদিন স্নানের জন্য গঙ্গায় নেমেছেন অর্জুন ; স্নানও হয়ে গেছে। জল থেকে উঠতে যাবেন, ওমনি তাঁর কাপড় ধরে কে যেন জলের মধ্যে টানল। সরসর করে তাঁকে টেনে নামানো হল অনেক নীচে জলের তলায়। সেখানে বাড়ি-ঘর সব আছে ; এমনকী অর্জুন যে স্নানের পর অগ্নিহোত্র করবেন—সে ব্যবস্থাও আছে। ব্রহ্মচর্যের প্রথম আবেশে অর্জুন আগে অগ্নিকার্য করে নিলেন। তারপর হাসিমাখা মুখে যাঁর দিকে তাকালেন, তিনি নাগ-কন্যা উলূপী। বললেন—কন্যে! বড় সাহস দেখলুম তোমার, কে গো তুমি, কার মেয়ে ?

একটু আধুনিক দৃষ্টি থেকে বলি—এই যে নাগকন্যা উলূপীকে দেখছেন—ইনি কোনও সাপিনী-টাপিনী বলে আমাদের মনে হয় না। বস্তুত উত্তর ভারতে বেশ কিছু অনার্য জাতির বাস তখনও ছিল যারা সাপের 'টোটেম' ব্যবহার করত। জলের তলায় অর্জুনকে কতটা হিরহির করে টেনে নামানো হয়েছিল, তা অর্জুনই জানেন, তবে আমরা যা জানি তাতে বুঝি—গঙ্গাদ্বারের ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে এই মেয়েটি তাঁর নিজের যৌবন বেগে অর্জুনকে দূরে সরিয়ে নিজের বসতিতে এনে ফেলতে পেরেছিল। অনার্যত্ব-হেতু সে নিজের যৌবন সুখ উপভোগ করার জন্য আচার-বিচারের ধার ধারে না এবং সোজাসুজি সে অর্জুনকে বলেছে—তোমায় গঙ্গায় স্নান করতে দেখেই ভীষণ ভাল লাগল আমার, তোমার সঙ্গ পেতে ইচ্ছে হল তাই—দৃষ্ট্বৈব পুরুষব্যাঘ্র কন্দর্পেনাভিমূর্চ্ছিতা। অর্জুন বললেন—সে কী কথা! আমি ব্রহ্মচারী, দাদার কথায় বনে এসেছি, বারো বছর আমার এইভাবে চলতে হবে। এই ব্রত-নিয়মের কথা শুনেও অর্জুন কিন্তু উলূপীকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না। কারণ উলূপী ভারতবর্ষের আদিম জাতের মানুষ এবং উলূপী সুন্দরী, আদিম যৌবন তার শরীরে। অর্জুন বললেন—জলকন্যে! তোমার যেটা ভাল লাগছে, আমি তাও করতে চাই—তব চাপি প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছামি জলচারিণি—আবার আমার ব্রতটা যাতে নষ্ট না হয়—সেটাও একটু ভাবো।

হায়! অর্জুন এমন একজনের ওপর তাঁর ব্রতরক্ষার ভার দিলেন, যিনি তাঁর ব্রতভঙ্গ করার জন্যই এতদূর তাঁকে নিয়ে এসেছেন। উলূপীর বাবার ছেলে ছিল না বলে, তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু উলূপীর সন্তান হবার আগেই তাঁর স্বামীকে হরণ করে নিয়ে গেল সুপর্ণ (যারা হয়তো খগরাজ গরুড়ের টোটেম ব্যবহার করত।) সেই থেকে উলূপীকে সবাই করুণা করে। যৌবনের সুখ সে পায়নি, সব সময় মনমরা হয়ে থাকে—মহাভারতের কবির ভাষায়—কৃপণা দীনচেতনা। সেই উলূপী যখন মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও হরিদ্বারের গঙ্গা আর ব্রাহ্মণসমাজ থেকে অর্জুনকে তুলে নিয়ে এল—সে কি অর্জুনের ব্রতরক্ষার জন্য ? আর অর্জুনের মতো মহাবীরের যদি সায় না থাকত এতে, তবে কার সাধ্য তাঁকে এমনি করে অজানা অনার্য জনপদে টেনে আনে ? অর্জুন ধরা দিতেই এসেছেন, তবু পুরুষমানুষ বলে কথা, একটু গুমোর দেখাচ্ছেন—এই আর কী। অর্জুনের ব্রতের কথা শুনে উলূপী বলল—আমি সবই জানি গো জানি। তা ওসব ব্রত, নিয়ম, ব্রহ্মচর্য—সবই তো দ্রৌপদীর ব্যাপারে—তদিদং দ্রৌপদীহেতোঃ। ভাইরা মিলে তোমরা যে নিয়ম করেছ, তাতে এক ভাই দ্রৌপদীর সঙ্গাসক্ত হলে অন্য ভাই সেখানে ঢুকবে না। ঢুকলে বারো বছরের বনবাস ব্রহ্মচর্য। তা সে ব্রহ্মচর্য তো বাপু দ্রৌপদীর ব্যাপারে, তার সঙ্গে আমার কী—কৃতবাংস্তত্র ধর্মার্থমত্র ধর্মো ন দুষ্যতি।

এই মনের গতি শুরু হল। মহাবীর অর্জুন দ্রৌপদীকে আপন ভুজবলে জয় করেও সম্পূর্ণ পেলেন না, তারপর আবার ব্রাহ্মণের গরু-চুরির ঘটনায় দ্রৌপদী তাঁর কাছে আসবেন আরও বারো বছর পর ; হয়তো বা তাও নয়, কারণ তখন তিনি হয়তো অন্য কোনও ভাইয়ের বাহুডোরে আবদ্ধ থাকবেন। স্বয়ম্বর-সভার বরমাল্য হাতে-করা নববধূ দ্রৌপদী অর্জুনের চক্ষু এবং হৃদয় থেকে বছরের পর বছর পিছিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় বাঁধ ভাঙার বিষয় পেলে মনের বাঁধ এমনিই ভেঙে যায়।

ধর্মের যুক্তি-তর্কও তখন নিজের মনের মতো করে জুটতে থাকে। উলূপী বললেন—দ্রৌপদীর জন্য নিয়ম। ব্রহ্মচর্যও দ্রৌপদীর ব্যাপারে, তার সঙ্গে আমার কী? ঠিক এই মুহূর্তে অর্জুনেরও কি মনে হয়নি—ঠিক তো, এই কথাটাই তো ঠিক—দ্রৌপদীর জন্য। নিয়ম দ্রৌপদীর জন্য, ব্রহ্মচর্য দ্রৌপদীর জন্য, কিন্তু দ্রৌপদীকে কবে পাওয়া যাবে? এক, দুই, তিন, চার নয়, বারো বছর; তারপরেও স্থিরতা নেই। অর্জুন অনার্য নাগকন্যা, উলূপীর বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। সম্পূর্ণ একরাত্রি ধরে যৌবন-বুভুক্ষু রমণীর প্রিয়তা সম্পাদন করলেন। অর্জুনের মন তির্যক্‌পথে চলতে আরম্ভ করল।

শাস্ত্রকার এবং পুরাণকারেরা এককে জায়গায় টিপ্পনী কেটে দেখিয়েছেন যে, বড় বড় মুনি-ঋষির মন বড় নির্দ্বন্দ্ব হয়। বিষয় ভোগে কচিৎ কদাচিৎ তাদের আসক্তি মনুষ্যলোকের মতোই বটে, কিন্তু তাঁদের মনটা টানা আটকা পড়ে থাকে না। মায়ার বাঁধনটাও বড় শিথিল। তাঁরা এ-সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করার জন্য পরাশর-সত্যবতীর উদাহরণ দেন, সৌভরিমুনির উদাহরণ দেন। অর্জুন মুনি-ঋষি নন, কিন্তু অর্জুনকেও আমরা উলূপীর বাঁধনে আটকে থাকতে দেখলাম না। উলূপীর শরীর-সাধনের পরের দিনই নবীন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন আবার গঙ্গাদ্বারে এসে পৌঁছেছেন। উলূপী তাঁকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

এরপর কত তীর্থ, কত নদী, কত রমণীয় বনশোভা দেখতে দেখতে অর্জুন ভারতবর্ষের পূর্বদেশে এসে পৌঁছলেন। বিহার, বঙ্গদেশের সীমানা পেরিয়ে অর্জুন কলিঙ্গের পথ ধরলেন। কলিঙ্গ থেকে সাগরে। এবার তাঁর কী মনে হল, সাগরের তীর দিয়ে উদাস মনে হাঁটতে তাঁর বড় ভাল লাগল। তারপর সাগরের তীরবাহী পথই এক সময় তাঁকে নিয়ে গেল মণিপুরে। তবে এই মণিপুর বোধহয় আমাদের মণিপুর নয়। কারণ মহাভারতে অর্জুনের তীর্থযাত্রার ভৌগোলিক পথ অনুসরণ করলে দেখা যাবে এই মণিপুর দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের কোনও দেশ। টীকাকার নীলকণ্ঠের অনুমান অনুযায়ী জায়গাটা কেরালাতেও হতে পারে। যাই হোক মণিপুর মানেই তো চিত্রাঙ্গদা। মহাভারতের কবির অন্তরজন্মা যে কবি চিত্রাঙ্গদার গীতিনাট্য লিপিবদ্ধ করে আমাদের মুখরতা স্তব্ধ করে দিয়েছেন তাঁর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখেই বলি, মহাভারতের কবির ভাষ্যে এত জটিলতা, এত কবিকল্পনা নেই। সেখানে তিনি পুরুষের বিদ্যাও শিক্ষা করেননি, ধনুঃশর হাতে কঠিন পাষাণের ধাতুতেও তাঁর হৃদয় তৈরি হয়নি। অর্জুনের কাছে হৃদয় প্রাণ মন—কিছুই তিনি নিবেদন করেননি, অর্জুনও ব্রহ্মচর্যের গর্বে চিত্রাঙ্গদাকে ফিরিয়ে দেননি। ভালবাসার দেবতার বর এবং অভয়—দুই-ই কল্পনা।

তাই বলে মহাভারতের কবির কোনও সুরই কি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বাজেনি? যেটা বেজেছে—সেটা হল, চিত্রাঙ্গদার পিতৃকুলে চিরকালই একটা করে সন্তান জন্মেছে এবং সে সন্তান ছেলেই হয়েছে। শুধু এই এখনকার মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের ছেলে নেই, তাঁর একমাত্র মেয়ে—চিত্রাঙ্গদা। হ্যাঁ রাজা তাঁকে একটু প্রশ্রয় দিয়েছেন বেশি, চিত্রাঙ্গদা স্বেচ্ছায় মণিপুরনগরের যেখানে সেখানে বেড়াতে বেরোন। হয়তো এই প্রশ্রয় এবং এক সন্তানের ব্যাপার থেকেই কবিগুরুর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথের যখন 'চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী' বলে বিলম্বিতে সুর টানবেন, তখনই আপনাকে মহাভারতের প্রায় অবিকল শব্দগুলি স্মরণ করতে হবে—চিত্রাঙ্গদা চৈব নরেন্দ্রকন্যা। স্মরণ করতে হবে চিত্রাঙ্গদার গায়ের রঙ মহুয়া ফুলের মতো এবং তাঁর কটাক্ষে পঞ্চম-শর এতটাই ছিল যে অর্জুন মণিপুর নগরের রাজপথে তাঁকে দেখামাত্র তাঁর সঙ্গকামনা করেছেন—দৃষ্ট্বৈব তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্। বিশেষত উলূপীকে সঙ্গ দেবার পর অর্জুন কোন মুখে বলবেন—বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে—ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।'

যাক, আমি আর তুলনামূলক বিচারের ধারায় নিজেকে জড়াতে চাই না। তবে যাঁরা মহাভারতে অর্জুনের এই সকাম ব্যবহার দেখে তাঁকে 'ফাইলাণ্ড্যারার' 'টম বয়' গোছের ভেবে নেন তাঁদের উদ্দেশে আমার বক্তব্য আছে। বক্তব্য আছে তাঁদের উদ্দেশেও যাঁরা চিত্রাঙ্গদার রসে সরস অর্জুনকে চরিত্রগতভাবে দুর্বল বলে মনে করেন। শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—'উলূপীর

প্রার্থনা পূর্ণ করায় ধর্মত অর্জুনের ব্রহ্মচর্য স্খলিত হয় নাই, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে তিনি কামার্ত হইয়াই বিবাহ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ইহাতে অর্জুনের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। অরণ্যবাস তো হয়ই নাই, পরন্তু তিনি উভয় শ্বশুরবাড়িতে চারি বৎসরের অধিককাল পরম সুখে বাস করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই সকল ঘটনাকে তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা ছাড়া কী বলিব ?'

ভট্টাচার্য মহাশয় আমার নমস্য ব্যক্তি। আমার বক্তব্যের সঙ্গে এই মুহূর্তে তাঁর বক্তব্য না মিললেও তিনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ। তবে কিনা শাস্ত্র আর নীতির যুক্তিতেই কি সব সময় একজন পুরুষকে বিচার করা যায়, না কি করাটা উচিত হবে ? তাও আবার অর্জুনের মতো পুরুষকে ? ভট্টাচার্য মহাশয় উলূপীর প্রার্থনা সঙ্গত মনে করেছেন, কারণ উলূপী কামার্তা ছিলেন। কামার্তা নারীর 'প্রার্থনা পূরণ করায় ধর্মত অর্জুনের ব্রহ্মচর্য স্খলিত হয় নাই।' কিন্তু হায় ! অর্জুনের কি কোনও কামনা-বাসনা থাকতে নেই ? যৌবনের চরম সম্ভাবনার মুহূর্তগুলিতে তাঁকে ব্রহ্মচর্য নিয়ে থাকতে হবে ? শাস্ত্রের বিচারে বহিরঙ্গ শারীরিক সুখের কথা, না হয় ছেড়েই দিলাম। মানসিকভাবে দ্রৌপদীকে না পাওয়ার আকুলতা তাঁকে অন্তরে অন্তরে শূন্য করে রেখেছিল। এই শূন্যতার কথঞ্চিৎ লাঘবের জন্য মানুষের, এমনকী অর্জুনের মতো মানুষেরও বহিরঙ্গে এক ধরনের ছায়াপাত ঘটে। সেই প্রতিক্রিয়াতেই চিত্রাঙ্গদাকে দেখা মাত্র অর্জুনের ভাল লেগেছে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার খানিকটা শান্তি হয়েছে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হবার পর। এগুলি তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা বলব, না কি তাঁর গূঢ় অন্তর্দাহ নির্বাপণের বিকল্প বলব—তা শাস্ত্রনিয়মের বাইরে গিয়ে সাহিত্যের বেদনাবোধ থেকে বুঝতে হবে বলে আমরা মনে করি।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করে তিন বছর সেখানে কাটিয়ে দিলেন। রাজবাড়ির আদর আপ্যায়নে অর্জুনের বনবাস-ব্রহ্মচর্য মাথায় উঠেছিল। হঠাৎই যেন খেয়াল পড়ল, আর তখনই নিগূঢ় অন্তর্দূষণের চেতনায় দ্বিগুণিতভাবে তীর্থযাত্রায় মন দিলেন। কিন্তু সে কতদিন ? হয়তো বেশ কিছুদিন। কিন্তু তারপরেই আবার সেই বিষাদ এসে গ্রাস করে অর্জুনের মন। চিত্রাঙ্গদাই যে তাঁর ক্ষত-হৃদয়ের প্রলেপ—তাই তাঁকে আরও একবার দেখবার জন্য আবারও মণিপুরে ফিরে এলেন অর্জুন। এসে এই প্রথম পুত্রমুখ দেখলেন। এরপর আর তো থাকা যায় না। চিত্রাঙ্গদাকে বললেন—তুমি এখানেই থাকো এবং ছেলেকে মানুষ করো।' যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের সময় আবার দেখা হবে। চিত্রাঙ্গদাকে ছেড়ে আসতে অর্জুনের যত না কষ্ট হয়েছে, বোধ করি তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন বিরহকাতর চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন আবারও বেরিয়ে পড়লেন পশ্চিম সমুদ্রতীরে। কত তীর্থ, কত মন্দির দেখে উপস্থিত হলেন প্রভাসে।

প্রভাস জায়গাটা ভারী সুন্দর এবং সেটা পুরুষোত্তম কৃষ্ণের দ্বারকাবাস থেকে সাংঘাতিক কিছু দূরে নয়। অতএব অর্জুন প্রভাসে যেতেই কৃষ্ণের কাছে খবর চলে গেল। তিনি সোজা এসে উপস্থিত হলেন প্রভাসে এবং জড়িয়ে ধরলেন বন্ধুকে। কাছেই রৈবতক পাহাড়, যেখানে কৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়ে একবার আস্তানা গেড়েছিলেন। বাড়িঘর সেখানে ছিলই। বন্ধুর আগমনে সে ঘর-দোর ধুয়ে মুছে আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কী জন্য এই বনে বনে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? অর্জুন সব বললেন—দ্রৌপদীর কথা, যুধিষ্ঠিরের কথা, এমনকী উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার কথাও—সর্বমাখ্যাতবাংস্তদা। সমপ্রাণ সখা কৃষ্ণ সব বুঝলেন ; ব্রতভঙ্গ কিংবা ব্রহ্মচর্য-চ্যুতির দোষ তিনি তো দেনইনি, বরঞ্চ বন্ধুর মনের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ নিজেই অর্জুনের সঙ্গে প্রভাসতীর্থের এখানে ওখানে অনেক ঘুরে বেড়ালেন। তারপর রৈবতক পাহাড়ের 'গেষ্ট হাউসে'—যেখানে কৃষ্ণের লোকেরা ঘর সাজিয়ে, খাবার সাজিয়ে বসেছিল—সেইখানে অর্জুনকে নিয়ে এলেন কৃষ্ণ। শাস্ত্রানুসারে অর্জুনের ব্রহ্মচর্য এবং বনবাস যদি অত্যন্ত যুক্তিযুক্তই হত, তা হলে কি সমস্ত ধর্মের কর্তা, বক্তা এবং অভিরক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুর জন্য পান-ভোজন আর আরামের এত ঢালাও ব্যবস্থা করতেন ? অর্জুনের উদ্‌ভ্রান্ত মনটা অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার জন্য কৃষ্ণ বাসুদেব তাঁর সঙ্গে বসে কত রাত পর্যন্ত নাচ দেখে আর গান শুনে কাল কাটালেন—সহৈব বাসুদেবেন দৃষ্টবান্ নটনর্তকান্।

তারপর একই সঙ্গে দুজনে শুয়েছেন, গল্প করেছেন। পরের দিন থেকে অর্জুন আর নিজেকে নিজের বশে রাখতে পারেননি। কৃষ্ণ আর তাঁকে ছাড়েননি। পরের দিন সোনার রথে চড়িয়ে অর্জুনকে নিয়ে গেছেন দ্বারকায়। সেখানে রাজকীয় অভ্যর্থনা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বহু অভিবাদন, আলিঙ্গন আর অবলোকনের পর কৃষ্ণ তাঁর সমবয়সী পিসতুতো ভাই-বন্ধুকে একেবারে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন। নির্জন গল্পকথা আর মনের কথায় কত রাত সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কেটে গেল—উবাস সহ কৃষ্ণেন বহুলাস্তত্র শর্বরীঃ। কৃষ্ণের উপরোধে অর্জুনের বনবাস আপাতত মাথায় উঠল। তিনি কী করবেন ? কৃষ্ণকে অতিক্রম করা কারও পক্ষে সম্ভব ? তাঁর মনের রিক্ত অবস্থা এবং কৃষ্ণের বন্ধুত্ব—দুটোই এমন পরস্পর প্রতিপূরক হয়ে উঠল যে, অর্জুন কৃষ্ণের ইচ্ছার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

সেকালের দিন আন্দাজে কৃষ্ণের নিজের জাতি যাদবরা কিন্তু ভীষণ আধুনিক ছিল। যে কোনও একটা উপলক্ষে উল্লাস আর আমোদ করাটা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। অর্জুনের মতো ব্যক্তিকে সামনে রেখে যাদব রাজপুরুষেরা অতি শীঘ্রই একটি 'পিকনিক'-এর ব্যবস্থা করে ফেললেন। স্থান রৈবতক পাহাড়। নির্দিষ্ট দিনে যাদবের মেয়ে-পুরুষেরা সবাই বাদ্য-বাদক, নাচিয়ে-গাইয়ে সঙ্গে নিয়ে রৈবতকে উপস্থিত হলেন। হলধর বলরাম, কৃষ্ণ, তাঁদের ভাই-বন্ধু, জ্ঞাতি-গুষ্টি, এমনকী বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেন পর্যন্ত আজ স্ফূর্তির মেজাজে রয়েছেন। বলরামের দিকটায় একটু মধুমদ্যের ব্যবস্থা আছে, কৃষ্ণের দুই ছেলে প্রদ্যুম্ন আর শাম্ব সময় বুঝে ওদিকটায় ভিড়ে গেছেন। অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, নানা মজাও দেখছিলেন। ঠিক এমনই সময় বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখতে পেলেন অর্জুন। তাঁর সাজগোজ, কথাবার্তা এবং রূপের মধ্যে এমন এক আভিজাত্য ছিল যে, অর্জুন তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মনের মধ্যে জেগে উঠল তৃষ্ণা, অধিকারের অহঙ্কার আর শরীরের মধ্যে প্রথম কদম ফুলের রোঁয়া।

কৃষ্ণ বহুক্ষণ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন—তাঁর চোখ সরছে না কোনও দিকে। সম্মতি আর রহস্যের অদ্ভুত এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে কৃষ্ণ সহাস্যে অর্জুনকে বললেন—বনবাসী পুরুষের মনটা বড় রসিয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। এ আমারই বোন, পিতা বসুদেবের বড় আদরের মেয়ে—সুভদ্রা। তোমার মন হয় তো বলো—বাবার সঙ্গে আলাপ করতে পারি এ বিষয়ে। অর্জুন বললেন—যে রমণী কৃষ্ণের বোন, বসুদেবের মেয়ে, আর এমন অসাধারণ যাঁর রূপ, সে কাকে মোহিত করবে না বলো—কম্ ইবৈষা ন মোহয়েৎ ? সত্যি কথা বলতে কি, তোমার এই বোনটি যদি আমার হত—যদি স্যান্ মম বার্ষ্ণেয়ী !

পাঠক-পণ্ডিতজনের কাছে আমার অনুরোধ—তাঁরা যেন অর্জুনের হতাশ বাক্যটুকু খেয়াল করেন—যদি আমার হত—যদি স্যান্ মম—সম্পূর্ণ আমার। বিবাহলগ্নে যিনি স্বামী হন—দোহাই আপনাদের, নারী-স্বাধীনতার প্রবক্তারা আমায় রক্ষা করুন—সেই স্বামীর মধ্যে আপন স্ত্রীর বিষয়ে অহঙ্কার অধিকারিত্বের বোধ থাকেই। বোধ থাকে—এই রমণী একমাত্র আমার। অথচ দ্রৌপদীকে বিয়ে করার পর পাঁচ ভাইয়ের মিশালে অর্জুনের সেই অধিকারবোধ এবং স্বামিজনোচিত অহঙ্কার একটুও তৃপ্ত হয়নি, যা একজন সাধারণ স্বামীরও হয়ে থাকে। উলূপীর সঙ্গে একরাত্রির গভীর পরিচয়ে সাধ্যসাধন যত বড় হয়ে উঠেছে, মোহ ততটা নয়। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পরিণয়ে স্বামীর অহঙ্কার তৃপ্ত হতে পারত। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার পিতা মেয়ের অধিকার ছাড়েননি। তাঁর পুত্র ছিল না, অতএব তাঁর শর্ত ছিল মেয়ের যে ছেলে হবে, সেই পুত্রিকা-পুত্রই তাঁর রাজ্যে রাজা হবেন। এই অর্ধেক অধিকারের মধ্যে স্বামীর অহঙ্কার তৃপ্ত হয় না। কিন্তু এইবার এবং এই প্রথম কৃষ্ণের বোনটিকে দেখে, তাঁর রূপ, গুণ এবং স্নিগ্ধতা দেখে অর্জুনের মনে হল—এই সেই রমণী যাঁর অধিকার পেলে নিজেকে সার্থক মনে করবেন অর্জুন।

সুভদ্রার ক্ষেত্রে অর্জুন কোনও হঠকারিতা করেননি। কৃষ্ণ যদিও বলেছিলেন—বলো তো পিতা বসুদেবকে বলি, কিন্তু অর্জুন সে পথে যাননি, কেন না সম্পর্কে বসুদেব তাঁর আপন মামা—যদি কোনও বাধা আসে। অর্জুন কৃষ্ণকে একান্তে বললেন—কী করা যায় বলো তো ভাই, একটা উপায়

বলো—সে উপায় যদি মানুষের সাধ্যির মধ্যে হয়, তা হলে এ ব্যাপারে আমি তার শেষ পর্যায়ে যেতে রাজি আছি। কৃষ্ণ অর্জুনের একাগ্রতা বুঝে বললেন—দেখো ভাই। এক হতে পারে—আমরা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতে পারি, আর তুমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার হিসেবে সেখানে থাকতেই পারো।

কৃষ্ণ স্বয়ম্বরের কথা বললেন বটে, তবে এই বিকল্পে তিনি নিজেই খুশি হলেন না, কারণ স্বয়ম্বর-সভায় নির্দিষ্টা রমণী যে নির্দিষ্ট পুরুষটিকেই বিবাহ করবেন, তা তো নয়। নিজের বোন হলেও মেয়েদের স্বভাবের ব্যাপারেও কৃষ্ণের সংশয় আছে। কারণ, বর পছন্দ করার সময় পুরুষমানুষের বীরত্ব-পাণ্ডিত্য—ইত্যাদি বড় বড় গুণই যে স্ত্রীলোকের ব্যক্তি-চিত্তে বড় হয়ে দেখা দেবে—তার কোনও মানে নেই। একেবারেই অপরীক্ষিত অথচ আপাতরমণীয় পুরুষেও স্ত্রীলোকের স্পৃহা বা কামনা অকল্পনীয় নয়। কৃষ্ণ তাই বললেন—স্বয়ম্বরে এসে তুমি আমার বোনের বরমাল্য আদায় করে নিয়ে যাবে—সেটা বড়ই অনিশ্চিত—স চ সংশয়িতঃ পার্থ স্বভাবস্যানিমিত্ততঃ। তার চেয়ে আমি বলি কি—আমরা একটা স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করতেই পারি, কিন্তু তুমি সেখানে এসে জোর করে রথে তুলে নিয়ে যাও সুভদ্রাকে—ক্ষত্রিয়-পুরুষেরা তো এমন বিয়ে করেই থাকে।

মনের যে অবস্থায় অর্জুন সুভদ্রাকে নিজের মতো করে পেতে চেয়েছেন, কৃষ্ণ সেটা বন্ধুজনোচিত বেদনাবোধে অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে নিজের বোন হলেও তিনি কোনও 'চান্স' নিতে চাননি। আবার অর্জুনের দিক থেকেও সুভদ্রার ব্যাপারটা এত বেশি সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এটি তাঁর কাছে শুধু বিবাহমাত্র ছিল না। অন্তত এই রমণীটির ক্ষেত্রে তাঁর অনুরাগ এবং মর্যাদাবোধ এতটাই ছিল যে, সুভদ্রা-হরণের বহু আগেই অর্জুন তাঁর করণীয় কার্য প্রস্তাবের আকারে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমোদনের জন্য। যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গেই অনুমোদন করেছেন এবং অর্জুন কাজে নেমেছেন। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ের যে রাজনৈতিক তাৎপর্য—তা আমি অন্যত্র 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ' প্রবন্ধে দেখিয়েছি। কিন্তু সুভদ্রার ক্ষেত্রে অর্জুন যে শুধুই ব্যক্তিগতভাবে নয়, নিজের পরিবারকেও জড়িয়ে নিতে চেয়েছেন—তার পেছনে কারণ হল সেই বিশিষ্ট, ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ—যা এই মুহূর্তে দ্রৌপদীকেও অতিক্রম করেছে। দ্রৌপদীরও মন ভাঙতে আরম্ভ করেছে, কপাল পুড়তে শুরু করেছে এই মুহূর্ত থেকেই। সে কথায় পরে আসছি।

দুটি প্রাণী দুটি পৃথক কারণে রৈবতক পাহাড়ে গেছেন। একজন ধনুক-বাণ, ঢাল-তলোয়ার রথে চাপিয়ে রৈবতক পাহাড়ে মৃগয়া করতে গেছেন। তিনি জানেন—তিনি কী করবেন। কোন মৃগীকে তিনি পঞ্চশরের একটি শরে সম্মোহিত করে দেবেন—তিনি জানেন। তিনি অর্জুন। আরেকজন রৈবতক পাহাড়ে দেবতার উদ্দেশে পুজো দিতে গেছেন। তিনি তখনও জানেন না—তাঁর কী হবে। যে দেবতাকে তিনি এইমাত্র পুজো করলেন—সে দেবতা আড়াল থেকে তাঁকে মধু-মৃগয়ার শিকার হবার আশীর্বাদ দিলেন কি না—তা এই নিঃসন্দিগ্ধা রমণী জানেন না। তিনি সুভদ্রা। পুজো সেরে, ব্রাহ্মণদের দান দিয়ে, দেবশৈল রৈবতক পাহাড় পরিক্রমা করে সুভদ্রা ঘরে ফিরবেন, ঠিক এমন সময় অর্জুন সবেগে রথ চালিয়ে এসে নিঃসন্দিগ্ধা রমণীকে চেপে ধরলেন পেছন থেকে। জোর করে সপৌরুষ আলিঙ্গনে সুভদ্রাকে অর্জুন নিজের রথে তুলে নিলেন। অর্জুনের তখন কী অবস্থা! দ্রুপদের স্বয়ম্বর-সভায় দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করে অর্জুনের মনে যতখানি বীরোচিত সন্তুষ্টি এসেছিল, রমণীর সরস অধিকার ততটা নয়। আজ শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে যে রমণীকে তিনি সালিঙ্গনে অধিকার করে নিলেন, তাঁর থরথর কুমারীস্পর্শে অর্জুনের প্রতি অঙ্গে সাড়া পড়ে গেল—সুভদ্রাং চারুসর্বাঙ্গীং কামবাণ-প্রপীড়িতঃ। অর্জুনের কাঞ্চনরথ ছুটে চলল ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে।

যাদবদের মেয়ে ডাকাতি হয়ে গেল, বিশাল শোরগোল উঠল দ্বারকায়। এই রথ আন্, এই তলোয়ার, এই খড়্গ—এই বেটার পেছনে ধাওয়া কর—এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বিপর্যস্ত দ্বারকাবাসীরা যে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই প্রস্তুত হল। ঠিক এমন একটা মুহূর্তে কৃষ্ণের বড়ভাই বলরাম আরেক পাত্র মদ চড়িয়ে নিয়ে বললেন—মহামতি কৃষ্ণের মুখ দিয়ে যে একটি কথাও বেরুচ্ছে না। সে কথা বলুক, তার মনের ভেতর কী আছে একটু শুনি। এই কৃষ্ণই তো এই

বেটাকে আদর-আপ্যায়ন আর আরতি করে নিজের ঘরে এনে তুলেছে। বলি ওই কুলাঙ্গার কি এত আদরের যোগ্য ? বেটা—আমারই বাড়িতে বসে যে থালাটায় খেলি, সেই থালাটাও ভেঙে দিয়ে গেলি—কো হি তত্রৈব ভুক্ত্বান্নং ভাজনং ভেত্তুমর্হতি। আজ আমি ওকে ছাড়ছি না, সে সুভদ্রাকে নিয়ে গেল, না নিজের মৃত্যুকে রথে চাপিয়ে নিয়ে গেল—একবার দেখছি আমি।

এক নিঃশ্বাসে বলরামের কথার ঝড় বয়ে গেলে কৃষ্ণ মুখ খুললেন। বললেন—সুভদ্রাকে জোর করে তুলে নিয়ে অর্জুন কী এমন অন্যায় করেছে ? সমগ্র যাদবকুলই বা এটাকে অপমান হিসেবে নিচ্ছে কেন ? এমন তো নয় যে, অর্জুন আমাদের অর্থলোলুপ ভেবেছে—আমরা কি টাকা পয়সার পণ নিয়ে তাকে মেয়ে দিতাম ? যদি বলেন—বেশ তো, সুভদ্রার স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন হত, অর্জুনও সেখানে আসত। কিন্তু সে ব্যাপারটা সে নিশ্চিত মনে করেনি, কারণ সেখানে সুভদ্রা অন্য কাউকে পতি নির্বাচন করলে, অর্জুন সেটা সহ্য করতে পারত না। আর যদি বলেন—বেশ তো, সুভদ্রাকে যদি অর্জুনের এতই পছন্দ, তো আমরা বামুনদের মতো তার বাড়ির গুরুজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, মেয়ে দেখিয়ে, অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দিতাম—তা হলে বলব—এই দেখাদেখি, বোঝাবুঝি—এত সব ব্রাহ্মবিবাহের ঢঙগুলো অর্জুনের মতো বীরপুরুষেরা ছাগলের মতো মনে করে—প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কো'নুমন্যতে।

সবার শেষে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করলেন—তা ছাড়া এতে হয়েছেটা কী ? সুভদ্রা সুন্দরী—সে কথা সবাই এখন জেনে গেছে, আর সেই সৌন্দর্যের কারণেই সে হৃত হয়েছে। তা ছাড়া ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে যে জন্মেছে—সেই অর্জুনও তো এমন কিছু ফেলনা নয়। স্বর্গে-মর্ত্যে তার সমান বীর আমি দেখিনি। এখন যদি দ্বারকাবাসীরা সবাই মিলে বীরদর্পে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আর তারপর যদি পরাজিত হয়, তা হলে আমাদের মান-মর্যাদা কিছুই থাকবে না। তা এসব ঝামেলার চেয়ে আমি বলি কি তাকে ফিরিয়ে আনুন। তাতে লজ্জার কিছু নেই। সে আমাদের পিসতুতো ভাই, আমাদের সঙ্গে সেও কোনও শত্রুতা পুষে রাখবে না।

কৃষ্ণের কথা সবাই শুনলেন। অর্জুনকে ফিরিয়ে আনা হল সেই মতো। শুভলগ্নে অর্জুন-সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর অর্জুন বছর খানেকের বেশি-কিছু দিন থেকে গেলেন দ্বারকায়। বেশ ভালই কাটল। বারো বছর বনবাসের আর যেটুকু বাকি রইল সেটুকু নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য অর্জুন পুষ্কর তীর্থে চলে গেলেন। তীর্থ-ভ্রমণ দিয়ে বনবাস শুরু হয়েছিল। তীর্থেই সে বনবাসের সমাপ্তি। এরই মধ্যে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা আর সুভদ্রার প্রণয়-পরিণয়ে ব্রহ্মচর্য এবং বনবাসের ত্রুটি কতটা হল জানি না, কিন্তু মহাভারতের কবিও হয়তো অর্জুনের অশান্ত মনের দিকে তাকিয়ে তাঁর ত্রুটি মার্জনা করে দিয়ে মন্তব্য করেছেন—অর্জুন নিজের দেশে ফিরলেন বনবাসের নিয়মে সংযত থেকেই—নিয়মেন সমাহিতঃ—নীলকণ্ঠ লিখেছেন—বনবাসব্রতাচারেণ সমাহিতঃ সংযতচিত্তঃ। এখানে অবশ্য অর্জুনের ব্রহ্মচর্য অথবা বনবাস কতটা রক্ষিত হল—তা নিয়ে অন্তত আমি অত চিন্তিত নই। আমার চিন্তা—অর্জুন বারো বছর পরে ঘরে ফিরলেন এবং ফিরলেন যাদব-সাত্বত-কুলের অনিন্দ্যসুন্দরী সুভদ্রাকে নিয়ে।

৬

আগের অধ্যায়ের অর্জুনের মুখ থেকে শুধু একটা কথা শোনার জন্য আমরা বিরাটপর্বের ঘটনাটা বলেছিলাম। অর্জুন বলেছিলেন—কেউ কোনওদিন কারও মন বুঝতে পারে না, দ্রৌপদী। আমরা বলেছিলাম—পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকের প্রতি নীতিগতভাবে সমদর্শিনী হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদী অর্জুনের মুখে ওই একটি কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করেছেন এবং নিজের অন্তরজাত আত্মবিশ্বাসের শুশ্রূষা করেছেন। ভেবেছেন—মানুষটা একান্তভাবে আমারই। কিন্তু এই মুহূর্তে আজ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে যাদবনন্দিনী সুভদ্রার আগমন হল, তখন দ্রৌপদীর জীবনের শেষ মুহূর্তটার কথা আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী যখন হিমালয়ের পথে চলতে চলতে মৃত্যুর আঘাতে

লুটিয়ে পড়লেন ভুঁয়ে, তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাজপুত্রী যাজ্ঞসেনী কোনওদিন কোনও অন্যায় করেননি, তিনি কেন এইভাবে মারা গেলেন ? যুধিষ্ঠির বললেন—আমাদের সবার মধ্যে অর্জুনের ওপর তাঁর প্রেমের পক্ষপাত বেশি ছিল। এই কারণেই আজ তাঁর মৃত্যু।

দেখুন, সাধারণভাবে মহাভারত পড়ে অথবা দ্রৌপদীর কাজকর্ম, ব্যবহার বিচার করে এই পক্ষপাত বার করা খুব মুশকিল। এমনও নয় যে, তিনি অর্জুনের পাতে আলাদা ঘি দিতেন, কি মাছের মুড়োটি তাঁর জন্য সরিয়ে রেখেছেন আলাদা করে। এই পক্ষপাত বোঝা যাবে দ্রৌপদীর ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়। এ সব কথা কথঞ্চিৎ সবিস্তারে আমরা 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে দেখিয়েছি। কিন্তু আজ অর্জুনের দিক থেকেও ব্যাপারটা বোঝার সময় এসেছে। কারণ আজ তিনি সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন। যে রমণী পঞ্চস্বামীর মধ্যে আপনার প্রেম ভাগ করে দিয়েও তাঁর গোপন গভীর সারাংশটুকু স্বয়ম্বর-সভার লক্ষ্যভেত্তা পুরুষটির জন্য সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছেন, সেই অর্জুন আজ সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন। কাজেই দু'জনকেই আজ লক্ষ্য করতে হবে—দ্রৌপদীকেও, অর্জুনকেও। একজন রমণী—যিনি স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যভেত্তা পুরুষকে হৃদয়ের বরমাল্য দিয়েও তাঁকে সম্পূর্ণ পেলেন না। আরেকজন পুরুষ—যিনি আপনার প্রাপ্য বীরোচিত উদারতায় ভাইদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে কপালদোষে বারো বছর বনে কাটিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। এই তাঁদের দ্বিতীয়বার দেখা হল। দ্রৌপদী আগেই জানেন—সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়ে গেছে।

অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করলেন। এই রাজদর্শনের পরেই অর্জুন ছুটলেন দ্রৌপদীর ঘরে। কেন ? তাঁর কি দেখা করবার মতো আর কোনও গুরুজন ছিলেন না ? রাজমাতা কুন্তী, মেজদাদা ভীমসেন—এরা কি কিছুই নন ? আমরা বলি—গুরুজন বটে, তবে গুরুতর নন ততো। অর্জুন জানেন—তার দ্বিতীয়-বিবাহে এই বিদগ্ধা রমণীর হৃদয়ে কী আঘাত লাগতে পারে। তিনি জানেন—আপন মনোজ্বালায় তিনি যতই দগ্ধ হন না কেন, তিনি যদি অন্যত্র মন দেন, তা হলে দ্রৌপদীর ভালবাসায় যতটুকু আঘাত লাগবে, তার থেকে অনেক বেশি লাগবে তাঁর প্রেমের অহঙ্কারে, অধিকার-চেতনায়। দ্রৌপদীর মনে হবে বুঝি—সিংহীর মুখের গ্রাস শৃগালিনী তুলে নিয়ে গেল। অর্জুন তাই সাত-তাড়াতাড়ি দ্রৌপদীর কাছে এসেছেন।

বিদগ্ধা রমণী বলেই তখনও দ্রৌপদীর ভাষায় প্রণয়ের অভিমান ছিল। অর্জুনকে দেখামাত্রই তিনি বলে উঠলেন—তুমি আবার এখানে কেন, অর্জুন ? যেখানে যাদব-কুলের সুন্দরী সুভদ্রা রয়েছেন, সেইখানেই যে তোমার জায়গা, তুমি সেইখানে যাও—তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। শুধু এইটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অভিমান নিবৃত্ত হয়ে গেছে। দ্রৌপদী বাস্তব বোঝেন অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে এবং আপাতত তিনি এটা বুঝতেই পারলেন যে, তাঁর মনের মানুষকে আরও একজন অধিকার করে নিয়েছে। বাস্তবতা বোঝানোর জন্য আমাদেরই দৈনন্দিন জীবনের এমন একটা উপমা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, যা দ্রৌপদীর মতো স্পষ্টবক্তার মুখেই মানায়।

দ্রৌপদী বললেন—যে জিনিসটা আগেই ভাল করে বাঁধা ছিল, সেটা যদি আরও ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়, তা হলে আগের বাঁধনটা আলগা হয়ে যায়। আমারও তাই হয়েছে। আজ সুভদ্রার নতুন প্রেমের বাঁধনে দ্রৌপদীর পুরাতন বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। তবে এই সাভিমান স্পষ্টভাষিতার মধ্যেও দ্রৌপদীর বক্রোক্তির ঝাঁঝ বড় কম নয়। অর্থাৎ তাঁর প্রেম যতখানি, তার থেকেও প্রেমের অহঙ্কার বেশি। তিনি যে বাক্যটা বলেছিলেন—তার মধ্যে নতুন-পুরাতন প্রেমের বাঁধনের থেকেও যে-কথাটা বড় বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে শ্রোতাকে কষাঘাত করে—সেটা হল তাঁর উপমাটি। দ্রৌপদী বলেছেন—সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য—অর্থাৎ যে ভার আগে থেকেই ভাল করে বাঁধা হয়েছে। দ্রৌপদী বলতে চাইছেন—তোমাদের মতো পুরুষমানুষেরা অনেকটা যেন ভারী বোঁচকা-বুঁচকির মতো জড় ; মনের বিকার নেই তোমাদের। আমি বাঁধন দিলাম আর আমার প্রেমের গ্রন্থিতে মনে হল যেন বেশ শক্ত-পোক্ত হয়েছে, ওমা যেই না আরেকজন এসে আরও একগাছা প্রেমের সূত্রে নতুন বাঁধনে বেঁধে নিল তোমাকে, অমনই তুমি ভারী বোঁচকাটার মতো আরও একটু চুপসে গেলে ভেতরে, নতুন বাঁধন লাগল শক্ত হয়ে, পুরনো বাঁধন শুধু আলগা ফাঁসের মতো পড়ে রইল, তাকে খুলে ফেলাও কঠিন

অথচ নতুনটা আছে বলে তার প্রয়োজনও নেই—সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে।

মহাভারতে কবি যে উপমাটা একেবারে 'ক্রুড্ ফর্মে' ব্যবহার করলেন কবির কবি সে কথা প্রকাশ করেছেন আপন কাব্য চেতনার সমস্ত গভীরতা মিশিয়ে। বস্তুত নবপ্রেমজালে আটকে পড়া অর্জুনকে দেখে দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে যদি নিতান্ত আধুনিকভাবে বা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বেরুত, তা হলে তার রূপ হত এইরকম—

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর॥

দ্রৌপদী অনেক কাঁদলেন। পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদী একতম পাণ্ডবের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে অনেক কাঁদলেন। এ এমন কান্না—যার কারণ বুঝিয়ে দিলে বিদগ্ধা রমণীর কষ্ট হয়। পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকেরই দ্রৌপদী ছাড়াও অন্য বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু দ্রৌপদী তখন তো কাঁদেননি। কিন্তু অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করে আনলে দ্রৌপদী অনেক কাঁদলেন। স্বয়ং দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা হয়ে যাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই অর্জুন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে কী করে—এই খেদেই দ্রৌপদী কাঁদছেন। অর্জুন সেটা বোঝেন। অর্জুন বোঝেন—দ্রৌপদীর এই কান্নার মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণ করে পাবার আকুলতা যতখানি, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি আছে হেরে যাবার যন্ত্রণা, অহঙ্কারের হানি। অর্জুন তাই দ্রৌপদীকে অনেক বোঝালেন, অনেকবার তিনি ক্ষমা চাইলেন। সান্ত্বয়ামাস ভূয়শ্চ ক্ষময়ামাস চাসকৃৎ। কিন্তু সান্ত্বনা আর ক্ষমায় অগ্নিসম্ভবা দ্রৌপদীর ক্ষোভ দূর হল না। শেষে অর্জুন একটা বুদ্ধি করলেন।

সুভদ্রা তখন দ্বারকা থেকে কেবল ফিরেছেন। বাপের বাড়ির সব সমৃদ্ধি তখনও তাঁর বেশে-বাসে, অলংকারে ছড়িয়ে। বিয়ের লাল-চেলি আর সোনার গহনায় তাঁকে দেখতে লাগছে ঠিক রাজরানির মতো। অর্জুন দেখলেন—পাঞ্চালের সেই খণ্ডিতা রাজবধূ যদি একবার সুভদ্রার এই বিবাহোদ্ধতা মূর্তি দেখেন, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। সেই মুহূর্তে তিনি সুভদ্রার অঙ্গ থেকে বিবাহের অনুরাগ মাখা রক্ত বসনখানি নামিয়ে নিলেন। তারপর বৃন্দাবনের গোপিনীদের মতো সাধারণ একটি ঘাঘরা আর ওড়না দিয়ে সুভদ্রাকে সাজিয়ে দিলেন অর্জুন—রক্তকৌষেয়বাসিনীম্। পার্থ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ।

সাধারণের সাজে সুভদ্রাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল ; তিনি জননী কুন্তীর কাছে আশীর্বাদ নিয়েই প্রথমে এলেন দ্রৌপদীর কাছে। তাঁর পা জড়িয়ে ধরে অর্জুনের শিক্ষামতো প্রথম কথাটি বললেন সুভদ্রা—আমি তোমার দাসী, দিদি ! পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর মনে কেমন যেন মায়ার সঞ্চার হল। নববধূর সাধারণ সাজে সুভদ্রতাকে দেখে, তাঁর দৈন্যভরা আর্তির কথা শুনে ক্ষণেকের তরে বুঝি গরবিনীর মনে হল—না তো ! আমি যতখানি তাঁকে হারিয়েছি ভেবেছি, ততটা তো নয়, সে তো এখনও আমারই আছে। সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে নববধূকে পা থেকে উঠিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। সকৌতুকে বুক-ভরা আশীর্বাদ দিয়ে বললেন—তোমার স্বামীর যেন আমার মতো শত্তুর না থাকে—নিঃসপত্নো'স্তু তে পতিঃ।

অর্জুনের মনশ্চিকিৎসায় দ্রৌপদীর মনে একটু প্রলেপ লাগল বৈকি। এই যে অর্জুন তাঁকে অতিক্রম করলেন না—এই সান্ত্বনাই দ্রৌপদীকে আবারও বয়ে নিয়ে চলল জীবনের পথে—সাধিকারে, সদর্পে। আর কী আশ্চর্য, শুধু আজ নয় অর্জুন কোনওদিনই দ্রৌপদীকে অতিক্রম করেননি। সুন্দরী সুভদ্রাকেও তিনি সেই ভাবে চালিয়েছেন যাতে তিনিও কোনওদিন দ্রৌপদীকে অতিক্রম না করেন। এই অনতিক্রমই মহাপ্রস্থানের পথ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে অর্জুনের ব্যাপারে আশ্বস্ত

রেখেছে। আসলে নিজের সমস্ত অভিমান, অহঙ্কার সত্ত্বেও যদি দ্রৌপদী কাউকে ভালবেসে থাকেন—তবে তিনি অর্জুন। আর বেচারা অর্জুন, এই ভালবাসা বুঝেও তিনি বোঝেননি, ইচ্ছে করেই বোঝেননি। সারা জীবন দ্রৌপদীকে কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছেন। ভাইদের কাছে সংকোচ—যদি স্বভুজলব্ধা রমণীটির প্রতি আপন অধিকার প্রকাশ পায়। নিজের মন আবর্তিত করেছেন যাদবনন্দিনী সুভদ্রার দিকে, কিন্তু সেও বড় সাবধানে, বড় সতর্কভাবে—যদি কৃষ্ণা পাঞ্চালীর অহঙ্কার আর অধিকারবোধে আঘাত লাগে। কিন্তু এই সংকোচ, সাবধান সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে প্রতি পদে প্রতি পলে দ্রৌপদীর কাছে বিশ্বস্ত রেখে তাঁর নিজের মনের-কী অবস্থা হয়েছিল ? নিশ্চয়ই তা এতটাই করুণ যে, কোনও এক হতাশ্বাস চরম মুহূর্তে তাঁকে নপুংসকের সিদ্ধিতে বলে উঠতে হয়—কেউ কোনওদিন কারও মন বোঝে না দ্রৌপদী—ন তু কেনচিদ্ অত্যন্তং কস্যচিদ্ হৃদয়ং ক্বচিৎ। বেদিতুং শক্যতে ভদ্রে...।

আমার সহৃদয় পাঠককুল—আপনারা নিশ্চয়ই অর্জুনকে এতক্ষণে খানিকটা বুঝেছেন। রমণীর প্রেম—যা নাকি সাধারণ একটি মানুষও সাহঙ্কারে আত্মসাৎ করে, সেখানেও অর্জুনকে কী অদ্ভুত এক 'ব্যালান্স' রেখে চলতে হচ্ছে। এই সমতা রাখতে রাখতে এক সময় যখন তিনি ক্লান্ত, বিষণ্ণ হয়ে যান, তখনই দেখি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হতে চলেছে। বিরাট দুই সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুর্বল, সংকুচিত অর্জুন যেন তাঁর জীবন-রথের সারথির কাছে সারা জীবনের প্রশ্ন করে যাচ্ছেন ; আর উত্তর মিলিয়ে দেখছেন—আমি ঠিক করেছি তো ? অর্জুন বললেন—তুমি তো খালি বলছ—সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ—সব জায়গায় শুধু সমতা রাখতে হবে, 'ব্যালান্স' রাখতে হবে, কিন্তু এও কি সম্ভব ? আমার মন ? মন যে বড়ই চঞ্চল। যতবার ভেবেছি—আমি মনকে সংযত করে রাখব, পারিনি, হয়নি। হাওয়া যেমন আটকানো যায় না ভাই, মনটাও তেমনি আটকানো যায় না—সমস্ত 'ব্যালান্স', সমস্ত সমতার বুদ্ধি হাওয়ার দমকে এক মুহূর্তে উবে যায়—তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।

অর্জুন মিলিয়ে নিচ্ছেন। যে সমস্ত পণ্ডিত গো-এষণার তত্ত্বে আকুল হয়ে মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতার অবস্থিতি অসংবদ্ধ বিবেচনা করেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ—তাঁরা যেন 'অপউদ্ধার' পদ্ধতি বাদ দিয়ে শিল্পীজনোচিত সমবেদনায় সমস্ত মহাভারত মিলিয়ে পড়েন। তাই বলছিলাম—অর্জুনও মিলিয়ে নিচ্ছেন। নিশ্চয়ই তিনি দাদার কথা শুনে বারো বছর ব্রত-নিয়মে থাকবেন ভেবেছিলেন। মন তা হতে দেয়নি, ইন্দ্রিয়গুলি তা হতে দেয়নি। অর্জুনের একমাত্র সান্ত্বনা—কৃষ্ণ পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি মানুষের মনকে জোর করে উত্তাল করে তোলে—ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। অর্জুন তাই এখন স্বস্থ হয়ে বুঝেছেন—আমারও তো এমনই ঘটেছে। নইলে, দাদা যুধিষ্ঠিরের কাছে সংকল্পিত ব্রহ্মচর্য নাগকন্যা উলূপীর সরসতায় এক মুহূর্তে উবে গেল। চিত্রাঙ্গদার বেলায় ইন্দ্রিয়ের গতি আরও শিথিল, দেখা মাত্রই কামনা। আর 'চারু-সর্বাঙ্গী' সুভদ্রার কাছে এসে অর্জুনের ব্রত-নিয়ম, সংকল্প ঝড়ের মুখে কুটোটির মতো উড়ে গেল। এই অর্জুনই তো বলবেন—মনের গতি যে ভাই দমকা হাওয়ার মতো, আটকানো অসম্ভব—বায়োরিব সুদুষ্করম্। কৃষ্ণ মনুষ্যধর্মের সমস্ত মমত্ব দিয়ে কথা বলবেন—সে-কথা ভাই বড় সত্যি—অসংশয়ং মহাবাহো—মনকে আটকে রাখা বড় দায়। কিন্তু এর জন্য চাই অভ্যাস, স্খলিত *হলেও পুনরায় অভ্যাস।*

অর্জুনের বুকে বুঝি স্বস্তি আসল কিছুটা। বনবাস-ব্রহ্মচর্যের সমস্ত সদিচ্ছা নিয়েই তিনি স্খলিত হয়েছেন, দ্রৌপদীর জন্য সমস্ত হৃদয়ের অপেক্ষা রেখেও, তিনি মনের অস্থিরতায় সুভদ্রার প্রেমে বন্দি হয়েছেন। এই যে সদিচ্ছার সংকল্পের সঙ্গে বাস্তবের স্খলন-পতন-ত্রুটিগুলি কিছুতেই মিলছে না—এতে অর্জুন বিচলিত, একেবারে দার্শনিকভাবে বিচলিত। অভ্যাস কি তিনি কম করেছেন ? আপনার সম্পূর্ণ প্রাপ্য প্রিয়তমা পত্নীকে না পাওয়ার অভ্যাস পর্যন্ত তাঁর রপ্ত হয়ে গেছে। তবু তারই

মধ্যে এসেছে অবিশ্বস্ততা, স্খলন—মনের গতিতে তা হলে সবই কি ভুল হয়ে গেল ? অর্জুন মিলিয়ে নিচ্ছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আসরে দাঁড়িয়ে পূর্ব জীবন এবং যৌবনের আপাত-বিরোধগুলির জবাব চাইছেন তিনি। কৃষ্ণকে বলছেন—তুমি তো বলেই খালাস। অভ্যাস আর বৈরাগ্যে মন বশ করতে হবে। তা ধরো—আমি তো প্রথমে আমার সংকল্পে আর সততায় শ্রদ্ধাবান ছিলুম, কিন্তু মনের জ্বালা বড় জ্বালা। আমি আমার প্রচেষ্টায় যত্নে স্থির থাকতে পারিনি—অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ। দ্রৌপদী, দ্রৌপদীর জন্য বনবাস—এ-সব কিছুতেই তো অর্জুনের প্রাথমিক সততার অভাব ছিল না, কিন্তু মনের গতি তাঁকে সংকল্প থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে দূরে। তাই বলে কি সব তাঁর ব্যর্থ হল ! অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—এসব লোকের কী গতি হয়, কৃষ্ণ ? অর্জুনের মনে হচ্ছে—মনের গতিকে সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভের সমতাও আমার হল না, দ্রৌপদীকেও আমি হারালাম—আমার এদিকও গেল, ওদিকও গেল, আকাশে ওড়া ছেঁড়া মেঘের মতো আমার সিদ্ধির কোনও ঠিকানা রইল না—কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট শ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

কৃষ্ণ ভগবান সিদ্ধান্ত দিলেন। তিনি যে মানুষের মন, মায়া, মোহ, শ্রদ্ধা, সংকল্প—সব জানেন। কৃষ্ণ বললেন—না, অর্জুন, না। সংকল্পিত অবস্থা থেকে তুমি যতই চ্যুত হও, তবু তুমি হীন নও। তুমি যে ভাল কাজ করতে চেয়েছিলে, ভাল কাজ করেছিলে এটাই অনেক, এমন মানুষের কোনওদিন দুর্গতি হয় না—ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

আমি জানি—গীতার শ্লোকের গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলি থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। তবু জীবনের প্রাপ্য রমণীকে সম্পূর্ণ করে না পাওয়ার পরেও, সুভদ্রাকে নিয়ে তিনি যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়—সংসার-জগতে অর্জুন সেই দুর্লভ 'আত্মসংস্থ' পুরুষদের একজন যিনি রমণীর ভালবাসার ক্ষেত্রে মানুষের মতোই দুর্বল বটে, কিন্তু সেই দুর্বলতাকেও বুদ্ধি আর ধৈর্যের বন্ধনে তিনি এমন এক দার্শনিকের ভূমিতে উন্নীত করতে পারেন যে, তাঁকে সংসার-সন্ন্যাসী না বলে পারি না। মহাভারতের চরিত্রকে গীতার দর্শনে মিলিয়ে নেবার সুযোগ এইখানেই।

৭

সুভদ্রার পর অর্জুনকে আমরা আর কোনও রমণীর চিন্তায় মন দিতে দেখিনি। বস্তুত এই রাগ-অনুরাগ-অভিমান পর্বের পর অর্জুনের জীবনের কয়েকটি বড় ঘটনা আমাদের তীব্রবেগে উল্লেখ করতে হবে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সাময়িক জ্ঞাতিভেদ এড়ানোর জন্য যুধিষ্ঠিরকে যে জায়গাটা রাজ্য করার জন্য দিয়েছিলেন, সে জায়গাটা ছিল জঘন্য। চাষবাস হয় না, শষ্য মেলে না, শুষ্ক-রুক্ষ মরুভূমির মতো সে দেশ। সদ্য বিবাহের পর অর্জুন বনবাসে গেলে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ঘরে বাইরে রাজ্য সামলে রাজধানী বা রাজপ্রাসাদের উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। অর্জুন ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাচক্রে অগ্নিদেবতার যে খাণ্ডব-বন পুড়িয়ে খেতে ইচ্ছে হল, সেটা আমাদের মতে নেহাতই সমানুপাতিক। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ছোট ছিল এবং বন কেটে বা পুড়িয়ে বসতি তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। দগ্ধ বনে অতঃপর শষ্যরোপণের ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাই হোক, অর্জুন বনবাস থেকে ফিরে আসার পর খাণ্ডব-বন পোড়ানোটাই তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য এই বন-দহনের সূত্র ধরেই অর্জুনের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কিছু শুভ লাভ হল। তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হবে অর্জুনের বড় পছন্দের ধনুক গাণ্ডীবের কথা। গণ্ডারের পিঠের চামড়া দিয়ে তৈরি এই ধনুক তাঁর কাছে এতই পছন্দ এবং শ্রদ্ধার ব্যাপার ছিল যে, দাদা যুধিষ্ঠিরও যদি কখনও এই ধনুকের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলেন, তো তাঁকেও তিনি রেহাই দেননি। অর্জুনের কপিধ্বজ রথটিও এই খাণ্ডবদহনের প্রাপ্তি। এই দুটি জিনিসই অর্জুন পেয়েছেন খাণ্ডববন পোড়ানোর আগে স্বয়ং অগ্নিদেবের সহায়তায়। এই দুটি জিনিসের উল্লেখ না করে পারলাম না, কারণ গাণ্ডীব ধনুর সঙ্গে অর্জুন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, গাণ্ডীব ছাড়া তাঁর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। যদিও

পূর্বোল্লিখিত চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যদি তিনি 'পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা' বলে নিজেকে 'এলিভেট' করে থাকেন, তবে যথার্থতার খাতিরে ওই মুহূর্তে সে-পরিচয় মিথ্যা হলেও, গাণ্ডীব ছাড়া যে অর্জুনকে কল্পনা করা যায় না—সেইটাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

খাণ্ডবদহনের সূত্রে অর্জুনের পারিবারিক লাভ—ময়দানবের নির্মাণ—ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা। এই সভার জন্য যুধিষ্ঠিরের 'স্ট্যাটাস্ বেড়ে গেল, ফলে সম্রাট পদবী লাভের জন্য তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞ' করতে হল। এই রাজসূয়ের আগে যদিও অর্জুনকে কৃষ্ণ এবং ভীমের সঙ্গে মগধরাজ জরাসন্ধের হত্যায় অংশ নিতে হয়েছিল, তবে সেখানে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। অবশ্য ভূমিকা না থাকলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, যুধিষ্ঠির দাদা হিসেবে ভীম এবং অর্জুন কাউকেই জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাতে চাননি। কারণ ভীম-অর্জুন—দুজনেই ছিলেন যুধিষ্ঠিরের নয়নের মণি—ভীমার্জুনাবুভৌ নেত্রে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই মানসিক অবস্থাতেও প্রধানত অর্জুনের উৎসাহেই জরাসন্ধ-বধের পর্ব সূচিত হল। অর্জুনের কথায় তাঁর আপন সার্থকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা—একই সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অর্জুন বলেছিলেন—ধনুঃশর, অস্ত্রশস্ত্র, শক্তি, বাসুদেব কৃষ্ণের মতো বন্ধুপক্ষ, থাকবার জায়গা এবং যশ সবই আমি পেয়ে গেছি। পাওয়া হয়নি শুধু—যা এখন চাইছি তাই। এই উৎসাহের পরে যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব হয়নি। রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন যে ভারতবর্ষের উত্তর-দিকটা জয় করে বহু ধন-রত্ন ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে এলেন এই সব বীরোচিত ঘটনার উল্লেখ করে আমি সময় নষ্ট করব না। কারণ, অর্জুন যুদ্ধে যাচ্ছেন, যুদ্ধ জয় করেছেন, বীরত্ব প্রকাশ করেছেন—এইগুলি এতই জলভাতের মতো যে, অন্তত অর্জুনের চরিত্রে এগুলির কোনও নূতনত্ব নেই। আমাদের তাই অর্জুন চরিত্রের সেই দিকগুলির দিকে ফিরে তাকাতে হবে, যেখানে এই মহাবীর নিজেকে বীরোচিত মহিমায় সংযত রাখছেন, কারণ বীরত্ব থাকলে তার প্রকাশ যতখানি স্বাভাবিক, বীরত্ব সংযত রাখার ব্যাপারটা তার চেয়ে শতগুণ কঠিন এবং ঠিক সেখানেই অর্জুন—অর্জুন।

খাণ্ডবদাহের আগুন থেকে বেঁচে ময়দানব তাঁর কৃতজ্ঞতার শিল্পমাধুর্যে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা তৈরি করে দিলেন, সেই রাজসভার ঐশ্বর্য দেখেই দুর্যোধনের ঈর্ষা এবং সেই ঈর্ষা থেকেই শকুনির পাশা-খেলা, দ্রৌপদীর অপমান এবং পাণ্ডবদের বনবাস। ঠিক এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুনকে আমাদের এক ঝলক দেখে নিতে হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের আসরে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলি জয় করা ছাড়া অর্জুনের আর কোনও ভূমিকা নেই। এমনকী রাজসূয়ের শেষ পর্বে শিশুপাল বধ পর্যন্ত অর্জুনের কোন কার্যকরী ভূমিকা আমরা দেখিনি। তবে হ্যাঁ, যজ্ঞান্তে, সবাই চলে গেলে, দুর্যোধন যখন শকুনির সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ঐশ্বর্য দেখতে গিয়ে স্ফটিক-জলে পড়ে গেলেন, তখন ভীম-নকুলদের সঙ্গে অর্জুনও হেসেছিলেন। কাজটা ঠিক অর্জুনোচিত না হলেও অন্যভাইদের উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে এই হাসাহাসিটা অস্বাভাবিকও নয়। যাই হোক, যুধিষ্ঠিরের রাজসভার ঐশ্বর্য, সমস্ত রাজাদের যুধিষ্ঠিরের কাছে আত্মনিবেদন এবং সর্বোপরি দুর্যোধনের হাস্যাস্পদ হয়ে যাওয়া—এই সব কিছু মিলে শকুনির পাশা-খেলা ত্বরান্বিত করল। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে, পাশার দানে পাণ্ডবদের রাজ্য-ঐশ্বর্য জিতে নেওয়াটাই সময়োচিত এবং যুক্তিযুক্ত হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হল—ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলতে ডেকে পাঠালেন, তখন যুধিষ্ঠির কিন্তু অর্জুনের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একবারও আলোচনা করলেন না। পাশাখেলার অভিজ্ঞতা অল্প থাকা সত্ত্বেও নিজের নেশা এবং রাজোচিত মর্যাদায় তিনি হস্তিনাপুরে পাশা খেলতে এলেন। সঙ্গে রইলেন ভাইয়েরা এবং দ্রৌপদীর মতো স্ত্রী। অর্জুনকে আমরা এই পরিসরে একটাও কথা বলতে দেখিনি। এমনকী সেই যে ভয়ঙ্কর পাশা-খেলা আরম্ভ হল, যুধিষ্ঠির একের পর এক ধন-রত্ন, রাজ্য-সম্পত্তি হেরেই চলেছেন কিন্তু অর্জুনকে আমরা রা কাড়তে দেখছি না। খেলার পণ হিসেবে যখন স্বয়ং অর্জুনকেই বাজি রাখা হল, তখন তো নয়ই। অবশ্য একই সঙ্গে এটা বলতেই হবে—অর্জুন কেন, কোনও ভাই-ই যুধিষ্ঠিরের খেলা বা হারার সময় কোনও কথা বলেননি। কিন্তু

যখন দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হেরে গেলেন যুধিষ্ঠির এবং যখন সেই একবস্ত্রা রজস্বলা রাজবধূকে সকলের সামনে টেনে এনে বস্ত্রহরণের পালা আরম্ভ করলেন দুঃশাসন, তখন মধ্যম-পাণ্ডব ভীম কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারেননি। বিবাহিতা পত্নীর এই অপমানে তিনি দুঃশাসনের ওপর যতখানি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের প্রতি। কারণ পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি না রাখলে অপমানের এই চূড়ান্ত হত না। রাগে, অপমানে ভীম সহদেবকে বললেন—নিয়ে এসো আগুন, এই যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দেব আমি।

এইবার অর্জুনকে আমরা কথা বলতে দেখছি, নিতান্ত আশ্চর্যজনকভাবে কথা বলতে দেখছি। আর এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে, আপাতত অর্জুনের এই ব্যবহার স্ত্রী-স্বাধীনতা-কামী রমণীকুলের যথেষ্ট ক্রোধ উদ্দীপন করবে। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ থেকে আরম্ভ করে তাঁর উত্তমাঙ্গের বসন নমিত করা পর্যন্ত—তাঁকে যে চূড়ান্ত অপমান কৌরবসভায় সহ্য করতে হল, তার মধ্যে একটি কথাও বলেননি অর্জুন। অথচ এই এখনই ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দিতে চাইছেন—তখন তিনি কথা বলছেন। এই ব্যবহার শুধু সতর্ক রমণীকুলেরই ক্রোধের কারণ নয়, নিরপেক্ষ পুরুষকেও তা বিচলিত করে। তবু আগে আমরা অর্জুনের বক্তব্যটা শুনে নিই। অর্জুন বললেন—আর্য ভীম! তুমি তো কই আগে কখনও শ্রদ্ধাস্পদ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে এমন রূঢ় কথা বলোনি। শত্রুরা কি তোমার ধর্মগৌরবও নষ্ট করে দিল? একটা কথা পরিষ্কার বলি—তুমি শত্রুদের আশা পূরণ কোরো না—এই মুহূর্তে এই অপমানের মধ্যে তুমি ছোটভাই হয়ে দাদাকে অপমান করো—শত্রুরা এটাই চায়। তাতেই তাদের সুবিধা। কিন্তু আমি বলব—তুমি ধর্ম এবং ধর্মের বিধি-নিষেধ মেনে চলো। ধার্মিক ধর্মরাজ বড়দাদাকে কি কেউ অতিক্রম করে—ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং কো'তিবর্ত্তিতুমর্হতি? ভীম অর্জুনের ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করতে পারলেন না। তিনি নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হলেন।

যে কথাগুলি অর্জুন বলেছেন, তার পেছনে তাঁর নিজের যুক্তি হল—মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের নিয়ম মেনে কৌরবদের সভায় পাশা খেলতে এসেছিলেন, তাঁকে পাশা খেলতে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মেই পাশা খেলেছেন এবং সেটাই আমাদের পক্ষে কীর্তিজনক—দীব্যতে পরকামেণ তন্নঃ কীর্তিকরং মহৎ। প্রসঙ্গত জানাই—সেকালের দিনে এক ক্ষত্রিয়-রাজা অপর ক্ষত্রিয়-রাজাকে পাশা খেলতে আহ্বান জানালে অন্য ক্ষত্রিয়-রাজার পক্ষে 'না' বলাটা ছিল অসভ্যতা। যুধিষ্ঠিরের পক্ষেও তাই 'না' বলাটা সম্ভব হয়নি। এবং সম্ভবত সেই কারণে ভীম-অর্জুনেরাও তাতে বাধা দেননি। বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের মাধ্যমে পাশা খেলবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি জানিয়েছিলেন—খেলাটা হবে বন্ধু-রাজার সঙ্গে বন্ধু-রাজার মতো—সুহৃদ্‌দ্যূতং বতর্তামত্র চেতি। যুধিষ্ঠিরও সেই ভেবে এসেছিলেন। কিন্তু সভায় ঢুকে তিনি অন্যরকম বুঝেছেন। শকুনি-দুর্যোধনের ভাব দেখে তাঁর সন্দেহই হয়েছে। খেলাতে অন্যায়-কপটতা যে হতে পারে—সে আশঙ্কা যুধিষ্ঠির পরিষ্কার ব্যক্তও করেছেন। শকুনিরা বলেছেন—এত যদি ভয় তা হলে আর খেল না, তুমি চলে যাও। যুধিষ্ঠির নিরুপায় হয়ে বলেছেন—আমাকে যখন ডাকা হয়েছে খেলতে, তখন আমি ফিরব না, কারণ সেটাই ক্ষত্রিয়ের ব্রত। বিধি বলবান, অতএব নিজের ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় খেলা আরম্ভ করে খেলার পণে হারতে হারতে এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠির গৃহবধূ দ্রৌপদীকেও হারিয়ে বসে আছেন। ভীম তাঁর পাশা-খেলা হাত দুটি পুড়িয়ে দিতে চাইছেন—অর্জুন তাঁকে বলছেন—বড়দাদাকে এভাবে অতিক্রম কোরো না।

ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! যে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ দাদার মর্যাদা-লঙ্ঘনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, তিনি আপন কুলবধূর লাঞ্ছনার বিষয়ে একটি কথাও বলছেন না—এই অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা আমাদের পীড়িত করে। কী অসীম, আশ্চর্য এক দার্শনিক নির্বিণ্ণতায় অর্জুন তার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে দ্যূতক্রীড়ার অপমান-পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। একে 'অ্যাসেটিক্ উইদ্‌ড্রয়াল' নাই বলি, কিন্তু অর্জুনের ব্যবহারে গীতার সেই কচ্ছপের উদাহরণটা মনে আসেই। কচ্ছপ যেমন প্রয়োজনে নিজের সমস্ত অঙ্গগুলিকে কঠিন খোলসটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে,

অর্জুনও তেমনি আপাতত সমস্ত ঘটনা পরম্পরা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অর্জুন ভবিষ্যতে বিরাট পুরুষের মুখে গীতার উপদেশ শুনবেন। শুনবেন—পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীবর্গ ঈশ্বরী মায়ায় যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মতো ভ্রমণ করে। এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠির, দুঃশাসন, দ্রৌপদী—সবাই যেন অর্জুনের কাছে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মতো ; তাঁর যেন কিচ্ছুটি করার নেই। ভাল-মন্দ কিছুই না। জাগতিক সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির রাজা বলে এবং দাদা বলে প্রথম থেকেই অর্জুন তাঁকে কিছু বলেননি এবং এখনও বলছেন না। ভবিষ্যতেও কোনওদিন বলেননি। কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কোনও ব্যাপারেই না। এবং তা শুধু রাজা এবং দাদা বলেই যে বলেননি, তাও সব সময় আমার মনে হয় না। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের প্রতিমূর্তি বলে মনে করেন। এই বিপন্ন মুহূর্তেও তিনি ভীমকে বলছেন—ধার্মিক এবং বড়দাদাকে কে অতিক্রম করে—ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং কো'তিবর্ত্তিতুমর্হতি ?

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যে এতক্ষণ পাশা খেলেছেন, বাজি ধরেছেন এবং হেরেছেন—এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই অর্জুন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দেখতে পেয়েছেন। কারণ, যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মেনেই পাশা খেলেছেন এবং এখন সে খেলায় হেরে গেলেও যুধিষ্ঠির ধর্ম থেকে চ্যুত নন, এমনকী সেটা অকীর্তিরও কিছু নয়, অন্তত অর্জুন তাই মনে করেন। আপাতত অর্জুনের এই ব্যবহার আমাদের খুশি করে না, বরঞ্চ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখে ভীমের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা আমাদের মতো মানুষের কাছে অনেক বেশি ইচ্ছাপূরক। কিন্তু এ বিষয়ে বিবেচনার বিষয় একটাই। মহাভারতের কবির মনোজগৎ থেকে তিন, সাড়ে তিন হাজার বছর এগিয়ে এসে আমাদের আধুনিক এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারায় যে বিশ্লেষণগুলি আমরা মনোমতো মনে করি, সেই বিশ্লেষণগুলি যদি মহাভারতের চরিত্রগুলির ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলি—যুধিষ্ঠির একটি ট্যাড়স-মার্কা লোক, আর অর্জুন লোকটা নারীর মর্যাদা জানে না—তা হলে আমি বলব ভুল করছেন, খুব ভুল করছেন। কারণ ব্যক্তিগত একটি চরিত্রকে সেই ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিচার করতে হবে। কিন্তু আমাদের পরিশীলিত সামাজিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তিন হাজার বছরের পূর্বতন চরিত্রের ওপর আরোপ করে আপনি ব্যক্তিচরিত্রের হনন করতে পারেন না। আজকাল রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন—এই চরিত্রগুলির এইরকম বিশ্লেষণ হচ্ছে এবং তা করছেন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাই। আমার তাতে সবিশেষ আপত্তি আছে এবং আমি সে-কথা সবিনয়ে বলতেও চাই।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার—মহাভারতের মতো বিশাল মহাকাব্যে একটি ব্যক্তিজীবনের ঘটনা খামচা খামচা করে তুলে এনে একটি ব্যক্তি-নারীর মর্যাদা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মহাভারতের কবি এক সার্বিক বিশালতায় তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছেন। এখানে প্রত্যেকটি চরিত্র ব্যক্তি-জীবনের কুটিল সংকীর্ণতার মধ্যে যতখানি আবদ্ধ, তার থেকে অনেক বেশি সামাজিক বিশালতার সঙ্গে সম্বদ্ধ। সে বিশালতাও আবার এমন যে, ব্যক্তি চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সেই বিশালতার দ্বারাই নিজেকে চিহ্নিত করতে ভালবাসে। ধর্মের মতো বিশাল এক ধারণা, জাতির মতো বিরাট এক শক্তি অথবা যশ কিংবা কীর্তির মতো বিরাট এক লক্ষ্য—এইগুলির সঙ্গে মহাকাব্যিক চরিত্রগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটি ব্যক্তি-নারীর মর্যাদার জন্য কাউকে নিন্দাও করা যায় না, আবার কাউকে বহুমাননও করা যায় না। রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় এমনই এক সামগ্রিকতা আছে যে তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত। কাজেই এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় ভীমের যে প্রতিক্রিয়া হল—আধুনিক প্রগতিশীলতার নিরিখে তাঁর জন্য সাধুবাদ জমা থাকুক, কিন্তু মহাকাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রতিক্রিয়ার বড় বেশি বিশেষত্ব নেই। বিশেষত্ব শুধু এইটুকু যে, ভীমের এই ব্যবহার তাঁর চরিত্রের একান্ত একটা দিক নির্দেশ করে। যে ঘটনা ঘটছে তার আপাতিক প্রভাব ভীমের ওপর এতই বেশি, যে, তিনি মুহূর্তের মধ্যে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাই বলে কি অর্জুন কিংবা যুধিষ্ঠির স্বয়ং এই ঘটনায় বিচলিত ছিলেন না ? আমি আবারও বলছি এই মুহূর্তে অর্জুনের নীরবতায় আমি তেমন কিছু ক্ষুব্ধ নই, কেন না এই নীরবতার এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও নেই। বৈশিষ্ট্য শুধু এইটুকুই যে, প্রতিবাদে মুখর না হলেও এই নীরবতা অর্জুনেরও চরিত্র নির্দেশ করে। প্রথমত কোনও ব্যাপারেই তিনি এত আকুল হন না যে, সঙ্গে সঙ্গে হই-চই শুরু করে

দিয়ে এক বিষম কাণ্ড বাধিয়ে দেবেন। বরঞ্চ দুর্ঘটনা অথবা লাঞ্ছনা যখন ঘটে, তখন তাঁর নিশ্চল, স্বস্থ মূর্তি দেখে ভগবদ্‌গীতার বাঞ্ছিত সেই আদর্শ পুরুষটির কথা মনে আসে, সেই পুরুষটি—নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী। মহাবীর, অথচ তাঁর নিশ্চল সত্ত্বরূপ যেন খ্রিস্টীয় নিশ্চলতার প্রতিরূপে ধরা দেয়—Ye resist not evil।

কিন্তু তবু তো অর্জুন মানুষ। মানুষের ক্ষোভ, তৃষ্ণা, দুর্বলতা এবং ক্রোধ তাঁর অন্তরের সত্ত্বকে অতিক্রম করে বাইরে প্রকাশিত হয় না বটে, তবু সেই সব বিক্ষুব্ধ বৃত্তিগুলি তাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে, তাঁকে নিজের কর্তব্যে, প্রতিজ্ঞায় আরও কঠিন আরও দৃঢ় করে তোলে। হ্যাঁ, আপাতত দ্রৌপদীর অপমানে তিনি মুখ খোলেননি বটে, কিন্তু দাদার অপমানে মুখ খুললেন। মনে হতেই পারে—এ সেই পুরুষশাসিত সমাজের মাত্রাহীন পক্ষপাত, কিন্তু এ-পক্ষপাত যতখানি যুধিষ্ঠিরের জন্য, তার থেকে অনেক বেশি ধর্মের জন্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাচন, মনন এবং আচারে ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখে সকলে তাঁকেই একমাত্র ধর্মস্বরূপ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা কেউ অর্জুনের কথা ভাবেন না। ভাবেন না কী সব বিষম পরিস্থিতিতে অর্জুন ধর্মের কথা স্মরণ করেছেন। মনে পড়ে—সেই যেদিন নম্রনেত্রপাতিনী নববধূ দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে অর্জুন মায়ের কাছে পৌঁছেছিলেন, সেদিনও কুন্তীর ভুলে অর্জুন ভেঙে পড়েননি। যুধিষ্ঠির তবুও বলেছিলেন—অর্জুনই দ্রৌপদীকে জিতেছে, দ্রৌপদী তারই। তুমি বিয়ের আয়োজন করো। কিন্তু অর্জুন বলেছিলেন—আমাকে এমনি করে অধর্মের ভাগী করবেন না। আপনি আমার প্রতি স্নেহবশত যা বললেন ধর্মের দৃষ্টিতে তা ঠিক নয়—মা মাং নরেন্দ্র ত্বমধর্মভাজং/কৃথা ন ধর্মোঽয়মশিষ্টদৃষ্টঃ। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে মায়ের আদেশের নিরিখে যেটা সত্যই ধর্ম বলে মনে হয় আপনি তাই করুন, যেটা যশস্কর—আপনি তাই করুন—এবং গতে যৎ করণীয়মত্র ধর্ম্যং যশস্যং কুরু তদ্ বিচিন্ত্য।

ঠিক একইভাবে যেদিন নারদের উপদেশে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গ পেলেন আর ওদিকে ব্রাহ্মণের গরু-খোঁজার জন্য অস্ত্রাগারে ঢুকতে হল অর্জুনকে, যুধিষ্ঠির ঘটনা লঘু করে বলেছিলেন—তুমি বনবাসে যেয়ো না অর্জুন, এতে কোনও দোষ নেই। অর্জুন একই ধীরতায় উত্তর দিয়েছিলেন—আপনার কাছেই না শুনেছি দাদা, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ ধর্ম সিদ্ধ হয় না—ন ব্যাজেন চরেদ্ ধর্মম্ ইতি মে ভবতঃ শ্রুতম্। অর্জুন আরও বলেছিলেন—আমি সত্য থেকে বিচলিত হব না, কারণ সত্যই আমার অস্ত্র। আজ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার মুহূর্তেও আমরা অর্জুনকে স্থির দেখছি এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অপমানের মুহূর্তেই তাঁকে আমরা প্রতিক্রিয় হতে দেখছি। যুধিষ্ঠির পাশা-খেলার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজার ধর্ম মেনে তাঁকে পাশা খেলতে বসতে হয়েছে। তাঁর 'না' বলার উপায় ছিল না। এইরকম একটা অবস্থায় পাশার দানে হেরে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাও তাঁকে দেখতে হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের এই নাচার অবস্থাটা অর্জুন বুঝেছেন। আর বুঝেছেন বলেই স্ত্রীর অপমানের থেকেও আরও বিশাল এক ইতিবাচক-বোধ অর্জুনকে এই সময় আত্মস্থ করে তুলছে—না, আমরা হারাইনি। নিজের অপমান, স্ত্রীর অপমানের চেয়েও আরও বড় যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—সেটা আমরা হারাইনি।

'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম' কথাটা এমনই যা আজকের এই পরিবর্তিত পরিশীলিত সমাজে প্রায় অর্থহীন। কিন্তু সেদিনের সেই মহাভারতীয় সমাজে এই ধর্মের ব্যাপ্তি ছিল এতটাই যে, অন্য সব কিছু, এমনকী এই ধর্ম ছাড়া ক্ষত্রিয়-পুরুষ নিজেও ছিলেন মূল্যহীন। অর্জুনের এই গভীর ধর্মবোধ—যা প্রায়শই যুধিষ্ঠিরের মতো প্রকটভাবে প্রকাশিত হত না—এই ধর্মবোধের কথা দ্রৌপদী যথেষ্ট জানতেন। আর জানতেন বলেই বনবাসের সময় কৌরবদের জামাই জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দ্রৌপদী অর্জুনকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে—এই সেই মহাবীর, যিনি ধনুর্ধারীদের অগ্রগণ্য। ধৈর্য, যশ এবং জিতেন্দ্রিয়তা তাঁর চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর ইনি শুধু যুধিষ্ঠিরের ভাই-ই নন, শিষ্যও বটে—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। এই একটি মাত্র কথা—শুধু ভাই নন, শিষ্য—এই কথাতেই বোঝা যায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকালে তিনি কেন ততটা বিচলিত হননি এবং কেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের অপমানের ভাষায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আমি জানি আধুনিক প্রগতিবাদীরা আমার যুক্তিতে খুশি হবেন না। তাঁরা বলবেন—তুমি যে যুক্তিই দাও, স্ত্রীকে এইভাবে পণ্য করাটা একেবারেই বর্বরতা। আমরা বলব—এ-কথা কে অস্বীকার করে? তবে এ কথাটা আপনারা বলার তিন হাজার বছর আগে ভীমই বলে দিয়েছেন। আমরা লড়ছি—অর্জুন কেন কিছু বললেন না তাই নিয়ে। বিরাট মহাকাব্যের পরিমণ্ডলে, বিশাল ক্ষাত্র-শক্তির ব্যাপ্তির মধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা একটা ঘটনামাত্র—যে লাঞ্ছনার মোকাবিলার জন্য ক্ষত্রিয়বধূ হিসাবে দ্রৌপদী নিজেই ছিলেন যথেষ্ট। আপনারা সবাই জানেন—দৌপদী তাঁর যুক্তি-তর্কে কুরুসভার সভ্যদের আকুল করে দিয়েছিলেন এবং এক সময় সেই নারীশক্তির কাছে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকেও হার মানতে হয়েছিল। আপন লাঞ্ছনাকালে দ্রৌপদী নিজেও হয়তো জানতেন যে, অর্জুন কিছু বলবেন না, কারণ সেটা তাঁর স্বভাব নয়। দ্রৌপদী তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে চিনতেন। জয়দ্রথের কাছে অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার সময় তিনি বলেছেন—এই অর্জুন কখনও ধর্ম ত্যাগ করেন না। কামনা-বাসনার ঘোরে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন না, ভয় কিংবা রাগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের ধর্ম বিসর্জন দেন না—যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন কোপাৎ ত্যজেদ্ধর্মং ন নৃশস্যঞ্চ কুর্যাৎ—অর্জুনের আরেক বৈশিষ্ট্য—তিনি নৃশংসতা পছন্দ করেন না। অর্জুনের স্বভাব সম্বন্ধে দ্রৌপদীর এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বলতে পারি—কুরুসভায় নৃশংসতার নামান্তরে তাঁর ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তাতে সেই মুহূর্তে ধর্মের থেকেও ক্রোধটা বড় বেশি জরুরি ছিল। কিন্তু এও ঠিক—ধর্ম এবং দার্শনিকতা আমাদের দেশে এমন এক বৃহৎ তত্ত্ববোধ, যাতে সাময়িক ঘটনার পরম্পরা থেকে নিজেকে যুক্তিযুক্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়। অর্জুনও তাই করেছেন। যদি ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকে, তা হলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকালে সেই 'বীতরাগভয়ক্রোধ' ব্যক্তিটির ওই বিপ্রতীপ আচরণ বুঝে ওঠা খুব কঠিন। রাগ কিংবা নৃশংসতার কারণ ঘটেছে বলেই অর্জুন ঘটনার অনুরূপ ব্যবহার করবেন—এত অল্পসত্ত্ব তিনি নন, তাই আমাদের একান্ত মানবিক প্রতিক্রিয়াগুলি দিয়ে তাঁর এই গভীর ব্যবহার সযৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করাও খুব কঠিন।

বেশ, বুঝলাম—অর্জুন কার্যকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সমস্ত বাহ্যস্পর্শে তিনি অনাসক্ত অথবা নিতান্ত অনাসক্তভাবেই সমস্ত বিষয় তিনি গ্রহণ করতে পারেন, তাই বলে কি কুরুসভায় পাণ্ডব-কুলবধূর লাঞ্ছনা তাঁর মনে কোনওই প্রতিক্রিয়া তৈরি করেনি? আমরা বলব—মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলে নারীর সেই লাঞ্ছনাও তার সমস্ত ব্যাপ্তি নিয়ে ক্ষত্রিয়ের ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার ধর্ম যেমন একদিকে অর্জুনকে সেই উন্মুক্ত সভাস্থলে নিশ্চল থাকতে বাধ্য করেছে অন্যদিকে সেই ধর্মই তাঁকে ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞায় আরও দৃঢ় করেছে। অথচ তিনি কথা বলেন খুবই কম। এরই মধ্যে ভীমসেন, দুঃশাসনের রক্তপান, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ এবং সমস্ত কৌরব-ভাইদের পিষে মারবার প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন। প্রথমবার পাশার জাল থেকে মুক্তি পেয়ে পাণ্ডবরা বেরিয়ে যাবার সময় কর্ণ যখন গালি দিলেন, ভীমও তখন কর্ণকে উল্টো গালাগালি দিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও অর্জুন মহাবীরের দূরত্ব নিয়ে ভীমকে বললেন—ফালতু লোকের সঙ্গে কথা বলতে নেই, দাদা।

অর্জুন কথা বলেন না, শুধু মনে মনে দৃঢ় হন। দ্বিতীয়বার পাশা-খেলায় হেরে পাণ্ডবরা যখন বনে চললেন, তখনও অবধারিতভাবে দুর্যোধন-কর্ণেরা পাণ্ডবদের এই অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করতে লাগলেন। ভীম আবারও ক্ষেপে উঠে গোটা তিনেক প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি করলেন। আর নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মতো উদ্ধত মহাবীর অর্জুন শুধু বললেন—ভদ্রলোকেরা এত কথা বলে নিজেকে প্রকাশ করে না দাদা! আজ থেকে বনবাসের চোদ্দো বছরের মাথায় যা ঘটবে—সবাই তা দেখতে পাবেন—ইতঃ চতুর্দশে বর্ষে দ্রষ্টারো যদ্ ভবিষ্যতি। তবু এইখানে একবার তাঁকে মুখ খুলে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে হয়েছে। তার কারণ অবশ্য ভীমই। ভীম নিজে তো কৌরববংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিলেনই, উপরন্তু যুদ্ধ লাগলে পাণ্ডব-ভাইদের মধ্যে কে কাকে হত্যা করবেন, তার একটা 'লিস্ট' বানিয়ে—আমি দুর্যোধনকে মারব, কর্ণকে মারবে অর্জুন, শকুনিকে মারবে সহদেব—এইরকম আস্ফালন করে যাচ্ছিলেন। অর্জুন তাঁকে ধীর স্বরে শান্ত করলেন বটে, কিন্তু

ভোলেভালা সরল ভীমদাদার জন্য তাঁর মায়া লাগল। তিনি দেখলেন —ভীমকে অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেলেছেন, এখন তাঁর নিতান্ত সযৌক্তিক কথাগুলিকে, তাঁর যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদগুলিকে একটু সমর্থন করা দরকার। অতএব তিনিও কর্ণবধের ভীষণ প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করলেন আপাতত শুধু ভীমের ভাল লাগবে বলে—অর্জুনঃ প্রতিজানীতে ভীমস্য প্রীতিকাম্যয়া।

আসলে অর্জুন যে সেই অস্ত্র পরীক্ষার আসরের দিন থেকে কর্ণকে দুচোখে দেখতে পারেন না, সে-কথা তো ভীমের অজানা ছিল না। কিন্তু আপাতত কুরুসভায় ওই অপমানদিগ্ধ ব্যক্তিটির মানসিক শান্তির জন্য অর্জুন যেন তাঁর ভাল-লাগা, তাঁর ইচ্ছাটাই বড় করে দেখলেন। বললেন ভীম ইচ্ছা করেছেন, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি—যদি হিমালয় পাহাড়ও নড়ে চড়ে বসে, সূর্য যদি হারায় তার আলো, তবু আমার এই প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় হবে না। এই কথা বলে অর্জুন দাদা যুধিষ্ঠির আর ভীমের পেছন পেছন বনের পথে চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মুষ্টিতে ধরা ছিল বালুকা, যে বালুকা ঝুরঝুর করে রাস্তায় ছড়িয়ে যেতে যেতে তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন—আজ থেকে চোদ্দো বছর পরে এমনি ঝুরঝুর করে বাণ বর্ষণ করব শত্রু-সৈন্যের ওপর।

৮

আমরা যে মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলের কথা বলেছিলাম, সেই নিরিখে আবার জানাই যে, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় অর্জুনের কোনও সাময়িক প্রতিক্রিয়া নাই ঘটুক, কিন্তু নীরব অর্জুনের দিক থেকে এই লাঞ্ছনার ফল ছিল এতটাই ব্যাপ্ত যে, বনবাসের থেকেও এ-ঘটনা যেমন তাঁর কাছে গুরুতর ছিল, তেমনই কৌরবরাও কেবলই ভেবেছেন —আজ থেকে চোদ্দো বছর পর না জানি অর্জুন কী করে! একবার বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিচ্ছেন, আরেকবার নারদ অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় জানাচ্ছেন—আজ থেকে চোদ্দো বছর পর কৌরবদের সর্বনাশ হবে। এই সাবধান-বাণী আর সাধারণ অভিসম্পাতের শেষে দুর্যোধনকে সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যাটা বুঝিয়ে দিলেন মহামতি দ্রোণাচার্য। তাঁর মতে একদিকে যেমন দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে নিয়ে আসাটাই ছিল কৌরবদের অন্যায়ের চরম বিন্দু, তেমনই অন্যদিকে এর ফল হিসেবে চোদ্দো বছর পর অর্জুনের প্রতিশোধ নেওয়াটাই ছিল শেষ-কথা। তিনি ভয় পাচ্ছেন—আগমিষ্যতি বীভৎসুঃ—অর্জুন আসবেন। এই যে সব-কথার মধ্যে একবার করে শোনা যাচ্ছে—অর্জুন আসবেন—আগমিষ্যতি বীভৎসুঃ—একবার দ্রোণাচার্যের মুখে, একবার ধৃতরাষ্ট্রের মুখে—এর থেকে বোঝা যায়—সভাস্থলে পাঞ্চালী কৃষ্ণার অপমানে তিনি যতই নীরব থাকুন, তাঁর অন্তঃক্রিয়া ছিল এতই গভীর, এতই তীব্র যে প্রত্যেকে তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন—যেষাং যোদ্ধা সব্যসাচী কৃতাস্ত্রো, ধনুর্যেষাং গাণ্ডীবং লোকসারম্।

পাণ্ডবরা যখন বনবাসে দিন কাটাতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ একদিন এসে উপস্থিত হলেন পাণ্ডবদের ডেরায়। তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নও ছিলেন। কৃষ্ণ পাশা-খেলার সময় উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি থাকলে হয়তো পাশা-খেলা হতও না। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কৌরবরা যে অন্যায় অত্যাচার দ্রৌপদীর ওপর করেছে তার জন্য তিনি প্রাথমিকভাবে এতই রেগে গেলেন যে, মনে হল—এই এক্ষুনি যেন তিনি কৌরবরাজ্যে গিয়ে ভয়ানক যুদ্ধ করে সবাইকে মেরে ফেলবেন। অর্জুন তাঁকে অনেক স্তোকবাক্য দিয়ে শান্ত করলেন বটে, কিন্তু দ্রৌপদী তাঁকে ছাড়লেন না। কৃষ্ণ যে দ্রৌপদীর সখা। দ্রৌপদী তাঁকে যা মুখে আসল তাই বললেন, বিশেষ করে কুরুসভায় তাঁর লাঞ্ছনার কথা। বিশেষ করে সেই বিপদে তাঁর স্বামীরা যে তাঁকে একেবারেই রক্ষা করেননি—সেই কথা খুব জোর দিয়েই প্রকাশ করলেন। বারংবার তাঁর ভাষায় ধিক্কার শব্দ উচ্চারিত হল ভীমের শক্তিমত্তা লক্ষ করে, বারংবার অপশব্দ উচ্চারিত হল অর্জুনের ধনুষ্মত্তা লক্ষ করে। শেষে দ্রৌপদী কৌরবদের পূর্ব আচরণগুলি, অর্থাৎ সেই ভীমকে বিষ খাওয়ানো, জতুগৃহে পাঠানো—ইত্যাদি শত্রুতার কথাও আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। দ্রৌপদীর কথা শুনে কৃষ্ণ

রোদনপরা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আজকে যেমন তুমি কেঁদে ভাসাচ্ছো, তেমনই কৌরবদের বউরাও একদিন কেঁদে ভাসাবে। অর্জুনের বাণে যেদিন কৌরবেরা রক্তগঙ্গায় শুয়ে থাকবে, সেদিন তাদের বউরাও তোমরাই মতো করে কাঁদবে—তুমি বিশ্বাস করো পাঞ্চালী।

অর্জুণের বাণে ? কৃষ্ণের কথা শুনে দ্রৌপদী একবার তেরছা করে তাঁর মধ্যম-স্বামী অর্জুনের মুখের দিকে তাকালেন—সাচীকৃত-মবৈক্ষৎ সা পাঞ্চালী মধ্যমং পতিম্। ভাবটা এই—সেই প্রচণ্ড অপমানের সময় যাঁকে রা কাড়তে দেখিনি, সেই অর্জুনের ওপর এতটা ভরসা করা কি যুক্তিযুক্ত হবে ? প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণের সামনে, শ্যালক-সম্বন্ধী ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর এই অবিশ্বাসের চাউনি অর্জুনকে মুহূর্তের জন্য উদ্বেলিত করে তুলল। তা ছাড়া এত রাগের মধ্যেও দ্রৌপদীর দিক থেকে অর্জুনের প্রতি একটু বিশেষ দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়ে গেছে। পাঁচ স্বামীর সামনেই সেই বিশেষ দুর্বলতা ফুটে উঠেছে তাঁর কথায়। পাণ্ডবদের ওপর কৌরবদের ধারাবাহিক অত্যাচারের প্রসঙ্গে যখন জতুগৃহের কথা উঠল, তখন দ্রৌপদী বলে ফেলেছেন—জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে পাণ্ডবরা ছন্নছাড়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্চালে পৌঁছেছিলেন। আর সেখানেই তো সব্যসাচী অর্জুন আমাকে জিতে নিল নিজের ক্ষমতায়। দ্রৌপদী সোৎসুকে আরও বলে ফেলেছেন—ঠিক তুমি যেমন কৃষ্ণ। বিদেহরাজার সভায় সমবেত রাজপুত্রদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে তুমি যেমন রুক্মিণীকে জিতে এনেছিলে, ঠিক তেমন করেই—অন্যে যা পারত না—সেই রকমভাবে সবাইকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে পার্থ অর্জুন আমাকে জিতে নিয়ে এসেছিল—এবং সুযুদ্ধে পার্থেন জিতাহং মধুসূদন।

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে দাঁড়িয়ে, পঞ্চস্বামীর ঘরণীর মুখে একতম পার্থের প্রতি বীরভোগ্যা রমণীর এই সগৌরব পক্ষপাত সমস্ত ধিক্কারের মধ্যেও, সমস্ত অবিশ্বাসের চাউনির মধ্যেও অর্জুনকে নিশ্চয়ই মুহূর্তের জন্য উদ্বেলিত করে তুলল। কৃষ্ণের কথা সমর্থন করে অর্জুন অত্যন্ত সংক্ষেপে যা বললেন—তার মধ্যে অবশ্য একতম পতির স্বতন্ত্রতা মেশানো ছিল। অর্জুন বললেন—অমন করে কেঁদো না তুমি—মা রোদীঃ শুভতাম্রাক্ষি। এই সম্বোধন—শুভতাম্রাক্ষি—এর মধ্যে কেঁদে কেঁদে দ্রৌপদীর চোখ লাল হয়ে যাবার ব্যঞ্জনা নেই তো ? যদি তা থাকে, তবে অর্জুনের সম্বোধনেও সরসতা আছে। অর্জুন বললেন—অমন করে কেঁদো না। ঠিক আছে, এই কৃষ্ণ যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনটিই ঘটবে, তার অন্যথা হবে না—নান্যথা বরবর্ণিনি।

এই স্থির প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে প্রবেশ করেছেন। কষ্টেসৃষ্টে বনের ফল কুড়িয়ে, শিকার ধরে আর পর্ণশয্যায় মাটিতে শুয়ে পাণ্ডবদের দিন কাটতে লাগল। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা কথায় কথায় আবার সেই কুরুসভায় পাশা-খেলার কথা উঠল। বিদগ্ধা পাঞ্চালী মহামতি যুধিষ্ঠিরকে খুব এক প্রস্থ গালাগালি দিলেন। বনের মধ্যে ভীম-অর্জুন—এই সব মহাবীর স্বামীদের চরম দুর্গতি দেখে দ্রৌপদী আর স্থির থাকতে পারলেন না। যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোপবর্ষণ চলল কয়েক অধ্যায় জুড়ে। সময় বুঝে ভীমও গলা মেলালেন দ্রৌপদীর সঙ্গে। তাঁদের মত হল—দুর্যোধন যখন কপটতা করেছে, অতএব তার শর্তে সত্যবদ্ধ হয়ে বনবাস করার কোনও মানে হয় না। বরঞ্চ এখনই গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্য দখল করে নেওয়া উচিত। যুধিষ্ঠির অনেক বকা-ঝকা আর গালাগালি শুনলেন বটে, কিন্তু শেষে অনেক চিন্তাভাবনা করে যে বিচক্ষণ সিদ্ধান্তটি দিলেন, সেটা কেউ অমান্য করতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির বললেন—যুদ্ধ মানে তো শুধু দুর্যোধন-দুঃশাসনের সঙ্গে যুদ্ধ নয়। কৌরব পক্ষে লড়বেন মহা-মহা সব বীর—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—এঁরা কেউ কিছু কম যোদ্ধা নন। এঁদের সবার সঙ্গে লড়তে হবে। অথচ আমাদের সহায় বলতে কী আছে ? যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীম, যিনি এতক্ষণ যুদ্ধ-যুদ্ধ করে গলা ফাটাচ্ছিলেন, তিনিও কেমন যেন চুপসে গেলেন। দ্রৌপদীর মুখও থেমে গেল নিমেষে।

ঠিক এই সময় পাণ্ডবদের ঘরে এসে পৌঁছলেন মহামুনি ব্যাস। তিনি অভয় দিয়ে বললেন,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যত বড় যোদ্ধাই হন না কেন—ভয়ের কিছু নেই। আমি প্রতিস্মৃতি নামে এক দিব্য বিদ্যা দান করছি। এই বিদ্যার বলে অর্জুন তপস্যায় সন্তুষ্ট করুক দেবরাজ ইন্দ্রকে, মহাদেবকে, বরুণকে, যমকে।

সেই অর্জুন। যিনি এতক্ষণ ক্রোধে আরক্ত হয়েছিলেন, সেই ভীমও নন, যিনি ধর্মের তত্ত্ববোধে প্রায় সিদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ, সেই যুধিষ্ঠিরও নন, তপস্যার জন্য নির্দিষ্ট হলেন অর্জুন। কারণ, ব্যাস বলেছিলেন—ইনিই পারেন সেই সুরলোকের সম্মুখীন হতে, যাঁর তপস্যার উপযুক্ততা আছে, শক্তিও আছে—শক্তো হ্যেষ সুরান্ দ্রষ্টুং তপসা বিক্রমেণ চ। অর্জুনের মধ্যে আছে সেই দুর্লভ সংমিশ্রণ—তপস্যার ক্ষমতা এবং বীরত্ব। অতএব একদিন যুধিষ্ঠির তাঁকেই পাঠালেন তপস্যা করার জন্য—যে তপস্যায় ইন্দ্র, মহাদেব সন্তুষ্ট হবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞায় অর্জুন প্রতিস্মৃতি শিখে নিয়ে হিমালয়ের দিকে চললেন। সঙ্গে থাকল শুধু গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণ। মনে রইল কৌরবকুল বধের প্রতিজ্ঞা, নজর রইল শুধু উঁচুতে দেবতার স্থানের দিকে—বধায় ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং নিঃশ্বস্যোর্ধ্বমুদীক্ষ্য চ। পাণ্ডবভাইদের কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। শুধু বনবাসিনী বীরবধূ কৃষ্ণার চোখ জুড়ে জল এল। শৃঙ্গার-সরসা রমণীর মুখ দিয়ে জননীর মতো শুভকামনা ঝরে পড়ল। দ্রৌপদী বললেন—তোমার জন্মের সময় জননী কুন্তীর মনে তোমাকে নিয়ে যে আশা ছিল আর তুমিও জীবনে যা চেয়েছো—তাই যেন তুমি পাও। এরপর থেকে যখন তুমি এখানে আর থাকবে না—তোমার ভাইয়েরা তখন নিশ্চয়ই তোমারই গৌরব-গানে দিন কাটিয়ে দেবে, কেননা আমাদের জীবন, মরণ, রাজৈশ্বর্য—সব তোমারই ওপর নির্ভরশীল। বিদায় বন্ধু, তোমার ভাল হোক, দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন। দ্রৌপদীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ভাইদের আশা-ভরসা পাথেয় করে অর্জুন দ্রুত চলে গেলেন ইন্দ্রকীল পর্বতে।

পাহাড়ি পথ অতিক্রান্ত হতে হতে এক জায়গায় ছদ্মবেশী ইন্দ্রের সঙ্গে যখন অর্জুনের দেখা হল তখন অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। ইন্দ্রের কাছে অর্জুনের বক্তব্য ছিল একটাই—আমি লোভ বা কামনায় পীড়িত নই, স্বর্গের ঐশ্বর্য আমি চাই না। আমার অসহায় ভাইদের আমি বনে ফেলে এসেছি এবং এই বনবাসই আমাদের লজ্জা। আমি এর থেকে মুক্তি চাই। ইন্দ্র বললেন— তুমি তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করো, তারপর আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তুমি পাবে। অর্জুন সেই মুহূর্তে সেইখানেই দেবদেব মহাদেবের তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করা বড় সহজ কথা নয়। অনেক কষ্টে, অনেক ত্যাগে, অনেক আর্তিতে অর্জুন শেষ পর্যন্ত তাঁর দেখা পেলেন। মহাদেব ব্যাধের বেশে এসে অর্জুনের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি করে তাঁর ভক্তি পরীক্ষা করলেন ; শেষে স্বমূর্তিতে দান করলেন পাশুপত-অস্ত্র।

কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ-পর্ব নিয়ে ভারবির অমরকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়' লেখা হয়েছে। আমি তার বিশদ অংশে যাচ্ছি না, কিন্তু মহাভারতে কিরাতবেশী মহাদেব অর্জুনকে পাশুপত-অস্ত্র দেবার পূর্ব মুহূর্তে যে দুটি পরীক্ষা করে দেখেছেন, তা হল—অর্জুনের শৌর্য এবং ধৈর্য। মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে বারংবার তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর বাণ নিক্ষেপের মধ্যেও অর্জুনের শৃঙ্খলাবোধ ছিল ক্রমিক। একটি কঠিন বাণে যখন কাজ হচ্ছে না, তখন তার থেকেও কঠিনতর অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। শেষে অক্ষয় তূণের ভাণ্ডারও যখন শেষ হয়ে গেল তখন ধনুকের বাড়ি, খড়্গের কোপ, অবশেষে হাতাহাতিও বাদ গেল না। দেবদেব মহাদেবের নিষ্পেষণে একসময় অজ্ঞানও হয়ে গেলেন অর্জুন। কিন্তু জ্ঞান ফেরা মাত্রই ভাবলেন—একবার স্থির মনে মহাদেবের পূজো করেই আবার যুদ্ধে নামব। এই যে ধৈর্য এবং অবশ্যই তাঁর পূর্বদর্শিত শৌর্য—এই দুটি গুণই লোক-বিধ্বংসী মহাস্ত্র ধারণের উপযুক্ততা নির্ণয় করে। পাশুপত-অস্ত্রদানের প্রাঙ্মুহূর্তে তাই মহাদেব মন্তব্য করেছেন—অর্জুন! তোমার এই বীরত্ব আর ধৈর্যে আমি খুশি—শৌর্যেনানেন ধৃত্যা চ। আর অস্ত্রদানের পর মহাদেব বলছেন—তুমিই এই অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত, নিক্ষেপের উপযুক্ত এবং তুমিই এই অস্ত্র ফিরিয়ে আনারও উপযুক্ত। কখনও যেন এই অস্ত্র হঠকারিতার বশে সাধারণ-জনের ওপর প্রয়োগ কোরো না।

অর্জুনের সম্বন্ধে মহাদেবের এই মূল্যায়ন এবং বিশ্বাস যে কতখানি খাঁটি—সেটা আমাদের পুনরায় স্মরণ করতে হবে মহাভারতের যুদ্ধপর্বের শেষে—যখন পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটি ছেলেই মারা গেছে এবং ক্রোধী অশ্বত্থামার মারণাস্ত্র লক্ষ্য করেছে পাণ্ডবদের একমাত্র আশা-ভরসা অভিমন্যুর সন্তানবীজ

পরীক্ষিৎকে। এ-সব দুঃখ এবং ধৈর্যের কথায় আমরা পরে আসব। আপাতত অর্জুনকে আমরা বড় প্রসন্ন দেখেছি। এই প্রসন্নতা যতখানি অস্ত্রলাভের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি যেন মহাদেবকে দেখার সৌভাগ্যে—আমি মহাদেবকে দেখেছি, তাঁর শরীর ছুঁয়েছি হাত দিয়ে—দৃষ্টঃ স্পৃষ্টশ্চ পাণিনা। মহাদেবের পর যম, বরুণ, কুবের—অনেক দেবতাই তাঁকে দিলেন অলৌকিক সব অস্ত্র আর স্বর্গ থেকে ইন্দ্র পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আপন রথ। সারথি মাতলি তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছে।

এতদিন পরে অর্জুনের বনবাসের কষ্ট, তপস্যার কষ্ট—সব মুছে দিতেই যেন দেবরাজ ইন্দ্রের এত আয়োজন। ছেলে বলে কথা। অর্জুন স্বর্গে পৌঁছে তখনও প্রথম-বিস্ময়ের ঘোরটুকুও কাটাতে পারেননি—নন্দন কানন, পারিজাত ফুল, অপ্সরা, গান-বাজনা কত কিছু। এরই মধ্যে দেবরাজ তাঁকে ডেকে নিলেন কাছে, বসালেন কোলের কাছে, অর্ধাসন ত্যাগ করে। অর্জুনের কি লজ্জা করছিল? পাণ্ডব অর্জুন বীজী পিতার সঙ্গে অর্ধাসনে বসে কোনও অস্বস্তি বোধ করছিলেন না তো? স্বর্গের আচার-ব্যবহার, রকম-সকমও যে একেবারে আলাদা। আমাদের পশ্চিমি কায়দায় হাল-ফ্যাশনের বাড়িতে বাপ-ছেলের একসঙ্গে মদ-খাওয়ার ঘটনাটা যেরকম—এও বুঝি তাই। স্নেহাতুর পিতার প্রথম স্নেহবর্ষণ শেষ হতে না হতেই ধুম নাচ-গান আরম্ভ হয়ে গেল। স্বর্গবেশ্যা সুন্দরীরা দলে দলে ইন্দ্রের সামনে অর্থাৎ অর্জুনের সামনে নাচ দেখাতে আরম্ভ করল—শরীর দুলিয়ে, কোমর দুলিয়ে—কম্পমানৈঃ পয়োধরৈঃ। অর্জুনের কি অস্বস্তি হচ্ছিল?

একপ্রস্থ ঝুমুর নাচের পর গন্ধর্ব চিত্রসেনকে নিয়োগ করা হল অর্জুনের চিত্ত বিনোদনের জন্য। তিনি আবার একপ্রস্থ নাচের 'অর্ডার' দিলেন। কিন্তু অর্জুনের মন বসছে না, ভাল লাগছে না। হ্যাঁ, গৃহকর্তার আতিশয্যে তাঁকে মাঝে মাঝে আগ্রহ প্রকাশ করতে হচ্ছে বইকী, কিন্তু সব বিনোদন ভেদ করে মনে পড়ছে—দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানাটানি করছে দুঃশাসন, অথবা পাশা-খেলার কপট চালে হারিয়ে দিচ্ছে শকুনি। মনে পড়ছে—ভাইদের কথা, বনবাসী ভাইদের কথা, পুত্রবিরহিণী কুন্তীর কথা। অর্জুনের কিচ্ছু ভাল লাগছে না—ন শর্ম লেভে পরবীরহন্তা ভ্রাতৃণ্ স্মরণ্ মাতরঞ্চৈব কুন্তীম্।

এরই মধ্যে বড়মানুষ বাবা হিসেবে ইন্দ্রের মনে হল—নাচ দেখতে দেখতে অর্জুন একবার উর্বশী অপ্সরার দিকে কেমন যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ছেলের বুঝি মনে ধরেছে এই নৃত্যপরা সুন্দরীকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের রাজা হুকুম দিলেন চিত্রসেনকে—উর্বশীকে বলো, সে যেন অর্জুনকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ দেয়—সোপতিষ্ঠতু ফাল্গুনম্। চিত্রসেন উর্বশীর কাছে গিয়ে অর্জুনের অসংখ্য গুণ গাইলেন অনেক করে। উর্বশী ভুললেন। স্বর্গসুখ ভোগ করে করে তাঁরও বুঝি বা অরুচি ধরে গেছে। মর্ত্যের মানুষ অর্জুন তাঁর কাছে হয়তো নতুন রসে ধরা দিল। বিশেষত মর্ত্য মানুষের ভালবাসা যে কত গভীর হতে পারে—সে অভিজ্ঞতা তাঁর বহু আগেই হয়ে গেছে, যদিও ভালবাসার গভীরতা সম্বন্ধে তাঁর কোনও বোধ নেই। কুরুবংশের মূল-পুরুষ পুরূরবার প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন স্বর্গসুন্দরী উর্বশী। স্বর্গের নৃত্যকালে ছন্দপাতন অপরাধের আঘাত তাঁর কাছে প্রেমের পরশে রূপান্তরিত হয়েছিল পুরূরবার সঙ্গমাধুর্যে। তবু মর্ত্যে তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। স্বর্গের অভ্যাসে তাঁকে পুনরায় ভেসে আসতে হয়েছিল স্বর্গের গড্ডলিকায়। কিন্তু উর্বশীর প্রেমে বাঁধা বিরহাতুর পুরূরবার বাঁধনহারা ক্রন্দনধ্বনি এখনও মর্ত্যে বন-বনান্তর থেকে তাঁর কানে ভেসে আসে পুরাণ-মুনিদের ছন্দে, বিক্রমোর্বশীয়ের গ্রন্থনায়। স্বর্গসুন্দরী বুঝি কৌতুক অনুভব করেন—মর্ত্য মানুষেরা অভীপ্সিতা রমণীকে পাবার জন্য কেমন আতুরভাবে কাঁদে। স্বর্গে তো এমনটি নেই।

সেই পুরূরবার বংশেরই আরেক পুরুষ এই অর্জুন—যাঁর গুণপনার কথা এতক্ষণ ধরে চিত্রসেনের কাছে শুনছিলেন উর্বশী। স্বর্গসুন্দরীদের বয়স বাড়ে না, যৌবন স্থির হয়ে আছে যৌবনেই। পার্থ অর্জুনের কথা শুনে উর্বশীর হৃদয় মথিত হল—ফাল্গুনে জাতমন্মথা। বললেন—যাব—আমি ঠিক সময়মতো যাব অর্জুনের কাছে। উর্বশীর সঙ্গে কথা বলে গন্ধর্ব চিত্রসেন যখন চলে গেছেন, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অর্জুনের নামের গুণে স্বর্গসুন্দরীর মনে নতুন কোনও রসের আবেশ হল বুঝি! সেই ভর সন্ধ্যায় তিনি শরীর মেজে স্নান করলেন—স্বর্গের গড্ডল ধুয়ে গেল যেন। তারপর

খুব সেজে, গয়না পরে, খোঁপায় মালা দুলিয়ে উর্বশী অর্জুনের কাছে চললেন—পার্থ-প্রার্থনলালসা। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, রজনী গাঢ় হচ্ছে—উর্বশীর জ্যোৎস্নাভিসার শুরু হল।

সবাই জানেন—স্বর্গসুন্দরীদের স্বভাব বড় চপল, তাদের মনে প্রেম-ভালবাসা বলে কিছুই নেই, উর্বশীরও তা ছিল না। পুরূরবার সঙ্গে উর্বশীর মিলনেও তাই দেখেছি। পুরুষ পুরূরবা যখন গভীর প্রেমে উন্মত্তপ্রায়, উর্বশীর তখন হুঁশও নেই। এখন অর্জুনের কাছে যাবার সময়েও মনে মনেই তিনি অর্জুনের সঙ্গে রতিরতা। অর্জুনকে রূপে ভোলাবার জন্যই তিনি সেজেছেন, ভালবেসে নয়। তাঁর সাজের মধ্যে তাই যেন উদ্দাম প্রদর্শনী, মনটাকেও সেইভাবে তৈরি করার জন্য সামান্য একটু মদও খেয়ে নিয়েছেন তিনি। তাতে সূক্ষ্মবস্ত্রে, সুসূক্ষ্ম উত্তরীয়ে স্বর্গসুন্দরীর রূপ আরও 'প্রেক্ষণীয়তরা'। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এবং উত্তরীয়ের সূক্ষ্মতা ছিল এতটাই যে হালকা মেঘের তলায় চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো তাঁর শরীর-সংস্থানগুলি ছিল স্পষ্টাস্পষ্ট রহস্যে ঘেরা—তনুরভ্রাবৃতা ব্যোম্নি চন্দ্রলেখেব গচ্ছতী। বেশবাসে, অঙ্গরাগে মানসিক শৃঙ্গারের উপান্তে এসে উর্বশী অর্জুনের ঘরের দরজায় এসে পৌঁছলেন।

দরজা খুলেই এমন মোহিনী মূর্তি দেখে অর্জুন চকিতে বুঝলেন—তিনি উর্বশী। লজ্জায় তাঁর মাথা নুয়ে গেল, চক্ষু মুদে গেল। মুখে বললেন—স্বর্গসুন্দরীদের প্রধান তুমি। তোমাকে নমস্কার। আজ্ঞা করুন দেবী। আমি তোমার ভৃত্য। উর্বশী তো অবাক। বলে কী লোকটা? যার জন্য এত হাব-ভাব, ছলা-কলা, গন্ধর্ব চিত্রসেনের দূতিয়ালি—তার মুখে এ কী কথা! উর্বশী অজ্ঞান হয়ে যাবেন না তো? তিনি সমূলে চিত্রসেনের বক্তব্য, ইন্দ্রের ইচ্ছা সব প্রকাশ করে নিজের কথা বললেন—সব সুন্দরীরা যখন একসঙ্গে হয়ে আমরা নাচ দেখাচ্ছিলাম দেবরাজ আর তোমার সামনে, তখন অমন অনিমিখে কেন চেয়ে ছিলে আমার দিকে, শুধু আমারই দিকে? সেটা লক্ষ করেই তো দেবরাজ চিত্রসেনকে দিয়ে আজকের অভিসার ঘটিয়েছেন। তবে ভেবো না—আমি শুধু ওঁদের কথাতেই এখানে তোমার কাছে এসেছি। তোমার কথা শুনে, তোমায় দেখে আমি অভিভূত, আমারও ইচ্ছে করে আমি তোমাকে পাই—চিরাভিলষিতো বীর মমাপ্যেষ মনোরথঃ।

অর্জুন আবারও লজ্জা পেলেন। উর্বশীর আত্মনিবেদন শুনে কানে আঙুল দিলেন লজ্জায়। বললেন—আমি এখনই যা শুনলাম, তা ভুল-শোনা হয়ে থাক—দুঃশ্রুতং মে'স্তু। তুমি আমার কাছে জননী কুন্তীর মতো, ইন্দ্রাণী শচীর মতো। তোমাকে যে নৃত্যসভায় অমন করে অনিমেষে দেখেছিলাম—তার কারণ শুনবে উর্বশী? তুমি যে বিশাল এই পৌরব বংশের জননী—যে বংশের অধস্তন শেষ পুরুষ হিসেবে আমি তোমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি—আমার বংশের অন্যতম মূল পুরূরবা একদিন তোমারই গর্ভে আমার এই বংশের ধারা রক্ষা করেছিলেন—গুরোর্গুরুতরা মে ত্বং মম বংশবিবর্দ্ধনী। উর্বশী অর্জুনের ন্যায়নীতির তত্ত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে বললেন—থাক ওসব কথা। স্বর্গরাজ্যে সবাই সমান, আমরা সবারই ভোগ্যা। এখানে এসে তুমি আমাকে গুরুর আসনে বসিয়ে দিতে পারো না। পুরূরবার বংশ, যে বংশ নিয়ে তুমি এত গৌরব করছো—সেই বংশের অনেক অধস্তন পুরুষই পুণ্যবলে স্বর্গরাজ্যে এসে আমাদের রমণসুখ উপভোগ করেন। তা ছাড়া এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গ পাওয়ার জন্য শৃঙ্গারী হয়ে উঠেছে আমার মন। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো না।

সব কথা শুনেও অর্জুন আবারও একই কথা বললেন, এবং পুনরায় কুন্তী আর শচীর সম্বোধনে ডাকলেন উর্বশীকে। স্বর্গসুন্দরী অপ্সরার সম্মানে খুব লাগল। ত্রিভুবন-কাম্যা রমণীকে অর্জুন প্রত্যাখ্যান করছেন, শৃঙ্গারযোগ্যা ষোড়শী সুকুমারীকে মা মা করছেন, তাও কিনা যে রমণী স্বর্গেও সবার কাছে সুলভা নন, কিন্তু অর্জুনের কাছে তিনি নিজে স্বয়ং এসেছেন শৃঙ্গার-যাচিকা হয়ে—কাজেই এই মুহূর্তে বংশ নিয়ে অর্জুনের গৌরবস্মৃতি তাঁর কাছে নেহাতই অপমানজনক বলে মনে হল। বয়স না-বাড়া স্বর্গের ষোড়শীর মনে মর্ত্য-মানুষের ন্যায়বিচার একেবারেই গণ্য হল না। ঋগ্‌বেদ থেকে আরম্ভ করে বিক্রমোর্বশীয় পর্যন্ত পুরুবংশের অগ্রজন্মা পুরূরবার বিরহাতুর কান্নার অর্থও সেদিন উর্বশী বুঝতে পারেননি আর আজ সেই বংশেরই অধস্তন অর্জুনের সূক্ষ্ম নীতিবোধও তাঁকে পীড়া দিল।

প্রতিহত-কামনা ক্রোধের সঞ্চার করল তাঁর মনে। তাঁর মনে হল বুঝি—পূর্বে পুরূরবা তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য যে কান্নাটা কেঁদেছিলেন, আজ স্বয়ং যেচে-আসা তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে অর্জুন তার শোধ তুললেন। তিনি অভিশাপ দিলেন—তোমার বাবার কথায় আমি নিজে যেচে তোমার কাছে এসেছিলাম। তবু আমার সঙ্গে যখন এই ব্যবহার করলে তখন মেয়েদের মধ্যে থেকেও হীনমান নপুংসক হয়ে থাকবে তুমি।

উর্বশী ফিরে গেলেন রাগে ফুলে, লজ্জায় সংকুচিত হয়ে। অভিশাপ শুনে অর্জুনও এলেন বন্ধু চিত্রসেনের কাছে। সবিস্তারে জানালেন রাত্রির সব ঘটনা। দেবরাজ ইন্দ্রকেও জানানো হল উর্বশীর অভিশাপের কথা। দেবরাজ নিজ পুত্রের মধ্যে এই ঋষির সংযম দেখে খুব খুশি হলেন। অভয় দিয়ে বললেন—চিন্তার কারণ নেই কোনও। বনবাসের পর অজ্ঞাতবাসে যেতেই হবে তোমাদের। তখন এই নপুংসকের ভূমিকাই তোমার কাজে লাগবে। আমরা জানি—এই নপুংসকের ভূমিকা অর্জুনের কাজে লেগেছিল—যখন এক বৎসর কাল তিনি বিরাটরাজার ঘরে বৃহন্নলার বেশে বিরাট-কন্যা উত্তরার নৃত্যগুরু সেজেছিলেন।

এক্ষুনি আমরা উর্বশী-প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অর্জুনের যে সংযম দেখলাম, যে সংযম দেখে দেবরাজ অভিভূত হয়েছেন—এই সংযম খুব সাধারণ নয়। হ্যাঁ, ইতিপূর্বে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা অথবা সুভদ্রার ক্ষেত্রেও আমরা অর্জুনের চিত্তবিক্ষেপ এবং কিছুটা ইন্দ্রিয়ের শিথিলতাও দেখেছি। দ্রৌপদীর সঙ্গ না পাওয়ার ফলে তাঁর মনে একটা অভিমান কাজ করে থাকতে পারে এবং সেইজন্যই এক ধরনের ইন্দ্রিয়-প্রবণতা তখন ঘটে থাকতে পারে—এই ছিল আমাদের অনুমান। কিন্তু বনবাস থেকে ফেরার পরে তিনি দ্রৌপদীর সঙ্গ-সাহচর্য নিশ্চয়ই লাভ করে থাকবেন, উপরন্তু বৃষ্ণিসুন্দরী সুভদ্রা দ্রৌপদীর প্রায় সমান্তরাল জায়গায় দাঁড়িয়ে অর্জুনের জীবনে বিরাট স্থিরতা এনে দিয়েছেন। বনবাসে আসা ইস্তক অর্জুনের মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করছে কুরুসভার অপমান—যার প্রতিশোধের প্রস্তুতিতে মহাদেবের তপস্যা, যদিও মহাদেবের তপস্যার ফলে অস্ত্রলাভের থেকেও তাঁর মনে জুড়ে বসল অলৌকিক এক প্রসন্নতা। ইন্দ্রলোকে এসে হাজারো সুখভোগের মধ্যেও তাঁর এই মানসিক-প্রসন্নতা তাঁকে অনেক ব্যাপারেই নিস্তরঙ্গ করে রেখেছে। এ ছাড়া স্বর্গের সুখরাশির মধ্যে বাস করেও বনবাস ক্লিষ্ট ভাইদের জন্য তাঁর অন্তরে অন্তরে এক ধরনের কষ্ট জমা হচ্ছিল—আমি এটাকে পাপবোধ বলব না—তবু এই বোধ তাঁর উপভোগবৃত্তি কণ্টকিত করেছিল। কাজেই উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তাঁর বংশমাতৃকার বোধ যতখানি কাজ করেছে, ঠিক ততখানি কাজ করেছে তাঁর চিত্তের ক্রমিক-স্থিরতা, প্রসন্নতা এবং ভাইদের জন্য বিষণ্ণতা।

যাই হোক ইন্দ্রের কথায় অর্জুন তাঁর সম্ভাবিত ক্লীবত্ব সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু দেবরাজ তাঁর পুত্রটিকে ছাড়লেন না। আরও কিছুদিন অর্জুনকে স্বর্গে আটকে রাখবার জন্য লোমশ মুনিকে দিয়ে উৎকণ্ঠিত যুধিষ্ঠিরকে কাম্যক বনে খবর পাঠালেন—এই তিনি এলেন বলে। মহাদেবের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ এবং শেষে পাশুপত-অস্ত্র পাওয়ার খবর যেমন লোমশ মুনির মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে পৌঁছল, তেমনই কথায় কথায় অন্য মুনিদের মুখে হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছেও এই খবর গেল। ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনের ব্যাপারে এমনিতেই আতঙ্কিত ছিলেন, এখন তার পাশুপত-অস্ত্র লাভের ঘটনা তাঁকে এতটাই শঙ্কিত করে তুলল যে, তিনি বুঝলেন —অর্জুন এখন একেবারেই অপ্রতিরোধ্য। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের পক্ষেও সম্ভব হবে না ; সম্ভব হবে না আচার্য বৃদ্ধ-দ্রোণাচার্যের পক্ষেও, আর কর্ণের পক্ষে তো নয়ই কারণ, ধৃতরাষ্ট্রের মতে অর্জুন কতখানি বীর—সে সম্বন্ধে কর্ণ ততখানি অবহিত নয় এবং তার বোধহয় কিছু দয়াও আছে অর্জুনের ব্যাপারে—ঘৃণী কর্ণ প্রমাদী চ আচার্যঃ স্থবিরো গুরু। ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম কথাটা ঠিক হলেও হতে পারে, কিন্তু তিনি যে তাঁকে দয়ালু ভাবছেন—এটা ভুল এবং এ ভুল তৈরি হয়েছে—কর্ণের বারংবার আস্ফালনে, অর্থাৎ কর্ণ যে এক ফুৎকারে অর্জুনকে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু সেটা যে তিনি করছেন না—এটা যেন তাঁর দয়া। কিন্তু এরই মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র এটা পরিষ্কার বুঝেছেন যে, সমস্ত বিপত্তিটাই ঘটল দুর্যোধন এবং কর্ণের জন্য। বিশেষত পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদীকে

সভার মধ্যে টেনে এনে যে গর্হিত অন্যায় দুর্যোধন-কর্ণরা করেছেন—তার ফলেই ক্রোধযুক্ত হয়ে পাণ্ডবরা আরও শক্তিশালী করে তুলছে নিজেদের। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাচ্ছেন—সাধারণভাবেই অর্জুনের বাণ তাঁর ছেলেদের অন্তকাল ঘটিয়ে দিতে পারে, সেখানে দ্রৌপদীর অপমানে সে এখন রাগে জ্বলছে—কিং পুন র্মন্যুনেরিতাঃ। সব ব্যাপারটা ধৃতরাষ্ট্র আরও একবার দুর্যোধনকে বোঝালেন, কিন্তু কোনও লাভই তাতে হল না। নিরুপায় ধৃতরাষ্ট্র তখন শুধু ভাবনালোকে দেখতে পেলেন—সূর্যের কিরণের মতো অর্জুনের বাণ-ধারা এসে পড়ছে তাঁর ছেলেদের ওপর, আর সেই বাণধারাই নিঃশেষে শেষ করে দিচ্ছে তাঁর ছেলেদের। হায়! বিধাতা কী এক সর্বহর, কালন্তক যমের মতো করে সৃষ্টি করেছেন অর্জুনকে, যাকে কোনওভাবেই যুদ্ধে লঙ্ঘন করা যায় না।

আপনারা লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার বারবার মনে হয়—কী নির্লিপ্ত এবং নিস্তরঙ্গভাবে অর্জুন নিজেকে তৈরি করছেন। ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে উল্টো দিক দিয়ে বোঝা যায় যে, তাঁর এই সমস্ত চেষ্টাই দ্রৌপদীকে অপমানের ফলে আরও দৃঢ়তর হয়েছে, কিন্তু কোনওভাবেই এই প্রয়াসকে আপাতদৃষ্টিতে 'দ্রৌপদীর জন্যই'—এইভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তার ওপরে চরম অস্ত্রটি লাভের জন্য তাঁর যে ওই লোকাতীত বৃত্তিগুলিকে শুধু 'একটি মাত্র নারীর জন্য'—বলে চিহ্নিত করতে আমাদের সংকোচ আছে। হ্যাঁ, এ-কথা অবশ্যই ঠিক যে, সমস্ত মহাকাব্যগুলিতেই বৃহৎ যুদ্ধের কারণ হিসাবে সাধারণভাবে কখনও হেলেন, কখনও সীতা, কখনও বা দ্রৌপদীকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ-কথাটা ইলিয়াডের ব্যাপারে কতটা ঠিক, আমার পক্ষে তা বলা মুশকিল, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারতের ক্ষেত্রে যে কথাটা বড়ই অতিসরলীকরণের পর্যায়ে পড়বে—তা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি। মহাভারতের বিশাল এবং পর্যাপ্ত পরিমণ্ডলের নিরিখে আমরা বলতে চাই—দ্রৌপদীর অপমান অর্জুনকে যতটা প্ররোচিত করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি প্ররোচিত করেছিল রাজ্যাভিলাষী অহঙ্কারী দুর্যোধনের অহঙ্কার, অন্যায় এবং অধর্ম—দ্রৌপদীর অপমান যেগুলির একটি অঙ্গমাত্র। তপস্যার মাধ্যমে অর্জুনের অস্ত্রলাভ সেই অধর্ম এবং অন্যায় নিরাকরণের জন্যই। তাই অর্জুনের চেষ্টা, ত্যাগ, তপস্যা—এগুলি যতখানি দ্রৌপদীর জন্য, তার থেকে অনেক বেশি ধর্মের জন্য।

ধর্মের মতো বিশাল এক তত্ত্বই যেহেতু মহাভারতের বিশাল পরিমণ্ডলের সঙ্গে নিতান্ত খাপ খেয়ে যায়, আমরাও তাই লোকান্তক অস্ত্রের জন্য অর্জুনের তপস্যার কথাটা বুঝতে পারি। নইলে মহামতি কর্ণের সঙ্গেও অর্জুনের কোনও পার্থক্য থাকে না। কর্ণ অস্ত্র চান শুধু অর্জুনকে মারবার জন্য—ব্যক্তিগত হিংসায়। এর পেছনে তপস্যার মতো নিষ্কাম বিশুদ্ধ শক্তিও কাজ করে না। কিন্তু অর্জুন অস্ত্র চান ধর্মের কারণে, প্রতিপক্ষের অধর্ম শাতন করার জন্য। প্রতিপক্ষ সেখানে আপন অধর্মের কারণেই ধ্বংস লাভ করবে—অর্জুন হবেন সেই ধ্বংসের নিমিত্ত মাত্র। অর্জুনকে আমরা পূর্বেও দেখেছি। তিনি শুধু ত্যাগে, তিতিক্ষায় এবং পরিশ্রমে নিজেকে আরও বিরাট এক লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করছেন। স্বর্গে গিয়ে কোনও লঘু উপায়ে তিনি অস্ত্রলাভ করার চেষ্টা করেননি। দেবরাজকে তিনি বলেছেন —আমি তোমাকে আচার্য হিসেবে বরণ করছি, তুমি আমাকে নূতনতর দিব্য-অস্ত্রের প্রযুক্তি শিখিয়ে দাও। দেবরাজ বলেছেন—তা হয় না। আমি এই সব অস্ত্র কৌশল শেখালে সেই বলে বলী হয়ে তুমি ক্রূর কাজ করতে থাকবে— ক্রূরকর্মাস্ত্রবিত্তাত ভবিষ্যতি পরন্তপ। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন—না, আমি এই অস্ত্র মানুষের ওপর প্রয়োগ করব না। দেবরাজ খুশি হয়ে বলেছেন তাহলে যাও আমার অস্ত্রাগারে, অগ্নি, বায়ু, বরুণ—এঁদের কাছে শেখো সব ভাল করে—শিক্ষ মে ভবনং গত্বা সর্বাণ্যস্ত্রাণি ভারত। অর্জুনকে পাঁচ বৎসর ধরে এই দিব্য-অস্ত্রের প্রয়োগ শিখতে হয়েছে, যদিও মানুষের ওপর তার প্রয়োগই নেই। তবু শিখেছেন নিজেকে দুর্ধর্ষ করার জন্য, অপ্রতিরোধ্য করার জন্য। কারণ দিব্য-অস্ত্রগুলি নিজের হেফাজতে থাকলে প্রয়োগ না করলেও তার অস্তিত্বেই মানুষ ভয় পায়। শুধু এইটুকুর জন্যই এত সাধনা। সাধনার মতো এত বড় একটা বিশাল তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে বলেই অর্জুনের ত্যাগ, তপস্যা এবং অস্ত্রলাভকে আমরা 'শুধুমাত্র একটি নারীর জন্যও' বলতে পারছি না, যদিও বলতে পারলে আধুনিক অর্থে সেটি খুবই পুরুষোচিত এবং

বীরজনোচিত হত, অপিচ সাময়িক ভাবনায় নারীর মর্যাদাসূচকও হত হয়তো।

ওদিকে অর্জুনকে দেবরাজ স্বর্গে আটকে রাখলেন বটে, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে বনবাসী ভাইয়েরা ভীষণ মনমরা হয়ে পড়লেন। বিশেষত পাঞ্চালী-কৃষ্ণা তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে স্মরণ করে এমন কিছু মনের কথা বলে ফেললেন, যাতে যুধিষ্ঠিরের মতো সরল মানুষও বুঝলেন যে, অর্জুনের ওপর এই বীররমণীর বিশেষ কিছু পক্ষপাত আছে এবং এই পক্ষপাতের স্মৃতি স্পষ্টতই যুধিষ্ঠিরের মনে দ্রৌপদীর মৃত্যু পর্যন্ত অম্লান ছিল। দ্রৌপদী বলেছিলেন—এই বনবাসে কি অর্জুন ছাড়া ভাল লাগে! অর্জুনের তুলনা শুধু অর্জুনের সঙ্গেই হতে পারে, আমার দু-হাতওয়ালা অর্জুন শুধু তুলিত হতে পারেন হাজার হাতওয়ালা কার্তবীর্য অর্জুনের সঙ্গে। সেই অর্জুন। তুমি ছাড়া এই বন আমার কাছে শূন্য। এমন মধুর ফুল-ফল, লতা-তরু, এমন সুন্দর এই পৃথিবী—তোমাকে ছাড়া কি ভাল লাগে—ন তথা রমণীয়ং বৈ তমৃতে সব্যসাচিনম্। এরপর দ্রৌপদী তাঁর চার স্বামীর সামনে অর্জুনের ঘন কালো গায়ের রঙ আর কালো চোখের প্রশংসায় মুখর হলেন আর বারবার বলতে লাগলেন—তাঁকে ছাড়া এখানে আমার কিছুই ভাল লাগছে না,—তমৃতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বনং ন প্রতিভাতি মে। এই বিলাপের পরে আর কী হতে পারে? চার ভাই অতঃপর অর্জুনের জন্য আপন আপন শোক প্রকাশ করলেন কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর অনুকরণে। কিন্তু পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মনে একটা খোঁচ রয়ে গেল, যা তিনি প্রকাশ করেছেন দ্রৌপদীর মৃত্যুর পর ভীমের কাছে।

অথচ অর্জুনকে দেখুন। হ্যাঁ, আধুনিক ভাবনায় এটা হয়তো খুবই বীরোচিত হত, যদি এরপর স্বর্গ থেকে ফিরে অর্জুন সবার সামনে বিশেষ পক্ষপাত দেখাতেন কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর ওপর, অথবা একান্তে ব্যক্ত করতেন পৃথক কোনও মধুর বিরহ-বেদনা। কিন্তু তা হয়নি, অনেক দিন পরে যখন দেবরাজ ইন্দ্রের রথে চড়ে অর্জুন উৎকণ্ঠিত ভাইদের কাছে এসে পৌঁছলেন, সেদিন সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বটে, কিন্তু কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে আলাদা করে কোনও গভীর অব্যক্ত কথা বলতে পারেননি অর্জুন। তাঁর এতদিনের হৃদয়-যন্ত্রণা উপশম করার জন্য তাঁকে শুধু মুহূর্তের জন্য সান্ত্বনা দিতে পেরেছেন—সমেত্য কৃষ্ণাং পরিসান্ত্ব্য চৈনাম্। তার বেশি কিছু করা ধীরোদাত্ত এই মহাবীরের পক্ষে সম্ভব হয়নি; করলে, দ্রৌপদীর মতোই তা অন্যভাইদের, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের চোখে পড়ত। মনে লাগত আরও বেশি। তবু এরই মধ্যে সাধারণ প্রবাসী-স্বামীর মতো অর্জুন দ্রৌপদীকে স্বর্গ থেকে আনা সূর্যের আলো ঠিকরানো একটা গয়না উপহার দিলেন, কিন্তু বেশ জানি এই উপহার দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীকে ভোলানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। অথচ এই 'রুটিনের' বেশি আর কোনও বিশেষ আদর অর্জুনের পক্ষেও দেখানো সম্ভব হয়নি। দেখালে, ভাইদের এবং যুধিষ্ঠিরের চোখে তা অন্য কোনও গভীর অর্থ নিয়ে ধরা দিত, যা অর্জুন কখনও চাননি।

এ বাবদে মহাভারতের কবির ব্যঞ্জনাটা কী অদ্ভুত! গয়না অর্জুন কাকে দিলেন? না, 'সুতসোমমাত্রে'—সুতসোমের মাকে। সুতসোম দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের ছেলে। দ্রৌপদী কোনও সাত-কালের বুড়ি নন, কিন্তু সুতসোমের মা দ্রৌপদীকে গয়না দিলেন মানে—ব্যাস দেখাচ্ছেন—অর্জুন পৃথক কোনও একান্ত অধিকারবোধে দ্রৌপদীকে উপহার দিতে পারছেন না। কারণ দ্রৌপদী শুধু অর্জুনের ঔরসজাত শ্রুতকীর্তির মা নন, তিনি ভীমের ছেলে সুতসোমেরও মা। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়—অর্জুনের ব্যাপারে মহাভারতের কবির সেই সমব্যথা ছিল, যাতে তিনি বুঝেছিলেন—বিরহবিধুরা প্রিয়া পত্নীকে উপহার দিয়ে অর্জুনের মনে যতখানি আবেগ আসার কথা ছিল, সে আবেগ অনেকটাই তিনি দমিত করেছিলেন এই ভেবে যে, দ্রৌপদী যতখানি তাঁর স্ত্রী, ভীমেরও ঠিক ততখানি। কাজেই উপহার দিলেন সুতসোমের মাকে, শ্রুতকীর্তির মাকে নয়। অর্জুনের মনের অন্তঃস্থ এই অভিমান দ্রৌপদী নিশ্চয়ই বোঝেননি। তবু যে স্বামীর জন্য এত ভালবাসা, এত চাওয়া তিনি চিরটাকাল বহন করে এসেছেন, সেই সরসতায় কি তিনি অর্জুনের দেওয়া বহুমূল্য অলংকারখানি পেলেন, কিংবা তিনিও তো শুধু শ্রুতকীর্তির মায়ের গৌরবে অর্জুনের উপহার

নিতে পারেননি, কারণ তিনি যে সুতসোমেরও মা, ভীমেরও প্রিয়তমা রমণীটি। তবু এরই মধ্যে তার মনে আকুল বসন্তের হাওয়া লাগে, সমস্ত অভিযোগ শেষ হয়ে যায়—যখন প্রিয়-বন্ধু কৃষ্ণ এসে বলেন—এতদিন তোমার ঘর যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। কৃষ্ণা! অর্জুন ফিরে এসেছে আর তোমার ঘর নয় শুধু, তুমিও যেন ভরে উঠেছো—দিষ্ট্যা সমগ্রাসি ধনঞ্জয়েন সমাগতেত্যেবমুবাচ কৃষ্ণঃ। এ সব কথায় দ্রৌপদীর বুক ভরে উঠেছিল নিশ্চয়ই—সে না বুঝুক, অন্যে তো বোঝে।

আমরা এই হৃদয়চর্চার জগৎ বাদ দিয়ে আবারও অর্জুনের কথায় ফিরে আসি। মনে রাখা দরকার—অর্জুন সশরীরে স্বর্গ থেকে ঘুরে এসেছেন। পাণ্ডবভাইয়েরা আর দ্রৌপদী সোৎসুকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলেন। অর্জুন শিশুর মতো—কী দেখেছেন, কী খেয়েছেন, কত ভোগ, কত সুখ—সর্ব অনুপুঙ্খ-বর্ণনায় বিবৃত করলেন ভাইদের সামনে। স্বর্গের সুখে যদি ভাইদের মনে ব্যথা লাগে তাই সব বর্ণনার শেষে বললেন—পাঁচ বচ্ছর আমি স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে কাটিয়েছি, কিন্তু আমার মনে ছিল সেই পাশা-খেলার অপমান—স্মরতা দ্যূতজং কলিম্। এই একটি কথায় যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে সব ভাই এবং অবশ্যই কৃষ্ণা যে কত খুশি হলেন, তা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না। তাঁরাও শিশুর মতো অর্জুনের দিব্য অস্ত্রগুলি দেখতে চাইলেন, যা অর্জুন দেখালেন পরের দিন সকালে। অর্জুন বললেন—দেবরাজ আমাকে বলেছেন—ভীম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ—কেউ তোমাকে কিচ্ছুটি করতে পারবে না। আর এই দেখো না—আমার যুদ্ধের অঙ্গ হিসেবে এই 'দেবদত্ত' শঙ্খ আমাকে দিয়েছেন দেবরাজ, আর শিক্ষার সার্থকতার জন্য মাথায় নিজে পরিয়ে দিয়েছেন এই চূড়া-কিরীট—দিব্যং চেদং কিরীটং মে স্বয়মিন্দ্রো যুযোজ হ।

এইভাবে বনবাসে প্রবাসের কথায় দিন কাটছিল পাণ্ডবদের। এরই মধ্যে দুর্যোধনের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল। তিনি কর্ণের বাষ্পায়িত স্তুতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলেন—একবার হস্তিনাপুরের রাজ-ঐশ্বর্য বেচারা পাণ্ডবদের দেখিয়ে আসা যাক। বিশেষত সেই উদ্ধতা-রমণী দ্রৌপদীকে একবার দেখিয়ে আসা যাক যে, গরিব পাণ্ডবদের বিয়ে করে সে কত বড় ভুল করেছে। ধৃতরাষ্ট্রের এতে সায় ছিল না, কারণ অর্জুনের অস্ত্রলাভে তিনি খানিকটা ভীত ছিলেন। কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, তাঁকে এটা ওটা বুঝিয়ে দুর্যোধন-কর্ণরা দ্বৈতবনের সেই সরোবরের এক পারে এসে থানা গাড়লেন, যার আরেক পারে আছেন যুধিষ্ঠিরেরা। দুর্যোধন ঐশ্বর্য দেখানোর জন্য ঘরের বউ-ঝিদের যথেষ্ট গয়নাগাটি পরিয়ে বনের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন বটে, তবে তাঁর কু-অভিপ্রায় টের পেয়ে সেখানে আগেভাগেই এসে পৌঁছেছিলেন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন, যিনি অর্জুনের স্বর্গসখা।

গন্ধর্ব চিত্রসেন যুদ্ধ করে দুর্যোধন এবং তাঁর বউ-ঝিদের বন্দি করে রাখলেন, কর্ণ পালালেন। খবর গেল যুধিষ্ঠিরের কাছে। ভীম তো গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন—ঠিক হয়েছে ব্যাটাদের, আমরা যা করতাম, গন্ধর্বরাই তা করে দিয়েছে। কিন্তু অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির বললেন—সে কী কথা ভীম! জ্ঞাতিবিদ্বেষ যতই থাক, তারা আমাদের বংশের লোক বটে, তাতে আবার এখন বিপদে পড়ে শরণ নিয়েছে আমাদের। তোমরা যেভাবে হোক—ভাল কথায় হোক, অল্প বল প্রয়োগ করে হোক অথবা যুদ্ধ করেই হোক—তাদের মুক্ত করে নিয়ে এসো। যুধিষ্ঠির কথা বলছিলেন ভীমের সঙ্গে, কিন্তু তাঁর আদেশের জবাব এল গুরুর অধ্যাত্মজীবনের শিষ্যের মতো অর্জুনের কাছ থেকে—প্রতিজজ্ঞে গুরোর্বাক্যম্। বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই, যুধিষ্ঠির বলেছেন—অতএব করতে হবে। ভাবটা এই—দুর্যোধন কে, তা জানি না, সে কী করেছে, জানি না, কিন্তু যুধিষ্ঠির কুলধর্মের কথা বলেছেন—সব মূল্যে সেই ধর্ম রক্ষা করতে হবে। অর্জুন চললেন, সঙ্গে ভাইয়েরাও। গন্ধর্বদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হল। শেষে বন্ধু চিত্রসেনকে অর্জুন বললেন—বন্ধু। ছেড়ে দাও দুর্যোধনকে, হাজার হোক সে আমাদের ভাই; তুমি যদি আমার প্রিয় সাধন করতে চাও, তা হলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছে অনুসারে দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও। নানা কথার পর দুর্যোধনের মুক্তি হল, কিন্তু নিন্দুকেরা বলে—এ কীরকম অর্জুন, তিনি কি যুধিষ্ঠিরের ছায়া? নইলে ভীমের কথাও বুঝি—অন্তত তাঁর বিকার আছে; কিন্তু এই অর্জুনটা কী? তাঁর কি ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই?

দেখুন, সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের অর্থ যাই হোক, ব্যক্তিত্ব মানে কখনই অহঙ্কার নয়, বলদর্পিতাও

নয়। ব্যক্তিত্ব মানে নিজেকে ধারণ করা—তার জন্য চেঁচামেচিও করতে হয় না, বাহু-আস্ফোটও করতে হয় না, দাঁত-মুখও খিঁচোতে হয় না। শুধু দেখবেন—যাঁর ব্যক্তিত্ব আছে, তাঁকে অতিক্রম করা যায় না, তিনি শুধু যুক্তিতে কথা বলেন এবং নিজেকে স্থির রাখেন। এই ব্যক্তিত্ব এবং ধারণক্ষমতা যুধিষ্ঠিরের যেমন ছিল, অর্জুনেরও ঠিক তেমনই ছিল। যার জন্য একের সঙ্গে অপরের শক্তি এবং অস্ত্রশিক্ষার বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের মতের মিল এত বেশি। সাময়িক যে ঘটনাটা ঘটল, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেও নিজেকে এবং অন্যকে বিচার করাটাই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। ভীম সাময়িক ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্বাপর চিন্তা করতে পারেন না ; যুধিষ্ঠির তা পারেন, অর্জুনও তা পারেন। যে কোনও কারণেই হোক এই মুহূর্তে অর্জুনের মাথায় এটা ঢুকে গেছে যে, যুধিষ্ঠির ঠিক কথা বলেছেন—জ্ঞাতি-বিদ্বেষের থেকেও অন্য প্রতিপক্ষের সামনে নিজের বংশ এবং কুলবধূদের মর্যাদা আরও বেশি। অতএব দুর্যোধনের প্রতি ব্যক্তিগত শত-বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে রক্ষা করা উচিত, বিশেষত রক্ষা করা সবলেরই ধর্ম, দুর্বলের নয়।

ঠিক একই রকমের ব্যক্তিত্ব আবারও আপনারা দেখতে পাবেন—দুর্যোধনের ভগ্নীপতি জয়দ্রথ যখন বিজন বনে দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে রথে তুলে নিয়ে চললেন। দ্রৌপদী হাত-পা ছুঁড়তে থাকলেন, কাঁদতে থাকলেন এবং স্বামীদের ভয়ও দেখালেন জয়দ্রথকে। কোনও কাজই অবশ্য হল না। জয়দ্রথ তাঁকে ছাড়লেন না বটে, কিন্তু খবর পেয়ে পাণ্ডবরা সবাই ছুটলেন জয়দ্রথের পেছনে। দূর থেকে পাঁচভাই পাণ্ডবকে দেখে জয়দ্রথ রথস্থা দ্রৌপদীকে তাঁদের পরিচয় এবং গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঠিক এই রকম একটা বিপন্ন মুহূর্তেও দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামী সম্বন্ধে যে মূল্যায়ন করেছিলেন—তা এতই নিখুঁত যে দ্রৌপদীর তারিফ না করে পারা যায় না। আমি যুধিষ্ঠিরের অথবা নকুল-সহদেবের প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু দুই মহাবীর ভীম এবং অর্জুনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কী—তা যুগপৎ দুই নায়কেরই প্রেম-বশীভূতা দ্রৌপদীর দৃষ্টিতে একবার দেখতে পারি।

দ্রৌপদী বলেছিলেন—ওই যে দেখছো—শালখুঁটির মতো চেহারা, কপাল ভ্রূকুটি-কুটিল, আর রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন—ওই হল আমার স্বামী বৃকোদর। ওঁর গায়ের জোর সাংঘাতিক এবং কাজকর্মও ঠিক মানুষের মতো নয়। ওঁকে সবাই তাই ভীম বলে ডাকে। এইবার চরিত্রের মূল কথাটি বললেন দ্রৌপদী—ওঁর কাছে অন্যায় করে পার পাবার উপায় নেই, অপরাধীকে উনি শেষ করে ছাড়বেন। আর শত্রুতা যদি কেউ একবার করে—তা উনি জীবনে ভুলবেন না—নাস্যাপরাদ্ধাঃ শেষমাপ্লুবন্তি/নায়ং বৈরং বিস্মরতে কদাচিৎ। এবার দ্রৌপদী অর্জুনের কথায় আসছেন, যদিও অন্য প্রসঙ্গে আমি এই কথাটা আগে বলেছি। দ্রৌপদী বললেন—ওই যে দেখছো অদ্বিতীয় ধনুর্ধর—তিনি ধনঞ্জয়—অর্জুন। ওঁর যেমন ধৈর্য, তেমনি জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় পেলেই উত্তেজিত হয় না, সেগুলিকে তিনি নিজের ইচ্ছা মতো চালনা করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, ইনি যুধিষ্ঠিরের শুধু ভাই নয়, শিষ্যও বটে। ফলত যুধিষ্ঠিরের যে অসাধারণ গুণগুলি সেগুলিও নিশ্চয়ই অর্জুনের আয়ত্তে। এবার চরিত্রের সেই মূল কথা—দ্রৌপদী বলছেন—কামনার বশে বা ভয় পেয়ে অথবা হঠাৎ ক্রোধে তিনি কখনও ধর্ম ত্যাগ করবেন না। আবার ইচ্ছে হয়েছে বলেই, কিংবা ভয় পেয়েছেন বলেই অথবা রাগ হয়েছে বলেই তিনি নৃশংসতা করবেন তাও নয়—যো বৈ কামান্নভয়ান্ন কোপাৎ, ত্যজেদ্ধর্মং ন নৃশংস্যঞ্চ কুর্য্যাৎ।

বলতে পারেন—এ তো কথার কথা, গুণ গাইতে গেলে অমন কথা মানুষ বলে, তায় আবার বউ বলছে। আমরা বলি—এই মুহূর্তে যে ঘটনাটি ঘটবে, তাতেই দুই ভাইয়ের মৌলিক চরিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বেশি কথায় যাচ্ছি না। ছুটে আসা পাঁচ ভাইয়ের অস্ত্রযুদ্ধে কাতর হয়ে জয়দ্রথ সৈন্য-সামন্ত সব হারালেন। জয়দ্রথ শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে নিজের রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালানোর বুদ্ধি করলেন। জয়দ্রথ পালিয়ে গেছেন অথচ ভীম তাঁর নিরীহ সৈনিকদের পিটিয়েই চলেছেন। অর্জুন বললেন—এ কী করছেন দাদা! যার অন্যায় অসভ্যতার জন্য আমরা বিপাকে পড়েছি, তাকে খুঁজে বার করুন। এই সাধারণ সৈনিকগুলোকে মেরে কী হবে ? অর্জুনের

কথার যৌক্তিকতা লঙ্ঘন করা ভীমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সত্যিই তো জয়দ্রথকে খুঁজে বার করা দরকার। জয়দ্রথ পালানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আর কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু জয়দ্রথের ওপর যে রাগ হয়েছিল, ভীম সেটা মেটাচ্ছিলেন তাঁর সৈনিকদের মেরে। অর্জুনের কথা শুনে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—নকুল-সহদেব এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে আপনি বনের আশ্রমে অপেক্ষা করুন, আমার হাত থেকে জয়দ্রথের আজ রক্ষা নেই। ভীমের কথার মধ্যেই এমন এক রুদ্র ইঙ্গিত ছিল, যা যুধিষ্ঠিরকে সচকিত করে তুলল।

এমন অবস্থায় কার না রাগ হয়? রাগ যুধিষ্ঠিরেরও হয়েছে, ভীমেরও হয়েছে, অর্জুনেরও হয়েছে। চরম অপমানে ক্ষুব্ধা হয়েছেন দ্রৌপদী নিজেও। কিন্তু এই সঙ্কটকালেও ব্যক্তিগত সমস্ত হানির মধ্যেও বিরাট এবং গভীর পুরুষ কিন্তু তাঁর সমস্ত পরিমণ্ডলের কথা মনে রাখেন। ভীমের ভাব দেখেই যুধিষ্ঠির বললেন—যত বদমাইশ হোক, একেবারে প্রাণে মেরে ফেলো না তাকে। বেচারা দুঃশলা-ভগিনীর কথা মনে রেখো। তার খুড়তুতো ভাইদের হাতে দুঃশলার স্বামী মারা যাবে, বিধবা হবে, ধর্মময়ী গান্ধারীর মনের কী দশা হবে—একটু মনে রেখো ভাই—দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্। বেচারাকে প্রাণে মেরো না।

কথাগুলি এমন এক ব্যাপ্ত-গভীর-হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে যা সমসাময়িক ঘটনার নিরিখে ভীষণভাবে প্রতিবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু কথাগুলি অতিক্রম করা কঠিন। হ্যাঁ, প্রতিবাদ অবশ্য হল। দ্রৌপদী তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীর স্থিরতা এক মুহূর্তে উড়িয়ে দিয়ে সেই ক্ষণেই বললেন—না, ভীম। না, যুধিষ্ঠিরের কথা শুনো না। ভীম-অর্জুন দু'জনেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী ভীমকেই শুধু বললেন—তুমি যদি আমার ভাল-লাগার মতো কিছু করতে চাও, তা হলে সেই পাপী কুলাঙ্গার জয়দ্রথকে তুমি কিছুতেই ছাড়বে না, একেবারে মেরে ফেলবে—কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।

ভীম-অর্জুন—এই দুই পৃথক ব্যক্তিত্ব আরও দুই পৃথক ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে চরম দুই আদেশ শুনে জয়দ্রথকে ধরতে রওনা হলেন। অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্য এমনই যে এক ক্রোশ দূর থেকে বাণ ছুঁড়ে জয়দ্রথের রথের ঘোড়া দুটিকে আগে মেরে ফেললেন। জয়দ্রথ তখন দৌড়চ্ছেন। অর্জুন বললেন—ফিরে এসো জয়দ্রথ, এই ক্ষমতা নিয়ে তুমি বীররমণীর জন্য লুব্ধ হও? এসব ভদ্র ভাষা ভীম বোঝেন না। ঝড়ের গতিতে দৌড়ে গিয়ে তিনি জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন। অর্জুন শুধু বললেন—প্রাণে মেরো না। ভীম জয়দ্রথকে চুল ধরে মাটিতে ফেলে কিল, চড়, লাথি, ঘুষিতে এমন অবস্থা করলেন তাঁর যে, জয়দ্রথ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অর্জুন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন—ভগিনী দুঃশলার কথা মনে রেখো, আর কিছু নয়।

সেই একই সুর, সেই একই স্থিরতা। যুধিষ্ঠিরের ভাই এবং শিষ্যের মুখ থেকে যে কথাটা বেরুল—এরও প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু অতিক্রম করা যায় না। শুধু ছোটভাই বলে ভীম বাড়তি যে সুবিধাটুকু পেলেন তাতে প্রতিবাদের ভাষায় এইটুকু সংযোজন হল—শুধু আমি হলে,—দ্রৌপদীর সঙ্গে ও যা ব্যবহার করেছে, তাতে এ ব্যাটা আমার হাত থেকে বাঁচত না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যে দয়ার শরীর—ভীম ব্যঙ্গ করে বললেন—আর তুমি হলে আরেক মাথামোটা, সবসময় আমার কাজে বাধা দিচ্ছ—ত্বঞ্চ বালিশয়া বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মান্ প্রবাধসে। ভীম গালাগালি দিলেন বটে, কিন্তু অর্জুনকে অতিক্রম করতে পারলেন না। দ্রৌপদী, যিনি অত করে ভীমকে বলেছিলেন, সেই তিনিও অতিক্রম করতে পারেননি। ভীম জয়দ্রথকে মাথা মুড়িয়ে চরম অপমানের চুনকালি দিয়ে যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—যথেষ্ট হয়েছে, ছেড়ে দাও ভাই। ভীম বললেন—আপনি বললে কী হবে—দ্রৌপদীকে বলুন—দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি। আমরা জানি সেই মুহূর্তেও যদি দ্রৌপদী বলতেন—তাহলে ভীম তাঁকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু দ্রৌপদীর কী হল? তিনি একবার জ্যেষ্ঠ-স্বামীর দিকে তাকালেন—অভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্। কিন্তু দ্রৌপদীর দিকে যুধিষ্ঠির আর তাকাননি, যদি এই মুহূর্তে তিনি তাঁকে লঙ্ঘন করেন। কিন্তু না, অতিক্রম করা সম্ভব হল না। দ্রৌপদী নিজের গরিমা লঘু করে এমন ভাব দেখালেন, যেন এই যথেষ্ট হয়েছে—ও, তুমি ওর মাথা

মুড়িয়ে দিয়েছ, তাহলে তো ও আমাদের গোলাম এখন, দাও চাকরটাকে ছেড়েই দাও।

দুটি বিপরীতমুখী লোকের কাছ থেকে দুটি বিপরীতমুখী লোক দুটি আদেশ শুনেছিল। কিন্তু গভীর, ধীর এবং ব্যাপ্ত এক হৃদয় যা শুধু মহাভারতের ব্যাপ্ত পরিমণ্ডলের সঙ্গেই মিলে যায়, সেই হৃদয় থেকে যখন আদেশ নেমে আসে, তখন অতি কঠিন ভীমের মতো মানুষও ছোটভাই অর্জুনের একটা বাক্য অতিক্রম করতে পারেন না। শুধু একটা কথা—মা বধীরিতি—প্রাণে মেরো না। ভীম গালাগালি দিয়েও আদেশের মতো অর্জুনের এই শব্দ কটি অতিক্রম করতে পারেননি। দ্রৌপদীও পারলেন না—তাঁর সমস্ত অপমান গায়ে মেখেও যুধিষ্ঠিরের সেই পরিব্যাপ্ত সর্বতোভদ্র অভিলাষ তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না। এই ব্যক্তিত্বের জাত এতই আলাদা, এতই একক যে সাধারণ বুদ্ধিতে এ যেন সওয়াও যায় না, অবহেলাও করা যায় না। এই ব্যক্তিত্বের সর্বগামিতা এতই বেশি যে প্রতিবাদের পরের মুহূর্তেই তা সযৌক্তিক হয়ে পড়ে। অর্জুনও তখন যুধিষ্ঠিরের ছায়া হয়ে থাকেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরের সর্বতোভদ্র ধর্মের প্রযোক্তার মতো দেখা দেন। যুধিষ্ঠির যা মুখে বলেছেন অথচ শক্তিতে সামর্থ্যে করতে পারছেন না, অর্জুন সেটাই আপন শক্তি এবং সামর্থ্যের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যুধিষ্ঠির যে সিদ্ধির কথা উচ্চারণ করেন, অর্জুন তার সাধনোপায়।

কিন্তু তাই বলে অর্জুন যুধিষ্ঠির নন। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, সহ্য এবং ত্যাগও যেন মাত্রাছাড়া, অলৌকিক পর্যায়ের। অর্জুন তা সম্পূর্ণ অধিগত করতে পারেন না। তাঁর বিকার আছে, প্রতিটি বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর প্রতিক্রিয়া আছে, কিন্তু সে বিকার সে প্রতিক্রিয়া তিনি চাপতে পারেন। তাঁর বিকার, বা প্রতিক্রিয়া ঘটনার মুহূর্তে প্রকাশ না পেলেও, পরে তা প্রকাশ পায়, এবং তা তিনি মনেও রাখেন। ধর্মরূপী যক্ষ যখন তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল খেতে নিষেধ করেছিলেন, অর্জুন তা শোনেননি। তার সবচেয়ে বড় কারণ এই নয় যে তিনি গোঁয়ার, তার কারণ তিনি তাঁর অতি প্রিয় দুই ভাই নকুল আর সহদেবকে সেই মুহূর্তে মৃত পড়ে থাকতে দেখেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধনুর্বাণ হাতে নিয়েছেন এবং অবজ্ঞা করার জন্যই যেন অবজ্ঞা করে জলে হাত দিয়েছেন। ফল যা হওয়ার হয়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি অতিমানুষ-চরিত্র-সম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের থেকে আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে গেছেন। বিপ্রতীপভাবে এই সব জায়গায় যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য-স্থৈর্য বুদ্ধদেব বসু মহাশয় তাঁর অসামান্য ভাষা শৈলীতে প্রকাশ করেছেন। আমি এক্ষেত্রে কলম ধরবার উপযুক্ত বোধ করি না নিজেকে। তবে অর্জুনের একান্ত মানুষোচিত বিকারগুলি আমি সময়মতো আরও কিছু দেখাব, যা আমার মতে শুধু মানুষোচিত নয় মহাভারতের নায়কোচিতও বটে।

৯

বনবাস-পর্ব শেষ হলে পাণ্ডবরা বিরাটরাজার বাজবাড়িতে বিভিন্ন ছদ্মবেশে একবৎসর কাল কাটিয়ে দিয়েছেন। অর্জুন সেখানে বেণী বেঁধে হাতে বালা পরে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্যগুরু সেজেছিলেন—এ ঘটনা সবার জানা। আমিও বিরাটরাজার বাড়ির শেষ দিকের কিছু ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করেছি দ্রৌপদীর মনের গতির প্রসঙ্গে। সেখানে বৃহন্নলারূপী অর্জুনের মনের গভীর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, যে দীর্ঘশ্বাস একটি জীবনের প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে—কেউ কখনও কারও মন বোঝে না, দ্রৌপদী! আমি এই মুহূর্তে সূক্ষ্ম-চিকন মনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেব না, তবে আপাতত মহাভারতের বিরাট যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মন দেব এবং অবশ্যই অর্জুনকে লক্ষ করব—কোথায় কীভাবে তিনি সক্রিয় এবং প্রতিক্রিয়। এ-কথা বলা বাহুল্য যে, ভারতযুদ্ধের পূর্বে বিরাটরাজার গোধন লুণ্ঠন করতে এসে দুর্যোধন দুঃশাসন-কর্ণরা, এমনকী ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরাও অর্জুনের হাতে যে রকম নাকানি-চোবানি খেলেন, তাতে প্রাক্-যুদ্ধ প্রদর্শনী হিসেবে অর্জুনের সার্থকতা খুব বেশি মাত্রায় প্রমাণ হয়ে গেল।

মহাভারতের কবি অন্তত দশ-এগারো অধ্যায় জুড়ে অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণনাই শুধু করেননি। এত বছরের পরিণতিতে তাঁর অস্ত্রমোক্ষনে শিল্পের সুষমা লেগেছিল কতটা—তারও একটা আভাস

দিয়েছেন তিনি। যুদ্ধে লক্ষ্যভেদই যেহেতু অর্জুনের জীবনসাধনার প্রথম কল্প ছিল, তাই কোন কোন মহাস্ত্রের সুচতুর প্রয়োগে তিনি এই একক যুদ্ধ জয় করলেন—তার বর্ণনা মহাভারতের কবি ছাড়া অন্য কারও লেখনীতে পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটাবে। তবে যুদ্ধের বাস্তব খবরটুকু দিতে হলে এ-কথা তো একবার বলতেই হবে যে কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, দুঃশাসন, দুর্যোধনের মতো মহাবীররাও ক্ষত্রিয়ের অপলায়নবৃত্তি ভুলে গিয়ে সার বুঝেছিলেন—যঃ পলায়তে স জীবতি—যে পালায় সেই বাঁচে। পালিয়ে গিয়েও সবাই মিলে আরও একবার তাঁরা যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, কিন্তু এইবার অর্জুনের অস্ত্রে ক্রূরতার বদলে শিল্পীর স্পর্শ লাগল। সকলে একযোগে সম্মোহিত হয়ে পড়লেন অর্জুনের বাণে। এই অসাধারণ মুহূর্তেও অর্জুন প্রিয়শিষ্যা উত্তরার জন্য বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ-বস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। শত্রু-জয়ের সামর্থ্যে অর্জুন যখন প্রায় তৃপ্ত, সেই সময় সম্মোহন-বাণের ঘোর কাটল দুর্যোধনের। জ্ঞান ফিরতেই তিনি ভীষ্মকে বললেন—এখনও এই লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, এমন অস্ত্র প্রয়োগ করুন যাতে জীবনে আর কখনও পালাতে না পারে।

মধুর হেসে ভীষ্ম বললেন—এতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলে তাও বোঝোনি, ধনুক বাণ হাত থেকে খসে পড়েছিল, তখন কোথায় ছিল তোমার এই বুদ্ধি আর কোথায় তোমার বীর্য। তবু অর্জুনের চরিত্র দেখো—আমাদের এই স্খলিত অবস্থাতেও শুধু নৃশংসতা হবে বলে আমাদের কাউকে প্রাণে মারেনি। ত্রৈলোক্য রাজ্য হাতে পেলেও নিজের ধর্মত্যাগ করে অন্যায়-কাজটি সে করবে না এবং ঠিক সেই কারণেই আমরা এখনও বেঁচে আছি। ভীষ্মের এই কথাটা দ্রৌপদীর মূল্যায়নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ভীষ্মর কথায় লজ্জিত কুরুপুঙ্গব তাঁর বীরবাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু ভাবতযুদ্ধের আগে এই যে এত বড় মহড়াটা হয়ে গেল, তাতে অর্জুন নিজে মানসিকভাবে নিজের মধ্যেই বড় রকমের আস্থা খুঁজে পেলেন। তেমনই কৌরবদের মেরুদণ্ডপ্রমাণ ভীষ্ম-দ্রোণের কাছেও তিনি এগিয়ে রইলেন এক কাঠি।

ওদিকে বিবাটরাজ্যে ভারী মজার এক কাণ্ড ঘটে গেল। অর্জুন যদিও জানেন যে, তাঁদের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়ে গেছে, তবু তিনি নিজে এই যুদ্ধ-জয়ের সূত্রে নিজেকে উজ্জ্বল করে বিরাটরাজার কাছে নিজের বা পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় দিতে চান না। এত বড় একটা কাজ করেও তিনি এতটাই লাজুক যে, কোনও ক্রমেই অজ্ঞাতবাসের অপরিচয় নিজে পুরোধা হয়ে ভেঙে দিতে চান না। যুদ্ধ-জয়ের সমস্ত কৃতিত্ব তিনি কুমার উত্তরের মাথায় চাপিয়ে সারথি বৃহন্নলার সুবাদে রাজার দ্বারে এসে পৌছলেন। ওদিকে রাজসভায় দুটি পৃথক ব্যক্তি দুটি পৃথক কারণে একেবারে গদগদ হয়ে আছেন। বিরাটরাজা কঙ্ক-যুধিষ্ঠিরকে একটু আগে সবিষাদে বলেছেন—সৈন্য-সামন্ত পাঠানো দরকার এখনই। ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা কে জানে? যার রথের সারথি হয়েছে একটা হিজড়ে, সে কি আর বাঁচবে? বয়স্য স্বভাবে কঙ্ক-যুধিষ্ঠির হেসে বললেন—আপনার কোনও চিন্তা নেই মহারাজ! বৃহন্নলা যখন সারথ্য করছে, তখন আপনার গরুও চুরি যাবে না, কুমারও যুদ্ধ জিতবে।

এরই মধ্যে দূতেরা এসে খবর দিল—কুরুরা পরাজিত, গোধন সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে, কুমার উত্তর ভাল আছেন। যুধিষ্ঠির আরও একবার বললেন—উত্তরের বিজয়ে আমি খুব একটা আশ্চর্য হচ্ছি না, মহারাজ, যার সারথি বৃহন্নলা, জয় তার হবেই তো। কুমার উত্তরের গর্বে সেই সময় রাজার মন এত ভরে ছিল যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের কথায় অত গুরুত্ব দিলেন না, বরঞ্চ উত্তরকে রাজদ্বারে বরণ করার জন্য উপযুক্ত ধুমধাম যাতে হয়, সেই প্রক্রিয়ায় মেতে উঠলেন। ধুমধামের ব্যবস্থা হচ্ছে। বিরাট এবার খুশ-মেজাজে দ্রৌপদীকে ডেকে বললেন—সৈরন্ধ্রী! পাশার ছকটা পেতে দাও তো, এক দান খেলে নেওয়া যাক। এদিকে যুধিষ্ঠিরের তখন মনটা ভাল নেই—অর্জুন যুদ্ধ-জয় করে এসেছেন, আর তার কৃতিত্ব দাবি করছেন সেদিনের ছেলে কুমার উত্তর। এ সব তাঁর ভাল লাগছে না। তিনি বললেন—এত খুশি হয়ে পাশা খেলতে নেই, রাজা। আপনি যুধিষ্ঠিরের কথা শোনেননি? খুশ মেজাজে পাশা খেলে সে সব হেরে গিয়েছিল। রাজা বললেন—কুছ পরোয়া নেই, খেলো পাশা।

পাশা-খেলা আরম্ভ হল—রাজা এবার বললেন—ভাবা যায় না, কঙ্ক। ওই মহা মহা কুরুবীরদের

কুমার উত্তর একেবারে টিট্ করে দিয়েছে। যুধিষ্ঠির ঠাণ্ডা মাথায় বললেন—বৃহন্নলা যার সারথি সে জিতবেই বা না কেন ? রাজা এবার রেগে বললেন—দেখো, বারবার আমার বীর পুত্রের সঙ্গে ওই হিজড়েটার কথা টেনে আনছো তুমি। শুধু আমার পাশা-খেলার বন্ধু বলে ছেড়ে দিলাম, নইলে আজকে বাঁচতে না। যুধিষ্ঠিরের মনটা আজকে বাধা মানছে না। হয়তো অজ্ঞাতবাসের দিন-শেষের কথা তাঁরও খেয়ালে ছিল, অন্যদিকে এমন একটা মুহূর্তে অর্জুনের গৌরব একটি বালকের মিথ্যা-কৃতিত্বে আচ্ছন্ন হচ্ছে—এ যেন তাঁর সহ্যই হচ্ছিল না। তিনি এবার প্রায় পরিষ্কার করেই বলে ফেললেন—ওই ভীষ্ম, ওই দ্রোণ, ওই কর্ণ—ওঁদের সঙ্গে বৃহন্নলা ছাড়া আর কে লড়তে পারে ? এরপর আরও কথা, আরও প্রশংসা, যুধিষ্ঠিরের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। রাজা পাশার ঘুটি দিয়ে যুধিষ্ঠিরের মাথায় আঘাত করলেন। রক্ত চুঁইয়ে পড়ল তাঁর কপাল থেকে।

কী এমন হল যে, যুধিষ্ঠির মার খেয়েও নিজেকে সংযত রাখতে পারছেন না ; বিশেষত আশ্রয়দাতা রাজা যদি একটু পুত্র-প্রশংসা করে আনন্দ পান—তাতেই বা তাঁর কী আসে যায়! আমাদের ধারণা—যুধিষ্ঠিরের এই বাঁধ-ভাঙা বাক্যরাশির পিছনে আছে তাঁর অন্তর্নিহিত আনন্দ। অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেছে, এখন আর তিনি মনে মনে অন্তত কারও আশ্রিত নন। আর প্রথাগত কোনও মহাযুদ্ধের আগেই এমন একটা যুদ্ধ যে অর্জুন জিতে এলেন, তাতে যুধিষ্ঠির আশ্রয়দাতাকে প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ পেলেন। সবই সম্ভব হয়েছে অর্জুনের জন্য, অথচ অর্জুন সে কৃতিত্ব পাচ্ছেন না—এই দ্বন্দ্ব তাঁকে একদিকে যেমন বিষাদগ্রস্ত করছে, তেমনই অন্যদিকে তাঁর স্তম্ভিত ভ্রাতৃগর্ব উদ্বেলিত করে তুলছে। যুধিষ্ঠির জানেন না যে, এই কৃতিত্বের জন্য অর্জুন নিজেই লালায়িত নন। কুমার উত্তরকে তিনি আগেই বলে দিয়েছেন—তুমি বলবে—তুমিই এই যুদ্ধ জিতেছো—ত্বমাত্মনঃ কর্ম কৃতং ব্রবীহি। কিন্তু কুমার যখন নিজের কথা বলতে পারলেন না এবং যুদ্ধ-জয়ের কৃতিত্ব চাপিয়ে দিলেন কল্পলোকের এক দেবকুমারের ওপর, তখন অর্জুন আর কী করেন! তিনি দুদিন ধরে কুমার উত্তরের সঙ্গে গোপন পরামর্শে মেতে থাকলেন—কেমন করে, কোন নাটকীয়তা সৃষ্টি করে—মন্ত্রয়িত্বা তু কৌন্তেয় উত্তরেণ রহস্তদা—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আরও উজ্জ্বলভাবে বিরাটের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাতে তিনি একেবারে বিস্ময়ে আকুল হয়ে ওঠেন, আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে যান।

সেদিন থেকে তিনদিনের মাথায় পাণ্ডবরা নিজেদের অজ্ঞাতবাসের অন্তরাল ভেঙে ফেললেন। বিরাটেশ্বর আনন্দে, বিহ্বলতায় নিজের মেয়ে উত্তরাকে তুলে দিতে চাইলেন অর্জুনের হাতে। অর্জুন বললেন—অন্তঃপুরে তাকে বড় কাছে থেকে আমি দেখেছি। যা কিছু তার গোপনীয় এবং যা প্রকাশ্য—সবই আমার জানা। সে আমাকে পিতার মতো বিশ্বাস করে। তা ছাড়া এতদিন আচার্যের মতো তাকে নৃত্যশিক্ষা দিয়ে এখন আর সম্ভব নয় তাকে বিয়ে করা। আর পাঁচজনেই বা কী বলবে ? পুরোটা বছর আমি তোমার বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে দিন কাটিয়েছি, এখন তাকে হঠাৎ বিয়ে করলে লোকে আমার শুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, আমাকে সন্দেহ করবে। তাঁর চেয়ে এই ভাল—তোমার মেয়ে আমি নিশ্চয় নেব, তবে সে আমার ছেলের বউ হিসাবে, নিজের নয়।

অর্জুনের কথার প্রত্যেকটি যুক্তি ছিল অকাট্য। সে যুক্তি একদিকে যেমন তাঁর নিজের জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় বহন করে, তেমনই অন্যদিকে সে যুক্তি তাঁর প্রৌঢ় পিতৃত্বের গৌরবে সচেতন। তিনি এটা বেশ বুঝেছেন যে, তাঁর যা বয়স হয়েছে, তাতে এখন আর বিবাহ মানায় না। বিশেষত যে বালিকা এখনও পুতুল খেলার জন্য বৃদ্ধ কৌরবদের রঙিন উষ্ণীষ কামনা করে, সে যে প্রবীণ অর্জুনের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে না—সেটা তিনি বুঝেছেন। বাস্তববোধই তাঁকে নবীন অভিমন্যুর জন্য পুত্রবধূ নির্বাচনে সাহায্য করেছে। তেরো বৎসর কঠিন বনবাস-কষ্টের পর কোনও নবীনা বধূ তাঁর লক্ষ্য হতে পারে না, তাঁর লক্ষ্য এখন হৃত মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাটের রাজধানীতে পাণ্ডব-সহায় রাজারা সবাই প্রায় সমবেত হলেন—দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম এবং আরও কিছু কর্তাব্যক্তি। এই সব সভায় আমরা অর্জুনকে প্রায় কথা বলতে দেখিনি। তাঁর গাণ্ডীব এবং দিব্য-অস্ত্রের চেতনায় অন্য যোদ্ধাব্যক্তিরা অনেকেই বারংবার বলে গেছেন যে, অর্জুনের সামনে আসলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু অর্জুনকে আমরা কিছু বলতে দেখছি না। এমনকী কুরুসভায় দ্রুপদের যে দূত প্রথম গিয়ে পাণ্ডবদের জন্য রাজ্য যাচনা করছে, সেই দূতও ধৃতরাষ্ট্র এবং কুরুবৃদ্ধদের অর্জুনের ভয় দেখাচ্ছে। বলছে—তোমাদের একদিকে ওই এগারো অক্ষৌহিণী সেনা আর একদিকে অর্জুন—সত্যি বলছি, তোমরা পার পাবে না। আর শুধু পাণ্ডবদের দূতই বা কেন, কারণ ধরে নিতে পারি—সে অর্জুনের গুণ বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু দুর্যোধনের পক্ষেও যাঁরা শান্তিকামী আছেন, তাঁরাও অর্জুনের ভয় দেখিয়ে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। স্বয়ং ভীষ্মের মতো অত বড় ইচ্ছামৃত্যু যোদ্ধা পর্যন্ত সেই সময় কুরুসভাকে উদ্দেশ করে বলেছেন—অর্জুনের মতো অস্ত্রবিৎ মহারথ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে? স্বয়ং ইন্দ্রও যদি বজ্র হাতে নেমে আসেন ভুঁয়ে, তবে তাঁর পক্ষেও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে কি না জানি না, অন্য ধনুর্ধরদের কথা আর কী বলব—কিমুতান্যে ধনুর্ভৃতঃ?

কুরুসভায় অর্জুনের সম্বন্ধে ভীষ্মের ধন্যধ্বনিতে কর্ণের গা যেন জ্বলে গেল। তিনি একেবারে রে রে করে ভীষ্মের কথার প্রতিবাদ করলেন, অনেক অপকথাও বললেন সঙ্গে। ভীষ্ম আর থাকতে পারলেন না। বললেন—এত বড় বড় বাত দিয়ে তো লাভ নেই—কিন্তু রাধেয় বাচা তে—তুমি তোমার কর্মটা স্মরণ করো। বিরাটরাজার গো-হরণের সময় অর্জুন একা আমাদের ছ'জনকে কাত করে দিয়েছিল। অতএব এখন পাণ্ডবদের এই রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়ে যদি তোমার কথা শুনি, তা হলে অর্জুনের বাণে যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়ে শুয়ে ধুলো খেতে হবে, বুঝলে— ধ্রুবং যুধি হতাস্তেন ভক্ষয়িষ্যামঃ পাংশুকান্। ভীষ্মের কথা শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও খানিকটা থতমত খেয়ে শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়কে দূত করে পাঠালেন পাণ্ডবদের কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের বার্তায় শান্তির বাণী ছিল, পাণ্ডবদের জন্য সোৎসুক কুশল প্রশ্ন ছিল, কিন্তু হৃতরাজ্যের প্রতিদান নিয়ে কোনও বরাভয় ছিল না। সরলমতি যুধিষ্ঠির পর্যন্ত সে সব কথায় ভুললেন না। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, কুরুসভার দূত সঞ্জয়ের সঙ্গে যা কথাবার্তা হল—তা সবই প্রায় যুধিষ্ঠির উবাচ। অর্থাৎ যুদ্ধ, শান্তি বা নীতি-নিয়ম নিয়ে যা কথাবার্তা হল, তা সবই প্রধানত সঞ্জয়ের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের। হ্যাঁ, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান, পাশা-খেলা—ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্জুন কিংবা ভীমের মনোভাব যুধিষ্ঠির জানাতে ভোলেননি, কিন্তু অর্জুন সেখানে বড়দাদাকে অতিক্রম করে কোনও কথাই বলেননি। অথচ সঞ্জয় যখন কুরুসভায় ফিরে পাণ্ডবদের বিশেষত যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য নিবেদন করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, তখন—কী আশ্চর্য, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রথম প্রশ্ন করছেন—বলো সঞ্জয়। কুরুসভায় রাজাদের কাছে বলার জন্য সেই অর্জুন কী বার্তা পাঠিয়েছেন?

সঞ্জয় বললেন বটে, তবে অর্জুনের যা মনোভাব ছিল, তা অর্জুনের জবানীতে বললেন। সেই ওজস্বিনী ভাষার মধ্যে অর্জুনের নিজস্ব অহঙ্কার যতটুকু ছিল, তা সবটাই যেন ভাইদের বীর্যবত্তার জন্য। যুদ্ধ লাগলে ভীম কী করবেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু কতটা ক্ষতি করবেন কৌরবদের—সেই স্তুতিতেই অর্জুনের ভাষা প্রধানত খর হয়ে উঠেছিল। ফলত নিজের কথা যখন এল তখন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অহঙ্কারও কিছু মিশে গেল তাঁর ভাষণে। এই প্রথম আমরা অর্জুনকে জোরালো ভঙ্গিতে বলতে শুনলাম যে, যখন যুদ্ধকালে আমার গাণ্ডীবের টঙ্কার শোনা যাবে তখন মন্দবুদ্ধি কৌরবরা অনুতাপ করবে—কেন যুদ্ধ করতে এলাম। যখন মেঘের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতো, গাছ থেকে পাকা ফলের মতো আমার বাণগুলি পড়বে দুর্যোধনের সৈন্য-সামন্ত আর তার নিজের ঘাড়ে—তখন তারা অনুতাপ করবে।

অর্জুনের ভাষণ দীর্ঘতর ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর কথায় আত্মগরিমার আভাস পাওয়া গেল,

সেই মুহূর্তেই তিনি বন্ধু কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার দিকে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অসংখ্য যুদ্ধে তাঁর পারদর্শিতার খবর দিয়ে অর্জুন বলেছেন—সবার ওপরে বৃদ্ধ পিতামহ, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং মহামতি বিদুর আছেন—তাঁরা যা বলবেন, তাই হবে। তাতে কুরুকুলের আয়ু বাড়ুক—এতে সর্বে যদ্ বদন্ত্যেতদস্তু/আয়ুষ্মন্তঃ কুরবঃ সন্তু সর্বে। বস্তুত কুরুবৃদ্ধরা প্রত্যেকেই প্রধানত অর্জুনের ভয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। দুর্যোধন গোঁয়ার ছেলের মতো বাবা-মা ঠাকুরদাদা কারও কথাই শোনেননি। উল্টো দিক দিয়ে আপনারা অর্জুনকে দেখুন। এই কিছুক্ষণ আগে যাঁকে আমরা কথঞ্চিৎ আত্মগৌরব প্রকাশ করতে দেখেছি, এই যিনি দুর্যোধনের ভবিষ্যৎ অনুতাপ নিয়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই অর্জুন নিজেকে আত্মজনের স্বার্থে, বিশ্বজনের স্বার্থে কতটা পরিবর্তিত করছেন।

কোনওদিক দিয়েই কোনও কিছু ফল হল না দেখে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে কুরুসভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার আগে আসন্ন যুদ্ধের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে তিনি প্রত্যেক পাণ্ডবকে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত জিজ্ঞাসা করেছেন। আর কী মহানুভবতা এই পাণ্ডবদের। যুদ্ধে লোকক্ষয় এবং স্বজনবিনাশ যাতে না ঘটে, সেজন্য শুধু যুধিষ্ঠির নয়, ভীমের মতো ওইরকম আপাতক্রোধী মানুষও সেখানে শান্তির কথাই বললেন। কৃষ্ণ পর্যন্ত এতে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। কিন্তু ওই যে আগে বলেছি, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন—এই দুজনের মধ্যেই এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল যাকে ইচ্ছে করলেই অবহেলা করা যায় না। ভীম জানতেন—যুধিষ্ঠির যা বলেছেন, অর্জুনও তাই বলবেন। বিশেষত যুধিষ্ঠির যেটা বলবেন তাঁর গভীর দার্শনিক বুদ্ধির প্রমাণে, অর্জুন সেটাই বলবেন তাঁর নিপুণ অস্ত্রশিক্ষার গৌরব বিনীত করে। অস্ত্রের শাসনে মানুষের কতটা ক্ষতি হতে পারে সেটা তিনি অত্যন্ত মানবিকভাবে চিন্তা করতে পারেন বলেই আপন অধিগত অস্ত্রবিদ্যা—যা নাকি তাঁকে উদ্ধতও করতে পারত, তাই তাঁকে উদাত্ত এবং প্রশান্ত করে তুলেছে। ফলে কৃষ্ণ যখন অর্জুনের মত জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন—আমার যা বলার ছিল, যুধিষ্ঠিরই তা বলে দিয়েছেন—উক্তং যুধিষ্ঠিরেণৈব যাবদ্ বাচ্যং জনার্দন।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের মতে মত মিলিয়ে দিলেন দেখে কেউ যদি আবারও ভাবেন অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ছায়া মাত্র—তা হলে কিন্তু আবারও মস্ত ভুল হবে। মনে রাখা দরকার, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কুরুসভায় পাঠাতেই চাননি। প্রথমত তিনি জানতেন, এই শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হবে। দ্বিতীয়ত সমাগত রাজবৃন্দ এবং কুরুসভার মধ্যে কৃষ্ণের মতো মানুষের প্রস্তাব বিফল হবে—এটা যুধিষ্ঠিরের ভাল লাগেনি। কিন্তু কৃষ্ণ রাজনীতিটা যুধিষ্ঠিরের থেকে ভাল বুঝতেন এবং সেই কারণেই শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ করার রাজনৈতিক দায় যাতে কৌরবদের ওপর পড়ে—সেইজন্যেই কুরুসভায় যেতে চেয়েছেন। অন্যদিকে অর্জুনকে লক্ষ করুন। তিনি যুধিষ্ঠিরের শান্তি কামনায় সম্মতি জানিয়েছেন, কিন্তু অহেতুক দার্শনিকতার মধ্যে যাননি, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দার্শনিকতার পরিণতি নয়, রাজনীতিরই পরিণতি। অতএব যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমর্থন করেই অর্জুন কৃষ্ণের দিকে ঝুঁকেছেন।

অর্জুন বললেন—তোমার কথাটা আমার বেশ ভাল লেগেছে, কৃষ্ণ! তুমি নিশ্চয় এটা বুঝেছ যে, এখন আমাদের খারাপ অবস্থার নিরিখে এবং ধৃতরাষ্ট্রের লোভের নিরিখে কিছুতেই সন্ধি হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তুমি বলেছ—যুদ্ধ যে তুমি চাও না, তা মোটেই নয়। তা যদি হয়, তবে যুদ্ধই হোক। কৃষ্ণের কাছে নিজের অন্তর্গত মনের কথাটা জানিয়েই আবার যুধিষ্ঠিরের মনোগত ইচ্ছায় স্থিত হয়েছেন অর্জুন—অর্থাৎ যুদ্ধ নয় শান্তিই চাই। যে অদ্ভুত প্রাজ্ঞতায় এখানে তিনি যুধিষ্ঠিরের ওপরে কথা বলে পুনরায় যুধিষ্ঠিরের দিকে ঝুঁকলেন—তা বলে বোঝানো যাবে না। একইভাবে কৃষ্ণকে এবং অন্য ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিলেন আরও দুটি পুরাতন কথা। এক, রাজসভায় আহূত হয়ে যুধিষ্ঠির পাশা খেলে কোনও অন্যায় করেননি, বরঞ্চ কপট পাশা খেলে কৌরবরাই তাঁদের বনবাসের কষ্ট দিয়েছে। দুই, যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করার পরেও অর্জুন এবার অত্যন্ত সচেতনভাবে দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বলেছেন—তুমি তো জানো কৃষ্ণ! কীভাবে দ্রৌপদী সভার মধ্যে অপমানিত হয়েছেন এবং পাণ্ডবদের মনের ভিতর যে সেই অপমান এখনও ক্রিয়া করছে—এও তুমি

নিশ্চয়ই জানো। অর্জুনের যুক্তিটাই অন্যরকম। যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলা এবং দ্রৌপদীর অপমান দুটোকে তিনি আলাদা 'ইসু' ভাবেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর অপমানের জন্য তিনি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারেন, কিন্তু সেই অপমান যে যুধিষ্ঠিরের জন্যই হয়েছে—এটা তিনি মনে করেন না। যুধিষ্ঠিরকে কপট-পাশায় দুর্যোধনেরা হারিয়েছে এবং তাদেরই অন্যায়-পরম্পরায় দ্রৌপদীর অপমান অন্য একটি অপমানমাত্র। এর জন্য কৌরবেরাই দায়ী, যুধিষ্ঠির নয়।

এই যে একদিকে শুদ্ধবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে সবার কাছ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা এবং অন্যদিকে ধর্মপত্নী দ্রৌপদীর অপমানের জন্য তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা—এই দুটোই অর্জুনকে যতখানি 'ব্যালান্সড়' মানুষটি করে তুলেছে, ঠিক ততখানিই যুধিষ্ঠিরের মতো ব্যক্তিত্ব থেকে তাঁকে পৃথক করে ফেলেছে। কৃষ্ণ শান্তির বাণী নিয়ে কুরুসভায় যাবার আগে একবার কুন্তীর কাছে গেলেন। এই অবসরে মহারানি কুন্তী যাঁর কথা বারবার স্মরণ করেছেন—তিনি অর্জুন। বারবার কুন্তী আক্ষেপ করেছেন যে, এত অপমানিত হওয়া সত্বেও, সে এসব সইছে কী করে ? উপহাস করে বলেছেন—আহা যেদিন অর্জুন আমার কোলে এল, দেবতারা আকাশবাণী করে বলেছিলেন—এই ছেলে তোমার বিশ্বজয় করবে। হায় কিসের কী ? গম্ভীর হয়ে কুন্তী বলেছেন—আমার কথা বলে তুমি তাকে বোলো, কৃষ্ণ—যে বিপন্ন সময়ের জন্য ক্ষত্রিয় জননীরা বীরপুত্র গর্ভে ধারণ করে, সেই সময় এখন এসে গেছে—যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালো'য়মাগতঃ। জননীর হাহাকারে, দ্রৌপদীর অপমানে বীরগর্ভা কুন্তী আহত আপ্লুত হয়ে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না—এত অস্ত্রশক্তি, এত নিপুণতা নিয়েও অর্জুন কেন চুপ করে আছে ? কিন্তু এর উত্তর যে তিনি জননী হিসেবে প্রথম কুশল প্রশ্নেই কৃষ্ণকে বলে নিয়েছেন—সে কথা তাঁর খেয়াল নেই। কুন্তী বলেছিলেন—আমার অর্জুন কেমন আছে কৃষ্ণ। আমার অর্জুন—সূর্যের মতো যার তেজ, শম-দম ইত্যাদি সাধন যার ঋষির মতো, ক্ষমাতে যে সর্বংসহা বসুন্ধরার মতো. আর ইন্দ্রের মতো যার বিক্রম—সেই ধনঞ্জয় অর্জুন কেমন আছে, কৃষ্ণ ?

এই বিশ্বসংসারে জননীই যেহেতু তাঁর পুত্রকে সব থেকে বেশি চেনেন, তাই অর্জুনের সম্বন্ধে কুন্তীর এই মূল্যায়ন আমরা খুব বেশি মূল্যবান মনে করি। যে মানুষের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী রোগ আছে, তার চিকিৎসা করা যেমন কঠিন, তেমনই সূর্যের মতো যাঁর তেজ অথচ পৃথিবীর মতো যাঁর ধারণশক্তি, তাঁকে কারণ উপস্থিত হলেই উদ্দীপ্ত করা কঠিন। এই ধাতের মানুষেরা অপেক্ষা করে থাকেন। যখন পৃথিবী তার ধারণসীমা অতিক্রম করে, যখন অন্যায় অন্ধকার রাত্রির মতো ঘন হয়ে ওঠে, তখনই উপযুক্ত সময়ে সূর্যের মতো আত্মপ্রকাশ করেন অর্জুন। দুর্যোধনের অহঙ্কারে এবং নির্বুদ্ধিতায় কৌরবদের কাল পরিণত হয়ে এসেছিল এবং এই উপযুক্ত সময়ে অর্জুনকেও আমরা কথা বলতে দেখেছি, তাঁকে উদ্যোগী হতেও দেখছি। যুধিষ্ঠির-অর্জুনের আশঙ্কা অনুযায়ী কৃষ্ণের শান্তিকামনা সার্থক হল না এবং আবারও বীর জননী কুন্তী যুদ্ধক্ষেত্রে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান জানালেন, কারণ তাঁর মতে সমস্ত পাণ্ডবরা অর্জুনের ওপরেই প্রধানত ভরসা করে—যস্য বাহুবলং সর্বে পাণ্ডবাঃ পর্যুপাসতে।

কৃষ্ণের দৌত্য বিফল হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডবরা যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। পাণ্ডবদের সেনাপতি নির্বাচিত হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং এই নির্বাচন অর্জুনের ভোটেই। কৃষ্ণ নির্বাচন সমর্থন করেছেন। সেনাপতি নির্বাচন করার সময় সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সহদেব মৎস্যরাজ বিরাটের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। নকুল সেনাপতি হিসেবে চেয়েছিলেন দ্রুপদকে। এমনকী ভীম শিখণ্ডীকে চেয়েছিলেন সেনাপতি করতে। কিন্তু অর্জুনের নির্বাচনই যে সবচেয়ে বুদ্ধিসম্মত ছিল, তা বোঝা যায় কৃষ্ণের সমর্থনে। প্রথমত ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্বাচিত হলে, দ্রুপদ এবং শিখণ্ডীর কিছুই বলার থাকে না, কারণ তাঁরা এক ঘরেরই মানুষ। দ্বিতীয়ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অর্জুনের সমর্থনের পিছনে আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল বলে আমরা মনে করি, তবে তা ঠিক কি না, মহাভারত-রসিকেরা তা বিচার করে দেখবেন। কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান পঞ্চপাণ্ডবদের মনে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। কিন্তু উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ শান্তির দূত হয়ে যাবার সময় সবাই যখন শান্তির কথা বলতে শুরু করলেন, বিশেষত ভীম এবং অর্জুন—যাঁরা দ্রৌপদীর অপমানে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, তাঁরাও যখন শান্তির

দিকেই ঝুঁকতে লাগলেন তখন আরও একবার অভিমানে ফেটে পড়লেন দ্রৌপদী। তিনি বললেন—যুদ্ধ যাতে লাগে সেই ব্যবস্থাই তোমার করতে হবে কৃষ্ণ। পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণী হয়ে রাজসভায় যে অপমান আমি সহ্য করেছি, তার প্রতিবিধান যদি এঁরা না করেন, তাহলে ধিক ভীমসেনের শক্তিতে। ধিক অর্জুনের ধনুষ্মত্তায়। আমি আবারও বলছি—যদি ভীম অথবা অর্জুনের মতো মহাবীর সেই অপমানের কথা মাথায় রেখেও এখন হঠাৎই সন্ধিকামুক হয়ে ওঠেন, তবে জেনো—আমার বুড়ো বাবা, আমার ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং আমার ছেলেরা আমার জন্য যুদ্ধ করবে—পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈ মর্হারথৈঃ।

আমার ধারণা—যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের সেনাপতি নির্বাচনের সময় দ্রৌপদীর এই অভিমানের কথাটা অর্জুনের মনে ছিল। চিরকালই তিনি কথা বলেন কম, কিন্তু কথা তাঁর মনে থাকে বড় বেশি। তাই সময় যখন উপস্থিত হল, তিনি প্রথমেই সেনাপতিত্বের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম উল্লেখ করলেন। কৃষ্ণের সমর্থনে এই নির্বাচনের পিছনে রাজনৈতিক এবং পারিবারিক মাত্রা বিনা কথায় যুক্ত হয়ে গেল। কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। দুর্যোধনের শিবিরে বিরাট জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল—কে কতদিনে পাণ্ডবদের উৎখাত করতে পারেন। ভীষ্ম বলেছেন—আমি একমাসে সব শেষ করতে পারি, দ্রোণ বলেছেন—আমিও তাই। কৃপাচার্য সময় নিয়েছেন দু'মাস, অশ্বত্থামা দশদিন আর কর্ণ পাঁচদিন। সব শুনে যুধিষ্ঠির তো একটু ভয়ই পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন— হ্যাঁ গো অর্জুন, সবাই যে দশদিন, পাঁচদিন সব বলছে, তা তুমি কত সময়ে এই বিরাট কুরুসৈন্য ধ্বংস করতে পার? অর্জুন উত্তর দিলেন। সবাই জানেন এবং আমিও পূর্বে এ-কথা উল্লেখ করেছি যে, শুধুমাত্র এই উত্তরের ওপর নির্ভর করে যুধিষ্ঠির অর্জুনের মৃত্যুকালীন বিচার করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের মতে অর্জুনের কথার মধ্যে অহঙ্কার ছিল। তিনি নিজেকে এতবড় ধনুর্ধর ভাবতেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ যা পারেন না, তাই তিনি একদিনে করে দেবেন বলেছিলেন। বস্তুত মহাভারতের যে জায়গাটায় এই প্রশ্নোত্তর-পর্ব ঘটেছে, সেখানে আমরা অর্জুনকে একটুও অহঙ্কারী দেখিনি, বরঞ্চ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। অর্জুন প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—যাঁদের কথা আপনি বললেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ ধনুর্ধর। যা তাঁরা বলেছেন, তাঁরা তা করতেও পারেন—এ ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু তার জন্য আপনার কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মহামতি বাসুদেব সহায় থাকলে—এক নিমেষে আমি সমস্ত ভূত-চরাচর ধ্বংস করতে পারি। তার কারণ আমার কাছে শিবের দেওয়া সেই পাশুপত-অস্ত্র আছে—যা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা—কারও কাছেই নেই। দেবদেব পশুপতি যুগান্তসময়ে তাঁর সংহার-লীলার জন্য যে অস্ত্র প্রয়োগ করেন—তা তিনি আমাকে দিয়েছেন।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অর্জুন জানিয়েছেন—তবু কিন্তু আমি এই অস্ত্রের সাহায্য নেব না, কারণ এই দিব্য-অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য নয়। আমি যুদ্ধ করব, সবাই যেমন যুদ্ধ করে তেমনই, একেবারে বিশিষ্ট অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট অস্ত্র—ঋজুযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে অর্জুন কোনও সময়সীমা উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ সবিনয়ে দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইত্যাদি স্বপক্ষীয় ধনুর্ধরদের কথা গৌরব সহকারে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—এঁরা থাকতে আপনার চিন্তা কী মহারাজ? এই বাক্যগুলির মধ্যে কোথাও কোনও অহঙ্কারের স্পর্শমাত্র আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আর ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি মহাধনুর্ধরদের কথার প্রতিক্রিয়ায় অর্জুন যে নিমেষে শত্রুশাতনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন—তার মধ্যে তাঁর নিজের অহঙ্কার যতখানি ছিল, তার চেয়ে মহাদেবের দেওয়া পাশুপত-অস্ত্রের গৌরব ছিল একশোগুণ বেশি। তবু কিন্তু তিনি এই অস্ত্রের গৌরব আত্মসাৎ করতে চাননি। বরঞ্চ বলেছেন—আমি ঋজুযুদ্ধ করব অর্থাৎ আমি যা পারি—দিব্য-অস্ত্রের গৌরবে তার বেশি কিছু করব না বা করে দেখাতে চাই না।

এই কথার পরেও যুধিষ্ঠির, মনে রাখবেন—ধর্মবিৎ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে তুচ্ছ ব্যপদেশে মৃত্যুর দায় দিয়েছেন অর্জুনকে—তা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। মনে করি না—তার কারণ আরও গভীর হতে পারে এবং অনেক সময় গভীর এবং কোনও সঙ্গত কারণ লুকোনোর জন্যে মহাজনেরাও তুচ্ছ কারণ

আশ্রয় করেন। আমাদের ধারণা—যে দোষে দ্রৌপদীকে দায়ি করেছেন যুধিষ্ঠির—অর্থাৎ পাঁচ পাণ্ডবকে বিয়ে করেও দ্রৌপদী অর্জুনকে বেশি ভালবাসতেন—উল্টো দিক দিয়ে একইরকম আশঙ্কা অর্জুনের ব্যাপারেও লালন করেননি তো যুধিষ্ঠির ? অন্তত মনে মনে ? অর্জুন যে দ্রুপদসভায় সমস্ত বীরমণ্ডলীর মাথা হেট করে দিয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন—এ-কথা কি যুধিষ্ঠির ভুলতে পেরেছিলেন ? অর্জুন ছাড়া অন্য কোনও পাণ্ডবই যে সেই অসম্ভব মৎস্য-লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন না—এ-কথা কি যুধিষ্ঠির সব সময় মনে রাখেননি ? যদি মনে নাও রাখতেন স্বয়ং দ্রৌপদীই কি কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর প্রকৃত অধিকারীর কথা মনে করিয়ে দেননি ? এই তো সেদিন যখন বনবাসের কুটিরে কৃষ্ণ এসে পৌঁছলেন পাণ্ডবদের কাছে, তখন তো দ্রৌপদী নিজের অভিমান প্রকাশ করার সময় নিজের এবং পাণ্ডবদের কষ্টসংকুল জীবন-কথা বলতে বলতে পরিষ্কার বলেই ফেললেন—তারপর তো সেই দ্রুপদের রাজসভায় এসে সবার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে জয় করে নিলেন সব্যসাচী অর্জুন। আর কত গর্বভরে এ-কথা বললেন দ্রৌপদী—ঠিক তোমার মতো কৃষ্ণ ! তুমি যেমনটি বিদর্ভ নগর থেকে রুক্মিণীকে জয় করে নিয়ে এসেছিলে, তেমন করেই আমাকে জয় করেছিলেন অর্জুন। এই সামান্য কটা কথার মধ্যে আরও একটা সামান্য তথ্যও দ্রৌপদী নির্দেশ করতে ভোলেননি। অর্থাৎ সেদিন যে যুদ্ধ অর্জুন জিতেছিলেন তা অন্য কেউ পারত না—তার মানে কি অন্য পাণ্ডবরাও পারতেন না—স্বয়ংবরে মহৎ কর্ম কৃত্বা ন সুকরং পরৈঃ।

এই সব কথায় দ্রৌপদীর স্পষ্ট পক্ষপাত বিপ্রতীপভাবে যুধিষ্ঠিরের মনে অন্য কোনও প্রতিক্রিয়া তৈরি করত না তো ? তিনি ভাবেননি তো যে, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর যে ভাব, অর্জুনেরও দ্রৌপদীর প্রতি সেই ভাবই আছে মনে মনে। মুশকিল হচ্ছে—কথায়, কাজে, বিরহে, আনন্দে দ্রৌপদী যে পক্ষপাত অর্জুনের প্রতি দেখিয়েছেন, অর্জুন দ্রৌপদীর প্রতি সেই পক্ষপাত তো দূরের কথা —এমন ভাবও কোনওদিন প্রকাশ করেননি, যাতে বোঝা যায় যে অর্জুন নিজেকে এই বিদগ্ধা রমণীর অধিকারী বলে ভাবেন। এর জন্য বনবাস এবং দূরে থাকাও হয়তো তিনি বেশি পছন্দ করেছেন। কিন্তু আমার ধারণা যুধিষ্ঠির কোনওদিনই এই শঙ্কা থেকে মুক্ত হননি যে অর্জুনের অন্তর্গত কোনও স্বাধিকারবোধ আছে দ্রৌপদীকে নিয়ে। ফলত তুচ্ছ এক অছিলায় অর্জুনকে তিনি দায়ী করেছেন অহঙ্কারী বলে, যে অহঙ্কার তাঁর কথায়, কাজে এমনকী অহঙ্কারের সুলভ মুহূর্তগুলিতেও প্রকাশ পায়নি।

১১

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ লাগবেই। অতএব আমরা এখন সেই অসাধারণ দার্শনিক মুহূর্তে উপনীত যখন অর্জুন ভগবদ্গীতার উপদেশ শুনছেন কৃষ্ণের কাছ থেকে। আমরা আগেই বলেছি—গীতার উপদেশের আধার হিসেবে অর্জুন পূর্বাহ্নেই ছিলেন উপযুক্ত। এখন যুদ্ধমুখীন স্পর্ধার পরিস্থিতিতে তাঁকে বুঝি আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল—দেখো অর্জুন। তোমার অসাধারণ অস্ত্রনৈপুণ্য সত্ত্বেও তুমি যা করতে যাচ্ছো—তার কর্তা তুমি নও, কারণ একমাত্র অহঙ্কার-মূঢ় মানুষেরাই নিজেকে কর্তা ভাবে—অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণের মতো মহারথ যোদ্ধারা কাল পরিপক্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই মারা গেছেন বা যাবেন—অর্জুন তুমি সেই মৃত্যুর নিমিত্ত মাত্র, কর্তা নও। এই যে বিরাট যুদ্ধভূমিতে দাঁড়ানো সবচেয়ে অস্ত্রনিপুণ ব্যক্তিটিকে একেবারে দার্শনিকভাবে, নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হল, এইখানেই মহাভারতের শেষ পর্যায়ে যুদ্ধোত্তর শান্তরসের সঙ্গে একমাত্র অর্জুনেরই যেন নায়কত্ব তর্কযোগ্য হয়ে ওঠে। অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্মে দুর্যোধনের মতো অন্যায়ী ব্যক্তিকে শাসন করা প্রয়োজন, তাই। অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যেহেতু এই কর্মে তাঁর অধিকার আছে, কিন্তু এই কর্মের ফলে তাঁর আসক্তি নেই। অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যেহেতু যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো পিতামহ বা আচার্যের, দুর্যোধন-দুঃশাসনের মতো জ্ঞাতিভাইদের শরীরে

অস্ত্রাঘাত করতে হবে—এই চিন্তায় তিনি আপন কর্তব্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান এবং পরিশেষে পরম ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের বাণী শুনে তিনি এখন আত্মস্থ, ধীর, আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সংশয়হীন এবং যুদ্ধ করার জন্যই যে যুদ্ধ করতে হবে—এই রকম একটা নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই আমরা অর্জুনের মধ্যে মহাভারতের নায়ক সন্ধানের সার্থকতা খুঁজে পাই।

পাঠকের ধৈর্য নিঃশেষ হবার আগেই আরও একটা ব্যাপারে তাঁদের অবহিত হতে বলি। দেখুন, একেবারে ভীষ্মপর্ব থেকে আরম্ভ করে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের যে বিরাট যুদ্ধ চলেছে—তাতে অর্জুন কেমন যুদ্ধ করেছেন, কত বিচিত্র বাণ ছুঁড়েছেন, কত বীরত্ব দেখিয়েছেন—এই আলোচনা আমি আপাতত নিরর্থক মনে করি। আচার্য দ্রোণের কাছে পাখির মাথা-কাটার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর থেকে সারাজীবন ধরে তিনি যে অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, তাতে এই রকম একটা বিরাট যুদ্ধ তাঁর কছে কাম্য ছিল। হয়তো এই দিকে লক্ষ্য রেখেই মহামতি কৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধ-পূর্ব বিচলন দেখে অবাক হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—ক্ষত্রিয়বীরগণ এই রকম একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হলে নিজেদের ধন্য মনে করে—সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্। অর্জুন তাঁর সমস্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধটি আজ পেয়েছেন। অথচ তাঁর কী বিড়ম্বনা, যাঁদের সঙ্গে তাঁর এই যুদ্ধ হবে, তাঁরা সবাই তাঁর আত্মীয়স্বজন।

ঠিক এই মুহূর্তে গীতার কথা তাঁকে প্রকৃতিস্থ করেছে—এই যুদ্ধ তাঁর কাছে ধর্মের স্বরূপে ধরা দিয়েছে। আরও আশ্চর্যের কথাটা দেখুন, যে ভীষ্ম, যে দ্রোণকে অস্ত্রাঘাত করার আশঙ্কায় অর্জুন বিচলিত হয়েছিলেন, সেই ভীষ্মের মৃত্যুর শেষ কারণ কিন্তু তিনি নন। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুও তাঁর হাতে হয়নি। এমনকী যে কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অর্জুন অন্তরে অন্তরে চিরকাল তুষাগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, সে কর্ণের মৃত্যু যতখানি ভাগ্যের হাতে হয়েছে, অর্জুনের হাতে ততটা নয়। এর কারণ কী ? মহাভারতের কবি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে এ কী বিড়ম্বনায় ফেলেছেন ? আধুনিক অল্পস্বত্ব চিন্তাবিদ্‌রা বিশালবুদ্ধি ব্যাসের ভাব-ব্যঞ্জনা কিছুই না বুঝে বলে ফেলেন—অর্জুন ! সে তো বাসুদেব কৃষ্ণের ছায়ামাত্র। ও কি নিজে কিছু করেছে ? কৃষ্ণ বুদ্ধি দিয়েছেন, আর অর্জুন তোতার মতো তা অনুসরণ করেছে। শুধুমাত্র অল্পস্বত্বতার কারণেই এমন মন্তব্য আমাদের শুনতে হয়, তাই শুধু নয়। অতিবুদ্ধি গবেষক—যাঁরা সাহেব-সুবো আর উর্বর প্রতিভার বিভিন্ন বক্তব্য সমযোজনা করে নিজস্ব বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেন—তাঁদের মুখেও একই বক্তব্য শুনি আরেকভাবে। এই কুফল তখনই সম্ভব, যদি আমরা বিশালবুদ্ধি ব্যাসের ভাব-ব্যঞ্জনা ব্যাসের অনুকূলে না বুঝি। ভগবদ্‌গীতাকে তাঁরা মহাভারতের অন্তর্গত হৃদয় ভাবেন না এবং গবেষণা-বলাৎকারে যাঁরা এই একান্ত মহাভারতীয় অংশকে স্বয়ম্ভু মনে করেন—তাঁরা অর্জুনকেও বুঝবেন না, কৃষ্ণকেও বুঝবেন না। আমি বলেছি—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো মহারথ যোদ্ধাদের যুদ্ধে একান্তভাবে জয় করার যশ অর্জুন আত্মসাৎ করতে পারলেন না। এর কারণ কী ? আমি বলব—এরও কারণ সেই ভগবদ্‌গীতাই। কৃষ্ণ বলেছিলেন—যে কাজটা করছি—তা বড় কাজই হোক অথবা ছোট—সে কাজটা আমি করেছি—এমন অভিমান যাঁর নেই, যাঁর বুদ্ধি কর্মের ফলে লিপ্ত হয় না, সে এই সমস্ত লোককে হত্যা করলেও, হত্যার পাপ তাঁর লাগে না—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি র্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

বস্তুত ভীষ্মকে যদি শিখণ্ডীর মাধ্যম ছাড়াই অর্জুন রণভূমিতে শায়িত করতে পারতেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা ছেড়েই দিলাম, যদি 'অশ্বত্থামা হত' এর মতো মিথ্যাভাষণ না করেও যদি দ্রোণাচার্যকে অর্জুন মারতে পারতেন, অথবা কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যাওয়ার মতো দুর্ভাগ্য যদি অর্জুনের সহায় না হত—তাহলে এই সমস্ত বীরযোদ্ধাদের রণভূমিতে লুণ্ঠিত করার অহঙ্কার এবং গৌরব অর্জুনের হৃদয়ের সত্যপথ রুদ্ধ করত এবং অবশ্যই কর্মফলে তাঁর লিপ্তি ঘটাত। অতএব সে সুযোগই অর্জুনের হল না। মহাভারতের কবি অর্জুনকে এমনভাবেই গীতার সঙ্গে মিশিয়ে তাঁর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন

যে, সে লোকটার বলবার মতো কোনও সুযোগই রইল না যে—ভীষ্মের মতো যোদ্ধাকে, দ্রোণের মতো অস্ত্রগুরুকে, কর্ণের মতো অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধাকে আমি, শুধু আমিই মেরেছি। ওদিকে আরও একবার গীতার শেষ পৃষ্ঠায় লক্ষ করুন—ভগবান রূপে চিহ্নিত কৃষ্ণ নামক ব্যক্তিটি সমস্ত দার্শনিকতার শেষ প্রস্তাবে বলছেন—তোমার সমস্ত ধর্মাধর্ম অতিক্রম করে তুমি আমার শরণাগত হও, অর্জুন। আর সেই ধর্মাতিক্রমে তোমার যদি কোনও পাপ হয়, তবে তার দায় আমার। দেখুন, এই যে চরম শরণাগতি—এর পথও স্বয়ং কৃষ্ণই করে দিয়েছেন। কৌরবপক্ষের একেকজন সেনাপতি মারা গেছেন এবং তার আগে কৃষ্ণ তাতে স্বেচ্ছায় বুদ্ধি জুগিয়েছেন ; তাতে অন্যায় যা হয়েছে—তার দায় বহন করেছেন তিনি নিজে। অর্জুন বাসুদেব কৃষ্ণের শরণাগত, অতএব তাঁকে অহঙ্কার থেকে মুক্ত করার ভার যেমন তাঁর, অন্যায় থেকে মুক্ত করার ভারও তেমনি তাঁরই।

গীতার উপদেশের নিরিখে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে গীতার চরম ধর্ম শোনার পর তিনি বাসুদেবের শরণাগত হয়েছেন। আমি আগে যেমন বলেছি যে, গীতার ধর্ম শ্রবণ করার সবচেয়ে উপযুক্ত আধার ছিলেন অর্জুন, তেমনই এই গীতার চরম উপদেশ যে শরণাগতি, সে শরণাগতিও তাঁর পূর্বাহ্ণেই ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষের বিশাল সৈন্য সমাবেশ এবং সেনাপতি ভীষ্মের সুচিন্তিত ব্যূহ-রচনা দেখে ভীষণ ভয় পেলেন—বিষাদম্ অগমদ্ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। তিনি অর্জুনকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ গো ভাই, পিতামহ ভীষ্ম যাঁদের যোদ্ধা, আর যে অভেদ্য সেনাব্যূহ তিনি রচনা করেছেন—আমরা যুদ্ধ করব কী করে ? অর্জুন বললেন—অতিপ্রাজ্ঞ, অতিবীর ব্যক্তিকেও তাঁর থেকে অল্পতর জ্ঞানী বা অল্পতর বীর যেভাবে জয় করেন—তার একটা সূত্র আছে। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কথাটা একসময় বলেছিলেন। বলেছিলেন—জয়লিপ্সু ব্যক্তি শক্তি আর ক্ষমতার জোরে নিজের জয় যতখানি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি পারে নিজের সততা, অনৃশংসতা, ধর্ম এবং অবশ্যই উদ্যমের জোরে। কাজেই কোনটা ধর্ম এবং কোনটা অধর্ম—এটা জেনে, আমরা শুধু লোভের জন্যই এই যুদ্ধ আরম্ভ করছি কি না—এটা বুঝে এবং সর্বোপরি আমরা সাহঙ্কারে যুদ্ধ করছি কিনা—এটা উপলব্ধি করেই আমি বলতে পারি—যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। তা ছাড়া সমস্ত কল্যাণ-গুণ এবং ধর্মের আধার হলেন কৃষ্ণ—তিনি রয়েছেন আমাদের পক্ষে। সবচেয়ে বড় কথা—তিনিই যেখানে আপনার জয় চান, সেখানে কি জয় না হয়ে পারে—যস্য তে জয়মাশাস্তে বিশ্বভুক্ ত্রিদিবেশ্বরঃ।

লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই—অর্জুন সেই সত্যের পথ, সেই স্থিতবুদ্ধি, সেই কাম-লোভ-হীন কর্তব্য কর্ম বিষয়ে, সেই নিরহঙ্কার প্রয়াসের কথা বলছেন—যা পরে আরও বিস্তারিতভাবে দার্শনিকের যুক্তিতে কৃষ্ণের কাছে তাঁকে শুনতে হবে। আর যে চরম শরণাগতির কথা গীতার শেষে অর্জুনকে সম্পূর্ণ ভারমুক্ত করবে, সেই প্রপন্নতা অর্জুনের মধ্যে পূর্বাহ্ণেই চিহ্নিত। এই শরণাগতি, এই প্রপন্নতা তাঁকে বৃহত্তর শক্তির কাছে দাসে পরিণত করেনি, অথবা তাঁকে বাসুদেব-কৃষ্ণের ছায়া হিসাবে উপস্থিত করেনি। বস্তুত অতি বৃহৎ মহাসত্ত্ব ব্যক্তির পক্ষে এই প্রপন্নতা অর্জুনের চরিত্রে নতুনতর দার্শনিক মাত্রা যুক্ত করে। যে ছোট, যে দুর্বল—শরণাগতি তার স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু যিনি সমর্থ এবং একাধিকবার যার সামর্থ্য বিভিন্ন যুদ্ধে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত, তিনি যদি তাঁর সমস্ত সামর্থ্য, নৈপুণ্য, এবং শক্তি সত্ত্বেও অন্তিম এক চরম মুহূর্তে চরমতম শক্তির কাছে নিজেকে লঘু করতে পারেন—সেখানে তাঁর সামর্থ্যগৌরবের সঙ্গে বিনয়ের মাহাত্ম্য যুক্ত হয়। তাঁর নিপুণতা, তাঁর অস্ত্রশক্তি, তাঁর সামর্থ্য, এগুলি কবির ভাষায়—

> এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা
> বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা—
> সব দিতে হবে।

এই প্রপন্নতার কী ফল হয়েছে জানেন ? কোনও অন্যায় অর্জুনের গায়ে লাগেনি। অনেকে বলেন এবং দুর্যোধনের মতো লোক তখনও বলেছেন—সব কৃষ্ণের ছুতো। কৃষ্ণের ছল আর কপটতার জন্যই পাণ্ডবরা যুদ্ধ জিতেছেন, নইলে তাঁদের সাধ্য ছিল না—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের

মতো শক্তিকে পর্যুদস্ত করা। কৃষ্ণ কারও মুখ বন্ধ করেননি। এই কলঙ্ক, এই অপমান তিনি বহন করেছেন এবং একবার নয় বারবার সবার সামনে হেঁকে অর্জুনকে বলেছেন—তুমি ঋজুযুদ্ধের দ্বারা এই ভীষ্ম, এই দ্রোণ, এই কর্ণের মতো যোদ্ধাকে রণভূমিতে শায়িত করতে পারতে না, অর্জুন। আমি যদি আমার শঠতা, আমার মায়া প্রয়োগ না করতাম—তা হলে আজ কোথায় তোমাদের জয়, কোথায় তোমাদের রাজ্য, কোথায় কী ? দেখুন, কী নিপুণ ভঙ্গিতে কৃষ্ণ অর্জুনের সমস্ত দায়, সমস্ত কলঙ্ক নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। এ হল সেই চরম প্রতিজ্ঞার ফল—আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব—অহঃ ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। না জানি, অর্জুনের মনের তখন কী অবস্থা। বোধ করি, এই শেষের দিনটির জন্যই যুদ্ধারম্ভের প্রথম পর্বে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসেছিলেন অর্জুন—আমার জগতের সব তোমারেই দেব, দিয়ে তোমারে নেব—বাসনা।

আমি বোধহয় একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি ভারতযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে ভগবদগীতার দার্শনিক পরিবেশই আমাকে মুখর করে তুলেছিল। গীতা শোনার পর অর্জুন যুদ্ধ করতে গেছেন সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে। বড় খেলোয়াড়ের যদি খেলা জেতানোর 'টেনশন' না থাকে তবেই সে তার স্বাভাবিক খেলা খেলে। পরীক্ষার্থীর মনে যদি 'ফার্স্ট হওয়ার 'টেনশন' না থাকে তবেই সে ভাল পরীক্ষা দেয়। অর্জুন সেই যুক্তিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি আগেই বলেছি—অর্জুনের মতো অসামান্য একজন যোদ্ধা কত যুদ্ধ করলেন, কত নৈপুণ্য দেখালেন, কত সৈন্যশাতন করলেন—সে আলোচনায় আমি যাব না। কেন না সে যুদ্ধ এতই বিশাল, সে নৈপুণ্য এতই লোকাতীত, যার বর্ণনা আমার দীন ভাষায় করা সম্ভবপর নয়। বস্তুত ভীষ্ম এবং অর্জুনের যুদ্ধ, ভীষ্ম এবং অর্জুনের মতোই হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম যখন নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিলেন, তখন যুদ্ধের কর্তৃত্ব অর্জুনের হাত থেকে শিখণ্ডীর হাতে চলে গেল। এরপর যত বাণই অর্জুন ছুঁড়ুন, যত বীরত্বই তিনি দেখান, তাঁকে আর ভীষ্মবধের কারণ বলা গেল না। ভীষ্মের অলোকসামান্য প্রতিভা এবং অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠতম বীরের মধ্যে অন্তর ঘটিয়ে রাখল একজন ক্লীব—শিখণ্ডী।

পিতামহ হিসেবে ভীষ্ম বুঝেছিলেন—তাঁর মৃত্যুতে অর্জুনের গৌরব আহত হল, আহত হল নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বীরের অভিমান। তাই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও বুড়ো ঠাকুরদাদা কত না উপায় বার করলেন—অর্জুনকে শ্রেষ্ঠতার সম্মান দেওয়ার জন্য। একবার বললেন—এই শরশয্যায় শুয়ে আমার মাথাটা ঝুলে যাচ্ছে—আমাকে উপযুক্ত বালিশ দাও। কৌরব, পাণ্ডবরা সবাই তখন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষ্মের কথা শুনেই কৌরবরা কত না সুন্দর মহামূল্য বালিশ নিয়ে এলেন, কী বলব ! কিন্তু ভীষ্ম বললেন—এই কি রণভূমিতে শায়িত ক্ষত্রিয়বীরের উপাধান ? ভীষ্ম এবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন এই বীরশয়নের উপযুক্ত একটি বালিশ হয়তো তুমিই দিতে পারো বৎস ! চোখের জল মুছে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বুঝে বুদ্ধিমান অর্জুন অসাধারণ নিপুণতায় তিনখানি বাণ সংযুক্ত করে পিতামহ ভীষ্মের লম্বিত মস্তক শরীরের সমানপাতী করে রাখলেন। সানন্দে ভীষ্ম তাঁকে অভিবাদন জানালেন—এই না হলে সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে কেমন করে শ্রেষ্ঠ হলে তুমি !

সেদিনের রাত কাটল। সকালবেলায় কৌরব, পাণ্ডব আর অন্যান্য রাজারা সবাই আবার ভিড় করে এলেন ভীষ্মের কাছে। শরপাতনের যন্ত্রণায় তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন, কোনওরকমে বললেন—জল, জল দাও। রাজারা সব মিষ্টমধুর খাবার আর জলের পাত্র নিয়ে এসে ভীষ্মকে জল খাওয়াতে চাইলেন। ভীষ্ম তাঁদের একটু লজ্জা দিয়েই বললেন—আমি কি মানুষের মতো সাধারণ অবস্থায় শুয়ে আছি। যাও সব, অর্জুনকে ডেকে দাও। পিতামহের প্রশংসা-গৌরবে আরও বিনীত অর্জুন এসে দাঁড়ালেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম বললেন—তোমার বাণের জ্বালায় আমার সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে—একটু জল দিয়ে এই জ্বালা জুড়োবার ব্যবস্থা করো। অর্জুন রথে উঠলেন, সমন্ত্রক-বাণে পৃথিবী ফুঁড়ে জলের অবিরাম ধারা এনে জুড়িয়ে দিলেন ভীষ্মের শরীর আর তৃষ্ণা। অর্জুনের কাণ্ড দেখে অন্তরের লজ্জায় কৌরবরা শীত-লাগা গরুর মতো কেঁপে উঠলেন—সম্প্রাবেপন্ত

কুরবো গাবঃ শীতার্দিতা ইব। ভীষ্ম বললেন—আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হচ্ছি না, অর্জুন। কারণ, ধনুর্ধরদের মধ্যে তুমিই সেই একতম বীর, যে এই অসম্ভব কাজ করতে পারে। তুমি যে শ্রেষ্ঠতম, তুমি যে একাই সমস্ত ক্ষত্রিয়কে উৎখাত করতে পারো—একথা আমি বারংবার দুর্যোধনকে বলেছি। তাঁর মাথায় এই সত্য কথাটি ঢুকল না। ভীষ্ম বারবার অর্জুনের কথা তুলে দুর্যোধনকে আবারও শেষবারের মতো যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন, কিন্তু এই কথাগুলির মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রশংসার সান্ত্বনা ছিল অর্জুনের জন্য—যিনি ঈশ্বরেচ্ছায় ভীষ্মের দণ্ডদাতা হলেও, মৃত্যুর কর্তা নন।

দ্রোণাচার্যের সঙ্গে পাঁচদিন যুদ্ধ চলেছিল পাণ্ডবদের। এই পর্বে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু যত বড় ঘটনা, তার চেয়েও বড় ঘটনা বোধ করি অভিমন্যুর মৃত্যু, অর্জুনের প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু। যেদিন অভিমন্যু মারা যান, সেদিন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এই দারুণ সংবাদ দিতে পারেননি। প্রতিদিনের যুদ্ধ শেষ করে অর্জুন যখন ফিরে আসতেন, তখন তিনি রথ থেকে নামতে-না-নামতেই দ্রৌপদীর ছেলেদের সঙ্গে করে অভিমন্যু হাসি-মুখে অর্জুনকে একেবারে শিবিরের ভিতর পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। এই ছিল অভিমন্যুর অভ্যাস। এ হেন ছেলেকে না দেখে এবং যেহেতু অর্জুন পূর্বেই দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহের কথা শুনেছেন—তিনি ভীষণ শঙ্কিত হলেন। ক্রমে ক্রমে সবই প্রকাশ পেল এবং অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন যে আঘাত পেলেন—তার বর্ণনা ব্যাসের লেখনীতেই মানায়, আমার উদ্ধৃতি-পদ্ধতিতে সে শোকের একাংশও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই আকুল অবস্থার মধ্যে অবশ্যই যিনি তাঁর পাশে দাঁড়ালেন—তিনি কৃষ্ণ। ভগবদ্‌গীতার অমৃত-কথার মতোই আরও কটি কথা কৃষ্ণেব মুখ দিয়ে উৎসারিত হল এবং অবশ্যই দার্শনিকতার যুক্তিতেই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রশমিত করা ছাড়া কৃষ্ণের আর কিছু করার ছিল না। তবু পুত্রশোক শোক-তপ্ত পিতামাতার অন্তরে এমনই এক শূন্যতা সৃষ্টি করে—যে শূন্যতা প্রগাঢ় দার্শনিকতার দ্বারাও বিলুপ্ত করা যায় না। স্বভাবতই অর্জুন সেই ভয়ঙ্কর জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা নিলেন, কেন না জয়দ্রথই সেই ব্যক্তি, যিনি অভিমন্যুর সাহায্যে এগিয়ে আসা অন্য পাণ্ডবদের চক্রব্যূহে ঢুকতে দেননি।

অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন—পরের দিন সূর্যাস্তের আগেই তিনি জয়দ্রথকে মারবেন, নইলে নিজে আত্মহত্যা করবেন। জয়দ্রথ দুর্যোধনদের জামাই হওয়া সত্ত্বেও আচার্য দ্রোণ এবং সবার হাতে পায়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করলেন। আচার্য দ্রোণও তাঁর অস্ত্র শিক্ষার সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ব্যূহ-রচনার সার শকটব্যূহ তৈরি করলেন এবং জয়দ্রথকে প্রায় ধামা-চাপা দেবার মতো করে লুকিয়ে রাখলেন। আচার্য স্বয়ং রক্ষা করছিলেন সেই ব্যূহের দ্বার। স্বাভাবিকভাবে আচার্য দ্রোণের সঙ্গেই অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পেরে উঠছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছাড়ছিলেনও না। অর্জুনের হাতে সময় ছিল না—অনেক যুদ্ধ করে, অনেক পথ পেরিয়ে শকটব্যূহের সেই জায়গায় পৌঁছতে হবে—যেখানে জয়দ্রথ আছেন। অর্জুন কিন্তু আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বেশ মত্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণ বললেন—তাড়াতাড়ি, বন্ধু। তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যার আগে আমাদের জয়দ্রথকে মারতে হবে। তখন কৃষ্ণের বুদ্ধিতে অর্জুন আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে বললেন—আপনি আমার গুরু, পিতা। আপনার কাছে হারলেই বা লজ্জা কী? এইভাবে আচার্যকে তিনি এড়িয়ে এলেন বটে, কিন্তু শকটব্যূহের আরও সব অসাধারণ রক্ষী দুঃশাসন, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কর্ণ—এঁরা তো আর কেউ ছেড়ে দেবার লোক নন। অতএব যুদ্ধ হতে থাকল ভয়ঙ্কর, সময়ও যেতে থাকল বিস্তর।

সবচেয়ে মুশকিলে পড়লেন কৃষ্ণ। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন—জয়দ্রথকে সন্ধ্যার আগে মারবেন, নইলে নিজে মরবেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত অবস্থায় প্রতিজ্ঞার পিছনে কারণ থাকলেও অহংবোধও থাকে। মহাভারতের সমস্ত যুদ্ধপর্বে কৃষ্ণ চেয়েছেন—অর্জুন যুদ্ধ করুন, কিন্তু শান্ত নিরহঙ্কার ভঙ্গিতে করুন। অথচ এইখানে পুত্রশোকের মতো গভীর দুঃখ অর্জুনকে বিচলিত করে দিয়েছে, তাঁর মনে সামান্যতম হলেও সেই অনীপ্সিত কর্তৃত্বের বোধ এনে দিয়েছে, যা কৃষ্ণ মনে মনে চান না। এক্ষেত্রে আবারও তাঁকে সেই মায়া সৃষ্টি করতে হল। দিবসের শেষ সূর্য তখনও আলো ছড়িয়ে চলেছে, এরই মধ্যে

কৃষ্ণের বুদ্ধিযোগে ঘনিয়ে এল আকালিক অন্ধকার। জয়দ্রথ সানন্দে ভাবলেন তিনি বেঁচে গেছেন এবং অর্জুনকেও আত্মহত্যা করতে হবে। তিনি তাঁর লুকোনো জায়গা থেকে মুখটি বার করে সূর্যের সঞ্চার দেখছিলেন, অন্যান্য সৈনিকেরাও তাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—জয়দ্রথ মুখ বার করেছে—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল দেখে তুমি যেন সংকোচ কোরো না, ও আমারই বুদ্ধি। তুমি মারো জয়দ্রথকে। কিন্তু 'মারো' বললেই কি আর মারা যায়। দুর্যোধন, কৃপ, কর্ণ—সবাই তো লড়ছেন। এই অবস্থায় অর্জুনের অস্ত্রচালনা ছিল ঈর্ষণীয়। কী অসাধারণ দক্ষতায় এই মহারথ যোদ্ধাদের কাবু করে তিনি জয়দ্রথকে মারলেন—তা বলে বোঝানো যাবে না। তবু এই সামান্য একটা 'তবু' রয়ে গেল। অন্য সবার ক্ষেত্রে অর্জুন অসামান্য অস্ত্রকৌশল দেখানোর সুযোগ পেলেন বটে, জয়দ্রথকে তিনি অসাধারণ নিপুণতায় হত্যা করলেন বটে, তবু তাঁর প্রতিজ্ঞা-রক্ষার ব্যাপারে কর্তৃত্ব রয়ে গেল কৃষ্ণেরই হাতে। তিনি যে বলেছিলেন—তুমি নিরহঙ্কার হয়ে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধের ফলে অনাসক্ত হয়ে যুদ্ধ করবে। তাই যে মুহূর্তে—তা সে পুত্রশোকের মতো গভীর দুঃখ থেকেই হোক অথবা অন্য কোনও কিছু—অর্জুনের মধ্যে অহঙ্কার দেখা গেছে, আসক্তি দেখা গেছে, তখনই কৃষ্ণ ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন নিজের হাতে। তিনি যে বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন—তুমি আমার শরণ নাও, সমস্ত পাপের দায় আমার।

আচার্য দ্রোণের হন্তা হিসেবে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আগে থেকেই চিহ্নিত ছিলেন। তবু দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বের সময় বহুবার অর্জুন তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন এবং প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছেন অর্জুন। এই প্রিয়তম শিষ্যটির ব্যাপারে আচার্যেরও এমন এক শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রশ্রয় ছিল যে, তিনি বোধ হয় জয়ী হতে চানওনি। এই সমস্ত যুদ্ধেই অর্জুন তাঁর অস্ত্র-শিক্ষা শিল্পের স্তরে নিয়ে গেছেন। আচার্যও একাধিকবার অর্জুনকে হাতে পেয়েও কিছু করতে পারেননি। যুদ্ধ যত করেছেন, প্রিয়শিষ্যের নিপুণতায় মুগ্ধ হয়েছেন তার থেকে বেশি। এর জন্য দুর্যোধনের কাছে তাঁকে কথাও শুনতে হয়েছে যথেষ্ট। অর্জুনের ব্যাপারে তাঁর মুগ্ধতা, তাঁর স্নেহ এবং সর্বোপরি তাঁর বিশ্বাস এতটাই ছিল যে, দুর্যোধন বারবার সেটাকে পক্ষপাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই জয়দ্রথবধের পরেও দুর্যোধন তাঁকে বলেছেন—আপনি আমার পক্ষে যুদ্ধ করলেও আপনি যে পাণ্ডবদেরই ভাল চান—সেটা আমি জানি। অর্জুন আপনার শিষ্য বলেই তাকে আপনি ছেড়ে দেন। আচার্য দ্রোণকে এতই অপমানসূচক কথা বলেছেন দুর্যোধন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত কৌরবদের সারা জীবনের অন্যায়গুলি একের পর এক উচ্চারণ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এবং শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন—তুমি কে হে দুর্যোধন, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেব-দানব কারও পার পাবার উপায় নেই। দ্রোণাচার্য বৃদ্ধও হয়ে গিয়েছিলেন, অস্ত্রপাতনের ক্ষিপ্রতাও তাঁর কমে গিয়েছিল, কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে তিনি যে কোনওভাবেই এঁটে উঠতে পারলেন না—এটা যতখানি আশ্চর্যের, ততখানি আনন্দের। অর্জুনের দিক থেকেও ব্যাপারটা লক্ষণীয়।

আচার্য দ্রোণকে মারার ব্যাপারে অর্জুন সোজাসুজি দায়ী ছিলেন না এবং এটা তাঁর সৌভাগ্য। কিন্তু যেভাবে দ্রোণকে মারা হল—তাতে অর্জুনের সায় ছিল না মোটেই। আচার্যের সাংঘাতিক ক্ষমতা এবং তাঁর হাতে যে পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হচ্ছিল—তার বহর দেখে কৃষ্ণ অর্জুনের কাছেই প্রথম প্রস্তাব করলেন যে, এই বৃদ্ধের কাছে তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা খবর দেওয়া দরকার, নইলে দ্রোণাচার্য অস্ত্র-ত্যাগ করবেন না এবং অস্ত্র-ত্যাগ না করলে তাঁকে বধ করা যাবে না। কৃষ্ণের এই প্রস্তাব অর্জুন একটুও অনুমোদন করেননি—এতন্নারোচয়দ্ রাজন্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। কিন্তু সবাই মত করলেন এবং সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকেও এ-কথা বলতে হল যে, অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। সংবাদ শুনে আচার্য অস্ত্র-ত্যাগ করলেন এবং ধ্যানযোগে জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে অবধারণ করলেন। দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার অপমানের শোধ নেবার জন্য খড়্গ নিয়ে লাফিয়ে নামলেন রথ থেকে—দ্রোণের গলা কেটে ফেলতে চান তিনি।

অর্জুন দেখছেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন এগোচ্ছেন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে অর্জুন বললেন—না, ধৃষ্টদ্যুম্ন! না, আচার্যকে এইভাবে মেরো না, ওঁকে তুমি জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো—জীবন্তমানয়াচার্যং মা বধীঃ

দ্রুপদাত্মজ। অর্জুন বারবার চেঁচাতে থাকলে, অর্জুনের চিৎকার শুনে সৈনিকেরাও 'না-না' করতে থাকল। ধৃষ্টদ্যুম্ন কারও কথাই শুনলেন না। খড়্গের এক কোপে দ্রোণাচার্যের মাথা কেটে ছুঁড়ে দিলেন কৌরবদের সামনে। অর্জুনের ভীষণ, ভীষণ খারাপ লাগল। তাঁর বোধ হয় সেদিনটির কথা মনে পড়ছিল—যেদিন দ্রুপদকে জ্যান্ত বেঁধে আনতে বলেছিলেন দ্রোণাচার্য। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন জন্মাননি। কেউ নয়, এই অর্জুনই সেদিনকার যুদ্ধে দ্রুপদের রথ, অশ্ব এবং সারথিকে জখম করে দ্রুপদকে জীবন্ত বেঁধে এনেছিলেন। কিন্তু কই দ্রোণও তো তার বেশি চাননি। চরম অপমানিত হয়েও আচার্য নিজে তাঁর গায়ে হাত তোলেননি, তাঁকে মেরে ফেলতেও বলেননি। প্রতি-অপমানে এইটুকু সম্মান তো তিনি আশা করতেই পারতেন। হয়তো সে দৃশ্যটাই অবচেতন থেকে অর্জুনকে দ্রোণের মতোই বলাচ্ছিল—ওঁকে তুমি জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো—জীবন্তম্ আনায়াচার্যম্। ধৃষ্টদ্যুম্ন কথা শোনেননি। কিন্তু এই আচরণ! সবার সামনে, শিষ্যদের সামনে পঁচাশি বছরের বয়স্ক গুরুর চুল ধরে মাথা কেটে ফেলা—অর্জুন কিছুতেই মানতে পারেননি। রাগে, দুঃখে তিনি এবার সেই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে অতিক্রম করে কথা বললেন, যা তিনি জীবনে করেননি।

অর্জুন বললেন, আপনি রাজ্যলাভের আশায় গুরুর সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করলেন। ভদ্র-সজ্জনের ধর্ম আপনি জেনেও এমন অধর্মের কাজ করলেন। জানেন তো রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে বালিকে মেরে যে অখ্যাতি চিরকাল বহন করেছেন, দ্রোণবধের জন্য সেই অখ্যাতি আপনিও বহন করবেন চিরকাল। অর্জুনের কথা মিথ্যা হয়নি। এই এক অকীর্তি যুধিষ্ঠিরকে, সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আজও কালিমালিপ্ত করে। অর্জুনের কথা শুনে ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে প্রায় উপহাসই করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রশ্রয় পেতেন না, যদি ভীম কনিষ্ঠ ভাইকে উপহাসের ভাষায় কথা না বলতেন। ভীম বলেছিলেন—আহা, আহা এমন সব ধর্মকথা বলছো না ভাই, যেন বনের মধ্যে মুনি উপদেশ দিচ্ছেন—মুনির্যথারণ্যগতো ভাষতে ধর্ম-সংজ্ঞিতম্। ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণ তোমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তুমি যে কেমন করে এমন বোকার মতো কথা বলছ? তুমি এত ধর্মের কথা বলছ—তা, ওই পাশা-খেলা, দ্রৌপদীর অপমান, বনবাস—এগুলো কোন ধর্মে হয়েছে?

ভীম আরও অনেক বকলেন অর্জুনকে। ফলে ধৃষ্টদ্যুম্নও আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পেলেন। তবুও আচার্য দ্রোণের এমন মৃত্যুতে অর্জুনের ধিক্কার গেল না। তিনি 'ছি-ছি' করতেই থাকলেন। যুধিষ্ঠিরের মানসিকতা সম্বন্ধেও তাঁর গ্লানি কমল না। বস্তুত দ্রোণের সামনে মিথ্যা-উচ্চারণের ব্যাপারে যুধিষ্ঠির কিংবা ভীমের, এমনকী তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে ধৃষ্টদ্যুম্নেরও যে খুব দোষ ছিল, তা নয়। কারণ প্রস্তাব এসেছিল কৃষ্ণের কাছ থেকে, যুধিষ্ঠিরকে প্রায় জোর করেই অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুর কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল আর ধৃষ্টদ্যুম্ন জন্ম থেকেই দ্রোণের মৃত্যুর জন্য চিহ্নিত, দ্রোণও সে-কথা জানতেন। কিন্তু প্রাণপ্রিয় আচার্যের মৃত্যুতে অর্জুনের অন্তরে সেই সদাজাগ্রত শিষ্যটি এমনভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে, দাদা যুধিষ্ঠিরকেও তিনি লঙ্ঘন করেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরকে তিনি আরও একবার ভীষণভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন। বস্তুত বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রের মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন এতই বেমানান যে, মাঝে মাঝেই তিনি কেমন হতচকিত হয়ে যেতেন। কর্ণের সেনাপতিত্ব যখন চলছে, তখন যে তিনি সবচেয়ে বেশি লড়াই করবেন তাতে সন্দেহ কী। ঠিক এমনই এক দিনে যুধিষ্ঠির-মহারাজ কর্ণের বাণে খুব মার খেলেন। কর্ণ কিছুতেই আর তাঁকে ছাড়েন না, মেরেই যাচ্ছেন, মেরেই যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে গেলেন। স্বয়ং অর্জুন অশ্বত্থামার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, ভীমও ব্যস্ত ছিলেন কৌরব সৈন্য-ধ্বংসে। সময় বুঝে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে একেবারে বাণে বাণে উত্যক্ত করে তুললেন এবং যতক্ষণ কর্ণ অন্যত্র না সরলেন, ততক্ষণে তাঁকে ওই বাণের আঘাত সহ্য করতে হল। কর্ণ চলে যেতেই যুধিষ্ঠির একেবারে শিবিরে চলে গেলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে না পেয়ে অর্জুন ছুটতে ছুটতে এলেন ভীমের কাছে এবং সেখানেই তিনি খবর পেলেন যুধিষ্ঠির প্রায় পালিয়েই চলে গেছেন শিবিরে। অর্জুন আবারও ছুটতে ছুটতে শিবিরে এলেন এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি অর্জুনকে ভীষণ কটু কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তো দুই-ছেলের বয়স্কা মা যেমন এক ছেলের সামনে অন্যতরের প্রশংসা করে নিজের 'পোজিশন' বাড়াতে চান, তেমনই যুধিষ্ঠিরও অর্জুনকে বললেন—ওই এক ভীমের ভরসাতেই আমি যা বেঁচে আছি, নইলে, এতদিনে যা হত...ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর যুধিষ্ঠির কর্ণের অভূতপূর্ব শক্তির প্রশংসা করলেন এবং বললেন তুমি কি আজও সে ব্যক্তিটিকে মারতে পেরেছ—যা তুমি এতকাল বলে এসেছ ? অর্জুন প্রথমে নিজের দোষ-স্খালন করার চেষ্টা করলেন। তিনি কতটা ব্যস্ত ছিলেন, কত সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছে অশ্বত্থামার সঙ্গে—সব বলে বোঝাতে চাইলেন অর্জুন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেদিন এতই মার খেয়েছেন কর্ণের হাতে যে, তিনি অর্জুনকে গালাগালি করতে আরম্ভ করলেন। গালাগালি এতটাই করলেন, যা যুধিষ্ঠিরকে মানায় না। তিনি এতই রেগে গেলেন যে, অর্জুন কর্ণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—এমন কথাও বলতে ছাড়লেন না। একেবারে শেষে বললেন—ওইরকম বিরাট একটা খড়্গ কোমরে দুলিয়ে, গাণ্ডীবের মতো একটা ধনুক হাতে নিয়ে, কৃষ্ণের মতো একটা লোককে সারথি বানিয়ে—বাবু যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আসলে যে দাদাকে অর্জুন দেবতার মতো শ্রদ্ধা করেন, যাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে শিবিরে এসেছেন তিনি—সেই দাদার মুখে অনেকক্ষণ অকথা এবং অপযশ শুনে অর্জুন মনে মনে একেবারে ক্ষেপেই ছিলেন, শেষে তাঁর সাধের গাণ্ডীব-ধনুকের অপমান শুনে তিনি এমনই রেগে গেলেন যে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে মারতেই গেলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল—যে ব্যক্তি তাঁর গাণ্ডীবকে অপমান করবে, তাঁকে তিনি মেরেই ফেলবেন। অর্জুন তাই খড়্গ হাতে নিলেন। আসলে আমার মনে হয় গাণ্ডীবের থেকেও বড় কথা—যুধিষ্ঠির ভাইকে এত অপমান করেছেন এবং তাও এমন এক ভাইকে, যে যুধিষ্ঠিরের কাছে সদা-বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছে, যে তাঁর আপাত অন্যায়গুলিও সব সময় সমর্থন করেছে—সেই দাদা যুধিষ্ঠির যখন তাঁর যোগ্যতায়, তাঁর ইচ্ছায়, শুভকামনায় অবিশ্বাস করলেন—সেটা অর্জুন সইতে পারলেন না। তিনি গাণ্ডীবের অপমানকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে মারতে উদ্যত হলেন। মহামতি কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে যায় বটে, তবে এই ঘটনা নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। প্রয়াত বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এ বিষয়ে অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর 'নীতি যুক্তি এবং ধর্ম' নামক গ্রন্থে। কাজেই এ বিষয়ে আমার আর কথা বলা মানায় না। আমরা কর্ণবধের প্রসঙ্গে আসি।

কর্ণই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে অর্জুন তাঁর সমকালীন সময়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। কুরুসভায় দ্রৌপদীর সঙ্গে কর্ণ যে অসভ্য আচরণ করেছিলেন, তার নিবিখে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমি কর্ণকে মারব। আমার মনে হয়—দ্রৌপদীর অপমানে যে ক্ষোভ অর্জুনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, তার অনেকটাই মিশে গিয়েছিল সেই চরম ক্ষোভের সঙ্গে, যেদিন কিশোর অর্জুনকে আত্মীয়বন্ধুর সামনে কর্ণের প্রতিস্পর্ধিতায় থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। উন্মুক্ত রঙ্গস্থলে অর্জুন যখন তাঁর অস্ত্রবিদ্যার সার শিল্পগুলি দেখাচ্ছিলেন, তখনই কর্ণের আগমন এবং প্রতিস্পর্ধিতা তাঁকে চরম লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়। এই অপমান তিনি জীবনে ভোলেননি এবং এর জন্য নিজেকে তিনি এমনভাবেই শিক্ষিত করেছিলেন, যাতে কোনওভাবেই কর্ণ তাঁকে প্রতিহত করতে না পারেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে বেশ কয়েকবার তিনি কর্ণকে পর্যুদস্ত করেছেন, কিন্তু এই যুদ্ধই ছিল শেষ জায়গা, যেখানে তিনি তাঁর চরম অস্ত্র-শিক্ষার শেষ শিল্পটি দেখাতে পারতেন।

কিন্তু মহাভারতের কবি এতই নিষ্করুণ যে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে অর্জুনের অসাধারণ অস্ত্রনৈপুণ্যই শেষ কথা ছিল না। তিনি একদিকে কর্ণচরিত্রের গঠন করেছেন ভাগ্যের বঞ্চনা দিয়ে এবং অর্জুনকে তিনি শুধুই অস্ত্রশিক্ষার নিপুণতায় বড় করে দেখাতে চান না। রসসৃষ্টির চরম সম্ভাবনায় যে শিশুটিকে তিনি মায়ের কোল থেকে নামিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সে দিন থেকে দুর্ভাগ্য আর বঞ্চনাই তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে। অস্ত্রবিদ্যায় একান্ত কুশলী হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতের কবি তাঁর হাতে

সৌভাগ্যের শেষ-অস্ত্র তুলে দেননি। সমস্ত জীবন ধরে দুর্যোধনের সান্নিধ্যে তাঁকে ঐহিক সুখ দিয়েছে, কিন্তু বীর ক্ষত্রিয়ের একান্ত সহচর ভাগ্যটি দেননি। অন্যদিকে অপরজনকে ঐহিক সুখের বঞ্চনা দিয়েছেন, বনবাসে আব কঠিন সাধনায় তাঁর জীবন কেটেছে, কিন্তু এই জাগতিক পরিমাপের থেকেও তাঁর ব্যক্তি-পরিমাণ বৃদ্ধি করাব জন্য মহাভারতের কবি তাঁকে দিয়েছেন দার্শনিক নিরহঙ্কার। সেই নিরহঙ্কার সুস্থিত করাব জন্য একদিকে কৃষ্ণেব মতো সুমতিকে অর্জুনের চালক তথা সারথি করে বাখা হয়েছে, অন্যদিকে কর্ণকে দেওয়া হযেছে দুর্ভাগ্য—যাতে একজন ঋজু-জয়ের আনন্দ অনাবিলভাবে ভোগ করে অহঙ্কৃত না হন, আর অন্যজনও যেন জীবনের শেষ যুদ্ধে পুরোপুরি হেরে না যান, যেন তিনি বলতে পারেন—আমিই অর্জুনকে মারতাম, কিন্তু কী করব, দুর্ভাগ্য আমার রথের চাকা মাটিতে বসে গেল।

যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের একটা খটাখটি হয়ে যাবার পরেই কিন্তু কর্ণবধের জন্য অর্জুনের গতি ত্বরান্বিত হয। কর্ণ জীবনে পাণ্ডবদেব প্রতি যা যা অন্যায় করেছেন—সেগুলি একের পর এক বলে-বলে কৃষ্ণও অর্জুনের তেজ আরও উদ্দীপ্ত করেছেন। এক সময় অর্জুন সাহঙ্কারে বলেও ফেলেছেন—তুমি আমাব সহায় আছ, আমি কার পরোয়া করি। কিন্তু আস্তে আস্তে কথায় কথায় ক্ষত্রিয়ের দর্পাবেশে আরও বলেছেন—আমার সমান ধনুর্ধর আর কে আছে এই জগতে, বীরত্বেই বা কে আছে আমার সমান—ধনুর্বেদে মৎসমো নাস্তি লোকে/পরাক্রমে বা মম কো'স্তি তুল্যঃ। কৃষ্ণ আপাতত অর্জুনেব এই সব কথায প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকা যখন মাটিতে বসে গেছে এবং কর্ণ যখন বাববার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে অর্জুনকে বাণ মারা থেকে নিবৃত্ত কবতে চাইছিলেন, তখন কৃষ্ণই তাঁর পূর্বের দুষ্কর্মগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—সেই সব মুহূর্তে তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল, কর্ণ? অর্জুনকে বলেছেন—মারো অর্জুন। এই উপযুক্ত সময়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সতেরো দিনের মাথায় কর্ণ অর্জুনের হাতে মারা পড়লেন। কিন্তু ভূমি তাঁব বথচক্র গ্রাস কবেছিল—এই অবস্থায় অর্জুন যে তাঁকে মারলেন—এই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকাটি অর্জুনের রয়েই গেল। অর্থাৎ মহাভারতের কবি তাঁকে সেই সমান প্রতিস্পর্ধিতার গৌরব দিলেন না, যাতে তাঁর শত্রুদ্বেষ, ইচ্ছা-অভিলাষ, প্রয়োজনীয় সন্তুষ্টির মাত্রা অতিক্রম না করে, বণলব্ধ বিজয তাঁকে যেন আত্মশ্লাঘার দিকে প্রেরিত না করে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণবধের সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবদের সমস্ত জয়াশা ফুরিয়ে যায়। অপিচ কর্ণের মতো মহাবীব অর্জুনের হাতে মৃত্যুবরণ করার পর অর্জুন আরও কাকে কাকে মেরেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তিনি কতটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—এই সব কথা প্রায় অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। প্রবন্ধ-লাঘবের খাতিরে আমি সেই সব অনুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু একটি কথা না বললেই নয়। দ্রৌপদীব সমস্ত সন্তানগুলিকে হত্যা করার পর অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডবদের রোষাগ্নিতে পড়লেন—তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য তিনি জগদ-ধ্বংসী ব্রহ্মশির অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। অর্জুনও সেই অস্ত্র প্রতিহত করার জন্য নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্র ত্যাগ করলেন। এবার নারদ এবং ব্যাস—দুই পুবাণ মুনি এসে দাঁড়ালেন সেই দুই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের মাঝখানে। মনুষ্যলোকের হিতবুদ্ধিতে তাঁরা দুই মহাবীরকেই বললেন—অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিতে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা অস্ত্র হানাটাই জানেন, কিন্তু প্রত্যাহারের কৌশল জানেন না। তাঁর অস্ত্র শেষ পর্যন্ত কুরুপাণ্ডবের একমাত্র সন্তানবীজ অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভস্থ পুত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হল। কৃষ্ণের ক্ষমতায় পরীক্ষিত রক্ষা পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অশ্বত্থামা যখন কিছুতেই তাঁর অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারছেন না—তখন মহামুনি ব্যাস তাঁকে একটি অসাধারণ কথা বলেছিলেন।

ব্যাস বলেছিলেন—পার্থ অর্জুন যে ব্রহ্মশির অস্ত্র তাগ করেছেন — সে কিন্তু কোনও রাগ থেকে নয়, কিংবা তোমার বধের জন্যও নয়—উৎসৃষ্টবান্ ন রোষেণ ন নাশায় তবাহবে। শুধু তোমার অস্ত্র যাতে প্রতিহত হয়—সেইটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত আমরা যখন অর্জুনকে অস্ত্র ত্যাগ করতে দেখি, তখন তিনি নিজের, অশ্বত্থামার এবং আপন ভাইদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেই কথা উচ্চারণ করেছেন। অতিশয় বিপন্ন অবস্থাতেও লোকহিতের জন্য অর্জুনের এই যে সহানুভূতি, এই

যে ধৈর্য, এই যে সংযম—এগুলির কথা আমি পূর্বে বলেছি। কিন্তু আবারও বললাম এই জন্য যে, সবার জন্য যার চিন্তা থাকে, তাঁর কাছ থেকে সংসারের অতি কাছের মানুষগুলির প্রত্যাশাপূরণ হয় না। অর্জুনের জীবনে প্রতিটি কাজের মধ্যে যে 'ব্যালান্স' বা সৌষম্যবোধ ছিল, তাতে সংসার-জীবনের সবাইকে তিনি খুশি করতে পারেননি। পুত্রশোকের যে তাড়নায় দ্রৌপদী অশ্বত্থামার জীবন চেয়েছিলেন ভীমের কাছে, অথবা ভীমও যে ক্রোধের তাড়নায় অশ্বত্থামার দিকে ধেয়ে গিয়েছিলেন, এমনকী অশ্বত্থামাও যে ক্রোধে পাণ্ডব-বধের জন্য ব্রহ্মশির ত্যাগ করেছিলেন, সেই তাড়নায় অর্জুন অস্ত্রমোক্ষণ করেননি। ক্ষুব্ধ পরিস্থিতি মাত্রেই তিনি বিচলিত হন না বলে দ্রৌপদীও তাঁকে অশ্বত্থামা-বধের অনুরোধ করেননি। পূর্বে দেখেছি বিরাটনগরে কীচক-বধের জন্যও তিনি ভীমকেই অনুরোধ করেছেন, অর্জুনকে নয়। তিনি জানতেন পূর্বাপর চিন্তাপরায়ণ অর্জুনকে বললে ক্রোধের সদ্যফল নাও মিলতে পারে। ফলত অর্জুনকে তিনি যতই ভালবাসুন, তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারেননি দ্রৌপদী।

আবার যুধিষ্ঠিরকে দেখুন—কর্ণপর্বে কর্ণের কাছে নাকানি-চোবানি খেয়ে তিনি অর্জুনকেই দুষেছেন। যুদ্ধেও স্থির থাকেন বলে যাঁর নামই যুধিষ্ঠির, তিনি সকলের সামনে কর্ণের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে কী অপ্রীতিকর ভাষায়ই না অর্জুনকে দোষী করেছেন। যুদ্ধে স্থির হয়েও যুদ্ধের ফল তিনি কত তাড়াতাড়িই না চেয়েছেন অর্জুনের কাছে! জানি—যুদ্ধ জিনিসটাই যুধিষ্ঠির পছন্দ করেন না এবং সেই কারণেই হয়তো যুদ্ধ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়—তাই তাঁর ঈপ্সিত ছিল। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো বীর যোদ্ধাকে কি তিনি চিনতেন না? তা ছাড়া যুদ্ধোদ্যমেরও একটা পর্যায় আছে। কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ লাগল, আর তাঁকে মেরে দিলাম—এ তো হয় না। মহাকাব্যের নিরিখে প্রতিনায়কের কৃতিত্বও তাতে খাটো হয়। তার ওপরে অসাধারণ দিব্য-অস্ত্রগুলির প্রয়োগ অর্জুনের মোটেই পছন্দ নয়। সেখানে যদি অর্জুনকে বলা যায়—কই! কর্ণকে মারবে বলে এত বড় বড় কথা তো বলেছিল, কোথায় গেল তোমার সেই প্রতিজ্ঞা। কোথায় তোমার নিপুণতা? তুমি বরং তোমার গাণ্ডীবখানা কৃষ্ণের কাঁধে ঝুলিয়ে দাও, আর তুমি হও তাঁর সারথি—এমন কথায় কার না রাগ হয়?

তাই বলেছিলাম—অর্জুনের কাছে চাওয়া হয়েছে বড় বেশি। দ্রৌপদী তার কাছে একপত্নীব্রত পুরুষের প্রেম চেয়েছেন, যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে সদা নম্রতা এবং সমরশীঘ্রতা চেয়েছেন, ভীম তাঁর কাছে চেয়েছেন প্রতি পদে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, জননী কুন্তী অর্জুনের কাছে চেয়েছেন সন্তান ধারণের সার্থকতা, আর সর্বোপরি কৃষ্ণ তাঁর কাছে চান প্রত্যেক কর্মে সকর্মক, অথচ নির্লিপ্ত ভূমিকা। তাঁর কাছে জায়া, জননী, ভাই এবং সখার মতো পরস্পরবিরোধী চরিত্রের এই যে প্রত্যাশা—সেই প্রত্যাশাপূরণ কোনও একটি ব্যক্তি-পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি অর্জুন হলেও, নয়। তা ছাড়া সমতা বা সমদৃষ্টি এমনই এক দার্শনিক পদার্থ, যা সংসারের বাইরের মানুষের বোধ যতটা তৃপ্ত করে, ঘরের মানুষের মন ততটা নয়। ফলত যুধিষ্ঠির, ভীম, কৃষ্ণা, কুন্তী—সবাইকে তৃপ্ত করতে গিয়ে, তিনি কাউকেই পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারেননি; অথচ সবাই ভেবেছে—আসলে তাঁর শক্তি, নিপুণতা এবং সহৃদয়তার নিরিখে সবাই ভেবেছে—তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি প্রত্যেককে তৃপ্ত করতে পারতেন। এও এক বিড়ম্বনা। সর্বাঙ্গীনভাবে যাঁর মহাভারতের নায়ক হবার কথা, এই বিড়ম্বনাই হয়তো সমালোচকের মনে তাঁর নায়কত্ব প্রতিষেধ করেছে। হয়তো এই বিড়ম্বনাই তাঁকে আস্তে আস্তে ঠেলে দিয়েছে গীতোক্ত নিস্তরঙ্গ দার্শনিকতার দিকে। হয়তো এই বিড়ম্বনাই মহামতি কৃষ্ণের ওপরে তাঁর নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। যাতে জায়া, জননী, ভাই—সবাই যখন মুখ ঘুরিয়ে নেবে তখন একজন, অন্তত একজন তাঁর রথের রশি ধরে সংসারের যুদ্ধক্ষেত্র পার করে দেবে, আর বলবে—তুমি শুধু যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে যাও অর্জুন, কী হবে, কী ঘটবে—তা নিয়ে তুমি ভাবনা কোরো না। এমন নির্বিকার বৈরাগী ফলাকাঙ্ক্ষাহীন যুদ্ধবীরের মধ্যেও যদি মহাভারতের অন্তঃশায়ী শান্তরসের নায়ক খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হলেও বলব—অর্জুন! তুমি এখনও বঞ্চিত, কেননা জায়া, জননী, ভাইদের মতো তুমি আমাদেরও তৃপ্ত করতে পারোনি। অথবা এই বঞ্চনা তোমাকেই শুধু মানায়, অর্জুন! শুধু তোমাকেই।

দ্রৌপদী

ঘটনাস্থল দুর্যোধনের সাতমহলা বাড়ির অন্দরমহল। এখানে দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী আছেন। কোনও কারণে আজ সেখানে পঞ্চ স্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর আগমন ঘটেছে। ভানুমতী তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, নাকি দ্রৌপদী সেখানে নিজেই এসেছিলেন, সে খবর আমরা রাখি না। কিন্তু ভানুমতী যেহেতু দুর্যোধনের স্ত্রী এবং দ্রৌপদী যেহেতু পাঁচ ভাইয়ের এক বউ, তাই তাঁদের কথাবার্তা সোজা খাতে বইছিল না। বিশেষত এই দুই রমণীর স্বামীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ ছিল না, তাই এঁদের কথাবার্তার মধ্যেও কুটিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বিনা কারণেই এসে পড়ছিল। দুর্যোধনের গরবে গরবিনী ভানুমতী শেষ পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলেই ফেললেন কথাটা। বললেন—তোমার তো আবার একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচ পাঁচটা স্বামী। এ বিদ্রূপ দ্রৌপদীর গা-সওয়া। কৃষ্ণের পরম-প্রিয়া পত্নী সত্যভামাও মহাভারতের বনপর্বে একই প্রশ্ন করেছিলেন। তবে তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল ভাল আর জিজ্ঞাসার সঙ্গে ছিল বিনয়। সত্যভামা বলেছিলেন—পাঁচ-পাঁচটা পাণ্ডব স্বামীকে তুমি কেমন করে তুষ্ট কর দিদি ? ব্রত, স্নান, মন্ত্র, নাকি ওষুধ করেছ দিদি ! বল না, কী করলে আমার ওই একটা স্বামীই কৃষ্ণ আমার বশে থাকে ! কী বুদ্ধিতেই বা তুমি পাঁচ স্বামীকে সামাল দাও—কেন বৃত্তেন দ্রৌপদী পাণ্ডবান্ অধিতিষ্ঠসি ?

হ্যাঁ, সত্যভামার প্রশ্নে আবদার ছিল, জিজ্ঞাসার মধ্যে মিনতি ছিল, দ্রৌপদীও তাই স্বামী হাতে রাখার কেতা-কানুন সত্যভামাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে বুড়ি মাসিমার মতো। কিন্তু এই ভানুমতীর বলার ঢঙ তো আলাদা, ভানুমতীর কথার মধ্যে যেন মেয়েমানুষের লাম্পট্যের ইঙ্গিত আছে। দ্রৌপদী ছাড়বেন কেন ? বিশেষত তিনি বিদগ্ধা মহিলা, সংসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দগ্ধাও বটে। সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ দ্রৌপদীর চলে না, মুখ বুঝে সহ্য করার লোকও তিনি নন। সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদী জবাব দিলেন—আমার শ্বশুরকুলে স্বামীর সংখ্যা চিরকালই একটু বেশি ভানুমতী—পতিবৃদ্ধিঃ কুলে মম।

সরলা ভানুমতী প্রথমে বুঝতেই পারেননি কোপটা কোথায় গিয়ে পড়ল। তারপর যখন দ্রৌপদীর কথাটা বেশ ভেবে দেখলেন, তখন বুঝলেন তাঁর নিজের শ্বশুর, দিদিশাশুড়ি—সবাই জড়িয়ে গেছেন দ্রৌপদীর কথার পাকে। দ্রৌপদীর শাশুড়ি হলেন কুন্তী। পাণ্ডু ছাড়াও আরও পাঁচজন তাঁর অপত্যকারক স্বামী ছিলেন। না হয় ধরেই নিলাম কর্ণ-পিতা সূর্যের কথা দ্রৌপদী জানতেন না। আবার কুন্তীর দুই শাশুড়ি হলেন অম্বিকা আর অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্য ছাড়াও এঁদের পুত্রদাতা স্বামী স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেব। এই সুবাদে ভানুমতীর শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র অথবা তাঁর শাশুড়ি মা অম্বিকাও তো ফেঁসে গেলেন। আবার অম্বিকা-অম্বালিকার শাশুড়ি যে সত্যবতী, তাঁর শান্তনু ছাড়াও তো আরেক স্বামী ছিলেন—পরাশর মুনি। এবার দ্রৌপদীর কথার গুরুত্ব বুঝে আর কথা বাড়াননি দুর্যোধন সোহাগী ভানুমতী।

জনান্তিকে বলে রাখি, ভানুমতী-দ্রৌপদীর এই সংলাপের কথা মহাভারতে নেই। এমনকী দুর্যোধনের স্ত্রীর নাম ভানুমতী কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন—বেণীসংহার নাটকের লেখক ভট্টনারায়ণই দুর্যোধন-বধূর নামকরণ করেন ভানুমতী। বস্তুত দুর্যোধনের স্ত্রীর নাম ভানুমতী না মাধবী, তাতে কিছু আসে যায় না। এমনকী ওপরের যে সংলাপটি পণ্ডিত অনন্তকাল ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, সেটিও তাঁর মতে লোকপরম্পরায় প্রচলিত শ্লোকের একাংশ। খুব প্রামাণিক না হলেও এই শ্লোকটিকে আমরা অসীম গুরুত্ব দিই, এবং তা দিই এই কারণে যে, দ্রৌপদীর চরিত্র বুঝতে এমন শ্লোক বুঝি আর দ্বিতীয় নেই।

যাঁরা আর্থ-সামাজিক কুতূহলে সেকালের তাবৎ নারীকুলের অন্যায় আর অবিচারের জিগির তোলেন, দ্রৌপদীর চরিত্র তাঁদের কিছু হতাশ করবে। স্বামীদের ভুল বা ভালোমানুষির জন্য দ্রৌপদীর জীবনে দুঃখ-কষ্ট এবং উপদ্রব—কোনওটাই কম হয়নি। তবু কিন্তু কোনও সতীলক্ষ্মীর বিপন্নতা দ্রৌপদীর ছিল না। সতীলক্ষ্মীর মতো স্বামীদের সব কথা তিনি মুখ বুজে সহ্যও করেননি। বরঞ্চ আধুনিক অনেক গোবেচারা স্বামীদের মতোই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীকে মাঝে মাঝেই তাঁর মুখ-ঝামটা খেয়ে গোবেচারা হয়ে যেতে হয়েছে। এবং জনান্তিকে আবারও বলি—দ্রৌপদীর পাঁচ পাঁচটি স্বামীই দ্রৌপদীকে রীতিমতো ভয় পেয়ে চলতেন। ভয় পেতেন অন্যেরাও। তবে সে-কথা পরে।

দ্রৌপদী কালো মেয়ে। কালো বলেই তাঁর নাম কৃষ্ণা—কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎ সা হি বর্ণতঃ। মহাভারতীয় রঙ্গভূমিতে যে ক'টি কালো মানুষ মহাভারত মাতিয়ে রেখেছেন তার মধ্যে তিনজনই পুরুষ, আর দুজন স্ত্রীলোক। এই নতুন কথাটা প্রথম শুনি শ্রদ্ধেয়া গৌরী ধর্মপালের কাছে। প্রথম কালো মহামতি ব্যাসদেব, দ্বিতীয় কালো কৃষ্ণ ঠাকুর, তৃতীয় হলেন অর্জুন। আর মেয়েদের মধ্যে ব্যাস-জননী ধীবরকন্যা সত্যবতী নিকষ কালো। তাঁর নামও ছিল কালী। কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকেও কালী বলে ডাকা হত, কিন্তু তার গায়ের রঙ কালো ছিল না। কাজেই গায়ের রঙ এবং নামেও মহাভারতের দ্বিতীয়া যে কালো স্ত্রীলোকটি তার নাম দ্রৌপদী। তবে গায়ের রং কালো হলে কী হবে, সেকালে দ্রৌপদীর মতো সুন্দরী সারা ভারতবর্ষ খুঁজলেও মিলত না। অবশ্য দ্রৌপদীর রূপ যে শুধুমাত্র শরীরকেন্দ্রিক ছিল না, তাঁর রূপ যে দেহের সীমা অতিক্রম করেছিল, সে-কথা বোঝা যাবে স্বয়ং ব্যাসের বর্ণনায়। মহাভারতকার দ্রৌপদীর শারীরিক রূপ বর্ণনায় বেশি শব্দ খরচ করেননি। 'সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণীপয়োধরা'—দ্রৌপদীর এই বর্ণনা মহাকাব্যের সুন্দরীদের তুলনায় আলাপমাত্র। লক্ষণীয় বিষয় হল—নায়িকার রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে মহাকাব্যকারেরা যেখানে অনুপম শব্দরাশির বন্যা বইয়ে দেন, সেখানে দ্রৌপদীর রূপবর্ণনায় মহাভারতকার যেন একেবারে আধুনিক মানসিকতায় গ্ল্যামারের দিকে মন দিয়েছেন। দ্রৌপদী যে মোটেই বেঁটে ছিলেন না, আবার ঢ্যাঙা লম্বাও ছিলেন না—নাতিহ্রস্বা ন মহতী—সেকেলে কবির কাছে এই বর্ণনা, এই বাস্তব দৃষ্টিটুকু অভাবনীয়। তাও একবার নয়, দুবার এই কথা ব্যাসকে লিখতে হয়েছে, যদিও অন্যত্র হলে নারীদেহের প্রত্যঙ্গ বর্ণনার ঝড় উঠে যেত তাঁরই হাতে। ব্যাস জানতেন দ্রৌপদীর রূপ তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি কিংবা স্তন-জঘনে নয়, তাঁর রূপ সেই দৃপ্ত ভঙ্গিতে—বিভ্রাজমানা বপুষা—সেই বিদগ্ধতায়, যার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু নীলাভ বৈদুর্যমণির—বৈদুর্যমণিসন্নিভা। যেখানেই তিনি থাকেন, সেখানেই আলো ঠিকরে পড়ে, প্রতি কথায়, প্রতি কাজে। আর তাঁর মধ্যে আছে এক দূরত্ব, যে দূরত্ব তাঁব জন্ম-লগ্নেই বিধিপ্রদত্ত, কেননা যজ্ঞীয় বেদীর আগুন থেকে তাঁর জন্ম। তাঁর মানে এই নয় যে, একটি যজ্ঞবেদী থেকে কৃষ্ণার জন্ম হয়েছিল। এমনটি হতেই পারে না। তার কারণ দ্রুপদ রাজার আয়োজিত দ্রোণ-হন্তার জন্মযজ্ঞে পুরোহিত যখন আগুনে ঘি দিচ্ছিলেন তখনই তিনি টের পেয়েছিলেন যে ওই যজ্ঞের আগুন থেকে শুধুমাত্র একটি কুমার জন্মাবে না, উপরন্তু একটি কুমারীও জন্মাবে। দ্রুপদ রাজার স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—রাজ্ঞি পৃষতি মিথুনং ত্বামুপস্থিতম্—তুমি পুত্র এবং কন্যা দুই-ই পাবে রানি। পুরোহিত যাজ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া মাত্রই সেই আগুন থেকে জন্মালেন কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন—উত্তস্থৌ পাবকাৎ তস্মাৎ। এর পরে ধৃষ্টদ্যুম্নের একটু বর্ণনা দিয়েই ব্যাস

বললেন—কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা—সেই বেদী থেকেই কুমারী পাঞ্চালীও উদ্ভূত হলেন। ঠিক এখানে আগুন কথাটা সোজাসুজি নেই বটে তবে যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যে আগুন ছাড়া আর কী থাকে? বিশেষত পূর্বাহ্নে যে আগুন থেকে কুমার জন্মেছেন। ব্যাস অবশ্য পরে পরিষ্কার লিখেছেন যে দ্রুপদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে পুত্র এবং কন্যার মিথুন জন্মাল—তথা তন্মিথুনং যজ্ঞে দ্রুপদস্য মহামখে।

কাজেই যজ্ঞের বেদীমাত্র নয়, বেদীর আগুন থেকেই তাঁর জন্ম। বস্তুত আগুন তো কৃষ্ণার গায়ের রঙে আসবে না, আগুন যে দ্রৌপদীর চরিত্রে। যাঁরা দ্রৌপদীর নিত্যসঙ্গী—পাঁচভাই—তাঁরা এই আগুনে সোনার মতো পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছেন। আর যাঁরা দূরের, তাঁরা যতবারই এই যাজ্ঞসেনী আগুনে হাত দিয়েছেন, ততবারই তাঁদের হাত পুড়েছে, কপাল পুড়েছে, গোটা বংশ ছারখার হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর আবির্ভাব লগ্নেই তাই দৈববাণী শোনা গেছে—ক্ষত্রিয় কুলের ধ্বংসের জন্যই তাঁর জন্ম, তিনি কৌরবদের ভয়ের নিশান—অস্যা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপদ্যতে ভয়ম্‌। কি অসামান্যতায়, কি রূপে, কি গুণে—দ্রৌপদীর সঙ্গে আমি তাঁর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি সত্যবতীর খুব মিল খুঁজে পাই। শুধু গায়ের রঙ ভাগ করে নিয়ে এঁরা যে একজন কালী আর অন্যজন কৃষ্ণা হয়েছেন তাই নয়, এঁদেব দুজনের মধ্যেই ছিল সেই বিরল ব্যক্তিত্ব, যাতে সত্যবতীর হাতে গড়ে উঠেছিল ওই বিরাট কুরুকুল, আর দ্রৌপদীর ক্ষোভে সেই কুরুকুল ধ্বংস হয়ে গেল। সৃষ্টি আর ধ্বংসের মধ্যে তফাত এইটুকুই যে, মহাবাজ শান্তনু, পিতামহ ভীষ্ম—এঁরা সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব মেনে নিয়েছেন, আর পাণ্ডবেরা দুর্ভাগ্যবশে এবং কৌরবেরা সাহঙ্কারে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বকে অপমান করেছেন। ফল একপক্ষে বিড়ম্বনা, অন্যপক্ষে ধ্বংস।

দ্রৌপদীর যেদিন বিয়ে অথবা স্বয়ম্বর, তার আগে পাণ্ডবেরা বারণাবতে জতুগৃহের আগুন হজম করে প্রচ্ছন্নভাবে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ-বন সে-বন দেখে, আর কিছুই করার না পেয়ে পাণ্ডবজননী কুন্তী পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভিক্ষা-টিক্ষাও ভাল মিলছে না। এরই মধ্যে ব্যাস এসে দ্রৌপদীর জন্মকথা শুনিয়ে গেলেন পাণ্ডবদের। যাবার আগে এও বলে গেলেন, যে সেই রমণীই পাণ্ডবদের বউ হবে। কিন্তু কৌরব-জ্ঞাতির প্রতাড়না আর বন-বনান্তরে ঘুরে বেড়াবার যন্ত্রণায় পাণ্ডবদের মনে তখন স্ত্রীচিন্তা ঠাঁই পায় না। সমস্ত জগৎকে খরতাপে আক্রমণ না করে সূর্য যেমন সন্ধ্যা-বধূকে ভজনা করে না, তেমনি জগতের কাছে আপন শৌর্য প্রকাশ না করে পাণ্ডবেরাই বা রমণীর চিন্তা করবেন কী করে? তবে একাধারে শৌয-বীর্য দেখানোর সুযোগ এবং স্ত্রীরত্ন লাভ—দুইয়েরই মওকা এল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, যদিও পাণ্ডবেরা এ-কথা সচেতনভাবে বোঝেননি। তাঁরা পাঞ্চালরাজ্যের উদ্দেশে রওনা দিলেন ভাল ভিক্ষে পাবার আশায়। কারণ তাঁরা শুনেছিলেন পাঞ্চাল রাজ্যে ভাল ভিক্ষে পাওয়া যায়—সুভিক্ষাশ্চৈব পাঞ্চালাঃ শ্রূয়ন্তে। তা ছাড়া বনে বনে এতকাল বাস করে নগরে ভ্রমণ করার জন্য পাণ্ডবদের নাগরিক-বৃত্তিও কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিল বুঝি। কেননা পাঁচ ছেলের মা কুন্তী পর্যন্ত ভেবেছিলেন—নগরে গেলে দারুণ মজা হবে—অপূর্বদর্শনং বীর রমণীয়ং ভবিষ্যতি। পাণ্ডবেরা তাই চললেন। রাস্তায় ব্যাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বটে, তবে ব্যাসের কথা, দ্রৌপদীর কথা বুঝি বা তাঁদের ভাল করে মনেও ছিল না।

পাঞ্চাল রাজ্যে পৌঁছে ইস্তক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের খবর পাণ্ডবদের কানে আসছিল। মনে মনে তাঁকে বিয়ে করার মানসিক প্রস্তুতি পাণ্ডবদের কারও ছিল না, কিন্তু তাঁরা যে স্বয়ম্বরের জাঁকজমক দেখতে যাবেন, এটা অবশ্য মনে মনে ছিল। পাণ্ডবেরা পাঞ্চালরাজ্যে পৌঁছবেন কি, রাস্তাতেই তাঁরা দেখতে পেলেন দলে দলে ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা চলেছেন দ্রুপদের রাজসভায়। পাণ্ডবেরা তখনও বাড়ি-ঘর বাসস্থান ঠিক করেননি কিছু। তখনও প্রচ্ছন্নচারী ব্রাহ্মণের বেশ। যুধিষ্ঠির কিছু শুধোবার আগেই ব্রাহ্মণেরা স্বজাতির ভ্রমে পাণ্ডবদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা আসছেন কোত্থেকে, যাবেনই বা কোথায়? পুরো পরিচয় পাবার আগেই ব্রাহ্মণেরা বললেন—চল সব দ্রুপদের রাজবাড়িতে, বিরাট উৎসব, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। আমরা সবাই তো সেখানেই যাচ্ছি। নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণেরা দ্রৌপদীর চেহারার একটা লোভনীয় বর্ণনাও দিতে চাইলেন। তাঁরা বললেন—দারুণ

দেখতে নাকি দ্রৌপদীকে। 'দর্শনীয়া', অনবদ্যাঙ্গী', পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ। এক ক্রোশ দূর থেকেও নাকি তাঁর গায়ের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় (পাঠক! যোজনগন্ধা পদ্মগন্ধী সত্যবতীর সঙ্গে এখানেও দ্রৌপদীর মিল)। ব্রাহ্মণ বলে কথা, তাঁদের মুখে প্রত্যঙ্গ বর্ণনা কেমন শোনায়; তাই বুঝি অতি সংক্ষেপেও কোনও আড়ম্বরের মধ্যে না গিয়ে, অথচ সব কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণেরা বললেন—দ্রৌপদী তনুমধ্যমা। অনবদ্য তার চেহারা, তার ওপরে 'সুকুমারী মনস্বিনী।'

না, ব্রাহ্মণেরা দ্রৌপদীকে পেতে চান না। তাঁরা ধূমধাম দেখবেন, রঙ্গ দেখবেন। উপরি পাওনা রাজার দান—টাকাপয়সা, গরু, ভোক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সর্বশঃ। ব্রাহ্মণেরা বললেন—তোমরাও চল আমাদের সঙ্গে, মজা দেখে, দান নিয়ে ফিরে আসবে—এবং কৌতূহলং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। চাই কি, তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের এক ভাইকে কৃষ্ণা বরণও করতে পারে, কারণ তোমরা সবাই তো দেখতে বেশ সুন্দর। যুধিষ্ঠির বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, এই আমরা এলুম বলে।

এক কুমোরের ঘরে পাণ্ডবদের থাকার ব্যবস্থা হল। ভিক্ষা করে আর ব্রাহ্মণের বেশ ধরে পাণ্ডবেরা তাঁদের ছদ্ম ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে রাজা-রাজড়ারা এবং ব্রাহ্মণেরা অনেক আগে থেকেই উপস্থিত হচ্ছিলেন। পাণ্ডবেরাও নিজেদের ব্যবস্থা করে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হলেন। সভা একেবারে গমগম করছে। দ্রুপদ মৎস্যচক্ষুর পণ সমবেত সবাইকে জানালেন এবং প্রায় 'অলিম্পিয়ান' কায়দায় স্বয়ম্বর ঘোষণা করলেন—স্বয়ম্বরম্ অঘোষয়ৎ। ঈশান কোণে বসলে নাকি কোনও কাজে পরাজয় হয় না, তাই রাজারা বসলেন সেদিকটায়, মঞ্চের ওপর সারি সারি। উত্তর দিকটায় সাধারণ লোকেরা। আর ঋষিব্রাহ্মণেরাও বসলেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়।

বিবাহেচ্ছু রাজারা সব বসে আছেন এমনভাবে, যেন মনে হচ্ছে—এ বলে তুই আমায় দেখ, ও বলে তুই আমায় দেখ—স্পর্ধমানা স্তদান্যোন্যং নিষেদুঃ সর্বপার্থিবাঃ। জনতার মধ্যে তখন সাগরতরঙ্গের মতো অবিরাম কোলাহল। প্রত্যেকেই তখন ভাবছেন—কখন সেই দীপ্তিমতী সুন্দরী উদয় হবেন রাজসভায়, কখন কনে দেখব? এরই মধ্যে বাজনা-বাদ্যি আরম্ভ হয়ে গেল। সালঙ্কারা দ্রৌপদী রাঙা কাপড় পরে সভায় উদয় হলেন। হাতে সোনার রঙের বরণমালা। কার গলায় মালা দেব, কে সেই বীরপুরুষ—এই চিন্তায় কিছুটা বা বিবশা—আপ্লুতাঙ্গী সুবসনা সর্বাভরণভূষিতা। ব্রাহ্মণেরা আগুনে আহুতি দিয়ে স্বস্তিবাচন করলেন, এক লহমায় বাদ্যবাদন থেমে গেল—কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন কথা বলছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—এই ধনুক, ওই মীনচক্ষু লক্ষ্যস্থল, আর এই যে বাণগুলি। আপনাদের কাজ—ছিদ্রপথে ওই মৎস্যচক্ষু ভেদ করা। যিনিই এই কষ্টকর কাজটি করতে পারবেন তাঁরই গলায় মালা দেবেন আমার ভগিনী—দ্রৌপদী। কালিদাসের পার্বতীকে সকামে দেখে শিবের তিনটি চোখ যেমন যুগপৎ তাঁর অধরোষ্ঠে পড়েছিল, এখানে সমবেত রাজমণ্ডলীর আতুর চোখগুলিও তেমনি একসঙ্গে দ্রৌপদীর ওপরে গিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এই ভাবনায় মশগুল যে, দ্রৌপদীকে আমিই জিতব—সঙ্কল্পজেনাভিপরিপ্লুতাঙ্গাঃ—এবং লক্ষ্যভেদ করার আগেই প্রত্যেকে ভাবতে লাগলেন—দ্রৌপদী আমারই—কৃষ্ণা মমেত্যেব। আশ্চর্য! যে রাজারা অন্য সময় এক জোট, প্রাণের বন্ধু, তাঁরাও এখন অহংমম ভাবনায় সব আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন, একে অন্যকে গালাগালি দিচ্ছেন, যদিও তাঁদের চোখ, মন এবং রসভাব—সবই এক দ্রৌপদীর দিকে—কন্দর্পবাণাভি-নিপীড়িতাঙ্গা...কৃষ্ণাগতৈ-র্নেত্রমনঃস্বভাবৈঃ...দ্বেষং প্রচক্রুঃ সুহৃদো'পি তত্র।

কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাদের নাম ঘোষণা আরম্ভ করে দিয়েছেন আগেই—উদ্দেশ্য দ্রৌপদীকে কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—ইনি দুর্যোধন, ইনি কর্ণ, ইনি জরাসন্ধ, ইনি কৃষ্ণ, ইনি শিশুপাল—আরও কত শত নাম, যার মধ্যে বাংলা দেশের রাজা পর্যন্ত আছেন। বস্তুত বিদর্ভ রাজনন্দিনী রুক্মিণীর পরে আর এমন কোনও স্বয়ম্বরসভা বসেনি, যার সঙ্গে তুলনা চলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের। সেই সময়ে এই কৃষ্ণা দ্রৌপদীর রূপ-গুণের কথা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের ধারণা—ওই যে বলা হয়েছে দ্রৌপদীর গায়ের মিষ্টি গন্ধ এক ক্রোশ দূর থেকে পাওয়া যেত—একথার আসল তাৎপর্য হল—দূরে দূরান্তরে এই কালো মেয়েটির রূপ-গুণের কথা লোকে জানত। আজ তাই এতগুলি রাজ-ভ্রমর এই কৃষ্ণা পদ্মিনীর মধুলোভে দ্রুপদের রাজসভায় গুনগুন

করছে। খেয়াল করতে হবে একই বিবাহ-সভায় বরাত পরীক্ষা করতে মামা-ভাগ্নে—শল্য এবং পাণ্ডবেরা—উভয়েই এসেছেন। বাপ-বেটা—বিরাট এবং তাঁর ছেলে, জরাসন্ধ এবং তাঁর ছেলে—দুয়েই এসেছেন—যার কপালে দ্রৌপদী জোটে তারই লাভ।

আরম্ভ হল ধনুক তোলা। কলিঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র—সব গেল। জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য—সব গেল। দুর্যোধন, অশ্বত্থামা—সব গেল। মহাভারতকার কেবলই এই মহারাজাদের নাম একটি একটি করে বলেন, আর বলেন—না, ইনিও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন—জানুভ্যাম্ অগমন্‌মহীম। এত রাজার মাঝখানে মাত্র একটি দৃঢ় সঙ্কল্পিত মুখ ধনুকখানি তুলে তাতে বাণ লাগিয়ে লক্ষ্যভেদ করে ফেলেছিল আর কী! যাকে দেখে পাণ্ডবেরা পর্যন্ত ধরে নিয়েছিলেন—এই বুঝি লক্ষ্য-বিদ্ধ হল। তিনি কর্ণ, যাঁকে সমবেত সমস্ত রাজমণ্ডলীর সামনে দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করে বললেন—সুতপুত্রের গলায় মালা দেব না আমি—নাহং বরয়ামি সূতম্। ইতিহাসকে যাঁরা নীচে থেকে দেখেন—History from below—তাঁদের, এই ঘটনাটা মনঃপুত হবে না। হবেই বা কেন—সমাজের পর্যায়ভুক্তিতে কর্ণ সুতপুত্র, কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় তার কী? কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তো প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন—যিনিই লক্ষ্যভেদ করবেন, তিনিই পাবেন আমার ভগিনীকে, মিথ্যে বলছি না বাপু—তস্যাদ্য ভার্যা ভগিনী মমেয়ং কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মৃষা বদামি। সমাজের উচ্চবর্ণে না জন্মানোর যন্ত্রণা কর্ণকে সাভিমানে সইতে হল শুধু সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে। কিন্তু মশাই! নারী স্বাধীনতা! সে ব্যাপারে কী বলবেন? সমাজের বিচারে স্ত্রীলোকের অবস্থা তো অতি করুণ ছিল বলে শুনি। কিন্তু বাপভায়ের প্রতিজ্ঞায় তুড়ি মেরে উন্মুক্ত সভার মধ্যে দ্রৌপদী যে নিজের পছন্দ-অপছন্দ পরিষ্কার জানালেন, তাতে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, সেকালের নারী সমাজের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস একেবারে নিরঙ্কুশ বা সর্বাঙ্গীন হতে পারে না। অত্যাচার ছিল, এবং এখনও আছে। কিন্তু তারই মধ্যে কোথাও বা ছিল মুক্তির বাতাস, কোথাও বা স্ব-অধীনতাও।

দ্রৌপদীর এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণীর এক ধরনের মিল আছে। রুক্মিণীর বাবা ভীষ্মক এবং ভাই রুক্মী সেকালের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলেন। রুক্মিণী তার শোধ নিয়েছেন একেবারে পালিয়ে গিয়ে, নিজের পছন্দে বিয়ে করে। দ্রৌপদীও বাপ-ভায়ের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখেননি এবং আপন স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞা এবং কর্ণকে প্রত্যাখ্যান—এ-সব কিছুর মধ্যেই একটা রহস্য আছে, যে রহস্য আগে বোঝা প্রয়োজন। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে, সেকালের স্বয়ম্বর সভায় বীর-বরণের ক্ষেত্রে কন্যার ইচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেলেও সব জায়গায় কন্যার ইচ্ছেই শেষ কথা ছিল না। রাজনীতির চাল ছিল। ছিল সামাজিক মান মর্যাদার প্রশ্নও। যেমন ধরুন রুক্মিণীর স্বয়ম্বরের আগেই যে তাঁর বাপ-ভাই শিশুপালকে রুক্মিণীর বর হিসেবে পছন্দ করেছিলেন—এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ম্বর সভা অনেক সময় প্রহসনে পরিণত হত। অবশ্য রুক্মিণীর বাপ-ভাই যে শিশুপালকে মনস্থ করেছিলেন তার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল। কারণ ছিল—শিশুপালের পৃষ্ঠপোষক দুর্ধর্ষ জরাসন্ধকে সন্তুষ্ট রাখার। এ-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকুই প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক কারণে পিতা এবং ভ্রাতা অনেক সময়ই তাঁদের মতামত চাপিয়ে দিতেন স্বয়ম্বরা বধূটির ওপর। সৌভাগ্যের কথা, দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে তাঁর বাপ ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর মতামতের মিল ছিল এবং সেই কারণেই—এবং এটা অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ—দ্রৌপদীর কর্ণ-প্রত্যাখ্যান আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয় না।

একটা জিনিস খেয়াল করুন। মহাভারতকার দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পূর্বাহ্ণেই জানিয়েছেন যে, দ্রুপদ রাজার ভারী ইচ্ছে ছিল যাতে পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গেই তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়—যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে। কৃষ্ণাং দদ্যামিতি...। ব্যাস লিখেছেন, দ্রুপদ সবসময় মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেও বাইরে এ-কথা কখনও প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এ-কথা জানি যে, অন্য কোথাও প্রকাশ না করলেও পিতার মনোগত ইচ্ছা বউ-ছেলে-মেয়ে ঠিকই

জানতে পারে। আমাদের দৃঢ় ধারণা—দ্রৌপদী পিতার ইচ্ছে জানতেন। সৌভাগ্যবশত পিতার ইচ্ছের সঙ্গে দ্রৌপদীর ইচ্ছের মিল ছিল, এবং তার কারণও আছে। আমরা যে ঠিক কথা বলছি তার আরও দুটো কারণ আছে। প্রথমত বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যুর কথা যথেষ্ট চাউর হয়ে গেলেও দ্রুপদ সে-কথা বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। বিশ্বাস করতেন না বলেই ব্যাস লিখেছেন যে, পাণ্ডব অর্জুনকে তিনি খুঁজছিলেন—সো'ন্বেষমাণঃ কৌন্তেয়ং—এবং প্রধানত তাঁর কথা মনে রেখেই তিনি স্বয়ম্বরের জন্য সেইরকম অসামান্য একখানি ধনুক তৈরি করিয়েছিলেন। তৈরি করিয়ে ছিলেন সেই রকম কৃত্রিম যন্ত্র যা কেউ ভেদ করতে না পারে। দ্রুপদ জানতেন—তাঁর মেয়ের স্বয়ম্বরে অংশ গ্রহণ করাটা মর্যাদার ব্যাপার—এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল অর্জুন যদি কোথাও থাকেন, তাহলে এই বিরাট স্বয়ম্বর উৎসবে তিনি আসবেনই। দ্বিতীয়ত, খেয়াল করুন ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা। পিতার ইচ্ছে তিনি নিশ্চয় জানতেন এবং অর্জুনের সমকক্ষ বীর যে একমাত্র কর্ণ—তাও তিনি জানতেন। ঠিক এই কারণেই তাঁর ভগিনী সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটু প্যাঁচ ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেছিলেন—মিথ্যে বলছি না বাপু, আমার ভগিনী তাঁরই ভার্যা হবেন, যিনি এই লক্ষ্যভেদের মতো মহৎ কর্মটি করবেন। তবে তিনি কেমনটি হবেন? যিনি নাকি—কুলেন রূপেন বলেন যুক্তঃ—অর্থাৎ সেই মানুষটি, যাঁর বংশ-মর্যাদা, রূপ এবং বীরত্ব—সবই আছে। কাজেই যিনিই লক্ষ্যভেদ করবেন তিনিই আমার বোনের স্বামী হবেন—কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যেও একটু কথার ফাঁক ছিল, এবং দ্রৌপদী যে সূতপুত্রকে মর্যাদার প্রশ্নে প্রত্যাখ্যান করলেন, তাতে আমরা তাই খুব একটা আশ্চর্য বোধ করি না। বিশেষত মহারাজ দ্রুপদ অর্জুনকে খুঁজছিলেন—এই নিরিখে, অপিচ ধৃষ্টদ্যুম্ন লক্ষ্যভেদের ক্ষমতার সঙ্গে লক্ষ্যভেত্তা পুরুষের কুলমর্যাদা এবং রূপও চাইছেন এই নিরিখে—আমরা তো ধারণা করি যে দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত ছিলেন। এমন কী তাঁকে শেখানোও হয়ে থাকতে পারে যে কূটনৈতিক কারণে কর্ণকে স্বয়ম্বর-সভায় নেমন্তন্ন করতে হয়েছে বটে, কিন্তু দ্রৌপদীকে এ ব্যাপারটা সভাতেই সামলাতে হবে। দ্রৌপদী সামলে দিয়েছেন, এবং অর্জুন ছাড়া একমাত্র বীর যিনি এই লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন, তিনি অসম্মানে বঞ্চিত হলেন।

যাক, বড় বড় বীরেরা যখন হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসে হাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। তিনি আর থাকতে পারলেন না। বসে থাকা সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে রমণীর বরমাল্যের আশায় হঠাৎ করে উঠে আসতে অর্জুনের সংকোচ হচ্ছিল নিশ্চয়ই। কাজেই তাঁদের কারও বা অস্বস্তি এবং কারও বা বিরক্তি জন্মিয়েই উঠে পড়লেন অর্জুন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর এক অদ্ভুত মিশ্রক্রিয়া হল। কিছু উদ্যমী ব্রাহ্মণ একেবারে হই-হই করে উঠলেন, তাঁরা তাঁদের পরনের অজিন খুলে রুমালের মতো উড়িয়ে—বিধুন্বন্তো'জিনানি চ—অর্জুনকে 'চিয়ার আপ' করতে থাকলেন। কিন্তু মধ্যপন্থী ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা একটু বে-ভরসা গোছের, তাঁরা বলতে থাকলেন—কর্ণ শল্য রসাতলে গেল, আর এই দুবলা বামুন—প্রাণতো দুর্বলীয়সা—বেটা বলে কিনা ধনুক তুলব। সমস্ত রাজমণ্ডলের সামনে আজ বামুনদের মাথা হেঁট করে দেবে এই বিটলে ছেলেটা—অবহাস্যা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্বরাজসু। চিন্তিত ব্রাহ্মণেরা বললেন—ভাল চাও তো চেপে বসে পড় এখানে। অর্জুন থামলেন না দেখে, তাঁরা অন্যদের বললেন—প্রেমানন্দেই হোক, অহঙ্কার বশেই হোক কিংবা চপলতা বশে—ছেলেটা যে ধনুক বাঁকাতে যাচ্ছে ওকে বারণ করুন, যেন না যায়—বার্যতাং সাধু মা গমৎ।

এই যে কথাগুলি বললেন—এঁরা হলেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বে-ভরসা দলের, মহাভারতকার যাঁদের বলেছেন—বিমনসঃ। কিন্তু অর্জুন উঠতে যাঁরা বেশ খুশি হলেন—মুদান্বিতাঃ—তাঁরা উদ্যমী হয়ে বললেন—মাথাও হেঁট হবে না, মানও খোয়াবে না। ছেলেটার চেহারা দেখেছ; হাতের গোছা আর কাঁধের গুলিগুলো দেখেছ? তার ওপরে ছেলেটার উৎসাহ দেখলে বোঝা যায় যে, এর সম্ভাবনা আছে। ক্ষ্যামতা না থাকলে কি আর এমনি এমনি উঠে গেল—ন হি অশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ। রোগা হলেও এই ব্রাহ্মণদের খুব মনের জোর আছে। এঁদের ধারণা বামুনের অসাধ্য কিছু নেই, হোক না

বামুন ফলাহারী, উপোসী, ব্রতধারী। জল খায় আর হাওয়া খায় বলে—অব্‌ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ—তারা কি সব মরে গেছে নাকি, বামুন নিজের তেজেই বামুন।

ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের ঘাড়ে চেপে রোগা বামুনেরা যতক্ষণ মুখ এবং হস্তব্যায়াম করছিলেন, ততক্ষণে অর্জুন ধনুকের কাছে পৌঁছে গেছেন এবং দ্রুপদের যন্ত্র-লক্ষ্যও ভেদ করে দিয়েছেন। আর যায় কোথা, ক্ষত্রিয়দের লজ্জা দিয়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের উতলা উত্তরীয়গুলি আকাশে বিজয়ধ্বজের মতো উড়িয়ে দিলেন। দেবতাদের মুগ্ধ পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে সুকুমারী দ্রৌপদী মধুর এক সমর্থনের হাসি হেসে—উৎস্ময়ন্তী—ব্রাহ্মণবেশীর গলায় সাদা ফুলের বরমাল্যখানি দুলিয়ে দিলেন। তখনও তিনি জানেন না—ইনিই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন—গাণ্ডীবধন্বা। আমাদের ধারণা, বিবাহলগ্নে এই যে তিনি ব্রাহ্মণবোধে জীবনসঙ্গী বেছে নিলেন, এইখানেই তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সারাজীবনই তাঁর কেটেছে বনবাসিনী ব্রাহ্মণ-বধূর মতো। রাজোচিত সুখভোগ তাঁর কপালে জোটেনি, যাও জুটেছে তাও কণ্টকহীন নয়। বনবাস আর অজ্ঞাতবাসে তাঁর যৌবন শুধু ব্রাহ্মণ্যের আদর্শধূলিতে ধূসর। সাময়িকভাবে ভিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণবেশীরা কুটিরে ফিরে গিয়ে তাঁর বধূ-পরিচয় করিয়েছে ভিক্ষার পরিচয়ে। মহাভারতকার এই পরিচয় লগ্নটি লক্ষ করে বলেছেন—পাণ্ডবেরা যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে ভিক্ষা বলে পরিচয় দিলেন—ভিক্ষেতি অথাবেদয়তাম্। পাণ্ডবেরা সারা জীবন এই ভিক্ষার ঝুলি বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, আর যিনি স্বয়ং ভিক্ষা তাঁর সঙ্গে অন্য পাঁচজন ব্যবহারও করেছেন ভিক্ষার মতো।

অথচ দ্রৌপদীর বিবাহলগ্নে ঘটনাগুলি এইরকম ছিল না। এই অসামান্য রমণীর বরমাল্য ভিক্ষার জন্য দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলেন সেকালের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজারা। ঠিক সেই অর্থে পাণ্ডবরা তখনও প্রতিষ্ঠিত নন, কারণ তাঁরা তখনও হস্তিনাপুরের সামান্য দাবিদার মাত্র, রাজা নন। তবে যদি সম্ভাবনার কথা ধরা যায়, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে, ভীমার্জুনের শক্তিমত্তার কথা তখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং এই সম্ভাবনাকে মূলধন করেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দ্রুপদরাজার রাজনৈতিক বুদ্ধি পরিচালিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যাঁর সঙ্গেই দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীর মেলবন্ধন ঘটবে তাঁর সঙ্গে পাঞ্চাল রাজ্যেরও সুসম্পর্ক হবে—এ তো জানা কথা। রাজনৈতিক অবস্থানে দ্রুপদের অবস্থা তখন ভাল নয়। তাঁর অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডব-কৌরবের গুরুদক্ষিণার সময়েই দ্রোণের করগত। দ্রোণ কৌরবসভায় গুরুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে উষ্ণ সম্মানে কুরুকুলের হিতাকাঙ্ক্ষীর আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য ভীষ্মের ওপরেও দ্রুপদের ক্ষোভ থাকতে পারে। অন্যদিকে পাণ্ডবেরা যে জ্ঞাতিদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন এবং বারণাবতে তাঁদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও হয়েছিল—এ খবর দ্রুপদ রাখতেন। বস্তুত যে বালকবীর অর্জুন তাঁকে বেঁধে এনে দ্রোণাচার্যের কাছে দাঁড় করিয়েছিল, তার ওপরে দ্রুপদের রাগ ছিল না, রাগ ছিল দ্রোণের ওপরেই। কাজেই দ্রুপদ যে মনে মনে দ্রৌপদীকে অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেও কিন্তু আরেক প্রতিশোধ স্পৃহা—যে প্রতিশোধ-স্পৃহায় পূর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে। খেয়াল করে দেখুন কুরুকুলের বর্ম-আঁটা দুই প্রধান পুরুষ মহারথ দ্রোণ এবং ভীষ্ম—এই দুজনেরই হন্তা কিন্তু দ্রুপদের ঘরেই জন্মেছে—একজন ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যজন শিখণ্ডী। একজন যদি দ্রোণবধের নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকেন, তো ভীষ্মবধের নিমিত্তও শিখণ্ডী। দুজনকেই নিমিত্ত বলেছি এই কারণে যে, অর্জুন না থাকলে এই দুজনেরই বলবীর্য এমনকী শিখণ্ডীর ক্লীবত্বও বিফলে যেত। কাজেই দ্রোণাচার্যের আদেশ মাত্রে যে ছেলেটির হাতে দ্রুপদ বাঁধা পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলে যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে দ্রুপদের সুবিধা ছিল, একথা সবাই বোঝে।

আমাদের ধারণা, পাণ্ডবেরা যে বারণাবতে জতুগৃহদাহ থেকে কোনওক্রমে বেঁচে গেছেন, এ-কথা দ্রুপদ কোনও ভাবে শুনেছিলেন, না হলে ধনুক বানাবার আগে তিনি অর্জুনকে খুঁজবেন কেন—সো'ন্বেষয়ানঃ কৌন্তেয়ম্। দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদীর বিয়ের পর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের কুমোরশালা থেকে লুকিয়ে সব জেনে এসে দ্রুপদকে বললেন—এঁরা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়, শুধু তাই নয় এঁরাই পাণ্ডব। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবার বললেন—পাণ্ডবেরা জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে ফিরেছেন—এই রকম

একটা কথা শুনে আমরা যে আশান্বিত হয়েছিলাম—সে আশা আজ সম্পূর্ণ ফলবতী হল—আশা হি নো ব্যক্তমিয়ং সমৃদ্ধা মুক্তান্ হি পার্থান্ শৃণুমো' গ্নিদাহাৎ। তাহলে পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন—এ রকম এক খবর রাজ্যে রাজ্যে ছিল, এবং হয়তো দ্রৌপদীর সয়ম্বর-সংঘটন এই কারণেই যে, পাণ্ডবেরা এমন খবর শুনে ঘরে বসে থাকবেন না। আর সত্যিই তো তাই। সেই কবে ব্যাসদেব জানিয়ে যাচ্ছেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে, আর পাণ্ডবদের মনে নববধূর নিত্য আসা-যাওয়া ঘটছিল। সেই কবে ধৌম্য পুরোহিতকে তাঁরা বরণ করে নিলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডবদের মনে হল এবার ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখতে যাব—মেনিরে সহিতা গন্তুং পাঞ্চাল্যাস্তং স্বয়ম্বরম্‌। এ যেন বরপক্ষের পুরোহিত ঠিক হয়েছে, আর পাণ্ডবেরা চললেন বধূ বরণ করতে।

দ্রুপদের মনে যেমন ধারণা ছিল যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সম্ভাবনা ঘটলে পাণ্ডবেরা আর কিছুতেই আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন না, ঠিক এই ধারণাটা ছিল আরেকজন মানুষেরও—তিনি কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর তাঁর কাছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে-কথা আমি অন্যত্র বিস্তারিত লিখেছি। এখানে শুধু এইটুকুই বলব যে, কংসকে হত্যা করার পর কৃষ্ণ এবং তাঁর যাদব-সেনার উপর জরাসন্ধের আক্রোশ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, কারণ কংস ছিল জরাসন্ধের জামাই এবং জরাসন্ধ ছিলেন তাঁর কালের অবিসংবাদিত নেতা। হরিবংশে দেখা যাবে, জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর পুচ্ছভাগে দুর্যোধন ইত্যাদি কৌরবরাও সামিল হয়েছেন—কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কোনও সমবেত আক্রমণে জরাসন্ধকে সাহায্য করার জন্য—দুর্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ। অন্যদিকে উদীয়মান নেতা কৃষ্ণ একটু একটু করে জরাসন্ধের দিকে এগোচ্ছিলেন। কারণ, জরাসন্ধের বিনাশ না হলে যাদব-বৃষ্ণি-কুলের কোনও স্বস্তি ছিল না। কৃষ্ণ কৌরব-পাণ্ডবের জ্ঞাতিভেদের কথা জানতেন, বিশেষত পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্বন্ধসূত্র থাকায় তিনি চাইছিলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডবেরাও একটা শক্তি হয়ে দাঁড়ান। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে—বারণাবতে পাণ্ডবদের পুড়ে মরার কথা শুনে কৃষ্ণ ছুটে এসেছিলেন সেখানে। যে কোনও কারণেই হোক, তাঁকে হঠাৎ করে দ্বারকায় ফিরে যেতে হল পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করেই, যেন ওইটাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, শ্রাদ্ধকল্পের পরেও তিনি সাত্যকিকে বলে গেলেন পাণ্ডবদের অস্থি-সঞ্চয় করতে—কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডূনাং ন্যযোজয়ত সাত্যকিম্। স্পষ্টতই বোঝা যায় কৃষ্ণ যে ধরনের মানুষ তাতে যাচাই না করে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেবার লোক তিনি নন। তা ছাড়া পাণ্ডবদের মৃত্যুর কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। সাত্যকিকে অস্থি সঞ্চয় করতে বলা মানেই হল—হয় তুমি মৃত পাণ্ডবদের অস্থি সঞ্চয় করে দেখাও, নয়তো জীবিত পাণ্ডবদের পাত্তা লাগাও। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদের লাক্ষাগৃহ-মুক্তির খবর শত চেষ্টাতেও চেপে রাখতে পারেননি। কানাঘুসা চলছিলই, এবং মহারাজ দ্রুপদ, কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন কানাঘুসাতেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন, সাত্যকিও নিশ্চয়ই এই কানাঘুসার খবর কৃষ্ণকে জানিয়ে থাকবেন। কৃষ্ণও তাই দ্রুপদের মতোই ধারণা করেছেন যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের মতো ঘটনা ঘটলে পাণ্ডবেরা কিছুতেই আত্মগোপন করে থাকবেন না, তাঁদের দেখা যাবেই। কৃষ্ণের অনুমান পুরোটাই ঠিক। পাণ্ডবেরা এসেছিলেন। বিবাহসভা এবং ধনুর্বেধের হই-হট্টগোলের মধ্যেই ছাই-চাপা আগুনের মতো ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের কৃষ্ণ ঠিকই চিনেছিলেন—ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্। চেনাটা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। কারণ, পাঞ্চালের সঙ্গে পাণ্ডবদের মেলবন্ধন ঘটলে উভয়েই শক্তিশালী হবেন, এবং তাঁর প্রধান শত্রু জরাসন্ধের বিরুদ্ধে সে-জোট কাজে আসবে।

পাণ্ডবেরা কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম কাউকেই চিনতে পারেননি। কারণ এই নয় যে, ভিড়-ভাট্টা কোলাহল। যখন প্রথম দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় এলেন, সবাই তখন একযোগে, একদৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ সেই অবস্থাতেই পাণ্ডবদের চিনে ফেলেছিলেন, দাদা বলরামকে চিনিয়েও দিয়েছিলেন। অথচ পাণ্ডবেরা স্বরূপে থাকা কৃষ্ণকেও চিনতে পারেননি। দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন বিভিন্ন রাজ-নাম কীর্তনের সময় কৃষ্ণ-বলরামের কথা বলেও ছিলেন। কিন্তু কে দেখে তাঁদের? কে দেখে রাজাদের? সবাই যেমন তখন দ্রৌপদীকেই দেখছিল, ঠোঁট কামড়াচ্ছিল,

পাণ্ডবেরাও তখন প্রায় সেই কাজেই মত্ত ছিলেন। ব্যাসদেবকে তাই লিখতে হয়েছে—দ্রৌপদীকে দেখে পাণ্ডবেরা সবাই একেবারে কামমোহিত হয়ে পড়েছিলেন—তাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য তদা স্ম সর্বে কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ। এই ফুলশরের আঘাতে মূর্ছিত অবস্থা চলেছে একেবারে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত।

দ্রুপদ-সভার ঘটনাটা যখন পাণ্ডবেরা মাকে বলেন, তার মধ্যে রসিকতার ভাগই ছিল বেশি। কিন্তু কুন্তী যখন দেখলেন ভিক্ষা বলতে জলজ্যান্ত আগুনপানা এক সুন্দরী, তখন তিনি কী করেন? অন্যদিকে মায়ের ভিক্ষা-ভাগের আদেশ প্রত্যেক ভাইয়ের কাছেই এত ইচ্ছাপূরক ছিল যে, ততক্ষণ দ্রৌপদীকে নিয়ে প্রত্যেক ভাইয়েরই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে; মনে মনে পাঁচ ভাই-ই নিশ্চয় খুশি। যুধিষ্ঠির অবশ্য বললেন যে, সুন্দরী কৃষ্ণাকে বিয়ে করার প্রথম হক অর্জুনের, কারণ দ্রুপদের পণ জিতেছেন তিনিই। কিন্তু অর্জুন বীরোচিত ভদ্রতায় যুধিষ্ঠির অথবা ভীমকেই প্রথম সুযোগ দিতে চাইলেন, কারণ তাঁরা বড় ভাই। ঠিক এই মুহূর্তটা ছিল কিন্তু ভীষণ করুণ। পাঁচ পাঁচজন যুদ্ধবীরের চোখ তখন কৃষ্ণা পাঞ্চালীর দিকে। প্রত্যেকে একবার দ্রৌপদীর দিকে তাকান, আরেকবার ভাইদের দিকে। সবার হৃদয়ে তখন সুন্দরী কৃষ্ণা, পঞ্চবীর পাণ্ডবেরা তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন—হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্। মনে মনে বোধ হয় এঁদের একটু ভয়ও ছিল। যে রমণী উন্মুক্ত রাজসভায় সূতপুত্র কর্ণকে অত্যন্ত কটুভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি যদি এখন বলে বসেন—আমাকে যিনি জিতে এনেছেন, আমি তাকেই চাই, তা হলে কী হবে! পাণ্ডবদের ভাগ্য ভাল, দ্রৌপদী সে-কথা বলেননি। বরঞ্চ পাঁচ ভাইয়ের টেরা চোখের চাউনিতে এবং অর্জুনের বদান্যতায় দ্রৌপদী তখন ক্ষণিক বিব্রত। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন—অর্জুনের উপরোধে এখন যদি জ্যেষ্ঠটির, মানে, ওই ধর্মমার্কা যুধিষ্ঠিরের গলায় মালা দিতে হয়, তার চেয়ে একদমে পাঁচজনকে সামলানো অনেক ভাল—অন্তত তার মধ্যে তো অর্জুন থাকবেন। সেই অর্জুন, যিনি তাঁর যুবতী হৃদয়ের প্রথম অতিথি, সেই অর্জুন যিনি সবার মধ্যে সবলে জিতে এনেছেন তাঁকে।

যুধিষ্ঠির এতক্ষণ ভাইদের মুগ্ধ চোখগুলি আর মদনাহত চেহারা লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। এইবার তাঁর মহর্ষি দ্বৈপায়নের কথা মনে পড়ল। ঋষি না বলেছিলেন—তোমাদের পাঁচজনের স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী, এইটাই বিধাতার বিধান—নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা। কিন্তু কেন এমনটি বলেছিলেন ঋষি—সেকথা পৌরাণিকের দিক থেকে একরকম, যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে অন্যরকম। পৌরাণিক দার্শনিকেরা পোড়ো বাড়ির দরজা আর খ্যাপা হাওয়াকে এমনভাবে মেলান যে, পাঠকের মনে হবে খ্যাপা হাওয়ার জন্যেই বুঝি বা বাড়িটার অমন পড়-পড় অবস্থা। এর অভিশাপ, তার তপস্যা, অমুকের পূর্ব জন্মের সামান্য ঘটনা—সব পুরাণকারেরা মিলিয়ে দেন, এবং কপাল ভাল থাকলে দার্শনিকের সায়-সম্মতিও জুটে যায় তাতে। দ্রৌপদীর বেলাতেও তা জুটেছে। কেমন করে জুটেছে, তার আগে ব্যাসের অনুভবে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের গল্পটা শোনাই, তারপর দর্শন।

ব্যাস দ্রৌপদীর বিয়ের অনেক আগে পাণ্ডবদের বলেছিলেন যে, পূর্বজন্মে দ্রৌপদী ছিলেন এক ঋষির কন্যা। পরমা রূপবতী; এমনকী এই ঋষিকন্যা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার কোমরের মাঝখানটা যে কোথায় সেঁটে থাকে তা বোঝাই যায় না—বিলগ্নমধ্যা সুশ্রোণী সুভ্রূঃ সর্বগুণান্বিতা। এ হেন সুন্দরী মেয়েরও দুর্ভাগ্য হল স্বকৃত কর্মদোষ, যাতে তার বিয়েই হল না, জুটল না মনোমত বর। সে তখন তপস্যা আরম্ভ করল ভগবান শংকরের। তুষ্ট ভগবান বর দিতে চাইলে কন্যা সর্বগুণে গুণী এক পতি চাইলেন। পাছে ভোলেভালা শিব কন্যার আকাঙ্ক্ষা না বোঝেন, তাই সে বারবার ইচ্ছেটি পরিষ্কার করে জানাল। কিন্তু ঈশ্বর, বিশেষত বরদ ঈশ্বরের কাছে বৃথা কথা চলে না। যা বক্তব্য যা ঈপ্সিত তা একেবারেই স্পষ্ট করে তাঁকে জানাতে হয়। অতএব শিব বললেন—তুমি যেহেতু পাঁচবার স্বামী চেয়ে বর মেগেছ, তাই তোমার বরও হবে পাঁচটা। পূর্বজন্মের ঋষিকন্যা এতদিন বিয়ে না করে থাকার ক্ষোভেই যেন বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা আপত্তিতে পঞ্চস্বামী-সম্ভোগের কথা মেনে নিয়ে বললেন—এবম্ ইচ্ছামি—তাই হোক প্রভু, তোমার দয়ায় তাই হোক—এবমিচ্ছাম্যহং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ পতিং প্রভো।

এই যে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মে পাঁচবার বর চেয়ে পাঁচ স্বামী লাভ করার ঘটনা ঘটল, তাতে এক মহা সমস্যা হয়েছে দার্শনিকদের। অবশ্য তাঁদের আসল সমস্যাটা আরও গভীরতর। তাঁরা বললেন—যজ্ঞাদির বিনিয়োগে এমন কথা তো পাওয়া যায় যে, 'সমিধ যজন করছে', 'তনূনপাত্ যজন করছে'—সমিধো যজতি, তনূনপাত্ যজতি। এক্ষেত্রে 'যজতি' অর্থাৎ যজন করার ব্যাপারটা কি আলাদা আলাদা পাঁচবার বোঝাবে, নাকি একবার? মীমাংসক দার্শনিকেরা কিন্তু বেদের বিনিয়োগমন্ত্রগুলিতে বেশির ভাগ সময়েই আক্ষরিক অর্থে ধরেন এবং সেই নিরিখেই তাঁরা বললেন—যজন করার ব্যাপারটা যখন পাঁচবার উচ্চারণ করা হয়েছে, তখন ওই যজ্ঞের ভাবনা কিংবা যজ্ঞীয় কর্মে ভেদ একটা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ একের মধ্যেও একটা বিভিন্নতা আছে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা 'পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান' বলে একটি পুরাকাহিনী স্মরণ করেছেন। কাহিনীটি আর কিছুই নয়, সেই তপস্যা করতে করতে বুড়ো হয়ে যাওয়া দ্রৌপদীর কাহিনী। দার্শনিকদের মতে এখানে দেবতা একটাই, এবং তিনি হলেন প্রধান দেবতা ইন্দ্র।

বেদের কাহিনীতে ত্বষ্টার ছেলেকে বধ করার সময় ইন্দ্রের তেজ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, বল প্রবেশ করেছিল বায়ুতে আর তাঁর রূপ প্রবেশ করেছিল দুই অশ্বিনীকুমারের মধ্যে। অর্ধেকটা অবশ্য ইন্দ্রের নিজের মধ্যেই ছিল। অতএব একই ইন্দ্রের ধর্মাংশ কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম দিলেন। বল স্বরূপ বায়ু-অংশ মহাবলী ভীমের জন্ম দিলেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় মাদ্রীর গর্ভে জন্ম দিলেন নকুল আর সহদেবকে। এঁরা দুজনেই ইন্দ্রের রূপ-স্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সন্তান বলে অত্যন্ত রূপবান বলে পরিচিত। ইন্দ্র স্বয়ং তাঁর আপন অপ্রতিম অর্ধ দিয়ে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম দিলেন। তা হলে এই পাঁচজনই ইন্দ্রের অবয়ব এবং ইন্দ্র থেকেই জন্মলাভ করায় এক এবং অদ্বিতীয় ইন্দ্রই এঁদের মূল জন্মদাতা—পঞ্চাপীন্দ্রাবয়ব-প্রকৃতিত্বাদ্ ইন্দ্রা এবেতি পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানে।

দার্শনিকের এই উদার দৃষ্টিতে অবশ্য দ্রৌপদীর ওপর অসতীত্বের সেই চিরন্তন আরোপ অনেকটাই কমে যায়। এমনকী অর্জুনের লক্ষ্যভেদও অনেক বেশি সযৌক্তিক হয়ে ওঠে এই সুবাদে, কারণ ইন্দ্রের অর্ধাংশই রয়েছে অর্জুনের মধ্যে। কিন্তু দ্রৌপদীর ওপর অসতীত্বের আরোপ যতই কমুক, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে ইন্দ্র যদি একাও জন্মে থাকেন, তবু বাস্তবে তাঁর ওই পঞ্চ-অবয়ব-বিশিষ্ট পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতারা কিন্তু কেউই নিজের নিজের অধিকার ছাড়েননি। কাজেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব অর্জুন যেই প্রত্যাখ্যান করলেন, যেই অর্জুন বললেন অগ্রজদের অনুক্রম নষ্ট করে এখনই তাঁর বিয়ে করা সাজে না ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরা প্রত্যেকে অনিমিখে দেখছিলেন দ্রৌপদীকে—দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ। প্রত্যেকেই একবার চকিতে তাকিয়ে-থাকা দ্রৌপদীকে দেখেন, আরেকবার অন্যভাইদের দেখেন। হ্যাঁ, দ্বৈপায়ন ঋষির বিধান—পাঁচ জনেরই স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী—এই অনুজ্ঞা যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ল বটে, কিন্তু ভাইদের ভাবগতিক এবং তাঁদের মুখের চেহারায় তাৎক্ষণিক পরিবর্তনই যুধিষ্ঠিরের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল—তেষাম্ আকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ব্যাসের বচনের থেকেও তাঁর বেশি মনে হল—যদি শেষে সুন্দরী কৃষ্ণার কারণে ভাইতে ভাইতে বিবাদ লাগে! যুধিষ্ঠির ভাইদের মুখগুলি দেখে বুঝলেন—ভাইদের একজনও যদি কৃষ্ণার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হন, তা হলে তাঁদের মনে জন্মাবে সেই অর্ন্তদাহ, যা তাঁদের পাঁচ ভায়ের একজোট ভেঙে দেবে। অতএব ভাই-ভাই ঝগড়া হওয়ার চেয়ে—মিথো ভেদভয়ান্নৃপঃ—যুধিষ্ঠির মায়ের প্রস্তাবই মেনে নিলেন। ঠিক হল পাঁচজনেরই ঘরণী হবেন দ্রৌপদী। অবশ্য প্রথম বাধাটা এল মহারাজ দ্রুপদের দিক থেকেই।

অজ্ঞাতকুলশীল জামাতার খোঁজ ভাঁজ করার জন্যে দ্রুপদরাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে আনুষ্ঠানিক বিবাহপর্বের জন্য তাঞ্জামও পাঠিয়েছেন। সবাই যখন দ্রুপদসভায় উপস্থিত তখন দ্রুপদ বললেন—তা হলে অর্জুন এবার কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ। আমারও যে একটা সম্বন্ধ ঠিক করতে হয়, আমি সবার বড়। দ্রুপদ থতমত খেয়ে, তা তো বটেই, তা তো বটেই—এমনি একটা ভাবে যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিত বুঝে বললেন—তা হলে আপনিই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন, কিংবা আপনাদের মধ্যে অন্য কেউ...। যুধিষ্ঠির বললেন—কৃষ্ণা

আমাদের সবারই ঘরণী হবে। বিশেষত অর্জুন এই মহারত্ন জয় করেছে, আমরা ঠিক করেছি আমরা সবাই এই রত্নের অংশীদার হব—এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহ ভোজনম্। দ্রুপদ আকাশ থেকে পড়লেন। আরক্ত মুখে বললেন—এক পুরুষের অনেক বউ থাকে শুনেছি, কিন্তু এক বউয়ের অনেক স্বামী—অসম্ভব। এ তোমার কেমন বুদ্ধি বাপু? ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন—এরকমটি হলে ছোট ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে বড় ভাই—যবীয়সঃ কথং ভ্রাতুঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা...উঃ আমি আর ভাবতে পারছি না। ঠিক এই সময়ে রাজভবনে উপস্থিত হলেন ব্যাস। তিনি পুরা-কাহিনী শোনালেন। পাণ্ডবদের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত প্রকট করলেন। জানালেন দ্রৌপদীর পূর্বজন্ম-কথাও। দ্রৌপদী নাকি পূর্বজন্মে ছিলেন এক ঋষির কন্যা—রূপবতী, পতিপ্রার্থিনী। তিনি তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করে পাঁচবার একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ঠাকুর আমাকে মনের মতো বর দিন। যেহেতু পাঁচবার, অতএব শিব বললেন তোমার পাঁচটা স্বামী হবে। ব্যাস বললেন—শিবের সেই কথা আজ ফলতে চলেছে। ভগবান শংকর, মহামতি ব্যাস—এঁদের ওপরে আর কথা চলে না। শুভলগ্নে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ পাকে বাঁধা পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী।

কুমারিল ভট্ট, যিনি ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম খ্রিস্টাব্দের ধুরন্ধর মীমাংসক পণ্ডিত বলে পরিচিত, তিনি তাঁর তন্ত্রবার্তিকে কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে মহাত্মা পুরুষদের আপন আত্মতুষ্টিও ধর্মবিষয়ে কোনও প্রমাণ হতে পারে কি না, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে অনেকের সঙ্গে পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের এক বউ দ্রৌপদীর কথা উঠেছে। পাঁচ ভাইকে পর্যায়ক্রমে সেবা করলে, দ্রৌপদী যে স্বৈরিণী বলে পরিচিত হতে পারেন এ প্রশ্ন তো দ্রৌপদীর বাপ-ভাইও তুলেছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বারবার সেখানে বলেছেন—আমরা পাঁচজনে বিয়ে করব, এইটাই ধর্ম—এষ ধর্মো ধ্রুবো রাজন্। ব্যাসের সামনেও যুধিষ্ঠির রীতিমতো আস্থা নিয়ে বলছেন—আমার কথা মিথ্যে হতে পারে না। তাই এখানে অধর্ম থাকতেই পারে না—বর্ততে হি মনো মে'ত্র নৈষো'ধর্মঃ কথঞ্চন। বোধ করি ধর্মময় যুধিষ্ঠিরের এই আত্মতুষ্টির প্রমাণ দেবার জন্যই কুমারিল তন্ত্রবার্তিকে দ্রৌপদীর কথা তুলেছেন। কিন্তু ঠিক এই কথাটা তোলার সময় আত্মতুষ্টির প্রসঙ্গ গেছে হারিয়ে। কুমারিল সরাসরি প্রশ্ন তুলে বলেছেন—পঞ্চ পাণ্ডবের এক বউ—কথাটা বিরুদ্ধ লাগতে পারে, কিন্তু স্বয়ং দ্বৈপায়ন তো সেকথা পরিষ্কার বুঝিয়েই দিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা কুমারিল যুধিষ্ঠিরের আত্মতুষ্টির প্রামাণিকতা বাদ দিয়ে দ্রৌপদীর জন্মে দৈববাদকেই প্রাধান্য দিলেন বেশি। তাঁর মতে যেখানে স্বয়ং দ্বৈপায়ন 'বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা' দ্রৌপদীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করেছেন, তিনি তো আর সাধারণ মানবী নন যে স্বৈরিণীর প্রসঙ্গ আসবে। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী এবং লক্ষ্মী যদি অনেকের দ্বারা ভুক্তা হন, তা হলে দোষও হয় না—সা চ শ্রীঃ শ্রীশ্চ ভূয়োভি-র্ভুজ্যমানা ন দূষ্যতি।

আমরা আজকের দিনে দুষ্টুমি করে ভট্ট কুমারিলকে বলতে পারতাম—মহাশয়! তা হলে লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা রাবণের দ্বারা দু'-একবার ভুক্তা হলে কী ক্ষতি হত, কিংবা লক্ষ্মী রুক্মিণী শিশুপালের অঙ্কশায়িনী হলেই বা কী ক্ষতি হত? তার ওপরে লক্ষ্মীর ভাগ স্বয়ং বিষ্ণুর। পাণ্ডবেরা কেউ তো তাঁর তেজে জন্মাননি? যা হোক, আপাত এইসব বিটকেল প্রশ্ন আমরা ভট্ট কুমারিলকে করতে চাই না, কারণ তিনি আমাদের দারুণ একটি খবর দিয়েছেন। কুমারিল মহাভারতের প্রমাণে জানিয়েছেন যে, সুমধ্যমা দ্রৌপদী প্রত্যেক পতিসঙ্গমের পরই আবার কুমারী হয়ে যেতেন—মহানুভবা কিল সা সুমধ্যমা বভূব কন্যৈব গতে গতে'হনি। পাঠক! আবার আপনি দ্রৌপদীর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি সত্যবতীর সঙ্গে দ্রৌপদীর মিল খুঁজে পেলেন। মহর্ষি পরাশরের সঙ্গে সঙ্গম হওয়ার পর সত্যবতী আবার তাঁর কুমারীত্ব লাভ করেছিলেন এবং তা পরাশরের বরে। দ্রৌপদীর কাহিনী কিন্তু আরও সাংঘাতিক, তিনি প্রতি সঙ্গমের পরেই কুমারীত্ব ফিরে পেতেন। আগেই যে শ্লোকটি উদ্ধার করেছি সেটি কিন্তু ভট্ট কুমারিলের লেখা। তন্ত্রবার্তিকের এই শ্লোকের সূত্র ধরেই মূল মহাভারতীয় শ্লোকটি তন্ত্রবার্তিকের টীকাকার সোমেশ্বর ভট্ট তাঁর ন্যায়সুধায় উদ্ধার করেছেন। এই শ্লোকটি আছে সেইখানেই, যেখানে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বৈদিক রীতিতে প্রথামাফিক বিয়ে হল।

ভগবান শংকর বলেছেন—তুমি পাঁচবার যেহেতু একই কথা বলেছ, অতএব তোমার স্বামী হবে পাঁচটি। কিন্তু যিনি পরজন্মে পঞ্চপতির মনোহারিণী হবেন, তাঁর বিদগ্ধতা, তাঁর বাস্তব-বোধই কি কম হবে! পূর্বজন্মের ঋষিকন্যা দ্রৌপদী বললেন—হোক আমার পাঁচটা বর, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তা হলে এই বরও দিতে হবে যে, প্রত্যেক স্বামী-সহবাসের পরই কুমারীত্ব লাভ করব আমি—কৌমারমেব তৎ সর্বং সঙ্গমে সঙ্গমে ভবেৎ। বারংবার এই কুমারীত্বলাভের মধ্যেই দ্রৌপদীর দৈবসত্তার সন্ধান পেয়েছেন দার্শনিক কুমারিল। তাঁর ধারণা, প্রধানত দ্রৌপদীর এই অমনুষ্যসুলভ কুমারীত্বের ভরসাতেই কৃষ্ণ কর্ণকে প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই যখন উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের দূতীয়ালি বিফল হল, তখন কৃষ্ণ ভাবলেন অন্তত কুরুপক্ষপাতী কর্ণকে যদি পাণ্ডবপক্ষে টেনে নেওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা সাফল্য আসে তাঁর অনুকূলে। কৃষ্ণ কর্ণকে তাঁর আসল জন্মরহস্য শোনালেন, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবে তাঁর রাজসিংহাসন প্রাপ্তির যোগ্যতাও ঘোষণা করলেন। কিন্তু টোপ হিসেবে কৃষ্ণ যাকে ব্যবহার করলেন, তিনি কিন্তু দ্রৌপদী। কৃষ্ণ বললেন—যুধিষ্ঠির তোমার মাথায় সাদা চামর দোলাবেন, ভীম ছাতা ধরে বসে থাকবেন, আর অনিন্দিতা দ্রৌপদী! ছ' বারের বার যথাকালে দ্রৌপদী উপনীত হবেন তোমার শয্যায়—ষষ্ঠে ত্বাং চ তথা কালে দ্রৌপদ্যুপগমিষ্যতি।

ভট্ট কুমারিল বলেছেন—মানুষের মধ্যে এই ধরনের কুমারীত্ব লাভ মোটেই সম্ভব নয় এবং দ্রৌপদীর এই কুমারীত্বের প্রামাণিকতা আছে বলেই কৃষ্ণ কর্ণকে প্রলোভিত করতে চেয়েছেন—অতএব বাসুদেবেন কর্ণ উক্তঃ...ইতরথা হি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ এবং বদেৎ। বস্তুত দ্রৌপদীর এই প্রাত্যহিক কুমারীত্ব নিয়ে ভট্ট মহোদয়দের যতই মাথাব্যথা থাকুক না কেন, আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই, এমনকী খোদ পঞ্চপাণ্ডবেরও কোনও মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরা দ্রৌপদীর অসামান্য রূপে মুগ্ধ ছিলেন, গুণে বশীভূত এবং বিদগ্ধতায় গর্বিত। এবং সেই মুগ্ধতা এমনই যে, রসিক সুজন মাত্রেরই তা চোখে পড়বে, যেমন পড়েছিল নারদমুনির। পাণ্ডবদের ভাবগতিক দেখেই বুঝি তিনি তিলোত্তমার জন্য সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন, এই দুই ভাইয়ের এত ভাব অথচ শুধু তিলোত্তমার রূপে মত্ত হয়ে তাদের ভাব-ভালবাসা সব চলে গেল—তস্যা রূপেণ সম্মত্তৌ বিগতস্নেহসৌহৃদৌ। কাজেই তোমরা যদি নিজেদের ভাল চাও, দ্রৌপদীর জন্য যাতে ভাই-ভাইয়ের ঝগড়া-ঝাঁটি না হয়—যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাৎ সর্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে, সেজন্য যা হোক একটা ব্যবস্থা কর। পঞ্চপাণ্ডব নারদের সামনেই প্রতিজ্ঞা করলেন—যে ভাই দ্রৌপদীর সঙ্গে থাকবে, তখন অন্য কোনও ভাই তার ধার মাড়াবে না। যদি অমন ঘটনা হয়েই যায়, তবে তাকে বারো বছরের জন্য বনে যেতে হবে। তাই সই, সহবাসের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হল।

অপরূপা দ্রৌপদীকে যিনি প্রথম প্রেম নিবেদন করার সুযোগ পেলেন তিনি হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। এটি দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্য না যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য—সে আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি, যুধিষ্ঠির, মানে যিনি মহা যুদ্ধকালেও স্থির থাকতে পারেন, তিনি আর কত উতলা হয়ে রমণীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারেন। বরঞ্চ যিনি তাঁকে লক্ষ্যভেদ করে জিতেছিলেন, যাঁর গলায় তিনি প্রথম বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সময়-সুযোগ আসার আগেই তাঁকে হারাতে হল। আমি বলি, যে ঘরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গে বসে আছেন, সে ঘরে অস্ত্র রাখা কেন। তুমি ক্ষত্রিয় মানুষ, ক্ষত থেকে ত্রাণ করাই তোমার ধর্ম, আর সেই ধর্ম রক্ষার জন্য যখন তখন অস্ত্রের প্রয়োজন হতেই পারে। যেমন দরকার হলও। গরিব ব্রাহ্মণের গরু চুরি গেছে, অর্জুনকে এখন তীর-ধনুক নিয়ে চোর তাড়া করতে হবে। এখন উপায়? অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী। এতকাল আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, অস্ত্রাগারেই এই নবদম্পতীর আস্তানা ছিল। কিন্তু তা মোটেই নয়। মানুষটি তো যুধিষ্ঠির, তিনি দ্রৌপদীকে একান্তে পাওয়ার জন্য খাণ্ডবপ্রস্থে আর এক খণ্ড জমিও খুঁজে পাননি। বাগান, বনস্থলীর কথা ছেড়েই দিলাম। তিনি সেঁধিয়েছেন গিয়ে নির্জন অস্ত্রাগারে। অর্জুনের সে কী দোটানা অবস্থা। তিনি ভাবছেন—দাদা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গে আছেন অস্ত্রাগারে, আর একদিকে

ব্রাহ্মণ রক্ষা বিধানের দায়ে পাণ্ডবদের সাহায্য চাইছেন। পরিত্রাতার ভূমিকাই অর্জুনের কাছে বড় হল। তিনি অস্ত্রাগারে ঢুকলেন, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি উদ্ধার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বনবাসের অনুমতি চাইলেন অগ্রজের কাছে।

যুধিষ্ঠির বললেন—ছোটভাই দাদার ঘরে ঢুকেছে, তো কী হয়েছে? যদি বড়ভাই ছোটভাইয়ের ঘরে ঢোকে সেইটাই অন্যায়, তুমি বনে যেয়ো না—নিবর্ত্তস্ব মহাবাহো। অর্জুন মানলেন না, বনে চলে গেলেন। আর যাই হোক, ধর্মের সঙ্গে তো আর ছলনা চলে না। সময় না আসতেই দ্রৌপদীর কামনার ধন বনে চলে গেলেন।

এ-কথা ঠিক যে পাঁচ স্বামীর সুবাদে দ্রৌপদী এক থেকে চার ভায়ের বউদি হতেন, আবার কখনও ভাদ্দর বউ। তবে এই ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। ব্যাস লিখেছেন—স্নিগ্ধ বনস্থলীর মধ্যে যেমন অনেকগুলি হাতি একসঙ্গে থাকে তেমনি পঞ্চ স্বামীকে পেয়ে দ্রৌপদী গজদর্পিতা বনস্থলীর মতো অন্যের অধরা হয়েছিলেন। পাণ্ডবরাও তাঁর মধ্যে পেয়েছিলেন বনস্থলীর ছায়া। ব্যাস উপমাটি দিয়েছেন ভারি সুন্দর—নাগৈরিব সরস্বতী। 'সরস্বতী' মানে নীলকণ্ঠ লিখেছেন 'বহু সরোবরযুক্ত বনস্থলী'।

দ্রৌপদী যে এক-এক সময়ে এক-এক বীরস্বামীর স্নান সরোবরে পরিণত হতেন এবং অন্য স্বামীকে দিতেন বনস্থলীর ছায়া—তাতে সন্দেহ কী! ব্যাস তাই লিখেছেন—বভূব কৃষ্ণা সর্বেষাং পার্থানাং বশবর্তিনী—একসঙ্গে তিনি সবারই বশবর্তিনী ছিলেন এবং সেইজন্যই সাধারণভাবে বনস্থলীর উপমা। পাঁচ স্বামীর মধ্যে সবার সঙ্গেই দ্রৌপদীর ব্যবহার একরকম ছিল না। কাউকে একটু বেশি ভালবাসতেন, কাউকে বেশি বিশ্বাস করতেন, কাউকে বা যেন মানিয়ে চলেছেন, আবার কাউকে বাৎসল্যও করেছেন।

বাৎসল্যের কথাটা হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে নকুল-সহদেব, এই দুই ভ্রাতার প্রতি দ্রৌপদীর বাৎসল্য রসই বেশি, যতখানি না শৃঙ্গার। সারা মহাভারতে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনের মাহাত্ম্য এত বেশি যে, এই তিন ভ্রাতার চাপে নকুল সহদেবের কথা সংকুচিত হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে গাছের ওপরে উঠে জলের খোঁজ করা, একে ডাকা, তাকে বলা—এইসব খুচরো কাজের বেলায় নকুল-সহদেবের ডাক পড়ত। দ্রৌপদীর বিয়ের অব্যবহিত পূর্বেও জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে ফেরবার সময়ে নকুল-সহদেব ভীমের কোলে উঠেছেন। এ হেন নকুল-সহদেবের সঙ্গে তিনটি নাম করা বীর স্বামীর রসজ্ঞা দ্রৌপদী কী ব্যবহার করবেন! বিশেষত কনিষ্ঠ সহদেবের সঙ্গে?

বনে যাবার সময় জননী কুন্তী দ্রৌপদীকে বলেছিলেন—স্বামীদের সঙ্গে কখন কীরকম ব্যবহার করতে হবে—আমি জানি—সে তোমায় বলে দিতে হবে না মা। তোমার পাতিব্রত্য গুণ যেমন আছে, তেমনি আমার মতো—মদনুধ্যানবৃংহিতা—মায়ের গুণও তোমার মধ্যে যথেষ্ট। বনের মধ্যে তুমি বাপু আমার সহদেবকে একটু দেখে রেখো—সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সহাবেক্ষ্যো বনে বসন্। মা-মরা ছেলে যেন আমাকে ছেড়ে মা হারানোর দুঃখ না পায়—যথেদং ব্যসনং প্রাপ্য নায়ং সীদেন্ মহামতিঃ। বস্তুত জননী কুন্তী সহদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই দ্রৌপদীর মধ্যেও সহদেবের প্রতি বাৎসল্য জন্মেছিল হয়তো।

মহাভারতের বিরাট পর্বেও এই তত্ত্বের সমর্থন আছে। বিরাটের রাজবাড়িতে কীচকের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে দ্রৌপদী যখন ভীমের কাছে নালিশ জানাতে এসেছিলেন, তখনও এই সহদেবের জন্য মায়ায় তাঁর বাক্য অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সহদেবের জন্য দ্রৌপদীর মমতা প্রায় কুন্তীর মতোই। বাস্তবে সহদেবের স্বামিত্বের নিরিখে অতিরিক্ত মায়া দেখানো যেহেতু খারাপ দেখায়, দ্রৌপদী তাই সহদেবের ওপর তাঁর অসীম মমত্ব প্রকাশ করেন কুন্তীর জবানীতেই। বিরাটপর্বে ভীমের কাছে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন—আমার মনে শান্তি নেই একটুও। সহদেবের কথা ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুমই আসে না, তায় শান্তি—ন নিদ্রাম্ অভিগচ্ছামি ভীমসেন কুতো রতিম্। দ্রৌপদী বললেন—বনে আসবার আগে জননী কুন্তী আমার হাত ধরে বলেছিলেন—দ্রৌপদী! রাত-বিরেতে আমার সহদেবকে একটু দেখে রেখো, তুমি নিজ হাতে ওকে খাইয়ে দিও—স্বয়ং

পাঞ্চালি ভোজয়েঃ।

এসব কথা থেকে বোঝা যায়, সহদেব হয়তো ঘুমের ঘোরে গায়ের চাদর ফেলে দিতেন, হয়তো তিনি নিজহাতে জুত করে খেতে পারতেন না, অতএব জননী কুন্তীর সমস্ত মাতৃস্নেহ দ্রৌপদীর বধূহৃদয়ে এক মিশ্ররূপ নিয়েছিল। যার জন্য মুখে তিনি সহদেবকে 'বীর' 'শূর'—এইসব জব্বর জব্বর বিশেষণে ভূষিত করলেও মনে মনে ভাবতেন—আহা ওই কচি স্বামীটার কী হবে—দূয়ামি ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরং প্রিয়ম্। দ্বৈতবনে এসে দ্রৌপদী যখন নির্বিকার যুধিষ্ঠিরকে বেশ পাঁচ-কথা শুনিয়ে দিলেন, তখন ভীম আর অর্জুনের কথা উল্লেখ করে দ্রৌপদী বলেছিলেন—এঁরা এইরকম মহাবীর, তবুও এঁদের বনে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু নকুল-সহদেব, বিশেষত সহদেবের কথা যখন উঠল, তখন দ্রৌপদী বললেন—সহদেবকে বনের মধ্যে দেখেও তোমার মায়া লাগছে না, তুমি নিজেকে ক্ষমা করছ কী করে ? নকুল-সহদেব, যারা নাকি জীবনে কষ্টের মুখ দেখেনি, তাদের দুঃখ দেখেও কি তোমার রাগ হচ্ছে না ?

ভীম-অর্জুনের বেলায় বীরতা, আর নকুল-সহদেবের বেলায় তাদের দুঃখই দ্রৌপদীর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ভাবে বুঝি, এই যমজ ভায়ের ওপর দ্রৌপদীর রসাপ্লুতি যতখানি ছিল, তার চেয়ে মায়া এবং বাৎসল্যই ছিল বেশি। অন্যদিকে সহদেব কিন্তু দ্রৌপদীকে আপন গিন্নি বলে বড়ই গর্বিত বোধ করতেন। ছোট বলে সহদেবের অনেক ছেলেমানুষি ছিল, নিজেকে ছেলেমানুষের মতো একটু প্রাজ্ঞও ভাবতেন তিনি—আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষো'মন্যত কঞ্চন। ঠিক এই কারণেই বুঝি কুরুসভায় পাঞ্চালীর যে অপমান হয়েছিল, তার প্রতিশোধের ভার তিনি একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের হয়ে কুরুসভায় দূতীয়ালি করতে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত পাণ্ডবেরা, এমনকী ভীম পর্যন্ত বারবার শান্তির কথা বলেছিলেন। এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য সমস্ত পাণ্ডবেরা ছিলেন উদগ্রীব। কিন্তু যখন সহদেবকে বলতে বলা হল, তখন তিনি আচমকা বলে উঠলেন—যুধিষ্ঠির যা বলেছেন তাই সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু কৃষ্ণ ! তুমি সেই চেষ্টাই করবে যাতে যুদ্ধ বাধে। এমনকী যদি কৌরব নায়কেরাও পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হন, তবু কিন্তু যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করবে। কুরুসভায় পাঞ্চালীকে যে অপমান আমি সইতে দেখেছি, দুর্যোধনকে না মেরে তার শোধ তোলা অসম্ভব। কৃষ্ণ ! যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এঁরা ধার্মিক মানুষ, তাই তাঁরা যুদ্ধশান্তির কথা বলছেন, কিন্তু আমি ধর্মের বাঁধ ভেঙে দিয়ে একাই যুদ্ধ করতে চাই—ধর্মম্ উৎসৃজ্য তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি সংযুগে।

যে কনিষ্ঠ ছেলেটি দ্রৌপদীর অপমানে উত্তেজিত, ধর্মের বাঁধ ভেঙে যুদ্ধে একাই প্রাণ দিতে চায়, তার প্রেমরহস্য যতই একতরফা হোক না কেন, দ্রৌপদী তাকে বাৎসল্যে বন্দি করেছিলেন, যে বাৎসল্যকে সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। অন্যথায় দ্রৌপদীর প্রেম বড় সহজলভ্য নয়। যে বিশালবপু বৃষস্কন্ধ মানুষটি দ্রৌপদীর জন্য কত শতবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই মধ্যম-পাণ্ডব ভীমও যে দ্রৌপদীর প্রেমের স্বাদ সম্পূর্ণ পেয়েছেন তা আমরা মনে করি না। অথচ দ্রৌপদী ভীমের কাছে মাঝে মাঝে এমনভাবে আত্মনিবেদন করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যেন ভীমের মধ্যে তিনি মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন। আসলে এই মধ্যম-পাণ্ডব নিজেই দ্রৌপদীকে এত ভালবাসতেন যে দ্রৌপদীকে মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে হয়েছে। এত বড় বিশাল মাপের মানুষকে তো আর সহদেবের মতো বাৎসল্যরসে সিঞ্চিত করা যায় না। তবে এই যে আত্মনিবেদন, এ কিন্তু প্রেমের আত্মনিবেদন নয়, এ শুধু বিশ্বাস। চিরমুগ্ধ মধ্যম পাণ্ডবকে তিনি মাঝে মাঝেই কাজে লাগিয়েছেন, এমন কাজ যা অন্যের দ্বারা হবে না। আর দ্রৌপদীর লাবণ্যে, বৈদগ্ধ্যে আত্মহারা ভীম বারবার সেই দুরূহ কর্মগুলি করেছেন প্রিয়ার মন পাবেন বলে।

আপন স্বয়ম্বর লগ্নে দ্রৌপদী নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে, লক্ষ্যভেত্তা পুরুষটির সঙ্গে আরও একজন শক্তিধর পুরুষ সমস্ত রাজমণ্ডলকে একেবারে নাজেহাল করে তুলেছে। সেই মানুষটি অন্যের মতোই তাঁকে দেখে মুগ্ধহৃদয়ে বরণ করেছিল। অথচ দ্রৌপদী পাঁচভাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু এই মুগ্ধতার কথা মনে রেখেই বিদগ্ধা দ্রৌপদী তাঁর এই পরম বিশ্বস্ত পতিটিকে এমন কোনও কর্মভার

দিতেন, যাতে ভীম ভাবতেন—দ্রৌপদীর পক্ষপাত বুঝি তাঁর ওপরেই। এর মধ্যে অর্জুন নামক উদাত্ত পুরুষটির মধ্যে যে ঈর্ষা জাগানোর ব্যাপার আছে, তা ভীম বুঝতেন না। তার ওপরে অর্জুন যখন তপস্যা ইত্যাদি নানা কারণে বাইরে গেছেন, তখন দ্রৌপদী এমন ভাব করতেন যেন ভীমই তাঁর মালঞ্চের একমাত্র মালাকর।

মনে করুন সেই দিনটির কথা। অর্জুন গেছেন দেবলোকে, অস্ত্র সন্ধানে। বহুদিন হয়ে গেল তিনি ফেরেন না। লোমশ মুনির কথায় অন্য পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতে এলেন যদি অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয় । পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভাঙতে গিয়ে পথশ্রান্তা দ্রুপদরাজার দুলালী কৃষ্ণা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তবু টাল রাখতে পারলেন না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁকে প্রথমে দেখতে পেলেন নকুল। কোনওমতে তাঁকে ধরে ফেলেই নকুল অন্য ভাইদের ডাকতে লাগলেন। দৌড়ে এলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, সহদেব। নিজের কোলে দ্রৌপদীর মাথা রেখে ধর্মরাজ খানিকক্ষণ বিলাপ করলেন—সাত-পুরু বিছানায় যার শুয়ে থাকার কথা, আমার জন্যে তার কী অবস্থা—ইত্যাদি ইত্যাদি। বারবার পাণ্ডবেরা ঠাণ্ডা হাতে তাঁকে স্পর্শ করে, মুখে জলের ছিটে দিয়ে হাওয়া করে—জলমিশ্রেণ বায়ুনা—দ্রৌপদীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেই দেখা গেল ধর্মরাজ তাঁর কোলে-মাথা-রাখা দ্রৌপদীকে অনেকভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন—অর্থাৎ কিনা, এখন কেমন লাগছে, একটু ভাল বোধ করছ কি—পর্যাশ্বাসয়দ্ অপ্যেনাম্। অন্যদিকে নকুল-সহদেব সেই তখন থেকে দ্রৌপদীর রক্ততল পা-দুখানি টিপেই চলেছেন—তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ...সংববাহতুঃ। হ্যাঁ, অসুখে পড়লে স্ত্রীর পা টিপলে দোষ কী, কিন্তু আমাদের ধারণা, অসুখে না পড়লে, মানে সুখের দিনেও নকুল-সহদেবের ওই একই গতি ছিল। এদিকে মাথা আর পা-দুখানি তিন পাণ্ডবের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ভীমের পক্ষে যেহেতু আর কোনও অঙ্গসংবাহন সম্ভব ছিল না, অতএব হতচকিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। ধর্মরাজ মুখ তুলে বললেন—এই বন্ধুর গিরিপথ দ্রৌপদীর পক্ষে আর অতিক্রম করা সম্ভব নয়, ভীম! ভীম বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কোনও চিন্তাই করবেন না, সব ভার আমার। আমি বরং আমার পুরনো ছেলে ঘটোৎকচকে স্মরণ করছি। সে হাওয়ার গতিতে সবাইকেই নিয়ে যেতে পারবে। ব্যবস্থা হল, পাণ্ডবেরা অর্জুনকে রাস্তায় ধরে ফেলার আশায় নিসর্গরাজ্য গন্ধমাদনে প্রবেশ করলেন।

হিমালয়ের বিচিত্র মনোরম পরিবেশে পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী বিমলানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। এমনই এক দিনে না-জানা দিঘির এক সহস্রদল পদ্ম হাওয়ায় উড়ে এসে দ্রৌপদীর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ল। সূর্যের কিরণ-মাখা সে পদ্মের যেমন রঙ, তেমনই তার গন্ধ। দ্রৌপদী বায়না ধরলেন, ভীমের কাছে বায়না ধরলেন—দেখেছ কী সুন্দর পদ্ম, যেমন রঙ, তেমনই গন্ধ। আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাক—যদি তে'হং প্রিয়া পার্থ—তা হলে এই পদ্ম আরও অনেক, অনেক আমায় এনে দিতে হবে, ভীম! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই পদ্ম উপহার দেব—ইদঞ্চ ধর্মরাজায় প্রদাস্যামি পরন্তপ। বুঝুন অবস্থা, মেজস্বামী ভীমসেন কোথায় মাঠ-ঘাট খুঁজে দিব্যগন্ধ পদ্ম নিয়ে আসবেন, আর সেই পদ্মগুলি যাবে জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠিরের ভোগে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সময় দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কোলে শুতে পেরেছিলেন বলেই নাকি—অঙ্কমানীয় ধর্মাত্মা—জানি না, দ্রৌপদী দ্যূতসভার অপমান ভুলে ধর্মরাজকে সৌগন্ধিক উপহার দিতে চাইলেন এবং সে উপহারের ব্যবস্থা করবেন ভীম। শুধু তাই নয় দ্রৌপদীর ইচ্ছে—দু-পাঁচটা পদ্মফুলের গাছ যদি গোড়াশুদ্ধ উপড়ে আনা যায় তবে সেগুলি কাম্যক বনে পুঁতেও দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, কাম্যক বন পাণ্ডবদের বনবাস লগ্নে প্রথম অরণ্য, প্রথম প্রথম বনবাসে দ্রৌপদীর বুঝি সে অরণ্য ভারী ভাল লেগেছিল। ভীমের কাছে বায়না ধরে দ্রৌপদী ছুটলেন ধর্মরাজের কাছে। যে একগাছি পদ্ম হাওয়ায় উড়ে এসেছিল, সেটিও তিনি নিবেদন করতে চান ধর্মরাজের হৃদয়ে। এদিকে ভীম প্রিয়ার ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে—প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ—চলে গেলেন সেই সহস্রদল পদ্ম জোগাড় করার জন্য।

সে কি সোজা কথা। গিরি-দরী, নদ-নদী পেরিয়ে, হাজারো বনস্থলী তছনছ করে, শেষে পূর্বজন্মের দাদা হনুমানের উপদেশ নিয়ে ভীমসেন গন্ধমাদনের বিশেষ বিশেষ জায়গায় সূর্যবরণ পদ্ম

খুঁজে চললেন। তাঁর সদা সজাগ চোখ দুটি ছিল শুধু পর্বতসানুদেশে ফোটা ফুলের রাশির ওপর, আর পাথেয় ছিল দ্রৌপদীর বাক্য। দ্রৌপদী যে বলেছেন—যদি তুমি আমাকে একটুও ভালবাস, ভীম, আমাকে পদ্ম এনে দিতেই হবে। ভীম আরও তাড়াতাড়ি চললেন—দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ। শেষে এক হরিণ-চরা বনের ধারে, হাঁস আর চখাচখীর শব্দ-মুখর নদীর মধ্যে ভীম দেখলেন সেই পদ্ম—হাজার, হাজার, যেন পদ্মের মালা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে নদীর মধ্যে। পদ্মগুলি দেখার পরেই মহাবলী ভীমের যে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, সেটি ভারী সুন্দর করে লিখেছেন ব্যাসদেব। ভীমের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর একান্ত প্রেমের সঙ্গে করুণা মাখিয়ে দিয়েছেন চরিত্রচিত্রী ব্যাসদেব। পদ্মগুলি দেখেই ভীম যেন সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে গেলেন—তদ্ দৃষ্ট্বা লব্ধকামঃ সঃ। পুষ্পদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভীমের মন যেন প্রিয়া দ্রৌপদীর সান্নিধ্য লাভ করল, যে দ্রৌপদীর রাজার দুলালী হয়েও বনবাসের কষ্টে মলিন—বনবাসপরিক্লিষ্টাং জগাম মনসা প্রিয়াম্। তাঁরই কষ্টার্জিত ফুল দিয়ে কৃষ্ণা ধর্মরাজের প্রিয় সাধন করবেন, এই কুটিলতা ভীমের মনে ছিল না। কৃষ্ণ মুখ ফুটে ফুল চেয়েছেন—এইটেই তাঁর কাছে বড় কথা ছিল। যার জন্য ফুল পাওয়া মাত্র তিনি লব্ধকাম, দ্রৌপদীর উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেছেন মনে মনে। ভীম নিজে সরল মানুষ, তাঁর ভালবাসাও সরল। বিশেষত পদ্ম পাওয়া মাত্রেই তাঁর মনে যে কৃষ্ণার মলিন মুখখানি ভেসে উঠেছে তাতে বোঝা যায় নিজে সঙ্গে থাকলেও দ্রৌপদীর বনবাস তিনি কোনওদিন সহ্য করতে পারেননি।

ভীম যে দ্রৌপদীর জন্য পদ্মবনে গেছেন সে-কথা যুধিষ্ঠির জানতেন না। কাজেই ভীমকে বহুক্ষণ না দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রৌপদীকেই ভীমের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন কিন্তু এই বিদগ্ধা মহিলা—তোমায় সাজাব যতনে কুসুম-রতনে—ইত্যাদি প্রেমালাপ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেননি। তিনি বললেন—ওই যে অপূর্ব পদ্মফুল, সেইগুলিই অনেকগাছি আমি ভীমকে আনতে বলেছি। আমার প্রিয় সাধনের জন্য—প্রিয়ার্থং মম পাণ্ডবঃ—তিনি বোধহয় গেছেন আরও উত্তরে। ঠিক কথাটাই দ্রৌপদী মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। ভীমকে তিনি কত ভালবাসতেন, সে বিসংবাদে কাজ নেই, তবে তাঁর ভাল লাগবে বলে, শুধুমাত্র তাঁর ভাল লাগবে বলে কত দুঃসাহস যে তিনি দেখিয়েছেন তা বলবার নয়। আর ঠিক এই সব জায়গায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিপ্রতীপ আচরণও লক্ষ করার মতো। ভীমের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্ক যাই থাকুক, তার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কটিও খেয়াল করে যেতে হবে।

আমাকে পুনশ্চ সেই বিবাহ-সভায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে সমস্ত রাজপুরুষের মুখে চুনকালি দিয়ে যে পুরুষসিংহ দ্রৌপদীকে জিতে নিয়েছিলেন, মানসিকভাবে দ্রৌপদী যে তাঁকেই চিরজনমের সাথী হিসেবে পাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতে সন্দেহ কী ? কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে কুটীরে ফিরে ভিক্ষা ভাগের প্রশ্ন যখন এল, তখন কি নববধূর কিছুই মনে হয়নি ! যুধিষ্ঠির একবারই মাত্র অর্জুনকে এই বিবাহের ব্যাপারে 'অফার' দিয়েছেন। কিন্তু অর্জুন তা প্রত্যাখ্যান করলে যুধিষ্ঠির লক্ষ করলেন যে তাঁর অন্য তিন ভাই, প্রত্যেকেই যেন কৃষ্ণাকে আপন হৃদয়েই বসিয়ে ফেলেছে—হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তো তাঁর আপন ভাইগুলির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের হাল কী হয়েছিল, তার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রেখেছিলে স্বয়ং মহাভারতকার ব্যাসদেব। এই জন্য তাঁকে দ্বিতীয় একটি শ্লোক লিখে বলতে হল—দ্রৌপদীকে দেখে তাদের সবার—সর্বেষাং—অর্থাৎ কিনা পাঁচ ভাইয়ের সমস্ত ইন্দ্রিয়-রন্ধ্র শিথিল হয়ে পড়েছিল, তাঁরা সবাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন কামনায়—সংপ্রমথ্য ইন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীৎ মনোভবঃ। আর এর ঠিক পরেই যুধিষ্ঠির দ্বৈপায়ন ব্যাসের বাক্য উদ্ধার করে দ্রৌপদীকে সবাই মিলে বিয়ে করা ঠিক করলেন। যেহেতু যুধিষ্ঠির এখানে প্রধান এবং প্রবক্তার ভূমিকায়, অতএব দ্রৌপদীর মত বিদগ্ধা মহিলা কি তাঁর এই ভূমিকা সহজ মনে গ্রহণ করেছেন ! পরবর্তী সময়ে দ্রুপদের কাছে, ব্যাসের কাছে তিনি বারবার মাতৃবাক্য পালনের কথাই বলেছেন, কারণ তাতে সবারই সুবিধে। শেষে কিন্তু নিজের অবচেতন মনের কথাও তিনি চেপে রাখতে পারেননি। বলেছেন পাঁচভাই তাঁকে বিয়ে করুক—এ যেমন জননী কুন্তী বলছেন, এ তেমনি আমারও মনের কথা—এবং চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্।

এ আমারও ইচ্ছে—মনোগতম্—এই ইচ্ছেটুকুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু সেই মুহূর্তে, যখন নাকি লজ্জানম্রা বধূটির পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব ছিল না, যেখানে তাঁর লক্ষ্যভেত্তা পুরুষসিংহ অর্জুন দাদাদের জন্য নিজের হক ছেড়ে দিয়েছেন, সেই কালেও দ্রৌপদী কি তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীকে ক্ষমা করতে পেরেছেন ! আমার তো মনে হয় যুধিষ্ঠিরকে সেই থেকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। মহাভারতকার স্পষ্ট করে এই ব্যাপারে স্বকণ্ঠে কিছু ঘোষণা করেননি, তবে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার লক্ষ করার মতো। তার ওপরে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে থাকা অর্জুনকে যদিও বা কোনও পর্যায়ে লাভ করা যেত, তাঁকেও তিনি পরম লগ্নে হারিয়ে বসলেন সেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অস্ত্রাগারে রসালাপ করে। দ্রৌপদী নিজেকেই বা কী করে ক্ষমা করবেন। যুধিষ্ঠিরের কথা তো ছেড়েই দিলাম, যদিও এর ফল ভুগতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরকেই, অন্য সময়ে, অন্যভাবে।

অবশ্য যুধিষ্ঠিরের দোষ কম ছিল না। যুধিষ্ঠিরের স্বামিত্বে খুব অল্পদিনই কৃষ্ণার ভাগ্যে সুখ জুটেছিল—ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যলাভের পর রাজসূয় যজ্ঞের রমরমা পর্যন্ত। তারপরেই যুধিষ্ঠিরের মাথায় ভূত চাপল ; তিনি কৌরবদের আহ্বানে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে বসলেন। মহামতি বিদুর তাঁকে বারণ করেছিলেন, তবু তিনি পাশায় হাত লাগালেন। শকুনির সঙ্গে পাশার দান দিতে দিতে যুধিষ্ঠির একে একে সব হেরে বসলেন—ধন-জন, রাজ্য, সম্পত্তি সব। শেষে ভাইদের সঙ্গে নিজেকেও পণ রেখে হারলেন। তাঁর পণ রাখার মতো যেন কিছুই রইল না। শেষ পণে যখন যুধিষ্ঠির নিজেকেই হারালেন, তখন কূটবুদ্ধি শকুনি বললেন—এ ভারী অন্যায় কাজ করলে রাজা, নিজেকে তুমি হেরে বসলে ? তোমার ঘরে অমন ভাল জিনিসটা থাকতেও তুমি... ? সর্বহারা যুধিষ্ঠির তবুও যখন কোন জিনিসটা ভেবে পাচ্ছেন না, ঠিক তখুনি শকুনি তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন—ঘরে আছে তোমার প্রিয়া পত্নী পাঞ্চালী, তাকে পণ রেখে, তুমি অন্তত নিজেকে জিতে নাও, অর্থাৎ কিনা নিজেকে অন্তত ফের পাশার দান দেওয়ার উপযুক্ত রাখ। যুধিষ্ঠিরের একটুও স্থিরবুদ্ধি কাজ করেননি, তিনি দ্রৌপদীকেই পণ রেখে বসলেন। প্রত্যেকবার হারার পর যুধিষ্ঠির যখন আবার পণ রাখছিলেন, তখন সেই পণ-রাখা বিষয়ের বিশেষ গুণগুলিও বলছিলেন। এবারে তা বাদেও তিনি নির্লজ্জের মতো উন্মুক্ত সভায় তাঁর রূপরাশি বর্ণনা করলেন—যে রূপের কথা শুনলে অন্যের কামনার উদ্রেক হয়, সেই রূপ-বর্ণনা। যুধিষ্ঠির বললেন—সেই ক্ষীণমধ্যা দ্রৌপদীকে এবার পণ রাখলাম। সভায় সকলে ধিক ধিক করে উঠল। শকুনি পণ জিতে নিলেন, কিন্তু নিজেকে জয়-করা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আর খেললেন না। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে।

দ্রৌপদীকে পণে জেতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন আদেশ দিলেন দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে নিয়ে আসতে। সারথি ক্লাসে'র এক লোক—প্রাতিকামী বলে তাকে ডাকা হয়েছে মহাভারতে—সে চলল দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে। সিংহের গুহায় ঢোকা কুকুরের মতো প্রাতিকামী পাণ্ডবদের প্রিয়া মহিষীকে বলল—যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় মত্ত, মহারাজ দুর্যোধন তোমায় জিতে নিয়েছেন, দ্রৌপদী। তুমি চল এখন ধৃতরাষ্ট্রের ঘরের কাজে নিযুক্ত হবে।—নয়ামি ত্বাং কর্মণে যাজ্ঞসেনি। দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। "এ তুমি কী বলছ প্রাতিকামী ?"—দ্রৌপদী বললেন। সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ তাঁর চলে না, অতএব তাঁর বক্তব্যে কোনও স্বামী-সোহাগ নেই। সোজা বললেন—রাজার ঘরের কোনও ভদ্র ছেলে বউকে পণ রেখে পাশা খেলে ? পাশা খেলায় মজে গিয়ে রাজার যুক্তি বুদ্ধি সব গেছে, নইলে পণ রাখার মতো জিনিস আর কি কিছু ছিল না ? প্রাতিকামী বলল—থাকবে না কেন ? ধন সম্পত্তি তাঁর আগেই গেছে। তারপর ভাইদের বাজি রেখেছিলেন তারপর নিজেকে, অবশেষে তোমাকে। দ্রৌপদী বললেন—ওরে সারথির পো, তুই আগে গিয়ে জুয়াড়িকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছে, না, আগে আমাকে বাজি রেখে হেরেছে ?

এই বিপন্ন মুহূর্তে এর থেকে ভাল জবাব আর কিছু হতে পারে না। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন। কোন অধিকারে, কার অধীশ্বর ভেবে ধর্মরাজ দ্রৌপদীকে বাজি ধরেছেন—কস্যেশো নঃ পরাজৈষীরিতি ত্বামাহ দ্রৌপদী। ধর্মনন্দন কোনও জবাব দিতে পারেননি,

জন্যেই এই সুকুমারী কুলবধূর এত লাঞ্ছনা। যা রাগ হচ্ছে, এবার তোমার হাত দুটোই আমি পুড়িয়ে দেব। সহদেব! আগুন নিয়ে এস তো—বাহু তে সংপ্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয়। অর্জুনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ভীমের এ দাহনেচ্ছা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু লাঞ্ছনার সময়ে অন্তত ভীমের এই ব্যক্তিত্বটুকু নিশ্চয়ই বড় মধুর লেগেছিল দ্রৌপদীর কাছে। দুঃশাসনের অপমান চরমে উঠলে এই ভীমই আবার তার রক্তপান করার প্রতিজ্ঞা নিলেন। দুর্যোধন নিজের উরুর কাপড় সরিয়ে দ্রৌপদীকে অধম ইঙ্গিত করার পর সেই ভীমই কিন্তু উরু ভেঙে দেবার সংকল্প নিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ভীম কিছুই করতে পারছেন না, শুধু একের পর এক ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাচ্ছেন।

এইগুলি দ্রৌপদীর স্ত্রীহৃদয়ে কাজ করেছে, কাজ করেছে স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারেও। নকুল, সহদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির সবাই চুপ, শুধু ভীম একের পর এক প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাচ্ছেন। দ্যূতসভার মাঝখানে অসহায় দ্রৌপদী এবার বোধহয় বুঝতে পারলেন যাকে তিনি ভালবাসেন, সে বুঝি তাঁকে ভালবাসে না। কই গাণ্ডীবধন্বার মুখ দিয়ে একটি আওয়াজও তো বেরল না, কিছু করতে নাই পারুন, অন্তত প্রতিবাদ। স্বামী আত্মসার, নাকি সে আপন স্ত্রীর গৌরবে মহিমান্বিত, তার রক্ষা বিধানে তৎপর, তা বোঝবার এই তো সময়। দ্রৌপদী স্বামীদের চিনে নিলেন। এরপর তিনি যতবারই বিপদে পড়েছেন, তিনি ভীমের কাছেই তা জানিয়েছেন, মহাভারতের উদাত্ত নায়ক অর্জুনকে নয়। উদ্ধত ব্যক্তিত্ব দ্রৌপদীর ভাল লাগে, ধীরোদাত্ত নায়কত্ব নয়। এই দ্যূতসভায় অকর্মণ্য অক্ষম অর্জুনকে তিনি যেমন চিনলেন তেমনি চিনলেন যুধিষ্ঠিরকে—ক্রোধহীন, আপন স্ত্রী-রক্ষায় অপারগ, প্রতিবাদহীন—শুধু ধর্মসার। পতিধর্মের জন্য যদি স্ত্রীধর্ম ত্যাগ করতে হয় তা হলে স্ত্রীলোকের কী রইল, বিশেষত যে নারী নিজেই অত ব্যক্তিত্বহীন নন। আগুন থেকে তাঁর জন্ম, আগুন তাঁর স্বভাবে রয়েছে। সেই আগুনে যিনি চিরকাল সর্বনাশের হাওয়া লাগিয়েছেন, তিনি বায়ুপুত্র ভীম, অন্য কেউ নন। দ্বিতীয়বার পাশা খেলায় হেরে পাণ্ডবদের যখন বনে যাওয়া ঠিক হল, তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলেছিল—তুমি আবার বনে যাচ্ছ কেন, সুন্দরী! তোমার বাবা কী পুণ্যের কাজ করেছেন এই নপুংসক পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে। দেখ না কেমন জ্যালজেলে পাতলা কাপড় পরে বনে চলেছে তোমার স্বামীরা—টাকা নেই, পয়সা নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, কিছুই নেই। বনে গিয়ে তোমার কী সুখ হবে সুন্দরী! তার চেয়ে এই কৌরবদের মধ্যেই কাউকে তুমি বরং স্বামী বেছে নাও। কৌরবদের কত ধন-জন, টাকা-পয়সা। এদের যে কোনও একজনকে তুমি পতিত্বে বরণ করতে পার—এষাং বৃণীষ্ব একতমং পতিত্বে। চাল ছাড়া যেমন ধানের খোসা, পশুর চামড়াপরা খেলনা যেমনটি, পাণ্ডবরাও ঠিক তেমনি—এদের সেবা করে তুমি কী করবে?

কেউ এসব কথার প্রতিবাদ করেননি। সুকুমারী কৃষ্ণারও আর দুঃশাসনের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। সিংহ যেমন শেয়ালের দিকে ধেয়ে আসে, তেমনি ভীম এবার ধেয়ে এলেন দুঃশাসনের দিকে। আবার সেই প্রতিজ্ঞা—বুক চিরে রক্ত খাব। একেবারে শেষে বুঝি সবাই এবার ক্ষেপে উঠলেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব—সবাই। সবাই এবার ভীমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিলেন। কিন্তু প্রথমে ভীম। কৃষ্ণা আবার তাঁকে চিনলেন।

একটা কথা এখানে বলে রাখাই ভাল। রামায়ণের সীতা এবং মহাভারতের দ্রৌপদী—এই দুজনেরই একমাত্র মিল হল যে তাঁরা অযোনিসম্ভবা—অর্থাৎ কিনা তাঁদের জন্মে অলৌকিকতার গন্ধ আছে। কিন্তু এই দুই মহাকাব্যের নায়িকা-চরিত্র এত বিপরীত যে ভয় হয়—একের পরিস্থিতিতে আরেকজন পড়লে কী করতেন। কল্পনা করতে মজা পাই—যদি দণ্ডকবনে লক্ষ্মণের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে দ্রৌপদী ভিক্ষা দিতেন রাবণকে, তবে হয় তাপসবেশী রাবণের দাড়ি-গাছি উপড়ে নিতেন দ্রৌপদী; আর সীতা যদি শ্লথবাসা হতেন উন্মুক্ত রাজসভায় তবে তিনি তক্ষুনি ধরণী দ্বিধা হবার মন্ত্র পড়ে চিরতরে ঢুকে পড়তেন পাতালে; মহাভারত কাব্যখানাই অর্ধসমাপ্ত রয়ে যেত। যদি বলেন রাজসভায় দ্রৌপদীই বা এমনকী করেছেন যে, আমরা তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ হচ্ছি। আমি বলব অনেক কিছু করেছেন, যা সর্বংসহা সীতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সীতাকে যদি রামচন্দ্র বলতেন যে তুমি সভায় এসে শ্বশুরের সামনে কান্নাকাটি কর তা হলে তাই করতেন। তাঁর পক্ষে কি রামচন্দ্রকে

ভাল মন্দ কিছু না—বচনং সাধ্বসাধু বা। দুর্যোধন বললেন—এসব প্রশ্নোত্তরের মীমাংসা দ্রৌপদী সভায় এসেই করুক না। প্রাতিকামী আবার এসে বলল। দ্রৌপদী আবার কুরুবংশের সভাসদদের মতামত চেয়ে প্রাতিকামীকে ফিরে পাঠালেন। কিন্তু এ যেহেতু দুর্যোধনের ইচ্ছে, অতএব কুরুকুলের বৃদ্ধেরা কিছু বলার চেয়ে অধোমুখে থাকাই বেশি সুবিধে মনে করলেন। এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরই স্বয়ং দূত পাঠালেন কৃষ্ণার কাছে, তাঁর বক্তব্য ছিল—পাঞ্চালী যেন সভায় আসেন। যে কাপড় পরে আছেন, সেই কাপড় পরেই, একবস্ত্রা অন্য আচ্ছাদনহীন। পরনের কাপড়টি নাভির ওপরে বেঁধে তিনি যেন আসেন। তিনি যেন শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের সামনে আসেন কাঁদতে কাঁদতে—অধোনীবি রোদমানা রজস্বলা।

যার তখন এমনিই কান্নায় ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করছে, সেই দ্রৌপদীকে কি কান্নার অভিনয় করতে উপদেশ দিচ্ছেন ধর্মপুত্র! যে সংযম নিজের হাতের মুঠোয় ছিল, সেটা বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠির এখন শ্বশুরের সামনে কান্নাকাটি করার জন্য দ্রৌপদীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন স্বামীকে তিনি কী করে ক্ষমা করবেন! বরঞ্চ হঠাৎ-ক্রোধী ভীমসেন দ্রৌপদীর আছে অনেক ভাল, কেননা সে অন্তত রাগের সময় রাগ করা জানে। আমি বলি, ভীমের সংযম নেই কে বলেছে! যুধিষ্ঠির এত কর্ম করে চলেছেন ভীম তো কিছুই বলেননি। দুর্যোধন বললেন—এই প্রাতিকামী সূতের বেটাকে দিয়ে কাজ হবে না, ও বোধহয় ভীমকে ভয় পাচ্ছে। অথচ ভীম তখনও কিছুই বলেননি। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন গেলেন এবার দ্রৌপদীকে ধরে আনতে। তার চোখ লাল, নিজের ওপরে তার কোনও শাসন নেই—সেই দুঃশাসন গিয়ে খলনায়কের মতো দ্রৌপদীকে বললেন—এস গো, এস এস! তোমায় আমরা জিতে নিয়েছি! লজ্জা কীসের সুন্দরী! একবার দুর্যোধনের দিকে তাকাও—দুর্যোধনং পশ্য বিমুক্তলজ্জা। এবার পাণ্ডবদের ছেড়ে কৌরবদের আত্মদান কর—কুরূন্ ভজস্বায়ত-পদ্মনেত্রে। দৌপদী রাজবালা, এসব শোনা তাঁর অভ্যাস নেই। বিবর্ণা, হাতে মুখ ঢেকে কেবল পিছু হঠছেন, কুরুস্ত্রীদের মধ্যেও তাঁর আশ্রয় মিলল না। দুঃশাসন এবার তাঁর চুলে হাত দিল। যে চুল একদিন রাজসূয়ের যজ্ঞজলে অভিষিক্ত হয়েছিল, যে চুলের মধ্যে রাজেন্দ্রাণী হবার জল্পনা মেশানো ছিল, দুঃশাসন সেই চুলে হাত দিল। পাঁচ স্বামীর সাহচর্যে নাথবতী হয়েও অনাথের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ছোটলোক, অনার্য! রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে বসে আছি আমি। এ অবস্থায় আমাকে তুমি সভার মধ্যে নিয়ে যেতে পার না। খলহাসি হেসে দুঃশাসন বলল—তুমি রজস্বলাই হও আর এক কাপড়েই থাক অথবা গায়ের কাপড় গায়ে নাই থাকুক—রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি একাম্বরা বাপ্যথবা বিবস্ত্রা—সভায় তোমাকে যেতেই হবে। তুমি আমাদের কেনা বাঁদী, আমরা যেমন খুশি ব্যবহার করব।

দ্রৌপদী সভায় এলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর অপমান বাড়তে থাকল, বাড়তে থাকল দুঃশাসনের দুঃশাসন হাসি, কর্ণের 'দাসী, দাসী' চিৎকার (ভাবটা এই, স্বয়ম্বর সভায়—'সূতের ছেলেকে বিয়ে করব না' বলেছিলি, এবার ঠেলা সামলা)। কেউ কিছু বলছে না, শুধু অপমান, কাপড় ধরে টানাটানি, হাসি, 'দাসী' আরও হাসি। এই কতক্ষণ চলল। কথা বলছেন শুধু দ্রৌপদী, ন্যায়, যুক্তি, ধর্মের কথা। যাদের উদ্দেশে বলছেন তারা সবাই চুপ। মাঝে মাঝে শুধু আগুন-পানা কটাক্ষ হানছেন পাণ্ডবদের দিকে। এক-একটি কটাক্ষে পাণ্ডবদের অন্তরাগ্নি যেন জ্বলে উঠতে লাগল—সন্দীপয়ামাস কটাক্ষপাতৈঃ। ভীম তবু কিছু বলেননি। এরপরে যখন একবস্ত্রার উত্তরীয় বসন, মানে দ্রৌপদীর উত্তমাঙ্গের বসন টেনে খোলার চেষ্টা করলেন দুঃশাসন, তখন ভীম আর থাকতে পারলেন না। থাকা সম্ভবও নয়। তিনি অপরকে কী গালাগালি দেবেন, যার জন্যে আজ নিজেদের এবং দ্রৌপদীর এই দুর্দশা সেই বড়ভাই যুধিষ্ঠিরের হাত দুটিই তিনি পুড়িয়ে দেবেন ঠিক করলেন। সহদেবকে বললেন—আগুন নিয়ে এস তো। ভীম বললেন—দেখ যুধিষ্ঠির, জুয়াড়ি পাশাড়েদের বাড়িতে যদি বেশ্যারা থাকে, জুয়াড়িরা তাদের পর্যন্ত খেলায় রাজি রাখে না, বেশ্যাদের ওপরেও তাদের দয়ামায়া আছে। তোমার সেটুকুও নেই। তুমি এতক্ষণ ধরে আমাদের ভাইদের নিয়ে যথেচ্ছ ফাটকাবাজি খেলেছ, কিন্তু কিছুই বলিনি, তুমি এবার দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছ, আর তোমায় ছাড়ব না। তোমার

'জুয়াড়ি' সম্বোধন করে এই প্রশ্নটা করা সম্ভব হত যে, পাশাখেলায় আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন, না আগে তাঁকে বাজি রেখেছেন—কিং নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানাম্ অথবা নু মাম্ ?

এ তো রীতিমতো 'ল-পয়েন্ট'। সভাসদদের কারও পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রাতিকামী, যে দ্রৌপদীকে নিতে এসেছিল, সেও বুঝতে পেরেছিল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন দুর্যোধনও, যার জন্যে প্রাতিকামী দ্বিতীয়বার বলেছে—তা হলে আমি রাজকুমারী কৃষ্ণাকে কী বলব—উবাচ কৃষ্ণাং কিমহং ব্রবীমি ? দুর্যোধন বলেছেন—প্রাতিকামী ভীমকে ভয় পাচ্ছে। তা মোটেই নয়। সে দ্রৌপদীকেই ভয় পাচ্ছিল—স্ত্রীলোকের কাছে এমন সাংঘাতিক আইনের প্রশ্ন শুনেই সে দ্রৌপদীর ওজন বুঝেছে—ভীতশ্চ কোপাদ্ দ্রুপদাত্মজায়াঃ। দ্রৌপদীর মুখে আইনের প্রশ্ন শুনে সভাসদ কুরুবৃদ্ধেরা যে চুপ করে গেলেন তার কারণ একটাই। বাপের বাড়িতে দ্রৌপদী কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বাবা দ্রুপদ বাড়িতে পণ্ডিত রেখে ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্নের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্রৌপদী যে তাঁর কাছ থেকে এবং ভাইয়ের কাছ থেকেও বিদ্যা শিখে নিতেন সে-কথা দ্রৌপদী নিজেই কবুল করেছেন মহাভারতের বনপর্বে। আর আইনের ব্যাপারে দ্রৌপদীর আগ্রহ ছিল বিশেষ রকম। তখনকার দিনে আইনের বই বলতে বৃহস্পতিসংহিতা, শুক্রসংহিতা—এই সবই ছিল। ঘরে রাখা সেই পণ্ডিতের কাছে বৃহস্পতি-নীতির পাঠ নিতেন প্রধানত দ্রুপদ রাজা। কিন্তু আইনের ব্যাপারে দ্রৌপদীর এত আগ্রহ ছিল যে ওই পাঠ-গ্রহণের সময় তিনি কোনও কাজের অছিলায় চলে আসতেন সেইখানে, যেখানে গুরুজি বৃহস্পতি পড়াচ্ছেন। দ্রৌপদীর আগ্রহ দেখে গুরুজিও তাকে সস্নেহে বৃহস্পতি-নীতির উপদেশ দিতেন এবং বাবার আদরের দুলালী সঙ্গে সঙ্গে বাবার কোলে বসে যেতেন বৃহস্পতির লেখা আইন বোঝবার জন্য—স মাং রাজন্ কর্মবতীম্ আগতামাহ সান্ত্বয়ন্। শুশ্রূষমাণাম্ আসীনাং পিতুরঙ্কে যুধিষ্ঠির।

বাপের ঘরে শেখা এই আইনের পাঠ যে দ্রৌপদীর জীবনে কত কাজ দিয়েছে তা আমরা পদে পদেই দেখতে পাব। সভায় এসে এত কাপড় টানাটানি আর চুলের মুঠি পাকড়ানোর মধ্যে দ্রৌপদী আর কুলবধূর প্রণাম-আচারে মন দেননি। তিনি সোজা কুরুপ্রধান সভামুখ্যদের উদ্দেশ করে বললেন—এঁরা তো সব শাস্ত্রজানা, শাস্ত্রের প্রয়োগ-জানা মানুষ—উপনীতশাস্ত্রাঃ ক্রিয়াবন্তঃ—সবাই আমার গুরুস্থানীয় অথবা গুরু। আপনাদের সামনে আমার এমনিভাবে দাঁড়াতেই ইচ্ছে করছে না। দ্রৌপদীর ইঙ্গিতটা হল, তাঁকে যে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হল, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই কুরুমুখ্য সভাসদদের। কারণ দুর্যোধন তো রাজা নন, তা হলে রাজসভায় তাঁকে ধরে আনা হয়েছে কার আদেশে ? ওই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের ওপর হাজার রাগ থাকলেও দ্রৌপদী তাঁকে 'ডিফেন্ড' করে বললেন—ধর্মরাজ যা বলেছেন, তাঁর কথার গুণটাই আমি ধরব, দোষটা নয়। হ্যাঁ ধরেই নিলাম তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দ্রৌপদী এবার দুঃশাসনকে বলার ছলে গুরুস্থানীয়দের উদ্দেশে বললেন—এই যে কুরুবীরদের মধ্যে অসহায় রজস্বলা এক কুলবধূকে নিয়ে তুমি টানাটানি করছ, দুঃশাসন ! এবং এই ব্যাপারে যে কেউ এক বর্ণ নিন্দাও করছেন না তোমার, তাতে বুঝি এ-বিষয়ে কুরুবৃদ্ধদের অনুমোদন লাভ করেছ তুমি—ধ্রুব তবেদং মতমভ্যুপেতঃ। হায় ! প্রসিদ্ধ ভরতবংশের আজ কী গতি হয়েছে ! আজকে ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে লুপ্তি-রেখার ওপর, ক্ষত্রিয় চরিত্রহীন, নইলে কুরুবংশীয়রা সভায় দাঁড়িয়ে কুলবধূর ধর্ষণা দেখছেন—প্রেক্ষন্তি সর্বে কুরবঃ সভায়াম্ ? ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং বিদুর—এঁদের কি কোনও অস্তিত্ব আছে, না এঁরা মারা গেছেন ? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অস্তিত্বে সন্দিহান আমি, নইলে এই কুরুবৃদ্ধ এবং প্রধানেরা কিছুই কি লক্ষ্য করছেন না !

মহামতি ভীষ্ম এবার মুখ খুললেন কিন্তু তিনিও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। এতকালের রাজনীতির অভিজ্ঞতায় তাঁর শুধু দ্রৌপদীর আইনের প্রশ্নটি মনে আছে। উকিলের জেরা শুনে জজসাহেবের যে প্রাথমিক দ্বন্দ্ব হয়, ভীষ্মের অবস্থাও ঠিক সেইরকম। বস্ত্রাকর্ষণে তাঁর মাথাব্যথা বেশি নেই, কিন্তু বিদগ্ধা মহিলার চতুর প্রশ্নে তিনি বেশি বিচলিত। তিনি বললেন—যিনি পূর্বাহ্নেই নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন তিনি পরের ধন বাজি রাখতে পারেন না। দ্রৌপদী তো যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য চারজনেরও বউ। আবার ভাবছি স্ত্রী মাত্রেই তো স্বামীর অধীন, সেখানে তোমার

প্রশ্নের যৌক্তিকতা কী ? কথা আছে আরও। ভীষ্ম বলে চললেন—শকুনি যখন যুধিষ্ঠিরকেও পণে জিতে নিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বিজিত হলাম—জিতোঽস্মি। এ-কথায় বোঝা যায় তিনিই পরাজিত হয়েছেন, তাঁর স্ত্রী নন। অন্যদিকে শকুনি হল ধুরন্ধর পাশাড়ে। ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠিরকে জয় করলেই যে তাঁর স্ত্রীও সেই জয়ের ভাগে পড়েন না, একথা শকুনি বিলক্ষণ জানেন। জানেন বলেই শকুনি যুধিষ্ঠিরকে জয় করার পরেও দ্রৌপদীকে পণ রাখার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নিজেই বলেছেন ; যুধিষ্ঠির নিজে সে পণ রাখেননি। কিন্তু শকুনির বুদ্ধিতে যে তোমাকে পণ রাখা হল—এ কথা শকুনি স্বীকার করবেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় এই ধুরন্ধর শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছেন—সেখানেই বা বা আমি কী বলি।

দ্রৌপদী আবার 'ল-পয়েন্ট' ধরলেন—'স্বেচ্ছায় ?' অনার্য দুষ্টবুদ্ধি লোকেরা যারা দিন-রাত পাশা খেলে ছল-চাতুরি সব তাতেই হাত পাকিয়েছে, তারা গিয়ে নবিশী করা 'অ্যামেচার'—'নাতিকৃতপ্রযত্ন', 'অনভ্যস্তদ্যূত'—যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করে সভায় নিয়ে এসে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করলেন—সেখানে যুধিষ্ঠির 'স্বেচ্ছায়' পাশা খেলতে এসেছেন এটা কেমন কথা হল—কস্মাদয়ং নাম নিসৃষ্টকামঃ ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এ-কথা বুঝতে পারেননি যে, এই বদমাশ লোকগুলো পাশা খেলার নামে জুয়োচুরি করে। সবাই মিলে ছল করে তাঁকে হারানো হয়েছে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, খেলার নামে এটি জুয়োচুরি—পশ্চাদয়ং কৈতবমভ্যুপেতঃ। যা হোক ছাড়ুন এসব কথা, এখানে তো কুরুরা সবাই আছেন তাদের ঘরে নিজেদের ছেলে আছে, ছেলের বউও আছে, তাঁরা আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন।

কী প্রশ্ন দ্রৌপদীর দিক থেকে হতে পারে, তা সবাই বুঝতে পারছিলেন, এবং এই মোক্ষম প্রশ্ন করার আগেই তাই দুঃশাসনের টানা-হ্যাঁচকা বেড়ে গেল। দ্রৌপদীর আর প্রশ্ন করা হল না। বিবসনা হবার ভয়ে তখন তিনি মন্ত্র আউড়ে চলেছেন—গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়। অলৌকিক উপায়ে দ্রৌপদীর আব্রু-রক্ষা হল বটে, কিন্তু দুঃশাসন, কর্ণ, দুর্যোধন—এঁদের কটূক্তি, অধম ইঙ্গিত থেকে রেহাই পেলেন না তিনি। কৌরবদের যা তা বললেন দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ। একমাত্র তিনিই দ্রৌপদীর যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়ে দ্রৌপদীকে সম্মান করেছেন। শেষরক্ষা করেছেন বিদুর, যিনি রাজনীতি জিনিসটা গুলে খেয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কার জানালেন—দ্রৌপদী পণজিতা নন, কারণ পণ রাখার সময়ে যুধিষ্ঠিরের আপন স্বত্বই ছিল না। এখন যা ঘটছে তার সবটাই শকুনির চালাকি।

দ্রৌপদীর একটা প্রশ্নের মধ্যে যে গাম্ভীর্য ছিল—তা বোঝা যায় সমবেত কুরুবীরদের মাথা চুলকানি দেখে। শেষ পর্যন্ত যখন বিদুর আর গান্ধারীর চাপ আসতে লাগল অন্ধ রাজার ওপর, তখন ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্যোদয় হল যেন। তিনি এবার দ্রৌপদীকে বর দিতে চাইলেন। প্রথম বরেই দ্রৌপদী যেন ঝাঁটা কষিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরের মুখে। দ্রৌপদী বললেন—ধর্মের অনুগামী যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন প্রথমে। যুধিষ্ঠির মনস্বী, বিদ্বান মানুষ, ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করেন তিনি, সেই মনস্বী মানুষটাকে ছেলে-ছোকরারা, মানে, আপনার ছেলেরা যেন আবার দাস বলে না ডাকে। তা ছাড়া যুধিষ্ঠিরের থেকেই আমার ছেলে—প্রতিবিন্ধ্য ; রাজার ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তাকে সবাই দাসপুত্র বলবে—এও কি হয় ? মুক্ত হলেন যুধিষ্ঠির। দ্বিতীয় বর। মুক্ত হলেন ভীম, অর্জুন, নকুল-সহদেব। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—আমার ঘরের সব বউদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি। তুমি তৃতীয় বর চাও। বীরোচিত বিদগ্ধতায় ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। বললেন—ক্ষত্রিয়ের বউকে দুই বরের বেশি বর চাইতে নেই। তা ছাড়া আমার স্বামীরা এখন দাসত্ব থেকে মুক্ত, তাঁদের ভাল এখন তাঁরা নিজেরাই করতে পারবেন—বেৎস্যন্তি চৈব ভদ্রাণি রাজন্ পুণ্যেন কর্মণা।

ভাল করাটা কিছুই হয়ে ওঠেনি আর। রাস্তায় বেরতে না বেরতেই আবার তাঁদের পাশাখেলার ডাক পড়ল। শকুনির মায়াপাশার ডোরে আবার তাঁরা বাঁধা পড়লেন ; ফল—বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস। গাছের ছাল পড়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবেরা এলেন বনে। বন তাঁদের কাছে কিছু নতুন নয়, এমনকী ভিক্ষা করাও নয়—দুয়েরই স্বাদ তাঁরা জানেন।

চলছিলও ভালই। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ দিচ্ছেন, দ্রৌপদী সূর্যমার্কা থালার দৌলতে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন, চারভাই বনে বনে ঘোরেন, আর যুধিষ্ঠির ধর্মকথা শোনেন। এই গড্ডলিকা দ্রৌপদীর যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। বীর ক্ষত্রিয় পুরুষেরা নিষ্কর্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-সম্মেলন করে যাচ্ছেন। ওদিকে শত্রুর বৃদ্ধি ঘটছে। দুর্যোধন ভালই রাজ্য চালাচ্ছেন, সে খবরও দ্রৌপদীর কাছে আছে। এই অবস্থায়, যুধিষ্ঠির যদি দুঃখ দুঃখ মুখ করে দ্রৌপদীকে স্তোক দিতেন কিংবা কোমর বাঁধতেন পরবর্তী প্রতিশোধের জন্য—তাও বুঝি কিছু সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু তিনি নির্বিকার, অনুৎসাহী—ব্রাহ্মণোচিত ধর্মচর্চায় আবদ্ধ। ফেটে পড়লেন দ্রৌপদী।

যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর রাগ জমা ছিল বহুদিনের। যে যাই বলুক, দ্রৌপদী জানতেন—তাঁর এ দুরবস্থা যুধিষ্ঠিরের জন্যই। সকলের সম্মানিত ধর্মরাজ স্বামীকে তিনি বারবার শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের অত্যাসক্তি তাঁকে তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হতে বাধা দিয়েছে। যে দ্যূতাসক্তি একদিন তাঁকে পণ্য করে তুলেছিল, যে দ্যূতাসক্তি একদিন তাঁকে রাজসভায় বিবস্ত্রা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল শত্রুপক্ষের কাছে, তিনি যতই ধর্ম-উপদেশ করুন না কেন, ঘা-খাওয়া রমণীর কাছে তা ধর্মধ্বজিতা বলে মনে হয়। সত্যিই যে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এই ধারাতেই ভাবতেন তার প্রমাণ পাব সেই বিরাট পর্বে, কীচক যেখানে দ্রৌপদীর পেছন পেছন ঘুর-ঘুর করছেন। অপমানিতা দ্রৌপদী তাঁর চিরদিনের বিশ্বাসী ভীমের কাছে সেদিন বলেছিলেন—তোমার বড়ভাই যুধিষ্ঠিরকে তুমি নিন্দা করতে পার, যার পাশা খেলার সখ মেটানোর জন্য আমাকে এই অনন্ত দুঃখ সইতে হচ্ছে। পৃথিবীতে এক জুয়াড়ি ছাড়া এমন আর কে আছে যে রাজ্য হারিয়ে, নিজেকে হারিয়ে, শেষে বনবাসের জন্য আবার পাশা খেলে—প্রব্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা দুর্দ্যূত-দেবিনম্।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করতে পারেননি, কোনওদিনও পারেননি। বনবাসে কিছুদিন কাটার পরেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। না, এ ঝগড়াটা নেহাত সাধারণ স্তরের ছিল না। বিবাহ এবং ছেলেপিলে হবার পর কর্তা-গিন্নির যে গার্হস্থ্য কলহ—এ তাও নয়। ঝগড়ার পূর্বাহ্ণেই ব্যাসকে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে বলতে হয়েছে—প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা, অর্থাৎ কিনা বারবার এই 'চ' শব্দ দিয়ে ব্যাসকে দ্রৌপদীর প্রশংসায় 'ক্যাটিগোরিক্যাল' হতে হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশেষণে এক কুলবধূ রমণীকে 'পণ্ডিত' বলে সম্বোধন করায় বুঝতে পারি দ্রৌপদীর কথাগুলি যে ঠিক—তার পেছনে ব্যাসেরও সমর্থন আছে।

দ্রৌপদী বললেন—তোমাকে এমনকী আমাকে যে তোমার সঙ্গে গাছের ছালের কোপনী পরিয়ে বনে পার করেছে দুর্যোধন, তাতে তার মনে অনুতাপ তো হয়ইনি, বরঞ্চ সে রয়েছে আনন্দে—মোদতে পাপপূরুষঃ। তা ছাড়া তোমার অবস্থা দেখে আমার করুণা হচ্ছে মহারাজ...

পাঠক! দ্রৌপদীর এই করুণার নমুনাগুলি আমি মহাভারতকারের ভাষায় উপস্থাপন করতে চাই না। মহাভারতের ঠিক এই জায়গাটি অবলম্বন করে মহাকবি ভারবি তাঁর কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যে দ্রৌপদীর জবানী তৈরি করেছেন। এক মহাকবি আরেক মহাকবিকে যেমন বুঝেছেন তারই মূর্ছনা ভারবির দ্রৌপদীর রসনায়। দ্রৌপদী বললেন—তোমার অবস্থা দেখে আমার করুণা হচ্ছে মহারাজ! সময় ছিল যখন বন্দীরা বিচিত্র রাগিণীতে বন্দনা গান গেয়ে তোমার ঘুম ভাঙাত, এখনও গানে গানেই তোমার ঘুম ভাঙে মহারাজ, তবে সে বন্য শেয়ালের অমঙ্গল গানে। সময় ছিল, যখন দ্বিজোচ্ছিষ্ট অন্নে প্রতিদিনের ভোজন আরম্ভ করতে তুমি, এখনও তাই কর তুমি, তবে এ দ্বিজ ব্রাহ্মণ নয়, এ দ্বিজ দুবার জন্মানো অণ্ডজ পাখি, যাদের ঠুকরে খাওয়া ফলের প্রসাদ পাও তুমি। সময় ছিল, যখন প্রণতমস্তক রাজা-রাজড়াদের মুকুটমণিতে রক্তলাল হয়ে উঠত তোমার পা-দুখানি, হ্যাঁ, এখনও তোমার পা-দুখানি রক্তলাল, তবে তা একেবারেই রক্তেই—ব্রাহ্মণদের তুলে নেওয়া আধেক-ছাঁটা ধারালো কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয় তোমার চরণ আর আক্ষরিক অর্থেই সেগুলি রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে।

বস্তুত দ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারতে দ্রৌপদীর অধিকারের সীমানা দেখে ভারবির দ্রৌপদী আরও

বেশি মুখর হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদে। তিনি বললেন—মহারাজ! এ জগতে তুমি ছাড়া আর কে আছে যে তার মনোরমা কুলবধূর মতো রাজলক্ষ্মীকে অন্যের দ্বারা অপহরণ করায়, কারণ আমাকেও যেমন তুমি পাশা খেলে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলে, তেমনি রাজলক্ষ্মীকেও তুমি পাশা খেলেই অন্যের হাতে তুলে দিয়েছ,—পরৈস্ত্বদন্যঃ ক ইবাপহারয়েন্ মনোরমাম্ আত্মবধূমিব শ্রিয়ম্। তোমার পূর্বতন রাজপুরুষেরা ইন্দ্রের মতো যে-রাজ্য শাসন করে গেছেন, সেই রাজ্য তাঁরা তুলে দিয়েছিলেন তোমার হাতে। আর তুমি! হাতির শুঁড়ে মালা পরিয়ে দিলে সে যেমন যথেচ্ছভাবে সে মালা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তুমিও রাজলক্ষ্মীর বরমাল্যখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, যা লুফে নিয়েছে কৌরবেরা। তা ছাড়া তোমার জোয়ান জোয়ান ভাইগুলিকে দেখে তোমার মায়া হয় না মহারাজ? এই যে ভীম, যে এককালে রক্তচন্দন গায়ে মেখে সগর্বে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত—পরিভ্রমল্-লোহিতচন্দনার্চিতঃ—সে এখনও চন্দনের মতো লাল রঙ গায়ে মেখেই ঘুরে বেড়ায়, তবে তা গিরি-গুহার গৈরিক ধুলোর লাল—পদাতিরন্ত গিরিরেণুরুষিতঃ। তারপর, এই যে দেখছ অর্জুন, যে এককালে উত্তর দিক জয় করে থরে থরে ধনরত্ন এনে দিয়েছিল তোমার রাজসূয় যজ্ঞের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে, সেই বীরপুত্র এখন গাছের বাকল খুঁজে বেড়ায় কোনটা পরিধানের উপযুক্ত, কোনটা নয়, এই বাছাই করার বীরকর্মে সে এখন নিযুক্ত।

রাজসভায় সুখলালিত পাণ্ডবদের বনবাসমলিন অবস্থাটি প্রতিতুলনায় বড় করুণ করে ধরবার চেষ্টা করেছেন ভারবি। দ্রৌপদীর জবানীতে তার বক্তব্য হয়ে উঠেছে বক্রোক্তির সংকেতে অলংকৃত। মহাভারতকার অলংকারের ধার ধারেন না, সহজ কথা তিনি এত সহজেই বলেন যে দ্রৌপদীর বক্তব্য যেন আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। মহাভারতের দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কাছে রাগে ফেটে পড়েন—তোমার শরীরে কি রাগ বলে কোনও জিনিস নেই মহারাজ! তোমার জোয়ান জোয়ান ভাইয়েরা সব ঘুরে-বুলে বেড়াচ্ছে। যাদের খাওয়াবার জন্য পাচকেরা শতেক ব্যঞ্জনে রান্না করে দিত, তাদের এখন বন্য খাবার ছাড়া গতি নেই। এই ভীমকে দেখে তোমার রাগ হয় না মহারাজ! যার পথ চলার সুখের জন্য দুয়ারে গোটা কতক রথ, হাতি, ঘোড়া প্রস্তুত থাকত, যে একাই সমস্ত কৌরবদের ধ্বংস সাধনে সমর্থ, তাকে দুঃখিত অন্তরে বনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে দেখে তোমার রাগ হয় না মহারাজ! যে অর্জুনের তুলনা শুধু অর্জুনই, অস্ত্রসন্ধানে যে যমের মতো সমস্ত রাজার মস্তক নত করে ছেড়েছিল, সেই বাঘের মতো মানুষটাকে দেখে তোমার রাগ যে কেন বেড়ে যায় না—তাই ভেবে আমার মুচ্ছো যেতে ইচ্ছে করে—ন চ তে বর্ধতে মন্যুস্তেন মুহ্যামি ভারত। তারপর আছে নকুল, অমন সুন্দর চেহারা, অমন বীরত্ব—দর্শনীয়ঞ্চ শূরঞ্চ, আছে সহদেব, কোনওদিন কোনও দুঃখ সইতে হয়নি বেচারাকে—আহা তাদের দেখেও কি তোমার রাগ বেড়ে যায় না মহারাজ! একেবারে শেষে আমার নিজের কথাও বলি, বড়মানুষের ঘরে আমার জন্ম, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রবধূ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী আর পাঁচ পাঁচটা বীর স্বামীর ঘরণী আমি—এমন আমাকে বনে বনে ঘুরতে দেখে তুমি সেই লোকগুলোকে ক্ষমা কর কী করে? বেশ বুঝি রাগ বলে কোনও জিনিসই তোমার শরীরে নেই, ভাইদের এবং বউকে দেখে মনে কোনও পীড়াও হয় না তোমার। জান তো লোকে বলে যাদের গায়ে ক্ষত্রিয়ের রক্ত আছে তারা কখনও ক্রোধহীন হয় না—ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়ো'স্তি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্। ভারবি কবি মহাভারতের এই কথাটাকে আরও একটু টেনে নিয়ে দ্রৌপদীর মুখে বলেছেন—ক্ষমার দ্বারা শান্তি চায় মুনিরা, রাজারা নয়। আর তোমার যদি হৃদয়ে অত ক্ষমা থাকে, তবে মাথায় জটা ঝুলিয়ে হোমকুণ্ড সাজিয়ে মুনিদের মত মন্ত্র পড় গিয়ে—জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্।

পূর্ণ এক অধ্যায়ে দ্রৌপদীর মুখে যে ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছেন মহাভারতকার তা হল—তবু তোমার মাথায় রাগ চড়ে না যুধিষ্ঠির—কস্মান্ মন্যু-র্ন বর্ধতে। যুধিষ্ঠিরের কিছুই হয়নি, কোনও বিক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়াও নয়। দ্রৌপদী সর্বসহ প্রহ্লাদের উক্তি পর্যন্ত উদ্ধার করে যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মতেও মাঝে মাঝে ক্রোধের প্রয়োজন আছে, অন্তত রাজনীতিতে, শত্রু-ব্যবহারে। কিন্তু যুধিষ্ঠির তবু সেই মিন-মিন করে সেই অক্রোধ, ক্ষমা, আর শান্তির বাণী

পুনরুক্তি করতে থাকলেন। এবার রাগের বদলে দ্রৌপদীর ঘেন্না ধরে গেল যেন। যে ধর্ম মানুষকে এমন করে ডোবায়, সেই ধর্মের প্রবক্তার ওপরেই তাঁর ঘেন্না ধরে গেল যেন। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষুব্ধা হল তাঁর রসনা। বললেন—

ঠাকুর তোমার পায়ে নমো নমঃ, যে ঠাকুর তোমায় এমন করে গড়েছে—নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহং চক্রতুস্তব। শুনেছি ধর্মের রক্ষাকারী রাজাকে ধর্মই রক্ষা করে, নিজেও সে রক্ষিত হয়, কিন্তু সেই ধর্ম তোমাকে রক্ষা করছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি জানি—এই যে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এমনকী আমি—এদের সবাইকে তুমি ধর্মরক্ষার জন্য ত্যাগ করতে পার। ছায়ার মতো তোমার বুদ্ধি সবসময় ধর্মেরই অনুগামিনী। জানি, এই সসাগরা পৃথিবী লাভ করে ছোট বড় কাউকে তুমি অবমাননা করনি, কিংবা বলদর্পে তোমার শিংও গজায়নি দুটো—ন তে শৃঙ্গম্ অবর্ধত। কিন্তু যে তুমি অশ্বমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক যজ্ঞ করে এত দানধ্যান করলে, সেই তোমার ধর্মরাজের পাশা খেলার মতো বিপরীত বুদ্ধিটা কী করে হল শুনি? সব তো খুইয়েছিলে, রাজ্য, ধন, অস্ত্র, ভাই এমনকী পরিণীতা স্ত্রীকেও। তুমি তো সরলতা, মৃদুতা, বদান্যতা, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা—এত সব ধর্মগুণের পরাকাষ্ঠা, সেই তোমার মতো লোকের জুয়ো খেলার মতো উল্টো বুদ্ধি হল কী করে—কথম্ অক্ষব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব।

দ্রৌপদী আরও অনেক কথা বলেছেন, দর্শনশাস্ত্রও বাদ যায়নি। বেশ বোঝা যায় শান্তরসের নায়ক যুধিষ্ঠিরের ধর্মকথা তাঁর কাছে সময়কালে ধর্মধ্বজিতাই মনে হয়েছে। যুধিষ্ঠির 'পণ্ডিতা' দ্রৌপদীর যুক্তি-তর্ক মেনে তাঁর বচন বিন্যাসভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন—বল্গু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং যাজ্ঞসেনি ত্বয়া বচঃ। কিন্তু এই প্রথম বাক্যটি বলেই যুধিষ্ঠির হৃদয়ে কোনও জটিলতা বোধ করলেন বোধহয়। দ্বিতীয় বাক্যেই তিনি বললেন, যত ভালই বলে থাক, কিন্তু যা বলেছ, নাস্তিকের মতো বলেছ। তর্কাহত ধর্মিষ্ঠ মানুষের শেষ অস্ত্র তর্কজয়ী মানুষকে নাস্তিক বলা। যুধিষ্ঠির কি পণ্ডিতা ঘরণীর সারকথা বুঝতে পেরেই তাঁকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করলেন। অনেক কথা যুধিষ্ঠির বললেন, তাতে ব্রাহ্মণ-সজ্জন, মুনি-ঋষিদের ধর্ম প্রমাণসিদ্ধ হল, কিন্তু রাজধর্ম, যা নিয়ে মহাভারতেরই অন্যত্রও বিশদ আলোচনা আছে এবং যে আলোচনা দ্রৌপদীর সপক্ষে যাবে, কই যুধিষ্ঠির তো তার ধারও মাড়ালেন না! তিনি স্ত্রীকে নাস্তিক বললেন এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দ্রৌপদীও ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়া তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত নয়। বস্তুত দৈবাধীন হয়ে বসে থাকা এবং সময়ের অপেক্ষা করা—যুধিষ্ঠিরের এই অলস নীতিতে দ্রৌপদীর আস্থা ছিল না। তাই ক্ষমা চেয়েও দ্রৌপদী বললেন—হঠকারিতা করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যেমন বোকামি, তেমনি দৈবের দোহাই দিয়ে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করাও এক ধরনের বোকামি। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিত করেই ব্যঙ্গ করলেন—যে নাকি দৈব মাথায় নিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে সুখে নিদ্রা যায়, তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। জলের মধ্যে সদ্য নির্মিত কাদার ঘটখানি রাখলে সে যেমন আপনিই গলে গলে জলের মধ্যে মিশে যায়, দৈবাধীন পুরুষের অবস্থাও তেমনই—অবসীদেৎ স দুর্বুদ্ধিঃ আমো ঘট ইবাম্ভসি।

দ্রৌপদী, বীরস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদী, পুরুষকারে বিশ্বাস করেন। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলতে চান—তুমি আমার জ্যেষ্ঠ স্বামী হলে কী হয়, তুমি যে হলে চাষারও অধম যুধিষ্ঠির। দেখ না, ক্ষেতের চাষিরাও লাঙল দিয়ে মাটি ফেড়ে বীজ বপন করে—পৃথিবীং লাঙ্গলেনেহ ভিত্ত্বা বীজং বপন্ত্যুত—তারপর কৃষক চুপটি করে বসে থাকে দৈবাধীন বৃষ্টিপাতের অপেক্ষায়। কৃষক ভাবে, যতটুকু আমার পুরুষকারে কুলোয়—লাঙল দিয়ে মাটি ফাড়া—সেটুকু আমি করেছি, তারপরেও যদি বৃষ্টিপাতের দৈব সাহায্য না পাই তা হলে আমার দিক থেকে অন্তত ত্রুটি নেই কোনও—যদন্যঃ পুরুষঃ কুর্যাৎ কৃতং তৎ সকলং ময়া। তেমনি ধীর ব্যক্তিরা তাঁর পৌরুষের কর্তব্যটি আগে সম্পন্ন করেন, তারপরেও যদি দৈব তার সহায়তায় হাত বাড়িয়ে না দেয়, তখন তিনি আত্মতুষ্ট থাকেন এই ভেবে যে তাঁর তো কোনও দোষ নেই। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের এই উত্তাপহীন অলস-দশা সহ্য করতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরকে তিনি মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছেন যে, শুয়ে পড়ে থাকা অলস ব্যক্তিকে অলক্ষ্মীতে ধরে—অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরম্। কিছু তো কর, কিছু করলে তবে তো তুমি

বলবে—আমি চেষ্টা করেছি, হয়নি—কৃতে কর্মণি রাজেন্দ্র তথানৃণ্যমবাপ্নুতে।

যুধিষ্ঠির কিছু করেননি, অন্তত সেই সময়ে কিছু করেননি। ঘরের বউ পণ্ডিতদের মতো বৃহস্পতির রাজনীতি উপদেশ দেবে, এ বোধ হয় তাঁর সহ্য হল না। কিন্তু তিনি যে দ্রৌপদীকে আরেক দফা নাস্তিক-টাস্তিক বলে বসিয়ে দেবেন সে উপায়ও রইল না, কারণ মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন ততক্ষণে বেশ একটু রাগত স্বরেই এগিয়ে এলেন দ্রৌপদীর পক্ষে—ক্রুদ্ধো রাজানম্ অব্রবীৎ। নরমে গরমে অনেক কিছুই বলে গেলেন ভীম, তাঁর সমস্ত বক্তব্য দ্রৌপদীর ভাষণের পাদটীকা মাত্র। সত্যি বলতে কি, ভীম দ্রৌপদীকে এতটাই ভালবাসেন যে, কখনও, কোনও সময়ে তাঁর কথার যৌক্তিকতা নিয়ে বিচার করেননি বেশি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে যতখানি বুঝি ভালবাসেন তার থেকেও বুঝি ভয় পান ; আর ভয় পান বলেই তাঁর ভালবাসার মধ্যে শুকনো কর্তব্যের দায় যেন বেশি করে ধরা পড়ে। পাঠক! খেয়াল করবেন, অজ্ঞাতবাসের আগে সব পাণ্ডবেরা যখন ভাবছেন কীভাবে, কোন কর্ম করে বিরাট রাজার রাজ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখবেন, তখন যুধিষ্ঠির বলছেন—এই আমাদের প্রাণের চেয়েও ভালবাসার পাত্রী দ্রৌপদী। মায়ের মতো এঁকে প্রতিপালন করা উচিত এবং বড়বোনের মতো ইনি আমাদের পূজনীয়াও বটে—মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা। অজ্ঞাতবাসের সময় অন্য মেয়েদের মতো দ্রৌপদী কি কিছু কাজকর্ম করতে পারবেন—ন হি কিঞ্চিৎ বিজানাতি কর্ম কর্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ।

কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে যুধিষ্ঠিরের এই কথাগুলি বাণী দেওয়ার মতো মনে হয়। মূলত, যুধিষ্ঠিরের কারণেই তাঁকে সমাজবহির্ভূত ভাবে পঞ্চস্বামী বরণ করতে হয়েছে। একথা একভাবে তাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশও হয়েছে এবং তা প্রকাশ হয়েছে মহাভারতের যুদ্ধ-মেটা শান্তিপর্বে যখন তাঁর জীবনেরও শেষ পর্ব উপস্থিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতিরা সব মারা যাওয়ায় যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের এই বৈরাগ্যই তো দ্রৌপদীর দু-চক্ষের বিষ। অথচ এই বৈরাগ্যই দ্রৌপদীকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা মহাভারতকার ব্যাসের নজর এড়ায়নি। দ্রৌপদী যে যুধিষ্ঠিরকে খুব ভাল চোখে দেখতে পারেন না, সে-কথা ব্যাসও রেখে ঢেকে পিতামহের মতো লঘু প্রশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন—দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ব্যাপারে চিরকালই একটু অভিমানবতী—অভিমানবতী নিত্যং বিশেষেণ যুধিষ্ঠিরে।

কিন্তু অভিমানের কথাগুলি কেমন ? দ্রৌপদী বললেন, অনেক কথাই বললেন, 'ক্লীব'-টিব ইত্যাদি গালাগালিও বাদ গেল না। রাজনীতি, দণ্ডনীতির মধ্যে দ্রৌপদীর অভিমানও মিশে গেল। বললেন—আজকে আমার এতগুলো স্বামী কেন—কিং পুনঃ পুরুষব্যাঘ্র পতয়ো মে নরর্ষাভাঃ। আমার তো মনে হয় তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন আমার স্বামী হলেই আমার যথেষ্ট সুখ হত। একোপি হি সখায়ৈষাং মম স্যাদিতি মে মতিঃ। (দ্রৌপদী শুধু অর্জুনকে ব্যঞ্জনা করেননি তো ?)। কিন্তু কপালের ফের, শরীরে যেমন পাঁচটা ইন্দ্রিয় থাকে তেমনি তোমরা পাঁচজনই আমার স্বামী। দ্রৌপদী ভুলে যাননি যে মূলত যুধিষ্ঠিরের পাশা-পণের চাপেই কৌরবসভায় তার চরম অপমান এবং পাশার দৌরাত্ম্যেই আবার অজ্ঞাতবাস। যুধিষ্ঠির নিজেও এ-কথা সবিনয়ে স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বীকার করলেই কী ? এই ব্যবহারগুলির মধ্যে দ্রৌপদী 'মা' কিংবা 'বড়বোনে'র সম্মান পাননি। পরবর্তীকালে দেখেছি, এতকাল বনবাস-যুদ্ধ এবং সত্যি সত্যি যুদ্ধের পর যখন আবার যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য এসেছে, তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—'তুমি উন্মাদ' এবং তোমার পাগলামির জন্যেই তোমার পাঁচ ভাইও আজ পাগল হতে বসেছে—তবোন্মাদান্মহারাজ সোন্মাদাঃ সর্বপাণ্ডবাঃ। দ্রৌপদী বললেন—জননী কুন্তী বলেছিলেন, সমস্ত শত্রুশাতন করে যুধিষ্ঠির তোমায় সুখে রাখবে। ছাই—তদ্ ব্যর্থং সংপ্রপশ্যামি। তুমি উন্মাদ, ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাও। ধূপ, কাজল আর নস্যির ব্যবস্থা নিয়ে কবিরাজ আসুন—ভেষজৈঃ স চিকিৎস্যঃ স্যাৎ...ধূপৈরঞ্জনযোগৈশ্চ নস্যকর্মভিরেব চ।

সত্যিই যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে এই দ্বিমাত্রিকতা আছে। যিনি আজকে দ্রৌপদীকে মায়ের মতো, বড়বোনের মতো প্রতিপাল্যা মনে করেন, তিনিই পূর্বে তাঁকে পাশা খেলায় পণ রাখেন কী করে ? ভীমের তো এইটেই খারাপ লেগেছে। তাঁর মতে পাশাখেলায় ধন-সম্পত্তি হেরে যাই, রাজ্য

হারাই—দুঃখ নেই। কিন্তু এটাই যুধিষ্ঠিরের বাড়াবাড়ি যে, তিনি দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন—ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে। বস্তুত যুধিষ্ঠির ছাড়া ভীম, অর্জুন কারও ব্যবহারেই দ্রৌপদী বৈষম্য খুঁজে পাননি। বিশেষত দ্রৌপদীর সম্বন্ধে ভীমের গৌরববোধ এতই বেশি যে, তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে—অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদীকে লুকিয়ে রাখা যাবে। যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের সাজ নিয়ে চিন্তা করেছেন অজ্ঞাতবাসের আগে। কিন্তু ভীম তো সেই প্রথম বনবাসে দ্বৈতবনে বসেই ভাবছেন দীপ্তিমতী দ্রৌপদীকে লুকিয়ে রাখবেন কী করে? অজ্ঞাতবাসের আবরণে ফুলটি না হয় লুকোনোই রইল, কিন্তু পাণ্ডবঘরণীর উদীর্ণ গন্ধ লুকোবেন কী করে?. সেই বনপর্বেই ভীম বলছেন—এই যে 'পুণ্যকীর্তি রাজপুত্রী দ্রৌপদী', ইনি এতই বিখ্যাত যে লোকের মধ্যে অপরিচিতার মতো থাকবেন কী করে—বিশ্রুতা কথম্ অজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি।

গর্বে বুঝি কৃষ্ণার বুক ফুলে উঠেছিল সেদিন। বুঝেছিলেন এই মানুষটিই তাঁর একমাত্র নির্ভর। কৌরবসভায় প্রিয়া মহিষীর অপমানে বারংবার যে মানুষটি সভাস্তম্ভের দৈর্ঘ্য মেপে মেপে দেখছিলেন, সেই মানুষটিই তাঁর একান্ত নির্ভর। তাঁর এই আস্থার প্রমাণ দিয়েছেন ভীম, দ্রৌপদীর মুখের এককথায় হিমালয় থেকে পদ্মফুল কুড়িয়ে এনে। বস্তুত দ্রৌপদীর ব্যাপারে ভীমের এই যে গৌরববোধ তা একেবারে মিথ্যে ছিল না। ধরে নিতে পারি যজ্ঞবেদী থেকে উঠবার সময়েই যে কুমারী—তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রুশ্চারুপীনপয়োধরা,—তিনি বিবাহসময়ে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ যৌবনবতী, পুষ্পবতী। বিবাহের পর বনবাসের সময় পর্যন্ত দ্রৌপদীর অনেক বছর কেটেছে। এতদিনে পঞ্চবীর স্বামীকে পাঁচ পাঁচটি বীর সন্তানও উপহার দিয়েছেন তিনি—প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক এবং শ্রুতসেন—এই পঞ্চপুত্রের জননী দ্রৌপদী। বনবাসপর্বে কৃচ্ছ্রতায় মালিন্যে বারো বছর কেটেছে, তবুও দ্রৌপদীর দেহজ আকর্ষণ বোধহয় একটুও কমেনি। ভীমের ভালবাসার ভয় তাই মিথ্যে নয়—বিশ্রুতা কথম্ অজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি। বিশেষত অন্য মানুষের কাছে দ্রৌপদীর আকর্ষণ এতই বেশি যে, ভীমের দায়িত্ব বারবার বেড়ে গেছে এবং বারবার তিনিই দ্রৌপদীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন, অর্জুন নন, যুধিষ্ঠির তো ননই।

স্মরণ করুন সেই দিনটির কথা। পাণ্ডবেরা সবাই দ্রৌপদীকে ঘরে একলা রেখে চারদিকে বেরিয়ে পড়েছেন মৃগয়ায়, নিজেদেরও খেতে হবে, ব্রাহ্মণদেরও খাওয়াতে হবে। কিন্তু এই সময়ে সিন্ধু-সৌবীর দেশের রাজা জয়দ্রথ মনে মনে বিয়ের ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলেন শাল্বরাজার নগরীতে। জয়দ্রথের বিয়ে হয়ে গেছে, প্রথিতযশা ধৃতরাষ্ট্রের তিনি জামাই, দুঃশলাকে বিয়ে করে স্বয়ং দুর্যোধনকে তিনি সম্বন্ধী বানিয়েছেন। কিন্তু জয়দ্রথের আবার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে, তাই আবার বরের সাজে বেরিয়ে পড়েছেন, তবে ছাতনাতলাটি ঠিক কোথায় এখনও ঠিক জানেন না। শাল্বনগরী থেকে আরও রাজা-রাজড়াদের বরযাত্রী নিয়ে তিনি কাম্যক বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাণ্ডবরাও তখন কাম্যক বনে এবং একলা ঘরে দ্রৌপদী। নির্জন বন। নতুন মেঘে বিদ্যুতের ছটা লাগলে যে শোভা হয়, দ্রৌপদীর আগুন-রূপের বিজলী লেগে বনস্থলীরও সেই দশা। তিনি কুটিরের দ্বারেই বসেছিলেন এবং চোখে পড়ে গেলেন জয়দ্রথের। শুধু জয়দ্রথ কেন, উপস্থিত সকলেই দ্রৌপদীকে না দেখে পারছিলেন না। ইনি অপ্সরা না দেবকন্যা—এইসব গতানুগতিক তর্কে অন্যেরা যখন ব্যস্ত, তখন কিন্তু জয়দ্রথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে—দৃষ্ট্বা তাং দুষ্টমানসঃ। অব্রবীৎ কামমোহিতঃ। বন্ধুকে ডেকে জয়দ্রথ দ্রৌপদীর সমস্ত খবর নিতে বললেন। মহাভারতকারের মতে ব্যাপারটা ছিল—ঠিক শেয়াল যদি বাঘের সুন্দরী বউয়ের খবরাখবর জানার চেষ্টা করে—সেইরকম—ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব।

আহা! জয়দ্রথের দিক থেকেও ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন পাঠক! নির্জন অরণ্যে একাকিনী সুন্দরী, যাঁর প্রতি অঙ্গসংস্থানে এখনও কোনও খুঁত নেই—'অনবদ্যাঙ্গী'—তাঁর দিকে যুবক পুরুষেরা তাকাবে না, বিশেষত যে যুবক বিবাহার্থী! আমি বেশ জানি, জয়দ্রথ জ্ঞাতি-সম্বন্ধে পাণ্ডবদের পূর্বপরিচিত হলেও পাণ্ডব ঘরণীকে তিনি চিনতেন না। নির্জন অরণ্যে একচারিণী সুন্দরীকে দেখে বিবাহার্থী যুবকের মনে এই ইচ্ছে হতেই পারে যে, এই সুন্দরীকেই বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে

যাই—এতামেব অহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্। তবে সন্দেহ এই—এমন চেহারা, ভুরু, দাঁত, চোখ, কোনও কিছুতেই খুঁত নেই, উত্তমাঙ্গ অধমাঙ্গ অনালোচ্য, শুধু বলি তনুমধ্যমা—ইনি আমাকে পছন্দ করবেন তো ? জয়দ্রথ বন্ধুকে খোঁজ করতে পাঠালেন।

আমি বলি, দ্রৌপদীরও দোষ ছিল। না হয় তিনি পঞ্চস্বামিগর্বিতা রাজপুত্রী। কিন্তু সুন্দরী অরণ্যভূমির মধ্যে বিশেষত যেখানে তাঁর পাঁচ স্বামীই বাইরে গেছেন—সেখানে এই খ্যাপা হাওয়ায়—ব্যাধূয়মানা পবনেন সুভ্রু—কুটির দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন কী ? দ্রৌপদীর আরও দোষ—এমন আগুনপানা রূপ যখন—দেদীপ্যমানাগ্নিশিখেব নক্তং—সেখানে দুয়ার থেকে নেমে এসে (দ্রৌপদী বিলক্ষণ জানতেন—রাজপুরুষেরা তাঁকে দেখছিলেন, সর্বে দদৃশুস্তাম্ অনিন্দিতাম্, জয়দ্রথ তাকে দেখে বন্ধুর কাছে গুনগুন করছিলেন এবং বন্ধু কোটিকাস্য তাঁর দিকে আসছে দেখেও)—দুয়ার থেকে নেমে এসে চিরকালের প্রেমের প্রতীক কদমগাছের একখানি অবাধ্য ডাল নুইয়ে ধরেছিলেন কেন—কদম্বস্য বিনাম্য শাখাম্ একাশ্রয়ে তিষ্ঠসি শোভমানা। দ্রৌপদী কি বুঝতে পারছিলেন না, এই শাখা নোয়ানোর আয়াসে, আন্দোলিত শরীরে, খ্যাপা হাওয়ায় তাঁকে আরও মোহিনী, আরও সুন্দরী লাগছিল !

দ্রৌপদী গাছের ডাল ছাড়লেন। যখন নাকি জয়দ্রথের বন্ধু তাঁর সহগামী সমস্ত রাজপুরুষের একে একে পরিচয় দিয়েছেন, তখন দ্রৌপদী কদম্বের ডাল মুক্ত করলেন। যখন জয়দ্রথের পরিচয় দিয়ে বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কার বউ, কার মেয়ে—তখন দ্রৌপদী গাছের ডাল ছাড়লেন। সেই তখনই দ্রৌপদী মন্দ ভাবনায় উত্তমাঙ্গের ক্ষৌম বনবাসখানি আরও একটু টেনে নিলেন—অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং সংগৃহ্নতী কৌশিকম্ উত্তরীয়ম্। সংরক্ষণশীলেরা বলবেনই—দ্রৌপদীর দোষ ছিল। কিন্তু মহাশয় ! দ্রৌপদীর ব্যবহারে লুকানো আছে চিরকালের বিবাহিতা রমণীর মনস্তত্ত্ব। বিবাহিতা বলে কি নিজের যৌবন অন্য পুরুষের চোখের আলোয় একটুও পরীক্ষা করবে না রমণী ! একটুও পরখ করবে না, এই বেলাতেও তার আকর্ষণ আছে কিনা ? দ্রৌপদী এতক্ষণ কদমগাছের শাখা টানাটানি করে এই পরীক্ষাই চালিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষায় সফল হওয়া মাত্রেই ঈষৎ-স্রস্ত উত্তরীয় টেনে নিয়েছেন। নিশ্চয় বিপদ বুঝে—অবেক্ষ্য মন্দম্।

আমরা কি দ্রৌপদীর মনস্তত্ত্ব-চিন্তায় প্রসঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি ? আমরা দ্রৌপদীর প্রতি ভীমের স্বামি-ব্যবহার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু দ্রৌপদী যেমন স্বামী থাকতেও নিজের অস্তিত্ব, নিজের আকর্ষণ যাচাই করে নিলেন, আমরাও তেমনি একটু অন্য প্রসঙ্গ থেকে ঘুরে এলাম। বলা বাহুল্য, দ্রৌপদী বিদগ্ধা রমণী, ঠারে-ঠোরে আপন মাধুর্যের পরীক্ষা শেষ হতেই বিদগ্ধা বিবাহিতার পতিগৌরব ফিরে আসে। দ্রৌপদীরও তাই হয়েছে, অতএব আমরাও প্রসঙ্গে উপস্থিত। জয়দ্রথের বন্ধু দ্রৌপদীর মুখে পঞ্চপাণ্ডবের বৃত্তান্ত শুনে এসে জয়দ্রথকে জানাল। জানাল সে পাণ্ডবদের প্রিয়া পত্নী।

মধুলম্পট যে ভ্রমর একবার মল্লিকা ফুলে বসেছে, তার আর অন্য ফুল ভাল লাগে না, এ-কথা রসিক আলংকারিকেরা বলেছেন। জয়দ্রথের অবস্থায় এখন তাই। সে বললে—বিবাহিতা রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা এই মহিলাকে দেখে আর ফেরার পথ নেই—সিমন্তিনীনাং মুখ্যায়াং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্। বস্তুত দুর্যোধনের বোন দুঃশলা, যে তার পূর্ব-পরিণীতা বধূও বটে, সেই দুঃশলাকেও বুঝি দ্রৌপদীর তুলনায় বানরী বলে মনে হচ্ছিল জয়দ্রথের কাছে—যথা শাখামৃগস্ত্রিয়ঃ। জয়দ্রথ মনের বেগ আর সহ্য করতে না পেরে সোজা উপস্থিত হল দ্রৌপদীর কাছে। বলল—সব ভাল তো, তুমি, তোমার স্বামীরা ?

ঠাকুরজামাই বাড়ি এলেন। দ্রৌপদী বললেন—ভাল আছি গো ঠাকুরজামাই, সবাই ভাল আছি। যুধিষ্ঠির, তাঁর ভাইয়েরা এবং আমি—সবাই ভাল। এই নাও পা ধোবার জল, এইখানটায় বোস। আজকে তোমায় পাঁচশো হরিণের মাংস দিয়ে প্রাতরাশ খাওয়াব, ঠাকুরজামাই—মৃগান্ পঞ্চশতঞ্চৈব প্রাতরাশান্ দদানি তে। জয়দ্রথ বললে—তোমার প্রাতরাশ মাথায় থাকুক—কুশলং প্রাতরাশস্য—এখন আমার রথে ওঠ। রাজ্যহীন বনচারী পাণ্ডবদের উপাসনা করার যোগ্য নও তুমি। তুমি হবে আমার বউ—ভার্যা মে ভব সুশ্রোণি। দ্রৌপদীর বুক কেঁপে উঠল। ভ্রূকুটি-কুটিল

কটাক্ষে একটু সরে গিয়ে দ্রৌপদী বললেন—লজ্জা করে না তোমার, কী সব বলছ ? বিপদ বুঝে বিদগ্ধা রমণী অপেক্ষা করতে লাগলেন স্বামীদের, আর মুখে নানা মিষ্টি কথা বলে রীতিমতো ভুলিয়ে দিলেন জয়দ্রথকে—বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী। পাঁচ পাঁচটা জোয়ান মরদকে যিনি হেলায় ভুলিয়ে রেখেছেন, তাঁর পক্ষে কিছু সময়ের জন্য জয়দ্রথকে ভোলানো অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যে দুষ্ট মানুষ, কামার্ত। দ্রৌপদীকে আবার রেগে উঠতে হল। ইন্দ্রকল্প স্বামীদের কুৎসা তিনি আর সইতে পারছিলেন না। স্বামীদের বল-বীর্য সম্বন্ধে তিনি কিছু বলাও প্রয়োজন বোধ করলেন।

স্বামীদের প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ভাব-ভাবনার কথায় এই অংশটুকুই আমার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দুষ্টজনের কাছে স্বামি-গৌরব করতে হলে সব স্বামীরই গৌরব করতে হয়। সেই সাধারণীকরণের সভ্যতার মধ্যে থেকে স্ত্রী-হৃদয়ের নির্ভরতা বের করে আনা কঠিন। এখানে যুধিষ্ঠিরকেও সংগ্রামী ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বললেন—তুমি ভাবছ যুধিষ্ঠিরকে জয় করে আমায় নিয়ে যাবে। এটা কেমন জান—কেউ যদি হাতে একটা ছড়ি নিয়ে ভাবে, 'আমি হিমালয়ের পাহাড়ি হাতি মেরে ফেলব', সেইরকম। তা ছাড়া রেগে যাওয়া ভীমকে কি তুমি দেখেছ ? দেখনি। পালিয়ে যেতে যেতে যখন দেখবে, তখন মনে হবে 'ঘুমিয়ে থাকা মহাবল সিংহের দাড়ি ধরে টেনেছি, এখন উপায়—সিংহস্য পক্ষ্মানি মুখাল্লুনাসি'।

দ্রৌপদী অর্জুনের বেলাতেও সিংহের উপমা দিলেন। নকুল-সহদেবেরও কম প্রশংসা করলেন না। কিন্তু জয়দ্রথ ছাড়বেন কেন, তিনি পাণ্ডবদের নিন্দা করেই চললেন এবং প্রচুর ছুঁয়ো-না, ছুঁয়ো-না'র মধ্যেও দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টান দিলেন। টানের চোটে দ্রৌপদী জয়দ্রথের কাছে এলেন বটে, কিন্তু তিনি তো সীতা-সাবিত্রী নন কিংবা অত 'স্পর্শকাতর'ও নন, কাজেই নিজের আঁচলের উল্টো টানে জয়দ্রথকে তিনি ফেলে দিলেন মাটিতে—সমবাক্ষিপৎ সা। পাঞ্চালী-মেয়ের ঠেলা জয়দ্রথ সামলাতে পারল না, কিন্তু পড়ে গিয়েও সে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে উঠে এল। আঁচল ধরে সে যখন টানতেই থাকল, তখন দ্রৌপদী ধৌম্য পুরোহিতকে জানিয়ে উঠে পড়লেন জয়দ্রথের রথে। আমি নিশ্চয় জানি, অনুরূপ পরিস্থিতিতে দণ্ডক-গতা সীতার সঙ্গে দ্রৌপদীর তফাত হল—নিজের অনিচ্ছায় পুরুষের স্পর্শমাত্রেই তিনি কাতর হন না—তার পরীক্ষা দুঃশাসনের টানাটানিতেই হয়ে গেছে। দ্রৌপদী যদি ব্যাসের না হয়ে বাল্মীকির হতেন, তা হলে হয় তাঁকে এখন 'সুইসাইড' করতে হত নয়তো মায়া-দ্রৌপদী হয়ে জয়দ্রথের সঙ্গে যেতে হত। দ্বিতীয়ত, দুঃশাসনের অভিজ্ঞতায় তিনি স্বেচ্ছায় রথে উঠেছেন—সাকৃষ্যমাণা রথম্ আরুরোহ। তৃতীয়ত, দ্রৌপদীর সুবিধে ছিল, তাঁর 'রাম' একটি নয়, পাঁচটি ; তাঁর অবিচল ধারণা ছিল—পাঁচটি যখন পাঁচ দিকে মৃগয়া করতে গেছে, তখন তাঁর চিৎকারে একটা না একটা স্বামীকে বনপথেই পাওয়া যাবে। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় রথে উঠলেন।

সত্যিই পাণ্ডবেরা এসে গেলেন। ঘরে ফিরে ঘটনা শুনেই তাঁরা জয়দ্রথের পিছু নিলেন। একসময়ে জয়দ্রথ তাঁদের দেখতে পেলেন এবং ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। আমি আগেই বলেছি, জয়দ্রথ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী কাউকেই ভাল চিনতেন না। সে দ্রৌপদীকে স্বামি-পরিচয় দিতে বলল এবং ঠিক এইখানটায় শত সাধারণীকরণের মধ্যেও দ্রৌপদী কোন স্বামীকে কেমনটি দেখেন তার একটা দ্বিধাহীন বর্ণনা আছে। প্রত্যেক স্বামী সম্বন্ধে দ্রৌপদীর গৌরবের মধ্যেও কোথাও যেন তাঁর পক্ষপাতের বিশেষ আছে। ঠিক এই বিশ্লেষণটায় পৌঁছনোর জন্যই আমাকে জয়দ্রথের পথটুকু অতিক্রম করতে হল।

ভীত ত্রস্ত জয়দ্রথ বললেন—ওই এলেন বুঝি তোমার স্বামীরা। একটু বুঝিয়ে বলবে সুন্দরী, কার কেমন ক্ষমতা ? দ্রৌপদী বললেন, তোমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে—এখন আর ওসব বলেই বা কী হবে ? তবে কিনা মৃত্যু পথের পথিক যে, তার শেষ ইচ্ছে পূরণ করা ধর্ম, তাই বলছি। ওই যে দেখছ—চোখ দুটো টানা টানা, ফরসা চেহারার মানুষটি—ইনি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ যুধিষ্ঠির, লোকে যাঁকে ধর্মপুত্র বলে ডাকে। শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাকেও ইনি প্রাণদান করেন।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠিরের বল, বীর্য, যুদ্ধক্ষমতা—এইসব বীরসুলভ গুণের দিকে দ্রৌপদীর আর কোনও নজর নেই, তাঁর দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির শরণাগত শত্রুরও পালক অর্থাৎ নিজের কিংবা আপনজনের ক্ষতি

স্বীকার করেও তিনি শত্রুকে বাঁচান। দ্রৌপদী এবার ভীমের প্রসঙ্গে এলেন, বললেন—ওই যে দেখছ শাল খুঁটির মতো লম্বা চেহারা, বড় বড় হাত ; ভ্রূকুটি-কুটিল চোখ আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে যাচ্ছে, ইনিই আমার স্বামী ভীম। লোকে ওকে ভীম বলে কেন জান—ওর কোনও কাজই সাধারণ মানুষের মতো নয়। তৃতীয় ব্যক্তির চোখ থেকে সরে এসে একান্ত আপন এবং নিবিড় দৃষ্টিতে ভীমকে যেমন লাগে, দ্রৌপদী এবার তাই বলছেন—অন্যায় করে এই মানুষটির কাছে বাঁচবার আশা কম। তা ছাড়া শত্রুতার একটি শব্দও ইনি ভোলেন না—নায়ং বৈরং বিস্মরতে কদাচিৎ—এবং শত্রুর প্রাণ না নেওয়া পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি থাকে না।

দ্রৌপদী যা বলেছেন, তার প্রমাণও তিনি পেয়েছেন। কৌরবদের পাশাখেলার আসরে একমাত্র ভীমই চুপ করে থাকতে পারেননি। বারংবার তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সভাগৃহ কেঁপে উঠেছিল, এবং ভবিষ্যতে দ্রৌপদীর এই ধারণা প্রমাণিত করেছে যে, ভীম কখনও শত্রুতা ভোলেন না। অথচ দেখুন, যে অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর মালাবদল হয়েছিল এবং যাঁর মতো বীর সমকালে প্রায় কেউ ছিল না, তাঁর অনেকগুণের পরিচয় দিয়ে দ্রৌপদী বললেন—ইনি যুধিষ্ঠিরের শুধু ভাইই নয়, শিষ্যও বটে—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। ছোটভাই বড়ভাইয়ের কথায় ওঠেন বসেন, অন্য মানুষের কাছে এর থেকে বেশি পারিবারিক গৌরব আর কী আছে। কিন্তু দ্রৌপদীর ব্যক্তিজীবনেও তাঁর এই বিশ্লেষণের গুরুত্ব আছে। সেই যেদিন কুন্তী-যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ভিক্ষা ভেবে ভাগ করে নিলেন, সেদিনও এই মানুষটি কিছু বলেননি। তারপর দিন গেছে, রাত গেছে, কৌরবসভায় সেই চরম অপমানের দিন এসেছে, অর্জুন কিছুই বলেননি, কেননা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ এবং তিনি যদি কোনও উচ্চবাচ্য না করেন অর্জুনও করবেন না, কারণ ইনি 'ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য'। এই ব্যবহার বোধহয় দ্রৌপদীর ভাল লাগেনি, এমনকী ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রুখে ওঠেন, তখন তাঁকেও শান্ত করে দেন এই অর্জুন। দ্রৌপদীর চোখে তিনি তাই যুধিষ্ঠিরের ভাই এবং ভাবশিষ্য।

জয়দ্রথের সেনাবাহিনী এবং পঞ্চপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধল। প্রথমেই যাকে নির্ভীক ভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল—তিনি ভীম। অবশ্য স্ত্রীরক্ষার জন্য এখানে যুধিষ্ঠির থেকে সহদেব সবাই যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ছেড়ে বনের মধ্যে পালালেন এবং যে মুহূর্তে ভীম তা জানতে পারলেন, সেই মুহূর্তেই ধর্মরাজকে তিনি বললেন—সবাইকে নিয়ে আপনি কুটিরে ফিরে যান এবং দ্রৌপদীকে দেখা-শোনা করুন। জয়দ্রথকে আমি দেখছি, তার আজকে বেঁচে ফেরা কঠিন। যুধিষ্ঠির জানেন তাঁর অনুপস্থিতিতে জয়দ্রথ যদি ভীমের হাতে পড়ে, তাহলে দলাপাকানো মাংসপিণ্ড ছাড়া জয়দ্রথকে আর চেনা যাবে না। যুধিষ্ঠির অনুনয় করে বললেন—ভগিনী দুঃশলা বিধবা হবে, জননী গান্ধারীর একমাত্র কন্যা বিধবা হবে। এই দুঃশলা আর গান্ধারীর কথা মনে রেখে অন্তত তাকে প্রাণে মেরো না—দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।

দ্রৌপদী প্রথমেই ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠলেন ভীমকে—ভীমম্ উবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া। তারপর দেখলেন অর্জুনের মতো সম্মানিত পুরুষও সেখানে দাঁড়িয়ে। তখন দুজনকেই যেন উদ্দেশ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথার প্রতিবাদ জানালেন দ্রৌপদী। তিনি বললেন—যদি আমার ভাল লাগার কথা বল, তাহলে মানুষের অধম সেই জয়দ্রথকে কিন্তু মারাই উচিত—কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ। জনান্তিকে বলি—'আমার ভাল লাগবে' এই কথাটা কিন্তু অবশ্যই ভীমের উদ্দেশে, কারণ তিনিই এ-ব্যাপারে একমাত্র উদ্যোগী ছিলেন এবং দ্রৌপদীর ভাল লাগার মূল্যও তিনিই সবচেয়ে বেশি দেন। সেইজন্যেই বুঝি ভীমকে তিনি প্রথমে বলতে আরম্ভ করেছিলেন। দ্রৌপদী বললেন—যে পরের বউ চুরি করে এবং যে রাজ্য চুরি করে সেই অপরাধী বারবার যাচনা করলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

আমার ধারণা, এই রাজ্য চুরির কথাটা যে হঠাৎ দ্রৌপদীর মুখে এল, তা এমনি এমনি নয়। ব্যাস এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর বিশেষণ দিয়েছেন 'কুপিতা, হ্রীমতী, প্রাজ্ঞা'। প্রাজ্ঞা দ্রৌপদী এ-কথাটা অর্জুনের উদ্দেশে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভাবটা এই—যারা রাজ্য চুরি করেছে তাদের তো

ছেড়েই দিয়েছ, এখন বউ-চুরির ব্যাপারে কী কর দেখি—পুরুষ মানুষেরা তো এই দুটি বস্তুকেই জমি বলে ভাবে। ভীম-অর্জুন ঝড়ের বেগে গিয়ে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন এক ক্রোশের মাথায়। তিনি তখন বনের পথে পালাচ্ছেন। অর্জুন নায়কের মতো বললেন—এই ক্ষমতায় পরের বউ চুরি করতে আস ? পালিয়ে যেয়ো না, ফিরে এসো বলছি। কিন্তু জয়দ্রথ কি আর সেখানে থাকে। এবারে ভীম হঠাৎ করে ছুট লাগালেন জয়দ্রথের পেছনে—দাঁড়া ব্যাটা, যাচ্ছিস কোথায়—তিষ্ঠ তিষ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজের শিষ্য বিবেকরূপী অর্জুন চেঁচিয়ে বললেন—প্রাণে মেরো না ভাই—মা ব্যধীরিতি।

ভীম প্রথমেই জয়দ্রথের চুলের মুঠি ধরে তার মুখটা একটু বনের মাটিতে ঘঁষে নিলেন। তারপর দু-চার ঘা চড়ালেন মাথায়। তারপরের ব্যাপারটা অনেকটা হিন্দি সিনেমার মতো। খলনায়ক মাটিতে পড়ে গেছে, আর নায়ক বলছে 'উঠ্ উঠ্', তারপর আবার মার। তেমনি জয়দ্রথ যেই একটু সামাল দিয়ে মাটি থেকে উঠতে চায়—পুনঃ সঞ্জীবমানস্য তস্যোৎপতিতুমিচ্ছতঃ—অমনি ভীমের লাথি। এবার থামালেন অর্জুন। কিন্তু ভীম কি থামতে চান। তিনি অর্জুনের তূণ থেকে একখানি আধা-চাঁদের মতো বাণ দিয়ে জয়দ্রথের মাথাটা পাঁচ জায়গায় চেঁছে নিলেন, তারপর তাকে নিয়ে এলেন সেই বনের কুটিরে, যেখানে দ্রৌপদী আছেন, যুধিষ্ঠির আছেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের অবস্থা দেখে বললেন—এবার ছেড়ে দাও ভাই—মুচ্যতামিতি চাব্রবীৎ।

দ্রৌপদী জয়দ্রথকে পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য—ইনি যুধিষ্ঠিরের শিষ্য অর্জুন। জয়দ্রথের ঝুঁটি-ধরা মানুষটি যদি সেই অর্জুন হতেন, তাহলে যুধিষ্ঠিরের কথা মুখ দিয়ে বেরনো মাত্রেই তিনি মুক্ত হতেন। কিন্তু ইনি তো অর্জুন নন, ভীম। কাজেই যুধিষ্ঠিরের কথায় কাজ হল না। কৌরবের রাজসভায় দ্যূতক্রীড়ায়, এবং দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর যে অপমান হয়েছিল, তার সমমর্মী যুধিষ্ঠিরও নন, অর্জুনও নন। তার ওপরেও জয়দ্রথকে ধরতে যাবার আগে দ্রৌপদী যে ভীমকেই প্রথম ডেকে উচ্চ করে বলেছিলেন—যদি আমার ভাল লাগার কথা বল—কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ—তাহলে জয়দ্রথকে শেষ করে দেবে। সবার মধ্যে দ্রৌপদীর এই আকুল আবেদন ভীম ভুলে যাবেন কী করে ? হন না তিনি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। ভীম সোজা বললেন—আপনার কথায় ছাড়ব না, আপনি দ্রৌপদীকে বলুন—রাজানং চাব্রবীদ্ ভীমো দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি। যুধিষ্ঠিরের কথা মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁর কাতর অবস্থা দেখে দ্রৌপদীর বুঝি মায়া হল। জয়দ্রথের ওপরে যতখানি, তার চেয়েও বেশি বোধ হয় যুধিষ্ঠিরের ওপর। হাজার হোক জ্যেষ্ঠ স্বামী বটে, যুধিষ্ঠিরের মুখ চেয়েই—অভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্—দ্রৌপদী বললেন—যাক্ এর মাথাটা তো কামিয়ে নিয়েছ, এবার এটা পাণ্ডবদের দাস হয়ে গেছে, একে এবার ছেড়েই দাও। ছাড়া পেল দুর্যোধনের ভগ্নীপতি জয়দ্রথ। দ্রৌপদী আবার চিনলেন ভীম, অর্জুন এবং যুধিষ্ঠিরকেও।

বারো বছর বনের পথে চলে-ফিরে পুরো এক বছরের অজ্ঞাতবাসের সময় হয়ে গেল। ভীম তো সেই কবেই যুধিষ্ঠিরকে শাসিয়ে রেখেছেন—অজ্ঞাতবাসে দ্রৌপদীর এই আগুনপানা রূপ আপনি লুকিয়ে রাখবেন কী করে—বিশ্রুতা কথম্ অজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি। কিন্তু বনের ফল আর মধু-খাওয়া গতানুগতিক মুখে অজ্ঞাতবাসের নতুনত্ব সব পাণ্ডবদের মুখেই বোধ হয় তেঁতুলের চাটনির কাজ করল, দ্রৌপদীর তো বিশেষত। যুধিষ্ঠির, ভীম—সবাই একে একে 'আমি এই সাজব', 'আমি সেই সাজব'—এমনি করে নতুন ঘরের কল্পলোক তৈরি করলেন। সেখানে দ্রৌপদীও পেছিয়ে থাকবেন কেন! যুধিষ্ঠির অবশ্য বিরাটরাজার সঙ্গে আবার নতুন করে পাশার ছক পাতার গন্ধে দ্রৌপদীর বনবাসের কষ্টটা ভুলেই গেছিলেন। তিনি বেশ কর্তাঠাকুরের মতো বললেন—আমরা সবাই তো এটা-ওটা করব ঠিক করলাম, কিন্তু দ্রৌপদীর তো অন্য বউদের মতো কাজকর্ম তেমন কিছু জানে না—ন হি কিঞ্চিদ্ বিজানাতি কর্ম কর্ত্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ। ছোটবেলা থেকে যখন যেখানে গেছেন, দ্রৌপদী তো গয়না, কাপড়, এসেন্স আর বেণীতে ফুল গোঁজা ছাড়া আর কিছু জানেন না—মাল্যগন্ধান্ অলংকারাণ্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। এতান্যেবাভিজানাতি যতো যাতা হি ভাবিনী ॥ বিরাটরাজার ঘরে ইনি কি কিছু করতে পারবেন ?

কীই বা বলার আছে! জ্যেষ্ঠ-স্বামী, বড় মুখ করে বলছেন। দ্রৌপদী আর কীই বা বলেন। হ্যাঁ

বনবাসের কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও দ্রৌপদীর দাস-দাসী প্রচুর ছিল, কিন্তু তাই বলে দিন রাত শাড়ি-গয়নার চিন্তা করার মতো অবিদগ্ধা নন দ্রৌপদী। হয়তো তাঁর মনে পড়ল—বিয়ের নববধূকে পাণ্ডবেরা কুমোরশালায়পরের বাড়িতে এনে তুলেছিলেন। হয়তো মনে পড়ল—সুখের মুখ দেখেছিলাম দুদিন বই তো নয়—সেই খাণ্ডবপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের পরে। তারপরেই তো আবার পাশার আসর বসল আর কপালে জুটল বারো বছরের বনবাস, এক বছরের অজ্ঞাতবাস। তবু দ্রৌপদী এসব কথায় কথা বাড়ালেন না। বরঞ্চ অজ্ঞাতবাসের নতুন সাজের কথায় যেন বেশ মজাই পেয়েছেন, এমনি মেজাজে বললেন—লোকে তো ঘরে শিল্পকর্মের জন্য দাসী রাখে, যদিও ভদ্রঘরের মেয়ে-বউরা সে কাজ করেন না—একথা সবাই জানে—ইতি লোকস্য নিশ্চয়ঃ। আমি বিরাটরাজার রানির বাড়িতে সৈরন্ধ্রীর কাজ করব, তাঁর চুল বাঁধব, তাঁকে সাজিয়ে দেব।

দ্রৌপদী 'সৈরন্ধ্রী' কথাটার একটা বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁর বক্তব্যের প্রথম লাইনে। সৈরন্ধ্রীকে লোকে দাসীকর্মের জন্য রাখে এবং যে রাখে সে তাকে পালন করে। টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখিয়েছেন—সৈরন্ধ্রী পরের ঘরে থাকে, কিন্তু সে স্বাধীনও বটে। সে দাসী হলেও খানিকটা অরক্ষিতা অর্থাৎ কিনা স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে গৃহকর্তার যে দায়িত্ব থাকে, দাসীর ব্যাপারে তা থাকে না। আবার এই দাসীর চাকরিটা যেহেতু দাসীর নিজের হাতেই, তাই সে খানিকটা স্বাধীনও বটে অর্থাৎ তার অরক্ষণের ভাগ দিয়ে যদি কোনও বিপদ আসে, তাহলে সে চাকরি ছেড়েও দিতে পারে। কিন্তু মজা হল কাজের লোক যদি অতি সুন্দরী হয়, তবে তাকে নিয়ে গৃহকর্ত্রীর বিপদ আছে, বিশেষত সেকালের পুরুষ মানুষের কাছে মা আর বোন ছাড়া আর সবাই বুঝি গম্যা ছিলেন। যা হোক সবাই যখন নানা বেশে নানান ছাঁদে বিরাট রাজ্যে ঢুকে নিজের নিজের কাজ বাগিয়ে নিলেন, তখন দ্রৌপদীও কাজের লোকের মতো একটি ময়লা কাপড় পরে নিলেন। কিন্তু ময়লা কাপড় পড়লে কি হয়, তিনি যেহেতু বড় ঘরে চুল বাঁধার কাজ করবেন, তাই নিজের চুলেই যত পারেন বেশ খানিকটা কায়দা করে নিলেন। শুধু এপাশের চুল ওপাশে নিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, কালো চুলে চিকন-মৃদু, দীর্ঘ-হ্রস্ব গ্রন্থি তুলে বড়ো বাহারি সাজে সাজলেন দ্রৌপদী। অ্যাডভারটাইজমেন্ট।

ময়লা কাপড়ের মধ্যে থেকে যে আগুনপানা রূপ চোখে পড়ছিল, আর কথাবার্তায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল এমনি বিদগ্ধতা যে, বিরাট-নগরের স্ত্রী-পুরুষ কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, পেটের দায়ে দ্রৌপদী খেটে খেতে এসেছেন—ন শ্রদ্দধত তাং দাসীম্ অন্নহেতোরুপস্থিতাম্। বিরাটরাজার রানি সুদেষ্ণা পাঞ্জাব-ঘেঁষা কাশ্মীর অঞ্চলের মেয়ে। ছাদের আলসে থেকে অমন আলো-ছড়ানো রূপ দেখে তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে আনলেন। বললেন, "কে গো তুমি মেয়ে, কী চাও"? "কাজ চাই, যে কাজে লাগাবে, তার বাড়িতেই থাকব"—দ্রৌপদী বললেন। সুদেষ্ণা বললেন—এই কি কাজের লোকের চেহারা—নৈবংরূপা ভবন্ত্যেব যথা বদসি ভাবিনি? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি নিজেই মাল্‌কিন। নইলে এমন চেহারা, হাত, পা, নাভি, নাক, চোখ—সবই সুন্দর, সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা। কথা বলার ঢঙও তো একেবারে হাঁসের মতো—হংসগদ্‌গদভাষিণী। এক কথায় তুমি হলে দারুণ 'স্মার্ট', যেন কাশ্মীরি ঘোড়া—কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী—আর লক্ষ্মীর মতো রূপ তোমার।

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর তুলনায় উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, সবাইকেই স্মরণ করলেন। দ্রৌপদী সলজ্জে বললেন—ওসব কিছুই নয়, নাস্মি দেবী ন গন্ধর্বী। আমি সৈরন্ধ্রী, খোঁপা বাঁধার কাজটি জানি ভাল, কুমকুম-চন্দনের অঙ্গরাগ তৈরি করি আর চাঁপা-মল্লিকার বিচিত্র মালা গাঁথতে পারি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, যেখানে যেখানে ভাল খাওয়া-পরা পাই—বাসাংসি যাবচ্চ লভে লভমানা সুভোজনম্—সেখানে সেখানেই আমি থাকি। সুদেষ্ণা বললেন—তোমাকে মাথায় করে রাখতে পারি—মূর্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং, কিন্তু ভয় হয়, স্বয়ং রাজা যদি তোমার রূপ দেখে তোমার প্রেমে পড়ে যান। দেখ না, রাজকুলের মেয়েরাই তোমাকে কেমন ড্যাব্ ড্যাব্ করে দেখছে, সেখানে পুরুষমানুষের বিশ্বাস আছে—পুমাংসং কং ন মোহয়ে—তারা তো মোহিত হবেই। এখন যদি বিরাটরাজা তোমার রূপ দেখে আমাকে ছেড়ে তোমাকে ধরেন—বিহায় মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্বেণ

চেতসা। না, না, বাপু, তুমি এস, যেই তোমাকে দেখবে, তারই মাথা পাগল হবে, প্রেমে নয়, কামেই। তোমার মতো মেয়েমানুষকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া আর গাছের চুড়োয় উঠে আত্মহত্যা করা সমান।

দ্রৌপদী বললেন—কি বিরাটরাজা, কি আর কেউ, অন্য কোনও পুরুষ আমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আমার পাঁচটি গন্ধর্ব স্বামী আছে, তাঁরা আড়াল থেকে অদৃশ্যভাবেই আমাকে রক্ষা করেন শুধু একটা শর্ত—আমাকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেবেন না অথবা কাউকে পা ধুইয়ে দিতে বলবেন না। এতেই আমার স্বামীরা সন্তুষ্ট। আমার রূপ দেখে কোনও পুরুষ যদি আমার পেছনে ছোঁক ছোঁক করে—যো হি মাং পুরুষো গৃধ্যেৎ—তাকে পরপারে যেতে হবে সেই রাত্রেই। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাকে সতীধর্ম থেকে টলানো অত সস্তা নয়, আমার অদৃশ্য স্বামীরা আছেন না! দ্রৌপদীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিরাটরানি সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে প্রধান পরিচারিকার স্থান দিলেন।

পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামীর মধ্যে প্রধানত যাঁর ভরসায় দ্রৌপদী এত কথা বললেন, সেই মধ্যম পাণ্ডব ভীম কিন্তু দ্রুপদের পাকশালায় রাঁধার কাজে ব্যস্ত। ভাল খাইয়ে বলে ভীমের নাম ছিল, কাজেই রন্ধনশালায় ভীমের দিন খারাপ কাটছিল না। মাঝে মাঝে রাজার সামনে কুস্তির লড়াইতেও অংশ নিচ্ছিলেন তিনি। দ্রৌপদীরই একটু কষ্ট হচ্ছিল বুঝি, একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সবারই পরিশ্রমের কাজ, সবাই রাজাকে কাজ দেখিয়ে তোষানোর চেষ্টা করছেন। দেওরপানা নরম-স্বামী নকুল-সহদেবের গরু-ঘোড়ার তদারকি দ্রৌপদীর স্ত্রীহৃদয়ে মমতা জাগাচ্ছিল। আবার ধরুন ভারতের 'চিফ্ অব্ দ্য আর্মি-স্টাফকে' যদি রবীন্দ্রভারতীর কলা বিভাগে কুচিপুড়ি শেখাতে হয়, তাহলে তার বউয়ের যে মর্মপীড়া হয়, বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখে দ্রৌপদীর সেই পীড়াই হচ্ছিল—নাতিপ্রীতিমতী রাজন্।

যাই হোক সুখে দুঃখে দশ মাস কেটে গেল। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার চুল বেঁধে, মালা গেঁথে ভালই দিন গুজরান করছিলেন। অজ্ঞাতবাসের পাট প্রায় চুকে এসেছে, এমনি এক দিনে সুদেষ্ণার ভাই কীচক এলেন বোনের খবর নিতে। তখনকার দিনে শালাবাবুদের খাতির ছিল এখনকার দিনের মতোই। বিশেষত সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে রাজার শালার একটি বিশেষ সুনাম আছে। আলংকারিকেরা দেখিয়েছেন, রাজার শালা মানেই সে অকালকুষ্মাণ্ড, কিন্তু শুধু রাজার শালা বলেই শাসন-বিভাগে তার ভাল কাজ জোটে এবং সেই জোরে সে নানা কুকর্ম করে বেড়ায়। এই নিয়মে বিরাটের শালাও কিছু ব্যতিক্রম নন। বোনের পাশে সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখেই তিনি বেশ তপ্ত হয়ে উঠলেন। সুদেষ্ণাকে বললেন—কে বটে এই মেয়েটা, আগে তো দেখিনি! এ যে একেবারে ফেনানো মদের মতো, আমাকে মাতাল করে তুলছে। কীচক বলল—তুমি একে দিয়ে দাসী-কর্ম করাচ্ছ, এই কি এর কাজ? এ হবে আমার ঘরের শোভা, আমার যা আছে তা সব দেব একে। কীচক আর অপেক্ষা করল না, অধৈর্য হয়ে সোজা দ্রৌপদীকেই সে কাম নিবেদন করল। কীচক প্রেম নিবেদন জানে না, তাই তার কথাই শুরু হল দ্রৌপদীর প্রত্যঙ্গ-প্রশংসায়। তার মধ্যেও আবার স্তন-জঘনের প্রশংসাই বেশি, এই জায়গাগুলোতে হার অলংকার না থাকায় রাজার শালা সেগুলো গড়িয়ে দেবার দায়িত্ব অনুভব করে। বারবার সে তার উন্মত্ত কামতপ্ত ভাব সোজাসুজি জানাতে থাকে। পাঁচ ছেলের মা এবং অন্তত আঠারো বছর বিবাহিত জীবন-কাটানো দ্রৌপদী কীচকের কাছে কাঁচা বয়েসের তিলোত্তমা—ইদঞ্চ রূপং প্রথমঞ্চ তে বয়ঃ। হয়তো শরীরের বাঁধন দ্রৌপদীর তেমনি ছিল এবং সেই কারণেই কীচক দ্রৌপদীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বসল—আমার পুরনো সব বউগুলোকে আমি ঘর থেকে বিদায় করে দেব, নয়তো তারা তোমরা দাসী হবে—ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতনাঃ/ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি। এমনকী আমাকেও তুমি যা বলবে তাই করব, আমিও তোমার দাস।

জয়দ্রথের অভিজ্ঞতায় দ্রৌপদী আর কথা বাড়ালেন না। নিজের প্রতি ঘৃণা জাগানোর জন্য দ্রৌপদী কীচককে বললেন—খুব খারাপ ঘরে আমার জন্ম, তা ছাড়া আমি অন্যের বউ। তোমার এই দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। এ-সব সাধুভাষায় কি আর কামুককে ভোলানো যায়! নানা অকথা-কুকথায়

দ্রৌপদীর কান ভরিয়ে কীচক বলল—আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে দারুণ বোকামি করবে তুমি, পরে তোমায় কাঁদতে হবে—পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি। তারপর, ক্ষমতা পেলে জামাইবাবুর করুণায় চাকরি-পাওয়া শালাবাবুদের যে অবস্থা হয় আর কি। কীচক বলল—জান, আমি এ-সমস্ত রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। বিরাটরাজার কথা একটুও না ভেবে কীচক জানাল যে, সেই সবার আশ্রয়দাতা—প্রভুর্বাসয়িতা চাস্মি—তার সমান বীরও কেউ নেই। দ্রৌপদী এবার তাঁর অদৃশ্য পঞ্চস্বামীর কথা শুনিয়ে কীচককে একটু ভয় দেখাতে চাইলেন, নিজেও খানিকটা রেগে গিয়ে বললেন—তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মায়ের কোলে শুয়ে বাচ্চা ছেলে যেমন চাঁদ ধরতে চায়, তোমার অবস্থাও সেইরকমই কীচক—কিং মাতুরঙ্কে শয়িতো যথা শিশু শ্চন্দ্রং জিঘৃক্ষন্নিব মন্যসে হি মাম্।

কীচক গরবিনী বধূকে আর ঘাঁটালেন না, কিন্তু বোনটিকে সকাতরে বলে এলেন—যেমন করে পার তোমার পরিচারিকার মন আমার দিকে ভজিয়ে দাও—যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী। অতি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বোনেদের যে অবস্থা হয়, বিরাটরানি কীচককে বললেন—একটা ভাল পরব দেখে তুমি অনেক কিসিমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর, মদের ব্যবস্থাও রাখবে। সেই দিন, আমি তোমার ঘর থেকে সুরা নিয়ে আসবার ছলে সৈরন্ধ্রীকে পাঠিয়ে দেব। নির্জন ঘরে, বিনা বাধায়—বিজনে নিরবগ্রহে—তাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো, তবে যদি তোমার দিকে মন ফেরে—সান্ত্ব্যমানা রমেৎ যদি। সুদেষ্ণার 'প্ল্যান' মতো একদিন মাংস-ব্যঞ্জন অনেক রান্না হল, ব্যবস্থা হল উত্তম সুরার। কীচক খবর পাঠালেন সুদেষ্ণাকে, আর অমনি তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বড়ো সুরার তিয়াস লেগেছে সৈরন্ধ্রী, তুমি একবার কীচকের ঘরে যাও, সেখান থেকে মদ নিয়ে এসো।

দ্রৌপদী সব বুঝলেন, সুদেষ্ণার উদ্দেশ্য এবং কীচকের উদ্দেশ্য—সব বুঝলেন। দ্রৌপদী বললেন—আমি যাব না রানি, তুমি বেশ ভালই জান তোমার ভাই লোকটা কীরকম বেহায়া—যথা স নিরপত্রপঃ। আমাকে দেখলেই সে উল্টোপাল্টা বলবে, অশোভন ব্যবহার করবে। আমি যাব না রানি, তুমি অন্য কাউকে পাঠাও—অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মাম্ অবমংস্যতে। সুদেষ্ণা বললেন—আমি পাঠাচ্ছি জানলে সে তোমায় অপমান করতে পারে না। উত্তরের অপেক্ষা না করে সুদেষ্ণা পানপাত্রখানি দ্রৌপদীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। দ্রৌপদী চললেন। এই প্রথমবার বুঝি পঞ্চস্বামিগর্বিতা পাণ্ডববধূ ভয় পেলেন। প্রশস্ত রাজপথে যেতে যেতে তাঁর কান্না পেল। কী হবে, কী হবে—সা শঙ্কমানা রুদতী। পাঁচ পাঁচটা জোয়ান স্বামী থাকতেও এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর অবস্থা—যা হয় হবে—দৈবং শরণমীয়ুষী। ভীতা ত্রস্তা হরিণী কীচকের ঘরে উপস্থিত হল। আর অগাধ কামসাগরের পারে দাঁড়িয়ে কীচকের মনে হল—এই বুঝি তার তাপ-তরণের নৌকা—নাবং লব্ধেব পারগঃ। কীচক লাফ দিয়ে উঠল।

প্রথমে তো বৈষ্ণব পদাবলীর ভঙ্গিতে—আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু—সুব্যুষ্টা রজনী মম—ইত্যাদি আবাহন চলল কীচকের দিক থেকে। দ্বিতীয় দফায় চলল মণি-রত্ন আর বেনারসীর লোভ দেখানো। পরিশেষে বিছানাটি দেখিয়ে কীচক বলল—এসব তোমার জন্য, এসো, বসে বসে একটু সুরাপান কর—পিবস্ব মধুমাধবীম্। দ্রৌপদী বললেন—রানি সুরা পিপাসায় কাতর, তিনি সুরা চেয়েছেন। বলেছেন—সুরা নিয়ে এসো। আমার তাড়া আছে। কীচক এবার দ্রৌপদীর ডানহাতটি ধরলেন চেপে, তারপরেই আঁচলখানি। পাঠক জানেন, আঁচলে টান পড়লেই দ্রৌপদীর কিঞ্চিৎ 'অ্যালার্জি' হয়, দুঃশাসন, জয়দ্রথের কথা মনে পড়ে। তা দ্রৌপদী প্রথমে জয়দ্রথকে দেওয়া প্রথম ওষুধটি প্রয়োগ করলেন—ধাক্কা, জোর একখানা ধাক্কা। কীচক মাটিতে পড়ল এবং সেই অবসরে দ্রৌপদী বিরাটের রাজসভায় উপস্থিত। কিন্তু কীচকই বা ছাড়বে কেন, সে রাজার শালা, প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠেছে, রাজা কিংবা রাজসভাকেই বা তার ভয় কীসের? সেও উপস্থিত হল বিরাটের রাজসভায় এবং সবার সামনে দ্রৌপদীকে উল্টো লাথি কষাল।

রাজসভা থেকে রান্নাঘর আর কতদূর। রাজাকেও পান-ভোজন মাঝে মাঝেই জোগাতে হয়।

কাজেই সেই ছলে ভীমও ততক্ষণে রাজসভায় উপস্থিত। দ্রৌপদীর অপমান দেখে ভীমের দাঁত কড়মড়ি আরম্ভ হল, ঘাম ঝরতে থাকল আর বারবার উঠব কি উঠব না—এই ভঙ্গিতে বসে থাকলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন মহা বিপদ, ভীম একটা মারামারি বাধিয়ে দিলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে, তখন আবার বারো বছর বনে কাটাও। কোনও মতে তিনি ভীমকে আঙুলের খোঁচা মেরে মেরে বাইরে পাঠালেন। দ্রৌপদী আগুন চোখে বিরাটরাজাকে যেন দগ্ধ করে দিলেন। প্রথমে তো দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করে তাঁর অলক্ষ্য স্বামীদের খানিকটা অবোধ্য গালাগালি দিয়ে বিরাটকে বললেন—তুমি রাজা না দস্যু। নইলে তোমার সামনে নিরপরাধিনীর অপমান দেখেও চুপ করে বসে আছ—দুস্যানামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে। অথবা কীই-বা বলব, যেমন এই কীচক, তেমনি এ-দেশের রাজা, আর তেমনি তোমার মোসাহেব সভাসদেরা (শেষ টিপ্পনীটির অন্তরে যুধিষ্ঠিরও আছেন)।

বিরাট কিছুই জানতেন না, কী ব্যাপার, কেন এই মারামারি, কিছুই জানতেন না। সভাসদেরা সব খবর নিল এবং তারা কীচকের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে দ্রৌপদীকে খুব প্রশংসা করল। যুধিষ্ঠিরের আর সহ্য হচ্ছিল না। সবার সামনে কুলবধূর হেনস্থা, সভাসদদের খবরাখবর নেওয়া, বিচার, প্রস্তাব—এত সব কসরত যুধিষ্ঠিরের আর সহ্য হচ্ছিল না। রাগে যুধিষ্ঠির ঘামতে থাকলেন। এতটা সময় সভায় থেকে দ্রৌপদীও বুঝলেন—তিনি কিঞ্চিৎ কাঁচা কাজ করেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন—তুমি সুদেষ্ণার ঘরে যাও সৈরন্ধ্রী। যে স্বামীদের কথা তুমি বললে বোঝা যাচ্ছে, তাদের রাগ দেখাবার সময় এখনও আসেনি। তুমি সময় বোঝ না, সৈরন্ধ্রী, শুধু শুধু এই রাজসভায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটুকে মেয়েদের মতো কাঁদছ। রাজসভায় তরল জলে মাছের মতো সভাসদেরা যে খেলা করে, এ কান্না তাদের স্পর্শ করে না, শুধু খেলার বিঘ্ন ঘটায় মাত্র—অকালজ্ঞাসি সৈরন্ধ্রী শৈলুষীব বিরোদিষি। বিঘ্নং করোষি মৎস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি। তুমি যাও, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা নিশ্চয়ই এই অপমানের বিহিত করবেন।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার কাছে ফিরে গেলেন, চুল খোলা, চোখ লাল, রাজরানি দ্রৌপদীর মুখে সব শুনে দ্রৌপদীকে কথা দিলেন যে, তিনি কীচকের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন। দ্রৌপদী বললেন—তার আর দরকার হবে না, যাঁদের ব্যবস্থা নেবার কথা, তাঁরাই নেবেন। রাজসভায় দ্রৌপদীকে পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিতা দেখেছেন ভীম, অন্য কেউ নন। এ-কথা দ্রৌপদীর মনে ছিল, অতএব সুদেষ্ণাকে উত্তর দিতে দেরি হয়নি দ্রৌপদীর।

অপমানে মানুষের যা হয়, মনে মনে শালা, রাজার শালাকে মেরেই ফেলতে চাইলেন দ্রৌপদী—বধং কৃষ্ণা পরীপ্সন্তী। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য শীতল জলে গা ধুলেন, উত্তমাঙ্গ এবং অধমাঙ্গের বসন দুটিতে কীচকের পায়ের ধুলো, মাটির ধুলো লেগেছে, সেগুলি ধুয়ে নিলেন। বাইরে রাত নেমে আসছে। সুদেষ্ণাকে এই একটু আগেই দ্রৌপদী বলেছেন—আজকের রাত্রিই তোমার ভাইয়ের কালরাত্রি না হয়—মন্যে চাদ্যৈব সুব্যক্তং পরলোকং গমিষ্যতি।

ধুর ! গা ধুলে আর কাপড় ধুয়ে ফেললেই কি আর রাগ যায় ? দ্রৌপদীর কিছুতেই আর স্বস্তি হচ্ছে না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর কোনও বিশ্বাস নেই। তিনি বলেছেন এখনও তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের ক্রোধ করার সময় আসেনি। দ্রৌপদীর মনের ভাব—তোমার কোনওদিনই সময় আসবে না। এখন কী করি, কোথায় যাই, আমার ভবিষ্যতের পথটাই বা কী হওয়া উচিত—কিং করোমি, ক্ব গচ্ছামি, কথং কার্যং ভবেন্মম। রাতের আঁধার গভীরতর হয়ে আসছে। দ্রৌপদী মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মতো ঝলক দিয়ে উঠল একটি নাম—ভীমসেন—ভীমং বৈ মনসাগমৎ। দ্রৌপদী জানেন ভীমের ব্যাপারে তাঁর ভালবাসায় ফাঁকি আছে। কিন্তু তিনি এও জানেন যে, ভীমের ভালবাসায় কোনও ফাঁকি নেই। অন্তত দ্রৌপদী যা চান এবং যেমন করে চান তা একমাত্র সাধন করতে পারেন ভীম। যুধিষ্ঠিরের মনোভাব তিনি পূর্বাহ্নেই জানেন, আর অর্জুনকে বললে তিনি ধর্মরাজের সঙ্গে কোনও কথা না বলে দ্রৌপদীর কথায় কাজ করবেন বলে মনে হয় না। কাজেই একমাত্র ভরসা ভীম। তিনি নির্বিচারে কারও কোনও অপেক্ষা না রেখেই দ্রৌপদীর যা ভাল লাগে

তাই করবেন—নান্যং কশ্চিদ্ ঋতে ভীমান্মমাদ্য মনসঃ প্রিয়ম্—অতএব সেই সময়ে ভীমই তাঁর একমাত্র প্রিয় হয়ে উঠলেন (ব্যাসের এই পংক্তিটির মধ্যেই দ্রৌপদীর ভালবাসার ফাঁকিটুকু ধরা পড়ে গেল)।

রাতের সুখশয়ন ছেড়ে স্তিমিতপ্রদীপ অন্দর-মহলের বাইরে চলে এলেন দ্রৌপদী। সূপকার-কুলপতি ভীমের আবাস হবে রন্ধনশালার কাছেই, যেখানে বল্লব নামের ছদ্মবেশে নিজেকে মধ্যম-পাণ্ডবের গৌরব থেকে আড়াল করে রেখেছেন তিনি। দ্রৌপদী এক লহমায় ভীমের ঘরের সামনে পৌঁছলেন। ভেজানো দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই দ্রৌপদী বিড়বিড় করে বললেন—আমার মর্মশত্রু কীচক বেঁচে আছে, তবু তুমি ঘুমোচ্ছ কী করে—কথং নিদ্রাং নিষেবসে। দ্রৌপদী দেখলেন, তাঁর বিড়বিড়ানিতে ভীমের ঘুম ভাঙল না, বলবান সিংহ যেমন নির্ভয়ে নিদ্রা যায়, তেমনি ভীম ঘুমিয়েই আছেন। ব্যাস লিখেছেন দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে আর ভীমের প্রদীপ্ত তেজে সেই রন্ধনশালা যেন জ্বলে উঠল। আমি বলি, ভীমের আগুন-তেজে দ্রৌপদীর রূপের ঘি পড়ল। পাঁচ স্বামীর সহবাসিনী দ্রৌপদী দীর্ঘ দশ-এগার মাস পরে মধ্যম-পাণ্ডবের সাহচর্য পেয়েছেন। মনে আছে অপমানের জ্বালা। ভীমকে কীভাবে কাবু করতে হবে তা তিনি জানেন।

দ্রৌপদী ভীমকে জাগালেন। কিন্তু যেভাবে জাগালেন তার মধ্যে মহাভারতকার দ্রৌপদীর প্রেমের ফাঁকিটুকু দেখিয়ে দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহমশায় বিপদ ভেবে এই ফাঁকির শ্লোকের অনুবাদ করেননি, কিন্তু এই শ্লোক না হলে দ্রৌপদীর প্রেম-বিশ্লেষণ অসমাপ্ত থেকে যাবে। দ্রৌপদীর প্রেমের ফাঁকিটুকু আরও পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ। অতএব তাঁর সাহায্যও আমরা নেব। ব্যাস লিখেছেন—দ্রৌপদী প্রথমেই ভীমের কাছটিতে গা ঘেঁসে বসলেন, পাঞ্চালী দ্রৌপদী সর্বাংশে বরণীয় পতির কাছটিতে বসলেন—উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী। কেমন করে বসলেন ? ব্যাস উপমা দিয়েছেন—পুষ্পবতী কামাতুরা রমণীর মতো—বাসিতেব—কামাতুরা রমণীর মতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি কামাতুরা নন, নীলকণ্ঠ আরও ভেঙে বললেন—বস্তুতঃ ন কামাতুরা কিন্তু দ্বেষাতুরা এব। অর্থাৎ কিনা অন্তর্দাহ, প্রতিশোধ ইত্যাদি কারণেই ভীমকে পটাবার জন্য কামাতুরা রমণীর মতো দ্রৌপদী ভীমের গা ঘেঁসে বসলেন। ঠিক যেমনটি বন্য বকস্ত্রী প্রকৃতই কামাতুরা হয়ে বকের গা ঘেঁসে বসে থাকে, ঠিক যেমনটি তিন বছর বয়সের বকনা গরু গরম হয়ে ষাঁড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তেমনই এক কামাতুরার ভাব নিয়ে দ্রৌপদী ভীমের কাছটি ঘেঁসে বসলেন—সর্বশ্বেতেব মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিহায়ণী। উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বাসিতেব বরর্ষভম্ ॥

শ্লোকটিতে 'বাসিতা' মানে পুষ্পিণী কামাতুরা নারী। 'ইব' শব্দটা উপমার্থক, যার মানে 'মতো'—কামাতুরা রমণীর মতো। এই 'মতো' শব্দটা 'সর্বশ্বেতা' অর্থাৎ বকীর সঙ্গেও লাগবে আবার গরুর সঙ্গেও লাগবে। কাক যেমন দুদিকে চোখ ঘুরাতে পারে, সেই মতো 'মতো' শব্দটা একবার বকীর সঙ্গে লাগবে, আবার গরুর সঙ্গেও লাগবে। নীলকণ্ঠ লিখেছেন আভিধানিক অর্থে শ্বেতা মানে রাজহংসী। কিন্তু 'সর্ব' শব্দটা তো আর বোকার মতো ব্যবহার করেননি ব্যাস। কাজেই 'সর্বশ্বেতা' মানে বকী। আর সে যেহেতু বনে জাত, তাই কামাতুর হতে তার সময় লাগে না। আবার 'মাহেয়ী' মানেও গরু, ত্রিহায়ণী মানেও গরু। ব্যাস নিশ্চয়ই একই অর্থে দুটো শব্দ প্রয়োগ করেননি। ব্যাস বলতে চেয়েছেন—তিন বচ্ছর বয়সের গরু—ত্রিহায়ণী। আমরা বলি—তাতে এমনকী হল ? নীলকণ্ঠ উত্তর দিয়েছেন—ওই 'তিন বচ্ছরে'র বিশেষণটার মধ্যেই কামাতুরত্ব লুকিয়ে আছে, নইলে ওটি দ্রৌপদীর উপমা হবে কেন ? নীলকণ্ঠ লিখেছেন—তিন বচ্ছর বয়েসের গরু নাকি যৌবনবতী কামাতুরা হয়—ত্রিবর্ষা হি গৌঃ যৌবনারূঢ়া কামাতুরা চ ভবতি। তা আমাদের দ্রৌপদী যৌবনবতী গাভীর মতো, বন্য বকীর মতো কামাতুরা ভাব দেখিয়ে ভীমের কাছে বসলেন।

এই শ্লোকে দ্রৌপদীর প্রেমের ফাঁকিটুকু সাধারণে যাতে সহজে না বোঝে, তাই ব্যাস পর পর কয়েকটি উপমা সাজিয়ে দিয়েছেন। গোমতী নদীর তীরে মহাপ্রাংশু শালগাছগুলিকে লতা যেমন জড়িয়ে ধরে তেমনি করে পাঞ্চালী ভীমকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন। মনের মধ্যে দ্বেষভাব নিয়ে আর বাইরে যেমন কামাতুর ভাবে তিনি ভীমের কাছে বসে ছিলেন, মনের মধ্যে সেই ভাব নিয়েই

তিনি নিশ্চয়ই ভীমকে জড়িয়েও ধরলেন। প্রসুপ্ত মৃগরাজ সিংহকে সিংহবধূ যেমন জড়িয়ে ধরে, হাতিকে যেমন জড়িয়ে ধরে হাতির বউ, তেমনি দ্রৌপদী জড়িয়ে ধরলেন ভীমকে। দ্রৌপদীর প্রেমশীতল বক্ষে বাহুর ঘেরে জেগে উঠলেন ভীম—বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা। গলার স্বরে বীণার গান্ধার তুলে দ্রৌপদী বললেন—ওঠো ওঠো, কেমন মরার মতো ঘুমোচ্ছ তুমি ভীম—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ। এমন মরার মতো না হলে কি আর জীবন্ত কোনও লোকের বউকে অপমান করে অন্যে বেঁচে থাকে ?

গা-ঘেঁষা, আলিঙ্গন, বাহুর ঘের—এত সবের পর বীণার গান্ধারে যে সপ্তমের আমদানি হল তাতে ভীমের দিকে আর প্রত্যালিঙ্গন সম্ভব ছিল না। ভীম উঠে বসলেন এবং সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—তোমার গায়ের রঙ যে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! কী ব্যাপারটা হয়েছে, খোলসা করে বল তো ? খারাপ, ভাল, যাই ঘটুক, পরিষ্কার বল। তুমি তো জান কৃষ্ণা, সমস্ত ব্যাপারেই আমি তোমার বিশ্বাস রেখেছি, অনেক বিপদে আমি তোমাকে কতবার বাঁচিয়েছি—অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু। অহম্ আপৎসু চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভীমের মতো মানুষও বুঝে গেছেন দ্রৌপদী তাঁকে বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে বিপদে পড়লে অন্য সবার থেকে ভীমই যে দ্রৌপদীর কাছে বেশি আদরণীয় হয়ে ওঠেন, সে কথা ভীমও বুঝে গেছেন। ঠিক সেই কারণেই ভীম বললেন—তোমার যা বলার বল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি যা চাও অর্থাৎ যা হলে তোমার ভাল লাগবে, সেটা তাড়াতাড়ি বল—শীঘ্রমুক্ত্বা যথাকামং যত্তে কার্যং ব্যবস্থিতম্। সবাই জেগে উঠলে তোমায় আমায় চিনে ফেলতে পারে, কাজেই তার আগেই যা বলার বলে শুতে যাও।

আমি আগেই বলেছি যুধিষ্ঠিরের স্বামি-ব্যবহারে দ্রৌপদী কোনওকালেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই বিরাটের রাজসভায় তিনি কথা দিলেও তাঁর ওপরে তিনি নির্ভর করেননি। তিনি ভীমের কাছে এসেছেন তড়িঘড়ি অপমানের শোধ নিতে। দ্রৌপদী ভীমের মনস্তত্ত্ব জানতেন অথবা কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীই বা স্বামীর মনস্তত্ত্ব না জানেন ? দ্রৌপদী এও জানতেন যে, যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার নীতি ভীম পছন্দ করেন না অথবা অপমানের সময়েও যুধিষ্ঠিরের স্থিরভাব ভীম দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

দ্রৌপদী তাই ভীমের কাছে প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের ওপর ঝাল ঝেড়ে নিলেন। দ্রৌপদী বললেন—যার স্বামী যুধিষ্ঠির, তার জীবনে আর সুখ কী—অশোচ্যত্বং কুতস্তস্যা যস্যা ভর্তা যুধিষ্ঠিরঃ ? আমার সব দুঃখ জেনেও, আবার তুমি ভালভালাই করে জিজ্ঞাসা করছ—কী আমার হয়েছে ? দ্রৌপদী পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে তুললেন, কারণ তিনি জানেন কোন কোন ঘটনায় ভীমের আক্রোশ জমা আছে। তিনি বললেন—একে তো সেই কৌরবসভার মধ্যে আমাকে টেনে আনা হয়েছিল, সে দুঃখ তো আমার রয়েইছে, এক দ্রৌপদী ছাড়া আর কোন রাজার ঝি এত অপমান সইবে ? তার মধ্যে বনের মাঝে জয়দ্রথ এসে আমাকে আরেকবার নাকাল করে গেল, সেই অপমানও আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়ে সইবে—বোঢুমুৎসহতে নু কা ? এখন আবার...কেন, তুমি তো চোখের সামনেই দেখলে, এখন আবার ধূর্ত বিরাটরাজার শালা কীচক রাজার সামনেই আমায় লাথি কষাল—সে আঘাত সহ্য করার জন্যও তো আমিই বেঁচে আছি—কা নু জীবেত মাদৃশী। আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী ? এই রাজার শালা রানির ঘরে আমার দাসীত্বের সুযোগ নিয়ে দিন-রাত—'আমার বউ হও, আমার বউ হও'—বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে—নিত্যমেবাহ দুষ্টাত্মা ভার্যা মম ভবেতি বৈ।

কীচকের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই দ্রৌপদী কিন্তু আবার যুধিষ্ঠিরের ওপর আক্রোশে ফেটে পড়লেন। বললেন, তোমার দাদাভাইকে ঝাড়তে পারছ না, যার জুয়ো খেলার ফল ভোগ করছি আমি—ভ্রাতরং তে বিগর্হস্ব জ্যেষ্ঠং দুর্দ্যূতদেবিনম্। যস্যাস্মি কর্মণা প্রাপ্তা দুঃখমেতদনন্তকম্। সত্যি করে বল তো, এক জুয়াড়ি ছাড়া আর কে আছে, যে নাকি রাজ্য-সম্পত্তি সব ছেড়ে দিয়ে বনবাসের জন্য পাশা খেলে ? দ্রৌপদী বললেন—খেলবি, খেল না, ধন-রত্ন কি হাজার খানেক মোহর নিয়ে সম্বচ্ছর

ধরে—সকাল-সন্ধে পাশা খেললেও তো এত সম্পত্তি উজাড় হয়ে যেত না—সায়ং প্রাতরদেবিষ্যদ্ অপি সংবৎসরান্ বহূন্। কিন্তু বিবাদ আর উৎপাতের পাশা খেলে এখন মাথামোটার মতো চিৎপাত হয়ে পড়ে, চুপটি করে পুরনো কাজের হিসেব করছে—তূষ্ণীম্ আস্তে যথা মূঢ় স্বানি কর্মাণি চিন্তয়ন্। এই হল তোমার দাদা।

দ্রৌপদী দেখলেন, একটু বেশি হয়ে গেছে। ভীম যদি আবার 'জুয়াড়ি' মাথামোটা'—এসব কথায় ক্ষেপে যান। তাই তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব সম্মানের এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে, "এখন তাঁর কী অবস্থা হয়েছে, এও কি আমি সইতে পারি!"—এইভাবে একটা প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন পূর্ব গঞ্জনার ওপর। দ্রৌপদী দেখাতে চাইলেন—তিনি এই অনুক্রমেই কথা বলছিলেন, যার জন্য ভীমের সম্বন্ধেও তাঁকে বলতে হল—এই যে তুমি পাকঘরে রসুই করার কাজ নিয়ে বিরাটরাজার খিদমতগারি করছ, এও কি আমি সইতে পারি—তদা সীদতি মে মনঃ। বিরাটরাজা বলল—তোমার গায়ে শক্তি আছে, এই মত্ত হাতিগুলোর সঙ্গে লড়, আর তুমি হাতির সঙ্গে লড়াই করছ। হাতির সঙ্গে তোমার লড়াই দেখে এদিকে বিরাটরানি সুদেষ্ণা আর তাঁর পরিজনেরা যে দাঁত বার করে হাসে, তাতে আমার কীরকম লাগে, তা তুমি জান কি—হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্যো মম তূদ্বিজতে মনঃ। জান তো, তোমার ওই হাতির সঙ্গে লড়াই দেখে একদিন আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল, আমি চক্কর খেয়ে পড়েই গেছিলাম। তাই না দেখে বিরাটরানি অন্য মেয়েদের সামনে দাঁত বার করে কি হাসিই না হাসছিল। আর তারা কী বলল, জান? বলল—রাঁধুনে ছেলেটিকে হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে এই সুন্দরীর এমন সোহাগ উথলে উঠেছে, যেন ও ব্যাটা ওর কতকালের সোয়ামী—স্নেহাৎ সংবাসজাদ্ ধর্মাদ্...ইয়ং সমনুশোচতি। তা আমাদের সৈরন্ধ্রীকেও দেখতে ভাল, রাঁধুনে ছোকরাটাও চমৎকার, মেয়েদের মনের কথাও কিছু বলা যায় না, তার ওপরে দুটিতেই এই রাজবাড়িতে কাজ নিয়েছে প্রায়ই একই সময়ে, সৈরন্ধ্রীও তো দেখি মাঝে মাঝেই স্বামীর সঙ্গে মিলতে পারছে না বলে দুঃখ করে, কে জানে কী ব্যাপার! দ্রৌপদী বললেন—জান ভীম। সুদেষ্ণারা বারবার আমাকে এই সব কথা বলে, আবার তাতে যদি আমি রেগে যাই, তাহলে আবার তোমায় নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে—ক্রুধ্যন্তীং মাং চ সংপ্রেক্ষ্য সমশঙ্কত মাং ত্বয়ি। আমার আর এসব ভাল লাগছে না। আবার আর একজনকে দেখ, ওইরকম ধনুর্ধর পুরুষ! সে কিনা খুকি-বিনুনি বেঁধে—বেণীবিকৃতকেশান্তঃ—কানে দুল পরে, মেয়ে সেজে মেয়েদেরই মধ্যে নাচ শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে—কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা। সো'দ্য কন্যাপরিবৃতো গায়ন্নাস্তে ধনঞ্জয়ঃ। আর দুটির কথা তো ছেড়েই দিলাম—একজন লাল খেটো পরে—সংরদ্ধং রক্ত নেপথ্যং—রাখালি করে বেড়াচ্ছে, আর একজন বিরাটরাজাকে ঘোড়ার কেরামতি দেখাচ্ছে—বিরাটম্ উপতিষ্ঠন্তং দর্শয়ন্তঞ্চ বাজিনঃ।

বস্তুত দ্রৌপদীর এই বক্তব্যের মধ্যে বীরভ্রাতা ভীম আর অর্জুনের জন্যই তাঁর মানসিক নিপীড়ন বেশি। আমি আগেই বলেছি নকুল এবং সহদেবের ব্যাপারে দ্রৌপদীর পত্নীপ্রেম যতটুকু ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বাৎসল্য। এইখানে ভীমের কাছে যে তিনি দুঃখ করছেন, তাতেও সেই ভাবটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

ভীম আর অর্জুনের জন্যই দ্রৌপদীর মনে বীরপত্নীর মর্মপীড়া ছিল। স্ত্রীবেশী অর্জুনের ব্যবহার তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। আর ভীমের মতো মানুষ রাজবাড়ির মাইনে-করা কুস্তিগির আর হাতিদের সঙ্গে লড়ে মেয়েদের তামাশার খোরাক জোগাচ্ছেন, দ্রৌপদীর কাছে এর থেকে কষ্টকর আর কী হতে পারে! আবার এই ঘটনা নিয়ে রাজবাড়ির মেয়েদের সামনে তাঁর মমতা দেখানোর উপায়টুকু পর্যন্ত নেই। একে তো জানাজানি হবার ভয়, তার ওপরে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক, যা নাকি দ্রৌপদী এবং ভীমের ক্ষেত্রে ঘটনাই, সেটাকেও অন্তত সবার সামনে উড়িয়ে দিতে হচ্ছে, সুদেষ্ণা আর অন্য মেয়েদের মস্করাও শুনতে হচ্ছে—আমাদের সৈরন্ধ্রীও রূপে-গুণে লক্ষ্মীমতী আর এই রাঁধুনে ছোকরাটাও চমৎকার দেখতে—কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ। অর্জুন আর ভীমের জন্য মর্মপীড়া বাদ দিলে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর কিন্তু সেই একই ভাব। বিশেষত কৌরবের রাজসভায় যে পাশাখেলা হয়েছিল, তাতে হাজার নাকানি-চুবানি খেয়েও যুধিষ্ঠির যে বিরাটের রাজসভায় আবার

পাশা খেলারই কাজ নিয়েছেন, এটা দ্রৌপদীর কাছে অন্য অর্থ বহন করে এনেছে। তাঁর কাছে নকুল সহদেব ছোট্ট 'নাজুক', নরম মানুষ—গরু চরানো ঘোড়া-দাবড়ানো এসব পরিশ্রমবহুল কাজ তাদের যেন সয় না। উল্টোদিক থেকে ভীম আর অর্জুন হলেন বীর। বিশাল গদা আর গাণ্ডীব নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের পক্ষে রান্না করা আর গান শেখানো যেন নিতান্ত বীরত্বহানির ব্যাপার, অন্তত দ্রৌপদীর কাছে তাই। কিন্তু সেদিক থেকে দেখতে গেলে যুধিষ্ঠিরকে কোনও পরিশ্রমের কাজও করতে হচ্ছিল না, আবার তাঁর সম্মান হানি হয়, এমন কিছুও তাঁকে করতে হচ্ছিল না। এতে তো দ্রৌপদীর বরং সুখী হবার কথা ছিল, কিন্তু তা তিনি হননি।

যুধিষ্ঠিরের হাত থেকে পাশার দান পড়ছে—এ তাঁর দু'চক্ষের বিষ। ভীমের কাছে তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে। বলেছিলেন—যুধিষ্ঠির যার স্বামী, তার আবার সুখ? এখন ভীমের কাছে সব স্বামীর প্রতি মমত্ব জানিয়ে কথা শেষ করলেন যুধিষ্ঠিরকে দিয়েই। বললেন—এই যে শতেক দুঃখ আমার দেখছ, সেও যুধিষ্ঠিরের জন্যেই—এবং দুঃখশতাবিষ্টা যুধিষ্ঠির-নিমিত্ততঃ। আজকে যে আমাকে চাকরানির মতো রাজবাড়িতে ফরমাস খাটতে হচ্ছে, রানি সুদেষ্ণার পায়খানা পেচ্ছাপের জল জোগান দিতে হচ্ছে, সেও ওই পাকা জুয়াড়িটার জন্য—শৌচদাস্মি সুদেষ্ণায়া অক্ষধূর্ত্তস্য কারণাৎ! দ্রৌপদী এতক্ষণ অন্য স্বামীদের কষ্টভোগের কথা শুনিয়েছেন, এবারে নিজের দুর্ভোগের কাহিনী শোনাতে লাগলেন ভীমকে।

দ্রৌপদী বললেন—পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী আর দ্রুপদ রাজার মেয়ে হয়েও এই অবস্থায় পড়ে আমি ছাড়া আর কে বেঁচে থাকতে পারে? এককালে ইন্দ্রের মতো স্বামীরা আমার মুখ চেয়ে বসে থাকত, এখন আমিই এই অন্তঃপুরের ছোটলোক মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার সুখ কী ছিল—তা তুমি তো অন্তত বুঝবে ভীম! এককালে আমি হাঁটলে পরে আমার সামনে পেছনে শতখানেক বাঁদী যেত, এখন আমিই সেই কাজটা করি, আর হাঁটেন রানি সুদেষ্ণা—সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী। আর একটা দুঃখ আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে, ভীম। আমি আগে কোনও দিন কারও জন্যে চন্দনও ঘসিনি, আমার শাশুড়িমাতা ছাড়া আর কারও গা-হাত-পাও টিপে দিইনি, এখন সেই চন্দন পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেল। দেখ, ভীম! দেখ এই আঙুলগুলো, এ কি আর সেই রকম নরম তুলতুলে আছে, যেমনটি তুমি আগে দেখেছ—পশ্য কৌন্তেয় পাণী মে নৈবং যৌ ভবতঃ পুরা।

পাঠক! লক্ষ করবেন, সুদেষ্ণার বাড়িতে এই পরিচারিকার কাজ দ্রৌপদী নিজেই সেধে নিয়েছিলেন, নইলে যুধিষ্ঠির ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন যে, সুকুমারী কৃষ্ণার পক্ষে কোনও নীচ কাজ করা সম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু রাজার শালা কীচকের জ্বালায় আজ পরিস্থিতি পালটে গেছে। আজ তিনি যুধিষ্ঠিরকেই দুষছেন যে, কেন তাকে চন্দন পিষতে হচ্ছে? দ্রৌপদী বলেছেন যে, আমি কোনওদিন শাশুড়ি কি স্বামীদের ভয় করে চলিনি—বিভেমি কুন্ত্যা যা নাহং যুস্মাকং বা কদাচন—সেই আমাকে কিনা এখন বিরাটরাজার ভয়ে সিটিয়ে থাকতে হয়। চন্দন পেষা ভাল হল, না মন্দ হল—বর্ণকঃ সুকৃতো ন বা—মহারাজ কী বলবেন—কিং নু বক্ষ্যতি সম্রাড় মাং—এ সব প্রশ্নে সব সময় এখন আমি বিচলিত। হায় হায়! কী পাপ করেছি, যার ফলে আমাকে এত দুঃখও সইতে হল।

দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকল, ভীমের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে কান্নার নিঃশ্বাসে মিশিয়ে দিলেন অশ্রুবারি। ভীম দ্রৌপদীর হাত দুখানি নিজের হাতে তুলে নিলেন, অসীম মমতায় সে দুটি হাত ক্ষণকাল রাখলেন নিজের মুখে, তারপর কেঁদে ফেললেন দ্রৌপদীর হাতের মধ্যেই—মুখমানীয় দ্রৌপদ্যা রুরোদ পরবীরহা। নিঝুম রাত্রে যখন বৃষ্টির মতো অন্ধকারের কাজল ঝরে পড়ছিল তখন বিরাটের রন্ধনশালার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ প্রেমের ছবি দেখতে পেলাম আমরা। বর্তমান লেখক কিন্তু ভীম আর দ্রৌপদীর এই আভিসারিক প্রেম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাস্তববাদী। ভীম যে দ্রৌপদীর হাত দুখানি নিজের গালের ওপরে রাখলেন তার কারণ হয়তো এই—সুবিশাল গদা চালাতে চালাতে ভীমের নিজের হাতেই কড়া পড়ে গেছে; সেই গদা-ঘোরানো কড়ার মধ্যে

চন্দন-পেষা মেয়েলি কড়া ঠিক ঠাহর করা যায় না বলেই ভীম নিজের মসৃণ গালে (পাঠক ! ভীমের দাড়ি গোঁফও খুব বেশি ছিল না) দ্রৌপদীর হাত রেখে তাঁর দুর্ভোগ পরিমাপ করতে চেয়েছেন এবং যখন বুঝেছেন দ্রৌপদীর কথা সত্যি, সরলপ্রাণ ভীম তখন কেঁদে উঠেছেন সমব্যথায়। আমার কথা যে ঠিক, তার প্রমাণ—দ্রৌপদীর হাত দুখানি মুখে মেজেই ভীম বলে উঠেছেন—ধিক আমার বাহুবল ধিক সেই গাণ্ডীবধন্বার গাণ্ডীবকে, যাঁরা থাকতেও তোমার হাতের রক্ত-লাল নরম তালুতে কড়া পড়েছে—যত্তে রক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ।

এতক্ষণ ভীমের সামনে দ্রৌপদী যে যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করেছেন, তাতে অন্য সময়ে হলে ভীমের দিক থেকে যে প্রতিক্রিয়াটা হত, তা হয়তো দ্রৌপদীর অনুকূলেই যেত এবং অন্যত্র তা গেছেও। কিন্তু এই সময়ে অজ্ঞাতবাসের কারণেই হোক কিংবা যা হোক কোনও কারণে, ভীম কিন্তু দ্রৌপদীকে বুঝিয়ে বলতে চাইলেন যে বেচারা যুধিষ্ঠিরের ওপরে তিনি যেন রাগ না করেন। ভীম বললেন—যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের শেষের দিন গুণছেন, নইলে তো একটি লাথিতে ওই বদমাস কীচকটার মাথা গুঁড়িয়ে ফেলতাম আমি—পোথয়ামি পদা শিরঃ। এই বিরাট-রাজ্যেও লাগিয়ে দিতাম ধুন্ধুমার। নেহাত বড় ভাই যুধিষ্ঠির সব জানাজানি হবার ভয়ে চোখের ঠারে আমাকে সরে যেতে বললেন, তাই। কী জানি কেন, সরলপ্রাণ ভীমও বুঝেছেন যে যুধিষ্ঠির ঠিক কাজই করেছেন এবং এটা মাথায় ঢুকেছে বলেই তার মাথাও ঠাণ্ডা হয়েছে—স্থিত এবাস্মি ভামিনি। এই প্রথমবার বুঝি ভীম বললেন—মাথা ঠাণ্ডা কর, সুন্দরী ! মাথা ঠাণ্ডা কর। তুমি যুধিষ্ঠিরের নামে যেভাবে বললে, এ যদি তিনি শোনেন, তিনি নির্ঘাত 'সুইসাইড' করবেন—শৃণুয়াদ্ যদি কল্যাণি নূনং জহ্যাৎ স জীবিতম্।

ভীমের কী সরল যুক্তি, হাজার হোক বড় ভাই, সুখে দুঃখে এতকাল একসঙ্গে আছেন। ভীম খুব চেষ্টা করলেন—যাতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ সুদক্ষিণা হন। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন—তোমার এই নিন্দে-মন্দ শুনলে যুধিষ্ঠির নির্ঘাত 'সুইসাইড' করবেন। আর যুধিষ্ঠির 'সুইসাইড', করলে অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও 'সুইসাইড়' করবে। অপিচ এরা সবাই আত্মহত্যা করলে আমিই বা আর বেঁচে থেকে কী করব—নাহং শক্লোমি জীবিতুম্। অকাট্য যুক্তি, অর্থাৎ কিনা যুধিষ্ঠিরের আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আত্মহত্যা করতে পারছেন না, কারণ বোধহয় দ্রৌপদীই, কিন্তু চার ভাই পর-পর মারা গেলে তিনি একা দ্রৌপদীর একচ্ছত্র অধিকার নিতেও সাহসী নন—কারণ বোধহয় অনভ্যাস। দ্রৌপদীকে ভাগে পাওয়াই ভীমের অভ্যাস অথবা তাঁর ভাতৃপ্রীতিও ছোট করে দেখা উচিত নয়। যুধিষ্ঠিরকে আংশিক অবমাননা তিনি বহুবারই করেছেন কিন্তু পুরোটা কখনও নয়।

ভীমের কাছে দ্রৌপদীর ভাষণ শুনে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, মাঝে মাঝে দ্রৌপদীর অন্যায় মাথা গরম করার অভ্যাস ছিল, নইলে ভীমের মতো হঠাৎ-ক্রোধী মানুষও এই মুহূর্তে চ্যবনপত্নী সুকন্যা সীতাদেবী, লোপামুদ্রা এবং সাবিত্রীর উদাহরণ তুলে দ্রৌপদীকে পতিপরায়ণতার উপদেশ দিয়েছেন।

পাঠক মহাশয় ! আমরা বোধহয় আবার প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। আমাদের দোষও নেই খুব একটা—দ্রৌপদী এতক্ষণ পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘাঁটছিলাম। এখন তিনি ভীমের মনোভাব বুঝে যুধিষ্ঠির ইত্যাদির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন, আমরাও তাই সুযোগ বুঝে সেই রাজার শালা কীচকের প্রসঙ্গে এসেছি। দ্রৌপদী বললেন—আমার দুঃখ সমস্ত সহ্য-সীমার বাইরে চলে গেছে, নইলে যুধিষ্ঠিরকে গালমন্দ করে আর কী হবে—ন রাজানমুপালভে ? পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই বা কী হবে—কিমুক্তেন ব্যতীতেন ? দ্রৌপদী এবার সোজাসুজি কীচকের প্রসঙ্গে এলেন। তার ভাব, ভাবনা, তার পেছনে রাজবাড়ির মদত—এ-সব কিছুই ভীমকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। দ্রৌপদীর বক্তব্য অনুযায়ী—এক বাঘের মুখ থেকে বাঁচতে গিয়ে দ্রৌপদী আরেক বাঘের মুখে পড়েছেন। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার পরিচারিকা। সুদেষ্ণার ধারণা—দ্রৌপদীকে দেখলে রাজা-বিরাটকে ঠেকানো খুবই কঠিন হবে। দ্রৌপদীর রূপে তিনি এতই উদ্বিগ্ন যে, রাজা-বিরাট অন্তঃপুরের দিকে

এলেই সুদেষ্ণা এটা ওটা ফরমাস দিয়ে দ্রৌপদীকে এদিক-ওদিক পাঠিয়ে দেন। এই সুযোগটাই কীচক নিয়েছে। সুদেষ্ণার মনোভাব বুঝেই এবং ইতস্তত দ্রৌপদীকে চলাফেরা করতে দেখেই কীচক দ্রৌপদীকে প্রেম নিবেদন করা শুরু করে। তার পরের ঘটনা ভীমের জানা। গতদিন কীচক দ্রৌপদীকে সবার সামনে পদাঘাত করেছে। রাজা-বিরাটের এতে কিছুই করবার নেই, কেননা সুদেষ্ণার কারণেই হোক কিংবা অন্য কোনও কারণে, রাজা তাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছেন এবং দ্রৌপদীর পক্ষে তা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে—কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোককৃন্ মম ভারত।

শুধু এইটুকুই নয়, দ্রৌপদীর কাছে এইমাত্র যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কীচক শুধু সুন্দরী নারীর রতিলিপ্সু নয়, সে নৃশংসও বটে। গরিব প্রজাদের টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা থেকে হত্যা—এসব কিছুতেই তার হাত পাকা। দ্রৌপদীর আশঙ্কা হয় (পাঠক হিসেবে আমরাও বুঝি—এ আশঙ্কা অমূলক নয়) যে, বারবার রাস্তায় তিনি যেভাবে কামান্ধ কীচকের রতি-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে এরপর তার চোখের সামনে পড়লেই যথেষ্ট চড়-লাথি খেতে হবে দ্রৌপদীকে। পরে মহাভারতের গীতাপর্বে আমরা দেখেছি কামিজনের কামনা প্রতিহত হলেই তা ক্রোধের আকার ধারণ করে। 'কামাৎ ক্রোধো'ভিজায়তে' এই শ্লোকের ওপর টীকায় শংকরাচার্য তাই লিখেছেন—কাম এব প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে। দ্রৌপদী কীচকের ব্যাপারে এই সন্দেহই করছেন। তিনি এখন আপন সতীত্বের থেকেও বারবার মার খাবার কথা ভাবছেন এবং সেই মার খেতে খেতে তাঁর জীবন থাকবে কিনা—এই স্থূল শারীরিক চিন্তাই আপাতত তাঁর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্ যথা জহ্যাঞ্চ জীবিতম্। দ্রৌপদী বললেন—ভীম! এতে তোমাদের ধর্মও থাকবে না, শৌর্য-বীর্যও ব্যর্থ, কেননা যে স্বামী বউকেই রক্ষা করতে পারে না, তার আবার ধর্ম কীসের—মহান্ ধর্মো ন শিষ্যতি। আবার তোমরা যে লোক জানাজানি হবার ভয়ে অজ্ঞাতবাসের ব্রত নিয়েছ, সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে গেলে তোমরা পাঁচভাই আর স্ত্রীর আশা কোরো না—সময়ং রক্ষমাণানাং ভার্যা বো ন ভবিষ্যতি।

কীচকের কামনার জ্বরে দগ্ধা দ্রৌপদী মহিলা হিসেবে আকুল প্রার্থনা জানালেন ভীমের কাছে, কারণ, অজ্ঞাতবাসের কড়াকড়ির মধ্যে এই কাজ ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। দ্রৌপদী বললেন—তুমি আমাকে একসময়ে জটাসুরের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, ভীম! (এ ঘটনা বনপর্বের। জটাসুর হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীকে। ভীম তাকে মারেন।) তুমিই রক্ষা করেছিলে দুষ্ট জয়দ্রথের হাত থেকে, এখন এই লম্পট কীচকটাকেও উপযুক্ত শিক্ষা দাও। পাথরের ওপর মাটির কলসি ফাটালে যেমনটি হয়, তেমনি করে ওই কীচকের মাথাটা ফাটাও দেখি—ভিন্ধি কুম্ভমিবাশ্মনি।

জনান্তিকে বলে রাখি দ্রৌপদীর সামনে 'মাসল্' ফুলিয়ে বাহুর কসরত দেখাতে একটু পছন্দ করতেন ভীম। স্ত্রীলোক সামনে থাকলে কোন বীরপুরুষই বা এটি না-পছন্দ করে। আমরা বনপর্বে কীর্মির রাক্ষস বধের সময়ে দেখেছি সুন্দরী কৃষ্ণা ভীমের যুদ্ধ-কসরত দেখছিলেন বলে, শুধুমাত্র দেখছিলেন বলেই, ভীমের শক্তি যেন আরও ক'গুণ বেড়ে গেল—কৃষ্ণানয়ন দৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ। রুক্ষ শুষ্ক বামুন নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের টীকায় বলেছেন কৌরবনিবাসে দ্রৌপদীর বস্ত্রকর্ষণের কথা স্মরণ করেই, নাকি কৃষ্ণার চোখের চাহনিতে (নিশ্চয় করুণ চোখ বোঝাচ্ছেন নীলকণ্ঠ) অধিক কুপিত হয়েছেন ভীম। আরে এই শ্লোকের পূর্বার্ধে তো দুর্যোধনের অত্যাচারের কথাই আছে, কাজেই 'কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ' এই সুন্দর শ্লোকাংশে আবার ওসব কথা কেন! নীলকণ্ঠ জানেন না, সুন্দরী স্ত্রীর তারিফ-করা চোখের চাহনিতে যে কোনও প্রতিযোগিতার শক্তি বেড়ে যায়, যুদ্ধশক্তি তো বটেই। আমি বাপু এখানে ভূয়োদর্শী ব্যাসের কথার সোজা অর্থ বুঝি—কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ। তার ওপরে করুণ চোখে তাকানোটা কৃষ্ণার স্বভাববিরুদ্ধ। হয় তিনি বিদগ্ধা নারীর কটাক্ষে তাকান, নয়তো বাহবা দেওয়ার চোখে। ভীমের শক্তি তাতেই চেতিয়ে দেয়। দ্রৌপদী জানেন—কীচকের কথা যতটুকু বলেছেন, তাতেই ভীম তেতে গেছেন, এখন শুধু ঠোঁট ফুলিয়ে একবার বললেন—কীচক জীবিত আছে—এই অবস্থায় যদি কালকের রাত্রিও কাটে তবে

আমি 'গ্লাসে'র মধ্যে বিষ গুলিয়ে খাব—বিষমালোড্য পাস্যামি—তবু কীচকের হাতে আমি ধরা দেব না। তার চেয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব, তাও ভাল।

আবার প্রেমের 'সিন'। ভীম দ্রৌপদীর কথার মর্ম বুঝলেন। বুঝলেন কীচকের বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সুন্দরী কৃষ্ণা তখনও ভীমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদছেন। ভীম জড়িয়ে ধরলেন দুঃখের ঝড়ে আপতিতা অভিসারিকাকে। হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তুমি যা চাও তাই হবে—তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে। তবে একটু নাটক করতে হবে তোমায়। বিরাটের নতুন নৃত্যশালাটি চেন তো? ওখানে দিনের বেলা মেয়েরা নাচে, কিন্তু রাত্রে কেউ সেখানে থাকে না। তুমি কীচককে জানাবে নৃত্যশালাতেই তোমার সঙ্গে মিলন হবে তার। দেখো কেউ যেন তোমাদের কথালাপ শুনতে না পায়। আজ সন্ধেবেলাতেই এই কাজ করতে হবে, তারপর সেখানেই আমি কীচককে তার মৃত বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব—তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রেতান্ পিতামহান্।

রাত্রি আর বাকি নেই। দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে, যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ থেকে দ্রৌপদী ফিরলেন নিজের ঘরে। ভোর হতেই কীচককে আবার দেখা গেল দ্রৌপদীর কাছে কাছে ঘুর-ঘুর করতে। তার আর লজ্জা-ভয় কিছুই নেই। সে বলল—বিরাটরাজার সামনেই তো তোমাকে আমি লাথি মেরেছি। আরে! রাজা কিছু করতে পারল আমাকে? ও রাজা, নামেই রাজা—প্রবাদেনেহ মৎস্যানাং রাজা—রাজা আমিই এবং সেনাপতি তো বটেই—অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ। আমাকে তুমি একটু সুখ দাও সুন্দরী, আমি তোমার গোলাম হয়ে যাব—দাসো ভীরু ভবামি তে। প্রতিদিন তোমায় দেব হাজার মোহরের তোড়া আর দাস-দাসী যা চাও। পরিবর্তে আমি চাই তোমার সঙ্গে মিলতে—অস্তু নো ভীরু সঙ্গমঃ।

দ্রৌপদী বিদগ্ধা নারী। নাটক করা তাঁর ভালই আসে। দ্রৌপদী বললেন—আমি আজ মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি—তোমার বাঁধনে ধরা দেব। কিন্তু একটা কথা, তোমার বন্ধু-বান্ধব ভাইয়েরা সব কেউ যেন এ-কথাটা জানতে না পারে। তুমি জান তো, আমার সেই মুখপোড়া গন্ধর্ব স্বামীগুলো আছে, তারা জানতে পারলে আমায় আর আস্ত রাখবে না। কীচক বললেন—দূর বোকা, কেউ জানতে পারবে না, আমি একাই যাব—একো ভদ্রে গমিষ্যামি। 'মিট্' করার জায়গা ঠিক হয়ে গেল—সেই নৃত্যশালা।

সেই সকাল বেলার কথা। দুপুর বারোটা পর্যন্ত কীচকের মনে হল সে যেন ছ'মাস বসে আছে। দুপুর গড়িয়ে পড়তেই আরম্ভ হল তার সাজ। মনে কেবল দ্রৌপদীর রূপ-চিন্তা, আর সমাগমের প্রতীক্ষা। দ্রৌপদী আবার ভীমের কাছে জানিয়ে এসেছেন—সব ব্যবস্থা পাকা। রাত এসে গেল। সিংহ যেমন প্রচ্ছন্ন ভাবে শিকারের অপেক্ষা করে, ভীমও অন্ধকার নর্তনাগারে তেমনটি ঘাপটি মেরে রইলেন। রাত্রির আমেজে অনেক সাজগোজ করে কীচক উপস্থিত হল অন্ধকার নৃত্যশালায়। প্রথমে যেন কিছু ঠাহর করাই যায় না কোথায় সেই দ্রৌপদী। কীচকের মনে হল—সে যে বলেছিল, নৃত্যশালায় রীতিমতো শয্যা বিছানো আছে একটা। কোথায় শয্যা। আরে এই তো, এইখানেই শুয়ে আছে, কীচক অল্প একটু হাত ছোঁয়াল। দ্রৌপদী যে এতটা উন্মুখ হয়ে আছেন, তা যেন তার কল্পনাতেও আসে না। কীচক বলল—তোমায় কত টাকা পাঠিয়েছি, কত দাসী পাঠিয়েছি, তোমার সেবার জন্য। (এবার কাজের কথায়—) জান তো আমার অন্তপুরের মেয়েরা বলে—আমার মতো সুন্দর পুরুষ নাকি তারা কোনওদিন দেখেনি।

উত্তর এল, তবে সে কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত, বড় কঠিন, শুষ্ক স্বাধীন সে উত্তর। উত্তর এল—বড় সৌভাগ্য আমার, তুমি এত সুন্দর। মেয়েদের ভাল লাগবার মতোই বটে। তবে এখন আমি তোমায় যে স্পর্শসুখ দেব, তুমি কামকলাকোবিদ হওয়া সত্ত্বেও এমন স্পর্শসুখ তুমি কোথাও পাওনি—ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্বো ন কর্হিচিৎ। আর নিশ্চয়ই বলতে হবে না। কীচক আর ভীমের ধস্তাধস্তিতে নৃত্যশালা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। অবশেষে কীচককে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে একটুখানি আগুন জ্বালিয়ে ভীম এবার ডাকলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী এবং ভীম—দুজনেরই ক্রোধ শান্ত হল। ভীম

বললেন—তোমায় যারা অন্যায়ভাবে চাইবে, তাদের অবস্থা হবে ঠিক এই কীচকের মতো। দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য করে ভীম রন্ধনশালায় ফিরে গেলেন। কিন্তু দ্রৌপদী গেলেন না। তাঁর সাহসটা দেখুন। এই নির্জন রাত্রে তিনি ঘুমন্ত সভাসদদের ডেকে ডেকে বললেন—দেখুন আমার গন্ধর্ব-স্বামীরা লম্পট কীচককে তার লাম্পট্যের শাস্তিটি কেমন দিয়েছেন, দেখুন। সভাপালেরা এলেন, মশাল জ্বালিয়ে এলেন অন্যেরাও। কীচকের বন্ধুবান্ধব এবং তার ভাইয়েরাও। কীচকের ভাইয়েরা হল সব উপকীচক। তারা ভাবল এই দ্রৌপদীটাই যত নষ্টের গোড়া। তারা দ্রৌপদীকে বেঁধে নিয়ে চলল মরা কীচকের সঙ্গে—তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে কীচকের আত্মার শান্তি ঘটাতে।' দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর ছদ্মনামগুলি ধরে চেঁচাতে লাগলেন এবং আবার তাঁর রক্ষায় এগিয়ে এলেন ভীম। গুপ্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শ্মশান চত্বরে ঢুকে দ্রৌপদীকে বন্ধন-মুক্ত করলেন ভীম এবং সেই সঙ্গে কীচকের একশো পাঁচটি ভাইকেও হত্যা করলেন।

খবরটা রটে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা এসে রাজা-বিরাটকে ভয় দেখাল। ভয়ের কারণ তিনটে—সৈরন্ধ্রী অত্যন্ত রূপবতী, গন্ধর্ব বলে যার কথা শোনা যাচ্ছে সে প্রবল পরাক্রান্ত ; তৃতীয়, কোনও পুরুষ যদি আবার দ্রৌপদীর পেছনে ছোঁক ছোঁক করে—তাহলেই বিরাট রাজ্য উচ্ছন্নে যাবে। রাজাকে তারা বলল—মুক্ত হয়ে সৈরন্ধ্রী আবার আপনার ঘরে ফিরে আসছে—পুনরায়াতি তে গৃহম্। মানে এটাও যেন একটা ভয়ের কথা। দ্রৌপদীকে রাস্তায় ফিরে আসতে দেখে বিরাটরাজ্যের পুরুষমানুষেরা পর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা দিল। শশ্মান-ফেরা দ্রৌপদী স্নান করে নতুন কাপড় পরে জনহীন পথ বেয়ে বিরাটের রন্ধনশালার দ্বারে এলেন ভীমকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। একটু ইশারা করে আস্তে ভীমকে বললেন—নমো গন্ধর্বরাজায়, তুমি আমার রক্ষাকর্তা। ভীম বললেন, আমরা যার হুকুমের গোলাম, তার এইটুকু কথাতেই আমি অঋণী হলাম।

আমরা বলেছিলাম—পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীম একমাত্র মানুষ যিনি দ্রৌপদীকে ভালবাসতেন মনের গভীর থেকে। দ্রৌপদীর প্রত্যেকটি কথা যিনি বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে পালন করতেন, তিনি ভীম। কৌরবসভায় দ্রৌপদীয় অপমানে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত খাব। খেয়েছেন। দুর্যোধনকে বলেছিলেন—গদার বাড়িতে তোমার উরু দুটি ভাঙব। ভেঙেছেন। ক্ষত্রিয়ের নীতি উল্লঙ্ঘন করার কলঙ্ক মাথায় নিয়েও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছিলেন ভীম। কিন্তু যে দ্রৌপদীর জন্য ভীমের এত আত্মদান, সেই দ্রৌপদী ! তাঁর মনে মনে মাতাল হওয়ার জায়গা তো ভীম নয়। ভীমকে তিনি বললেন—নমো গন্ধর্বরাজায়—আর এইটুকু চাটুতেই ভীম একেবারে বাধিত বোধ করেন দ্রৌপদীর কাছে। কিন্তু বিদগ্ধা রসবতীর এতে তৃপ্তি হবে কেন ? তিনি কেবলই ধাওয়া করে বেড়ান সেই ব্যক্তিত্বের পেছনে, যাকে কেবলই মনে হয় এই বুঝি আধেক ধরা পড়েছেন। কিন্তু আর বাকি অর্ধেকের নাগাল পেয়েছি পেয়েছি করেও পাওয়া যায় না যেন। তার জন্য খোঁজ চলে, কিন্তু উত্তর মেলে কি ?

দ্রৌপদী কিন্তু ভীমের কাছ থেকে মধুর বিদায় নিয়ে সুদেষ্ণার ঘরে ফিরে গেলেন না। মহাভারতের লেখক লক্ষ করেছেন যে, তিনি বিনা কারণে বিরাটরাজার নর্তনালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই যেখানে বিরাটের মেয়েরা নাচগান শেখে। আর নর্তনাগারের কাছে গেলে যে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখা যাবে, তাতে সন্দেহ কী ? হ্যাঁ, তিনি স্বভাবতই রাজবাড়ির মেয়েদের কাছে নাচের বোল আউড়ে যাচ্ছিলেন। মেয়েরাও দেখল দ্রৌপদীকে। সেই মুহূর্তে দ্রৌপদী নিজেই যেহেতু জব্বর খবর, তাই নাচিয়ে মেয়েরা সব অর্জুনকে নিয়েই বেরিয়ে এসে দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ জানাল—ভাগ্যিস আপনি কীচকদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন, ভাগ্যি মানি আপনি ফিরে এসেছেন আবার—দিষ্ট্যা সৈরন্ধ্রী মুক্তাসি, দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা। মেয়েদের দেখাদেখি অর্জুনও জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কেমন করে ছাড়া পেলে সৈরন্ধ্রী ! কেমন করেই বা সেই দুষ্টু লোকগুলো শাস্তি পেল—আমরা আদ্যন্ত সব কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে—ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্বমেতদ্ যথাযথম্।

দ্রৌপদীকে এমনিতেই ক্লিষ্টা দেখাচ্ছিল, কিন্তু যিনি সারারাত্রির ধকল সহ্য করে, সকালবেলায় গা

ধুয়ে, কাপড় কেচে—গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা—আবার ভীমের কাছে দরবার করতে যেতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই এত ক্লান্ত ছিলেন না যে, গল্প বলতে পারবেন না। কিন্তু কই, তিনি তো গল্পের ধারে কাছে গেলেন না, উল্টে দ্রৌপদী বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে বললেন—তুমি অন্তপুরের মেয়েদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছ, সুখেই থাক, আবার সৈরন্ধ্রীর কী হল না হল, তা দিয়ে তোমার আজ কী দরকার—কিন্নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্যমদ্য বৈ। রাজবাড়ির কিঙ্করী সৈরন্ধ্রী যে কষ্ট পাচ্ছে, সে কষ্ট তো আর তোমাকে পেতে হচ্ছে না এবং ঠিক সেইজন্যই মধুর হাসিটি হেসে দুখিনীকে এমনতর প্রশ্ন করতে পারছ—তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব—'হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?'

অন্তরের ব্যথায় দ্রৌপদী ভুলেই গেছিলেন অর্জুন এখন স্ত্রীবেশে বৃহন্নলা, আপন পূর্ব-সংস্কারবশে তাই অর্জুনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন পুংলিঙ্গবোধক ক্রিয়াপদ—প্রহসন্নিব। অর্জুন শুধরে দিয়ে বললেন—বৃহন্নলাও তোমার জন্যে যথোচিত দুঃখ পাচ্ছে, কল্যাণী! তাকে তুমি অন্তত পশু-পক্ষী ভেব না। এতকাল তুমি আমাদের মধ্যে আছ, আমিও তোমাদের মধ্যে একসঙ্গে আছি। সহবাসিনী একজনের কষ্ট মানে যে আমাদের সবারই কষ্ট। এবারে অর্জুন মোক্ষম কথাটি বললেন। বললেন—যে কেউ আরেক জনের মনের কথা ভাল করে বুঝতে পারে না—ন তু কেনচিদ্ অত্যন্তং কস্যচিদ্ হৃদয়ং ক্বচিৎ। বেদিতুং শক্যতে ভদ্রে যেন মাং নাববুধ্যসে ॥

দ্রৌপদীকে অর্জুন কতটা ভালবাসতেন সেটার পরিমাণ বিচারে অর্জুনের এই কথাটা অত্যন্ত জরুরি। যে বিদগ্ধা সুন্দরীকে তিনি নিজেই লক্ষ্যভেদ করে আপন বীর্যশুল্কে বিবাহ করে এনেছিলেন, বিবাহের এত বচ্ছর পরেও তাঁকে বলতে হচ্ছে—তুমি আমার মনের কথাটা বুঝতে পারছ না—যেন মাং নাববুধ্যসে। অন্যদিকে দ্রৌপদী তার মনের কথাটাই বুঝতে চান, অথচ পারেন না। এমনকী আজকেও তিনি এক লহমার তরে অর্জুনের কাছে না এসে পারেননি, অন্তত এই বিপন্ন মুহূর্তে অর্জুন তাঁর কথা কী ভাবছেন, কতটা ভাবছেন—এই জানা তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন। এসেই খোঁটা দিয়েছেন, অথচ অর্জুন কতটা নিরুপায় তা তিনি বোঝবার চেষ্টা করেননি।

বস্তুত দ্রৌপদীর ব্যাপারে অর্জুন যে শুধু এখনই নিরুপায় তা নয়। স্ত্রীবেশী বৃহন্নলা অজ্ঞাতবাসের ব্যবহারে—এখনই নিরুপায়, তা মোটেই নয়। এই উপায়হীনতার বন্ধন তাঁর জীবনে সেইদিন থেকে তৈরি হয়েছে, যেদিন তাঁর মা কুমোরশালার মধ্যে থেকে দ্রৌপদীকে না দেখেই বলেছিলেন—পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। ব্যাপারটা আরও একটু বুঝিয়ে বলি। প্রথম কথা, অর্জুন হলেন মহাভারতের উদাত্ত নায়ক। যুদ্ধবীর হিসেবে তিনি যতখানি বড়, ঠিক ততখানি বড় সংযমী হিসেবে। সংযমী কথাটা আমি খুব প্রসারিত অর্থে ব্যবহার করছি। মহাভারতের কথায় অর্জুনের যতগুলি পদক্ষেপ আছে, প্রত্যেকটি সংযমের মাহাত্ম্যে ভরা। যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য জায়গাগুলো আপাতত বাদই দিলাম, কারণ সেখানে সমস্ত বড় কাজগুলিই তাঁর নীরব এবং আস্ফোটহীন সহায়তায় ঘটেছে। শুধু যদি দ্রৌপদীর ক্ষেত্রটাই ধরি, তাহলেও দেখব—প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে নিজেকে বাঁধবার জন্যই কতবার রাশ টেনে ধরতে হয়েছে এবং এইভাবেই তিনি অন্য ভাইদের ভুল বুঝবার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেতে চেয়েছেন। অন্যদিকে সুন্দরী কৃষ্ণাকে দেখুন। পাঁচ ভাইকে আপন একক প্রেম ভাগ করে দেওয়ার জন্য বৈবাহিকভাবে তিনি দায়বদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে তা করতে গিয়ে কারও প্রতি বাৎসল্য, কাউকে রসমধুর স্তোকবাক্য, আবার কারও প্রতি শুধুই কর্তব্য করে গেছেন। কিন্তু অর্জুনের ব্যাপারটা বুঝি আলাদা। বিবাহ-লগ্নেই যে লক্ষ্যভেদী বীরপুরুষকে তিনি আশ্চর্য বিস্ময়ে হৃদয় নিবেদন করেছিলেন, সেই মানুষকে কি ভাগের প্রেম দিলে চলে? কারণে অকারণে, জ্ঞানে অজ্ঞানে দ্রৌপদীর দিক থেকে তাই কখনও বা সামান্য আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, যে আকুলতা অতি স্বাভাবিক এবং তা এতই সূক্ষ্ম যে বোঝাই যায় না, এতই গভীর যে একমাত্র ভাগ-বসানো সতর্ক স্বামী ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তা ধরাই মুশকিল।

বস্তুত আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে একজনের পাঁচটা বউ থাকতে পারত, কিন্তু এক বউয়ের পাঁচটা স্বামী থাকতে পারত না। কিন্তু এক স্বামীর পাঁচটা কেন, যদি দুটি বউও থাকে তাদের একজন ঠিক বুঝতে পারে যে অন্যতরের প্রতি কতটা রস বিতরণ হচ্ছে, তেমনি এক বউয়ের যদি

পাঁচটা স্বামী থাকে তাহলে অন্য স্বামীরাও ঠিক বুঝতে পারেন যে, নিকষে কার কতটা রসলাভ হল। এঁদের মধ্যে তাঁর পক্ষেই বরং খানিকটা নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, যাঁর ভাগ্যে সত্যিই সেই রস-বিনোদন ঘটছে এবং এই ঘটনাই ঘটেছে অর্জুনের ক্ষেত্রে। দ্রৌপদীর প্রেম নিশ্চিত জেনেই তিনি সে প্রেমে অধিকতর নির্লিপ্ত ; কিন্তু সমস্ত বাস্তবতার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে, ঔচিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, সে আকুলতা সামান্য হলেও তা ঠিক ধরা পড়েছে অন্য স্বামীদের কাছে। হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক, দ্রৌপদীর বিবাহ থেকে আরম্ভ করে মহাভারতের প্রায় শেষাংশ পর্যন্ত এ-তথ্য কেউ প্রকাশ করেননি, পঞ্চপাণ্ডবের কেউ না। মনের কথা বুঝি মনেই ছিল, হয়তো দ্রৌপদীর সামনে এ-কথা প্রকাশ করার ভয়ও ছিল। কিন্তু মহাপ্রস্থানপর্বে যে মুহূর্তে দ্রৌপদীর দেহান্ত হয়েছে সেই মুহূর্তে—আমাদের ধারণামতো—বউ ভাল মরলে আর চাকর ভাল পালালে—এই সুযুক্তি সহানুভূতি যুধিষ্ঠিরের ছিল না, সেই মুহূর্তে তিনি যেন ভাইদের প্রতিনিধি হয়ে বললেন—আমাদের সবার মধ্যে দ্রৌপদী সবচেয়ে ভালবাসত অর্জুনকে, তার ওপরেই ছিল দ্রৌপদীর গহন প্রেমের পক্ষপাত—পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে। যুধিষ্ঠির একটুও ভণিতা না করে দ্বিধাহীনভাবে বললেন—এই পক্ষপাতেরই ফল আজ পাচ্ছে দ্রৌপদী তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে—তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম।

অর্জুনকে বেশি ভালবাসত এবং তার ফল পেয়েছে, মরেছে—মৃত্যুর মুহূর্তে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা যুধিষ্ঠিরের এই সত্যবচন তাঁকে যতই সত্যবাক ঋষির মতো করে তুলুক, মানুষের হৃদয়লোকে এ যেন নৃশংসতা। তা ছাড়া এই পক্ষপাত কতটুকু ? নববধূর কুসুম-কল্পনা বারবার দলিত করে ভাবে ভঙ্গিতে আর বক্রোক্তিতে এই পক্ষপাত কতটুকু দেখাতে পেরেছেন দ্রৌপদী ? আবার তিনি, যদি বা নিজের অভিমান-মঞ্চ থেকে নেমে এসে যতটুকু পক্ষপাত দেখাতে পেরেছেন, অর্জুনের দিক থেকে তারও সাড়া মেলেনি। একেবারে বিরাটপর্বে এসে অর্জুনকে তাই বলতে হয়েছে—কেউ কারও মন বোঝে না, আমাকেও তুমি বোঝ না—যেন মাং নাববুধ্যসে।

ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অর্জুনের দিক থেকে একটা পরিকল্পিত ব্যবহার সৃষ্টি করে নিলেই তাঁর নির্লিপ্ততা এবং দ্রৌপদী আকর্ষণের তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, আমি সেদিনটার কথা ধরছি না, যেদিন লক্ষ্যভেদের পর খুশির হাসিতে উছলে-পড়া দ্রৌপদীর বরমাল্যখানি অর্জুনের গলায় দুলিয়ে দিয়েছিলেন। ধরছি না এই জন্যে যে, নববধূর সদ্য-ফোটা একাধার হৃদয়কল্পনার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বসিয়ে দেওয়া হল আরও চারজনকে। বেশ এ-পর্যন্তও না হয় বোঝা গেল, কিন্তু দ্রৌপদীর সঙ্গে প্রথম সহবাসের সুযোগ পেলেন যুধিষ্ঠির, অর্জুন নয়। অন্তত লক্ষ্যভেদ করার পুরস্কার হিসেবে প্রথম সহবাসের অধিকার তো অর্জুনকে দেওয়া যেত। না, যুধিষ্ঠিরও এ-সুযোগ ছাড়েননি, যদিচ ছাড়লেও আমি নিশ্চিত জানি অর্জুন এ সুযোগ নিতেন না। তারপরেই তো সেই ব্রাহ্মণের গরু-হারানোর ঘটনা। আচ্ছা, সামান্য একটা গরু চোর ধরার জন্য, আর গরু খোঁজার জন্যও কি অর্জুনকে যেতে হবে ? ভীম, নকুল, সহদেব—এঁরা কী করছিলেন ? যিনি দূর থেকে কতবার দ্রৌপদীর গলা শুনতে পেয়ে বিপদ উদ্ধার করেছেন, সেই তিনি ভীম ব্রাহ্মণের গরু-হারানো গলা শুনতে পেলেন না ? নাকি, কেউই ওই অস্ত্রাগারে ঢুকে দ্রৌপদীর সহবাস খোয়াতে চাননি। তা যাক, না হয় অর্জুনই গরু-চোর ধরতে গেলেন এবং নারদের নিয়মে তাঁর বনবাস হল। কিন্তু যুধিষ্ঠির তো ছোট ভাইকে ছাড় দিয়ে বাড়িতেই থাকতে বলেছিলেন, তিনিই তো পাকামি করে থাকলেন না।

ঠিক এইখানটাতেই কথা। ধরে নিই যুধিষ্ঠিরের পীড়াপীড়িতে অর্জুন থেকেই গেলেন। ফলটা কী হত ? প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে যেত যে, অর্জুন কোনও মূল্যেই সহবাস-সুখ ত্যাগ করতে চান না। দ্বিতীয়ত, ভীম কিংবা নকুল-সহদেব হলেও বুঝি ঘরেই থেকে যেতে পারতেন, কিন্তু এটা যেহেতু সেই অর্জুন, যিনি দ্রৌপদীর বরমাল্য জিতেছিলেন, তাই তিনিই প্রথম নিয়ম ভাঙলে অন্য স্বামীদের মনে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের মনে তো এক ধরনের মিশ্রক্রিয়া হতই। ভীম, নকুল-সহদেবের মনে হত—অর্জুনই যেহেতু লক্ষ্যভেদী এবং দ্রৌপদীর আসল নায়ক, তাই যুধিষ্ঠিরের তাকে অত করে

থাকতে বলছেন। আর যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবতেন—অর্জুন থেকে গেল, বীর ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অন্তত দ্রৌপদীর ওপরে নিজের হক এবং প্রাপ্য পাওনা ছেড়ে দিতে চায় না অর্জুন। কাজেই যুধিষ্ঠির যখন বলেছিলেন—তুমি ছোটভাই, বড়দের ঘরে ঢুকেছ, কী হয়েছে—এটা যুধিষ্ঠিরের ভালমানুষি, না পরীক্ষা, সেটা বুঝতে হবে। অন্তত অর্জুন এটাকে পরীক্ষা হিসেবেই নিয়েছিলেন। তাই যে কথাগুলি যুধিষ্ঠিরই সাধারণত বলেন, অর্জুন সেই ধর্মেরই দোহাই দিয়ে বললেন—ধর্মের ব্যাপারে চালাকি চলে না, একথা আপনার কাছেই শুনেছি। অতএব সত্যধর্ম থেকে বিচলিত হতে চাই না, দাদা! অর্জুন ধীর নির্লিপ্ততায় বনবাসী হলেন।

না, দ্রৌপদী কাঁদেননি, হৃদয়ের গভীরে পাক খাওয়া আসন্ন বিরহের বেদনা হৃদয়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে। তা ছাড়া সেটা কোনও সময়ও ছিল না কাঁদবার। তিনি জ্যেষ্ঠ-স্বামীর সঙ্গসুখ ভোগ করছেন, এই সময়ে তৃতীয় পাণ্ডবের জন্য কাঁদবার মানে হবে একটাই। পক্ষপাত। তিনি শারীরিক সঙ্গ পাবার আগেই অর্জুনকে ভালবেসেছেন। অন্তত নববধূর প্রথম মিলন মুহূর্তেও এই কথাটা তিনি কান্নায় প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু অর্জুন তো চলে গেলেন এবং দ্রৌপদীকে না পাবার নৈরাশ্যেই কিছুটা বা বাউল স্বভাব হয়ে গেল তাঁর। নৈরাশ্যের জবাবে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা—একটার পর একটা বিয়েই করে ফেললেন। তারপর বুঝি দ্রৌপদীকে হারানোর দুঃখ কিছুটা বা ঘুচল প্রথমবারের মতো সুভদ্রাকে দেখে। রৈবতক পর্বতের বনভোজন মহোৎসবে সুভদ্রাকে দেখেই তাঁর মনে হল—কৃষ্ণ-বলরামের বোনকে দেখে কেই বা না মোহিত হবে—কমিবৈষা ন মোহয়েৎ। তিনি সুভদ্রার মধ্যে দ্রৌপদীর রূপ এবং বৈদগ্ধ্য, দুয়েরই ছায়া পেলেন, মনে ভাবলেন—এই মহিলা যদি আমার বউ হত—যদি স্যান্ মম বার্ষ্ণেয়ী মহিষীয়ম্। শেষে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সুভদ্রা-হরণ করে, অনেক যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষে বীরের মতো অর্জুন পেলেন সুভদ্রাকে।

পেলেন তো, কিন্তু এক বছরের একটু বেশি সময় দ্বারকায় থেকে সুভদ্রার উষ্ণ-সঙ্গ ভোগ করতে করতেই যে বনবাসের বারো বচ্ছর কেটে গেল। এবার তো ঘরে ফেরার পালা, খাণ্ডবপ্রস্থে, দ্রৌপদীর ঘরে। উলূপী, চিত্রাঙ্গদাকে না হয় দ্রৌপদী নিজের সমমর্যাদায় দেখতেন না, কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে দ্রৌপদীর মুখোমুখি হওয়া! অর্জুন যে জানেন দ্রৌপদী তাঁকে ভালবাসেন। মাটিতে পড়ে গেলেও স্খলিতপাদ মনুষ্যের অবলম্বন তো সেই ভূমিই, কাজেই যার কাছে অর্জুন অপরাধী, অর্জুন তাকেই আশ্রয় করলেন। খাণ্ডবপ্রস্থে এসে রাজা-ব্রাহ্মণের অভিবাদন সেরেই তিনি ঢুকলেন দ্রৌপদীর ঘরে—দ্রৌপদীম্ অভিজগ্মিবান্। আগেই খবর হয়ে গেছে। বারো বচ্ছর পরে অভিমানে বিধুর দ্রৌপদী প্রথম স্বামি-সম্ভাষণ করলেন কঠিন বক্রোক্তিতে। বললেন—তুমি আবার এখানে কেন? যাও সেইখানে, যেখানে আছে সেই সাত্বত-বৃষ্ণি-কুলের সোহাগী মেয়ে—তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। দ্রৌপদী সুভদ্রার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না, তাঁর বংশের নামে কথা চালালেন। অর্জুনকে খোঁটা দিয়ে বললেন—তোমার আর দোষ কী? ভারী জিনিস কঠিন বাঁধনে বেঁধে রাখলেও সময়কালে সে বাঁধন খানিকটা আলগা হয়েই যায়—সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে।

ব্যাস লিখেছেন—প্রথমটা দ্রৌপদী যেভাবে বলছিলেন, তাতে তাঁর প্রণয়কোপের ভাগটাই ছিল বেশি—প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্। কিন্তু দ্রৌপদী যে বাঁধনের কথা বললেন, সে বাঁধন তো তাঁর অন্য স্বামীদের। যুধিষ্ঠির, ভীম—এঁদের বাঁধন যত বেড়েছে, অর্জুনের বাঁধন তত আলগা হয়েছে—পরে তার প্রমাণও দেব। কিন্তু এই মুহূর্তে, বারো বচ্ছর পরে যে দ্রৌপদী প্রথমে প্রণয়রসে রাগ দেখিয়ে কথা আরম্ভ করেছিলেন সে রাগ তার কোথায় গেল! তিনি তো পরমুহূর্তেই কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে। ব্যাস শব্দটা লিখছেন—বিলপন্তীং, যার মানে বিলাপ করাও হয়, আবার কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের মতে 'নানাবিধ পরিহাস করিতে থাকিলে'—তাও হয়। সিংহীমশায় ভেবেছেন, আগে যখন প্রণয় কোপের কথা আছে, তাহলে এ শব্দটা পরিহাসই বোঝাবে। কিন্তু সাতবাহন হাল থেকে সমস্ত রসবেত্তা বোদ্ধারা বলেছেন—বিদগ্ধা মহিলারা রাগ দেখায় কেঁদে, আমি তাই এখানে 'বিলপন্তীং বলতে কাঁদতে-থাকা দ্রৌপদীকেই বুঝি। বিশেষ করে অর্জুন যেহেতু দ্রৌপদীকে নানাভাবে সান্ত্বনা

দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, বহুভাবে দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তাতে বুঝি মানিনী দ্রৌপদী কাঁদছিলেন।

দ্রৌপদী কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। ধর্মপুত্র থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ছাড়া অন্য স্ত্রী আছেন। তাদের কারও জন্যে দ্রৌপদীর কোনও দুঃখ কোথাও ধরা পড়েনি। কারণ তাদের কাউকে দ্রৌপদী আপনার সমকক্ষ মনে করেননি। কিন্তু অর্জুন তাঁর নির্লিপ্ততার বাহানায় দ্রৌপদীর মতো সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের দিক থেকে পেছন ফিরতে গিয়ে তাঁরই সমকক্ষ আরেক ব্যক্তিত্বকে বিবাহ করে এনেছেন। এ অপমান দ্রৌপদীর সইবে কী করে ? যার জন্য বারো বচ্ছর ধরে হৃদয়ের মধ্যে গোপন আসন সাজিয়ে বসে আছেন, তিনি একেবারে বিয়ে করে ফিরেছেন। দ্রৌপদী লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেললেন। প্রথমবারের মতো তিনি ধরা পড়ে গেলেন—তিনি অর্জুনকে বেশি ভালবাসেন।

সমকক্ষ ব্যক্তিত্বকে দিয়ে সমকক্ষের মোকাবিলা করা মুশকিল, বিশেষত আগুনপানা দ্রৌপদীকে। অর্জুন প্রথমেই সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর ঘরে এনে তোলার সাহস পাননি। এখন দ্রৌপদীর ভাব বুঝে, ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেলেন সুভদ্রার ঘরে। নববধূর নতুন অনুরাগের মতো লাল কৌশেয় বাসখানি তাড়াতাড়ি খুলে ফেলতে বললেন সুভদ্রাকে, খুলে ফেলতে বললেন ভূষণ-অলংকার। সুভদ্রাকে সাজিয়ে দিলেন দীন-হীন গোয়ালিনীর বেশে—কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ। এবারে তাকে দ্রৌপদীর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন একা। অনুক্রম অনুসারে সুভদ্রা কুন্তীকে প্রণাম করেই দ্রৌপদীর ঘরে এলেন। তাঁকেও প্রণাম করে সুভদ্রা বললেন—আজ থেকে আমি তোমার দাসী হলাম দিদি—প্রেষ্যাহম্ ইতি চাব্রবীৎ। 'দাসী !' দ্রৌপদীর অভিমান বুঝি কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হল। সুভদ্রার কুল মান সব বুঝেও তাঁর আপাত ব্যবহারে, দীন বেশে খুশি হলেন দ্রৌপদী। ভবিষ্যতের ধারণাহীন নতমুখী একা একা বালিকাকে দেখে দ্রৌপদীর বুঝি মায়া হল। উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সুভদ্রাকে, আশীর্বাদ করলেন—তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হন। সপত্ন—মানে শত্রু, কাজেই নিঃসপত্ন হন মানে—স্বামী নিঃশত্রুক হন—এই তো বীরাঙ্গনার আশীর্বাদ। কিন্তু পাঠক ! শব্দের মধ্যেও ব্যঞ্জনা আছে। স্ত্রীলিঙ্গে 'সপত্নী' মানে যদি সতীন হয় তাহলে পুংলিঙ্গে সপত্ন মানেও একটা পুরুষ-সতীনের ব্যাপার থেকেই যায়, বিশেষত দ্রৌপদীর যিনি আসল স্বামী অর্জুন, তাঁর সপত্ন পুরুষের জ্বালাতেই বারো বছর পরে অর্জুনকে দেখতে পেলেন তিনি। কাজেই দ্রৌপদীর এই আশীর্বাদের অর্থ এই যে, আমার মতো যেন তোমার অবস্থা না হয়—তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোন।

ভাব দেখে মনে হল বুঝি দ্রৌপদী অর্জুনকে দিয়েই দিলেন সুভদ্রাকে। কিন্তু মন থেকে কি দেওয়া যায় ? দেওয়া কি অতই সহজ ? বরঞ্চ অর্জুনের প্রতি অক্ষমায় এবং সুভদ্রার প্রতি অতি ক্ষমায় দ্রৌপদীই যেন ধরা পড়ে গেলেন। সুভদ্রার স্বামীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নিজেরই মনের মধ্যে সতীন-কাঁটা বিঁধে রইল। অর্জুনের নির্লিপ্ততা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলল দ্রৌপদীর অক্ষমা। ইতিমধ্যে দ্রৌপদী ভীমকে অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছেন—ভালবাসার জন্যে যতখানি, অর্জুনের ঈর্ষা জাগানোর জন্যে তার চেয়ে বেশি। কৌরব সভায় সেই অপমানের দিন এসে গেল। দ্রৌপদীর মনে হল অর্জুন যেন নির্বিকার। অর্জুন যেন তাঁর হয়ে একটুও কথা বলছেন না। যেখানে ভীম দ্রৌপদীর অপমানে একের পর এক প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছেন, তার প্রতিতুলনায় গাণ্ডীবধন্বাকে তাঁর নিতান্ত অপ্রতিভ মনে হল। ভীম রাগের চোটে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, অর্জুনই তাঁকে বারণ করেছেন। এ-সব ব্যবহার দ্রৌপদীর কাছে প্রীতিপদ হয়নি।

দ্রৌপদী বুঝতে পারেননি, যিনি মহাযুদ্ধের নায়ক হবেন, তাঁর মাথাটি ভীমের মতো হলে চলে না। অর্জুনের যুক্তি ছিল—যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় পাশা খেলতে আসেননি। ক্ষত্রিয় ধর্মের নিয়ম অনুসারে পাশা খেলায় আহূত হলে তাকে খেলতেই হবে। সেখানে যুধিষ্ঠিরের দোষ কী ? অর্জুন ভীমকে বলেছেন—নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদে শত্রুরই আখেরে লাভ হবে। সেই সুযোগ আপনি করে দেবেন না দাদা—ন সকামাঃ পরে কার্যাঃ। ভীম যুক্তি বুঝেছেন। তবু অর্জুনের এই স্থিরতা, ধৈর্যের চেয়ে ভীমের হঠাৎ-ক্রোধই দ্রৌপদীর কাছে বেশি ভাল লেগেছে। অর্জুনের ওপর অক্ষমা তাই

বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু মুখের এই ক্ষমাহীনতার সঙ্গে দ্রৌপদীর হৃদয়ের মিল নেই। সেখানে বারবার অর্জুনের প্রেমিকা হিসেবেই তিনি ধরা পড়ে যান। বনবাস-পর্বে পাণ্ডবেরা যখন দ্বৈতবন ছাড়ার মুখে, তখন ব্যাস এসে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সেই বিদ্যা শিখিয়ে তপস্যায় যেতে বললেন, যে তপস্যায় তুষ্ট হবেন ইন্দ্র এবং মহাদেব। অর্জুন জ্যেষ্ঠের আদেশ নিয়ে চললেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করলেন—ধ্রুবো'স্তু বিজয়স্তব। হতভাগিনী দ্রৌপদী আবার ধরা পড়ে গেলেন।

অর্জুনের আসন্ন প্রবাস বেদনায় দ্রৌপদীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সব ভাইয়ের সামনেই তিনি অর্জুনের জন্য জমে থাকা ভালবাসা উজাড় করে দিলেন। বুঝি বিদগ্ধা রমণীর ভালবাসার এই রীতি। মুখে তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন, অথচ বাড়ি থেকে তিনি যে চলে যাবেন, তারও উপায় নেই—চলে যেতে চাইলেই অভিমানে ভরা একরাশ দুঃখ হাঁড়ি-মুখ থেকে গলগল করে বেরিয়ে পড়ে। দ্রৌপদী বললেন—মহাবাহু! তুমি জন্মানোর পরে আর্যা কুন্তী তোমার কাছে যা চেয়েছিলেন এবং যেমনটি তুমিও চাও, ঠিক তেমনটিই যেন তোমার হয়, অর্জুন! ঠিক এই শুভাকাঙ্ক্ষার পরেই দ্রৌপদীর গলা থেকে বেরিয়ে এল আক্ষেপের সুর—প্রার্থনা করি, কারও যেন আর ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম না হয়—মাস্মাকং ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম কশ্চিবদবাপ্নুয়াৎ। ভিক্ষা করে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণেরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল আছেন, তাঁদের আমি নমস্কার করি—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা।

ক্ষত্রিয় রমণীর মুখে এ কী কথা? না, আমরা বুঝি, আমরা দ্রৌপদীর দুঃখ বুঝি। সেই যে নববধূর আবেশ না ঘুচতেই ব্রাহ্মণের গরু উদ্ধার করতে অর্জুনকে ছুটে যেতে হল, আর বনবাস জুটল কপালে, সে ক্ষত্রিয় বলেই তো; রাজসভায় পাশাখেলার আসরে অপমান হতে হল দ্রৌপদীকে তাও—তো ক্ষত্রিয়নীতির বালাই নিয়ে। আবার এখন যে অর্জুনকে প্রবাসে তপস্যায় যেতে হচ্ছে, তাও তো ক্ষাত্রযুদ্ধে চরম জয়লাভের জন্য। এর থেকে বামুন হয়ে জন্মালে, দুবেলা দুমুঠো ভিক্ষার অন্ন মুখে দিয়ে, বামুন ঠাকুরের ত্রিসন্ধ্যা-তপস্যার ব্যবস্থা করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকত। অন্তত তিনি তো কাছেই থাকতেন, কোনওদিন কর্মহীন অবকাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন কাটাতে হত না দ্রৌপদীকে। কিন্তু দ্রৌপদীর মুশকিল হল—কৌরবসভায় যে অপমান তাঁকে সইতে হয়েছিল তার চরম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অর্জুনকে ছেড়ে দিতেই হবে, আবার অন্যদিকে তাঁকে ছেড়ে থাকতে তাঁর বনবাসের জীবন হয়ে উঠবে বিরহে বিধুর। চার স্বামী কাছে থাকতেও শুধু অর্জুন না থাকার মানে যে আলাদা। দ্রৌপদী বললেন—কুরুসভায় দুর্যোধন আমাকে বলেছিল 'গরু'। আমি 'গরু', কিন্তু সেই অপমান আর দুঃখ থেকে, তুমি অর্জুন—আমার কাছে থাকবে না—এ দুঃখ আমার কাছে আরও অনেক বড়—তস্মাদ্ দুঃখাদ্ ইদং দুখং গরীয় ইতি মে মতিঃ। তুমি চলে গেলে তোমার ভাইয়েরা হয়তো তোমার বীরত্বের কথা কয়েই দিন কাটাবে; কিন্তু আমার কী থাকল—তুমি প্রবাসে কষ্ট করবে, সেই অবস্থায় কোনও সুখ, কোনও ভোগ এমনকী জীবনও আমার কাছে অসহ্য লাগবে। আমাদের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য, ঐশ্বর্য—সব, সব তোমাতেই নির্ভর। কাজেই তোমাকে বিদায় দিতেই হবে, হে বন্ধু বিদায়। নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ—প্রার্থনা করি তোমার প্রবাসের দিন সুখের হোক, তুমি নীরোগ থাক—স্বস্তি গচ্ছ হ্যনাময়ম্।

ব্যাস লিখেছেন—দ্রৌপদী অর্জুনকে এই 'আশীর্বাদ' করে থামলেন—এবমুক্ত্বাশিষঃ কৃষ্ণা বিররাম যশস্বিনী। দ্রৌপদী কি তখন যুধিষ্ঠির কিংবা ভীমের বউ হয়ে ছিলেন যে, এই শব্দটি—আশীর্বাদ? হয়তো তাই, নয়তো নয়—ব্যাস স্বকণ্ঠে কিছু বলেননি। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখেছি অর্জুনের বনবাস, প্রবাস—সবকিছুই ঘটে, যখন তিনি অন্য পাণ্ডবের ঘরণী—হয়তো এখানেও তাই হবে, হয়তো দুঃখ তাই বেশি। কৃষ্ণার এত কথা, এত শুভাশংসার উত্তরে অর্জুন কিন্তু একটি কথাও বলেননি। যদি বলতেন, তাহলে ভাইদের সতীন-হৃদয়ে তার ছায়া পড়ত এবং মৃত্যুর পরও তাঁকে শুনতে হত—অর্জুন কৃষ্ণার প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিল। কিন্তু অর্জুন না হয় ধীরোদাত্ত নায়ক পুরুষ, কিছু বললেন না, কিন্তু দ্রৌপদীর স্ত্রীহৃদয় কি বশে আনা যায়! একবার, যেমন এখন, তিনি অর্জুনের ওপর

তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ করে ফেললেন, তেমনি অর্জুনের প্রবাস-পর্বে তিনি নিজেকে একেবারেই ধরে রাখতে পারেননি।

অর্জুন যখন তপস্যার জন্য চলে গেলেন তখনও পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে। তাঁরা কিছুদিন ব্রাহ্মণদের মুখে নল-দময়ন্তীর কাহিনী শুনে দিন কাটালেন, কিন্তু অর্জুন ছাড়া কারও ভাল লাগছিল না, এমনকী মহাভারতের শ্রোতা যে তরুণ ছেলেটি—জন্মেঞ্জয়, অর্জুন যার সাক্ষাৎ প্রপিতামহ, সে পর্যন্ত বৈশম্পায়নকে বলল—অর্জুনকে বাদ দিয়ে আমার আর আর পিতামহেরা কী করছিলেন ? সুভদ্রার গর্ভ-পরম্পরায় যার জন্ম সেই জন্মেঞ্জয়ও কি দ্রৌপদীর ধরা পড়ার আন্দাজ পেয়েছিলেন কোনও ? মহর্ষি বৈশম্পায়ন একটু বললেন অন্য পাণ্ডবদের কথা। তাঁরা সুতোছেঁড়া মণিমালার মতো ছন্নছাড়া আর ডানাকাটা পাখির মতো ছন্দোহীন হয়ে পড়েছেন। সবাই শোকার্ত, অহৃষ্টমনসঃ, কিন্তু পাঞ্চালী-দ্রৌপদীর অবস্থা যেন আরও খারাপ, অর্জুনকে স্মরণ করলেই জীবনের সবগুলো ফাগুন যেন একসঙ্গে তাঁর বুকের মধ্যে হা হা করে—অর্জুনকে যে তার ভাল করে পাওয়াই হয়নি। ব্যাস তাই লিখলেন—বিশেষতস্তু পাঞ্চালী স্মরন্তী মধ্যমং পতিম্। পাঞ্চালী দুঃখ জানানোর লোক পেলেন না, বেছে বেছে যুধিষ্ঠিরকেই তিনি মনের ব্যথা বোঝাতে আরম্ভ করলেন। জ্যেষ্ঠ-স্বামীর মানসিক জটিলতা সম্পূর্ণ হল—দ্রৌপদী অর্জুনেরই।

দ্রৌপদী বললেন—মাত্র দুটি হাতেই অর্জুন আমার সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মতো শক্তিশালী। তাকে ছাড়া এই বনভূমি যে আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে, এই ফল-ফুল, নদী লতা সব শূন্য। সেই মেঘের মতো কালোপানা পেটা চেহারা, হাঁটলে মনে হবে হ্যাঁ হাঁটছে বটে, হাতি হাঁটছে। আর মনে পড়ছে তার নীল পদ্মের পাপড়ি হেন চোখ দুটি। সে ছাড়া এই কাম্যক বন আমার অন্ধকার। যার ধনুকের টঙ্কার শুনলে মনে হবে বাজ পড়ছে যেন—সেই পরবাসী অর্জুনের কথা ভেবে ভেবে একটু যে শান্তি পাচ্ছি না আমি—ন লভে শর্ম বৈ রাজন্ স্মরন্তী সব্যসাচিনম্।

অর্জুনের বীরত্ব, অর্জুনের চেহারা আর অর্জুন ছাড়া সুন্দরী অরণ্যভূমি—শূন্যামিব প্রপশ্যামি—দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেলেন। কৃষ্ণার অর্জুন-বিলাপ শেষ হলে ভীম, নকুল এবং সহদেব তাঁরই সঙ্গে সুর মেলালেন বটে, কিন্তু সেই অধ্যায়ে ধর্মরাজের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। পরের অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণা এবং ভাইদের সম্মিলিত হাহাকার শুনে যুধিষ্ঠিরও কিঞ্চিৎ বিমনা হলেন—শ্রুত্বা বাক্যানি বিমনা ধর্মরাজো'প্যজায়ত। যুধিষ্ঠিরও অর্জুনের জন্যে বিলাপ করেছেন, তবে সে পরে, ভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নয়। আমি বিশ্বাস করি প্রধানত দ্রৌপদীর উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখেই পরবর্তী সময়ে যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইয়েরা অর্জুনকে কৈলাস পর্বতের দুর্গম পথে খুঁজতে বেরলেন। যুধিষ্ঠির পথ-পরিশ্রমের কারণে কৃষ্ণাকে রেখেই যেতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন শুধু নকুলকে। কিন্তু ভীম দ্রৌপদীর মন বুঝেই জবাব দিলেন—সে হয় না, দ্রৌপদী সত্যিই ক্লান্ত। কিন্তু অর্জুনকে দেখতে না পেয়ে তিনি তো দুঃখও পাচ্ছেন বটে এবং প্রিয়দর্শন লালসা যেহেতু শ্রমক্লান্ত শরীরকেও টেনে নিয়ে চলে, তাই দ্রৌপদী অর্জুনকে দেখার ইচ্ছে সামলাতে পারবেন না, তিনি যাবেনই—ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া।

সার্থক প্রেমিক ছাড়া প্রিয়ার মনের কথা এমন করে কে বুঝবে ? ভীম দ্রৌপদীকে ভালবাসেন বলেই তাঁর ভালবাসার পাত্রকে এমন করেই জুগিয়ে দিতে পারেন। ভীম বললেন—দুর্গম স্থানে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাব দ্রৌপদীকে—অহং বহিস্যে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্ষ্যতি। এইবার এতক্ষণে দ্রৌপদীর মুখে হাসি ফুটল—প্রহসন্তী মনোরমা। যুধিষ্ঠিরকে সলজ্জে বললেন—আমার জন্য আপনি ব্যাকুল হবেন না, মহারাজ ! আমি ঠিক পারব—গমিষ্যামি ন সন্তাপঃ কার্যো মাং প্রতি ভারত। ঠিক এই অর্জুনকে খুঁজবার পথেই দ্রৌপদীর সেই সুর-সৌগন্ধিকের বায়না। বায়না ভীমের কাছে। পাঠক ! এটি উৎকট কিছু ভাববেন না। অর্জুনের প্রতি এতক্ষণ যে অতিরিক্ত পক্ষপাত দেখিয়েছেন পাঞ্চালী, তাতে যদি একান্ত অনুরক্ত ভীমের প্রতি অবিচার হয়, তাই তিনি নতুন কোনও কর্ম দিয়ে ধন্য করলেন অনুরাগীকে। কিন্তু লক্ষ করুন অর্জুনকে। পাঁচ বচ্ছর পরে অর্জুনের সঙ্গে

দেখা হল পাণ্ডবদের এবং পাঞ্চালীর। অর্জুন চারভাইকে অভিবাদন জানালেন, অগ্রজদের প্রণাম করলেন, অনুজদের আশীর্বাদ। কিন্তু এতদিনের পথ-চাওয়া কৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হলেন যখন, অবিচারী ব্যাস সেই মুহূর্তটিকে তপ্ত আলিঙ্গনে ধরে রাখতে পারেননি। রাখবেন কী করে ? অর্জুনই যে সেরকম নন। দ্রৌপদী নিশ্চয়ই কাঁদছিলেন, হয়তো অনেক আশা ছিল। কিন্তু অর্জুন কী করেন, তিনি আপন প্রণয়িনীকে কোনওমতে সান্ত্বনা দিলেন—সমেত্য কৃষ্ণাং পরিসান্ত্ব্য চৈনাম্—এর বেশি কিছুই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। আর যদি করতেন তা হলে মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠিরের মুখে সেই বাণী শুনতে হত—দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুনের বেশি পক্ষপাত ছিল।

আমরা বিরাটরাজার নৃত্যশালায় দ্রৌপদী আর অর্জুনের সংলাপ থেকেই অর্জুনের প্রসঙ্গে এসেছিলাম। অর্জুন বলেছিলেন—আমার মন তুমি বুঝলে না, ধনি। আমরা বলি, বুঝবার উপায় রাখলে কি ? কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অনুকূলে তুমি একটি কথাও বললে না। বনের মধ্যে জয়দ্রথ এলেন, তোমার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভীম, বিরাটের ঘরে কীচকেরা জ্বালাল, রক্ষা করলেন ভীম, তুমি তখনও উত্তরাকে নাচ শিখিয়ে চলেছ। অর্জুন ! তুমি বলবে—দ্রৌপদীর বিপদে তুমি এগিয়ে আসার আগেই ভীম এত বেশি প্রাগ্রসর যে, তারপরেও তোমার এগিয়ে আসাটা বেমানান হত। আমরা বলি, হলেই কি, প্রেম দেখানোর রাস্তা তো ওইটাই। আসলে বল, তুমি যুধিষ্ঠিরের কাছে ধরা পড়ে যেতে--তুমি নির্লিপ্ত বীর সাজতে চেয়েছ এবং তা পেরেওছ। তোমার বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের কোনও অভিযোগ নেই বটে, কিন্তু দ্রৌপদীর আছে, আমাদেরও আছে। দ্রৌপদীর মতো আমরাও তাই তোমাকে আশীর্বাদ করি—তুমি জন্মানোর সময় আর্যা কুন্তী যা চেয়েছিলেন এবং তুমিও যেমনটি চাও, তুমি যেন তাই পাও, অর্জুন—তৎ তেস্তু সর্বং কৌন্তেয় যথা চ স্বয়মিচ্ছসি। তোমাকে আর তোমার মন বুঝতে হবে না অর্জুন। দ্রৌপদীর ভালবাসার উত্তরে, তুমি যদি কোথাও ধরা পড়ে যেতে, সেই হত তোমার সত্য পুরস্কার। তা তুমি পারনি, কিন্তু ধরা-পড়া তুমি জান না তা তো নয়। কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার কাছে তুমি বেশ বাঁধা। দ্রৌপদীর আগেই তার গর্ভে তোমার পুত্র হয়েছে এবং সেই পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে সযত্নে। দ্রৌপদীর গর্ভে তোমার পুত্র অবহেলিত, তার নামও শোনা যায় না। বিরাটরাজা যখন উত্তরার বিবাহ সম্বন্ধ করলেন তখন তাকে তোমার দ্রৌপদী-গর্ভজাত পুত্র শ্রুতকর্মার জন্য গ্রহণ করলেই পারতে, অভিমন্যুর জন্য কেন ? পট্টমহিষী দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্রগুলির মৃত্যুও হয়েছে এমনভাবে, যা একটু বীরোচিত নয়। সবই দ্রৌপদীর ভাগ্য। অথচ সুভদ্রার ধারায় অভিমন্যু মারা গেলেও তাঁরই বংশ পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় পাণ্ডবকুলের রাজ্যশাসন করেছেন। স্বামী এবং পুত্র—কোনওটাতেই চরম সুখ হয়নি দ্রৌপদীর। প্রায় সারা জীবনই রাজ্যহীন অথচ—শুধু পট্টমহিষীর উপাধিটা বয়ে বেড়ানো ছাড়া দ্রৌপদী আর কিছুই পাননি।

আসলে বিদগ্ধা এক রমণীর অধিকার স্বামীর পক্ষে অতি গৌরবের কথা। কিন্তু সে যদি অতি বিদগ্ধা হয় তাহলে স্বামী তাঁকে যতখানি ভালবাসেন তার চেয়ে বেশি ভয় পান। দ্রৌপদীকে অনেকেই ভয় পেতেন, স্বামীরাও। ব্যাতিরেক একমাত্র অর্জুন, কারণ তিনি নির্লিপ্ত। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত তার পুত্রদের সাবধান করে দিয়েছেন দ্রৌপদীর তেজস্বিতা সম্পর্কে। ঘোষযাত্রা পর্বে তিনি বলেছেন—দ্রৌপদী শুধু তেজেরই প্রতিমূর্তি—যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্। রাজমাতা কুন্তী, যিনি নিজেও প্রায় কোনওদিন রাজ্যসুখ ভোগ করেননি, তিনি অসীম প্রশ্রয়ে তাঁর এই পুত্রবধূটিকে তেজস্বিনী দেখতেই ভালবাসতেন। অন্তত একজন স্ত্রীলোক হিসেবে পুত্রবধূর মর্যাদা সর্বক্ষণ তাঁর অন্তরাশায়িনী ছিল। বনবাসে যাবার সময় দ্রৌপদীকে তিনি বলেছেন—আমি নিশ্চিন্ত, কারণ পতিব্রতার ধর্ম তোমায় শেখাতে হবে না। সত্যি কুন্তী নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু বনবাসের চোদ্দো বছরের মাথায় কৃষ্ণ যখন দূতীয়ালি করার জন্য কৌরব-সভায় এসেছেন, তখন কৃষ্ণের দেখা পাওয়ামাত্র তিনি যেমন তাঁর প্রিয় পুত্রদের জন্য বিলাপ করেছেন, তেমনি করেছেন পুত্রবধূ দ্রৌপদীর জন্য। কুন্তী বলেছেন—প্রিয় পুত্রদের থেকেও দ্রৌপদী আমার কাছে প্রিয়তরা—সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন। সে নিজের পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামীদের সঙ্গে কষ্ট করা বেশি ভাল মনে করেছে। কুন্তী তাঁর উপাধি দিয়েছেন—ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী। স্ত্রীলোক হিসেবে কুন্তীর

কাছে দ্রৌপদীর মর্যাদা যে কতখানি, সেটা বোঝা যায় কুন্তী যখন কৃষ্ণকে বলেন—যেদিন কৌরবসভায় আমি দ্রৌপদীর অপমান দেখেছি, সেদিন থেকে কি যুধিষ্ঠির, কি ভীম, কি অর্জুন, নকুল, সহদেব—কাউকে আমি আর প্রিয় বলে ভাবতে পারি না। কুন্তী দ্রৌপদীর অপমানে এতখানি অপমানিতা বোধ করেন যে, পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের হার, রাজ্য-হারানো এমনকী পুত্রদের নির্বাসন পর্যন্ত তাঁর সইতে পারে, কিন্তু রাজসভায় দ্রৌপদীকে খারাপ কথা বলা—এ তাঁর সয় না—ন দুঃখং রাজ্যহরণং ন চ দ্যূতে পরাজয়ঃ। ...যত্তুসা বৃহতী শ্যামা একবস্ত্রা সভাং গতা। অশৃণোৎ পরুষা বাচঃ কিংনু দুঃখতরং ততঃ।

কুন্তীর এই অভিমানী মর্যাদাবোধ দ্রৌপদীর অন্তরে সর্বক্ষণ অনুস্যূত ছিল। তিনি মুখে যতই বলুন না কেন—ক্ষত্রিয়কুলে যেন আর কারও জন্ম না হয়, দ্রৌপদী ছিলেন সেই মানের ক্ষত্রিয়রমণী যিনি কোনও কিছুর মূল্যেই মান খোয়াতে রাজি নন। বাস্তব জীবনে তিনি যতখানি প্রেমিকা বা কুলবধূ, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষাত্র তেজে তেজস্বিনী। সে তেজ এমনই যে তা প্রায় তাঁর পুরুষস্বামীদের সমান্তরাল। যেদিন থেকে তাঁর অপমান হয়েছে সেদিন থেকে প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান। মহাভারতের শল্যপর্বে এসে দেখেছি—যখন একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো প্রধান সেনাপতিরা মারা গেছেন, মারা গেছেন দুর্যোধনের ভাইয়েরা, কুলগুরু কৃপাচার্য তখন সন্ধি করতে বললেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন বললেন—আমি এখন সন্ধি করলেও পাণ্ডবেরা সন্ধি করবেন না। তাঁর অনেক যুক্তির মধ্যে একটি হল দ্রৌপদী। এতদিনে দুর্যোধনের বোধ হয়েছে যে, রাজসভায় দ্রৌপদীর যে অপমান তাঁরা করেছিলেন, সে অপমানের শোধ না হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবেরা কেন, স্বয়ং দ্রৌপদীই ছাড়বেন না। দুর্যোধনের কাছেই আমরা শুনেছি যে, অপমানের পরের দিন থেকেই দ্রৌপদী নাকি প্রতিশোধ-স্পৃহায় আপন স্বামীদের জয়লাভের জন্য তপশ্চরণ করছেন এবং সেই তপস্যার অঙ্গ হিসেবে সেদিন থেকেই তিনি নাকি মাটিতে শোন। দ্রৌপদী মাটিতে শোবেন ততদিনই, যতদিন না মূলশত্রু দুর্যোধনের অন্ত হচ্ছে—স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য যাতনম্।

এই হচ্ছেন দ্রৌপদী। শুধু 'প্রাজ্ঞা' 'পণ্ডিতা' কিংবা 'মনস্বিনী' নন, আগুনের মতো তেজস্বিনী। অজ্ঞাতবাসের শেষে যেখানে কৌরবদের সঙ্গে কথাবার্তার 'স্ট্র্যাটিজি' ঠিক করা হচ্ছে, সেদিন পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে একমাত্র সহদেব ছাড়া চারজনই, এমনকী ভীমও সন্ধির সুরে কথা বলেছিলেন। অন্তত ভীমের আচরণ দেখে দ্রৌপদী তো কিঞ্চিৎ হতাশই হয়ে পড়লেন—ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ। সেদিন এই কনিষ্ঠ স্বামীকেই সহায় করে—সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ—দ্রৌপদী কৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রতিশোধের বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। দুঃশাসনের হাত-ছোঁয়ানো দ্রৌপদীর চুল—অসিতায়তমূর্ধজা—সর্বজনের অভিজ্ঞানের জন্য সেদিন খোলাই ছিল। দ্রৌপদী আজকে আবার রাজনীতির পাকা আলোচনায় সামিল। অনেক কথার মধ্যে দ্রৌপদী বললেন—যুধিষ্ঠির মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে সন্ধি চাচ্ছেন, তাও যেন লজ্জার সঙ্গে—হ্রীমতঃ সন্ধিমিচ্ছতঃ। মনে রেখ কৃষ্ণ! দুর্যোধন যদি ঈপ্সিত রাজ্য না দেন, তাহলে যেন খবরদার সন্ধি করতে যেয়ো না, দুর্যোধন করতে চাইলেও না—সন্ধিমিচ্ছেন্ন কর্ত্তব্যস্তত্র গত্বা কথঞ্চন। তাদের ওপরে তোমার দয়া দেখানোর দরকার নেই। যেখানে মিষ্টি কথায় কাজ হয় না, সেখানে দণ্ড দিতে হয় এবং এই পাপিষ্ঠদের দরকার মহাদণ্ড—তস্মাত্তেষু মহাদণ্ডঃ ক্ষেপ্তব্যঃ ক্ষিপ্রমচ্যুত।

পরপর খানিকটা ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে দ্রৌপদী এবার করুণরসের ছোঁয়া লাগালেন রমণীর অস্ত্র হিসেবে। বললেন, কৃষ্ণ! তোমাকে ভাল করেই বলছি, হয়তো বা পুনরুক্তিও হচ্ছে, কিন্তু সীমন্তিনী কুলবধূর দুর্দশা আমার মতো আর কার হয়েছে বলতে পার! যজ্ঞের আগুন থেকে আমার জন্ম, মহারাজ দ্রুপদের মেয়ে আমি। ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন আর তোমার না আমি বন্ধু—তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী। আজকে মহারাজ পাণ্ডুর কুলবধূ হয়ে, পাঁচটা বীর স্বামী থাকতে এবং পাঁচটা ছেলে থাকতেও কৌরবসভায় আমাকে সেই অপমান সইতে হল? এই পাণ্ডবদের শরীরে যেন তখন রাগ বলে কিছু ছিল না, তাঁরা কোনও চেষ্টাও করেননি আমাকে বাঁচাবার। তাঁরা শুধু স্থানু সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অপমান দেখছিলেন—নিরমর্ষেষু অচেষ্টেষু প্রেক্ষমাণেষু পাণ্ডুষু। ধিক্ এই অর্জুন আর

ভীমকে যদি এঁরা থাকতেও দুর্যোধন আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকে—যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি।

লক্ষণীয়, দ্রৌপদী যেখানে নিজেকে করুণার যোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, সেখানে তাঁর করুণ-রসাত্মক বাক্যগুলির মধ্যেও ওজস্বিতার ছোঁয়া লাগে। প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক শব্দে প্রতিহিংসার ফুলকি ছড়িয়ে দ্রৌপদী মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর বাম বাহুতে নিয়ে এলেন আপন কুঞ্চিত কেশদাম। বেণী করা থাকলেও সে চুলের কোকড়ানো ভাব, ঘনত্ব অথবা সুবাস—কোনওটাই চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। সেই বিশাল বেণী-ভুজঙ্গিনীকে কৃষ্ণা তুলে নিলেন তাঁর বাম হাতে—মহাভুজগর্বচ্চসম্। কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা। সেই কুটিল কেশদামের মধ্যে বিষধর সর্পের অভিসন্ধি আরোপ করে দ্রৌপদী আকুল, জলভরা চোখে আস্তে আস্তে কৃষ্ণের কাছে এলেন। প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ির মতো আয়ত চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডব-ঘরণী কৃষ্ণা বললেন—এই সেই চুল, কৃষ্ণ! যে চুলে হাত লাগিয়েছিল দুঃশাসন। তোমার সন্ধি করার ইচ্ছে প্রবল হলে তুমি শুধু এই আমার চুলের কথা মনে রেখ—স্মর্ত্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা।

বক্তৃতায় এই অলংকার-পর্বের পর এবারে 'আলটিমেটাম্'। দ্রৌপদী বললেন ভীম আর অর্জুনকে তো দেখছি যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারে যেন মিইয়ে গেছে, তারা যেন এখন সন্ধির জন্যই সজ্জিত। আমি বলছি—তাঁরা যদি যুদ্ধ করতে না চান, তাহলে জানবে—যুদ্ধ করবেন আমার বৃদ্ধ পিতা, যুদ্ধ করবেন আমার ভাইয়েরা—পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈ-র্মহারথৈঃ। যুদ্ধ করার লোক আছে আরও। আমার পাঁচটি ছেলে তাদের মায়ের সম্মান রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর তাদের নেতৃত্ব দেবে কুমার অভিমন্যু—অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ।

দ্রৌপদী যাঁদের নাম করলেন, তাঁদের ওপর তাঁর অধিকার একান্ত। এমনকী অর্জুন যতই সুভদ্রা-সোহাগী হন না কেন, সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যুর ক্ষমতা ছিল না তার বড়-মায়ের আদেশ অমান্য করার। আর দ্রৌপদীও সুভদ্রার এই ছেলেটিকে নিজের ছেলের থেকে কম স্নেহ করতেন না। সুভদ্রা নিজেও তাঁর বড় জা দ্রৌপদীকে কোনওদিনও কোনও ব্যবহারেই অতিক্রম করেননি। এই অনতিক্রমণই হয়তো ওজস্বিনী দ্রৌপদীকে সুভদ্রার ওপর সপত্নীর ঈর্ষা অতিক্রমের যুক্তি জুগিয়েছে। সেই যে বিবাহলগ্নেই সুভদ্রা এসে দ্রৌপদীকে বলেছিলেন—আমি তোমার দাসী, দিদি!—সে-ভাব তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। শল্য পর্বে দুর্যোধনের মতো শত্রুপক্ষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা শত-চেষ্টাতেও সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর মধ্যে বিরোধ ঘটাতে সক্ষম হননি। তিনি বলেছেন—কৃষ্ণের বোন সুভদ্রা সমস্ত মান, অহঙ্কার ত্যাগ করে এখনও পর্যন্ত দ্রৌপদীর মতে চলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন দাসীর মতো—

> নিক্ষিপ্য মানং দর্পঞ্চ বাসুদেব-সহোদরা।
> কৃষ্ণায়াঃ প্রেষ্যবদ্ ভূত্বা শুশ্রূষাং কুরুতে সদা ॥

কাজেই দ্রৌপদী স্বামীদের কাছে তাঁর প্রেমের যথাযথ মূল্য না পেলেও তাঁর ওজস্বিতার সম্মান, ব্যক্তিত্বের সম্মান সব সময় পেয়েছেন। নিজের ছেলেদের নেতৃত্বে কুমার অভিমন্যুকে স্থাপন করার মধ্যে ওই ওজস্বিতার সঙ্গে স্নেহধারা মিশেছে। হয়তো এই স্নেহধারা কৃষ্ণা পাঞ্চালীর অন্তরতম অর্জুনের প্রিয়তম পুত্র বলেই। তবু এই স্নেহ যে কতটা ছিল—তা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও ইয়ত্তা করতে পারেননি, যতখানি করেছেন সেই অর্জুন এবং তাও হয়তো বিদগ্ধা রমণীর অন্তর বিদগ্ধজনে বোঝে বলেই। প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—ওজস্বিতার মতো কঠিন গুণের প্রতিতুলনায় স্নেহ বড় বিরুদ্ধ বস্তু হলেও ব্যাঘ্রিনীর পুত্রের জন্য ব্যাঘ্রিনীর মমতা মোটেই অকল্পনীয় নয়। অভিমন্যু যখন সপ্তরথীর চক্রান্তে প্রাণ দিলেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রচুর বিলাপ করেছিলেন। সেই সখেদ বিলাপোক্তির মধ্যে যুধিষ্ঠির বারবার এই কথা বলেছেন যে, তিনি অর্জুনের সামনে মুখ দেখাবেন কী করে! কী করেই বা তিনি অভিমন্যু-জননী সুভদ্রার মুখের দিকে চাইবেন—সুভদ্রাং বা মহাভাগাং প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্!

কিন্তু অর্জুনকে বলতে হয়নি। প্রিয় পুত্রটি যখন সামনে এসে দাঁড়াল না, যুদ্ধ শিবির থমথম

করছে, তখনই অর্জুন বুঝেছিলেন—অভিমন্যু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। কেমন করে সেই পুত্রের মৃত্যু ঘনিয়ে এল—সেটা সবিশেষ জিজ্ঞাসা করার প্রথম মুহূর্তেই অভিমন্যুর প্রিয়ত্বের সম্বন্ধগুলি স্মরণ করলেন অর্জুন। বললেন—কেমন করে মারা গেল সেই বালকটি, যে শুধু সুভদ্রাই নয়, দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণের প্রিয় পুত্র—সুভদ্রায়াঃ প্রিয়ং পুত্রং দ্রৌপদ্যাঃ কেশবস্য চ। এরপর আবার যখন অর্জুনের বিলাপোক্তির মধ্যে নিজের প্রতি ধিক্কার আসছে—প্রিয় পুত্রকে বাঁচাতে পারেননি বলে, তখনও সবার কথা বাদ দিয়ে শুধু দুটি শোকার্তা রমণীর মুখ তাঁকে পীড়ন করছে। কিন্তু শোক-ক্লিষ্ট অবস্থার মধ্যেও এই দুই রমণীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য অর্জুনের নজর এড়ায় না। অভিমন্যুর প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে অর্জুন এই দুই নারীর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন, কিন্তু তবুও তার মধ্যে বলতে ভোলেন না—অভিমন্যুকে না দেখে সুভদ্রা আমায় কী বলবে ? আর শোকার্তা দ্রৌপদীকে আমিই বা কী বলব ?—সুভদ্রা বক্ষ্যতে কিং মাম্ অভিমন্যুম্ অপশ্যতা। দ্রৌপদী চৈব দুঃখার্তে তে চ বক্ষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥

'একজন আমায় কী বলবে, অন্যজনকে আমি কী বলব ?' অর্থাৎ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে এই দুই নারীই একইভাবে শোক সন্তপ্ত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রথমা সুভদ্রার শোকের আচ্ছাদন এতটাই যে, তিনি প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য বারবার অর্জুনের কাছে নিরাশ্রয়তার আর শূন্যতার হাহাকার শোনাবেন। তাই অর্জুন বলছেন—সুভদ্রা আমায় কী বলবে ? কিন্তু ওই পুত্রহীনার শত শূন্যতার মধ্যেও অন্যতরা রমণী তাঁকে প্রশ্ন করবে—তোমার এই শিব-স্পর্ধী ধনুষ্মত্তা নিয়ে বাসববিজয়ী বীরত্ব নিয়ে তুমি কী করছিলে, অর্জুন ? তাই অর্জুনকে ভাবতে হয়—আমি দ্রৌপদীকে কী-ই বা বলব—তে চ বক্ষ্যামি কিং ত্বহম্। দ্রৌপদী এইখানেই দ্রৌপদী। বস্তুত অর্জুন এই অসম্ভব মৃত্যু-সংবাদ বহন করে এই দুই নারীর মুখোমুখি হতে পারেননি। আমার বক্তব্য ছিল—অসামান্য প্রেম, বা অকৃত্রিম স্নেহধারার মধ্যেও দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব এমনই যে, অন্যায় এবং ক্ষত্রিয়ের শিথিলতায় তিনি প্রশ্ন না করে থাকবেন না। সুভদ্রা বিলাপ করবেন, গালাগালিও দেবেন, কিন্তু দ্রৌপদী প্রতিশোধ চাইবেন, জীবনের বদলে জীবন—আমি সুখে নেই, তুমিও সুখে থাকবে না।

আমি আমার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের কাছে সার্থক প্রেমের মূল্য যতখানি পেয়েছেন, ব্যক্তিত্বের মূল্য পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি। আর স্বামী ছাড়াও অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরাও দ্রৌপদীর সাভিমান ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারেননি। ফলে কৃষ্ণের মতো অসাধারণ পুরুষকেও দ্রৌপদীর স্বাধিকার-বক্তৃতা সমস্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হয়েছে। সন্ধির আশয় নিয়ে যে মহান দূত কৌরব-সভায় যাচ্ছিলেন, তিনি পূর্বাহ্নেই দ্রৌপদীকে নিজের নামের মাহাত্ম্যটুকু ধার দিয়ে কবুল করে বসলেন—আজ তুমি যেমন করে কাঁদছ, কৃষ্ণা ! ঠিক এমনই কাঁদবে কৌরবপক্ষের কুলবধূরা। স্বামী, পুত্র, ভাই, বন্ধু—সব হারিয়ে কাঁদবে এবং তা কাঁদবে শুধু তুমি তাদের ওপর রাগ করেছ বলে—যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভামিনি। কত অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী এই কৃষ্ণ। তাঁর ধারণা—ভীম, অর্জুনের মতো মহাবীরদের সন্ধিকামুকতার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাকুক, দ্রৌপদীর তাতে মন ভরবার কথা নয়, কারণ কুরুসভায় যে অপমান হয়েছিল তার বলি একমাত্র দ্রৌপদীই। পাছে ভীম, অর্জুনের মতো স্বামীকে তিনি ভুল বোঝেন, তাই কৃষ্ণ বললেন—আমি যা বললাম, তা আমি এই ভীম অর্জুন কি নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়েই করব, স্বয়ং ধর্মরাজও সেই নির্দেশ দেবেন। কৃষ্ণ বললেন—আমার অনুরোধ যদি কৌরবরা না শোনে, তাহলে শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে রণভূমিতে মরে পড়ে থাকতে হবে তাদের। আজকে যদি হিমালয় পাহাড়ও চলতে আরম্ভ করে, পৃথিবীও যদি ফেটে যায় শতধা, আকাশও যদি তার নক্ষত্রবাহিনী নিয়ে ভেঙে পড়ে ভুঁয়ে, তবুও আমার কথা অন্যথা হবে না, কৃষ্ণা ! তুমি আর কেঁদো না—কৃষ্ণে বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।

আবারও সেই সম্বোধন—কৃষ্ণা ! নিজের নামের সমস্ত ব্যাপ্তি দ্রৌপদীর ডাক-নামে লিপ্ত করে কৃষ্ণের এই সম্বোধন—কৃষ্ণা। যুধিষ্ঠির যা পারেননি, অর্জুন-ভীম যা পারেননি, কৃষ্ণ তাই পারলেন। কেন পারলেন—সে কথায় পরে আসছি।

আমি আগেই বলেছি—দ্রৌপদী আগুনের মতো। কৌরবরা কৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নেননি।

অতএব একদিন যে কুরুকুল ভীষ্ম, বিদুর এবং রাজমাতা সত্যবতীর বিচক্ষণতায় সংবর্ধিত হয়েছিল, সেই কুরুকুল দ্রৌপদীর ক্রোধের আগুনে আপনাকে আহুতি দিল। সংস্কৃতের নীতিশাস্ত্রে একটা লোকপ্রসিদ্ধ কথা চালু আছে। কথাটার মোদ্দা অর্থটা হল—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চর্তুযুগের এক একটিতে একেকজন অসামান্যা নারী জন্মেছেন, যাঁদের কারণে প্রচুর লোকক্ষয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অশান্তি হয়েছে। নীতিশাস্ত্রকার এই নারীর নাম দিয়েছেন 'কৃত্যা'। 'কৃত্যা' শব্দটির অর্থের মধ্যে একটু হীনতা আছে, কারণ কৃত্যা মানে হল এক ধরণের অপদেবতা। কখনও বা যজ্ঞীয় অভিচার প্রক্রিয়ায় সেই অপদেবী নারীর উৎপত্তি হয় অপরের ধ্বংস সাধনের জন্য। এই শ্লোকটিতে অবশ্য কৃত্যা শব্দটি আরও একটু বিশদর্থে ব্যবহৃত। এখানে বলা হচ্ছে—সত্যযুগের কৃত্যা হলেন রেণুকা।

রেণুকা মহর্ষি জমদগ্নির স্ত্রী, পরশুরামের মা। ছেলে হয়েও পরশুরাম মাকে মেরেছিলেন, এইটাই তাঁর সম্বন্ধে বিখ্যাত কথা। বাবার কাছে বর লাভ করে পরশুরাম অবশ্য মাকে পরে বাঁচিয়ে ছিলেন।

এক সময় ক্ষত্রিয়কুলের বিশাল পুরুষ কার্তবীর্য-অর্জুন পাত্রমিত্র নিয়ে জমদগ্নির আশ্রমে আসেন। জমদগ্নি তাঁর কামধেনু সুশীলার সাহায্যে অতিথি-সংস্কার করেন বটে, কিন্তু ওই কামধেনুর ওপর কার্তবীর্যের লোভ হয়। মুনিও তাঁর হোমধেনু দেবেন না, রাজাও সেটা নেবেন। ফল হল এই যে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়কুলের যুদ্ধবিগ্রহ বেধে গেল। চলল আক্রমণ, পালটা আক্রমণ। জমদগ্নির দিক থেকে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন পরশুরাম। তিনি কার্তবীর্যের হাজার হাত কেটে মেরে ফেললেন তাঁকে। ওদিকে পরশুরাম যখন বাড়ি নেই তখন কার্তবীর্যের ছেলে এসে জমদগ্নি মুনিকেই মেরে রেখে গেল। এই সময়ে জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা নাকি স্বামীর মৃত্যু যন্ত্রণায় একশোবার বুক চাপড়ে কেঁদেছিলেন। পুত্র পরশুরাম তখন বাধা দিয়ে মায়ের হাত ধরেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন একুশবার তিনি ক্ষত্রিয় নিধন করবেন। এই শুরু হল। পরশুরাম ক্ষত্রিয় মেরে মেরে রুধির হ্রদ তৈরি করে গেলেন। জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা এই একুশবার ক্ষত্রিয় নিধনের কারণ বলে সত্য যুগের কৃত্যা হলেন তিনি।

ত্রেতাযুগের কৃত্যা হলেন জনকনন্দিনী সীতা। সীতার কারণেই রামচন্দ্রের সাগর পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়া এবং রাবণ বধ। কবির মতে দ্বাপরের কৃত্যা হলেন দ্রৌপদী। কারণ তাঁকে অপমান করার ফলেই কুরুকুল উৎসাদিত হয়েছিল। সবার শেষে কবির মজাদার মন্তব্য—কলিকালে ঘরে ঘরে এই কৃত্যাদেবীরা আছেন, যাঁরা ঘর ভাঙেন—দ্বাপরে দ্রৌপদী কৃত্যা কলৌ কৃত্যা গৃহে গৃহে।

শ্লোকটা আমি উদ্ধার করলাম বটে, তবে এই শ্লোকের ভাবার্থের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। প্রথমত দেখুন, কলিযুগের 'ঘর-পোড়ানি, পরভুলানি' সামান্যা নারীগুলির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে দ্রৌপদীর নাম উচ্চারণ করায় আমার আপত্তি আছে। দ্বিতীয়ত জনকনন্দিনী সীতা রাবণ-বধের যত বড় নিমিত্তই হন না কেন, তাঁর সঙ্গেও দ্রৌপদীর কোনও তুলনা হয় না। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কুলক্ষয়ী যুদ্ধে রেণুকার একুশবার বুক চাপড়ানোটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, রেণুকাকে একটি গোটা যুগের ধ্বংস-প্রতীক বলে মেনে নিতে আমার যৌক্তিকতায় বাধে। আমার তো মনে হয় দ্বাপর-কলির সন্ধিলগ্নে এই যে বিরাট ভারত যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের নিমিত্ত হিসেবে দ্রৌপদী অত্যন্ত ব্যতিক্রমীভাবে উজ্জ্বল বলেই তাঁকে একটি যুগ-ধ্বংসের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা অনেক বেশি সযৌক্তিক। অপিচ সেইটেই একমাত্র বেশি সযৌক্তিক বলে অন্যান্য যুগেও আরও এক একটি নারীকে শুধু খাড়া করে দেওয়া হল চতুর্যুগের শূন্যতা পূরণের জন্যই। নইলে দেখুন, সত্যযুগের রেণুকা বা কলিকালের ফাঁপা-চুলের রোম-দোলানো বিনোদিনীর কথা না হয় বাদই দিলাম, ত্রেতা যুগের সীতা লঙ্কার রাক্ষস ধ্বংসের যতখানি কারণ, রামচন্দ্র নিজেই তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কারণ। রাবণ-বধের অন্তে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র নিজেই প্রায় সে কথা স্বীকার করে বলেছেন—সমুদ্র লঙ্ঘন করে এসে অশেষ রণপরিশ্রমে রাক্ষস রাবণকে আমি যে শাস্তি দিয়েছি—তা তোমার জন্য নয় সীতা। তা সবটাই প্রখ্যাত রঘুবংশের কলঙ্ক-মোচনের জন্য, নিজের মান রক্ষার জন্য—ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা। তবু অসামান্যা রূপবতী সীতাকে আমরা ত্রেতাযুগের কৃত্যা হিসেবে মেনে নিতে

পারি, কারণ সীতাহরণ না হলে সেই বিরাট লঙ্কাকাণ্ড ঘটত না।

কিন্তু রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন, তাতে সীতার দিক থেকে অক্ষম বিলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তিনি অত্যন্ত পতিনির্ভর এবং সেই ভরসাই তাঁর কাজে লেগেছে। কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী পড়লে কী হত, তা সভাপর্বে বস্ত্র হরণের সময়েই টের পাওয়া গেছে। পাঁচটি স্বামীর একজনেরও সেখানে সঙ্গত কারণেই কথা বলার উপায় ছিল না। কিন্তু দ্রৌপদী নিজেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। বস্ত্রাকর্ষণের হতচকিত মুহূর্তগুলির মধ্যেও তিনি কৌরবসভায় ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং সভা শেষ হয়েছে তাঁরই অনুকূলে। কাজেই সীতাহরণের বদলে দ্রৌপদী-হরণ হলে দ্রৌপদী যে নিষ্ক্রিয় থাকতেন না—তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। অন্তত হনুমান পৌঁছনোর আগেই অশোকবনে যে ধুন্ধুমার লেগে যেত—তা বেশ অনুমান করা যায়।

তবু বলি, এই সব তাৎক্ষণিক প্রত্যাশা তো দ্রৌপদীর কাছে করাই যায়, কিন্তু এমনটাই দ্রৌপদী নয়। দ্রৌপদী আরও অনেক বড়। অন্তত সমস্ত, কুরুকুল-ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে দ্রৌপদীকে চিহ্নিত করতে গেলে কুরুসভার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গীন অপমানই একমাত্র কারণ—এমন একটা কথাও বড়ই অকিঞ্চিৎকর শোনাবে। মনে রাখা দরকার, মহাভারতের কবি যাঁকে 'মনস্বিনী' অথবা 'পণ্ডিতা' শব্দের উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তিনি শুধু নারীর অপমানে ক্লিষ্ট হন না। পঞ্চস্বামীকেও তিনি শুধুমাত্র তাঁর একান্ত অপমানের দ্বারাই চালিত করেছেন—তাও আমি মনে করি না। মহাকাব্যের বিরাট পরিমণ্ডলে কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান একটা খণ্ডচিত্র মাত্র। সেই অপমান থেকে উৎক্রমণ করার জন্য তাঁর বীরস্বামীদের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি, তিনি একাই ছিলেন তার জন্য যথেষ্ট।

কুরুসভায় আসবার আগে যুধিষ্ঠির তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'একবস্ত্র অধোনীবী' অবস্থায় শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে কেঁদে কেঁদে তিনি যেন তাঁর করুণা উদ্রেক করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁকে চেনেননি। কুরুসভায় এসে তিনি যে নিজের জ্যেষ্ঠ-স্বামীকেই আইনের ফাঁদে ফেলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন অথবা আপন মনস্বিতায় শ্বশুরকে সন্তুষ্ট করে সেই ফাঁদে-পড়া জ্যেষ্ঠ-স্বামীকেই প্রথম মুক্ত করবেন কৌরবদের হাত থেকে—এসব কথা যুধিষ্ঠির ভাবতেই পারেন না। বিদগ্ধা রমণীর বিচিত্র হৃদয় বুঝতে পারেন না বলেই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথায় কখনও থতমত খান, কখনও পুলকিত হন, কখনও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন, কখনও বা গালাগালিও দেন। কিন্তু এই যে 'কনফিউশন', এই দ্বিধাগ্রস্ততা—এর কারণও দ্রৌপদীর বৈদগ্ধ্যই। নারীত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব, পড়াশুনো এবং রাজনীতির জ্ঞান যদি একত্তর হয়ে যায়, তাহলে যে বিশালতা জন্মায়, সেই বিশালতা ধারণ করার ক্ষমতা যুধিষ্ঠিরের ছিল না। যাঁর ছিল, তিনি সে-পথে হাঁটেননি একান্ত ব্যক্তিগত কারণে—তিনি অর্জুন। আরও যাঁর ছিল—তিনি তাঁকে অবধারণ করেছেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি একটু ঘরের বাইরের লোক—তিনি কৃষ্ণ। তবু সে-কথা পরে।

দ্যূতক্রীড়ার উত্তর পর্বে যে দিন কৃষ্ণা পাঞ্চালী কুরুকুলের দাসপঙ্ক থেকে তাঁর পঞ্চ স্বামীকে উদ্ধার করে আনলেন—সেদিন দুর্যোধন-কর্ণরা বাঁকা হাসি হেসে বলেছিলেন—যারা জলে ডুবে মরছিল, আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু ছিল না, সেই নিমজ্জমান পাণ্ডবদের দ্রৌপদী যেন নৌকার মতো এসে পার করে নিয়ে গেলেন—পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রাণাং নৌরেষা পারগাভবৎ। কথাটা সেই মুহূর্তে যতই বাঁকা শোনাক, কথাটার মধ্যে গভীর সত্য আছে, এবং সে-সত্য স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই পরে স্বীকার করেছেন। কর্ণের ওই কথা শুনে ভীম তো সেই মুহূর্তে রেগেমেগে অস্থির হয়েছিলেন, কিন্তু ওই একই কথা পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ স্বীকার করে নিয়েছিলেন পরে। যখন বনপর্বে স্বয়ং দ্রৌপদী এবং ভীমের কাছে তিনি তাঁর প্রশান্তি আর ক্ষমাগুণের জন্য গালাগালি খাচ্ছেন, তখন তিনি বলেছেন—তোমরা যে দুজনে মিলে আমায় গালাগালি করছ, সেটা যত খারাপই শোনাক, তবু বেঠিক নয়। আমি যে অসম্ভব একটা অন্যায় করেছিলাম, তার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তোমাদের—মমানয়াদ্ধি ব্যসনং ব আগাৎ। আমার যথেষ্ট মনে পড়ে—যেদিন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কপট পাশায় জিতে আমাদের রাজ্য নিয়ে নিল, আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিল দাস-দাসীর অপমান-পঙ্ক, সেদিন এই দ্রৌপদী—আমাদেরই এই দ্রৌপদীই, সবার প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছিলেন—যত্রাভবচ্ছরণং দ্রৌপদী নঃ।

এত নির্ভরতার সুরে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের এই যে স্তুতিবাদ—আপনারা কি মনে করেন—এই স্তুতিবাদে দ্রৌপদী একটুও সম্মানিত বোধ করেছেন? আমি যতদূর এই মহাকাব্যের নায়িকাকে চিনেছি, তাতে আমার বোধ হয় না যে, কোনও অসাধারণ বিপৎকালে স্বামীদের তিনি রক্ষা করেছেন—এই গৌরববোধ তাঁকে মোটেই স্বস্তি দেয় না। বরঞ্চ বিপৎকালে স্বামীরা কেন তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি, কেন স্বামীরা বেঁচে থাকতেও—জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু—তাঁকে অন্য পুরুষের হাতে চুলের মুঠি-ধরা সইতে হল—এই কৈফিয়ত তিনি বার বার চেয়েছেন। তিনি তো স্বামীদের শরণ বা আশ্রয় হতে চান না, কিন্তু স্বামীরা তাঁর অপমান চোখে দেখছেন—এই অবস্থাতেও—পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রেক্ষতাং—কেন তাঁর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারেননি—এই অনাস্থা বিদগ্ধা রমণীর বুকে পীড়ার সঞ্চার করে। কর্ণের বাঁকা কথা শুনে ভীম যে রেগে গিয়েছিলেন, বরং তাও তাঁর ভাল লাগে। তিনি তবু তাতে সনাথ বোধ করেন; এই বোধ আছে বলেই কৌরবসভায় পঞ্চস্বামীর দাসত্ব-মুক্তির পর ধৃতরাষ্ট্র যখন আবারও বর দিতে চাইলেন, তখন তিনি বলেছিলেন—আমি আর কোনও বর চাই না। আমার স্বামীরা পাপকর্ম করে ফেলেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা বিপদ থেকে উত্তীর্ণ—পাপীয়াংস ইমে ভূত্বা সন্তীর্ণাঃ পতয়ো মম। এঁদের মঙ্গল এখন এঁরা নিজেরাই বুঝবেন।

এক্ষুনি যে শ্লোকটা বললাম—আমার স্বামীরা নীচকর্ম পাপকর্ম করে ফেলেছিলেন, এখন তাঁরা বিপদ থেকে উত্তীর্ণ—এই শ্লোকে 'পাপীয়াংসঃ' শব্দের অর্থ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—কৌরবদের দাস্যে তাঁরা নীচভাবে অবনমিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাপীয়াংসঃ মানে কি দ্রৌপদী শুধু তাঁদের দাসত্বে কষ্ট পেয়েছিলেন? আমার তো মনে হয়—পাণ্ডবদের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকেও, তাঁর স্বামীরা যে উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে তাঁকে রক্ষা করতে পারলেন না, কুলবধূর লজ্জা নিবারণ করতে পারলেন না—এই অসহায়তার জন্যই তিনি বলেছেন—আমার স্বামীরা নীচকর্ম করে ফেলেছিলেন। যেভাবেই হোক এখন তাঁরা মুক্ত, কী করতে হবে—সেই মঙ্গল কর্ম তাঁদের আপন পুণ্যবলেই তাঁরা সাধিত করবেন—বেৎস্যন্তি চৈব ভদ্রাণি রাজন্ পুণ্যেন কর্মণা।

কী সেই পুণ্য কর্ম, যার দ্বারা নিজেদের মঙ্গল সাধন করবেন তাঁর স্বামীরা? এই পুণ্য নিশ্চয়ই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া অথবা ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-তপস্যা নয়, ক্ষত্রিয়ের কাছে এই পুণ্য হল তার শক্তি, যে শক্তির দ্বারা সে অন্যায়কে দমন করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করে। দ্রৌপদী যে স্ত্রী-রক্ষায় অক্ষম স্বামীদের পাপী হয়ে পড়াটা দেখেছিলেন, তাতেও তিনি ততটা আহত হননি, যতটা হয়েছেন পরবর্তী সময়েও নিজের ক্ষমতায় তাঁরা প্রতিশোধ-বৃত্তি গ্রহণ না করায়। 'পাপ' বা 'পাপী' বলতে দ্রৌপদীর বোধে যে স্বামীদের অক্ষমতাই ছিল এবং 'পুণ্য' বলতে তাঁর মনে যে ক্ষত্রিয়বধূর প্রতিশোধ-স্পৃহাই ছিল তা আরও একভাবে বোঝা যায়।

দ্যূতক্রীড়ার দ্বিতীয় পর্বে যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলায় হেরে গেলেন, তখন অরণ্যবাসের শাস্তি নেমে এল সমস্ত পাণ্ডবভাই এবং দ্রৌপদীর ওপর। যুধিষ্ঠির এবং অন্য বীর ভাইয়েরাও জানতেন এই পাশাখেলার জন্ম হয়েছে কৌরবদের লোভ এবং অন্যায় থেকেই। কিন্তু পাণ্ডবভাইয়েরা কেউই দুর্যোধনের বাজি ধরার প্রতিবাদ করেননি, যুধিষ্ঠিরকেও অতিক্রম করেননি। পাঞ্চালী-কৃষ্ণার পতির পুণ্যে সতীর প্রতিশোধ-স্পৃহা তৃপ্ত হয়নি কিছুই। এরই মধ্যে কৃষ্ণ এসে পৌঁছলেন কাম্যক বনে, পাণ্ডবদের কাছে। আগেও আমি একবার বলেছি—এই সময়ে কীভাবে দ্রৌপদী তাঁর অভিমান প্রকাশ করেছিলেন কৃষ্ণের ওপর। কিন্তু এই মুহূর্তে যে কথাটা ভীষণ জরুরি, তা হল—'পাপ' আর 'পুণ্য' বলতে দ্রৌপদী কী বুঝেছিলেন? দ্রৌপদী বলেছিলেন—ওঁদের দিক দেখে না হয় অন্যায়টা বুঝলাম। বুঝলাম যে, ভীষ্ম কিংবা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ধর্মানুসারে বিবাহিতা কুলবধূর অপমানে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার স্বামীদের দোষই বেশি দিই, কেননা তাঁরা ভারতবিখ্যাত বীর অথচ তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের 'ধর্মপত্নীর' ধর্ষণা দেখেছেন—যৎ ক্লিশ্যমানাং প্রেক্ষন্তে ধর্মপত্নীং যশস্বিনীম্।

আপনাদের কি মনে হয় না—এখানে 'ধর্মপত্নী' কথাটার ওপর একটা আলাদা জোর আছে। মনে

রাখা দরকার—এর পরেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী এবং ভীমের ঝগড়া লাগবে ; তখন ক্ষমা আর ধর্মের কথা কতবারই না বলেছেন যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী আগে ভাগেই তাই ধর্মের কথাই বলছেন। বললেন—চিরন্তন যে ধর্মপথ অথবা যে ধর্ম সজ্জন ব্যক্তিরা আচরণ করে এসেছেন এতকাল—সেই ধর্মে দৈহিক শক্তিহীন স্বামীরাও তাঁদের স্ত্রীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। সেখানে আমার কী হল ? দ্রৌপদী এবার নিশ্চয়ই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির থাকতেও আমার এই দশা হল কেন। দ্রৌপদী এবার ভীমের কথার জবাব দিচ্ছেন, যদিও সে-কথা ভোলেভালা ভীমও বোঝেননি। দ্রৌপদীর 'অনারে' পাণ্ডবদের দাসত্ব মুক্তির পর কর্ণ তির্যকভাবে পাণ্ডবদের যা বলেছিলেন তার অর্থ—অগতির গতি তোদের এই বউটি। আমি আগেই বলেছি কথাটা শুনে ভীম খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষ্যাপার কথাগুলির ভাষা যা ছিল, তাতে কর্ণ যথেষ্ট বিদ্ধ হলেও দ্রৌপদীর গায়ে তার আঁচ লাগে। ভীম সে-কথা না বুঝলেও, দ্রৌপদীর সে কষ্ট আছে বলেই আমি মনে করি।

ভীম রেগে অর্জুনকে উদ্দেশ করে কর্ণের কথার জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—হায় ! শেষে স্ত্রীই কিনা পাণ্ডবদের গতি হল—স্ত্রী গতিঃ পাণ্ডুপুত্রাণাম্ ! শাস্ত্রে বলে যে, পুরুষ মানুষ যদি মারা যায়, যদি অপবিত্র হয়, জ্ঞাতিবন্ধু যদি তাকে ত্যাগ করে, তাহলে পুত্র, মঙ্গল কর্ম এবং বিদ্যা—এই তিন জ্যোতি তাকে সাহায্য করে। কিন্তু আজ আমাদের ধর্মপত্নীকে দুঃশাসন যেভাবে সবলে লঙ্ঘন করল, তাতে তাঁর গর্ভের সন্তান কীভাবে আমাদের জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে !

কথাগুলি যতই ধর্মগন্ধী হোক না কেন, কথাগুলি ভাল নয়। এই কথায় যে স্বয়ং দ্রৌপদী জড়িয়ে পড়েন—সেটা সেই মুহূর্তে কর্ণ-দুঃশাসনের বিগর্হণার আতিশয্যে ভীম বুঝতে পারেননি। কিন্তু যাঁকে সম্বোধন করে ভীম কথাগুলি বলেছিলেন, সেই অর্জুন কিন্তু বুঝেছিলেন যে, এই ধর্ম-প্রবচন বেশি দূর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেছিলেন—ফালতু লোকে কী বলল, না বলল—তাই নিয়ে কি ভদ্রলোক মাথা ঘামায় ? ভীমের নিন্দাবাদ কর্ণ-দুঃশাসনের অসভ্যতা প্রকট করার জন্য যতটা, দ্রৌপদীর অসহায়তার জন্যও যে ততটাই—সেটা দ্রৌপদী বোঝেন, কিন্তু কথাটা তো ভাল নয়। তাই এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কী হতে পারে—সেটা ভীমের নাম না করেও তিনি কৃষ্ণকে একভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন—দুর্বল লোকেরাও নিজের বউকে সব সময় বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে—যদ্ ভার্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোঽল্পবলা অপি। স্ত্রীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার অর্থ হল আত্মজ সন্তানকে রক্ষা করা। স্ত্রী এবং সন্তানের সুরক্ষার মধ্য দিয়ে পুরুষ নিজেও রক্ষিত হয়, কেননা পুরুষ স্ত্রীর গর্ভে নিজেই জন্মায় বলে স্ত্রীকে লোকে 'জায়া' বলে।

এতটা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কথা বলে এইবার ভীমকে এক হাত নিচ্ছেন দ্রৌপদী অর্থাৎ ভাবটা এই—তুমি না বলেছিলে—দুঃশাসন যেভাবে আমাদের ধর্মপত্নীকে লঙ্ঘন করল, তাতে তাঁর গর্ভের সন্তান পিতার কাছে জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে না। তাতে আমি বলি কি—স্ত্রীকেই যেখানে স্বামীর সুরক্ষায় উদ্‌যুক্ত হতে হয়, যে স্বামী স্ত্রী-রক্ষায় নিরুদ্যম হয়ে নিজেই যেখানে স্ত্রীর আশ্রয়ে মুক্ত হন, সে আমার পেটে ধর্মজ সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজে জন্মাবে কীভাবে—ভর্ত্তা চ ভার্যয়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্ মমোদরে ? এতকাল শুনে এসেছি—শরণাগত জনকে পাণ্ডবরা কখনও ত্যাগ করেন না, আমি যে ধর্মপত্নীর অধিকারে তাঁদের শরণাগত হয়েই আছি, কই আমার প্রতি তো তাঁরা সেই শরণাগত-পরিত্রাণের অনুগ্রহ দেখাননি—তে মাং শরণমাপন্নাং নান্বপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ। এত যে শুনি—ধনুর্যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় করবেন, এমন শত্রু পৃথিবীতে নেই, কেন সেই পাণ্ডবরা দুর্বলতর কৌরবদের অপমান সহ্য করছেন—কিমর্থং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সহন্তে দুর্বলীয়সাম্।

হয়তো শেষ বাক্যটি তাঁর অর্জুনের উদ্দেশে। কিন্তু অর্জুন-ভীমের উদ্দেশে যে কটূবাক্যই তিনি বলুন না কেন, দ্রৌপদীর মূল লক্ষ্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামী—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, যাঁর ধর্ম এবং ক্ষমার অনুবৃত্তিতে ভীমার্জুনের মত শক্তিধরকেও দমিত হয়ে থাকতে হয়েছে। আসল কথা, কৌরব সভায় আত্মশক্তিতে স্বামীদের দাসত্ব-বন্ধন মোচন করেও দ্রৌপদী কোনও সাধুবাদে আগ্রহী নন, স্বামীরা কেন আপন যুক্তিতে স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে পারেননি বা এখনও কেন তাঁরা শত্রুর মাথায় পা দিয়ে

নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না—এই প্রতিশোধ-ভাবনাতেই তিনি আকুল। কারণ স্বামীরা যদি স্বরাজ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হন, তা হলে আপনিই যে দ্রৌপদীর সম্মান ফিরে আসবে—সেটা দ্রৌপদী জানতেন। এই স্বরাজ্য এবং রাজ-সম্মানের মতো বিরাট একটা ব্যাপারের জন্য দ্রৌপদী নিজের অপমানকে শুধু নিমিত্তের মতো ব্যবহার করেছেন। বস্তুত পাণ্ডব-কৌরবদের জ্ঞাতিস্বার্থ এবং রাজনীতির মধ্যে তিনি এতটাই সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, যখনই তিনি স্বামীদের, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতা লক্ষ করেছেন, তখনই সবার ওপরে যে যুক্তিটা তিনি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন—সেটা সেই কৌরব-সভায় অপমানের কথা।

তাই বলেছিলাম—দ্রৌপদী ঠিক সীতা বা রেণুকার মতো নন। তাঁর ধর্ষণ অপমান তিনি সব সময়ই মনে রেখেছেন বটে, কিন্তু সেইটাই সব নয়। তিনি চেয়েছেন, তাঁর স্বামীরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং এই প্রতিষ্ঠায় যত বিলম্ব ঘটছিল, ততই পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের ওপর তাঁর ক্রোধ ঘনীভূত হচ্ছিল। কারণ, দ্রৌপদী জানেন—যুধিষ্ঠিরের একান্ত ধর্মবোধ এবং সহিষ্ণুতা ক্ষত্রিয়ের ধর্মের সঙ্গে মেলে না, ক্ষত্রিয় বধূর আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাতে তৃপ্তিলাভ করে না। তৃপ্তিলাভ করে না বলেই তিনি নিজের অপমান সমস্ত রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে মিথ্যা নয় তারও একটা প্রমাণ আমরা হাজির করার চেষ্টা করছি।

কথাটা আমি আগেও একবার উল্লেখ করেছি, তবে তা অন্য প্রসঙ্গে, অন্যভাবে। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৌরবসভায় যাচ্ছেন, তখন তো যুধিষ্ঠির—ভীম—দুজনেই সন্ধিকামী হয়ে উঠলেন। অর্জুন সন্ধির কথা বলেওছেন, আবার বলেনওনি। সহদেব সন্ধির বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং প্রধানত তাঁর কথাকে প্রাধান্য দিয়েই দ্রৌপদী প্রথমে রাজনীতির কথা তুললেন। দ্রৌপদী যে রাজনীতি ভাল বুঝতেন অথবা এ বিষয়ে যে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো ছিল—সে কথা সেই কৌরবসভায় অপমানের পর থেকে একেবারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ পর্যন্ত শত শতবার প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডব-কৌরবদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেভাবে, যে পথে চলছিল—সেখানে যৌধিষ্ঠিরী নীতি তাঁর পছন্দ হয়নি। এই স্থিরবুদ্ধি মনস্বীর 'ধীরে চল' নীতি, অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজের উত্থান-শক্তি বিলম্বিত করাটা দ্রৌপদীর রাজনীতি-বোধে আঘাত করেছে। এর প্রমাণ দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের বহুতর কথোপকথনে বারংবার ফুটে উঠেছে। দুর্যোধনের বিরুদ্ধে সঠিক কী নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল বা এখনও উচিত—তা নিয়ে এই দুই জনের মধ্যে রাজনৈতিক মত-পার্থক্য উদ্যোগ-পর্বের এই মুহূর্ত পর্যন্তও দূর হয়নি।

হ্যাঁ, স্বামী বলে দ্রৌপদী এইটুকু মেনে নিতে রাজি আছেন যে, ঠিক আছে, যুধিষ্ঠির তো ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্তে পাঁচখানি গ্রাম ফিরে পাবার প্রস্তাব দিয়েছেন দুর্যোধনকে ; সে অন্তত তাই দিক। কিন্তু গোটা রাজ্যের বদলে এই যে যুধিষ্ঠির কঠিন কিছু করতে পারেন না বলে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে সন্ধির কথা বলছেন—দ্রৌপদীর সাফ কথা—পঞ্চ গ্রামের শর্তে যদি দুর্যোধন রাজি না হন, তবে যেন কৃষ্ণ আগ বাড়িয়ে সন্ধির কথা না বলেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর মতে—তোমরাই অন্যায়ভাবে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছ, অথচ এখন সন্ধির কথা তোমাদের দিক থেকেও উঠছে। কিন্তু সন্ধি যদি আদৌ করতে হয়, 'অ্যাজ আ টোকেন অব গুড জেসচার' তোমাকে নমনীয়তার প্রমাণ হিসেবে পাঁচটি গ্রাম আগে দিয়ে দিতে হবে, তারপর সন্ধির কথা। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—যদি রাজ্য না দিয়ে দুর্যোধন সন্ধি করতে চায়, তবে তুমি যেন সেখানে গিয়ে সন্ধি করে এস না—অপ্রদানেন রাজ্যস্য যদি কৃষ্ণ সুযোধনঃ। সন্ধিমিচ্ছেন্ন কর্তব্যস্তত্র গত্বা কথঞ্চন।

এইবার দ্রৌপদী রাজনীতির তত্ত্ব এবং প্রয়োগের কথায় আসছেন, যে-কথায় এতকাল মহামতি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর বারবার মতবিরোধ ঘটেছে, এবং যে কথার মীমাংসা এখনও হয়নি। দ্রৌপদী বললেন—ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যদি ক্রুদ্ধ হয়েও আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—কারণ, ক্রুদ্ধ হলে শক্তির বৃদ্ধি ঘটে—তবুও সেই শক্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পাণ্ডব এবং পাঞ্চালদের আছে। এতকালের অভিজ্ঞতায় কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিয়ে দ্রৌপদী বললেন—তুমি যেন এটা মনে কোরো না, কৃষ্ণ। যে, ভাল ভাল কথা আর নীতির উপদেশ দিয়ে তাদের কিছু করা যাবে ; এমনকী

তাদের কিছু ছেড়ে দিয়েও যে লাভ হবে, তাও আমার মনে হয় না—অর্থাৎ ওই ইন্দ্রপ্রস্থ বা রাজ্যের অর্ধাংশের দাবি না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মাত্র পাঁচখানি গ্রাম নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেও আর সব দাবী যদি আমরা ছেড়ে দিই, তাতেও যে কিছু করা যাবে—তা মনে হয় না—ন হি সাম্না ন দানেন শক্যো'র্থ স্তেষু কশ্চন। দ্রৌপদীর বক্তব্য—তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেও যদি কিছু না হয়, ত্যাগ স্বীকার বা অন্য কিছু করেও যদি কিছু না হয় তা হলে তাদের ওপর তোমার অত করুণা করার দরকার কী? সত্যি কথা বলতে কি, যদি নিজে বাঁচতে হয়, তা হলে ওদের শাস্তি দিয়েই বাঁচতে হবে—যোক্তব্য স্তেষু দণ্ডঃ স্যাজ্জীবিতং পরিরক্ষতা।

অতএব পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর বাপের বাড়ির লোক পাঞ্চালদের সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক—এই ছিল দ্রৌপদীর সর্বশেষে সিদ্ধান্ত। এতে পাণ্ডবদের সামর্থ্যে তৃপ্ত হবে ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা। দ্রৌপদী বোধহয় এখন জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে কিছু ইঙ্গিত করছেন। তিনি বললেন—ক্ষত্রিয় হোক অথবা অক্ষত্রিয়, সে যদি লোভী হয়, তা হলে উপযুক্ত অথবা নিজের ধর্মে স্থিত ক্ষত্রিয়ের কাজ হল সেই লোভীটিকে মেরে ঠাণ্ডা করা—ক্ষত্রিয়েণ হি হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়ো লোভমাস্থিতঃ। আসলে দ্রৌপদীর মতে—যাকে মারা উচিত নয়, তাকে মেরে ফেলাটা যেমন অন্যায়, তেমনই যে বধযোগ্য, তাকে বাঁচিয়ে রাখাটাও একই রকম অন্যায়।

রাজনীতির দিক দিয়ে নিজের সমস্ত নীতি-যুক্তি উপস্থিত করেও দ্রৌপদী এবার মোক্ষম সেই ঘটনায় এলেন, যেখানে অন্যের যুক্তি-তর্ক হার মানবে, যেখানে তিনি নিরঙ্কুশ—যেখানে শুধু এক যুক্তিতেই কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়। সেই কুরুসভার অপমানের ঘটনা। দ্রৌপদী নিজেই তাঁর বাপের বাড়ির আভিজাত্য, শ্বশুর-কুলের সম্মান, স্বামীদের শক্তি এবং ধর্মজ পুত্রদের অভিমান—সব একত্রিত করে সেই সাংঘাতিক পুরাতন কথাটা তুললেন—শাঁখা-সিঁদুর-পরা আর কোন অভাগিনী এই পৃথিবীতে আছে—কানু সীমন্তিনী মাদৃক্—যে তার স্বামীরা বেঁচে থাকতে, ভাইয়েরা বেঁচে থাকতে, এমন কী তুমিও বেঁচে থাকতে, সবার সামনে অন্যের হাতে চুলের মুঠি ধরার অপমান সহ্য করল। ক্রোধলেশহীন, প্রতিকারের চেষ্টাহীন স্বামীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অপমান দেখলেন, আর আমাকে কেঁদে কেঁদে ডাকতে হল তোমাকে—পাহি মামিতি গোবিন্দ মনসা চিন্তিতো'সি মে। বাস, রাজনীতির প্রয়োগ-তন্ত্রের আগুনে এইমাত্র দ্রৌপদীর ঘৃতগন্ধী অভিমান যুক্ত হল।

কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর অসহায় ক্রন্দনের সময় সেই অলৌকিক বস্ত্ররাশি দুঃশাসনকে ক্লান্ত করেছিল কিনা, তা আমাদের প্রত্যয়ে আসে না হয়তো। কিন্তু কৃষ্ণের নামে যে কাজ হয়েছিল—তা আমি হলফ করে বলতে পারি। হরিনামের মাহাত্ম্য এই নামের মধ্যে নাও থাকতে পারে—কিন্তু সে যুগের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণের কূটনীতির মাহাত্ম্য তখন এতই বহুশ্রুত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কৃষ্ণনামের মাত্রা তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৃষ্ণ পরে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—আমি যদি সেই সময় শুধু দ্বারকায় থাকতাম, তা হলে কৌরবরা না ডাকলেও আমি অনাহূত অবস্থাতেও পাশাখেলার আসরে পৌঁছতাম। প্রথমে ভীষ্ম-দ্রোণ এবং অন্যান্য বড় বড় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাশাখেলার দোষগুলি বোঝাতাম—আর যদি তাতেও কেউ আমার ভাল কথা না শুনত, তা হলে মেরে বোঝাতাম—পথ্য জিনিসটা কী—পথ্যঞ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ নিগৃহ্নীয়াং বলেন তম্। হয়তো তাতে অন্য পাশাড়েরা সব ক্ষেপে গিয়ে ওদের পক্ষে জুটত। তাতে কী? ওদেরও মেরে ফেলতাম নির্দ্বিধায়—তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্।

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি—কৃষ্ণের এই ক্ষমতা ছিল। তিনি যা বলেন, তা যে করতে পারেন—সেটা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে শিশুপাল বধের সময়েই দেখা গেছে। কোনও বিরুদ্ধতা তাঁকে কিছুই করতে পারেনি। কৌরব-সভায় পাশাখেলার সময় ভাল কথা অনেকেই বলেছেন, বিদুর তো বিশেষ করে, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর কারওই ওই মারার ক্ষমতাটা ছিল না। সমগ্র দ্যূতসভায় একমাত্র দ্রৌপদী ছাড়া কৃষ্ণের নাম কেউ মুখেও আনেননি—কৌরবরা তো নয়ই পাণ্ডবরাও নয়, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও নয়। আমার ধারণা যে মুহূর্তে এই শায়েস্তা করার লোকটির নাম দ্রৌপদীর মাধ্যমে

সবারই স্মরণে এসেছে, সেই মুহূর্তে দুঃশাসন ক্লান্ত বোধ করেছেন, তাঁকে থামতেও হয়েছে। কিন্তু অপমান-মুক্তির মধ্যে দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীকে ত্রাতার ভূমিকায় পাননি—সেই ধর্ষণ, অপমানের মুহূর্তেও পাননি, আজ এতকাল বনবাস পর্বের পর যুধিষ্ঠির, ভীম এবং আংশিকভাবে অর্জুনেরও সন্ধিকামুকতা দেখে তিনি এখনও আশ্বস্ত নন। তাই সেদিন সেই অকারণ লাঞ্ছনার মধ্যেও তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, আজ এই যুদ্ধোদ্যোগের সময়েও তিনি কৃষ্ণেরই স্মরণ নিয়েছেন—বোধহয় একমাত্র তিনিই পারেন ক্ষত্রিয়বধূর কাম্য জয়াশা পূরণ করতে।

বস্তুত এই প্রত্যাশাপূরণের ক্ষেত্রে ভীম এবং অর্জুনও দ্রৌপদীর অবিশ্বাসের মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর এই দুই স্বামীই যাঁর ইচ্ছা বা নীতি-যুক্তি অতিক্রম করতেন না—সেই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অমোঘ শাসন দ্রৌপদী কোনওদিনই পছন্দ করেননি, তাঁর নীতি-যুক্তিও সহ্য করতে পারেননি কোনওদিন। লেখক-সজ্জনের মধ্যে আছেন কেউ কেউ, যাঁরা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সদয় পক্ষপাতে দ্রৌপদীকেও তাঁর প্রতি সরসা করে তুলেছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু তাঁর অসাধারণ সংহত ভাষায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর প্রায় একক নিষ্ঠা এবং আশ্রয়ের কথাটা প্রকাশ করেছেন। তবে সে মত আমার মতো সাধারণ মহাভারত পাঠকের মনে বড় অনর্থক রকমের জটিল বলে মনে হয়েছে। মহাকাব্যের নায়িকা হিসেবে তথা পঞ্চস্বামীর একতমা বধূ হিসেবে দ্রৌপদীর মনের গতি-প্রকৃতি যে অতিশয় জটিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই জটিলতার সুযোগে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর 'নিকটতম' সম্বন্ধ প্রমাণ করে দেওয়াটা আমাদের মতে কিছুটা সংহতিহীন মনে হয়।

আমি প্রথমে প্রয়াত বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যগুলি উদ্ধার করে তাঁর সার্বিক মতটা দেখানোর চেষ্টা করব, তারপর, আমাদের যৌক্তিকতা আমরা দেখাব। বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন—(১, ২, ৩ সংখ্যাগুলি আমার দেওয়া)

(১) "কিন্তু 'আসলে' যেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই নিকটতম তাঁর সম্বন্ধ—ঘটনার পর ঘটনা অনুধাবন করতে-করতে এমনি একটা ধারণা হয় আমাদের, যদিও অগ্নিসম্ভবা আগ্নেয়স্বভাব পাঞ্চালীর সঙ্গে মৃদু দ্যূতাসক্ত যুদ্ধবিমুখ যুধিষ্ঠিরের বৈশাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট।"

(২) 'বক-যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন ভার্যার—তাঁর ভার্যার, তা বুঝে নিতে আমাদের দেরি হয় না। 'গৃহে মিত্র ভার্যা', 'দৈবকৃত সখা ভার্যা', আর উপরন্তু 'ধর্ম অর্থ কাম—এই তিন পরস্পর বিরোধীর সংযোগ ঘটে শুধু ধর্মচারিণী ভার্যার মধ্যে'—এ সব কথা যুধিষ্ঠিরের মুখে ঠিক শাস্ত্রবচনের মতো শোনাচ্ছে না, এদের পিছনে দ্রৌপদীর সঞ্চার আমরা অনুভব করি..."

(৩) "যুধিষ্ঠির সযত্নে লালন করেছিলেন এই সম্পর্কটিকে, এবং বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী এর মূল্য বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন তাও আমরা অনেকবার দেখেছি। স্মর্তব্য, তাঁর পায়ের কাছে যে স্বর্ণপদ্মটি উড়ে এসে পড়েছিলো, দ্রৌপদী সেটি যুধিষ্ঠিরকেই উপহার দিয়েছিলেন, আজ্ঞাবহ ভীমসেনকে নয় (বনঃ ১৪৬)। তাঁর আছে 'ইন্দ্রের মত পঞ্চস্বামী'—এই বাঁধা বুলিটি দ্রৌপদীর মুখে শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্যূতসভায় অবমানিত হ'য়ে তিনি তীব্র স্বরে ব'লে উঠলেন (সভা : ৬৭) : আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা।'—যেন বহুবচনের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে ধরানো গেল না, স্বতন্ত্রভাবে তাঁর নাম বলতে হ'লো, যেন পাঁচের মধ্যে একের নাম করতে হ'লে যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর মনে পড়ে।"

(৪) "আমরা লক্ষ করি যে সভাপর্বের পরে কাহিনী যত এগিয়ে চলে ততই সত্য হয়ে ওঠে দ্রৌপদীর সেই আর্ত মুহূর্তের ঘোষণা ;—একান্ত ভাবে না হোক, উত্তরোত্তর আরও বেশি সংশ্লিষ্টভাবে, তিনি যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হতে থাকেন। দ্রৌপদীর অন্য দুই প্রধান স্বামীর উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছেন ব্যাসদেব—বলা বাহুল্য, নকুল-সহদেব এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য নন—দ্রৌপদীর বল্লভ রূপে কখনো অর্জুনকে আর কখনো বা ভীমকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর নিত্যসঙ্গীরূপে যুধিষ্ঠিরই ছিলেন একমাত্র—হয়তো ঘটনাচক্রে, যেহেতু অর্জুন ছিলেন অনবরত ভ্রাম্যমাণ আর ভীমসেন প্রধানত এক মল্লবীর হিসেবে উপস্থিত, বা হয়তো অন্তঃস্থিত কোন নিগূঢ়

আকর্ষণ ছিলো দুজনের মধ্যে—কেননা বিপরীতেরও আকর্ষণ থাকে, এবং তা প্রবল হবারও বাধা নেই। যে কারণে কান্তিমান দুর্মদ যুবা আলকিবিয়াদেস-এর পক্ষে কুদর্শন বৃদ্ধ জ্ঞানী সক্রেটিস ছিলেন প্রয়োজন, হয়তো সেই কারণেই দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠিরকে না হ'লে চলতো না।

(৫) "যাকে বলা যায় সত্যিকার দাম্পত্য সম্বন্ধ, তার দৃষ্টান্ত রূপে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীকেই মনে পড়ে আমাদের—ঠিক মধুর রসে আশ্রিত নয় হয়তো, বলা যায় না রতিপরিমলে অনুলিপ্ত, কিন্তু গভীর ও স্থির ও সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপরায়ণ সেই সম্বন্ধ, এবং যা আরো জরুরি—সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের সমস্ত কথাগুলি এখানে উদ্ধার করতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু তাতে গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয় আছে ; তা ছাড়া যতটুকু আমরা এখানে তুলেছি, তাতেই তাঁর সার্বিক মতটা বোঝা যায়। আমাদের নিবেদন—প্রথম মন্তব্যে 'আসলে' যেন যুধিষ্ঠিরই তাঁর স্বামী'—এখানে 'আসলে' আর 'যেন' কথাটি যতই কাব্যগন্ধী গদ্যের সূচনা করুক, এই কথাগুলির মধ্যে কেমন এক অপ্রত্যয় আছে, বোঝা যায়, মহাভারতের সামগ্রিক প্রমাণে এই কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ করা যাবে না ভেবেই মন্তব্যের মধ্যে এক পিচ্ছিল অনিশ্চয়তা রেখে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু 'যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই নিকটতম তাঁর সম্বন্ধ' এই কথার সঙ্গেই 'যদিও' যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর 'বৈশাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট'—এই আপাত বিরোধিতারও অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়—এবং অস্পষ্টতা দিয়ে আর যাই হোক, পঞ্চস্বামীর একতমের সঙ্গে দ্রৌপদীর 'নিকটতম সম্বন্ধ' প্রমাণ করা কঠিন।

স্বামীদের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্বন্ধ পূর্বে আমি খানিকটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং তা অবশ্যই মহাভারতের প্রমাণে। তাতে আমি কোথাও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে 'নিকটতম সম্বন্ধ খুঁজে পাইনি। তার ওপরে বুদ্ধদেবের ৪ সংখ্যক মন্তব্যে 'সভাপর্বের' পর থেকে দ্রৌপদীকে 'উত্তরোত্তর' যুধিষ্ঠিরের সংশ্লিষ্ট অথবা 'তিনি যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হতে থাকেন'—এই সিদ্ধান্তের মধ্যেও আমি কোনও বৈয়াসিক যুক্তি খুঁজে পাইনি। বরঞ্চ প্রায় উলটোটাই আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়।

দ্রৌপদী যেদিন স্বয়ম্বরা বধূটির লজ্জারুণ চেলি পরে কুম্ভকার গৃহের ভাড়া-করা শ্বশুর-বাড়িতে এলেন, সেদিন গৃহের অন্তরালে থাকা কুন্তীর বচন ছিল—যা এনেছ পাঁচ ভাই ভাগ করে খাও। তারপর দ্রৌপদীকে দেখে তিনি ভীষণ ভয়ে আর্তস্বরে যুধিষ্ঠিরকেই বলেছিলেন—তুমি সেই ব্যবস্থা কর যাতে আমার কথা মিথ্যে না হয়, কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে যাতে কোনও অধর্ম না স্পর্শ করে অথবা তাতে তাঁর যেন কোনও বিভ্রান্তিও না হয় অর্থাৎ তিনি যেন কোনও ভুল না বোঝেন—ন বিভ্রমেচ্চ।

যুধিষ্ঠির মাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, হয়তো ধর্মের সূক্ষ্ম গতিপথ—যা তিনি নিজেও তখন তত বোঝেননি এবং যা তিনি কন্যার পিতা দ্রুপদকেও বোঝাতে পারেননি—সূক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্—অথচ তিনি প্রায় আদেশের মতো বলেছিলেন—আমাদের সবারই মহিষী হবেন এই কল্যাণী দ্রৌপদী। মায়ের কথা মিথ্যে হয়নি, হয়তো বৃহত্তর স্বার্থে পঞ্চভ্রাতার সৌহার্দ্যকামনায় ধর্মও লঙ্ঘিত হয়নি, কিন্তু কৃষ্ণা পাঞ্চালীর কোনও বিভ্রান্তি হল কিনা, অর্থাৎ তিনি ভুল বুঝলেন কিনা—সে খোঁজ, যুধিষ্ঠির নেননি। দ্রুপদকেও তিনি ধর্মের গতি বোঝাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মায়েরই আশ্রয় নিয়েছেন, এবং নিজেকেও তিনি যথোপযুক্ত প্রয়োগ করেছেন সর্বাংশে জ্যেষ্ঠের মতো। বলেছেন—মা এইরকম বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়—এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্। দ্রৌপদী খুশি হয়েছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। নিয়তির মতো পাঁচ স্বামী যখন তাঁর মাথায় চেপে গেল, তখন এই বিদগ্ধা নায়িকা অসাধারণ দক্ষতায় পঞ্চপ্রদীপের তলায় ধৃতিদণ্ডটির মতো পঞ্চস্বামীরই বশবর্তিনী হয়েছেন—বভূব কৃষ্ণা সর্বেষাং পার্থানাং বশবর্তিনী। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে তিনি ক্ষমা করেছেন তো ?

তবু এমন পাঁচ স্বামীকে নিয়ে ভরা সুখের মধ্যে অর্জুন এক সামান্য গরুচোর ধরতে গিয়ে বনে চলে যেতে বাধ্য হলেন কিন্তু ফিরে এলেন—যাদবনন্দিনী সুভদ্রাকে নিয়ে। ফিরে আসার পর দ্রৌপদীকে আমরা খণ্ডিতা হতে দেখেছি। অর্জুনের ওপর বড় অভিমান করতেও দেখেছি। উল্লেখ্য, মহামতি যুধিষ্ঠির কিন্তু রীতিমত স্বয়ম্বরে গিয়ে গোবাসন শৈব্যের মেয়ে দেবিকাকে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়েটা দ্রৌপদীর বিয়ের আগে না পরে সুসম্পন্ন হয়েছিল—সে-খবর মহাভারতের কবি দেনিনি,

অকিঞ্চিৎকর বলেই দেননি, আর দ্রৌপদীর কাছেও এ-ঘটনা ছিল বড়ই অকিঞ্চিৎকর। যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর নৈকট্যবোধ তীব্র হলে এই দেবিকার কথা একবারও অন্তত দ্রৌপদীর মুখে শুনতাম, অথবা দেখতাম সামান্যতম ভ্রূকুটি। এই ভ্রূকুটি যেমন যুধিষ্ঠিরের অন্যতরা স্ত্রীর জন্যও কুঞ্চিত হয়নি, তেমনই হয়নি নকুল বা সহদেবের অন্যান্য বধূদের জন্যও। স্বামীর প্রতি একান্ত অধিকার-বোধই এই ভ্রূকুটি-কুটিলতার জন্ম দেয় বলে রসশাস্ত্রে শুনেছি। অথবা যুধিষ্ঠির সেই রসভাব-সমন্বিত বিদগ্ধ ভ্রূকুটি-ভঙ্গের যোগ্য ছিলেন না—অন্তত দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদীর মুখে ভীম-হিড়িম্বার সংবাদও সাড়ম্বরে শুনেছি, কিন্তু হিড়িম্বাকে নিয়ে দ্রৌপদীর ঈর্ষা তো ছিলই না, বরং একটু স্বাধিকার-বোধই ছিল যেন—একান্ত অনুগত ভীমের বউ বলেই হয়তো।

তবুও কেউ বলতে পারেন—অন্যান্য পাণ্ডব-বধূদের ব্যাপারে দ্রৌপদীর অন্তরঙ্গ ঔদাসীন্য এমন কিছু দরকারি কথা নয়, যাতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর নৈকট্য অপ্রমাণ হয়ে গেল। কথাটা যাই হোক, আমিও অত বড় করে কিছু বলছি না, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে নিস্তরঙ্গতা আর অর্জুনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া—এই বৈপরীত্যের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর সামান্য নৈকট্যের আভাস যতটা, অর্জুনের প্রতি দুর্বলতার ইঙ্গিত তার চেয়ে বেশি।

তবু থাক সে-কথা। অর্জুন-সুভদ্রার বিয়ের পরে দ্রৌপদীকে আমরা একবার অর্জুনের সঙ্গে বেড়াতে যেতে দেখেছি। নিজের ইচ্ছায় নয়। কিন্তু বারো বছর বাইরে-বাইরে থেকে এক যৌবনোদ্ধত যুবক এতকাল পরে বাড়ি ফিরেছে—হতে পারে, তার সঙ্গে সুভদ্রার মতো সুন্দরী সঙ্গিনী আছে—তবু জীবনের প্রথমা নারীটিকে স্ববীর্যে জয় করে আনার মধ্যে যে চিরন্তন অধিকার-বোধ থাকে, হয়তো সেই অধিকার-বোধেই, অথবা অর্জুন বাড়ি ফিরেও হয়তো দেখেছিলেন—দ্রৌপদী তখনও দাদা কিম্বা ভাইদের পরকীয়া, হয়তো সেই যন্ত্রণায় অর্জুন যেন দ্রৌপদীর সমস্ত অন্যতর বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে ক্ষণেকের তরে নিজের অধিকারে স্থাপন করেছেন একান্ত এক বিহার-ভূমিতে।

বিবাহের পর দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের সেই প্রথম মধুচন্দ্রিমা। জানি—মহাভারতের কবি কথাটা এমন স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিঃসংশয় অনুজ্ঞার জন্য অর্জুন বেশ একটু কৌশলই করেছিলেন কিনা—কে জানে! অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন—চল যাই যমুনার দিকটাই ঘুরে আসি—বড্ড গরম এখানে—উষ্ণানি কৃষ্ণ বর্ত্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি। কৃষ্ণ বললেন—আমিও মনে মনে এই কথাই ভাবছিলাম, অর্জুন! বেশ বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে যমুনার কাছে ফুর্তি করে আসলে দারুণ হত। কে না জানে—ধীর সমীরে যমুনাতীরে কৃষ্ণের উল্লাস বড় বেশি। কিন্তু অর্জুন! কৃষ্ণের ইচ্ছা থাকায় ধর্মরাজের অনুমতি মিলতে দেরি হয়নি। ফুর্তির জন্য বন্ধু-বান্ধব যত না গেছেন তাঁদের সঙ্গে, ফুর্তিবাজ অন্য মেয়েরা গেছে তার চেয়ে বেশি। তারা নাচবে, গাইবে, যা ইচ্ছে করবে—বনে কাশ্চিজ্জলে কাশ্চিৎ—স্ত্রিয়শ্চ বিপুল-শ্রোণ্য-শ্চারুপীনপয়োধরাঃ। কৃষ্ণ আর অর্জুনের সঙ্গে এসেছেন সুভদ্রা আর দ্রৌপদী। খাওয়া দাওয়া আর নাচে-গানে ভরে উঠল এই চারজনের অন্তরঙ্গ আসর। নাচনেওয়ালি মেয়েদের রঙ্গ-তামাশায় ভারী মজা পেলেন দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা। খুশির মেজাজে তাঁরা সেই মেয়েদের দিকে নিজের গায়ের গয়না ছুঁড়ে দিলেন, ছুঁড়ে দিলেন রঙিন ওড়না—দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ বাসাংস্যাভরণানি চ।

বাড়ির বাইরে আপন ঈপ্সিততমের সঙ্গে দ্রৌপদীকে আমরা কি এত খুশির মেজাজে, এত উচ্ছ্বসিত—আর কখনও দেখেছি? হয়তো নৈকট্যের আরও সংজ্ঞা আছে কোনও, দিন-দিন, প্রতিদিন দাম্পত্য অভ্যাস—সেই বুঝি নৈকট্য! হবেও বা। কৃষ্ণ-অর্জুনের এই যমুনা-বিহার থেকেই সূচিত হয়েছিল খাণ্ডব-দহনের প্রক্রিয়া। পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞায় খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য করতে এসেছেন। শস্যহীন, রুক্ষ জমি এই খাণ্ডব-প্রস্থ। অগ্নিদেবের ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি কঠিন কথা থাক। কিন্তু সমস্ত খাণ্ডববন পুড়িয়ে যে বীর প্রায় একক ক্ষমতায় জায়গাটাকে সবার বাসযোগ্য করে তুললেন, যে শালীনতায় তিনি ময়দানবের মাধ্যমে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপ্রসাদ বানানোর ব্যবস্থা করলেন—সেই অর্জুনের সব ক্ষমতা, ত্যাগ—দ্রৌপদীর মনে ছিল। খাণ্ডব-দহনের অসাধারণ প্রক্রিয়ায় দ্রৌপদী কতটা মুগ্ধ ছিলেন—তা টের পাওয়া যায় পরবর্তী সময়ে দ্রৌপদীর আক্ষেপে। সেই বিরাট-পর্বে দ্রৌপদী যখন

কীচকের উদগ্র কামনায় বিব্রত হচ্ছেন, তখন ভীমের কাছে গিয়ে দ্রৌপদী অর্ধেক অনুশোচনা করেছেন শুধু অর্জুনকে নিয়ে। তাঁর কেবলই কষ্ট—অর্জুনের এই দশা হল কী করে ? সেই মানুষ, যে নাকি খাণ্ডব-দহন করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন—যো'তর্পয়দমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসম্—সে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে নাচনেওয়ালী সেজে থাকে কী করে ? এই খাণ্ডব-দহনের প্রসঙ্গ দ্রৌপদীর মুখে আবার এসেছে, যখন তিনি কুমার উত্তরের কাছে বৃহন্নলার সারথি হবার যোগ্যতা-প্রমাণে ব্যস্ত হয়েছিলেন। কাজেই মহাভারতের আদিপর্বেও যুধিষ্ঠিরের স্বামিত্বে যত গৌরবান্বিত ছিলেন দ্রৌপদী, তার চেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধ ছিলেন অর্জুনের বীরত্বে। কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে অর্জুনের মাহাত্ম্য প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার বক্তব্য—আদিপর্বে আমরা এমন কিছু দেখিনি যাতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর নৈকট্য প্রমাণ করা যায়।

তারপর বুদ্ধদেব যেমন লিখেছেন—'দ্যূতসভায় অবমানিত হয়ে দ্রৌপদী তীব্র স্বরে বলে উঠলেন—আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিনী, আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা!—যেন বহুবচনের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে ধরানো গেল না, স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষভাবে তাঁর নাম বলতে হ'লো...'—ঠিক এইভাবে কথাগুলি মহাভারতে নেই। দ্রৌপদী বলেছিলেন—আমি পাণ্ডবদের ভার্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, এবং কৃষ্ণের বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও কেমন করে যে আমায় এই সভায় সমস্ত রাজাদের সামনে নিয়ে আসা হল—ভাবতে পারি না।

এই হল একটি শ্লোক এবং এই শ্লোকে 'কথং হি ভার্যা পাণ্ডূনাম্' আমি পাণ্ডবদের ভার্যা—এখানে যুধিষ্ঠিরকেও ধরানো গেছে একভাবে। পরের শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের নাম আলাদাভাবে উচ্চারণ করেছেন দ্রৌপদী, কিন্তু তার তাৎপর্য বুদ্ধদেব যেমনটি বলেছেন, তেমনটি আমার মনে হয় না। এখানে আবারও শ্লোকটা যেখানে আছে, যে প্রসঙ্গে আছে—সেটা বলি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হেরেছেন যদিও, তবু তিনি নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন আগে। এ অবস্থায় আইনের মারপ্যাঁচে দ্রৌপদীকে কোনও ভাবেই কৌরবদের দাসী বলা যায় কিনা—এটাই ছিল দ্রৌপদীর প্রশ্ন। এই প্রশ্নকূট নিয়ে আগেও আলোচনা হয়ে গেছে। মহামতি ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন এবং উত্তরের জন্য দেখিয়ে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকেই। দুঃশাসনের অসভ্যতাও তখন শেষ হয়ে গেছে, কাপড় টেনে টেনে তিনি তখন ক্লান্ত। এরই মধ্যে কর্ণ বললেন—দুঃশাসন! ঝিটাকে এবার ঘরে নিয়ে যাও—কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয়।

ঠিক এই মুহূর্তে কৃষ্ণা-পাঞ্চালী আবার কথা আরম্ভ করলেন সমবেত সুধীজনের সামনে। আবার সেই শাশ্বত লোকাচার সাধারণ ধর্মবোধের কথা তুললেন দ্রৌপদী। সেই স্বয়ম্বর সভায় রাজাদের সামনে একবার আমি এসেছিলাম, আর আজও আমাকে আসতে হল! আমার গায়ে হাওয়ার পরশ লাগলেও যেখানে আমার স্বামীরা সইতে পারেন না, ভাবেন বুঝি, পর-পুরুষের ছোঁয়া লাগল সেই পাণ্ডবরাও আমার এই অপমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করলেন।

ঠিক এইখানেই দ্রৌপদী দুঃখ করে বলেছেন—পাণ্ডবের ভার্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন এবং কৃষ্ণের বান্ধবী হয়েও আমাকে এই সভায় আসতে হল ? এর পরেই যুধিষ্ঠিরের গৌরবে সেই আলাদা শ্লোকটি। দ্রৌপদী বললেন—দেখ হে, কৌরবরা! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভার্যা, আমাদের বিবাহ হয়েছে সবর্ণে, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে—তামিমাং ধর্মরাজস্য ভার্যাং সদৃশ-বর্ণজাম্—এখন ভেবে দেখ তোমরা, আমাকে দাসী বলবে, না, অদাসী বলবে ? যা বলবে—তাই করব—ব্রূত দাসীম্ অদাসীং বা তৎ করিষ্যামি কৌরবাঃ।

এখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভার্যার গৌরবে যে কথাগুলি বলেছেন দ্রৌপদী, তার একটা পৃথক গুরুত্ব অবশ্যই আছে আমার বিবেচনায়, তবে তার প্রসঙ্গটা এখানে খেয়াল করার মতো। মনে রাখা দরকার—দ্রৌপদীকে কোনওভাবেই দাসী বলা যায় কিনা—এই ছিল প্রশ্ন ? দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দিয়েছেন—তিনি কৌরবকুলের পুত্রবধূ, ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার মতো—স্নুষাং দুহিতরঞ্চৈব। দ্রৌপদী মনে করিয়ে দিয়েছেন—কুরুকুলের চিরন্তন ধর্মবোধের কথা—যে ধর্মবোধ অতিক্রম করে তাঁরা কোনওদিন কুল-বধূদের অমর্যাদা করেননি, এবং যে ধর্মবোধ এখন বিলুপ্ত। এইবার তিনি

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভার্যার গৌরবে কথা বলছেন।

আবারও মনে রাখতে হবে—বিদগ্ধা দ্রৌপদী, পাণ্ডব-ভার্যা দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী দ্রৌপদী—এই অভিজাত বংশ-সম্বন্ধগুলি কৌরব-কুলাঙ্গারদের মনে করিয়ে দিয়ে তবেই দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে আসছেন। আসছেন এইজন্য যে, এই কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের পাটরানি। রাজা যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী। ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির সমানবর্ণা ক্ষত্রিয়া-কুমারীকে বিবাহ করে, তবেই না কুরুকুলের পুত্রবধূর সম্মানে তাঁকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। আর যে কুরুকুল চিরকাল শুধু ধর্মানুসারে কাজ করেছে, সেই কুরুকুলের জাতকেরা আজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মানুসারে বিবাহিতা রানি দ্রৌপদীকে দাসী বানাতে চাইছে। দ্রৌপদীর শাণিত ইঙ্গিত—এতে আভিজাত্যও নেই, ধর্মও নেই।

ধর্ম শব্দটা এখানে ফুল, নৈবেদ্য কিংবা বেলপাতার পুজো বোঝাচ্ছে না, ধর্ম এখানে এক বিশাল নীতিবোধ, সামাজিক ঔচিত্য ; এমনকী যা করা হয়ে গেছে, তা যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে তার করণীয়তা সম্বন্ধে গভীর কোনও তর্কও হতে পারে। দ্রৌপদী সেই তর্কই করছিলেন, এবং এই সব ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির এতকাল ছিলেন প্রমাণ স্বরূপ। পাশা-ক্রীড়ার এই তাৎক্ষণিক মত্ততা ছাড়া যুধিষ্ঠির নৈতিক এবং উচিত কার্যে সব সময় ব্যক্তিস্বার্থ অতিক্রম করে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। এমনকী এখনও তিনি পাশা খেলে নিজেকে এবং নিজের স্ত্রীকেও হেরেছেন—এই চরম মুহূর্তেও পাশা-খেলার ন্যায়-নীতি অনুসারে তাঁর মাথার ওপর যে গভীর সংকট নেমে এসেছে—সে সংকট থেকে বাঁচবার জন্য অন্য কোনও সহজ পন্থা অবলম্বন করেননি, অথবা কোনও তর্ক করেননি। কারণ পাশাখেলার নির্ধারিত নিয়মনীতিও তাঁর কাছে ধর্ম। যার জন্য দ্রৌপদী যখন বারবার কৌরবদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন—বল তোমরা, আমি দাসী, না অদাসী, আমি ধর্মানুসারে জিত হয়েছি! না জিত হইনি—তোমরা যা বলবে—আমি তাই করব।

লক্ষণীয় বিষয় হল, কৌরবরা এখানে আজ্ঞাকারীর ভূমিকায় থেকেও তাঁদের সিদ্ধান্ত তাঁরা ঘোষণা করেননি। এই অবস্থাতেও তাঁরা বলেছেন—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি ধর্মেই স্থিত এবং পাশাখেলায় হেরে যাবার পর এখনও তোমার ওপর তাঁর স্বামীর অধিকার আছে, কি নেই—তা এই ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠিরের কাছেই জেনে নাও—ধর্মে হিতো ধর্মসুতো মহাত্মা স্বয়ঞ্চেদং কথয়ত্বিন্দ্রকল্পঃ।

এই কথাটা দুর্যোধন বলেছেন। আপনারা কি মনে করেন না যে, এখানেও 'স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষভাবেই' যুধিষ্ঠিরের নাম করতে হয়েছে। অন্যদিকে এই সংকট কালেও দ্রৌপদী যে ধর্মকেই শেষ অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন, সেই বহুমাননা করেও ভীষ্ম কিন্তু আবারও সেই যুধিষ্ঠিরকেই ন্যায়-নীতি বিচারের শেষ প্রমাণ বলে মনে করেছেন—যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।

যে কারণে ভীষ্ম, এবং এমনকী দুর্যোধনও বার বার 'স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষভাবে', আলাদা করে যুধিষ্ঠিরের নাম করেছেন—আমার বিবেচনায়—দ্রৌপদীও ওই একই কারণে যুধিষ্ঠিরের নাম আলাদা এবং স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণটা ভীষ্ম একবার যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে বলেছেন, আবার অন্যত্র দ্রৌপদী নিজেই যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে সে-কথা বলেছেন। ভীষ্ম এই দ্রৌপদীকেই বলেছিলেন—দরকার হলে যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবীও ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করবেন না—ত্যজেত সর্বাং পৃথিবীং সমৃদ্ধাং, যুধিষ্ঠিরো ধর্মমতো ন জহ্যাৎ। আর বনপর্বে এসে দ্রৌপদী নিজেই তার স্বামীর সম্বন্ধে বলেছেন আমি যা বুঝি তাতে তুমি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এমনকী নিজেকেও অথবা আমাকেও ত্যাগ করতে পার, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে পার না—ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধি র্ন তু ধর্মং পরিত্যজেঃ।

ধর্মের জন্য যুধিষ্ঠির এতটাই নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা এমন এক প্রাবাদিক পর্যায়ে উন্নীত যে, দ্রৌপদী প্রথম দুঃশাসনের কবলে পড়ে অতিসংকটে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে যে-শব্দ উচ্চারণ করেন—ধর্মে হিতো ধর্মসুতো মহাত্মা—দুর্যোধন তাঁর শত্রুপক্ষ হয়েও তাঁর তর্ক-সংকটে সেই একই প্রবাদ-কল্প ব্যবহার করেন—ধর্মে হিতো ধর্মসুতো মহাত্মা। কাজেই দ্রৌপদীর পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশিষ্টভাবে যুধিষ্ঠিরের নাম উচ্চারণের মধ্যে যদি অন্য কোনও মাহাত্ম্য আরোপ করতে হয়, তবে

দুর্যোধন বা ভীষ্মের দিক থেকে যুধিষ্ঠিরের নাম পৃথকভাবে উচ্চারণ করার জন্য আমরা তাঁর কোন মাহাত্ম্য স্মরণ করব ? বস্তুত ধর্ম, এবং এক অতি পৃথক তথা স্বতন্ত্র ধর্মবোধই যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভাইদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে, যার ফলে দ্রৌপদী, দুর্যোধন একই কারণে যুধিষ্ঠিরের নাম উল্লেখ করেন। এর মধ্যে যদি বুদ্ধদেবের দৃষ্টি-মতো দ্রৌপদীর 'উত্তরোত্তর আরও বেশি সংশ্লিষ্টভাবে' যুধিষ্ঠিরের ভার্যায় উত্তরণ দেখতে পাই, তা হলে দুর্যোধন বা ভীষ্মের জন্যও আমাদের আরও সংশ্লিষ্ট কোনও সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে হবে।

যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে পৃথক এবং বৃহৎ আলোচনার অবসর যখন আসবে, তখন আরও সূক্ষ্মভাবে এসব কথা ধরবার চেষ্টা করব, তবে শুধু বুদ্ধদেব বসুর মতো মহোদয় ব্যক্তির প্রতিপক্ষতার গৌরবে অল্প হলেও এ-কথা বলতে হবে যে, দ্রৌপদী কোনওভাবেই উত্তরোত্তর আরও সংশ্লিষ্টভাবে যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হন না। যুধিষ্ঠির স্বক্ষেত্রে এতই বেশি বড়, এতই বেশি মহান এবং সেই কারণেই সুদূর আকাশে-আঁকা ইন্দ্রধনুটির মতো এতই তাঁর দূরত্ব যে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে কারও পক্ষে সংশ্লিষ্টতায় উত্তরণ ঘটানো বড় কঠিন বলেই আমি মনে করি।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী তো বটেই, কিন্তু এই জ্যেষ্ঠ-স্বামীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে একধরনের 'ডিকটমি' আছে। একদিকে যুধিষ্ঠির যেখানে তাঁর সুদূর ধর্মমঞ্চে বসে আছেন, সেখানে দুঃশাসন এসে তাঁর চুলের মুঠি ধরলেও, তিনি বলে ওঠেন—আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কথার মধ্যে গুণগুলি বাদ দিয়ে অণুমাত্র দোষও দেখতে চাই না, কারণ ধর্মের গতি সূক্ষ্ম এবং নিপুণভাবে তা লক্ষ করতে হয় ; তিনি যা বুঝেছেন, আমি হয়তো তা বুঝতে পারছি না—বাচাপি ভর্তুঃ পরমাণুমাত্রম্ ইচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য। অন্য দিকে এই সুদূর সম্মানিত ব্যবহারের লেশমাত্রও ছিল না, যখন দুঃশাসনেরও আগে প্রাতিকামী এসে দ্রৌপদীকে প্রথম রাজসভায় যেতে বলেছিল। দ্রৌপদী সারথি-জাতের প্রাতিকামীর সামনেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তাঁর দ্যূতাসক্তির ঘৃণ্যতা প্রমাণ করে বলেছিলেন—যাও সভায় গিয়ে সেই জুয়াড়িকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো যে, সে নিজেকে আগে বাজি রেখে হেরেছে, না আমাকে—গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভায়াং পৃচ্ছ সূতজ ?

এই মুহূর্তে দ্রৌপদী আপন কুলবধূর সম্মান বাঁচানোর জন্য আইনের ফাঁকে যুধিষ্ঠিরের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যদি আগে কোনওভাবে নিজেকে বাজি রেখে হেরে থাকেন, তবে এই মুহূর্তে তাঁর স্বামিত্বের অধিকার না থাকায় দ্রৌপদী খুশি হতে পারেন। কাহিনী যত এগিয়ে চলেছে, যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর অধৈর্য আরও বেড়ে চলেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে যুধিষ্ঠির তাতে খারাপ হলেন, না ভাল হলেন—সে তর্কে আমি আপাতত যাচ্ছি না। কারণ, যুধিষ্ঠির এক বিশাল এবং ব্যাপ্ত মহাদ্রুমের মতো। শুধুমাত্র দ্রৌপদীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি খারাপ, না ভাল—সে প্রশ্নটির শুধু আলোচনা হতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্ম ধর্মবোধের মতো বুদ্ধদেবের সাহিত্য-বোধও বুঝি অতিশয় সূক্ষ্ম,—এতটাই সূক্ষ্ম যে, আমার মতো অনধিকারীর পক্ষে তা ধরাও বুঝি মুশকিল। তবে পূর্বাপর-বিচারে আমার যা মনে হয়েছে, তাতে সভাপর্বের পর কাহিনী যতই এগিয়ে চলেছে যুধিষ্ঠির সম্পর্কে দ্রৌপদীর অসহিষ্ণুতা ততই বেড়েছে। ইন্দ্রকল্প পাঁচস্বামীর পিছন পিছন তিনি বনে গিয়েছেন বটে, কিন্তু মনের রাগ তিনি মনে লুকিয়ে রাখেননি। দুঃশাসনের হাতে-ধরা চুল তিনি খুলে রেখে দিয়েছেন সমস্ত অপমানের প্রতীকের মতো। বনে যাবার কিছুদিনের মধ্যে যখন কৃষ্ণ এসে পৌঁছালেন পাণ্ডবদের কাছে, তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণের সামনে ধিক্কার দিয়েছেন স্বামীদের। হয়তো অত্যন্ত ক্ষোভে অথবা চরম উদাসীনতায় যুধিষ্ঠিরের নামও তিনি করেননি। ভাবটা এই—তিনি যা করে ফেলেছেন, ফেলেছেন ; কিন্তু কী হল এই ভীম আর অর্জুনের, যাঁদের একজন নিজের বাহুবলে আস্থাবান আর অন্যজন ধনুষ্মত্তায়—ধিক্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য গাণ্ডীবম্ ? বুদ্ধদেবের অনুকরণে কি এখানে বলব যে, পাঁচজনের মধ্যে যেন এঁদের ধরানো গেল না, স্বতন্ত্র এবং বিশেষভাবে এঁদের নাম করতে হল। যেন দ্রৌপদী নিজের রক্ষার জন্য এই দুই পাণ্ডবের ওপর বেশি নির্ভর করেন, যুধিষ্ঠির কিংবা নকুল-সহদেবের ওপর তাঁর যেন কোনও ভরসাই নেই।

কাহিনী আরও যখন এগিয়ে চলেছে, দ্রৌপদীকে আমরা তখন আরও উত্তপ্ত দেখেছি। দ্বৈতবনের এক অরুণিত সায়াহ্নে দ্রৌপদীকে দেখছি যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে বিব্রত, বিরক্ত। তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন দুর্যোধনের দোষ এবং শকুনির কপটতা নিয়েই, যাতে স্বামীদের ওপরে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের ওপরে তাঁর আক্ষেপ না আসে। ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ-স্বামীর সুখোচ্ছ্বাস এবং এই বনে তাঁদের কষ্টকর জীবনের প্রতিতুলনার উল্লেখেই কথা সমাপ্ত হতে পারত। কিন্তু রাজনীতির বিষয়ে দ্রৌপদীর ভাল রকম পড়াশুনো থাকায় তিনি সর্বংসহ প্রহ্লাদের উক্তি শুনিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। শুনিয়েছেন—প্রহ্লাদের মতো নরম মানুষও সময়কালে দণ্ডের প্রশংসা করেছেন, ক্ষমার নয়। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথা শোনেননি, কারণ তাঁর সেই চিরন্তন ধর্মবোধ, সেই চিরন্তনী ক্ষমার মহত্ত্ব। দ্রৌপদী হাল ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামী সম্পর্কে। বলেছেন তুমি ধর্মের জন্য নিজেকে, নিজের সমস্ত ভাইদের, এমনকী আমাকেও ত্যাগ করতে পার—ভীমসেনার্জুনৌ চেমৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ—কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে পার না।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল ভারবত্তা এবং মহত্ত্বের দূরত্ব জানেন। কিন্তু সে তাঁর সহ্যের বাইরে—

যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

ধর্মে চিরস্থিত মহান যুধিষ্ঠিরের বিশালতা দূরে সরিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী তাঁর স্বামীর কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেছেন। ঝগড়া করে বলেছেন—এত সরল, এত মৃদু, এত বদান্য অথবা এত সত্যবাদী তুমি—তা তোমার এই জুয়াড়ির মতো জুয়ো খেলার দোষটি ঘটল কেন—কথমক্ষ-ব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব? সময় বুঝে পাঞ্চালী-কৃষ্ণাও কত ধর্মের উপদেশ শুনিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। তবু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মনের কাছাকাছি আসেননি। স্ত্রীর সুমহান উপদেশের মধ্যে নাস্তিক্যের দোষারোপ করে তিনি শেষ আদেশ জারি করেছেন—বিধাতার বিধানকে 'চ্যালেঞ্জ' কোরো না, খোদার ওপর খোদকারি কোরো না—ঈশ্বরঞ্চাপি ভূতানাং ধাতারং মা চ বৈ ক্ষিপ। আরও শেখো আরও নত হওয়ার চেষ্টা করো, এমন বুদ্ধি ভাল নয় মোটেই—শিক্ষস্বৈনং নমস্বৈনং মা তে ভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।

নিজের কথা একটুও শুনছেন না, এমন মানুষকে দ্রৌপদী গভীর চুম্বনে পবিত্র করে তোলেননি। তিনি অদৃষ্টবাদী নন, অতএব পুনরায় তিনি তাঁকে শত্রুর বিরুদ্ধে জেগে উঠতে বলেছেন। বলেছেন—রাজনীতির ফলের জন্য চেষ্টা প্রয়োজন, যত্ন প্রয়োজন। তোমার মতো যারা বিধাতা আর অদৃষ্ট নিয়ে শুয়ে থাকে, তাদের অলক্ষ্মীতে ধরে আর কিছু নয়—অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানম্ অলসং নরম্।

দুঃখের বিষয়—দ্রৌপদী এখনও আমার কাছে যথার্থ যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হচ্ছেন না। অপিচ কোনও 'নিগূঢ় আকর্ষণ'ও তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কাছাকাছি নিয়ে আসছে বলে আমার মনে হয়নি। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর এই রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধের পর-পরই অর্জুন চলে গেলেন তপস্যায় পাশুপত অস্ত্রের সন্ধানে। দ্রৌপদীর মনের অবস্থা তখন কী হয়েছিল—তা পূর্বেই দেখিয়েছি। বছরের পর বছর অর্জুন-হীন জীবন আর দিনের পর দিন যুধিষ্ঠির মুনি-ঋষিদের কাছে পুরাণ-কাহিনী, অধ্যাত্ম-কথা শুনে যাচ্ছেন। এরই অবধারিত ফল—দ্রৌপদী অতিষ্ঠ হয়ে অর্জুনের জন্য একদিন কেঁদে উঠেছেন—আমার কিছু ভাল লাগছে না, অর্জুনকে ছাড়া একটুও ভাল লাগছে না, অর্জুন ছাড়া আমার কাছে সব শূন্য—শূন্যামিব প্রপশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।

ঠিক এই ধরনের হাহাকার দ্রৌপদীর মুখে আর দ্বিতীয়বার শুনেছি কিনা সন্দেহ। এই বিলাপোক্তির সঙ্গে ভীম, নকুল এবং সহদেব—তিন ভাইই সুর মিলিয়েছেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির নন। অবশ্য তিনি পরে একই কথা বলেছেন, কিন্তু ভাইদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সুর মেলাননি। আপন অধ্যাত্ম

স্বাতন্ত্র্যে তখনও তিনি স্থিতধী। ভেবেছেন বুঝি—মেয়েরা ওরকম কাঁদেই বটে। কিন্তু কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর সঙ্গে ভাইয়েরা যোগ দেওয়ায় যুধিষ্ঠির কিছু চিন্তিত হলেন—ধনঞ্জয়োৎসুকানাস্তু ভ্রাতৃণাং কৃষ্ণয়া সহ। সবার মন ভোলানোর জন্য নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। ঘুরে ঘুরে দ্রৌপদী শ্রান্ত, ক্লান্ত। কিন্তু এরই মধ্যে খবর এসে গেছে—অর্জুনের অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ, তিনি আসছেন। দ্রৌপদীকে আর রাখা যায়নি, হিমালয়ের কঠিন বন্ধুর পথে তাঁর পা চলে না। তবু তাঁকে রাখা যায়নি। যুধিষ্ঠির বলেছেন—তুমি এখানেই দ্রৌপদীকে নিয়ে থাক ভীম। তোমার গায়ে জোর আছে, তুমি সহদেব, ধৌম্য—এঁদের নিয়ে এখানে থাক, নইলে এত কষ্ট করে কৃষ্ণা-পাঞ্চালী যাবেন কী করে ?

দিনের পর দিন নিত্যসঙ্গের ফলে দ্রৌপদীর মন যদি এইভাবে বুঝে থাকেন যুধিষ্ঠির, তাহলে কী করেই বা বলি—পাঁচের মধ্যে একের নাম করতে হ'লে 'যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর মনে পড়ে।' আর ভীমসেন, যাকে বুদ্ধদেব ভেবেছেন বড়ই স্থূল, দ্রৌপদীর 'আজ্ঞাবহ' অথবা 'প্রধানত এক মল্লবীর'—তিনি কিন্তু দ্রৌপদীর মতো এক বিদগ্ধা রমণীর মন বোঝেন। এই স্থূল মল্লবীর জানেন—'অনবরত ভ্রাম্যমাণ' যুবকটির ওপর এই রমণীর কী গভীর দুর্বলতা। যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব শেষ হতে না হতেই তিনি জানিয়েছেন—হ্যাঁ, পথশ্রম, কিংবা শারীরিক কষ্ট অবশ্যই হচ্ছে, তবে দ্রৌপদী যে যাবেনই, তিনি যে অর্জুনকে দেখতে পাবেন—ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহ-দিদৃক্ষয়া। দ্রৌপদী গেছেন, হিমালয়ের কনকনে হাওয়ায় আর পথশ্রমে দ্রৌপদী একবার অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তবু গেছেন। ভীমের ছেলে ঘটোৎকচের কাঁধে বসে চলতে চলতে শেষে বুঝি তাঁর ভালই লাগছিল। অর্জুন আসবেন, কী ভাল যে লাগছে ! এখন আর বন্ধুর পার্বত্য ভূমিতে হাঁটার কষ্ট নেই, শুধু সামান্য অপেক্ষার আনন্দ। হিমালয়ের পর্বত, বিজন অরণ্যানী—সে যেমন এখনও মধুর তেমনই সেদিনও ছিল অপূর্ব। বনভূমি ফল-ফুলের শোভায় উপচে পড়ছে, আর কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর মনে তখন শুধু অর্জুনের দিদৃক্ষা—কতদিন পর তার সঙ্গে দেখা হবে।

ঠিক এই রকম একটা মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে—মন যখন আপনিই উদার হয়ে যায়—ঠিক তখনই কোথা থেকে উড়ে এসে একটি মাত্র সুর-সৌগন্ধিক, সোনার বরণ পদ্ম দ্রৌপদী পায়ের কাছে এসে পড়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে দ্রৌপদীর সেটি উপহার দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে—যুধিষ্ঠির আর দ্রৌপদীর জীবন-বন্ধনে এই উপহার বুঝি এক বিরাট ঘটনা, বিরাট প্রতীকী ঘটনা—বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর স্বামী হিসেবে মনে মনে এতদিন লালন করতেন বলেই যেন দ্রৌপদীর দিক থেকে এই স্বর্ণপদ্মের উপহার। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এরকম মনে হয় না। হ্যাঁ, এমন তো হতেই পারে—যে বিদগ্ধা রমণী পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করেন এবং যাঁর অন্তরের কেন্দ্রভূমিতে অর্জুনের মতো এক বিরাট স্বপ্ন আছে—তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ-স্বামীটির সম্বন্ধে এমন তো ভাবতেই পারেন—আহা ! এই মহান পুরুষটির হৃদয় তো আমি কোনও দিন ভাল করে লক্ষ করিনি, সারা জীবন ধর্ম-ধর্ম করে গেল, শত্রুপক্ষের অন্যায় আচরণের জন্য কতই না গালাগালি দিয়েছি এঁকে ! নিজের স্ত্রীর কাছেও কতই না লাঘব সহ্য করতে হয়েছে এই মহান ব্যক্তিটিকে ! দ্রৌপদী ভাবতেই পারেন—উদগ্র নীতিবোধ, অতি-প্রকট সাধুতা—এ-সব আমার অপমানের নিরিখে আমার কাছে যতই কষ্টের হোক, যুধিষ্ঠির মানুষটা তো খারাপ নয়।

না, এ-সব কথা মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করেননি। কিন্তু স্বর্ণপদ্মের উপহারে আর যাই হোক, যুধিষ্ঠিরের ভার্যাত্ব-প্রমাণের তাগিদ দ্রৌপদীর ছিল না। বরঞ্চ উদারতা ছিল। যে বীর স্বামীর সম্বন্ধে মনে মনে তাঁর একান্ত অপ্রাপ্তির বেদনা ছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে—এই আনন্দই তাঁকে সেদিন আকস্মিক-ভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রতি উদার করে তুলেছিল। এই ঔদার্যের আরও একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে অনায়ত্ততা। যুধিষ্ঠিরকে তিনি কোনওদিনই ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেননি। হ্যাঁ, অর্জুনকেও পারেননি। এমনকী তথাকথিত ভাবনাটি যদি মেনেও নিই, অর্থাৎ একজন 'নিত্যসঙ্গী' অন্যজন 'অনবরত ভ্রাম্যমাণ'। এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণের ওপর দ্রৌপদীর হৃদয়ের যে দুর্বলতা ছিল, নিত্যসঙ্গীর ওপর তা ছিল না। কিন্তু দুর্বলতা না থাকলেও একজন বলিষ্ঠ

পুরুষমানুষ—হোক না তাঁর বলিষ্ঠতা নীতি অথবা ধর্মের দিক থেকেই শুধু প্রবল—তবু তিনি দ্রৌপদীর মতো একজন বিদগ্ধা রমণীর আয়ত্ত হবেন না—এটা কি দ্রৌপদীরই অভিপ্রেত ছিল ?

স্বর্ণপদ্মের উপহার যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যে জুটেছে দ্রৌপদীর ক্ষণিক-উচ্ছ্বাসের অঙ্গ হিসাবে, অথবা মাঝে মাঝে তিনি নিত্যসঙ্গী যুধিষ্ঠিরের মনের কাছে আসতে চেষ্টা করেছেন, তারই সুফল হিসেবে অথবা—আমাকে যদি আরও স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তবে বলব—অনেকদিন পর অর্জুনের দেখা পাবেন বলে সব কিছুই যখন তাঁর কাছে উদার মাধুর্যে ধরা দিচ্ছে, সেই উদার-ক্ষণের উচ্ছ্বাসেই দ্রৌপদী স্বর্ণপদ্মের উপহার দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে।

অন্যদিকে ব্যাপারটা যুধিষ্ঠিরের দিক থেকেও দেখুন। দ্রৌপদী বহু-ভর্তৃকা হলেও আসলে তিনি আমারই—এমন কোনও স্বাধিকার বোধ কি তাঁর দিক থেকে ছিল ? স্বর্ণপদ্মের উপহারে তিনি একটুও বিগলিত হননি। মহাভারতের কবি একটি শব্দও ব্যয় করেননি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর উপহার দেওয়ার ছবিটি তুলে রাখতে। শুধু একটা সংবাদের মতো আমাদের তিনি জানিয়েছেন—দ্রৌপদী পদ্মফুল নিয়ে গেলেন ধর্মরাজের কাছে—জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তত্তদা। ব্যাস্, এরপর থেকেই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চলে গেছেন সেই ভীমসেনের বর্ণনায়—যিনি দ্রৌপদীর ইচ্ছামাত্রে আরও স্বর্ণপদ্ম জোগাড় করতে চললেন অথবা দ্রৌপদীর ওপর ভালোবাসায় তিনি কী করলেন, কতটা করলেন—তার অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণে। যুধিষ্ঠির এবং স্বর্ণপদ্মের কথা আর একবারও ওঠেনি। উপহার পাওয়ার পর যুধিষ্ঠিরের সামান্য প্রতিক্রিয়াও স্থান পায়নি ব্যাসের লেখনীতে। ভীমের জন্য ব্যাসের এত সহানুভূতি কেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটিমাত্র পংক্তিতে। ভীমকে অনেকক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, যুধিষ্ঠির উতলা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ভীম কোথায়, পাঞ্চালী। কোথায় সে, কী কাজে গেছে ? কৃষ্ণা-পাঞ্চালী বললেন—সেই যে সেই সোনার বরণ পদ্মখানি, মহারাজ!—যৎ তৎ সৌগন্ধিকং রাজন্—সেটা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছিল বটে কিন্তু সেটা ভীমই আমাকে এনে দিয়েছিল—আমি বলেছি—আরও যদি এমন ফুল দেখ তো নিয়ে এস আমার জন্য।

এইটুকুই। দ্রৌপদীর উপহার পেয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনও ভাব-বিকার আমরা দেখিনি। কিন্তু দ্রৌপদীর ইচ্ছা, শুধু একটা ইচ্ছার জন্য ভীমসেনকে কত মারামারি, কত গিরি-দরী-গুহা আমরা লঙ্ঘন করতে দেখলাম। যুধিষ্ঠির ভাইদের আর দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে ভীমকে খুঁজতে খুঁজতে যখন সেই পদ্ম-সরোবরের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন দেখলাম সরোবরের তীরে রক্ষী-প্রতিম যক্ষ-রাক্ষসদের মেরে গদা উঁচিয়ে রেগে অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভীমসেন। যুধিষ্ঠির ভাইকে আলিঙ্গন করে মহাস্থবির ধর্মজ্ঞের মত বললেন—এমন সাহস আর দ্বিতীয়বার কোরো না, যদি আমার মনের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে চাও তো দ্বিতীয়বার এমন ব্যবহার কোরো না—পুনরেবং ন কর্ত্তব্যং মম চেদ্ ইচ্ছসি প্রিয়ম্।

আর দ্রৌপদী ভীমকে কী বলেছিলেন ? যদি আমি তোমার ভালবাসার মানুষ হই, ভীম—তা হলে এইরকম পদ্মফুল আরও আমাকে এনে দাও—যদি তে'হং প্রিয়া পার্থ বহূনীমান্যুপাহর। মনে রাখবেন, ভীমের আনা পদ্মফুল দ্রৌপদী উপহার দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। তাতে বিন্দুমাত্র পুলকের প্রকাশ না ঘটিয়ে শুধুমাত্র দ্রৌপদীর প্রীতির জন্য সৌগন্ধিক পদ্মের অন্বেষায় ব্যস্ত ব্যক্তিটিকে যুধিষ্ঠির বলছেন—আমার পছন্দের কথা যদি ধর, তাহলে এমন কাজ যেন দ্বিতীয়বার কোরো না। এতে ভাইয়ের প্রতি যুধিষ্ঠিরের স্নেহ যতই প্রকট হয়ে উঠুক, দ্রৌপদীর উপহারের মর্যাদা এখানে কতটুকু প্রকাশ পেল ? বিদগ্ধা প্রণয়িনীর ইচ্ছার মূল্যই বা কতটুকু থাকল ?

আসলে এই উপহারের ব্যাপারটা বুদ্ধদেব অনর্থক বড় প্রতীকী করে তুলেছেন। কৃষ্ণা-পাঞ্চালী আর যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে এত জটিলতা কিছু নেই। যুধিষ্ঠির তাঁর আজন্মলালিত ধর্মীয় তথা ন্যায়নীতির সংস্কারেই হোক, অথবা পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে আপন জননী এবং ভাইদের একান্ত-নির্ভর হিসেবেই হোক অথবা শত্রুপক্ষের জটিল ব্যবহারে বার বার অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার ফলেই হোক, জগৎ সংসারে তিনি যেন কেমন বুড়ো মানুষটির মতো হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর বয়সের যে বড় বেশি ফারাক ছিল, তা নয় ; তবে স্ত্রীর ওপর তাঁর ব্যবহারটি ছিল বয়স্ক

স্বামীর মতো। ভাইদের তিনি যে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন, দ্রৌপদীকেও তিনি সেই স্নেহেই দেখতেন। দ্রৌপদী তাঁর কাছে নিতান্তই এক সংস্কারের মতো, ধর্মপত্নীর সংস্কারে বাঁধা, তার বেশি কিছু না। আর ঠিক এই কারণেই বক-যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যখন বলেন—গৃহে মিত্র ভার্যা, দৈবকৃত সখা ভার্যা, আর উপরন্তু 'ধর্ম অর্থ কাম—এই তিন পরস্পর বিরোধীর সংযোগ ঘটে শুধু ধর্মচারিণী ভার্যার মধ্যে'—এই সব কথার মধ্যে আমরা শুধু শাস্ত্রবচনের নীতিযুক্তিই অনুভব করি, দ্রৌপদীর সঞ্চার আমরা অনুভব করি না। মহাভারতে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে দ্রৌপদীর প্রণয়-সঞ্চারে তিনি কোনও ধর্ম-যুক্তি লঙ্ঘন করেছেন অথবা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। বক-যক্ষের কূট প্রশ্নের উত্তরে তিনবার ভার্যার প্রসঙ্গ এসেছে বটে, কিন্তু নীতিশাস্ত্রে এবং ধর্মশাস্ত্রে এই কথাগুলি প্রবাদ-প্রবচনের মতো বার বার বলা হয়—যুধিষ্ঠির সেইগুলিই বলেছেন। তা ছাড়া বক-যক্ষের অতগুলি প্রশ্ন এবং যে প্রশ্নগুলির একটারও বেঠিক উত্তর তাঁর স্নেহের ভাই এবং প্রিয়া পত্নীকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিতে পারত, সেইখানে সেই বিশাল নীতিশাস্ত্রীয় প্রহেলিকা সমাধানের সময় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ব্যক্তিগত সঞ্চার অনুভব করবেন—এমন মানুষই তিনি নন। যক্ষের প্রশ্ন এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তরগুলি যদি সেভাবে দেখতে হয়, তাহলে বলতে হবে যুধিষ্ঠির যক্ষের শত-প্রশ্নের উত্তরে শতবার শত-পরিচিত মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চার অনুভব করে থাকবেন। বস্তুত আমাদের চির-পরিচিত সংসারের সাধারণ তুলাদণ্ড দিয়ে দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার পরিমাপ করা বড়ই কঠিন। ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দর্শন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করা একান্ত অসম্ভব। কারণ তিনি বড় বেশি স্বতন্ত্র, বড় স্বতন্ত্র ভাবে নির্বিঘ্ন।

এত কথা বলেও আমি কিন্তু এটা বলছি না যে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ভালবাসতেন না, অথবা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে। বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীর সঙ্গে কখন, কী ব্যবহার করেছেন আমি সংক্ষেপে তার একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি—উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের দূতিয়ালির আগে পর্যন্তও দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের কাছে নিজের অসহ্য অপমানের বিষয়ে সুবিচার পাবেন বলে মনে করেননি। কিন্তু যার কাছে সেই সুবিচার পাবেন বলে মনে করেছেন, অথবা যিনি এই বিদগ্ধা রমণীর স্বামী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন বুঝেছেন, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্কটাও অদ্ভুত—অদ্ভুত সুন্দর। আসছি সে কথায়, দ্রৌপদী তাঁর প্রিয়তম অর্জুনের একান্ত ভালবাসা পাননি, ভীমসেন আজ্ঞাবহ—দ্রৌপদীর প্রেমে তিনি বিকিয়েই আছেন, যুধিষ্ঠির বৈচিত্র্যহীন—নিত্য সাহচর্যের দৈনন্দিনতায় স্বামীত্বের অভ্যাসমাত্র, আর বলাই বাহুল্য, দ্রৌপদীর প্রেমের ক্ষেত্রে নকুল-সহদেব বড় বেশি বিবেচ্য নন।

তাহলে দ্রৌপদী কী পেলেন ? তিনি প্রিয়তম অর্জুনের প্রত্যক্ষ ভালবাসা পাননি, পঞ্চস্বামীর অসম রসবোধ তাঁকে ভাগ করে নিতে হয়েছে, তাঁদের সারাজীবনের কষ্টের ভাগের সঙ্গে। বদলে তিনি পেয়েছেন শুধু সম্মান, ক্ষাত্র-রমণীর সম্মান, বীরপত্নীর সম্মান, শত্রুকুলের সর্বনাশের সম্মান। এমনকী যখন তাঁর প্রিয় পুত্রগুলিও মারা গেছে, তখনও তাঁর কোনও বৈরাগ্য কিংবা নির্বেদ আসেনি ; তখনও তিনি পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার প্রাণ চেয়েছেন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহায় তিনি সটান উপস্থিত হয়েছেন পাণ্ডব-শিবিরে যুধিষ্ঠিরের কাছে। হস্তিনাপুরের ভাবী মহারাজের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী তাঁর বাক্যশূল প্রয়োগ করলেন সমস্ত স্বামীদের হৃদয়েই—প্রতিশোধ-স্পৃহায়।

তবে হ্যাঁ এখানেও, এই যুদ্ধপর্বের শেষ মুহূর্তেও একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। ঝড়ে-পড়া কলাগাছের মতো দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সামনে এসেই—ন্যপতৎ ভুবি—মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তাঁর মুখটি শোকে কালিমাখা। অন্য কোনও কবি হলে দ্রৌপদীর মুখের উপমা দিতেন রাহুগ্রস্ত চাঁদের সঙ্গে। কিন্তু ব্যাস বললেন—তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্—অর্থাৎ তাঁর মুখখানি অন্ধকারে ঢাকা সূর্যের মতো। সূর্য ছাড়া এই ভাস্বর মুখের তুলনা হয় না। দ্রৌপদী পড়েই গিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীম একলাফে তাঁকে ধরে নিলেন বাহুর বন্ধনে—বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ। কথঞ্চিৎ শান্ত হবার পর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ ! সমস্ত ছেলেগুলোকে কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করে বেশ তো রাজ্য-ভোগ করবেন মনে হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়ে

আজকে সুভদ্রার ছেলেটাকে ভুলে গেলেন কী করে—অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিষ্যসি ! আপনি আজই যদি ওই পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামার জীবন না নিতে পারেন, তা হলে আমি উপোস করে মরব।

যুধিষ্ঠির স্বভাবতই মিন-মিন করা আরম্ভ করলেন। দ্রৌপদী বললেন—ওকে প্রাণে মারা না গেলেও ওর মাথার সহজাত মণিটি আমায় এনে দিতে হবে। দ্রৌপদী বুঝলেন—এরা কেউ এগোবে না, তিনি সোজা তাঁর বশংবদ ভীমসেনকে ধরলেন এবং যথারীতি ভীম চললেনও। কাজটা সহজ ছিল না। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে পাঠালেন, নিজেও গেলেন। অশ্বত্থামার সমস্ত সম্মানের প্রতীক, মণি আদায় হল এবং শুধুমাত্র নিজের জেদে সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় ঝুলিয়ে শান্তি পেলেন কৃষ্ণা। তাঁর এই জেদের সাক্ষী মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কিন্তু মণিটি দেবার সময় কতগুলি কথা বলেছিলেন এবং তাঁর বাক্যশেষের ব্যঞ্জনাটি ছিল—তাও কি তুমি খুশি হওনি ? আর কী চাই ? ভীম বলেছিলেন এই নাও তোমার মণি—অয়ং ভদ্রে তব মণিঃ—পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা পরাজিত। তোমার কি মনে পড়ে দ্রৌপদী ! সেই যখন শান্তির দূত হয়ে কৃষ্ণ যাচ্ছিলেন কৌরবসভায় আর তুমি বলেছিলে—যুধিষ্ঠির আজ যেভাবে শান্তির কথা বলছেন, তাতে বুঝি আমার স্বামীরা বেঁচে নেই, আমার ছেলে নেই, ভাই নেই, এমনকী তুমিও নেই। দ্রৌপদী ! তুমি সেদিন বড় কঠিন কথা বলেছিলে কৃষ্ণকে। মনে রেখ কৃষ্ণকে আমরা পুরুষোত্তম বলে মানি। সেই তাঁকে তুমি কী ভাষাতেই না অপবাদ দিয়েছিলে—উক্তবত্যসি তীব্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমে। হতে পারে—সেসব কথা ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুরূপ। কিন্তু আজ দেখ—দুর্যোধন মৃত, আমি কথা রেখেছি। দুঃশাসনের রুধির পান করেছি। আমি কথা রেখেছি। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সমস্ত যশের নিদান এই মণিও তোমাকে এনে দিলাম।

ভীম এইখানে কথা শেষ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস—এই বাক্যের অবশেষ দ্রৌপদীকে বলা যায় না। বলা গেলে শেষ কথা ছিল—আর কী চাও ? এবার অন্তত যুদ্ধ বন্ধ হোক। ভীম বলেছেন—দ্রৌপদীর কথা নাকি ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুরূপ, আমি বলি—আজীবন দ্রৌপদীর ব্যবহার প্রায় পুরুষ-ক্ষত্রিয়ের মতো। তিনি যতখানি রমণী তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষত্রিয়া কিংবা ক্ষত্রিয়াণী। তিনি যতখানি প্রেমিকা, তার চেয়ে পাঁচ স্বামীর জীবনে অনেক বড় ঝটিকা। পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্যহরণে কিংবা ধন-রত্নহরণে তত দুঃখ পাননি, যতখানি পেয়েছেন অপমানিতা কৃষ্ণার বিদ্যুৎসঞ্চারী কটাক্ষে—হৃতেন রাজ্যেন তথা ধনেন রত্নৈশ্চ মুখ্যৈ র্ন তথা বভূব। যথা ত্রপাকোপ-সমীরিতেন কৃষ্ণাকটাক্ষেণ বভূব দুঃখম্ ॥

সুন্দরী কৃষ্ণার ক্রোধ-কটাক্ষে শুধু ন্যুব্জ নন তাঁর বীর পঞ্চস্বামী, স্বামীর বাইরেও তাঁর এই কটাক্ষের ভক্ত ছিল অগুণতি। কেউ বা প্রতিকূলে থেকে সেই কটাক্ষ হজম করতে পারেননি এবং সারাজীবন তাঁর অপমান সাধনের চেষ্টা করে, অবশেষে মরেছেন—যেমন কর্ণ। আর কেউ অনুকূলে থেকে দূর থেকে সেই কটাক্ষের রস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন, কিন্তু বেণী ভেজাননি—তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক কী ছিল আমি সে আলোচনায় বিশেষ যাইনি, সে আলোচনার পরিসরও এটা নয়। তবে কৃষ্ণ যে কৃষ্ণার চিরকালের 'অ্যাড্‌মায়ারার' সে-কথা বোধ করি মহাভারতের উদার পাঠককে বলে দিতে হবে না। পাঁচ পাঁচটি স্বামী-কূপের বাইরেও দ্রৌপদীর আরও একটি নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা ছিল এবং সে-যুগে যা প্রায় অভাবনীয়, কৃষ্ণ ছিলেন দ্রৌপদীর তাই—'বয়ফ্রেন্ড'। ইংরেজি কথাটা কৃষ্ণ-কৃষ্ণার সম্পর্ক-ব্যাখ্যায় বড্ড অগভীর, কিন্তু এর থেকে গভীর শব্দ প্রয়োগ করতে গেলে কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণার ওপর যে ধরনের ভালবাসার দায় এসে পড়বে তাতেও স্বস্তি পাওয়া মুশকিল। তার থেকে বলি বন্ধু—কৃষ্ণস্য দয়িতা সখী। সংস্কৃতে 'সখা' শব্দটির মধ্যে সমপ্রাণতার মাহাত্ম্য মেশানো আছে, কিন্তু সে সমপ্রাণতা তো হয় পুরুষে পুরুষে, নয়তো মেয়েতে মেয়েতে। কিন্তু পুরুষ মানুষের মেয়ে বন্ধু—কৃষ্ণস্য দয়িতা সখী—তাও সেকালে—ভাবা যায় !

নইলে পঞ্চস্বামীর অতিরিক্তে দ্রৌপদী বারবার অভিমান করে বলেছেন—এমনকী তুমিও—এমন

নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা ক'জনের থাকে। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে প্রথম দেখেছিলেন পাঞ্চালের স্বয়ম্বর সভায়। না, না, আমি গজেন্দ্রকুমারের পাঞ্চজন্য ফেঁদে বসছি না। সে ক্ষমতাও আমার নেই এবং মহাভারতের প্রমাণে আমার পক্ষে তা প্রমাণ করাও মুশকিল ! তবে বলতে পারি—কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণা কেউই তাঁদের পারস্পরিক ব্যবহারে সীমা অতিক্রম করেননি কোনওদিন। এমনকী আজকের দিনের স্বচ্ছ-দৃষ্টিতেও দুই যুবক যুবতীকে শুধুমাত্র বন্ধু ভাবা যায় না বলেই উপন্যাসের রাস্তা প্রশস্ত হয়। কিন্তু মহাভারতের প্রমাণে তাঁরা কিন্তু শুধুই বন্ধু, প্রাণের বন্ধু এবং এইমাত্র, এর বেশি নয়। পাণ্ডবেরা বনবাসে আসার পর কৃষ্ণ যেদিন সদলবলে বনেই এসে উপস্থিত হলেন সেদিন দ্রৌপদী কৃষ্ণের সামনে তাঁর কমলকলিকার মতো হাত-দুটি দিয়ে মুখ ঢেকে অনেক কেঁদেছিলেন। তাঁর সমস্ত অপমানের কথা সবিস্তারে শুনিয়ে সেই একই কথা বলেছিলেন—আমার যেন স্বামী-পুত্র, ভাই-বন্ধু কেউ নেই—এমনকী তুমিও নেই—নৈব ত্বং মধুসূদন। আমি একটুও ভুলতে পারছি না, যাকে আমি সূতপুত্র বলে রাজসভায় লক্ষ্যবেধের যোগ্যতা দিইনি, সেই কর্ণও আমাকে দেখে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছিল—কর্ণো যৎ প্রাহসৎ তদা।

দ্রুপদের রাজসভায় যেদিন প্রথম কৃষ্ণা-পাঞ্চালীকে দেখেছিলেন কৃষ্ণ, সেদিন তিনি ছিলেন পতিম্বরা বধূটি—আপ্লুতাঙ্গী সুবসনা সর্বাভরণভূষিতা। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, কৃষ্ণ সেই স্বয়ম্বর-সভায় নতুন একটি বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাননি। কেননা সেই বারণাবতে জতুগৃহদাহের খবর শুনে সাত্যকিকে নিয়ে কৃষ্ণের অল্প-স্বল্প গোয়েন্দাগিরির কথা আমি আগেই জানিয়েছি। স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ হল। সমবেত রাজাদের আক্রমণ প্রতিহত করে দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম-অর্জুন ফিরলেন কুমোরপাড়ার বাড়িতে। আর তার পিছন পিছন এলেন কৃষ্ণ এবং বলরাম। সেদিন নববধূ কৃষ্ণাকে একটি সম্বোধনও করেননি কৃষ্ণ। কারণ যুধিষ্ঠির, ভীম ইত্যাদি পিসতুতো ভাইদের সঙ্গেও সেই তাঁর প্রথম পরিচয়।

পরিচয়টা কিন্তু বাড়ল দ্রৌপদীর বিয়ের উপলক্ষেই। হস্তিনাপুরে পাণ্ডবরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ পাঞ্চালেই ছিলেন। দ্রুপদ স্বয়ং এবং হস্তিনাপুর থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসা বিদুর দুজনেই কৃষ্ণের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। ফলত বিয়ের পর-পর কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগাযোগ আরও বেড়ে গেল। পাণ্ডবরা রাজ্য পেলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। ঘন-ঘন যাতায়াতে সমবয়সী অর্জুনের সঙ্গেও কৃষ্ণের যেমন বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে, হয়তো দ্রৌপদীর সঙ্গেও সেইভাবে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অর্জুন বনবাস থেকে ফিরে আসার পর কৃষ্ণ-অর্জুন তথা সুভদ্রা-দ্রৌপদীকে আমরা যমুনা-বিহারে একান্তে দেখেছি। কিন্তু আগেই বলেছি—সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েতে দ্রৌপদীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল সাভিমান পরুষ-বাক্য। কৃষ্ণের ওপর দ্রৌপদী যে সেই মুহূর্তে খুশি হননি তা বোঝা যায় তাঁর বাচনভঙ্গিতে। তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি সেই চুলোতেই যাও, যেখানে আছে সেই সাত্বত-বৃষ্ণিকুলের পরমা মহিলাটি—সুভদ্রা।

কৃষ্ণ সাত্বত-কুলেরই গৌরবময় পুরুষ। অর্জুন তাঁর ভাই এবং বন্ধু। দ্রৌপদী অর্জুনের পরম-প্রণয়িনী জেনেও কৃষ্ণ তাঁর দাদা বলরাম এবং অন্যান্য বৃষ্ণি-বীরদের আপত্তি সত্ত্বেও সুভদ্রাকে প্রায় স্বমতেই অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। সামান্যতম হলেও দ্রৌপদীর প্রিয়তম স্বামী অর্জুনের সম্বন্ধে কৃষ্ণের একটু ঈর্ষা ছিল কি না কে জানে ? অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হন এটা অন্তরের অন্তরে চাননি বলেই কি কৃষ্ণ সুভদ্রার ব্যাপারে অর্জুনকে এত সাহায্য করেছিলেন ? কে জানে চতুর চূড়ামণির অন্তরে কী ছিল ? মহাভারতের কবিকে ধন্যবাদ তিনি দ্বারকাবাসী সেই ধুরন্ধর পুরুষের নাম কৃষ্ণ, এবং দ্রৌপদীর নাম কৃষ্ণা রেখেই বুঝেছিলেন ব্যাকরণগতভাবে সম্পর্কটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তিনি আর বাড়তে দেননি। তবে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দেওয়ার মতো সামান্যতম ক্ষতি করেই বুঝি কৃষ্ণ অর্জুন এবং এমনকী দ্রৌপদীরও পরম বন্ধু হয়ে গেছেন। সুভদ্রাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কৃষ্ণ যেদিন দ্বারকায় ফিরে যাবার দিন ঠিক করলেন, সেদিন দ্রৌপদীকে রীতিমত সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। যেদিন থেকে কৃষ্ণের সান্ত্বনায় দ্রৌপদী সুখ পেতে আরম্ভ করলেন, সেদিন থেকেই বোঝা যায়—তিনি মনে-মনে অর্জুনকে একটু

একটু করে হারিয়েছেন, আর নিজের অজান্তেই দ্বারকার ওই প্রবাদ-পুরুষটির কাছাকাছি চলে এসেছেন, বাঁধা পড়েছেন সম-প্রাণতার বন্ধনে—বন্ধুত্বের বন্ধনে।

এই বন্ধুত্ব এতটাই যে, যুধিষ্ঠির, ভীম এমনকী অর্জুনও কৃষ্ণকে যতটুকু সম্মান করে কথা বলতেন, দ্রৌপদী তা বলতেন না। শাল্বরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণ কুরুসভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু সেদিন সেই চরম অপমানের মধ্যে দ্রৌপদী স্বামীদের সুরক্ষায় বঞ্চিত হয়ে এই সমপ্রাণ বন্ধুর জন্যই ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন—কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ। ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী। তারপর যেদিন বনবাসে কৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর দেখা হল, যুধিষ্ঠির অর্জুনের কথা যেই থামল, অমনই দ্রৌপদী অভিমান ভরে দেবল, নারদ আর পরশুরামের জবানীতে 'ভগবান' বলে গালাগালি দিলেন কৃষ্ণকে। বললেন—সবাই তোমাকে ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রাণিজগতের একান্ত গতি বলে বর্ণনা করেন, কিন্তু এমন বিরাট, সনাতন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সখী হয়ে, পাণ্ডবদের বউ হয়ে, ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন হয়ে আমাকে একবস্ত্রা রজস্বলা অবস্থায় কৌরব-সভায় দাঁড়াতে হল কেন? কেন আমার চুলের মুঠি গেল দুঃশাসনের হাতের মুঠোয়?

কৃষ্ণ কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। দ্রৌপদী বলেছিলেন—জান কৃষ্ণ! ওরা আমাকে দাসীভাবে ভোগ করতে চেয়েছিল, অথচ তবু তোমরা সব বেঁচেছিলে। অভিমানের শেষ কল্পে দ্রৌপদী নিজেকে এমন এক করুণ ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, যেখানে তাঁর শেষ কথা—আসলে আমার কেউ নেই—স্বামীরা নেই, ছেলেরা নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, বাপ-ভাই নেই, এমনকী তুমিও আমার নও কৃষ্ণ—নৈব ত্বং মধুসূদন। এই যে এত নেই-নেই, তার মধ্যে বিদগ্ধা রমণীর মুখে—এমনকী তুমিও নেই—নৈব ত্বং—এই 'তুমিও' শব্দটা যেন সবার থেকে আলাদা। যেন, তেমন দিনে ওঁরা অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-পুত্তুর বাপ-ভাইও আমায় না দেখতে পারে, কিন্তু তুমি—চিরজনমের সখা হে! কৃষ্ণের মাত্রাটা সবার থেকে যেন আলাদা।

বনপর্বে, উদ্যোগপর্বে এমনকী যুদ্ধ শেষের দিন পর্যন্ত ওই একই কথাই বলেছেন দ্রৌপদী। কৃষ্ণ কেবলই সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন, কেননা যুদ্ধের রাজনীতিতে পরপক্ষকে শাস্তি দিতে সময় লাগে। কিন্তু পাঞ্চালী কৃষ্ণার করুণ-কালো জল-ভরা চোখের কথা কৃষ্ণ ভোলেননি। দর্শনের দৃষ্টিতে যত নির্লিপ্ত পুরুষই তিনি হন অথবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নাই করুন কোনও সশস্ত্র যুদ্ধ, ভারত-যুদ্ধের সুতোটা যদি তাঁর হাতেই ধরা থেকে থাকে—কেননা তিনি, মহাভারত-সূত্রধারঃ—তা হলে কুরু-পাণ্ডবের পুতুলনাচে পাঞ্চালী-কৃষ্ণাই ছিলেন তাঁর প্রধান নটী। জননী গান্ধারী ভারত-যুদ্ধের সমস্ত দায় কৃষ্ণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, এবং সে দায় তিনি বহন করতেও দ্বিধা করেননি। বাহ্যত এই যুদ্ধের কারণের মধ্যে যত রাজনীতির কথা থাকুক, যতই থাক জ্ঞাতি-বঞ্চনা অথবা দুর্যোধনের অহংকার, কৃষ্ণ কিন্তু দ্রৌপদীর চুলের কথা ভোলেননি—সেই সর্পকুটিল, কুঞ্চিত, কেশদাম—মহাভুজগবর্চ্চসম্।

উদ্যোগপর্বে মহামতি সঞ্জয় যখন বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য শোনাতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সবার কথার শেষে কৃষ্ণ যে-ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে, সেই ভাষাটা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের পক্ষে নাকি ছিল 'ত্রাসনী' অর্থাৎ লাস্ট ওয়ার্নিং-এর মতো। ভাষার মধ্যে প্রাথমিক মৃদুতা ছিল বটে কিন্তু সেই মৃদুতার মধ্যে ছিল নিদারুণ পরিণতির সতর্কবাণী—ত্রাসনীং ধার্তরাষ্ট্রাণাং মৃদুপূর্বাং সুদারুণাম্।

কৃষ্ণের এই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা বলার পরিমণ্ডলটাও একটু বলতে হবে। মনে রাখা দরকার—এই পরিমণ্ডল বর্ণনায় আমার একটু ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে। যাঁরা কৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাসী, তাঁরা যেন এই রাজোচিত পরিমণ্ডল-বর্ণনায় আহত না হন। সঞ্জয় এসেছেন অর্জুনের সঙ্গে কথা বলতে। অর্জুন তখন অন্তঃপুরের শিথিল পরিবেশে বসে আছেন এবং কৃষ্ণও রয়েছেন সেখানেই। আর আছেন দ্রৌপদী এবং সত্যভামা। কিঞ্চিৎ মদ্যপান করার ফলে এই দুই মহাত্মার মন এবং বুদ্ধি—দুইই একটু টান টান হয়ে আছে। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং অন্তঃপুরের শৈথিল্যে কৃষ্ণ তাঁর চেয়ার থেকেই দুই পা বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্জুনের কোলে। আর অর্জুন তাঁর এক পা রেখেছেন নিজের স্ত্রী দ্রৌপদীর কোলে এবং অন্যটি রেখেছেন কৃষ্ণের প্রিয়া পত্নী সত্যভামার কোলে—অর্জুনস্য

চ কৃষ্ণায়াং সত্যায়াঞ্চ মহাত্মনঃ ।

একথা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, কৃষ্ণ এবং অর্জুন মদের ঘোরে ব্যক্তিগত ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বরঞ্চ এই মানুষগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং হৃদয়ের নৈকট্য এতই বেশি ছিল যে কৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামার কোলে অর্জুনের পা রাখা দেখে যেমন আমরা আশ্চর্য হচ্ছি না, তেমনই আশ্চর্য হতাম না যদি দ্রৌপদীর কোলে কৃষ্ণের পা-দুটি দেখতাম। তার ওপরে অন্তঃপুরের শিথিলতা তো আছেই। অর্জুন, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, সত্যভামার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, দ্বৈপায়ন ব্যাস মন্তব্য করেছেন—এঁরা ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকলে অভিমন্যু বা নকুল-সহদেবও সেখানে যেতেন না। ঠিক এইরকম একটা অন্তঃপুরের পরিবেশে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যকর্মের তাগিদে অর্জুনের কাছে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সঞ্জয় তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলে অর্জুন নিজে কথা না বলে, কৃষ্ণকেই বলবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

কৃষ্ণ বললেন। কোনও বড় বড় রাজনৈতিক কথা নয়, কোনও বিশাল দর্শনের কথা নয়, এমনকী কোন মহৎ ধর্মের কথাও নয়। কৃষ্ণ বললেন—যুধিষ্ঠিরের একটু তাড়া আছে সঞ্জয়! ভীষ্ম দ্রোণকে সাক্ষী রেখে তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বোলো—ভাল করে যজ্ঞ-টজ্ঞ করে নিন, ছেলে-পিলে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে যা আনন্দ করার, তাও করে নিন। সামনে বড় ভয় আসছে—মহদ্ বো ভয়ামাগতম্। কেন জান, সঞ্জয়! কৃষ্ণ বলে চললেন—দ্রৌপদীর কাছে আমার ঋণ বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর সেই কথাটা আমার মন থেকে এক পলের জন্যেও দূরে সরে যাচ্ছে না। আমি দূরে ছিলাম, আর সেই কুরুসভায় সমস্ত রাজন্যবর্গের চোখের সামনে অপমানিতা হতে হতে আমাকে কতই না কেঁদে কেঁদে ডেকেছিল দ্রৌপদী। এই কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দিন চলে গেছে অনেক, তাই দ্রৌপদীর কাছে ঋণও আমার বেড়েই চলেছে—ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।

কৃষ্ণ আরও অনেক কথা বলেছিলেন, যার অর্থ একটাই—সামনে বড় ভয় আসছে তোমাদের—মহদ্ বো ভয়মাগতম্। যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব চলছে, সেই মুহূর্তে কৃষ্ণের মুখে দ্রৌপদীর জন্য এই পরম আর্তি কৃষ্ণা পাঞ্চালীর হৃদয়ে অন্য এক বিশিষ্ট অনুভূতি তৈরি করেছিল নিশ্চয়ই। পঞ্চস্বামীকে নস্যাৎ করে দিয়েও ষষ্ঠ যে পুরুষটিকে তিনি আলাদা করে চিহ্নিত করেছিলেন—এমন কী তুমিও নও, কৃষ্ণ!—সেই মানুষটি যখন তাঁর সামনেই শত্রুপক্ষকে বলেন—আর দেরি নয়, আমাকে পাঞ্চালী-কৃষ্ণার ঋণ চুকোতে হবে, সেদিন নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর মনে হয়—পঞ্চস্বামীর বাইরেও আরও এক অন্যতম সম্বন্ধ আছে তাঁর—তাঁর বন্ধু, চিরজনমের সখা হে।

এই সখার অধিকার এতটাই যে, যুধিষ্ঠির-ভীম অথবা অর্জুনও কৃষ্ণের সঙ্গে যে মর্যাদায় কথা বলেন, সেই মর্যাদা সমপ্রাণতার মাহাত্ম্যে স্তব্ধ করে দিয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সাভিমানে বলতে পারেন—আমি তোমাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি কৃষ্ণ! অন্তত চারটে কারণ আছে যাতে তুমি নিয়ত আমাকে রক্ষা করতে বাধ্য—চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ। এক, 'সম্বন্ধাৎ' অর্থাৎ কিনা আমি তোমার আপন পিসির ছেলের বউ। দুই, 'গৌরবাৎ'—আমাকে কি তুমি খুব কম ভাব, যজ্ঞের আগুন থেকে আমার জন্ম অতএব ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা যেমন গার্হপত্য অগ্নি রক্ষা করে, সেই গৌরবে আমারও রক্ষা হওয়া উচিত। তিন, 'সখ্যাৎ'—সব চাইতে বড়, পাণ্ডববধূর সম্বন্ধ গৌরব ছাড়াও তোমার সঙ্গে আমার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে—তুমি আমার বন্ধু। দ্রৌপদী মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠকে চিনতেন না। চিনলে বলতেন—তুমি বোকার মতো 'সখ্যে'র অর্থ বানিয়েছ ভক্তিমতী। আমি কোনওদিনই কৃষ্ণের ভক্ত নই, আমি তাঁর বন্ধু। দ্রৌপদী বলেছেন—আমি পাণ্ডবদের বউ বটে—'ভার্যা পার্থানাং', কিন্তু আরও আছে অর্ধেক আকাশ—আমি যে তোমার বন্ধু—তব কৃষ্ণ সখী বিভো। চতুর্থ কারণ হিসেবে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলেছেন—সবার ওপরে তোমার ক্ষমতা আছে, সামর্থ্য আছে। তাই আমি তোমার ওপর নির্ভর করি—সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব। কৃষ্ণ এই কথাগুলি ভোলেননি। সম্বন্ধ, গৌরব, সখ্য এবং প্রভুত্ব—এই সবগুলিই তাঁকে দ্রৌপদীর কাছে উত্তরোত্তর ঋণীই করেছে, যে-ঋণ চুকানোর জন্য দ্রৌপদীর সামনেই তিনি সে-কথা অঙ্গীকার করেছেন।

দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক এই চার দেওয়ালের বাইরে যায়নি। যখনই মনে হয়েছে স্ত্রী হিসাবে তিনি সুবিচার পাচ্ছেন না, তখনি বন্ধুর কাছে তিনি সাভিমানে মুক্তশ্বাস হয়েছেন। আলগা করে দিয়েছেন তাঁর নিজের মনের গুরুভার। পরিবর্তে কৃষ্ণের কাছে পেয়েছেন সেই আশ্বাস যা তিনি চান। সেই সমপ্রাণতা, যা তাঁর স্বামীরাও তাঁকে দিতে পারেননি। দ্রৌপদীর মনের কথা দ্রৌপদীর মতো করেই যদি কেউ বুঝে থাকেন, তো সে কৃষ্ণ, তাঁর স্বামীরা নন। দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক এইটুকুই—ভাই, 'মনের কথা', 'তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী'।

কর্ণ

মহাভারতের বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখানে সেখানে স্তূপীকৃত মরদেহ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে এখন মরা পোড়ানো হচ্ছে। রীতি অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তির মরদেহগুলির কাছেই লোকজন দিয়ে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি, চন্দন-কাঠ, অগুরু, ঘি—এসব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর শবটি তুলে দেওয়া হচ্ছে চিতায়। যুদ্ধজয়ী যুধিষ্ঠির বিদুরকে, সঞ্জয়কে দুর্যোধনের পুরোহিত সুধর্মাকে এবং ধৌম্য পুরোহিতকে গোটা দাহপর্বটা তদারকি করতে বলেছেন। তিনি বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে যে সব নাম না-জানা সৈনিক মারা গেছেন, যে সব বীর মারা গেছেন, যাঁদের গোত্র-প্রবর কিছু জানা নেই—বেওয়ারিশ লোকের মতো তাঁদের মরদেহগুলি যেন শেয়ালে-শকুনে নষ্ট না করে—যথা চানাথবৎ কিঞ্চিচ্ছরীরং ন বিনশ্যতি।

বিদুর, সঞ্জয়—এঁরা একা একা কত করবেন ? ইন্দ্রসেন এবং আরও সব কাজের লোকেরা সাধারণ সৈনিকদের এক এক জায়গায় একসঙ্গে ডাঁই করে রাখছিল। এদের প্রায় কাউকেই চেনা যায় না। তবে ছোট-বড় রাজাদের যাতে অন্তত চেনা যায়, সে জন্য যুদ্ধিষ্ঠির বুদ্ধি করে সারথিদের কাজে লাগিয়েছিলেন—ভৃত্যান্ সূতান্ চ সর্বশঃ। প্রথমে অবশ্য কুরুযুদ্ধের বড় বড় নায়কদের চিতায় তোলা হল। প্রথমে দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইদের। তারপর একে একে শল্য, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, বিরাটরাজ, দ্রুপদ—এঁদের সবাইকে দাহ করা হল। দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলে, কর্ণের ছেলে, ঘটোৎকচ, কর্ণ স্বয়ং, শিখণ্ডী, শকুনি, ধৃষ্টদ্যুম্ন—এঁদের প্রত্যেককে যথোচিত সম্মানে আলাদা করে চিতায় তোলা হল। আর বিভিন্ন রাজার সারথিরা, ভৃত্যেরা যে সমস্ত রাজাদের চিনিয়ে দিতে পেরেছিল, তাঁদেরও ঘৃতধারায় লিপ্ত করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে চলছিল গণদাহ—রাশীকৃত, সহস্রশঃ। যাদের চেনা যায় না, বিদেশি সৈনিক—তাদের সব এক জায়গায় ডাঁই করে, একটু বেশি বেশি ঘি ঢেলে—প্রভূতৈঃ স্নেহপাচিতৈঃ— -পুড়িয়ে দেওয়া হল।

পাণ্ডব-কৌরবদের সমস্ত কাজের লোক এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল মানুষদের কাজে লাগিয়েও এই দাহ-কর্ম সারতে দিন বয়ে রাত্রি এসে গেল। মরদেহগুলি চিতায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে সুধর্মা আর ধৌম্য পুরোহিতের ঋক-মন্ত্র, সামগান ভেসে আসতে থাকে বাতাসে আর পরক্ষণেই মন্ত্র-গান আবিল হয়ে ওঠে স্বামীহারা, পুত্রহারা স্ত্রীলোকের চিৎকারে—সাম্নাম্ ঋচাঞ্চ নাদেন স্ত্রীণাঞ্চ রুদিতস্বনৈঃ। ব্যাস লিখেছেন—দিকে দিকে চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে, দীপ্ত অগ্নির শিখায় সামনে থেকে একটুও ধোঁয়া চোখে পড়ে না যেন। কিন্তু হালকা একটা ধোঁয়া আশেপাশে, ওপর দিকে উঠছেই। এই হালকা ধোঁয়ার আস্তরে বীর যুদ্ধনায়কদের মৃতদেহগুলি দেখাচ্ছে যেন পাতলা মেঘের আড়ালে গ্রহতারার মত—নভসীবাম্বদৃশ্যন্ত গ্রহাস্তন্বভ্রসংযুতাঃ। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশে তারা ফুটেছে, কুরুক্ষেত্রের তারকারাও স্মৃতির মতো জ্বলছেন জীবিত জনের মনের আকাশে ; আজ যে যুদ্ধবীরেরা কাছে থেকেও অনেক দূরে। সবাই যে গ্রহ-তারা হয়ে গেছেন।

দাহকার্য শেষ হয়ে গেলে যুধিষ্ঠির কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে চলে এলেন পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীর তীরে। তাঁর সঙ্গে আছেন কুরু এবং পাণ্ডব কুলের সমস্ত রমণীরা। গঙ্গায় এসে সবাই নিজের নিজের ভূষণ, উত্তরীয়বসন, উষ্ণীষ, কটিবন্ধ—সব নামিয়ে রাখলেন। পুরুষ এবং রমণীরা সবাই এবার প্রেত পুরুষের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরে জল-তর্পণ শুরু করলেন। কারও বাবা মারা গেছেন, কারও ভাই, কারও স্বামী, কারও বা পুত্র। কুরুস্ত্রীদের হাহাকার বিলাপে গঙ্গার তীর একেবারে একই সঙ্গে কোলাহল এবং নিরানন্দে দীর্ণ হয়ে উঠেছে—বীরপত্নীভিরাকীর্ণং নিরানন্দম্ অনুৎসবম্। বেশির ভাগই কুরুবংশের বউ। তাঁরা একে একে গঙ্গায় নেমে যাচ্ছিলেন। তাঁদের চোখে জল, হাতের অঞ্জলিতে তর্পণের জল, সামনে পাপহারী গঙ্গার জল, আর অন্তরে দুঃখের প্রবাহ। সবাই তর্পণ করছেন—উদকং চক্রিরে সর্বা রুদত্যো ভৃশদুঃখিতাঃ।

এই বিশাল কুরুকুলের বিবাহিতা রমণীদের মধ্যে অন্তত তিনজনের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন কুন্তী, পাণ্ডবজননী কুন্তী। একটু আগে দাহপর্বের পূর্বে এই তিন রমণীকে তিনি একটি বিশেষ মরদেহের পাশে আছাড়ি-পাছাড়ি করে কাঁদতে দেখেছেন। এঁদের স্বামীও মারা গেছেন, পুত্রও মারা গেছে। এবারে কুরুকামিনীদের পেছন পেছন এই তিন রমণীকে গঙ্গায় নামতে দেখে আর থাকতে পারলেন না কুন্তী। হঠাৎ করে—কারণ, কথাটা যখন বলতেই হবে, তখন হঠাৎ করেই বলতে হবে—অতএব হঠাৎই কুন্তী তাঁর পাঁচ ছেলে এবং বিশেষত যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যাকুল স্বরে বললেন—বাছারা! সেই যে, সেই মহাবীর, হাজারো রথী-মহারথীর বাড়া মহাবীর—অর্জুন যাকে যুদ্ধে মেরে ফেলল. তার জন্যে গঙ্গায় একটু জল দে তোরা—কুরুধ্বম্ উদকং তস্য,—সে তোদের বড় ভাই। যাকে তোরা এতকাল সারথির ছেলে, সূতপুত্র বলে জানতিস, রাধেয় বলে জানতিস, অথচ সমস্ত সৈন্য-সামন্তের ভিড়েও যাকে সূর্যের মতো তেজস্বী বলে মনে হত—তার জন্যে একটু জল দে তোরা, সে তোদের বড় ভাই। যে তোদের সবার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, দুর্যোধনের যুদ্ধ-নায়কদের মধ্যে যে সব সময় জ্বলজ্বল করত, যার মতো বীর বোধহয় পৃথিবীতে কেউ ছিল না, যে নাকি নিজের প্রাণের চেয়েও যশকে বড় বলে মনে করত, যুদ্ধে যে পালাতে জানে না—সেই কর্ণের জন্য গঙ্গায় এক অঞ্জলি জল দে তোরা, সে তোদের বড় ভাই—কুরুধ্বম্ উদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণঃ। দেবদেব ভাস্করের ঔরসে আমারই গর্ভে সে তোদের আগে জন্মেছিল, সহজাত কবচ কুণ্ডল নিয়ে সূর্যিপানা ছেলেটা আমারই গর্ভে জন্মেছিল—তোরা জন্মানোর অনেক আগে—স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করাম্ময্যজায়ত।

পাণ্ডবরা তাঁদের ঘটনাবহুল জীবনে বহুবার চমকে গেছেন। বারণাবতে জতুগৃহের কৌশলে চমকেছিলেন, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের আকস্মিকতায় চমকেছিলেন, অরণ্যবাসের সময় দুর্বাসা মুনিকে দেখে চমকেছিলেন, বিরাটপর্বে দুর্যোধনের হঠাৎ আক্রমণেও চমকেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কুন্তী যা বললেন, এর জন্য কোনও পাণ্ডবই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। মায়ের যে কথা এক সময়ে তাঁদের চরম সুখ দিতে পারত, সেই কর্ণের কথা শুনে পাণ্ডবেরা যেন আকুল হয়ে পড়লেন। যে যুধিষ্ঠির সারা যুদ্ধপর্বেও স্থির থেকে গেলেন, তাঁরও চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, আক্রোশে তাঁর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল সাপের মত—নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ। ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির মাকে বললেন—সেই বিরাট মানুষটি, যাঁর শরাঘাত একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কেউ সইতে পারত না, যাঁর প্রতাপে আমরা সব সময় ত্রস্ত ছিলাম, সেই তোমার দেবপ্রতিম পুত্রকে এতকাল আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলে কেমন করে? তুমি যেন তোমার কাপড়ের আঁচল দিয়ে আগুন ঢেকে রাখতে চেয়েছ—তমগ্নিমিব বস্ত্রেণ কথং ছাদিতবত্যসি। তাই কি হয়, সে আগুন তোমার লজ্জাবস্ত্র ফুটো করে এখন আমাদেরই পোড়াচ্ছে। যুধিষ্ঠির বললেন—আমরা যেমন অর্জুনের বাহুবল আশ্রয় করেছি, তেমনি সমস্ত কুরুকুল আশ্রয় নিয়েছিল কর্ণের বাহুছত্রের অন্তরালে। সমস্ত রাজাদের মধ্যে, সমস্ত শক্তিমান বীরদের মধ্যে যার নাম একমাত্র অর্জুনের সঙ্গে করতে হয়, সে নাকি আমাদের বড় ভাই, সে নাকি তোমার প্রথম ছেলে? ওহ্! এমন করেও কথা চেপে রাখতে পার তুমি! তোমার মন্ত্রগুপ্তির জন্য আজ যে সবাই আমরা মরলাম—অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গ্রহণেন বয়ং হতাঃ।

যুধিষ্ঠির মনে সত্যিই দুঃখ পেয়েছেন। যে কর্ণের শক্তিসামর্থ্য পাণ্ডবরা শ্রদ্ধা করতেন মনে মনে এবং শক্তি আছে বলেই যাঁর কথাগুলি বেশি করে মনে লাগত, সেই কর্ণ তাঁদের ভাই! এই আবিষ্কারের আকস্মিকতা এতটাই যে, কর্ণ পাণ্ডবদের দলে থাকলে কতটা সুবিধে হত তাঁদের, তারও একটা ছোট্ট অঙ্ক কষে নিয়েছেন যুধিষ্ঠির। তিনি বলেছেন—কর্ণ পাশে থাকলে কোনও জিনিস পাণ্ডবদের না-পাওয়া থাকত না, চাই কি সে জিনিস স্বর্গেই থাকুক না কেন—নেহ স্ম কিঞ্চিদ্ অপ্রাপ্যং ভবেদপি দিবি স্থিতম্। এমনকী কৌরবদের সঙ্গে এই সংঘাতও হয়তো এড়ানো যেত কর্ণ পাশে থাকলে। এই ঐহিক লাভের কথা ছেড়ে দিলেও যেটা সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে যুধিষ্ঠিরের কাছে, সেটা হল একটি উপযুক্ত দাদা না পাওয়ার দুঃখ। পিতা না থাকায় তিনিই ছিলেন পাণ্ডবদের পুরুষ অভিভাবক। কিন্তু অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণতার জন্যই হোক কিংবা তাঁর নরম স্বভাবের জন্য অনেক সিদ্ধান্তই তাঁকে নিতে হয়েছে, যা বেশিরভাগ সময়েই অভিভাবকোচিত হয়নি, প্রাণপ্রিয় ভাইদেরও তা মনঃপূত হয়নি। কর্ণের মৃত্যুর পর আজকে যুধিষ্ঠিরকে তাই নিশ্চয় ভাবতে হয়েছে যে, কর্ণ যদি মাথার ওপরে দাদা হয়ে থাকতেন, তা হলে তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে কাউকে আর ট্যাঁ-ফোঁ করতে হত না। ভীম পর্যন্ত মুখচোরা হয়ে যেত। তা ছাড়া দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বনবাস—এসব আদৌ ঘটত কিনা সন্দেহ। কর্ণের মৃত্যুতে নয়, সময়-মতো তাঁকে দাদা হিসেবে না পেয়ে যুধিষ্ঠির যে এতদিন কত বড় একজন অভিভাবক হারিয়েছেন, এই গ্লানিতেই তিনি জননী কুন্তীকে ক্ষমা করতে পারছেন না, খালি বলছেন—মাগো! তোমার মন্ত্রগুপ্তির জন্যই আজ আমাদের সকলের এমন সর্বনাশ—পীড়িতাঃ স্মঃ সবান্ধবাঃ।

তবু মৃত্যু বোধহয় মানুষের বয়স কমিয়ে দেয়। বিশেষত সারা জীবন ধরে অনেক ব্যবহারই, এমন কী দুর্ব্যবহারও এমন সরল শিশুর মত করেছেন কর্ণ যে, আজকে এই অন্তিম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির তাঁকে স্নেহ করতে শুরু করেছেন! দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দুর্যোধন—এইসব বৃদ্ধ কিংবা অন্য যুবক যোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি কর্ণকে একাসনে বসাতে পারছেন না, পারছেন না ভীষ্ম, দ্রোণ—এঁদের সঙ্গে কর্ণকে একাকার করতে। মাকে বলছেন—মাগো! সাত রাজার ধন এক মাণিক সুভদ্রার কোল-ছেঁচা অভিমন্যু মারা যেতে আমার যত না দুঃখ হয়েছে, আমাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন মারা যেতে যত না কষ্ট হয়েছে—এখন তার শতগুণ বেশি কষ্ট হচ্ছে কর্ণের কথা মনে করে—ততঃ শতগুণং দুঃখমিদং মাম্ অস্পৃশদ্ ভৃশম। যুধিষ্ঠির এবার সসম্ভ্রমে কর্ণের তিন বউকে ডেকে আনলেন নিজের কাছে, যে তিনজনের ওপর জননী কুন্তী নজর রেখেছিলেন। তারপর তাদেরই সঙ্গে গঙ্গার জলে বড়দাদার প্রেততর্পণ করলেন। কর্ণের সারা জীবনের পাণ্ডব-বিদ্বেষ যুধিষ্ঠিরের ভালবাসায় আর গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল। মন ভার করে যুধিষ্ঠির গঙ্গার জল ছেড়ে উঠলেন।

যে শ্লোকগুলি উপজীব্য করে আমরা কর্ণের শ্রাদ্ধ-তর্পণের ব্যবস্থা করেছি, এই শ্লোকগুলি ছাড়াও আরও দু-একটি শ্লোক মহাভারতের অন্যান্য মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যায়। তাতে লেখা আছে—যুধিষ্ঠির নাকি তর্পণ সেরে গঙ্গার মধ্যেই বিড়বিড় করে বললেন—স্ত্রীলোকের পাপেই আমাদের হাতে আমাদের বড় ভাই মারা পড়েছে, অতএব এর পর থেকে মেয়েরা আর কখনও মনের কথা চেপে রাখতে পারবে না—অতঃ মনসি যদ্‌গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি। কথাটা প্রায় অভিশাপের মতো শোনায়। একা কুন্তী কর্ণের কথা চেপে রেখে যে অন্যায় করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের অভিশাপে তাবত স্ত্রীলোকের মনে আর কোনও কথাই চাপা না থাকার ফলে আরও গভীর কোন বিপদ ঘটল কিনা, সে কথা যুধিষ্ঠির ভাবেননি ; তবে আমরা বেশ জানি মহাভারতের যে সংস্করণেই এই শ্লোক মুদ্রিত থাকুক না কেন, সেটি পরবর্তী কোনও মরমী কবির সংস্কার মাত্র। নইলে যুধিষ্ঠির অত সহজে অভিশাপ দেবার লোক নন। শত বঞ্চনায়, শত প্ররোচনায়ও যাঁর ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হয় না, তিনি মায়ের কথা, অবস্থা এবং তাঁর বিকল্প না বুঝে হঠাৎ সমগ্র স্ত্রী-জাতির ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবেন, তা সহজ মনে হয় না এবং তা তাঁর চিরকেলে স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গেও মেলে না।

আসলে কর্ণের কথা বলতে গিয়ে আমরা যে এই শেষ থেকে শুরু করলাম, তার কারণ একটাই। কোনও কোনও মানুষ বুঝি মারা যাবার জন্যেই জন্মায়। কর্ণের জন্মলগ্নে জননী যেদিন তাঁকে

নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যে তাঁর মৃত্যুশয্যাই বিছানো হয়েছিল, অন্তত জননীর হৃদয় তাই জানত। আজকে গঙ্গা নদীর তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে জননী কুন্তী একই ভাবে কাঁদছেন, ঠিক যেমনটি কেঁদেছিলেন প্রথমদিনে কর্ণকে নদীতে ভাসিয়ে দেবার পর। কর্ণের জন্ম এবং মৃত্যু—দুইই বিসর্জনের সুরে বাঁধা। কিন্তু যে সব ছেলে এইরকম মরবার জন্যই জন্মায়, তাদের সবই বৃথা যায় না, তাদের জীবনের অংশটুকু নানা রঙে রাঙিয়ে দেন প্রজাপতি বিধাতা, ঠিক যেমন রাঙান প্রজাপতি কবি। কর্ণের ওপরে জনক-জননীর অধিকার ছিল না বলেই মহাকবি নিঃশেষে তাঁর ভার নিয়েছেন, সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে দিয়ে এমন সব কাজকর্ম করিয়েছেন, যাতে জননী-হৃদয় আরও তাপিত হয়, যেন জননী তাঁর কুমারীত্বের বিলাস, অশ্রুর অক্ষরে স্মরণ করেন। কুন্তী কোনওদিন কর্ণকে ভুলতে পারেননি, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্ণ নিঃশব্দে কুন্তীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন ; আজকে শান্তিপর্বের আরম্ভে, আদিপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত দশ পর্বের গর্ভদশা শেষ করে স্ত্রীপর্বের শেষ অধ্যায়ে কুন্তী কর্ণের মাতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। আজ তিনি স্বামী পাণ্ডুর কাছে দায়মুক্ত সম্পূর্ণ এক স্ত্রী, সমস্ত পাণ্ডবদের কাছে আজ তিনি সম্পূর্ণ মা। সবাই, এমনকী ছেলেরাও যে সব জেনে গেল—এই শান্তিই যেন তাঁকে আজ শান্তি দিয়েছে। মহাভারতেও তাই শান্তিপর্ব আরম্ভ হয়েছে, কেন না মিথ্যা, ছলনা কিংবা অন্যায়ের শেষ না হওয়া পর্যন্ত কি শান্তিপর্ব আরম্ভ হতে পারে ?

স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, অনুতাপের মাধ্যমে শান্তি হয় কিনা জানি না, কিন্তু আগেই বলেছি কর্ণ মারা যাবার জন্যই জন্মেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিত, যাঁরা পুরাণজ্ঞ বলে পরিচিত, তাঁরা দেবতাদের স্বভাবচরিত্র দেখে তাঁদের কিছু জাতবিচার করেছেন। তাতে দেখা গেছে—সৌরকুলের দেবতা (Solar gods) যাঁরা কিংবা সৌর অংশে যাঁদের জন্ম, সেই দেবতাদের বৈশিষ্ট্য হল—তাঁরা অনেকে জন্মলগ্নেই এক বিরাট বিপদের মধ্যে পড়েন, কখনও বা জন্মলগ্নেই তাঁদের ত্যাগ করা হয়। শিশু কৃষ্ণ রাতের আঁধারে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন গোকুলে। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে গঙ্গা পরিত্যাগ করেছিলেন জন্মলগ্নেই। ওদেশে মোজেসকেও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছে নল-খাগড়ার বনে। সূর্যপুত্র কর্ণকেও ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গায়। পুরাণবিদদের মতে—জন্মানোর পর পরই সৌরবংশজের এই যে বিপদ, এ বিপদ নাকি পাঠকের মনে এক ধরনের করুণার উদ্রেক করে এবং করুণাই নাকি তাঁদের জীবনের পরবর্তী শৌর্য-বীর্য, কীর্তিকলাপকে প্রতিতুলনার মাধ্যমে ভাস্বর করে তোলে। কবি-বিধাতা তাঁদের এইভাবেই গড়ে তোলেন, কর্ণকেও সেইভাবেই গড়েছেন।

কুন্তীর সঙ্গে যেদিন পাণ্ডুর বিয়ে হয়, সেদিনটা কুন্তীর পক্ষে বিশেষ করে স্মরণীয়। শতেক রাজার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে স্বয়ম্বরা কুন্তী যে পাণ্ডুকে দেখে মোহিত হলেন, একেবারে যে সবার সামনে আকুল হলেন নববধূর কামনায়—কামপরীতাঙ্গী—তার কারণ এই নয় যে, পাণ্ডুর চেহারাটা ছিল মহাবল সিংহের মতো কিংবা তাঁর বুকের ছাতিটা ছিল বিরাট। তার কারণ এই যে, পাণ্ডুকে দেখে কুন্তীর যেন কার কথা মনে হল। ব্যাস উপমার অঙ্গুলীসংকেতে ব্যাপারটাকে গৌণ করে দেখিয়ে আসল ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন বটে, তবু তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, পাণ্ডুকে সেদিন সমস্ত রাজমণ্ডলীর মধ্যে যেন সূর্যের মতো দেখাচ্ছিল। কুন্তীর কাছে মনে হচ্ছিল পাণ্ডু যেন সমস্ত রাজার দীপ্তি ম্লান-করা সূর্য বুঝি—আদিত্যমিব সর্বেষাং রাজ্ঞাং প্রচ্ছাদ্য বৈ প্রভাঃ। কুন্তী যে এই তেজঃপুঞ্জ আরও একবার দেখেছেন ; সে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে আলিঙ্গন করেছিল তাঁকে। বালিকা হৃদয়ের সেই আলোড়ন তিনি ভুলবেন কী করে ? বিশেষত প্রথম প্রেম কিংবা জীবনের প্রথম রমণীটির কথা পুরুষ মানুষ যদি আরও গভীরতর প্রেমে ভুলেও যায়, মেয়েরা ভোলে না তাদের প্রথম প্রেম কিংবা প্রথম পুরুষটিকে। পাণ্ডুর সূয্যিপানা মুখ দেখে সূর্য-স্মরণের চকিত লজ্জা কুন্তী মিশিয়ে দিলেন নববধূর লজ্জার সঙ্গে—সে যে অনেকদিনের ঘটনা। তবে সেই যে পড়েছি—"বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয় ? কয়জন বাঁচিয়া থাকে ? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে ? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত

মধুর।" আমরা জানি, বিয়ের সময় কুন্তী বার্ধক্য-দশায় পৌঁছননি। তিনি তাই মধুর স্মৃতিতে বুঝি লজ্জা পেলেন, যে লজ্জা মিশে গেল নববধূর লজ্জায়—ব্রীড়মানা।

২

মথুরা থেকে রাজা কুন্তিভোজের রাজ্যটা খুব দূরে নয়। রাজপ্রাসাদের কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে অশ্বনদী, যে নদী শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না পেরে মিলে গিয়েছে চর্মণ্বতীর সঙ্গে, তারপর দুটিতে একাকার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যমুনায়। ঠিক কুন্তীর মতো। কুন্তী কৃষ্ণের বাবা বসুদেবের নিজের বোন। কৃষ্ণের ঠাকুরদাদা শূরের সঙ্গে কুন্তিভোজের খুব বন্ধুত্ব ছিল। সেই জন্য শূরের খুব আদরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও—শূরস্য দয়িতা সূতা—শূর কুন্তীকে খুশি মনে প্রতিজ্ঞা করে দত্তক দিয়েছিলেন কুন্তিভোজের কাছে। কাজেই বৃষ্ণিকুলের জাতিকা পৃথা, অশ্বনদীর মতো গিয়ে পড়লেন কুন্তীভোজের ধারায়—চর্মণ্বতীর জলে। তারপর দুই বংশধারা একাকার হয়ে কুন্তী গিয়ে পড়লেন ভরত-বংশের বিরাট প্রবাহে, ঠিক যেন চর্মণ্বতীর মতো—যমুনায়।

আমি যে খুব কায়দা করে কুন্তীর জীবন-ধারার সঙ্গে একে একে তিনটি নদীর উপমা টেনে দিলাম, মহাভারতকার ব্যাস এতে খুশি হননি। তিনি জানতেন—যত তেজস্বিনী হন, স্ত্রী মাত্রেরই বুঝি স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এই যে কুন্তী, রাজবংশের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কুন্তিভোজের কাছে তাঁকে বালিকা বয়সেই দত্তক দিয়ে দেওয়া হল, তাঁর করার কিছুই ছিল না। আবার মেয়ে হয়ে জন্মানোর দরুন সমাজ-বিধি, লোকলজ্জা এগুলি যেহেতু তাঁকে মেনে চলতেই হবে, অতএব বাপের বাড়ি হোক, চাই শ্বশুরবাড়ি, নদীর মত কূল উপচানোর ক্ষমতা কুন্তীর ছিল না। তাই নদীর সঙ্গে কুন্তীর উপমা দিয়ে মহামতি ব্যাসের কাছে আমি অপরাধ করেছি। আসলে ব্যক্তিজীবনের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যেহেতু কবির মনে জানাই আছে, তাই উপমা দেওয়ার সময়ে কবিকে সতর্ক থাকতেই হয়। আমার সে সতর্কতার দায় নেই, কিন্তু ব্যাসের আছে। অতএব বৃষ্ণিকুলের পৃথা যখন কুন্তিভোজের কুন্তী হলেন, তখন ব্যাস বললেন, তুমি এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে পড়েছ—হ্রদাৎ হ্রদম্ ইবাগতা। আসলে হ্রদ গভীর হলেও, তার সীমাবদ্ধতা আছে, সে কূল উপচে পড়ে না, ঝোড়ো হাওয়া লাগুক, ক্ষণিকের বৃষ্টি হোক, প্রকৃতির বিকার তাকে নির্বিকারে সহ্য করতে হবে, ঠিক যেমন কুন্তীকে করতে হয়েছে সারা জীবন ধরে। তাঁর জীবনে কুমারী কালেই যে ঝোড়ো হাওয়া উঠেছিল, সারা জীবন ধরে সকলের অজান্তে তাঁকে যে চোখের জল ফেলতে হয়েছে, তবু তিনি হ্রদের মতো স্ত্রীসমাজের বাঁধ ভাঙতে পারেননি। কর্ণ যে কোনওকালে তাঁর নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে বেরতে পারেননি, তার কারণ কর্ণের জন্মকালে কুন্তীও তাঁর কুমারীত্বের গণ্ডী কেটে বাইরে যেতে পারেননি। এ ব্যাপারে কর্ণের অসহায়তা যতখানি, কুন্তীর অসহায়তাও ততখানি। কুন্তীকে তাই যুধিষ্ঠিরের মতো দোষ দিয়ে লাভ নেই বরং তার অসহায়তার কারণটা বুঝে নিই।

ব্রাহ্মণ এসেছেন কুন্তিভোজের রাজবাড়িতে—অমিততেজা ব্রাহ্মণ। লম্বা চেহারা, মুখে দাড়ি, মাথায় জটা, হাতে সন্ন্যাসীর দণ্ড। দেখলে কেমন ভয় ভয় করে। ব্রাহ্মণ বললেন—তোমার ঘরেই কিছুকাল ভিক্ষে করব, রাজা। 'তোমার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করব'—এই অর্থে ভিক্ষে করার কথাটা খুব বেশি পাবেন চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গে। তার মানে মুনি বললেন—তোমার বাড়িতে থেকেই কিছুকাল চালাব। তবে মুনির শর্ত আছে। রাজা কিংবা তাঁর অনুচরেরা মুনির কোনও কাজে ঝামেলা করতে পারবেন না। মুনি বললেন—আমি যেমন খুশি বাইরে যাব, যেমন খুশি আসব—যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ। কিন্তু আমার শোয়া-বসার ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হলে চলবে না। রাজা বললেন—এবমস্তু। আমার একটি কন্যা আছে, সে সব সময় আপনার কাছে কাছে থাকবে—নিয়তং চৈব ভাবিনী। সে এমনভাবে আপনার সেবা করবে যে, আমার ধারণা—আপনি খুব খুশি হবেন—তুষ্টিং সমুপযাস্যসি। ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কুন্তিভোজ এবার মেয়ের কাছে গেলেন। বললেন—মা, আমি কথা দিয়েছি তুমি এই মহাতেজস্বী

ব্রাহ্মণের দেখাশোনা করবে। আমি বেশ জানি—আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এমনকী ঝি-চাকরকে পর্যন্ত তুমি কীরকম বশ করে রেখেছ। কাজেই এই কোপনস্বভাব মুনির কাছে যে একমাত্র তোমাকেই পাঠানো যেতে পারে কিংবা তাঁর কাজে যে একমাত্র তোমাকেই লাগানো যেতে পারে, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

এরপরে, কী জানি কী মনে করে, কুন্তিভোজ বললেন—তুমি হলে গিয়ে বৃষ্ণিবংশের মেয়ে, আমার ঘরে এসে পড়েছ। রাজবাড়ির মেয়ে বটে, তার ওপরে যথেষ্ট সুন্দরী—রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্। ব্যাপারটা কী হয় জান, বালিকাসুলভ চপলতায় মেয়েরা অনেক সময় নানান দুষ্টুমি করে বসে—বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে। তুমি বাপু নিজের রাজকুলের দম্ভ-মান ত্যাগ করে, রূপের গরিমা ত্যাগ করে মুনির সেবা কর। তোমার কল্যাণ হবে। কুন্তী বললেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বাবা! যেমনটি বললে, তাই হবে। ব্রাহ্মণ রাতে, দিনে, সকাল, সন্ধ্যায় যখন খুশি আসুন, আমার ওপর তিনি রাগ করার সুযোগই পাবেন না। রাজা কুন্তিভোজ পৃথাকে এবার নিয়ে গেলেন খ্যাপা দুর্বাসার কাছে। বললেন—এই আমার মেয়ে; এই আপনার সেবা করবে। যদি কোনও অপরাধ হয়ে যায় কার্যবশে, তো আপনি সে-কথা মনে রাখবেন না—ন কার্য্যঃ হৃদি তৎ ত্বয়া। সুন্দরী পৃথাকে কাজের লোক পেয়ে দুর্বাসার পছন্দ হল। রাজা তাঁকে হাঁসের পাখনা-ধোয়া, চাঁদের জ্যোৎস্না-ধোয়া একখানি শুচিশুভ্র বাড়ি দিলেন থাকার জন্যে, আর পৃথাকে দিলেন সেবাদাসী—পৃথাং পরিদদৌ তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ।

সেবা আরম্ভ হল। সকালে আসব বলে দুর্বাসা বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিতে। জ্যোৎস্না-ধোয়া রাজবাড়িতে খাবার-দাবার সাজিয়ে একাকিনী পৃথা বসে থাকেন। মুনি যত ঝামেলা করতে থাকেন, খাবার-দাবার, শোয়া-বসার, তরিবত তত বাড়তে থাকে। ব্রাহ্মণ গালাগালি দেন, তিরস্কার করেন, পৃথা কিছু বলেন না। এমন সময়ে এসে, এমন ঝকমারি খাবারের আয়োজন করতে বলেন দুর্বাসা যে, অন্য কেউ হলে প্রমাদ গণত—সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সো'ব্রবীৎ। কুন্তী বলেন—এই তো সব প্রস্তুত, আপনি খেতে বসুন। ব্যাসদেব, মহামতি ব্যাসদেব অত্যন্ত খেয়াল করে সম্বন্ধবিচার করে বলেছেন যে, কুন্তী পুরোদস্তুর শিষ্যের মতো, ছেলের মতো, মেয়ের মতো দুর্বাসার সেবা করে যাচ্ছিলেন। এবং তাও কীরকম? না—'সুসংযতা'। অর্থাৎ কোথাও শিষ্য, পুত্র বা বোনের সীমা লঙ্ঘিত হয়নি—শিষ্যবৎ পুত্রচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা। কিন্তু সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা হয়তো মুনির দিক থেকেই ঘটেছিল। পিতা তাঁকে দুষ্টুমি করতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ইন্দুধবল গৃহমধ্যে একাকিনী সেবাপরা রমণী 'দেখিয়া' খ্যাপা দুর্বাসা কোনও খ্যাপামি করেননি তো? কুন্তী সে কথা পরিষ্কার করে কোথাও ভাঙেননি, কিন্তু সেই একেবারে আশ্রমিক পর্বে গিয়ে কুন্তী যেখানে শ্বশুর ব্যাসের কাছে মৃত কর্ণকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাইলেন, তখন কিন্তু প্রথমেই বলেছিলেন—আমি অত্যন্ত শুদ্ধমনে, একটুও রাগ না করে দুর্বাসার সেবা করেছিলাম, যদিও আমার দিক থেকে রাগ করবার অনেক বড় বড় কারণ ছিল অর্থাৎ 'পয়েন্ট' ছিল—কোপস্থানেষ্বপি মহৎসু।

না, আমরা এই ব্যাপার নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি করতে চাই না, কারণ তার চেয়েও বড় ব্যাপার ততক্ষণে ঘটে গেছে। দুর্বাসা খুশি হয়েছেন এবং বর দিতে চাইছেন। কুন্তী সবিনয়ে বললেন—আপনি খুশি হয়েছেন, বাবা খুশি হয়েছেন, আমার আর কিছু চাই না। ব্রাহ্মণ বললেন—বরই যদি না নেবে, তবে একটা মন্ত্র দেব তোমায়। এই মন্ত্রে যে দেবতাকেই তুমি কাছে ডাকবে, সেই দেবতাই তোমার বশে আসবেন, তাঁর সঙ্গে থাকতেও পাবে তুমি—তেন তেন বশো ভদ্রে স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি। সেই দেবতা অকামই হন আর সকামই হন অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছে থাকুক চাই না থাকুক, তোমার বশে তাঁকে থাকতেই হবে—অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশে। দুর্বাসা কুন্তীর কানে মন্ত্র দিলেন। তারপর রাজাকে ডেকে বললেন—বেশ সুখেই দিন কাটল হে তোমার ঘরে, তোমার মেয়ে আমায় সুখী করেছে। মুনি চলে গেলেন।

কুন্তীর বুঝি তখন বয়ঃসন্ধির কাল। কুমারী মনের চপলতাটুকু তখনও তাঁর মন থেকে যায়নি আবার যৌবনের অনুসন্ধিৎসাগুলিও জেগে উঠেছে। কুন্তী জানতেন যে, দুর্বাসার মন্ত্র আসলে ছেলে

হওয়ার মন্ত্র। কিন্তু তাঁর ভিতরে যুবতী বলল—দেবতা পুরুষ নাকি তোমার বশে থাকবে। কেমন লাগে পুরুষকে বশে রাখতে ? মুনি বললেন—মন্ত্র। মন্ত্র খাটে কি না খাটে, কে জানে ? পরীক্ষা করে দেখলেই হয়, এক্ষুনি বোঝা যাবে—মন্ত্রগ্রামবলং তস্য জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিতি। মন্ত্রের কথা এমন করে চিন্তা করতে করতেই কুন্তী রজস্বলা হলেন—তাঁর লজ্জা হল—কন্যাভাবে রজস্বলা। রাজপ্রাসাদের বিরাট ঘরে পালঙ্কের ওপর শুয়ে ছিলেন কুন্তী। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সকালবেলার রাঙা সূর্য, একটুও চোখে লাগে না। রাত্রি আর দিনের সন্ধিলগ্নে সন্ধ্যার লালিমা-মাখানো সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগছিল। নিমেষে তাঁর মন প্রাণ এবং দৃষ্টি একসঙ্গে নিবদ্ধ হল প্রভাতসূর্যের দিকে, তাঁর চোখের পাতা পড়ছিল না—ন চাতপ্যত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা। কী যে হল প্রাতঃসন্ধ্যার মায়ায় কুন্তী বুকে হাত দিয়ে সূর্যকে কাছে ডাকলেন দুর্বাসার মন্ত্রে।

অমনি সূর্য দ্বিধা হলেন। তাঁর এক ভাগ যেমনটি পৃথিবীকে আলো দিচ্ছিল, তেমনি দিতে থাকল। আরেক ভাগ পুরুষরূপের সঙ্গে সূর্যের কিরণ মেখে মাথায় আলোর মুকুট পরে যেন দূর থেকে ডাক-পাওয়া প্রেমিকের মতো ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলেন কুন্তীর কাছে—ত্বরমাণো দিবাকরঃ। হাসতে হাসতেই যেন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিয়ে সূর্য বললেন—তোমার বশীকরণের ডাক শুনে তোমার বশ হতে এসেছি রানি। নাকি অবশ হতে ? আগতো' স্মি বশং ভদ্রে তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ। বল এখন কী করব ?

কুন্তী এবার ভয় পেলেন। যৌবনের অনুসন্ধিৎসার সঙ্গেই যে ভয় মেশানো থাকে। কুন্তী বললেন—না গো, তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে চলে যাও—গম্যতাং ভগবংস্তত্র যত এবাগতো হ্যসি। শুধু কৌতূহলে, শুধুই কৌতূহলে তোমাকে একবারের তরে কাছে ডেকেছিলাম—কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ। তাই বলে এমন করতে হয় ? তুমি চলে যাও লক্ষ্মীটি—প্রসীদ ভগবন্নিতি। সূর্যের সংলাপে এবারে একটু 'ভিলেন'-এর কায়দা জুড়ে গেল যেন। তিনি বললেন—আমি চলে যাব ঠিকই, তবে তুমি যেভাবে বলছ, এটা ঠিক হচ্ছে না সুন্দরী। তুমি আমায় কাছে ডাকলে, অথচ এখন আমার প্রাপ্যটুকু না দিয়েই ফিরিয়ে দিচ্ছ সেটি হবে না বাপু। তা ছাড়া তোমার অভিসন্ধি আমার জানা আছে। তুমি চেয়েছিলে—সূর্যের থেকে একটি পুত্র, শৌর্যে বীর্যে তুলনাহীন এক পুত্র। তা বেশ তো, ছেলে চেয়েছ, ছেলে পাবে, কিন্তু তার আগে তো তোমার নিজেকে নিঃশেষে আমার কাছে ছেড়ে দিতে হবে সুন্দরী—সা ত্বয়া আত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সঙ্গে সঙ্গম সেরে, তবেই আমি যাব—ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে। কুন্তী অনেক কাকুতি মিনতি করলেন, কিন্তু কুন্তীর রূপ দেখেই হোক কিংবা দুর্বাসার মন্ত্রবলে—সূর্য তখন এতই বিবশ যে, বারেবারেই তিনি এক কথা বলতে থাকলেন—নিজেকে তুমি আমার কাছে ছেড়ে দাও কন্যে—'আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তি কন্যে', নইলে তোমার বাবাকে এবং তোমার সেই মন্ত্রদাতা মুনিকে—দুটোকেই ভস্ম করব আমি—ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে।

সূর্য এবার কুমারী কুন্তীকে যৌবনের রসবিলাস সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন কিছু। কুন্তী বুঝলেন মিলন অবশ্যম্ভাবী, পুত্র-জন্মও অবশ্যম্ভাবী। এবারে বুঝি ভাবী পুত্রটির জন্যই তাঁর মায়া হল। সমাজের নিয়মকানুন যা, তাতে যে ছেলেটিকে বিসর্জন দিতেই হবে, এ ব্যাপারেও তিনি তখনই নিশ্চিত। এবারে যে সন্তানটি তাঁকে প্রথম মাতৃত্বের আস্বাদ দেবে সেই অনাগত শিশু-জীবনের রক্ষা কল্পনায় কুন্তী সূর্যকে বললেন—তুমি যখন একান্তই মানবে না তবে হোক সেই মিলন—অস্তু মে সঙ্গমো দেব। কিন্তু সে যদি জন্মাবেই তাহলে তার জীবনরক্ষার বর্ম দাও তাকে। সে যেন বেঁচে থাকে। সূর্য বললেন—তাই হবে। সূর্যের তেজে অথবা মিলনে কুন্তী যেন এবার বিহ্বল হয়ে পড়লেন—ততঃ সা বিহ্বলেবাসীৎ। মিলন সেরে সূর্য বললেন—আসি তাহলে এবার। সূর্য নাকি বিনা স্পর্শেই তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অথচ আমরা দেখছি, মিলনশ্রান্তা কুন্তী বিছানায় শুয়ে আছেন বিবশা লতার মতো—ভজ্যমানা লতেব। কুন্তীর সাদর মন্ত্রাহ্বানের মধ্যে সামান্য সাময়িক অনাদর মিশ্রিত থাকলেও সূর্য প্রেমিকের মতো অভীপ্সিত পুত্র জন্মানোর আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায়

নিলে কুন্তী ভারী লজ্জা পেলেন, বারবার যাচনা করলেন—যাচমানা সলজ্জা—ঠিক তোমার মতোই যেন ছেলে হয়, তোমার মতোই রূপ, তোমার মতো শক্তি, তোমারই মত গুণ—ত্বদীয়রূপসত্ত্বৌজা ধর্মযুক্তো ভবেৎ স চ।

কুন্তীর গর্ভদশা আরম্ভ হল। তিনি কেবলই লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন যাতে কেউ টের না পায়। প্রতিপদের চাঁদের মত গর্ভ—এদিক ওদিক কাপড় টেনেটুনে, আলগায় আলসে কুন্তী গর্ভ লুকিয়ে রাখেন অন্যের দৃষ্টি থেকে—গর্ভং তং বিনিগূহতী। জানল শুধু একজন, রাজবাড়ির ধাই—সে ঠিক বুঝে ফেলেছে। তবে কুন্তীর কাছে সব কথা শুনে সেও কুন্তীকে রক্ষা করতে থাকল। ঠিক সময়ে কুন্তীর ছেলে হল। সোনার রঙের বর্মপরা, সোনার কুণ্ডল কানে নিয়েই কর্ণ জন্মালেন। ছেলের কাঁধটা এখনই বেশ চওড়া, চোখটা যেন সিংহের মতো একটু কটা গোছের তবে কুন্তী খুশিও হলেন খুব—ছেলে হয়েছে ঠিক বাবার মতো—যথা অস্য পিতরং তথা। এক লহমার মধ্যেই সমস্ত বিচার, তুলনা—সব শেষ। ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বেশ বড় একটি পেটিকার মধ্যে শিশু কর্ণকে শুইয়ে দিলেন কুন্তী। পেটিকার চারপাশে যেখানে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হল মধু, যদি কখনও একটু মুখে যায়। গভীর স্নেহে আরও একবার শিশু পুত্রের মুখ দেখে পেটিকার ঢাকনা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেই পেটিকা ভাসিয়ে দিলেন রাজ অন্তঃপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অশ্বনদীর জলে।

নদীর জল কুন্তীর মনের সঙ্গে তাল দিয়ে চলল না। তরঙ্গে তরঙ্গে পেটিকা যতই দূরে যেতে থাকল, কন্যাকালে পুত্রজন্মের অন্যায় জেনেও কুন্তী ততই কাঁদতে থাকলেন, কারণ যে রমণী একবার পুত্রমুখ দেখেছে সে কন্যা হোক, সধবা হোক আর বিধবা—সে শুধু জননীর পরিচয় দিতে ভালবাসে। কিন্তু চিরকালের সমাজ যেহেতু কন্যা-জননীর হৃদয় বোঝে না, তাই অশ্বনদীর নির্জন তীরে দাঁড়িয়ে কুন্তীকে জননীর আশীর্বাদ জানাতে হয়—বাছা আমার! জন্মলগ্নেই তোকে জলে ভাসিয়ে দিলাম, জলের দেবতা তোকে বাঁচিয়ে রাখেন যেন—পাতু ত্বং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বর। সর্বগামী প্রাণশক্তি বায়ু যেন তোকে নিঃশ্বাস দেয়। যে আমার কন্যাকালে মাতৃত্বের আস্বাদ দিল, তোর সেই পিতা যেন তোকে সব জায়গায় বাঁচিয়ে রাখেন। আমার কোলে ছেলে দিয়েও তোর বাবাই আজ ধন্য—তিনি আকাশ থেকে সব সময় তাঁর কিরণের চোখে দেখতে পাবেন তোকে। তুই যেখানেই থাকিস বাছা! আমি তোকে ঠিক চিনব, ওই কবচ কুণ্ডল দেখে ঠিক চিনব। অশ্বনদীর ধারায় শায়িত কর্ণের পেটিকাখানি যতই নজরের বাইরে যেতে থাকল, মাতৃত্বের দায় ততই বিদ্ধ করতে থাকল কুন্তীকে। তিনি হাহাকার করে বলতে থাকলেন—ধন্য সেই রমণী, যে তোকে পুত্র বলে কোলে তুলে নেবে। ধন্য সেই জননী, তৃষ্ণার ব্যগ্রতায় যার স্তনের দুধ খাবি তুই—যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্রঃ স্তনং পাস্যসি দেবজ। জানি না, সেই রমণী কোন চাঁদ-চুয়ানো ছেলের মুখ দেখেছিল স্বপ্নে, যে এই সূয্যিবরণ ছেলে কোলে তুলে নেবে। শিশু বয়সেই এই টানা টানা চোখ, এই প্রশস্ত ললাট, এই চুল কোনও জননীর পুত্র-কল্পনায় ছিল কি? অথচ সেই ভাগ্যবতী তোকে লালন করবে—পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি। কুন্তীর মধ্যে যে জননী ছিল, সে বারবার ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল সেইসব রমণীদের প্রতি, যারা ধূলায় ধূসর এই শিশুটিকে হামাগুড়ি দিতে দেখবে—ভূমৌ সংসর্পমাণকম্। কুন্তী বললেন—ধন্যি তারা, যারা তোর ব্যাকুল হাসি-ভরা শিশুমুখের আধো আধো কথা শুনতে পাবে, ধন্যি তারা, যারা তোকে আস্তে আস্তে যুবকে পরিণত হতে দেখবে।

জননীমাত্রই, তাঁর বয়স যাই হোক, একইভাবে কাঁদে, একই ভাবে দুঃখ পায়, একই কল্পলোকে বাস করে। সমাজের রোষ থেকে বাঁচবার জন্য কুন্তী অনেক কেঁদে, অনেক দুঃখ বয়ে নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর মন একেবারে ভারী হয়ে রইল। ওদিকে সোনার পেটিকা অশ্বনদী পেরিয়ে চর্মণ্বতীর জলে এসে পড়ল। চম্বলের শিলাভূমি অতিক্রম করে চর্মণ্বতী কর্ণকে পৌঁছে দিল যমুনায়। তারপর গঙ্গা। ব্যাস লিখেছেন—সোনার পেটিকাখানিই যেন মাতৃগর্ভের মতো, যে গর্ভ ধারণ করে রইল নদীমাতা—স মঞ্জুষাগতো গর্ভ স্তরঙ্গৈরুহ্যমানকঃ। গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুর কিংবা কুরুক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চম্পা নগরী। ভাসতে ভাসতে কর্ণের পেটিকা এসে ঠেকল সেইখানে। চম্পা

অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। এই সমস্ত রাজ্যই তখন হস্তিনাপুরের অন্তর্ভুক্ত। তার মানে কুন্তী হস্তিনাপুরে নববধূ হয়ে ঢুকবার আগেই কুন্তীর ছেলে এসে পৌঁছলেন হস্তিনাপুরের এলাকায়। কর্ণের ভাবটা এই—মাগো ! জলে ভাসিয়ে দেবার সময় তুমি না বলেছিলেন—বাছা আমার ! তোর এই কবচ আর কুণ্ডল দেখেই বিদেশেও তোকে চিনে নেব আমি—বেৎস্যামি ত্বাং বিদেশে'পি কবচেনাভিসূচিতম্। তা কবচ-পরা কর্ণ তোমার এইখানেই রইল, যেখানে একদিন তুমি বউ হয়ে আসবে। পিতা না হোক, যা তাঁর পিতৃভূমি হতে পারত, সেই পিতৃভূমির কূলে এসে ঠেকলেন কর্ণ—মায়ের বদলে।

ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু সূত অধিরথ সস্ত্রীক এসেছিলেন গঙ্গাস্নানে। সারথি জাতের মানুষ হলে কী হয় অধিরথের স্ত্রী কিন্তু সুন্দরী, দারুণ সুন্দরী—রূপেণাসদৃশী ভুবি। তাঁর নাম রাধা। যাগ-যজ্ঞ, তীর্থ, কবচ—অনেক সাধ্যসাধনা করেও রাধার ছেলে হয় না। সেই রাধা গঙ্গায় স্নান করতে নেমে দেখেন, একখানি পেটিকা ভেসে আসছে ঢেউয়ের টানে, একেবারে তাঁর কাছেই। পেটিকাটি স্নান করার সঙ্গীদের দিয়ে ধরালেন তিনি, তারপর একেবারে জানালেন স্বামী অধিরথকে, কেন না পেটিকার মধ্যে কী আছে কেউ জানে না—ভাল জিনিস যেমন থাকতে পারে, মন্দ কিছুও তেমনি থাকতে পারে। স্বয়ং অধিরথ এসে জল থেকে তুললেন পেটিকাটি, তারপর একটি যন্ত্র দিয়ে খুলে ফেললেন পেটিকার ঢাকনা। দেখলেন পেটিকার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে শিশু—অপশ্যত্তত্র বালকম্। অধিরথ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—নতুন সূর্যের মতো গায়ের রঙ, সোনার বর্ম-পরা, সোনার কুণ্ডল-পরা দিব্য শিশু। ছেলেটিকে কোলে নিতেই এতদিনের রুদ্ধ বাৎসল্য যেন মুখর করে তুলল অধিরথকে। অধিরথ বললেন—জন্মে অবধি এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনি, পুত্রহীনকে পুত্র দিয়েছেন ভগবান। তিনি আজ মুখ তুলে চেয়েছেন। সূত অধিরথ এবার পুত্রকে তুলে দিলেন স্নেহাতুরা জননী রাধার কোলে। সূতপিতা আর সূতজননী পরম আদরে পুত্রকে লালন পালন করতে থাকলেন। ব্রাহ্মণেরা ছেলের গায়ে জন্ম থেকেই সোনার বর্ম আর কুণ্ডল দেখে অধিরথের ছেলের নামকরণ করলেন বসুষেণ। বসু মানে সোনা, সোনার ছেলে।

৩

পুরোপুরি খুন করার চেয়ে খুন করার চেষ্টা করে বিফল হওয়া বুঝি আরও বিপজ্জনক। তাতে আসামীর সব সময় ভয় থাকে যে, অপরপক্ষ তাকে চিনে ফেলল কিনা। কুন্তী খুনের আসামী নন, খুনের চেষ্টাও তিনি করেননি ; কিন্তু জননীর হৃদয় এমনই জিনিস যে, কুন্তী নিজেকে খুনের আসামী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। নিয়মিত তাই তিনি খবর নিয়ে যাচ্ছেন। যে শিশুপুত্রটিকে শুধুমাত্র সহজাত কবচ আর কুণ্ডলের ওপর ভরসা করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সে যে বেঁচে থাকতে পারে—এ তিনি ভাবতেই পারেননি। বেঁচে থাকুক এটাই তিনি চাইছিলেন কিন্তু যদি বেঁচে থাকে তা হলে তাঁর যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না। ততদিনে কুন্তীর বিয়ে হয়ে গেছে হস্তিনাপুরে, তিনি রাজরানি হয়েছেন। রাজরানি হওয়ার অনেক সুবিধে, দাস-দাসী, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য—সবই কেনা যায়। ফলে তাঁর শিশুপুত্রের খোঁজ পেতে দেরি হল না। বিশ্বস্ত দাসী-চরদের তিনি বলে দিয়েছিলেন যে, সোনার বর্ম-পরা যদি কোনও ছেলে দেখতে পাও তো বোলো আমায়। তারা অনেক ঘুরে, অনেক খুঁজে পেতে খবর এনে দিয়েছিল তাদের রানিমাকে। বলেছিল—সেই যে মগধের পুবদিকে চম্পা বলে এক নগরী আছে—অঙ্গরাজ্যের রাজধানী, সেখানে আছে এই রকম এক ছেলে। সেখানে সারথিজাতের লোকেরা থাকে অনেক—সূত বিষয়ম্। কুন্তী চরের মুখে জানলেন—এক সারথির ঘরে তুখোড় একটি ছেলে বড় হচ্ছে, তার গায়ে জন্ম থেকেই সোনার বর্ম আঁটা আছে—চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথয়া দিব্যবর্মভৃৎ। কুন্তী আর কৌতূহল দেখাননি ; রাজরানি হলেই কী ? তাঁরও কলঙ্কের ভয় আছে যে।

মহাভারতের কাণ্ডকারখানা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করলে কর্ণের সম্বন্ধে কুন্তী এবং সমস্ত পাণ্ডবদের বিচারই অত্যন্ত ভুল বলে প্রমাণিত হবে। কর্ণের অন্তকালে যুধিষ্ঠির কুন্তীকে যে খুব গালাগালি

দেওয়ার সুযোগ পেলেন, এ সুযোগও তাঁর প্রাপ্য ছিল না। অন্যদিকে তাঁর বলিষ্ঠ ভায়েরা যে সারা জীবন ধরে কর্ণকে 'সূতপুত্র সূতপুত্র' বলে গেল, সেই চেঁচানিরও সারবত্তা বেশি নেই। অর্থাৎ কর্ণ যে কুন্তীর কুমারীপুত্র হয়ে কলঙ্ক লাভ করলেন আর ভাসতে ভাসতে এসে উঠলেন সূতের ঘরে—এই দুটি ব্যাপারে তাঁর যে হাত ছিল না—এটা বড় কথা নয়। বড় কথা, এই দুটি ব্যাপারেই কোনও কলঙ্ক লাভের প্রশ্ন ছিল না একটুও।

কুন্তী যদি পাণ্ডুকে কর্ণের জন্মকথাটা বলে দিতেন তাতে কোনও অসুবিধে হত না। তখনকার দিনের আন্দাজে পাণ্ডু ছিলেন যথেষ্ট 'লিবারাল'। কিন্তু কলঙ্কের কথা বলতে যেন কুন্তীরই রুচিতে বেঁধেছে। তখনকার শিথিল সমাজে কন্যা-অবস্থায় পুত্র জন্মানটা কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়। কুন্তীর শাশুড়ি সত্যবতী স্বয়ংই কন্যা-অবস্থায় ব্যাসদেবের জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি তো পুত্রকল্প ভীষ্মকে সবই বলে দিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, আপনি বলবেন, সত্যবতীর বলার সময়টা ছিল খুব উপযুক্ত ; শান্তনু মারা গেছেন, কুরুকুলের বংশধর কেউ নেই, সেই অবস্থায় সংসারের প্রয়োজনে তিনি সব কথা বলে আপন কন্যাকালের পুত্রকে নিয়োগের জন্য স্মরণ করেছেন। আমরা বলব—প্রথমত স্বামীর কাছে যদি লজ্জা করে, তা হলে পাণ্ডু মারা গেলে অজস্রবার কুন্তীর সুযোগ এসেছে কর্ণের কথা পরিষ্কার করে বলার। কিন্তু আমাদের ধারণা, পাণ্ডু বেঁচে থাকতেই কুন্তীর সুযোগ ছিল বেশি। পাণ্ডু যে এ ব্যাপারে কতটা উদার ছিলেন, সেটা আগেই বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

পাণ্ডু যখন মুনির শাপে প্রজনন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন, তখন তিনি আরও বেশি করে পুত্রমুখ দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। অন্যান্য মুনিদের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ হল। তিনি তাঁদের বললেন—আমি যেমন আমার পিতার ঔরসপুত্র নই বরঞ্চ আমার মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাসের নিয়োগজাত পুত্র, তেমনি আমারও কি তেমন কোনও ক্ষেত্রজ পুত্র হতে পারে? মুনিরা বললেন—আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দেবতার মতো পুত্র হবে তোমার। এই পরামর্শটা কিছুই না, নিয়োগের বিধিতে ব্রাহ্মণদের কিছু অনুমতি লাগে, সেই অনুমতিটা পাওয়া গেল। পাণ্ডু এবার কুন্তীকে নিয়োগপ্রথায় প্রস্তুত হওয়ার আগে অদ্ভুত একটা সুযোগ দিলেন। পাণ্ডু বললেন—দেখ কুন্তী। এটা আমাদের আপদ কাল, অন্যভাবে ছেলেপুলে হয় কিনা সেটা আমাদের ভাবতে হবে—অপত্যোৎপাদনে যত্নম্ আপদি ত্বং সমর্থয়। এবারে পাণ্ডু মস্ত একটা সুযোগ দিলেন। বললেন—কুন্তী ! আমাদের সমাজে বারো রকমের ছেলে স্বীকৃত—সোজাসুজি বিয়ে করা বৌয়ের ছেলে—সে তো ভালই। তা না হলে নিয়োগজাত পুত্র, স্ত্রীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র—এরকম বারো রকমের ছেলে আছে। এর মধ্যে যে কোনও একরকমের ছেলে থাকলেই—সর্বেষামেব পুত্রাণাং যদ্যোকো'পি ভবেৎ সুতঃ—তা হলেই মনুর কথায় আমি নিজেকে পুত্রবান মনে করতাম। এত বড় সুযোগ সত্ত্বেও কুন্তী কিন্তু কর্ণের কথা বললেন না। মহাভারতের রুক্ষ টীকাকার নীলকণ্ঠ পর্যন্ত পাণ্ডুর 'অফার' বুঝে লিখলেন—ইস্ ! পাণ্ডু যে বারো রকম ছেলের লিষ্টি দিলেন তাতে অন্তত দুভাবে কর্ণের পুত্রত্ব সিদ্ধি হয়—কর্ণাদিসদৃশস্য কানীনস্যাপি অত্রৈব অন্তর্ভাবঃ—কিন্তু তবু কুন্তী কিচ্ছুটি বললেন না। এমন নয় যে, কুন্তী কর্ণের খবর রাখতেন না। তিনি কর্ণের খবর আগেই পেয়েছেন সে-কথাও আমরা জানিয়েছি।

কুন্তীর দিক থেকে যখন কোনও জবাব এল না, তখন পাণ্ডু নিয়োগপ্রথারই গুণ গাইলেন। প্রকৃষ্ট নিয়োগের উদাহরণ দিয়ে কুন্তীকে বললেন তুমিও এক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের ঔরসে আমার পুত্র উৎপাদন কর। কুন্তী এমন ভাব করলেন, নিজের দেহের ওপর পাণ্ডুর অধিকার এমন সোচ্ছ্বাসে ব্যক্ত করলেন যেন অন্য পুরুষের মুখই তিনি জীবনে দেখেননি। পাণ্ডুকে আরও গভীর মোহে ডুবিয়ে দিয়ে কুন্তী বললেন—তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমি রতিক্রিয়া করছি—এ যে আমি ভাবতেও পারি না—ন হ্যহং মনসাপ্যন্যং গচ্ছেয়ং তদৃতে নরম্। গভীর রসে কুন্তী এক পতিব্রতা রমণীর কাহিনী শোনালেন পাণ্ডুকে, যে রমণী তাঁর স্বামী মারা যাবার পরেও আপন পাতিব্রত্যগুণে স্বামীর শবের সঙ্গে শুয়ে থেকে পুত্র উৎপাদন করেছিল। অর্থাৎ কুন্তীর ভাবটা এই যে, পাণ্ডু মারা গেলে তাঁর শবের সঙ্গে শুয়েও জীবন কাটিয়ে দেবেন তিনি, তবু অন্য পুরুষ নৈব নৈব চ। যে

নারীর কুমারীকালেই যৌন বিচ্যুতি ঘটে সে বুঝি কুন্তীর মতোই সতী-সাধ্বী হয়ে ওঠে। বিশেষত কুন্তীর মতো যার দোষ থাকে না, সে অহেতুক কোনও পাপবোধেই যেন সতীত্বের বিকাশ ঘটাতে চায় বেশি। কিন্তু মহারাজ পাণ্ডু অত্যন্ত উদার। তিনি বললেন—দেখ কুন্তী! তুমি যে নারীর কথা বললে, সে খুবই ধর্মসম্পন্না বটে, তবে আমিও ধর্মকথাই বলছি—অহং ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্মতত্ত্বম্। দেখ কুন্তী! পুরাকালে মেয়েরা ছিল সব মুক্ত। যে কোনও পুরুষের সঙ্গেই তাদের যৌন-সম্বন্ধ ঘটতে পারত এবং তা ঘটতে পারত কুমারীকাল থেকেই—বারবার—কৌমারাৎ শুভগে পতীন্। তাতে কিন্তু অধর্ম হত না কুন্তী! কারণ সেকালে সেটাই ছিল ধর্ম—স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ।

'কুমারীকাল থেকেই'—এ শব্দগুলি নিশ্চয় কুন্তীর মনে তড়িৎ-ক্রিয়া করেছে। পাণ্ডু আজ স্বামী হয়ে যে কথা বলছেন, সে-কথা আরও একজন বলেছিলেন কুন্তীর স্বামিত্বলোভে। সেই কুমারীকালে সূর্য বলেছিলেন—কামনা করার ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ সবাই মুক্ত—অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ নরাশ্চ বরবর্ণিনি—কারণ স্ত্রীপুরুষের এইটেই স্বভাব, অন্যটাই বরং বিকার। কুন্তী অবশ্যই ভেবেছিলেন যে, এটা বড়ই বাড়াবাড়ি কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে পাণ্ডুর কথা যখন সূর্যের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এবং ঠিক এইসব কথার পরেই কুন্তী যখন পাণ্ডুকে দুর্বাসার মন্ত্রসংবাদ দিচ্ছেন, তখন বেশ বুঝি কুন্তীর কুমারীকালের পাপবোধ আর নেই। আমাদের মতে, ঠিক এই মুহূর্তটি ছিল কর্ণের খবর দেবার ব্যাপারে আদর্শ সময়। কিন্তু কুন্তী কিচ্ছুটি বললেন না। চম্পা নগরীর সূতপল্লীতে যে শিশুটি বেড়ে উঠছিল, সে যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপন রুচি, বিদগ্ধতা এবং সূক্ষ্মতাকে অতিক্রম করতে পারলেন না কুন্তী।

দ্বিতীয় কথা হল পাণ্ডবদের দিক থেকে, যাঁরা বীরপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন আরও এক বিপন্ন বীরপুরুষকে 'সূতপুত্র', 'সূতপুত্র' বলে সম্বোধন করে গেলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা—পাণ্ডবেরা কি কখনও পেছন ফিরে নিজেদের মূল বংশপরম্পরা লক্ষ করেছেন? জাতিতত্ত্বের পুরোধা হিসেবে যদি মনুমহারাজের নাম করি তা হলে বলব—একটি ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ যখন ব্রাহ্মণীর গলায় মালা দিয়ে তার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবে, তবে সেই পুত্রটি হবে জাতিতে সূত—ক্ষত্রিয়াদ্ বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ। সেই সূতের ছেলে হল সূতপুত্র। যদি এই দিক দিয়ে দেখি, তাহলে পাণ্ডবেরাও সমূহ বিপদে পড়বেন। পাণ্ডব-কৌরব এবং ভারতবর্ষের আরও অনেক গৌরবোজ্জ্বল বংশের মূল হলেন যযাতি রাজা। মহামতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এই ক্ষত্রিয়পুরুষের প্রেমে পড়েছিলেন। স্বয়ং যযাতি নিজে ক্ষত্রিয় হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণকন্যাকে অনেক বারণও করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর প্রেম তাতে নিরুদ্ধ হয়নি। তাহলে দেবযানীর গর্ভে যযাতির ছেলেরা সব সূত এবং তার ছেলেরা সব সূতপুত্র। আপনারা বলবেন—পাণ্ডবেরা তো আর সোজাসুজি দেবযানীর গর্ভজাত সন্তানদের বংশধর নন, তাঁরা এসেছেন শর্মিষ্ঠায় বংশলতায়। আমরা বলি তাহলে তো আরও বিপদ, শর্মিষ্ঠা তো দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণীর সংকর জন্মের তবু সংজ্ঞা আছে কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং দানবীয় ধারায়, যাঁদের জন্ম, তাঁরা যে কী, তা শাস্ত্রকারেরাও বলেননি। বিপদ কি শুধু এইখানেই। যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে প্রথম যে পুত্র, সে তো যদু, তাঁর বংশধরেরা হলেন সবাই যাদব। আর কে না জানে যে, পাণ্ডবেরা যাঁকে সব সময় মাথায় তুলে নাচতেন সেই কৃষ্ণ হলেন যদুবংশের লোক। তাহলে তিনিও তো সূতপুত্রের ধারায় জন্ম নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে কর্ণের কাছে যুদ্ধসন্ধির প্রস্তাব এলে কর্ণ বলেছিলেন—বসুদেবের ছেলে কৃষ্ণ যেমন সব সময় পাণ্ডবদের কাজ করে চলেছেন—বসুদেব-সুতো যদ্বৎ পাণ্ডবার্থে দৃঢ়ব্রতঃ—তেমনি আমারও সবকিছুই দুর্যোধনের জন্য। কুরু পাণ্ডবের বিরাট যুদ্ধে পাণ্ডবেরা যেমন কৃষ্ণকে সামনে রেখে এগোচ্ছিলেন, তেমনি দুর্যোধনেরাও এগিয়েছিলেন কর্ণকে সামনে রেখে—প্রাযুধ্যন্ত পুরস্কৃত্য মাতঙ্গা ইব যূথপম্। আমরা নিন্দুকের ভাষায় বলি, কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধে দুইপক্ষই কি তাহলে দুই সূতপুত্রের শৌর্য, বীর্য এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর ভরসা রেখে চলছিল? আসলে তা নয়, আমরা বলছিলাম—পাণ্ডবদের দিক থেকে কর্ণকে যখন তখন 'সূতপুত্র', 'সূতপুত্র' বলে অপমান করাটা ঠিক হয়নি।

বস্তুত মনুর মার্কামারা জন্মের কলঙ্কে পাণ্ডবেরা যে কর্ণকে সূতপুত্র বলেছেন, তা আমাদের মনে হয় না। প্রাচীন পুরাণগুলি বলেছে—যাঁর নাম থেকে এই বসুন্ধরার নাম হয়েছে পৃথিবী, সেই পৃথু যেদিন জন্মালেন সেইদিনই পিতামহ ব্রহ্মা সোমযজ্ঞের ভূমিতে সূত এবং মাগধদের সৃষ্টি করলেন। সূত এবং মাগধদের মুনিরা অনুরোধ করেছিলেন মহামতি পৃথুর স্তব করতে। সেই যে স্তব আরম্ভ হল, তারপর থেকে সূত এবং মাগধেরা চিহ্নিত হয়ে গেলেন বিভিন্ন রাজার স্তাবক হিসেবে। পুরাতন রাজাদের কীর্তিখ্যাতি স্মৃতিতে ধরে রাখতেন বলেই সূতেরা হলেন পৌরাণিক—সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ। প্রাচীন সমাজে মুনি-ঋষিদের কাছে পর্যন্ত সূতদের যথেষ্ট সম্মান ছিল—কারণ বিভিন্ন পুরাণবক্তারা সবাই সূত। কিন্তু সূতেরা যেমন পৌরাণিক, তেমনি ব্যক্তিরাজার স্তাবকও বটে—বন্দিনস্তু অমলপ্রজ্ঞাঃ। বছরের পর বছর রাজবংশ স্মৃতিতে ধারণ করে, আর দিনের পর দিন পরিপোষক রাজার বন্দনা করেই বোধহয় সূতেরা জনসমাজে হেয় হয়ে গিয়েছিলেন। এই স্তাবকতার কারণেই হয়তো স্বাধীনচেতা ক্ষত্রিয়পুরুষেরা সময়ে অসময়ে তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করতেন, যদিও কারণ উপস্থিত না হলে এই আঘাত তাঁরা করতেন না; যেমন কর্ণের পালক পিতা সূত অধিরথই ছিলেন কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু। অথচ প্রতিযোগিতার কারণেই হোক কিংবা বিষম নজরের জন্যই হোক, পাণ্ডবেরা অধিরথের পুত্রকে 'সূতপুত্র' বলে না ডেকে পারতেন না। আসল কথা এখানে ডাকবার কারণও ঘটেছে আবার অধিরথ হয়তো এককালে কুরুবংশের স্তাবকও ছিলেন।

মৎস্যপুরাণের এক জায়গায় দেখছি ঋষিরা কর্ণের সূতপুত্র সম্বোধনে কেচ্ছার গন্ধ পেয়েছেন। তাঁরা পৌরাণিককে বললেন—আমরা পুরু বংশের কীর্তিকাহিনী পরে শুনব। তার চেয়ে কর্ণকে লোকে সূতপুত্র বলে কেন, সেইটা আগে শোনান।

পৌরাণিক নিজে সূত, তিনি ঘরের কেচ্ছা মোটেই বেশি শোনাবেন না। তিনি সংক্ষেপে বললেন—বৃহদ্‌বাহুর পুত্র বৃহন্মনা কিন্তু রাজা ছিলেন, মানে অবশ্যই ক্ষত্রিয়। এই বৃহন্মনার দুই স্ত্রী—দুজনেই শৈব্যরাজার মেয়ে। প্রথমা স্ত্রী যশোমতীর গর্ভে জন্মালেন জয়দ্রথ বলে এক ছেলে আর দ্বিতীয়া স্ত্রী সত্যার গর্ভে আসেন বিজয়। বিজয়ের ছেলে বৃহৎ, তাঁর ছেলে বৃহদ্রথ, তাঁর ছেলে সত্যকর্মা এবং তাঁর ছেলে হলেন অধিরথ। পুরাণকার প্রায় কিছুই না ভেঙে বললেন—এই অধিরথ সূত নামে বিখ্যাত হন—সূতশ্চাধিরথঃ স্মৃতঃ। যাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন তাঁদের ঘরের ছেলে হঠাৎ সূত বলে পরিচিত হলেন কেন—তার দুটো কারণ হতে পারে, যদিও পৌরাণিক সে কারণ স্বকণ্ঠে কিছু বলেননি। এক কারণ হতে পারে—রাজবংশের ছেলে হলেও এই রাজারা হয়তো ছিলেন সামন্ত রাজা। সেই বংশের ছেলে হঠাৎ করে আপন খেয়ালে কবিওয়ালা হয়ে উঠল। সে কুরুবংশের কীর্তিগাথা গাইতে গাইতে সেই বংশের গায়েন হয়ে গেল; অধিরথকে সূত বলেই লোকে চিনল। আর এক কারণ হতে পারে—মনুর নিয়ম অনুসারে অধিরথের পিতা, অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন, সত্যকর্মা বুঝি ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রেমে পাগল হয়ে তাঁকে বিয়ে করে ফেলেন। লোকেরা, বামুনেরা, বন্ধুরা—বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি—এই নিয়মে এমন বিয়েতে সায় দিলেন না মোটেই; অতএব অধিরথ সূত বলেই পরিচিত হলেন—সূতশ্চাধিরথঃ স্মৃতঃ। আমাদের ধারণা, অধিরথের পিতার এই কুল অতিক্রম করে বিবাহের রটনা এবং ঘটনা—দুইই অধিরথের মর্যাদার পরিপন্থী হওয়ায় সময় বুঝে পাণ্ডবেরা কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলে আঘাত করতে ছাড়েননি। মৎস্য পুরাণ বলেছে—শুধুমাত্র সূত অধিরথ কর্ণকে পালন করেছিলেন বলেই কর্ণ 'সূতপুত্র', আর কোনও কারণ নেই—তেন কর্ণস্তু সূতজঃ।

সূতেরা রাজবংশ স্মৃতিতে ধারণ করতেন বলেই, তাঁরা মুখে মুখে কবিতা তৈরি করতেন বলেই, অনেক ক্ষত্রিয়ের থেকে তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি বেশি হত, আগেই বলেছি নির্মল বুদ্ধি তাঁদের—অমলপ্রজ্ঞাঃ। সূত অধিরথ আপন বংশে সূতের গ্লানি ভোগ করেছিলেন বলেই দৈবে পাওয়া ছেলেটিকে তিনি অতি যত্নে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদায় মানুষ করেছিলেন। ছেলে যেই একটু বড় হল, অধিরথ সময় বুঝলেন। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বন্ধু মানুষ—ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা—তিনি সোজা বসুষেণকে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরে। কারণ তিনি জানতেন যে, দ্রোণাচার্যের মত অস্ত্রগুরু সে যুগে ভূভারতে

ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র যেহেতু তখন রাজা এবং তিনিই যেহেতু কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দিয়েছেন দ্রোণাচার্যকে, অতএব ধৃতরাষ্ট্র যে বসুষেণকে দ্রোণের অস্ত্র-পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিতে পারবেন—এ বিশ্বাস অধিরথের ছিল। অনেকে ধারণা করেন যে, বসুষেণ কর্ণ দ্রোণের কাছে কোনও অস্ত্রপাঠ পাননি, দ্রোণ তাঁকে 'সূতপুত্র' বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভুল কথা। কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে একই লগ্নে বসুষেণও দ্রোণের কাছে অস্ত্রকৌশল আয়ত্ত করতে থাকেন। অধিরথ তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের আস্তানাতেই রেখে দেন—দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য—তত্রোপসদনং চক্রে দ্রোণস্য ইম্বস্ত্রকর্মণি। শুধু দ্রোণ নয়, যে কৃপাচার্য পরবর্তী সময়ে কর্ণের জন্ম, জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেই কৃপাচার্যও ছিলেন কর্ণের অস্ত্রগুরু। মহাভারত পরিষ্কার জানিয়েছে—কর্ণের অস্ত্রগুরু ছিলেন তিনজন—দ্রোণ, কৃপ এবং পরশুরাম—দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সোঽস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্। ব্যাপারটা কিছুই নয়, হস্তিনাপুরে কৃপাচার্য ছিলেন ছোট গুরু আর দ্রোণাচার্য বড় গুরু। পাণ্ডব-কৌরবেরা প্রথমে সবাই কৃপাচার্যের কাছেই অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যাদবেরা, বৃষ্ণিরা এবং অন্যান্য দেশের রাজপুত্রেরাও কৃপের পাঠশালায় ঢুকেছিলেন—বৃষ্ণয়শ্চ নৃপাশ্চান্যে নানা দেশ-সমাগতাঃ। এই যে নানা দেশ থেকে অন্যান্য রাজকুমারেরা এসেছিলেন, এদের মধ্যে বোধ করি কর্ণও ছিলেন। তারপর যখন পাণ্ডব-কৌরব—সবাইকেই অস্ত্রবিদ্যার 'হায়ার কোর্স' রপ্ত করার জন্য একযোগে দ্রোণের কাছে পাঠানো হল, আমাদের ধারণা, তখন একই সঙ্গে কর্ণও পাচার হয়ে গেলেন দ্রোণের পাঠগৃহে।

ভালই চলছিল। দ্রোণাচার্যের কাছে ক্রমান্বয়ে অস্ত্রবিদ্যার সমস্ত পাঠ তিনি ভালই রপ্ত করেছিলেন—চকারাঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠাদ্ ধনুর্বেদং গুরোস্তদা। কিন্তু বাদ সাধল তাঁর উচ্চাভিলাষ। সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের মধ্যে 'সূতপুত্র' হওয়ার গ্লানি তিনি তখন থেকেই বুঝতে পারছিলেন। জন্মলগ্নেই যার গ্লানি থাকে এবং সে মানুষ যদি যথাযথ পুরুষ হয়, তবে তার কেটে বেরবার ইচ্ছে বাড়তেই থাকে, উচ্চাভিলাষ বাড়তেই থাকে। এটা ঠিক নয় যে, অস্ত্রপরীক্ষার দিনে রাজকুমার নয় বলে কর্ণের প্রতিযোগিতা বন্ধ হল আর দুর্যোধনের দেওয়া রাজমুকুট পরে দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের হঠাৎ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দ্রোণের পাঠশালাতেই এবং তার কারণ একটাই—তিনি অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিলেন না। নারদ মুনি সেই শান্তিপর্বে জানিয়েছেন যে, কর্ণ পাণ্ডবদের দেখে জ্বলে-পুড়ে মরছিলেন। ভীম আর অর্জুনের ক্ষমতা আর যুধিষ্ঠিরের ঠাণ্ডা মাথার বুদ্ধি দেখে মনে মনে কর্ণের রাগ বেড়েই চলেছিল। তার ওপরে সেই ছোটবেলাতেই অতিবুদ্ধিমান কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের বন্ধুতা দেখে, পাণ্ডবদের ওপর সমস্ত প্রজাদের অনুরাগ দেখে কর্ণের হৃদয় জ্বলে উঠত—চিন্তয়ানো ব্যদহ্যত। কর্ণ অর্জুনদের এক কারণে দেখতে পারেন না, দুর্যোধন তাঁদের দেখতে পারেন না আরেক কারণে—জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে। কিন্তু এই দেখতে না পারার মধ্যেই যে সাধারণ মিলটা আছে, তাতেই কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে অতি ছোটবেলায়—স সখ্যম্ অকরোদ্ বাল্যে রাজ্ঞা দুর্যোধনেন চ। অন্যদিকে শুধুমাত্র দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই কর্ণের ওপর পাণ্ডবদের বিদ্বেষ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তাঁদের ধারণা হতে লাগল নীচ-কুলে জন্মেছে এমন বীর্যবান পুরুষ যদি খারাপ সংসর্গে অর্থাৎ দুর্যোধনের আস্কারায় মাথায় উঠে বসে—বীর্যাধিকো নীচকুলো দুঃসঙ্গেন সমেধিতঃ—তা হলে সে বড় মানুষের 'কেয়ার' করে না, রাষ্ট্রেরও সে সমূহ ক্ষতি করে। অতএব দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই কর্ণ এবং পাণ্ডবেরা—দুই পক্ষই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন।

তবু কিন্তু আসল কথাটা এখানে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, দ্রোণাচার্যের 'ক্লাশে' অর্জুন ছিলেন 'ফার্স্ট বয়'। কর্ণ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি কোনওভাবেই ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারছেন না। রণক্ষেত্রে কৌশলের অভাব থাকলে প্রতিযোগী পুরুষ যেমন মারণাস্ত্রের ওপর শেষ ভরসা করে, তেমনি অর্জুনের যুদ্ধ-কৌশলে কর্ণ একসময় হতাশ বোধ করতে আরম্ভ করলেন এবং একসময় বুঝেও নিলেন যে, ধনুর্বেদে অর্জুনই সবার সেরা—সর্বথাধিকমালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ঃ। উপায় একটা কিছু চাই। উপায়—মারণাস্ত্র, যার কাছে কৌশল খাটে না, রণনীতি

খাটে না, ব্যক্তিবল খাটে না। কর্ণের মারণাস্ত্র চাই। একদিন যখন পাণ্ডব, কৌরব, কেউ কাছেপিঠে নেই, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা পর্যন্ত পিতার কুটিরে অনুপস্থিত, তখন কর্ণ একা চুপি চুপি এসে পৌঁছলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। অর্জুনের ওপর হৃদয়-ভরা প্রতিস্পর্ধা নিয়ে একান্তে দ্রোণকে বললেন—গুরুদেব ! আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র ছোঁড়বার উপায় শিখিয়ে দিন, শিখিয়ে দিন ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়ে তার সম্বরণের উপায়। গুরুদেব ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র ছোড়বার কায়দা শিখতে চাই একটা কারণেই—আমি যাতে অর্জুনের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ করতে পারি—অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ।

অর্জুন নিশ্চয়ই দ্রোণাচার্যের কাছে পূর্বেই ব্রহ্মাস্ত্রের পাঠ পেয়ে গিয়েছিলেন। কর্ণ নিজেও কম যোদ্ধা নন, অতএব যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা দেননি গুরু অথচ অর্জুনকে দিয়েছেন—এই বিষমদর্শিতা গুরুর মনে কিছু ক্রিয়া করতে পারে এই ভেবেই কর্ণ বললেন—ঠাকুর ! সমস্ত শিষ্যদের প্রতি আপনার সম-দৃষ্টি (ভাবটা এই যে, সমদৃষ্টি যদি নাই থাকে তো সেটাই হওয়া দরকার)। এমনকী আপনপুত্র এবং শিষ্যের মধ্যেও আপনি ভেদ করেন না—সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্। আপনার এই সমদর্শিতার পরেও কেউ যেন আমাকে না বলে, কর্ণ দ্রোণাচার্যের ছাত্র বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিদ্যে হয়নি তার। দ্রোণাচার্য সব শুনলেন, কিন্তু শুনলে হবে কি, প্রথম হওয়া ছাত্র যদি নিপুণ এবং বিনয়ী দুইই হয়, তবে তার ওপরে মাস্টারের পক্ষপাত থাকবেই। মহাভারতের কবি পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, গুরুমাত্রেই সমদর্শী হওয়া উচিত, কিন্তু সবার উপরে তিনি মানুষ। মনুষ্যধর্মে পক্ষপাত এসেই যায়। এইজন্য কর্ণের কথা শুনলেও দেখা যাচ্ছে দ্রোণাচার্যের অর্জুনের ওপর পক্ষপাত রয়েই গেছে, 'বায়াস্' রয়েই গেছে—সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি। তার ওপরে এতদিনের অস্ত্রশিক্ষার দৌলতে কর্ণকেও তিনি চিনেছেন। কর্ণের প্রতিযোগী মনোভাব, হিংসা, অহঙ্কার এবং সবার ওপরে দুর্যোধনের সঙ্গে তার ওঠা-বসা—কিছুই গুরুমশায়ের নজর এড়ায়নি। তিনি জানেন—শুধুমাত্র প্রতিস্পর্ধার জন্যই যে মারণাস্ত্র কামনা করে, তার হাতে সে অস্ত্র বিনা কারণে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সামনাসামনি কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে এ কথা বলা যায় না যে, বাপু হে তুমি বড় দুরাত্মা, তোমাকে আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা শেখাব না। কিন্তু মনে মনে তিনি কর্ণের দুরাত্মতার কথা বুঝে—দৌরাত্ম্যঞ্চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ—দ্রোণ বললেন—ব্রহ্মাস্ত্র ! ব্রহ্মাস্ত্র জানার অধিকার আছে ব্রাহ্মণের, আর জানতে পারেন সচ্চরিত্র ব্রতচারী ক্ষত্রিয়, এমনকী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করতে পারেন, কিন্তু আর কেউ নয়—নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন। বস্তুতঃ দৈব অস্ত্র লাভ করার জন্য যে নিষ্কাম উদাসীনতা দরকার, সেটা কর্ণের ছিল না বলেই দ্রোণ কর্ণকে এমন এক যুক্তিতে পরিহার করলেন, যেখানে কর্ণ একেবারেই নাচার। তিনি ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয় নন, সূতজন্মা রাধেয় বলেই তিনি পরিচিত।

আসল কথা, যেখানে অর্জুনও আছেন এবং কর্ণও আছেন, সেখানে অর্জুনকে অতিক্রম করে যে কিছু পাওয়া যাবে না, এটা কর্ণ জানতেন। তাই দ্রোণের এই প্রত্যাখ্যানের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন বলেই দেখা যাচ্ছে যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গুরু দ্রোণকে বিদায় জানিয়ে—আমন্ত্র্য প্রতিপূজ্য চ—কাউকে না বলে হঠাৎ করে গিয়ে পৌঁছলেন মহেন্দ্র পর্বতে। মহেন্দ্রপর্বতে আছেন পরশুরাম, ক্ষত্রিয়দের একুশবারের শত্রু নয়, চিরকালের শত্রু। তাঁর কাছে—'আমি সচ্চরিত্র ক্ষত্রিয়' বলেও লাভ নেই। কাজেই মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হয়ে পরশুরামের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কর্ণ বললেন—আমি ভার্গব গোত্রের ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণো ভার্গবো'স্মি। ভরদ্বাজ নয়, কাশ্যপ নয়, একেবারে ভার্গব ! পরশুরাম নিজেই যে ভৃগুবংশীয় ভার্গব। এতদিন পর আরও একটি ভার্গব ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে বিদ্যা শিখতে আসায় পরশুরাম ভারী খুশি হয়ে কর্ণকে রীতিমত স্বাগত জানালেন—স উক্তঃ স্বাগতঞ্চেতি প্রীতিমাংশ্চাভবদ্ ভৃশম্। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ কর্ণকে, শৈশবে গোত্রহারা কর্ণকে বুঝি বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—কর্ণ যে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিলেন, তার কারণ তিনি ভাবলেন—গুরু তো পিতার সমান হয়, অতএব ভার্গব পরশুরামকে তিনি যখন গুরু বলে ফেলেছেন, সেখানে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিলে ক্ষতি কী ! আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে কর্ণের ওপরে নীলকণ্ঠের এই মায়া ভাল চোখে দেখছি না। দেখছি না এইজন্যে যে, কর্ণ চরিত্রের

শেষ পর্যন্ত গেলে আমাদেরও মায়াই হবে ; কিন্তু এই মুহূর্তে যে পরশুরামের কাছে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিলেন তার একমাত্র কারণ সেই মারণাস্ত্র লাভের আশা, যা তাঁকে অর্জুনের সমকক্ষ করে তুলবে।

যাই হোক মহেন্দ্র পর্বতে কর্ণ অস্ত্রশিক্ষা করতে থাকলেন পরশুরামের কাছে। সেখানে থাকতে থাকতে অনেক দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস এবং অনেক অতিমানুষ লোকের সঙ্গে কর্ণের বন্ধুত্বও হয়ে গেল। এরই মধ্যে ঘটল এক অঘটন। দিনরাত মুক্ততরবারি আর ধনুক-বাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যেখানে সেখানে লক্ষ্যভেদ অনুশীলন করার ফলে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু মেরে ফেললেন। ব্রাহ্মণ রেগে শাপ দিলেন—যার কথা মনে করে তুই দিনরাত এই অস্ত্রাভ্যাস করে যাচ্ছিস, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে তোর রথের চাকা বসে যাবে মাটিতে—যুধ্যতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি। কর্ণ অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, অনেক টাকা-পয়সা, গরু, ধনরত্ন দিতে চাইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হলেন না। অধোমুখে ভীতমনে কর্ণ এসে পৌঁছলেন গুরুর আশ্রমে, কিন্তু কিচ্ছুটি বললেন না।

কর্ণের বাহুবীর্যে, কৌশলে, গুরুসেবায় পরশুরাম কিন্তু সম্পূর্ণ খুশি হয়েছিলেন। খুশির উপহার হিসেবে তিনি কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়বার কৌশল এবং সে অস্ত্র সংবরণ করার নিয়ম—সবই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র জেনে বারবার তিনি সে অভ্যাস রপ্ত করছেন এবং যেন আরও মন দিয়ে ধনুর্বিদ্যা অধিগত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কপাল যদি মন্দ হয় তবে জেনেও সে জানা কাজে আসে না। সেদিন উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের কাছেই এক জায়গায় কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে আছেন গুরু—এই সময়ে কাঁকড়া বিছে ধরনের একটি কীট কর্ণের উরুভেদ করে রক্ত খেতে লাগল। গুরুর ঘুম ভেঙে যাবে বলে কর্ণ একটুও নড়লেন না। অসহ্য বেদনা ভোগ করেও কর্ণ অপেক্ষা করতে লাগলেন—কখন গুরুর ঘুম ভাঙবে সেই সময়ের। তিনি গুরুকে একটুও নাড়ালেন না, একটু ব্যথার ভাব দেখালেন না, শুধু বীরের ধৈর্যে গুরুর মাথাটি নিশ্চল উরুতে ধারণ করে রইলেন—অকম্পয়ন্ অব্যথয়ন্ ধারয়ামাস ভার্গবম্। রক্তের ধারা বয়ে গিয়ে এবার পরশুরামের গায়ে লাগল। ঘুম ভেঙে সচকিত মনে তিনি বললেন—রক্ত গায়ে লেগে আমি অশুচি হলাম, বল কী হয়েছে, ঠিক ঠিক বল। কর্ণ বললেন, সব বললেন। পরশুরাম বললেন—দেখ বাপু! ব্রাহ্মণের ধৈর্য-সহ্য কতটুকু সব আমার জানা আছে, এই দারুণ কীটের দংশন কোনও বেটা বামুন সইতে পারবে না, এই সহ্যশক্তি ক্ষত্রিয়ের মানায়, সত্যি করে বল তুমি কে ? আমতা আমতা করে সানুনয়ে কর্ণ বললেন—আমার জন্ম হয়েছে সেই ঘরে, যে ঘরের ক্ষত্রিয় পুরুষ এক ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করেছিল—আমি সূত জাতির ছেলে—ব্রহ্মক্ষত্রান্তরে জাতং সূতং মাং বিদ্ধি ভার্গব। আমাকে লোকে রাধেয় কর্ণ—রাধার ছেলে বলে ডাকে।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়—কর্ণ পিতার নাম বললেন না কেন ? বিশেষত রাধার নামে কর্ণ পরিচিত বলে এমন বলা যায় কি যে, স্বয়ং রাধাই ছিলেন সেই ব্রাহ্মণী যিনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন অধিরথকে। উঁচু ঘরের মেয়ে বলেই হয়তো তাঁর নামেই কর্ণ বিখ্যাত হয়েছেন, অন্তত কর্ণের কথায় তো তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক, কর্ণ সম্পূর্ণ সত্য স্বীকার করে বললেন—লোকে আমাকে রাধার ছেলে বলে ডাকে। সত্যি বলতে কি অস্ত্রের লোভেই আমি মিথ্যে কথা বলেছি—প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ অস্ত্রলুব্ধস্য ভার্গব। আমি জানি, গুরু হলেন পিতার মতো, সেইজন্যে আপনার গোত্রেই আমি নিজের পরিচয় দিয়েছি।

টীকাকার নীলকণ্ঠ আগেই কর্ণের এই যুক্তি দেখিয়ে কর্ণের ওপর মায়া দেখিয়েছেন, কিন্তু আসলে কর্ণ ছলনাই করতে চেয়েছিলেন। বিপদে পড়লে যেহেতু যুক্তি মাথা থেকে বেরয়, তাই এখন তিনি বলছেন—আপনি আমার পিতার মতো, তাই আপনার গোত্রেই প্রথম পরিচয় দিয়েছি। গুরুর গোত্রে শিষ্যের পরিচয় অবশ্য শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু সে গোত্র পরম্পরায় নেমে আসে গুরুর কাছে দীক্ষিত হবার পর অথবা বহুকাল শিষ্যত্বসিদ্ধির পর, শিষ্য হবার আগেই নয়। যাই হোক আপন পরিচয় দিয়ে কর্ণ ভয় পেয়েছেন, তিনি কাঁপছিলেন। শিষ্যের অতদূর ধৈর্যে, গুরুসেবার নিশ্চল বৃত্তিতেও পরশুরামের

মায়া হল না। তিনি মারণাস্ত্রলুব্ধ শিষ্যের মিথ্যা পরিচয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—শুধুমাত্র অস্ত্রের লোভে তুই যেহেতু আমায় সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করেছিস, তাই তোর বিনাশকালে কিংবা অসম্ভব সংকটের মুহূর্তে ব্রহ্মাস্ত্র ছোড়বার কৌশল তোর মাথায় আসবে না—ন তে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি। তা ছাড়া এক্ষুনি তুই আমার সামনে থেকে দূর হ, কারণ মিথ্যের কোনও জায়গা নেই আমার আশ্রমে—গচ্ছেদানীং ন তে স্থানম্ অনৃতস্যেহ বিদ্যতে। তবে হ্যাঁ, অত ধৈর্য ধরে, অত যন্ত্রণা সহ্য করে কর্ণ যে গুরুর ঘুমের ব্যাঘাত করেননি, তাতে পরশুরাম একটু খুশি হলেন বইকি। তিনি বললেন—হ্যাঁ! তোমার এইটুকু হবে যে, যুদ্ধে অন্য কোনও ক্ষত্রিয় পুরুষ তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। বাস্, এইটুকুই। এর বেশি কর্ণ তাঁর সারা শিক্ষাজীবন ধরে এতগুলি গুরুর কাছে চেয়েছেন, কিন্তু পাননি। যাও বা গুরু পরশুরামের কাছে গোত্র ভাঁড়িয়ে পাওয়া গেল, সেই মারণাস্ত্রের ব্যবহার-ক্ষমতা তাঁর নিজেরই প্রবঞ্চনায় নিজের কাছে হারিয়ে গেল।

মহেন্দ্র পর্বত থেকে ফিরে এসে কর্ণ প্রথম দেখা করলেন দুর্যোধনের সঙ্গে এবং তাঁর কাছে ফের তিনি মিথ্যে কথা বললেন। বললেন—সমস্ত অস্ত্রের কৌশল আমি শিখে ফিরেছি, বন্ধু—দুর্যোধনম্ উপাগম্য কৃতাস্ত্রোঽস্মি ইতি চাব্রবীৎ। স্বয়ং পরশুরামের সমস্ত অস্ত্রের কৌশল-শেখা কর্ণ দুর্যোধনের কাছে আরও প্রিয়তর হয়ে উঠলেন। দুজনের মিলনে দুজনেরই খুব আহ্লাদ হল—দুর্যোধনেন সহিতো মুমুদে...। কর্ণ ফিরে এসে সেই লোকটার সঙ্গে পুনরায় জুটে গেলেন যার সঙ্গে অর্জুনের বৈরিতা আছে, যার সঙ্গে পাণ্ডবদের শত্রুতা আছে। হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে তখন অস্ত্রপরীক্ষার দিন গণনা চলছিল। যাঁরা ভাবেন অস্ত্রপরীক্ষার দিনে হঠাৎ কর্ণ এসে অর্জুনের প্রতিযোগী হয়ে রঙ্গস্থলে ধূমকেতুর মত উদয় হলেন, তাঁরা আমাদের পূর্বকথাগুলি ভেবে দেখবেন। আমাদের বিশ্বাস—রঙ্গস্থলে কর্ণের আসাটা পূর্ব-পরিকল্পিত এবং সেটি দুর্যোধনের সঙ্গেই কল্পিত। কর্ণের মনে দ্রোণ-গুরুর ব্যাপারে কিছু কাঁটাও ছিল এবং তাঁর ভাবটা এই—প্রতিযোগিতা যখন হচ্ছে, সেখানে অর্জুন তাঁর অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে জনতার ধন্যধ্বনি তুলবেনই, ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রোণের চরম-শিক্ষাটি না পেয়েও যদি অর্জুনের রণ-রস একটু খাটো করে দিতে পারেন সবার সামনে তাই বা মন্দ কী? পাঠক কিন্তু মনে রাখবেন কর্ণ পরশুরামের কাছ থেকে সোজা দুর্যোধনের কাছে এসেছিলেন; পিতা অধিরথের কাছেও যাননি, মা রাধার সঙ্গেও দেখা করেননি। সুদূরে চম্পায় বসে অধিরথ হয়তো কেবল এইটুকু শুনেছেন যে, কর্ণ ভালয় ভালয় হস্তিনাপুরে পৌঁছেছে। অধিরথ এও শুনে থাকবেন যে, হস্তিনাপুরে রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। তিনি প্রিয় পুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এবং অস্ত্র পরীক্ষার দিন কর্ণ যাতে প্ররোচিত না হন সেই জন্যই হয়তো বা রওনা দিয়েছিলেন হস্তিনার পথে।

অবশেষে সেই দিন এল। অস্ত্রপরীক্ষার জন্য দ্রোণ নিজেই জায়গা পছন্দ করে 'ডেকরেটর'দের মাপজোক দিয়ে দিলেন—মাপয়ামাস মেদিনীম্। একেবারে ঘাসকাটা সমভূমি জল ছিটোনো মাপা জায়গা। দুই দিকে 'গ্যালারি', রাজার মঞ্চ, মেয়েদের আলাদা বসবার জায়গা—সব তৈরি। নির্দিষ্ট দিনে কাতারে কাতারে লোক এসে জায়গা দখল করল। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সবাই উপস্থিত। স্বয়ং দ্রোণ অস্ত্র পরীক্ষার শুভক্ষণ ঘোষণা করলেন। প্রথমে ভীম এবং দুর্যোধন যথেষ্ট গদাযুদ্ধের কসরত দেখালেন। কৃত্রিম যুদ্ধ শেষে আসল যুদ্ধে পরিণত না হয়, সেই ভয়ে দুজনকেই 'ব্র্যাকেটে' ফার্স্ট করে দিলেন দ্রোণ—কৃত যোগ্যৌ উভৌ অপি। এবার ডাকলেন অর্জুনকে। শুধু ডাকা নয়, তাঁর ডাকার মধ্যে গুরুর সমস্ত প্রশ্রয় মেশানো ছিল, অর্জুনের মধ্যে তিনি আপন প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—বাজনাদারেরা! বাজনা থামাও, কথা শোনো—যে আমার ছেলের থেকেও প্রিয়, যে সমস্ত অস্ত্রের কৌশল জানে, সেই অর্জুন এবার এসো সামনে। অর্জুন এলেন, দৃপ্ত ভঙ্গিতে ধনুকবাণ হাতে নিয়ে অর্জুন এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল, কাঁসি একসঙ্গে বেজে উঠল। সমবেত জনতার আবেগে, অর্জুনের মহান উপস্থিতিতে কুরুপিতা ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত অর্জুনের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। বললেন—বিদুর! আজকে সত্যিই আমরা সুরক্ষিত বোধ করছি। আনন্দাশ্রুতে জননী কুন্তীর বুক ভেসে গেল—অস্রৈঃ ক্লিন্নমুরোঽভবৎ।

অর্জুন এবার অস্ত্রকৌশল দেখাতে থাকলেন। কখনও তিনি বাণমুখে আগুন সৃষ্টি করছেন, কখনও জল, কখনও ঝড়। কখনও তাঁকে রথের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, কখনও অন্তর্হিত, কখন তাঁকে লম্বা দেখাচ্ছে, কখনও বা হ্রস্ব—সবই অর্জুন দেখাচ্ছেন বাণের গতি-চাতুরিতে। যত অদ্ভুত বাণের খেলা দেখা যাচ্ছে, বাজনাদারেরা ততই উৎসাহে বাজনা বাজাচ্ছিল। তারপর অস্ত্রপরীক্ষার রঙ্গ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কমে এসেছে জনতার কোলাহল, বাজনাদারের বাজনা—মন্দীভূতে সমাজে চ বাদিত্রস্য চ নিস্বনে। এমন সময় রঙ্গদ্বার থেকে এক বিরাট শব্দ শোনা গেল, বজ্রের মতো তার আওয়াজ, মেঘধ্বনির মতো তার গাম্ভীর্য। সবাই একযোগে রঙ্গদ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সোনার কবচ-কুণ্ডলের শোভায় দীপ্তিমান হয়ে সূর্যের আলো-মাখা কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাঁটা-চলায় যেন পাহাড়ের গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে—পাদচারীব পর্বতঃ। আমাদের ধারণা কর্ণ খুব দূরে কোথাও ছিলেন না, মনে মনে পণও ছিল—যাব না রঙ্গভূমিতে, দর্শক হিসেবেও না। কিন্তু অর্জুনের ধনুক-টঙ্কারে, জনতার জয়ধ্বনিতে আর মুহুর্মুহু যুদ্ধ-বাজনা তীব্রতর হওয়ায় তিনি আর থাকতে পারেননি। অর্জুনের প্রতি তাঁর আক্রোশই রঙ্গশেষের বেলায় তাঁকে টেনে আনল রঙ্গভূমিতে।

রঙ্গভূমির মাঝখানে, যেখানটা অর্জুন দাঁড়িয়েছিলেন, একেবারে সেইখানটা এসে কর্ণ চারিদিকটা দেখে একবার ঠাহর করে নিলেন। দ্রোণ আর কৃপকে একটা প্রণাম জানালেন অত্যন্ত অনাদরে, অবহেলায়—প্রণামং দ্রোণকৃপয়ো র্নাত্যাদৃতমিবাকরোৎ। ভাবটা এই—তোরা আমায় শেখালি না, কিন্তু আমি সব শিখেই এসেছি। বড় ভাই ছোট ভাইকে চিনল না—ভ্রাতা ভ্রাতরমজ্ঞাতম্—সবার সামনে অর্জুনকে উদ্দেশ করে কর্ণ বললেন—অর্জুন ! এক একটা বাণ চালানোর মধ্যে যেন কত কায়দা আছে এমন একটা বিশেষ ভাব দেখিয়ে যে তুমি ধনুক-বাণের কেতা দেখিয়েছ, সে সবই আমি আবার করে দেখাব—করিষ্যে পশ্যতাং নৃণাং—তুমি নিজেকে নিয়ে অত বিস্ময়ের ভাব জাগিয়ে তুলো না বড়। যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বস্তুর মত জনতা একেবারে লাফ দিয়ে উঠল—লোকটা বলে কী, অর্জুনের মতো করবে। দ্রোণও অনুমতি দিলেন—একজনকে তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, আর একজনকে শুধু জাতের লঘুতায় বঞ্চিত করেছেন, তাঁকে ছাড়াই সে কতটা শিখল, এই কৌতূহল থেকেই তিনি কর্ণকে অনুমতি দিলেন। সত্যি, কর্ণ সব করে দেখালেন, যা যা অর্জুন করেছিলেন—যৎ কৃতং তত্র পার্থেন তচ্চকার মহাবলঃ। একশো ভাইয়ের সঙ্গে একযোগে দুর্যোধন সবার সামনে জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। বললেন—দারুণ দিয়েছ বন্ধু ! তুমি আমার কুরুরাজ্যে যা ইচ্ছে ভোগ কর। কর্ণ বললেন—আমি শুধু তোমার বন্ধুত্ব চাই, আর এখনই অর্জুনের সঙ্গে সোজাসুজি লড়তে চাই। সেও ক্ষমতা দেখাক, আমিও দেখাব। দুর্যোধন বললেন—তুমি বন্ধুর মুখ উজ্জ্বল কর, শত্রুদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দাও—দুহৃদাং কুরু সর্বেষাং মূর্ধ্নি পাদম্ অরিন্দম। পাণ্ডবদের ওপর সাধারণ শত্রুতায় দুর্যোধন এবং কর্ণ আবার একসঙ্গে হাত মেলালেন।

অর্জুন খুব অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর লজ্জাও হল রাগও হল। তিনি বললেন—না ডাকতেও যারা রবাহূত আসে, না কথা বললেও যারা কথা বলে, তুমি তাদেরই মতো, কর্ণ ! কর্ণ বললেন—রঙ্গস্থল সবার, সর্বসাধারণের, তোমার এতে বলার কী আছে অর্জুন—কিমত্র তব ফাল্গুন। যাঁরা বলবান, তাঁরা শক্তির পেছনে ধাওয়া করেন। তা ছাড়া তোমার এত বাক্যি দেওয়ার তো কিছু নেই, বাণের মুখে কথা বল, আমি জবাব দিচ্ছি। আজকে তোর গুরুর সামনেই তোর মাথাটা গলা থেকে খসিয়ে দেব আমি—গুরোঃ সমক্ষং যাবৎ তে হরাম্যদ্য শিরঃ শরৈঃ। বেশ বোঝা যায় অর্জুনের ওপর কর্ণের যত রাগ, তাঁর গুরু দ্রোণের ওপরেও ঠিক ততখানি। ফাঁকে ফোকরে, দ্রোণকেও তিনি বক্রোক্তি করতে ছাড়ছেন না। অর্জুন দ্রোণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য। কর্ণও প্রস্তুত। দুই মহাবীরের 'চ্যালেঞ্জে' সমস্ত রঙ্গস্থলের সমর্থকেরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। কর্ণের পাশে পাশে থাকলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা—ধার্ত্তারাষ্ট্রাঃ যতঃ কর্ণঃ। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—এঁরা দাঁড়ালেন অর্জুনের দিকে। রঙ্গস্থলের সমাজ দ্বিধা হল, এমনকী রমণীরা পর্যন্ত দুই বীরের সমর্থনে দ্বিধা হলেন। কিন্তু দ্বিধাভিন্ন রমণীকুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন জননী অজ্ঞান হয়ে

গেলেন। শেষে বিদুর, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রঙ্গস্থলের বিবরণ শোনাচ্ছিলেন, তিনি কোনওরকমে দাসীদের ডেকে চন্দন জলের ছিটায় কুন্তীকে বিপদমুক্ত করলেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরেও সেই পরস্পর-স্পর্ধী দুই পুত্রকে দেখে কুন্তী যে কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তিনি চেঁচিয়ে বলতে পারতেন—ওরে কর্ণও আমার ছেলে, তোরা কেউ যুদ্ধ করিস না। তাতে লোকলজ্জা, কন্যাগর্ভের কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ত। যদি বা এত কথা তিনি নিজমুখে নাও বলতেন, ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিরা তাঁকে ছাড়তেন না। স্বয়ং ব্যাস এই অস্ত্রপরীক্ষার দিনে মঞ্চে বসে ছিলেন। কুন্তীর সংকটমুহূর্তে তিনি সব বলে দিতেন, তাতে জ্বালা আরও বাড়ত, কমত না। কিন্তু পুত্র পরিচয়ের সম্মান যে দিতে পারে না, তাকেও অসম্মানের জ্বালা বইতে হয়, আরেকভাবে। অনিবার্য যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তখন কৃপের মুখে নির্মম প্রশ্নবান নিক্ষিপ্ত হয়, তাতেও কুন্তীর জ্বালা বাড়ে, কমে না। কৃপ বললেন—ইনি পৃথার ছেলে, পাণ্ডব অর্জুন, ইনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তোমার কোন বংশে জন্ম, মাতৃকুল, পিতৃকুল সব বল। সেগুলো জেনেই ইনি যুদ্ধ করবেন তোমার সঙ্গে, কারণ রাজপুত্রেরা কুলমানহীন সাধারণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না।

আসলে দুয়ে দুয়ে যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তখন এই নিয়ম, প্রত্যেককে আপন আপন কুলপরিচয় দিয়ে যুদ্ধে নামতে হয়। কৃপাচার্য কর্ণের প্রথম গুরু, ছোটবেলায় যখন কর্ণ এসে তাঁর পাঠশালায় ঢুকেছিলেন, তিনি তখন থেকেই সব জানেন এবং জানেন যে, ওই কথা বললে কর্ণ প্যাঁচে পড়বেন। বিশেষত কর্ণ প্রথম থেকেই কৃপ এবং দ্রোণকে যেভাবে তাচ্ছিল্য এবং অপমান করে যাচ্ছিলেন, তাতে কৃপের কিঞ্চিৎ বিরক্ত হওয়ারই কথা। তা ছাড়া শিক্ষা-দানের যে মনস্তত্ত্ব আছে সেই ব্যবস্থায় নাকি অত্যুৎসাহী ছাত্রদের কিঞ্চিৎ দাবিয়ে রাখার নিয়ম। কৃপ তাই কর্ণের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করে একেবারে দাবিয়ে দিলেন। এত বড় বীর যে এক মুহূর্তে চুপটি করে গেলেন তাতে মহাভারতের কবির মনে আঘাত লেগেছে। তিনি বলছেন, কৃপের প্রশ্ন শুনে কর্ণের মুখটি লজ্জায় অবনত হল। অর্জুনের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধী কর্ণের মুখটি লাগছিল সদ্য ফোটা পদ্মের মত। এই মুহূর্তে সেই ফুল্ল পদ্মের ওপর কৃপের প্রশ্ন যেন বর্ষার জল ঢেলে দিল—বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা। পদ্মের উপমা কেন ? পদ্ম যে পাঁকে ফোটে, কর্ণও যে সূতপঙ্কে পঙ্কজ। যদি বা পাঁকে পদ্ম ফুটল, তার ওপরে বর্ষার জলধারা নামল। নিজের মৃণাল-মেরুদণ্ডে তাঁকে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হল না—বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা।

এগিয়ে এলেন দুর্যোধন। এই অপমানের দিনে দুর্যোধন সত্যিই বন্ধুর কাজ করলেন। তিনি বললেন, আচার্য ! তিন রকমের রাজা হয়—যিনি সৎকুলে জাত, যিনি বীর এবং যিনি সৈন্যপরিচালনা করতে পারেন। তবু যদি রাজা নয় বলে অর্জুনের যুদ্ধে শুচিবাই থাকে, তবে এই মুহূর্তে কর্ণকে আমি অঙ্গরাজ্যের রাজা করে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ফুল, খই, মুকুট, সোনার পিঁড়ি, সব এসে গেল। মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণেরা অভিষেকমন্ত্র পড়লেন। জয়শব্দ উচ্চারণ করলেন কৌরবেরা। যবনী রমণীরা কর্ণের মাথার ওপর ছাতা ধরে চামর ঢুলাতে লাগল—সচ্ছত্রবালব্যজনো জয়শব্দোত্তরেণ চ। কর্ণ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দুর্যোধনকে তিনি বললেন—রাজ্য দিয়েছ তুমি, এর উত্তরে আমি কীই বা দিতে পারি তোমায়। দুর্যোধন বললেন—কিছু নয়, শুধু তোমার বন্ধুত্ব চাই। দুই পাণ্ডববিরোধী মহাবীর পরস্পর আলিঙ্গন করলেন।

তবু যুদ্ধ হত, অর্জুন-কর্ণে তবু একটা যুদ্ধ তখনই লাগত। কিন্তু সেই মুহূর্তে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধপ্রায় এক মানুষ, পথক্লেশে এবং তাড়াতাড়িতে তাঁর উত্তরীয়বাস লুটোচ্ছে ভুঁয়ে। ঘেমে নেয়ে লাঠিতে ভর করে প্রবেশ করলেন কর্ণের পিতা সূত অধিরথ। তাঁকে দেখা মাত্র ধনুক ত্যাগ করে কর্ণ তাঁর অভিষেকের জল-ধোয়া মাথাটি লুটিয়ে দিলেন অধিরথের পায়ে—কর্ণোঽভিষেকাদ্রশিরাঃ শিরসা সমবন্দত। এতগুলি প্রণম্য লোকের সামনে পুত্রের এমন সগর্ব প্রণাম পেয়ে অধিরথের যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল। নিজের কাপড়ের খুঁটি দিয়ে নিজের পা দুখানি ঢেকে তিনি বললেন—থাক্ বাবা ! থাক্ থাক্। অঙ্গরাজ্যের অভিষেকে আর্দ্র-শির কর্ণের মাথায় পিতৃতীর্থের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

অসহিষ্ণু মধ্যম পাণ্ডব এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার সূত অধিরথকে দেখে তাঁর কথায় ধার এসে গেল। ভীম বললেন—ওরে সারথির বেটা, তুই না রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবি বলছিলি। তুই বরং যা, ধনুক ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার লাগাম ধর হাতে—কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া। এ আবার অঙ্গরাজ্যের রাজা হয়েছে, তোর কি সে যোগ্যতা আছে? কুত্তা যেন যজ্ঞের ঘি খেতে এসেছে। এইসব কাদা-ছোঁড়া কথার উত্তরে কর্ণের বিকল্প আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস, আর আছে পিতৃকল্প সূর্যের দিকে তাকানো। আবার প্রতিবাদ করলেন দুর্যোধন। বললেন—এসব বাজে কথা বোলো না ভীম। ক্ষত্রিয়ের বলই সব ; বলবান পুরুষ আর নদীর উৎস খুঁজতে যেয়ো না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে। এই বিশ্বামিত্র, দ্রোণ, কৃপ—এঁদেরও জন্মবিন্দুতে রহস্য আছে। আর ভীম! তোমাদের পাঁচভায়ের জন্ম কেমন করে হয়েছে তাও আমি জানি—ভবতাঞ্চ যথা জন্ম তদপ্যাগমিতং ময়া। তা ছাড়া চেয়ে দেখ, এই যাঁর চেহারা, সোনার বর্ম আর সোনার কুণ্ডল যাঁর জন্ম থেকে গায়ে আঁটা, সূর্যের মতো উজ্জ্বল গায়ের রং—এইরকম মানুষের জন্ম কি নীচকুলে হতে পারে, হরিণীর পেটে কি বাপু বাঘ জন্মায়—কথমাদিত্যসংকাশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি। দুর্যোধন বললেন—আরে! শুধু অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই রাজা হবার উপযুক্ত আমাদের কর্ণ। তা ছাড়া কারও যদি আমার কথাবার্তা ভাল না লাগে, সে এস না বাপু, যুদ্ধ করবে।

আবার যুদ্ধ হয় হয়। রঙ্গস্থলের লোকেরা, দর্শকেরা হাহাকার করে উঠল। কিন্তু ওই সময়ে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেল। কাজেই শুধুমাত্র আলোর অভাবে সে যাত্রা আর কিছু হল না। অস্ত্র-পরীক্ষার দিনে সবচেয়ে বড় লাভ হল দুর্যোধনের। সব শিখে এসেছি বললেও কর্ণেরও একটা পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত নাই যাক, যতটুকু দেখেছেন, তাতেই দুর্যোধন দারুণ খুশি। তিনি হাতে ধরে আগে আগে নিয়ে চললেন তাঁকে এবং তাঁর একশো ভাই মশাল জ্বালিয়ে কর্ণের জয়ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে চলল—দীপিকাগ্নিকৃতালোক স্তস্মাদ্ রঙ্গাদ্ বিনির্যযৌ। পাণ্ডবরাও ভীষ্ম-দ্রোণদের সঙ্গে বেরিয়ে নিজের নিজের ঘরে গেলেন। সমাজের লোকেরা কেউ অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল, কেউ বা কর্ণের, এমনকী কেউ কেউ দুর্যোধনেরও প্রশংসা করতে লাগল। পাণ্ডবভাইদের মধ্যে যুদ্ধবলে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ যুধিষ্ঠিরের ধারণা হল যে, কর্ণের মতো বীর বুঝি আর দুনিয়ায় নেই। অবশ্য এই ধারণা হল অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অতিপরিচয়ের ফলেই, যাকে ইংরেজিতে বলি familiarity breeds contempt. কিন্তু দুর্যোধনের লাভ, পাণ্ডবদের ক্ষতি, আচার্যদের অপমান—এ সব কিছু অতিক্রম করে অতি অদ্ভুত এক চাপা আনন্দ রঙ্গস্থলে বসে-থাকা এক রমণীকে আপ্লুত করে দিল। যেখানে পাণ্ডব-জননী কুন্তী অন্যান্য কুলবতীদের সঙ্গে তাঁদের মতো করেই কথা-বার্তা বলতে বলতে ঘরে ফিরছিলেন, সেখানে তাঁরই মধ্যে এক কুমারী-জননী হৃদয়-ভরা চাপা আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন। যাঁকে নাম ধরে ডাকতে পারেননি, লোকলজ্জায় যাঁকে জননীর প্রথম বাৎসল্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাঁর সেই ছেলে আজ রাজা হয়েছে। কুমারী-গর্ভের মতো এ আনন্দও যে অপ্রকাশ্য—আনন্দ প্রকাশিত হলে পূর্বের লজ্জাও প্রকাশিত হবে, তাই চাপা আনন্দ—পুত্রম্ অঙ্গেশ্বরং স্নেহাচ্ছন্না প্রীতিরজায়ত।

৪

কর্ণ ছোট ছিলেন, বড় হয়েছেন। তাঁর জন্মের রহস্য তাঁর যতখানি বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে জন্ম-রহস্যে পরম্পরায় জমে ওঠা অপমান। অস্ত্রশিক্ষার *'স্ট্রাগল' তাঁর বয়স বাড়িয়েছে, বয়স বাড়িয়েছে রাজবাড়ির পরতন্ত্রতা।* অঙ্গরাজ্যের রাজা হয়ে তিনি পরের দিনই পিতা অধিরথকে নিয়ে সিংহাসন দখলের জন্য রওনা হননি। বরঞ্চ দুর্যোধনের অসামান্য উপকারের প্রতিদানে তাঁর কাছে প্রতিদিনের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করাই যেন কর্ণের একমাত্র কাজ বলে মনে হল। দ্রোণ গুরুদক্ষিণা হিসেবে দ্রুপদকে ধরে আনতে বললে, কর্ণ কিন্তু দ্রোণের সম্পূর্ণ শিষ্য না হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন এবং অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

এইখানে তাঁর প্রথম হার হল। আর কি, এবার তিনি হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির দৈনন্দিন 'পলিটিক্সে' জড়িয়ে পড়লেন। দুর্যোধন প্রতিনিয়ত চিন্তা করছেন কী করে জ্ঞাতিভাই পাণ্ডবদের শায়েস্তা করা যায়। দুর্যোধনের সঙ্গে থাকতে থাকতে পাণ্ডবদের শাস্তিচিন্তা কর্ণেরও একান্ত আপন কর্তব্য বলে মনে হতে লাগল। আগুনে ঘি পড়ল যখন অস্ত্রপরীক্ষার দিন থেকে প্রায় এক বছর পরেই যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজের পদে অভিষেক করলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র। শুধু যুবরাজ হলেও হত, রাজ্য পাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই যুধিষ্ঠির আপন গুণে পিতা-পিতামহের কীর্তি ম্লান করে দিলেন। অন্যদিকে গুরু দ্রোণ গদগদ হয়ে অর্জুনকে দিয়ে দিলেন ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, যা তিনি তাঁর গুরুর কাছে পরম্পরাক্রমে পেয়েছিলেন। কৌরবদের আরও রাগ হল এইজন্যে যে, যুধিষ্ঠিরের প্রতিনিধি হয়ে অর্জুন এমন কতগুলি রাজ্য জয় করে এলেন, যা তাঁর বাবাও পারেননি—ন শশাক বশে কর্তুং যং পাণ্ডুরপি বীর্যবান্। সবাই যখন ধন্যি ধন্যি করতে আরম্ভ করল, তখন দুর্যোধনের অন্তঃকক্ষে যে সামান্য কজন পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারবার বুদ্ধি করলেন, তার মধ্যে একজন হলেন কর্ণ—দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ দুষ্টং মন্ত্রম্ অমন্ত্রয়ন্। এ কথা অবশ্য মানতে হবে যে, কৌরবদের এই সব হীন চক্রান্ত কর্ণ ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না। কিন্তু পরতন্ত্রতা এবং অধমর্ণতার এই এক দায় যে, অনীপ্সিত হলেও তিনি আস্তে আস্তে রাজবাড়ির কূট চক্রান্তগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠলেন। বারণাবতে জতুগৃহের আগুন পাণ্ডবদের গায়ে আঁচ লাগাতে পারল না, কিন্তু এই আগুনের পথ ধরে আরেক আগুন উলটে এসে লাগল হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। এতে দুর্যোধনেরা যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে কর্ণ।

জতুগৃহ থেকে বেঁচে পাণ্ডবেরা এ বন সে বন ঘুরে গঙ্গাদ্বারে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এসেই শুনলেন যজ্ঞের বেদী থেকে জন্মানো দ্রৌপদীর কথা—আগুনপানা দ্রৌপদীর কথা। শুনলেন, সেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে। পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারীর বেশে এসে পৌঁছলেন পাঞ্চালে। অন্যদিক থেকে বড় বড় রাজ্যেব যত রাজা-মহারাজা আছেন—তাঁরা সবাই এসে উপস্থিত হলেন পাঞ্চালে। তিন ভুবনের সেরা সুন্দরী দ্রৌপদী। গায়ের রঙ কালো বটে, কিন্তু বিদগ্ধতা এবং ব্যক্তিত্বে তিনি সমস্ত রমণীকুলের মূর্ধন্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। সবার ওপরে তাঁর জন্মলগ্নে অলৌকিকতার স্পর্শ থাকায় বহু রাজাই এলেন তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে। স্বয়ম্বরা দ্রৌপদী যখন বরমাল্যের থালি নিয়ে অপেক্ষা করছেন বাজসভায়, তখন পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণিপ্রার্থী বড় বড় রাজাদের নাম ডাকতে থাকলেন জোরে জোরে। তার আগেই তিনি ঘোষণা করেছেন—যে ওই যন্ত্রস্থিত মৎস্যচক্ষু ভেদ করতে পারবে, সেই হবে দ্রৌপদীর স্বামী। ধৃষ্টদ্যুম্নের বলার মধ্যে একটু প্যাঁচ ছিল। তিনি বলেছেন—এই মহান কাজ যে করতে পারবে, সেই কুলীন, রূপবান এবং বীর্যবান পুরুষই দ্রৌপদীর স্বামী হবে—কুলেন রূপেণ বলেন যুক্তঃ। তস্যাদ্য ভার্যা ভগিনী মমেয়ম্। হয়তো এ-কথা শুনে কর্ণের মনে একটু খটকা লেগেছিল—আবার সেই কুলের কথা! হয়তো ভাবলেন—সাজানো বক্তৃতার মধ্যে কুলের কথাটা অভ্যাসবশেই এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু একী! বড় বড় রাজাদের নাম ডাকার সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন তো দুর্যোধন, দুঃশাসন, এমনকী বিকর্ণ, দুর্বিষহ, দুর্মুখ নামে ধৃতরাষ্ট্রের অকর্মা ছেলেগুলিরও নাম করলেন। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের যে ছেলেগুলির নাম বলা গেল না, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদেরও কারক-বিভক্তি ঠিক করে কর্তৃপদে ব্যবহার করলেন। আর কর্ণের কথা বলতে গিয়ে বললেন—ওঁদের সঙ্গে এসেছেন কর্ণও—কর্ণেন সহিতা বীরা ত্বদর্থং সমুপাগতাঃ। কারক-বিভক্তির এই অপব্যবহার কর্ণের মনে লাগে বইকি! তবু তিনি ভাবলেন—যাকগে, তীর ছোঁড়ার সময় দেখা যাবে, তখন আর কাউকে কলকে পেতে হবে না।

সত্যিই তো তাই, মৎস্য-চক্ষু ভেদ করার সময় দুর্যোধন, শাল্ব, শল্যেরা তো কিছুই করতে পারলেন না। না হয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণের নামটা যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বলেননি, তাই বলে কি মহাভারতের কবিও নির্মমতায় মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন কর্ণের দিক থেকে। কবি সমস্ত ধনুক-তোলা রাজাদের মধ্যে হাহাকার আর্তস্বর তুলে দিয়ে বলেছেন—রূপে, ক্ষমতায়, কুলগর্বে, টাকাপয়সা, যৌবনে যারা বলীয়ান,—রূপেণ বীর্যেণ কুলেন চৈব শীলেন বিত্তেন চ যৌবনেন,—তারা তো প্রথম থেকেই

একসঙ্গে কৃষ্ণাকে পাবার জন্য লাফিয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্যভেদ করতে ; কিন্তু তাঁরা যে সবাই একে একে ধনুক তুলতে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছেন—বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থাঃ। কর্ণ এতক্ষণ বংশবাগীশ রাজাদের মুরোদ দেখছিলেন। কর্ণের প্রতি মমতায় ব্যাস অন্তত তাই বলেছেন—সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণ—সমস্ত রাজাদের চেষ্টা-চরিত্তির দেখে, ধনুর্ধরী বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ এবার এগিয়ে গেলেন ধনুকের কাছে—ধনুর্ধরাণাং প্রবরো জগাম।

না, অন্যান্য তথাকথিত বীরদের মতো দ্রুপদের রাখা ধনুক তুলতে গিয়ে কর্ণের গলার হারটি খসে পড়েনি, শিথিল হয়নি হাতের কাঁকন—বিস্রস্তহারাঙ্গদচক্রবালম্। কর্ণ ধনুক তুললেন এক মুহূর্তে, উদ্যত ধনুকে গুণ পরালেন সঙ্গে সঙ্গে এবং তাতে লক্ষ্যভেদী বাণ জুড়লেন চোখের নিমেষে। এই তৎপরতা দেখেও যাঁরা ভাবলেন কর্ণ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জিতে নিতে পারবেন না, তাঁরা হচ্ছেন সেই আহাম্মকেরা, যাঁরা পূর্বে ধনুক তোলার চেষ্টা করে মাটিতে গেঁড়ে বসেছেন। কিন্তু ধনুকের রীতিনিয়ম যাঁরা জানেন, সেই পাণ্ডবেরা কিন্তু ব্রহ্মচারীর মতো বসে থেকেও কর্ণকে দেখে সবিষাদে নিশ্চিত হলেন যে, আর দ্রৌপদীকে পাওয়া হল না, কর্ণ তাঁকে লক্ষ্যভেদ করে এই নিয়ে নিল বলে। আর দ্রৌপদী, যিনি এতক্ষণ বরমাল্য হাতে মজা দেখছিলেন, স্বয়ম্বরের শর্ত অনুযায়ী লক্ষ্যভেদ করলেই যাঁর বরমাল্য হাতে এগিয়ে আসার কথা, সেই দ্রৌপদী নিশ্চয় ভাবছিলেন—এ পুরুষটি যেন ধনুক তুলতেই না পারে। কিন্তু এবার ! লোকে যে এই মানুষটাকে সূতপুত্র বলে জানে, শেষে অলৌকিক আগুন থেকে জন্ম নিয়ে সারথি জাতের গলায় মালা ! সমস্ত সভাকক্ষ উচ্চকিত করে দ্রৌপদী রীতিমতো চেঁচিয়ে বললেন—আমি কিন্তু সূতপুত্রকে বরণ করব না—নাহং বরয়ামি সূতম্।

কর্ণ মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন, সামনে হয়তো তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তাঁর চিরপরিচিত বিকল্প, সূর্যের দিকে তাকালেন—সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যম্—ছুড়ে ফেলে দিলেন ধনুকটি। এই যে কর্ণ মাঝে মাঝেই সংকটকালে সূর্যের দিকে তাকান, এর একটা অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের ধারণা, কর্ণ তাঁর নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানতেন, অন্তত সূর্যের ঔরসে যে তাঁর জন্ম, এটা তিনি জানতেন। পিতা অধিরথ এবং মাতা রাধার সগৌরব ব্যবহারে এও হয়তো কর্ণের ধারণা ছিল যে, এই সূতবংশের সঙ্গে তার যোগ হয়েছে মাত্র, এঁরা তাঁর জন্মদাতা নন। ভাগ্যের পরিহাসে সূত পিতামাতার স্নেহসম্বন্ধ কর্ণ কখনও অস্বীকার করতে পারেন না বা করতে চানও না, কিন্তু এই সব বিপন্ন মুহূর্তে সূতবংশের সঙ্গে তাঁর আরোপিত কৌলিক যোগ আছে বলে মনে মনে তিনি ভীষণ রেগে যান। নীলকণ্ঠের ধারণা দ্রৌপদীর উচ্চ প্রত্যাখ্যানের পর যে তাঁর রাগ হয়েছে তা এই কারণেই—নীচকুলযোগাদ্ অমর্ষঃ। আর কর্ণ যে তবু হাসলেন, সে হাসি দ্রৌপদীকে তাচ্ছিল্য করে নয়। নীলকণ্ঠ মনে করেন, ও হাসিটা সূর্যের প্রতি কটাক্ষ। ভাবটা এই—কার অপরাধে কার শাস্তি,—অতএব সূর্যাপরাধত্বাৎ হাসঃ।

আমরা যদি নীলকণ্ঠের মতো অত গভীরে নাও যাই, যদি বলি যোগ্য ব্যক্তিকে অহেতুক ছুতোয় দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেই কর্ণের রাগ হয়েছে এবং তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছেন তিনি, তা হলেও কোনও ক্ষতি নেই। বস্তুত কর্ণের মনস্তত্ত্ব-গঠনে দুটি নারীর অবদান সাংঘাতিক। কর্ণের জীবনে যে বিকারগুলি ঘটেছে, যে আচরণগুলি তাঁর জীবনে পরস্পরবিরোধী—সেই বিকার এবং স্বতোবিরোধিতার মূলে আছে দুটি নারীর ভূমিকা—এবং সে দুটিই প্রত্যাখ্যানের কাহিনী। এই দুই নারীর প্রথমটি কুন্তী, দ্বিতীয়জন দ্রৌপদী। প্রথমজন অতি শৈশবে জন্মলগ্নেই কর্ণের প্রতি তাঁর পুত্র-সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দ্বিতীয়জন যৌবনে যোগ্য-পুরুষের যোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি বা কুন্তীর দিক থেকে পুত্রত্ব-অস্বীকারের পরেও সূতজননীর স্নেহপ্রলেপে সে জ্বালা কিছুটা কমেছিল, যৌবনোদ্দীপ্ত বীরপুরুষের পৌরুষ অস্বীকার করে সে জ্বালা চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুললেন এমন এক রমণী, যিনি একমাত্র পুরুষকারের দ্বারা লক্ষ্যভেদ মাত্রেই যে কোনও পুরুষের দ্বারা জিতা হবেন বলে পূর্বাহ্নেই স্বীকৃতা। উন্মুক্ত সভাস্থলে দ্রৌপদীর এই অপমান কর্ণ কোনওদিন ভোলেননি এবং ভোলেননি বলেই এ অপমান কর্ণের মনের গভীরে এমন এক কূট অন্তঃক্রিয়া

করেছিল যা থেকে দ্রৌপদী কোনওদিন রেহাই পাননি, পরস্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নয়।

বারণাবতের অগ্নিকাণ্ড বানচাল হয়ে গেল এবং উলটে পাণ্ডবেরা বেঁচে ফিরে উপহারের মতন পেলেন দ্রৌপদীকে—এই ঘটনা কৌরবশিবিরে দারুণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। দ্রুপদের রাজসভায় দ্রৌপদীর বিয়েকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু কর্ণ তখন অর্জুনকে চিনতে পারেননি। সন্দেহ হয়েছিল অবশ্য ; কর্ণ বলেও ফেলেছিলেন—ব্রাহ্মণ। যুদ্ধে তোমার নৈপুণ্য দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি—তুষ্যামি তে বিপ্রমুখ্য—কিন্তু সত্যি বলতে কি সাক্ষাৎ ইন্দ্র ছাড়া কিংবা অর্জুন ছাড়া আমার সঙ্গে এমনিতর এতক্ষণ যুদ্ধ করবে, এ হতেই পারে না। তুমি কি বাপু পরশুরাম না সাক্ষাৎ হরিহর। অর্জুন তখন মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যুদ্ধ থামানোর জন্যই হোক, কিংবা নববধূর বিস্মিত, স্ফুরিত মুখখানি দেখার জন্যই হোক, অর্জুন বলেছিলেন—আমি পরশুরামও নই, অন্য কেউই নই ; আমি ব্রাহ্মণ। আজকে তোমাকে যুদ্ধে জয় করব বলেই এখানে উপস্থিত, তুমি ক্ষান্ত হও আজ—বীর স্থিরো ভব। অর্জুনের মধ্যে প্রচুর ব্রাহ্মতেজ আছে, এইরকম একটা বিচারেই কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষান্তি দিলেন—ব্রাহ্মং তেজস্তদাযজ্যং মন্যমানো মহারথঃ। কিন্তু আজকে যখন চর এসে কৌরবশিবিরে খবর দিল যে, দ্রৌপদীকে অর্জুনই জিতে নিয়েছে এবং ভীম, অর্জুন সকলেই ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সবাইকে বোকা বানিয়েছে, তখন কৌরবপক্ষে নিজেদের মধ্যে যেন ধিক্কার উঠল। একে তো জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচেছে পাণ্ডবেরা, তার মধ্যে আবার অর্জুন জিতে নিল দ্রৌপদীর মত সুন্দরীকে—এত সব ভেবে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি—সবাই মাথা নিচু করে বসেছিলেন। দুঃশাসনটার লজ্জা একটু কম। সে যেন কর্ণকে তাঁর পুরনো সংলাপ স্মরণ করিয়ে দিয়েই চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকল—বেটা যদি বামুনের বেশ ধরে না থাকত তা হলে আর পেতে হত না দ্রৌপদীকে। ভাবটা এই—আমাদের কর্ণ তা হলে দিত ঠাণ্ডা করে ওই অর্জুনটাকে। দুঃশাসন বললেন—সবই কপাল, দাদা ! সবই কপাল—দৈবঞ্চ পরমং মন্যে—নইলে একটা লোকও সেদিন অর্জুনকে চিনতে পারল না।

পাণ্ডবদের এমন সফলতায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও বড় খুশি হলেন না। বিদুরের সামনে মিথ্যে আনন্দ দেখিয়ে দুর্যোধনকে তিনি বললেন—তোমাদের যা ইচ্ছে, আমি তাই করব—যচ্চ ত্বং মন্যসে প্রাপ্তং তদ্ ব্রবীহি সুযোধন। কর্ণকে বললেন—এই অবস্থায় কী করা যায় শীগগির বলো, কর্ণ। কী করা যায়—এমন প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবে দুর্যোধনই প্রথমে বলবেন। তিনি অনেকগুলি প্রস্তাব দিলেন। বললেন—আমরা এবার ওদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ তৈরি করব। ভাল গুপ্তচর দিয়ে এমন কৌশল করা যেতে পারে যাতে সৎমা মাদ্রীর ছেলেদুটো কুন্তীর ছেলে তিনটেকে বিষ নজরে দেখে। দ্বিতীয়ত এমন করা যেতে পারে যে, দ্রুপদ, দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, এমনকী দ্রুপদের মন্ত্রীদের পর্যন্ত টাকা পয়সা খাইয়ে এমন করব যাতে যুধিষ্ঠিরকে তাঁরা ত্যাগই করে বসবেন, কিংবা যুধিষ্ঠিরের কানের কাছে সদা-সর্বদা গুপ্তচররা বলবে—হস্তিনাপুর অতি বাজে জায়গা, তোমরা বাপু এখানেই থাক। তৃতীয়ত আর একটা উপায় হতে পারে যে, অত্যন্ত বিশ্বস্ত গুপ্তচর গিয়ে নববধূ দ্রৌপদীর মনে বহুস্বামিতার দোষ জাগিয়ে তুলবে। এটা করা খুব কঠিন হবে না, কারণ দ্রৌপদী সে কষ্ট নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে—বহুত্বাৎ সুকরং হি তৎ—তারপর স্বামী স্বামীতে ঝগড়া-ঝাঁটি লাগিয়ে দিয়ে গুপ্তচর কেটে পড়বে। চতুর্থ উপায়, ছদ্মবেশে সেই রকম কিছু মানুষ গিয়ে ভীমকে মেরে ফেলুক, আর ভীম মারা গেলে ওই অর্জুনটা আমাদের কর্ণের কড়ে আঙুলের যোগ্যও নয়—রাধেয়স্য ন পাদভাক্ ('পাদভাক্' মানে নীলকণ্ঠ বলেছেন, কর্ণের এক চতুর্থাংশের সমানও হবে না)। দুর্যোধন বললেন—অথবা আরেক কাজ করা যেতে পারে, দারুণ দেখতে কতকগুলি মেয়েছেলে পাঠান। তারা গিয়ে এক একটি পাণ্ডবকে ধরবে আর রঙ্গ-রসে মজিয়ে দেবে, তখন দ্রৌপদীই ওদের ওপর রাগ করে ভেগে যাবে—অথবা দর্শনীয়াভিঃ প্রমদাভি র্বিলোভ্যতাম্। আর এটাও আপনার ভাল না লাগলে কর্ণকে পাঠান পাণ্ডবদের নিয়ে আসতে। তারপর নিয়ে আসার পথে গুপ্তঘাতক দিয়ে রাস্তাতেই পাণ্ডবদের সাবাড় করে দিন। এতগুলো প্রস্তাব দিলাম, আপনি যেটা ইচ্ছে করুন। একেবারে সব কথার শেষে দুর্যোধন বললেন—কর্ণ, কী বলো, উপায়গুলো দারুণ না ?

গুপ্তহত্যা, মেয়েছেলে পাঠানো, শেষে—কর্ণ গিয়ে পাণ্ডবদের নিয়ে আসবেন আর রাস্তায় গুমখুন—এইসব কাপুরুষোচিত উপায় কর্ণের একটুও পছন্দ হল না। যুধ্যমান অবস্থায় অর্জুনকে ব্রাহ্মণ ভেবে হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন, সেই ভুল এখনও কর্ণের হাতে পায়ে কামড় দিচ্ছে, সেই তিনি কিনা গুম-খুন করাবেন পাণ্ডবদের ! তার ওপরে ওই এক লহমার দেখায়, একবার উচ্চ-চকিত কথায় দ্রৌপদীর স্বভাব তিনি বুঝে গেছেন। যাঁকে তিনি বীরতার প্রতিদানে পেতে চেয়েছিলেন তাঁকে যে কর্ণের ভাল লেগেছিল। সেই মনের মানুষ অপমান করেছে বলেই তাঁকে তিনি এখন ঘেন্না করেন। তবু দুর্যোধনের উপায় কৌশলগুলি কর্ণের একটুও পছন্দ হল না। এই প্রথম প্রকাশ্যে তিনি দুর্যোধনের কথার প্রতিবাদ করলেন। বিশেষত কর্ণ লুকিয়ে ছদ্মবেশী ঘাতক দিয়ে পাণ্ডবদের খুন করাবেন—এই প্রস্তাব কর্ণের পৌরুষে আঘাত দিল। তিনি প্রতিবাদ জানালেন দুর্যোধনের প্রত্যেকটি প্রস্তাবে।

কর্ণ বললেন—তোমার কথা আমার একটুও ঠিক মনে হচ্ছে না, দুর্যোধন ! পাণ্ডবদের বধ করার জন্য অনেক কূট কৌশল, অনেক সূক্ষ্ম উপায় আগেও তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, কিছুই হয়নি, তুমি কিছুই করতে পারনি। পাণ্ডবেরা যখন শিশুটি ছিল, ডানা-না-গজানো পাখির মতো, তখন এখানে থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের কিছুই করতে পারনি। এখন তারা হাতের বাইরে, বিদেশে। তারপরে দ্রুপদ রাজার সহায়তায় তাদের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। এখন কি আর তাদের কৌশল করে কাত করা যায় ? তারপর দ্রৌপদীর কথাটা তুমি কী বললে ? যেখানে পাঁচ ভাই মিলে একটি বউ বিয়ে করেছে, তাদের মধ্যে কখনও বিরোধ বাধে ? বউদের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াঝাটি হবে না বলেই তো একটা বউ, সেখানে কখনও ঝগড়া বাধে—একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্ ? তার ওপরে আর একটা ব্যাপার কী জান। দ্রৌপদী যখন পাণ্ডবদের বরণ করেছেন, তখন তাঁদের খারাপ অবস্থা, দীন ব্রহ্মচারী বেশ—এসব দেখেশুনে মনে মনে তাঁদের দীনাবস্থা মেনে নিয়েই বরণ করেছেন, সেই দ্রৌপদীর মন ভাঙানো অত সহজ হবে না জেনো। দ্রৌপদীর দৃঢ়তা কতখানি কর্ণ তা সত্যিই জানেন। উন্মুক্ত সভাস্থলে তাঁর নিজের প্রতি যে অপমান-বাক্য বর্ষিত হয়েছিল তাতেও যেমন দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল দ্রৌপদীর, কর্ণ মনে করেন, সেই দৃঢ়তাতেই ওই মেয়ে সমস্ত রাজা-মহারাজা ত্যাগ করে অর্জুনকে অর্জুন না জেনেই, পাণ্ডবদের দীনতার সঙ্গেই বরণ করেছে। ওই মেয়েকে ফুসলানো কি অত সহজ ? এইবার কর্ণের মনে ভেসে উঠল সেই অপমান, সূতপুত্র বলে তাকে বিয়ে না করার অপমান। দ্রৌপদীর সমস্ত দৃঢ়তা জেনেও তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল তাঁরই খাবার গ্রাস, পাণ্ডবেরা সবাই মিলে যেন চেটেপুটে খাচ্ছে। এতে যেন দ্রৌপদীরই কাম-অভিলাষ পরিতৃপ্ত হচ্ছে। কর্ণ বললেন—জানো দুর্যোধন ! মেয়েদের এক স্বামী থাকা সত্ত্বেও সব সময় তাদের ইচ্ছে করে আরও পুরুষমানুষ তাকে ভোগ করুক—ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণাম্ একস্যা বহুভর্তৃতা। সেখানে রমণীকুলের পরম বাঞ্ছিত এই বহুপুরুষের ভোগ একেবারে আইন মেনেই পাচ্ছে দ্রৌপদী—এই রমণীকে কি ফুসলানো যায়—ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা।

শুধু অর্জুন নয়, এলেবেলে নকুল-সহদেবকে নিয়ে পাঁচজন পুরুষমানুষ দ্রৌপদীকে ভোগ করছে—মনে মনে এই পীড়নই কর্ণকে দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে বারবার প্ররোচিত করেছে। তবু এ কথা পরে হবে। প্রথমে মনে রাখতে হবে, হস্তিনাপুরে একটা 'ডাবল-অ্যাডমিনস্ট্রেশন' চলছিল। এই দ্বৈতশাসনের একদিকে আছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ—এইসব প্রাজ্ঞ এবং বৃদ্ধ পুরুষেরা। অন্যদিকে আছেন দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, অশ্বত্থামা—এঁরা। মাঝখানে আছেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যিনি চক্ষুষ্মত্তার পরিচয় দিয়ে একবার ভীষ্ম-দ্রোণের দিকে হেলেন আবার পরমুহূর্তে উচ্চাভিলাষের অন্ধতায় দুর্যোধন-কর্ণের দিকে হেলেন। কিন্তু এই দুর্যোধন-দুঃশাসনের যে যুবগোষ্ঠী, এই গোষ্ঠীতে অতি অল্পকালের মধ্যেই অতি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছেন কর্ণ। এই স্থান এতটাই উঁচুতে যে, কর্ণ দুর্যোধনের সমস্ত কূট প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে সোজাসুজি যুদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছেন। কর্ণের মতে ঠিক তখনই ছিল যুদ্ধের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ, পাণ্ডবদের শিকড় তত দৃঢ় নয়, পাঞ্চালেরাও কমজোরি। যতক্ষণে কৃষ্ণ যাদব বাহিনী নিয়ে না আসছেন, যতক্ষণে পাণ্ডবেরা সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ

করে বলশালী না হচ্ছেন, তার আগেই কৌরববাহিনী সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক পাণ্ডবদের ওপর—এই ছিল কর্ণের প্রস্তাব। কর্ণের মনোভাব যখন এতখানি দুঃসাহসিক, সেখানে ভীষ্ম-দ্রোণ যখন সস্ত্রীক পাণ্ডবদের প্রায় আরতি করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে বললেন, তখন কর্ণ আর থাকতে পারলেন না। তিনি ভীষ্ম আর দ্রোণকে সোজাসুজিই প্রায় ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার 'দুষ্ট মন্ত্রী' বলে চিহ্নিত করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি পরিষ্কার জানান—মহারাজ ! আপনি আপনার দুষ্ট মন্ত্রীদের থেকে সাবধান থাকবেন এবং আপনার মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে দুষ্ট নয় যাঁরা তাঁদেরও আপনি চিনে নিন—দুষ্টানাঞ্চৈব বোদ্ধব্যম্ অদুষ্টানাঞ্চ ভাষিতম্। কর্ণ যে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বৃদ্ধ মন্ত্রীদের সামনেই তাঁদের প্রতি কটূক্তি করতে পারলেন—এটা থেকে বোঝা যায় দুর্যোধনের গোষ্ঠীতে কর্ণ কতটা স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। অবশ্য তাঁর এই শক্তি বাড়ার পিছনে দু-একটা সামান্য কারণ আছে, সেটা আগেই বলে নিই।

দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ—এঁরা সকলেই একসময় দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কারও অপদার্থতায়, কারও বা দুর্ভাগ্যে সে বিয়ে হয়ে উঠল না। এর মধ্যে কিছু সময় চলেও গেল এবং খবর এল যে, উড়িষ্যার রাজা চিত্রাঙ্গদ তাঁর মেয়েকে স্বয়ম্বর সভায় ঈপ্সিত পতি লাভের সুযোগ দেবেন। দুর্যোধন ভাবলেন—দুর ! দ্রৌপদী কালো মেয়ে, তার ওপর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। ভাগ্যিস ধনুক তুলতে পারিনি। আর দ্রৌপদীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে, অন্য সুন্দরীদের হৃদয়ে স্থান না দিয়ে, তিনি মানব জমিন পতিত রাখবেন কেন ? অতএব কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধন উড়িষ্যা রাজ্যের রাজপুর নগরে এসে পৌঁছলেন। এখানেও অনেক বড় বড় রাজা—জরাসন্ধ, শিশুপাল—সবাই এসেছেন। স্বয়ম্বর সভায় একটা একটা করে রাজার নাম বলা হতে থাকল কিন্তু কলিঙ্গরাজনন্দিনী দুর্যোধনের নাম শুনেও তাঁকে অতিক্রম করে গেলেন—অত্যক্রামদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রং সা কন্যা বরবর্ণিনী। যত সুন্দরীই হোক একটি উড়িয়া রমণী পর্যন্ত তাঁকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, এটা দুর্যোধনের কাছে দুর্বিষহ। তিনি সমস্ত রাজমণ্ডলের সামনে সেই কলিঙ্গ-নন্দিনীকে রথে নিয়ে তুললেন এবং চললেন হস্তিনাপুরের দিকে। এটা সমবেত রাজমণ্ডলীর অপমান। তাঁরা আক্রমণ করলেন দুর্যোধনকে। এবারে এই রাজমণ্ডলের পেছনে ধাওয়া করলেন কর্ণ। কর্ণ এক এক বাণে এক এক রাজার ধনুক-বাণ সব কেটে ফেললেন। কর্ণের বাণের গতিতে পর্যুদস্ত হয়ে তাঁদের আর দ্বিতীয়বার ধনুক তোলা হল না। তাঁরা এবার পালাতে লাগলেন। এবার শুধুমাত্র একা কর্ণের ক্ষমতায় দুর্যোধন একটি রাজকুমারীকে বিয়ে করে আনতে পারলেন। দুর্যোধন এতে বড় খুশি হলেন। এর অবধারিত ফল দুর্যোধনের গোষ্ঠীতে কর্ণের শক্তিবৃদ্ধি হল।

কর্ণের শক্তিবৃদ্ধির আরেক কারণ মগধরাজ জরাসন্ধ। মনে রাখতে হবে, দুর্যোধন, কর্ণ যখন প্রায় যুবক, সেইসময়ে জরাসন্ধের মত প্রবল রাজা দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কলিঙ্গরাজ্যের এই স্বয়ম্বরে যৌবনোদ্দীপ্ত কর্ণের যুদ্ধনৈপুণ্য দেখে প্রাজ্ঞ জরাসন্ধের বেশ ভাল লাগল। তিনি এই নতুন ছেলেটির মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। নিছকই পরীক্ষার জন্য। নানা অস্ত্রে, নানা প্রহরণে দুজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। কখনও এঁর বাণ কাটা পড়ে, কখনও ওঁর, কখনও অন্যতরের আঘাতে এঁর ধনুক কিংবা খড়্গ খসে পড়ে হাত থেকে, কখনও বা ওঁর। এইভাবে অস্ত্র-শস্তর শেষ হয়ে এলে শেষে কুস্তাকুস্তি আরম্ভ হল। কেউ হারেন না। কিন্তু জরাসন্ধ অধিক বলবান হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু জীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনিই যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। ভারী খুশি হয়ে তিনি মগধের অন্তর্গত মালিনী নগরীটি উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন কর্ণকে—প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ। নিজের রাজ্য অঙ্গের সঙ্গে মালিনীর যোগ হওয়ায় কর্ণের রাজ্য বড় হল। তাঁর পিতার আবাসভূমি চম্পা নগরীর শাসনভারও ছিল কর্ণের ওপরেই, যদিও অনেকে মনে করেন চম্পা ছিল অঙ্গরাজ্যেরই ভুক্তি বিশেষ। যাই হোক জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ-পরীক্ষায় কর্ণ পাশ করায় তাঁর মান-সম্মান রাজ্য-সম্পদ সবই বেড়ে গেল। ঠিক এই অবস্থায় তাঁর স্নেহময় জনক-জননী যে ছেলের বিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হবেন, তাতে আশ্চর্য কী ? দ্রৌপদীর মত অভীষ্টা রমণীকে পাওয়া গেল না, অন্যদিকে তাঁরই সহায়তায় দুর্যোধনেরও বিয়ে হয়ে

গেল। তাই বলে অন্য কোনও স্বয়ম্বর সভায় কন্যা-হরণ করতে গিয়ে আবার যদি কেউ দ্রৌপদীর মতো সূতপুত্রের কলঙ্ক দিয়ে বসে, তাই নিজে কোনও স্বয়ম্বর সভায় বিয়ে করতে যেতে সংকুচিত হয়েছেন কর্ণ। পিতা-মাতাও নিশ্চয় ব্যস্ত হয়েছেন তাঁর বিয়ের জন্য। আর বিশেষত প্রিয়বন্ধু দুর্যোধনের বিয়ের পর কর্মহীন কোনও অবকাশে তাঁর নিজের মনও বুঝি ব্যাকুল হল। অতএব পিতা-মাতার পছন্দ-করা নির্ঝঞ্ঝাট সূত-সুন্দরীরাই তাঁর কাছে বেশ কাম্য মনে হল। পরবর্তীকালে কর্ণ স্বয়ং কৃষ্ণের কাছে সশ্রদ্ধে স্বীকার করেছেন যে, কত যত্ন করে তাঁর পিতা অধিরথ অন্তত তিনটি সূতজাতীয়া রমণীর সঙ্গে কর্ণের বিয়ে দিয়েছিলেন—ভার্যাশ্চোঢ়া মম প্রাপ্তে যৌবনে তৎপরিগ্রহাৎ।

রাজ্য বড় হয়েছে, দুর্যোধনের যুবগোষ্ঠীতে তাঁর মর্যাদা বেড়েছে, তিনটি রমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, তবু কিন্তু কর্ণের মনে সুখ নেই। সত্যি কথা বলতে কী দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না, দ্রৌপদীর বদলে তিন তিনটি বউ পেলেও উতলা বসন্ত-বাতাসের দীর্ঘশ্বাস তাঁর মনকে যে এখনও ভীষণ আকুল করে তোলে, দ্রৌপদীকে যে তিনি এখনও ভুলতে পারেন না। আর ভুলবেনই বা কী করে? যাঁদের ঘরে দ্রৌপদী বধূ হিসেবে মিলিত হয়েছেন, তাঁদেরও যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। যে জরাসন্ধের সঙ্গে কর্ণের দ্বৈরথ যুদ্ধমাত্রেই কর্ণের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল, সেই জরাসন্ধকে মধ্যমপাণ্ডব ভীম মেরেই ফেলেছেন। তার ওপরে ধৃতরাষ্ট্রের দেওয়া খাণ্ডবপ্রস্থকে ভেঙে-গড়ে এখন ইন্দ্রপ্রস্থ বানিয়েছেন পাণ্ডবেরা, যা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ। তার মধ্যে আছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ। এই যজ্ঞের সূত্রেই জরাসন্ধবিজেতা ভীম কর্ণের রাজ্য অঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন—কর্ণমভ্যদ্রবদ্ বলী। তবে হ্যাঁ, ভীমের চতুরঙ্গ বাহিনী আর ভীমের শক্তির কাছে যে কর্ণ হার মানলেন, এ কথাটা আমরা সোজাসুজি বিশ্বাস করি না, কর্ণ হার মানলেন জরাসন্ধ বিজেতা ভীমের কাছে, যাঁর আধিপত্য সমস্ত পূর্ব ভারত তখনকার মতো স্বীকার করে নিয়েছে। সে যাই হোক ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমণ্ডল রাজসূয় উপলক্ষে একযোগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাপ্রাঙ্গণে হাজারো উপহার নিয়ে বশ্যভাবে উপস্থিত হওয়ায় দুর্যোধনের ঈর্ষার কারণ ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেরও। রাজসূয়ের মূলপর্বে চরম সম্মান দেওয়ার জন্য কৃষ্ণকে বেছে নেওয়ায় জরাসন্ধের ডান হাত চেদিরাজ শিশুপাল প্রচণ্ড গালাগাল করলেন কুরু-কুলপতি ভীষ্মকে, এমনকী যুধিষ্ঠিরকেও। শিশুপালের মতে—নাম-করা মানুষকে যদি সম্মান জানাতেই হয়, তা হলে আরও অনেকেই ছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে পারতেন ভীষ্ম কিংবা যুধিষ্ঠির। শিশুপাল অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্ণের নামও এখানে স্মরণ করেছেন। বলেছেন—দেবরাজ ইন্দ্রের মতো যাঁর ক্ষমতা, ধনুক-চালনায় যিনি অসাধারণ, যিনি অঙ্গ-বঙ্গের অধীশ্বর, সেই কর্ণকে আপনি সম্মান জানাতে পারতেন ভীষ্ম—বঙ্গাঙ্গবিষয়াধ্যক্ষং.. স্তুহি কর্ণমিমং ভীষ্ম...।

বোঝা যাচ্ছে, শক্তিমান এবং সম্মানিত পুরুষদের যদি আঙুলে গোনা যায় তবে এই পর্যায়ে এখন কর্ণেরও নাম করতে হচ্ছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে, তিনি শুধু অঙ্গ, চম্পা কিংবা জরাসন্ধের দেওয়া মালিনী নগরীর অধীশ্বর নন, আমাদের এই বাংলাদেশও ছিল তাঁরই রাজ্যের অন্তর্গত—বঙ্গাঙ্গবিষয়াধ্যক্ষং সংস্রাক্ষসমং বলে। কিন্তু হলে কী হয় তিনি যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন হস্তিনাপুরের রাজনীতির সঙ্গে। ফলে হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধন যখন যুধিষ্ঠিরের সম্মান আর ইন্দ্রপ্রস্থের কারিগরি দেখে মনে মনে জ্বলে গেলেন, তখন কর্ণেরও মনে ব্যথা হল। ক্রোধ এবং ঈর্ষার কারণ ছিল দুটি—যুধিষ্ঠিরেরা তাঁদের পিতার রাজ্যাংশও ফিরে পেল, আবার দ্রৌপদীকেও পেল ওরাই—তৈর্লব্ধা দ্রৌপদী ভার্যা দ্রুপদশ্চ সুতৈঃ সহ। প্রথম ব্যাপারটায় কর্ণের তত কিছু আসে যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটা যে দ্রৌপদী—তাঁর আপন মুখের গ্রাস! আমরা জানি কুরুসভায় যে পাশাখেলার চক্রান্ত তৈরি হয়েছিল, এই চক্রান্তের মূল পর্বে কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে ছিলেন না। এই পুরো চক্রান্তটাই ছিল শকুনি এবং দুর্যোধনের মস্তিষ্ক-প্রসূত, যার সহায়ক ছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং। কিন্তু সব কিছুর পরেও যে পাশাখেলার আসরে বসে গেলেন কর্ণ, তার একমাত্র কারণ দ্রৌপদী, যদি দ্রৌপদীকে হেনস্থা করা যায় কোনওক্রমে।

অবশেষে সেই চরম লাঞ্ছনার মুহূর্তটি এগিয়ে এল। শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে গেলেন। হেরে গেলেন একে একে প্রাণপ্রিয় ভাইদের বাজি রেখে। হেরে গেলেন নিজেকেও। যুধিষ্ঠিরের তখন প্রায় উন্মত্ত অবস্থা। জুয়াখেলার সময় জুয়াড়ি যেমন ভাবে—পরের দানটা নিশ্চয় জিতব, ঠিক সেই প্রত্যাশায় তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকেও বাজি রেখেছেন। কিন্তু হল না, কিছুতেই হল না। অন্তঃপুরচারিণী কৃষ্ণার কথা তাঁর মনেই ছিল না ; কিন্তু যারা আগে থেকেই জানে যে, যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে ভালবাসেন, কিন্তু পাশাখেলাটাই তিনি ভাল জানেন না—'দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্'—সেই তারা যে কিচ্ছুটি না ভুলে একটি একটি করে সবই আদায় করে নেবেন যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে, তাতে সন্দেহ কী ! শকুনিই মনে করিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। বললেন—নিজেকে বাজি রেখে হেরে যাওয়াটা বড় কষ্টকর মহারাজ ! তা ছাড়া তোমার তো জিনিস রয়েছে। অন্য ধন অবশিষ্ট থাকতেও নিজেকে হেরে বসাটা একেবারেই ঠিক নয়—শিষ্টে সতি ধনে রাজন্ পাপ আত্মপরাজয়ঃ। ঠিক এইটুকু বলে শকুনি, পাঞ্চালী-কৃষ্ণার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। দ্রৌপদীর কথাটা ধরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির পণ্য বস্তুর গুণ গাইতে থাকলেন। পণ রাখার এই নিয়ম—যেখানে টাকা পয়সা সব হেরে বসে আছে সেখানে প্রথাবহির্ভূত জিনিস বাজি রাখতে গেলে সে জিনিসের উৎকর্ষ বুঝিয়ে দিতে হয় পরপক্ষের কাছে। শকুনি বললেন—তোমার যে জিনিসটা এখনও হাতে আছে, সে হল দ্রৌপদী, তাকে বাজি রাখতে পার—পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীম্। সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির যেন পণ্যের গুণ বলতে থাকলেন—জানেন তো, সে মোটেই বেঁটেও নয়, ঢ্যাঙা লম্বাও নয়, আবার রোগাও নয়। কালো-কোঁকড়া চুলের ঢাল নেমেছে পিঠ বেয়ে। মুখখানি দেখলে মনে হবে যেন পদ্মফুল ফুটেছে। ঠোঁট লাল, গায়ে লোম নেই-ই প্রায়, অঙ্গসংস্থান অপূর্ব—সুমধ্যমা চারুগাত্রী—আর স্বভাব-চরিত্তির থেকে সবকিছু—ঠিক যা যা একটা পুরুষ মানুষ একটা মেয়ের মধ্যে দেখতে চায়—যামিচ্ছেৎ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্—সেই রকমই এই পাঞ্চালী দ্রৌপদী। আমি তাকেই পণ রাখছি।

ঠিক এমনি একটা দিনের জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করে আছেন কর্ণ। প্রমত্ত যুধিষ্ঠিরের এই নগ্ন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সভাক্ষেত্রে যখন ধিক্কারের গুঞ্জন উঠল, তখন সবচেয়ে খুশি হলেন দুটি লোক—এক জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র যিনি কেবলই জিজ্ঞেস করছিলেন—শকুনি এই বাজিটা জিতেছে তো, জিতেছে তো ? দ্বিতীয় হলেন কর্ণ। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যাবার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে কর্ণের পরিচয় ছিল সহার্থক তৃতীয়া বিভক্তিতে অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা এসেছেন, সঙ্গে কর্ণও গেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর এই বর্ণনা শুনে যিনি সজোরে প্রতিহিংসার হাসি হেসে উঠলেন তিনি কর্তৃপদে প্রযুক্ত, তিনি কর্ণ, অর্থাৎ কর্ণ হাসছেন, তাঁর সঙ্গে দুঃশাসন এবং অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা হাসছেন—জহাস কর্ণোতিভৃশং সহ দুঃশাসনাদিভিঃ। বাস্তবিক পক্ষে যুধিষ্ঠির যেমনটি বর্ণনা দিলেন, এমনতর দ্রৌপদীর নগ্নরূপ কর্ণ মনে মনে অনেকবার কল্পনা করেছেন, কিন্তু সেরূপ তাঁর আয়ত্তে ছিল না। আজকে তিনি সেই রূপকল্পনায় হেসে উঠেছেন এইজন্যে যে, দ্রৌপদী, অর্জুনের জেতা দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণী দ্রৌপদী আজ দুর্যোধন-শকুনির কৌশলে তাঁদের হাতের মুঠোয়। পঞ্চপাণ্ডবের উপভুক্তা নগ্না দ্রৌপদী যেমনটি কর্ণের কল্পনায় ছিল, সেই দ্রৌপদীকে আজ তিনি সবার সামনে নগ্ন দেখতে চান। তিনি আগ বাড়িয়ে হেসে উঠলেন, সবার চাইতে জোরে—অতিভৃশম্।

শকুনি দ্রৌপদীর বাজি জিতবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের আদেশ হল সভায় দ্রৌপদীকে নিয়ে আসবার জন্য। যে নিয়ে আসতে গেল দ্রৌপদীকে সেও কিন্তু এক সারথি জাতের লোক, সূতপুত্র। বারবার সে দ্রৌপদীর কাছে যাচ্ছে, দুর্যোধনের কাছে দ্রৌপদীর বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছে—এই পৌনঃপুনিকতায় দুর্যোধনের রাগ হল। তিনি দুঃশাসনকে বললেন—আসলে সূতপুত্র এই সারথির বেটা, ভীমকে দেখে ভয় পাচ্ছে, যাও তো, তুমি যাও তো ধরে নিয়ে এস দ্রৌপদীকে—স্বয়ং

প্রগৃহ্যানয় যাজ্ঞসেনীম্‌। এই যে সময়টা, সূতজাতীয় প্রাতিকামীর দ্রৌপদীর কাছে যাওয়া আসা এবং তার প্রতি 'সূতপুত্র' বলে দুর্যোধনের গালাগালি—এই সময়টা কর্ণ চুপ করেই ছিলেন, একটা কথাও বলেননি। কারণটা জলের মত স্পষ্ট। সূতপুত্রের পর্বটা চুকলে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে উন্মুক্ত রাজসভায় নিয়ে এল, অসহায়া দ্রৌপদী যখন পাশার বাজিতে বাঁধা অসহায় পাণ্ডবদের দিকে জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন, তখন দ্রৌপদীর সেই অসহায় অবস্থা বুঝেই তাঁকে এক ঝটকা দিয়ে দুঃশাসন সশব্দে হেসে বলল—তুই হলি আমাদের দাসী। সেকালের দিনে 'দাসী' মানে শুধু কাজকর্মের লোক বুঝাত না, দাসী ছিল সময়ে অসময়ে, অবসরে পুরুষের ভোগ্যা। দুঃশাসনের এই কথাটা কর্ণের মনে এক অদ্ভুত বিকৃত আনন্দ জাগিয়ে তুলল। দুঃশাসনের 'দাসী' সম্বোধন মাত্রেই কর্ণ দারুণ খুশি হয়ে তাকে যেন ধন্যবাদ জানালেন শব্দটার জন্য, হেসে উঠলেন দুঃশাসনের মতোই সজোরে—কর্ণস্তু তদ্‌ বাক্যমতীব হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস হসন্‌ সশব্দম্‌।

দ্রৌপদীকে সবার সামনে দুঃশাসন টানা-হেঁচড়া করছে, তাঁর উত্তমাঙ্গের উত্তরীয় বাস খসে পড়ে গেছে, তবু রেহাই নেই। পাণ্ডবপক্ষের ভীম খেপে উঠে দাদা যুধিষ্ঠিরকেই গালাগালি দিতে থাকলেন। কুরু-বৃদ্ধেরা কিছুই বলতে পারছেন না। এই অবস্থায় কৌরবপক্ষের একজনই এই ঘটনার নিন্দা করা আরম্ভ করলেন। তিনি দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ। বিকর্ণ দ্রৌপদীকে পণ রাখার বৈধতা নিয়ে আইনসঙ্গতভাবে লড়াই আরম্ভ করলেন। কিন্তু পূর্বাহ্নেই যে পুরুষ-মানুষদের মধ্যে রাজ্যলোভ, পরশ্রীকাতরতা প্রবেশ করেছে তাদের কি আর আইন ভাল লাগে! অথচ যেখানে ছোটভাই হিসেবে বিকর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে দুর্যোধনের বিরোধিতা আরম্ভ করেছেন, সেখানে দুর্যোধনের পক্ষে প্রতিবাদ করে জেতা মুশকিল। ঠিক এই অবস্থায় সভার হাল ধরলেন কর্ণ। কর্ণ এই মুহূর্তে ন্যায়-অন্যায় বোঝেন না। পাঁচ ভাই পাশাখেলার জাঁতাকলে আটকে ছটফট করছে, কর্ণের মজা লাগছে। পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীর বুকের প্রাবরণ-বাস খুলে পড়েছে দুঃশাসনের টানাটানিতে, কর্ণের ভাল লাগছে, তাঁর গহন মনের রুদ্ধ বিকার কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করছে। অন্তত দ্রৌপদীর ঘটনাটা বিকার জেনেও কর্ণ এই বিকারকে স্বাগত জানাচ্ছেন। বিকর্ণের কথা শুনে কর্ণের ভীষণ রাগ হল—ক্রোধমূর্ছিতঃ। রাগে বিকর্ণের হাতে একটা ঝাঁকাড় দিয়ে কর্ণ বিকর্ণকে তিরস্কার করতে থাকলেন।

কর্ণ বললেন—বিকর্ণ! অস্বীকার করি না এ সভায় অনেক বিকার দেখা যাচ্ছে—দৃশ্যন্তে বিকর্ণেহ বৈকৃতানি বহূন্যপি। অর্থাৎ কর্ণ জানেন কুলবধূ দ্রৌপদীকে টানা-হ্যাঁচড়া করাটা একটা বিকার। কিন্তু তাঁর মতে দ্রৌপদী নিজেই এই বিকারের কারণ। কর্ণ বললেন—দুটি কাঠে ঘষা লেগে যে আগুন জন্মায়, সে আগুন যেমন ওই কাঠকেই পুড়িয়ে দেয়, তেমনি এই বিকারই ওই মেয়েছেলেটাকে শায়েস্তা করবে। কর্ণ বললেন—তা ছাড়া তোমার এত সোহাগ কিসের, বিকর্ণ? কই যাঁদের বউ এই দ্রৌপদী তাঁরা তো দ্রৌপদীর ডাক শুনেও টুঁ-শব্দটি করছেন না—এতে ন কিঞ্চিদপ্যাহুশ্চোদিতা হ্যপি কৃষ্ণয়া। তাঁরা তো মনে করছেন, দ্রৌপদীকে আমরা জিতেইছি। তুমি বাপু বিকর্ণ! বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা ছেলের মতো থাক, ছোট মুখে বড়দের মতো কথা বলার দরকারটা কী তোমার—বালঃ স্থবিরভাষিতম্‌। তুমি দুর্যোধনের থেকে অনেক ছোট, ধর্মাধর্মের তুমি বোঝটা কী হে শুধু শুধু তখন থেকে বক বক করে বাজিতে জেতা দ্রৌপদীকে না-জেতা বলে যাচ্ছ? কর্ণ বিকর্ণকে হেঁইমারি কি সেই-মারি করে বসিয়ে দেননি পুরোপুরি। সভাস্থ লোক যেটাকে বীরপুরুষের মানসিক বিকার বলে মনে করতে পারে, সেটা যে আসলে দ্রৌপদীরই বিকার এবং সুস্থ সমাজের দিকে তাকিয়ে সে বিকার যে শান্ত করা একান্ত প্রয়োজন, সেটা বোঝাতেই যেন কর্ণ বিকর্ণকে শাসন করে কুরু-বৃদ্ধদের বোঝাতে চাইলেন।

কর্ণ বললেন—বিকর্ণ! এটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে যে, যুধিষ্ঠির সর্বস্ব বাজি রেখে হেরেছেন। তা হলে এই দ্রৌপদী কি সেই সর্বস্বের বাইরে? কর্ণ জানেন দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-সর্বস্ব ধন, কিন্তু সেই দ্রৌপদী এখন অঙ্কের হিসেবে পণ রাখা সর্বস্বের অভ্যন্তরা। তা ছাড়া—কর্ণ বলে চললেন—তা ছাড়া বাজির কথায় দ্রৌপদীর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, সমস্ত

পাণ্ডবের মৌনতায় সে বাজি সমর্থিত হয়েছে, এখন তুমি বলছ দ্রৌপদীকে আমরা জিতিনি ! কর্ণ এবার আসল বিকারের কথায় এলেন। দ্রৌপদীকে টানাটানি করা হচ্ছে, তাঁর উত্তরীয় খসে পড়েছে, তিনি এক কাপড়ে কুরুসভায় উপস্থিত—এগুলি কর্ণের ভাল লাগছে। বিকর্ণকে তিনি বললেন—অবশ্য হ্যাঁ, তুমি যদি বল একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনে বড় অধর্ম হয়ে গেছে, তা হলেও কিন্তু আমার উত্তর আছে। তুমি তো জান, দৈববিহিত নিয়ম অনুসারে একটি স্ত্রীলোকের একটিই স্বামী থাকে। এই দ্রৌপদীর স্বামী তো একটা নয়, পাঁচটা। তবে এই মেয়েছেলে বেশ্যা ছাড়া কী—বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা। এইরকম একটা বেশ্যা মেয়েকে উন্মুক্ত সভায় এনেছি দেখে আশ্চর্য হওয়ারও কিছুই নেই। তা ছাড়া কোনও বেশ্যা এক কাপড়ে এখানে এসেছে না উলঙ্গ হয়ে এসেছে, তাতেও মাথা খারাপ করার কিছুই নেই—একাম্বরধরত্বং বাপ্যথ বাপি বিবস্ত্রতা। বিকর্ণ তুমি জেনে রেখ, আমরা পাশার চালে সবাইকে জিতেছি—ধনরত্ন জিতেছি, একটি একটি করে সমস্ত পাণ্ডবদের জিতেছি, এই দ্রৌপদীকেও জিতেছি। কর্ণের মনের ভাব—সব এখন আমাদের, আমরা এদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করব।

যা ইচ্ছে তাই করব—এই তাগিদেই কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন—দেখ ভাই এই বিকর্ণ ছেলেটা বড় বেড়ে পাকা হয়েছে—বিকর্ণ প্রাজ্ঞবাদিকঃ। তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না। বরঞ্চ এক কাজ কর তো, তুমি এই সমস্ত পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে এসো তো। কর্ণের এই আদেশের নিরিখে অধিকতর অপমানের আশঙ্কায় পাণ্ডবেরা নিজেরাই নিজেদের উত্তরীয় বসনগুলি নামিয়ে দিলেন মেঝেতে। বস্তুত বীরপুরুষের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট অপমান। কিন্তু দ্রৌপদীর উত্তরীয় তো টানাটানিতে আগেই খসে পড়েছে এবার একবস্ত্রতার জায়গায় তাঁর বিবস্ত্রতা কাম্য হয়ে উঠেছে কর্ণের। অন্তত দুঃশাসনের কাছে কর্ণের আদেশের মর্ম ছিল তাই। ভীমের ভয়েই হোক কিংবা স্বেচ্ছায়, পাণ্ডবদের চাইতেও কুলস্ত্রীকে অপমান করতে বেশি ভাল লাগছিল বলেই দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরিধানের বসন ধরে টান দিলেন—দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ...ব্যাপাক্রষ্টুং প্রচক্রমে। সবাই জানেন, কর্ণের এই আদেশ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা যায়নি। অলৌকিকভাবেই হোক কিংবা লৌকিক কারণেই হোক, দ্রৌপদীর কাপড় টানার ব্যাপারটা দুঃশাসনের হাতের বাইরে চলে গেল। সুযোগ বুঝে বিদুর আবার গালাগালি দেওয়া আরম্ভ করলেন। কর্ণও যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন এবং যা চেয়েছিলেন তা করা গেল না বলে থতমত করেই দুঃশাসনকে আবার বললেন—ঠিক আছে, এখন তুমি এই দাসীটাকে বাড়ির ভেতরে কোথাও রেখে এসো তো—কর্ণো দুঃশাসনং ত্বাহ কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয়।

সত্যি বলতে কি পাশা খেলার পর যে অংশটা মহাভারতে আছে সেটা যদি অভিনয় করা যেত, তা হলে দেখা যেত নাটকের এই অংশটায় মঞ্চে প্রধান ভূমিকা হত কর্ণ এবং দ্রৌপদীর। দ্রৌপদী আত্মসম্মান বাঁচাতে ব্যস্ত আর কর্ণ যেভাবে হোক সেটা নষ্ট করতে। সভার মর্যাদা রক্ষায় একমাত্র চেষ্টা ছিল বিদুরের, আর সব কুরুবৃদ্ধেরা ছিলেন কর্তব্য নির্ণয়ে বিমূঢ়। এই অবস্থায় দুর্যোধন যে পাঁচ কথা বলে শেষ পর্যন্ত নিজের 'কদলীস্তম্ভ সদৃশ' উরুখানি দ্রৌপদীকে একবারের তরে দেখাতে পেরেছিলেন সেও বুঝি এই কর্ণের দৌলতে। দুঃশাসনের অসহায়তা দেখে দুর্যোধন আবার সেই মূল প্রশ্নে ফিরে গেলেন অর্থাৎ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলুন আমরা দ্রৌপদীকে জিতেছি কি না ? দুর্যোধন খুব ভালই জানতেন যে, যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না এবং এই উত্তরহীনতার অন্তরে মহাবলী ভীম আবার খানিকটা আক্রোশ প্রকাশ করায় সভামঞ্চে আবার কর্ণের ভূমিকা বড় হয়ে উঠল। যাতে আইনসঙ্গত ভাবে সব বদমায়েশি করা যায়, তারই একটা উপায় করার চেষ্টা করতে লাগলেন কর্ণ। কিন্তু মজা হল, তিনি ভীমের আক্রোশ সত্ত্বেও ভীমের সঙ্গে কথা বলছেন না। অথচ কোনও অবস্থাতেই তিনি দ্রৌপদীকে ছাড়ছেন না এবং যে সব কুরুবৃদ্ধেরা মৌনতার কৌশলে দ্রৌপদীর পক্ষ নিয়েছেন, তাঁদেরও কর্ণ এক হাত নিয়েছেন। কর্ণ বললেন—এ সভায় তিনজন আছেন যারা সবল এবং ধর্ম উল্লঙ্ঘন করতে সমর্থ। এঁরা হলেন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর। এঁরা এঁদের প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকেই দুষ্টতম বলে জানেন, অথচ তাঁর বাড়বাড়ন্ত হোক, এটাও চান, নিজেরাও

কোনও পাপাচরণ করেন না—যে স্বামিনং দুষ্টতমং বদন্তি বাঞ্ছন্তি বৃদ্ধিং ন চ বিক্ষিপন্তি। কর্ণের ভাবটা এই যে, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর এই তিনজনই রাজনির্ভর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, এঁদের কিছু স্বত্ব আছে, কিন্তু দাস, পুত্র এবং স্ত্রীলোক এদের কোনও স্বাতন্ত্র্যই নেই। ঠিক যেমন এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর কোনও স্বাতন্ত্র্যই থাকতে পারে না, কারণ তিনি দাসের পত্নী। যে মুহূর্তে পাণ্ডবেরা শকুনির পাশার চালে জিত হয়েছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তারা দাস, আর স্ত্রীলোকের সত্তা যেহেতু একান্ত ভাবেই পতি নির্ভর অতএব দাসের স্ত্রী দাসী। দাসের সত্তা এবং দাসের ধন যেহেতু প্রভুর অধীন তা হলে দাসের স্ত্রীতেও প্রভুরই অধিকার—দাসস্য পত্নী অধনস্য ভদ্রে হীনেশ্বরা দাসধনঞ্চ সর্বম্।

এটা বোঝা যাচ্ছে কর্ণের ওকালতি বুদ্ধি সাংঘাতিক। কর্ণ কিন্তু দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। সেই সভাগৃহে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যদি নিজেকে আগে বাজি রেখে হেরে থাকেন তা হলে দ্রৌপদীকে আর তিনি বাজি রাখতে পারেন কিনা, এই প্রশ্নে কুরুবৃদ্ধেরা বিমূঢ় বোধ করছিলেন। কর্ণের বক্তব্য—অত কূট-কচালির দরকার কী। পাণ্ডবেরা বাজির চালে সবাই দাস আর সেকালে স্ত্রীলোকের যেহেতু স্ব-অধীনতা ছিল না—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—সেই নিয়মে দাসের স্ত্রীও আপাতত কৌরবদের অধীন। তা ছাড়া স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁর জন্ম, পরাক্রম এবং পৌরুষ মাথার মধ্যে না রেখে আপন স্ত্রীকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করেছেন—এর থেকে বড় 'পয়েন্ট' আর কী হতে পারে। কর্ণের ওকালতি এতটাই মোটা দাগের ছিল যে, স্বয়ং ক্রোধ-কষায়িত ভীমও এক সময় যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আমি এই সূতের ব্যাটাকে দোষ দিই না—নাহং কুপ্যে সূতপুত্রস্য রাজন্—সত্যিই তো আপনার জন্যেই আমরা দাস হয়ে গেছি, আজ অন্তত যদি পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে আপনি বাজি না ধরতেন, তা হলে কি এই শত্রুরা আমাদের এত কথা বলতে পারে।

বেচারা ভীম! সরল ভীম জানেন না যে, তাঁর শত্রুরা বহুদিন ধরে এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিল। ওকালতি নয়, কূটবুদ্ধি নয়, বিক্রম নয়—কিচ্ছু নয়, যেন তেন প্রকারেণ এই মুহূর্তটি তারা চেয়ে এসেছে। দ্রৌপদীকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করব, তাঁকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাব—এমন একটি মুহূর্ত। অতএব কর্ণের ওকালতির ফল হল এই যে, কৌরবদের এক ভাই দুঃশাসন যখন কর্ণের আদেশ সত্ত্বেও দ্রৌপদীর পরার শাড়িটি খুলে ফেলতে পারল না, তখন বড় ভাই দুর্যোধন নিজের পরার কাপড়টিই তাঁর ঊরুমূল পর্যন্ত টেনে তুলে বাম ঊরুটি দেখাতে লাগলেন। এ এমন এক আক্রোশ যাতে অন্যজনকে বিবসনা করতে না পেরে নিজেই ন্যাংটো হয়ে গেলাম। শুধু ঊরু দেখানোই নয়, দুর্যোধন ঊরু দেখিয়ে দ্রৌপদীকে আহ্বানের হাসি হাসতে লাগলেন—স্ময়ন্নিবৈক্ষ্য পাঞ্চালীম্। দ্রৌপদীকে দেখিয়ে দেখিয়ে—দ্রৌপদ্যাঃ প্রেক্ষ্যমাণায়াঃ—দুর্যোধন যতই তাঁর ঊরু বিকশিত করতে থাকলেন, কর্ণের উৎসাহ ততই বাড়তে থাকল। এই কুৎসিত কর্মে কর্ণ যেন আপন মনোবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করলেন। তিনি খ্যাঁক খ্যাঁক্ করে হাসতে থাকলেন—অভ্যুৎস্ময়িত্বা রাধেয়ম্।

দুর্যোধন যে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, তার পেছনেও ছিল কর্ণেরই উৎসাহ। দ্রৌপদীর স্বাতন্ত্র্যহীনতা এবং দাসীত্ব প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ বলেছিলেন—এখন থেকে পাণ্ডবেরা কেউ তোমার প্রভু নয়, কৌরবেরাই তোমার প্রভু। তুমি বরং এঁদের মধ্যে থেকে নতুন কোনও স্বামী বেছে নাও—অন্যং বৃণীষ্ব পতিমাশু ভাবিনি। কর্ণ বলেছিলেন—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যে কামসংক্রান্ত ব্যাপার তা বাইরে কখনও আলোচনার বিষয় হতে পারে না, কিন্তু দাসীভাবে সব কথাই চলে, আর সবচেয়ে বড় কথা ওই গোটা পাঁচেক স্বামীর রতি-বন্ধনের চেয়ে, অগুন্তি পুরুষের রতিসাহচর্য লাভ করা যায় যাতে, এমন দাসীত্বই তোমার ভাল—পরিমিত-পতিকাদ্ দারভাবাদ্ অনন্তপতিকং দাস্যমেব তবাস্তু ইতি। কর্ণের এত কৌরবানুকূল ওকালতির পরে দুর্যোধন আর স্থির থাকেন কী করে? বিশেষত দুঃশাসনের অপচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার নিরিখে দুর্যোধন এবার নিজেরই কাপড় তুলে ফেললেন ঊরু থেকে। দেখাতে থাকলেন দ্রৌপদীকে, আর বিকট কোন মর্ষকামিতায় হাসতে থাকলেন কর্ণ।

না, শেষ পর্যন্ত দৈহিকভাবে কিছুই করা গেল না দ্রৌপদীকে। উপরন্তু কৌরবসভায় নানা দুর্লক্ষণ

দেখা দিতে থাকল ; ভীমের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হল, গান্ধারী এবং বিদুর পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রকৃতিস্থ করতে সফল হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বরে দ্রৌপদীই স্বামীদের একে একে দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন। সভাস্থলে কেউ আনন্দে, কেউ মুক্তিতে এবং কেউ বা নিরানন্দে—প্রত্যেকেই নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন, কিন্তু কর্ণ দ্রৌপদীকে দেখে দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলেন। এই বিপরীত রঙ্গস্থলে বিপরীতধর্মী মানুষের কাছে ততোধিক বিপ্রতীপ আচরণে লাঞ্ছিতা হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদী যে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েননি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই ধৈর্যে, বিদগ্ধতায় এবং তাঁরই অপমানের মূল্যে পাণ্ডবেরা যে আবার সব ফিরে পাওয়ার আশ্বাস পেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, এতে কর্ণ দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলেন। মহাভারতের কবি তাঁর এই লেখনীর পরিসরটুকু এমনভাবেই সাজিয়ে রেখেছেন যাতে মনে হবে কর্ণ বুঝি তখনই টিপ্পনী কাটছেন দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আমরা জানি এটি সেই মুগ্ধতা, যা তাঁকে পাঞ্চালরাজ্যের স্বয়ম্বর সভায় প্রথম মুগ্ধ করেছিল। কর্ণ বললেন—এমন কোনওদিন শুনিনি বাপু! মানুষের মধ্যে রূপবতী রমণীর কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এমনটি কোনওদিন শুনিনি—যা নঃশ্রুতা মনুষ্যেষু স্ত্রিয়ো রূপেণ সম্মতাঃ। তাসামেতাদৃশং কর্ম ন কস্যাশ্চন শুশ্রুম॥হ্যাঁ কর্ণের গলার সুর এখন অবশ্যই খুব নরম। পাণ্ডবেরা প্রত্যেকেই এখন দ্রৌপদীর কল্যাণে দাসত্বের দায় থেকে মুক্ত। কর্ণ সেদিকটাতেও একটু ইঙ্গিত করে দ্রৌপদীর প্রশংসায় যেন পাণ্ডবদের লজ্জা দিতে থাকলেন। কর্ণ বললেন—হ্যাঁ, পাণ্ডব, কৌরব—সকলকেই যেন রাগে পেয়ে বসেছিল, সেখানে শান্তি নিয়ে এসেছে শান্তির প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী—কৃষ্ণা শান্তিরিহাভবৎ। কেমন এক অথই জলে ডুবে যাচ্ছিল যেন পাণ্ডবেরা সবাই, যেখানে পাঞ্চালী কৃষ্ণা যেন নৌকো হয়ে সমস্ত পাণ্ডবদের পারে এনে তুলল—পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রানাং নৌরেষা পারগাভবৎ।

বাস্তবিক পক্ষে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে কর্ণের ধারণাটা যদি এমন মুগ্ধতারই হয়, তা হলে সে মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ক্ষণেকের তরে। বিশেষত চূড়ান্ত অপমানের পর এই কথাগুলি সামান্য প্রলেপের কাজ করতে পারে—এটা ভাবাও কর্ণের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মজা হল, যে নারকীয় অপমান শুধুমাত্র কথায় আর ভঙ্গিতে সম্পন্ন করেছিলেন কর্ণ, কোনও প্রলেপ, কোনও গৌরবই সেই কথা-ক্ষত পূরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তার ওপরে এখন একটা ভয়ও ধরেছিল। কৌরবদের পক্ষে প্রথমবার পাশাখেলাটা যদি ঈর্ষা কিংবা জ্ঞাতি-শ্রীকাতরতার ফল হয়, তবে দ্বিতীয়বার পাশাখেলাটা ছিল তাঁদের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আবার অর্ধেক পথ থেকেই—ততো ব্যধ্বগতং পার্থং—দ্বিতীয়বার পাশা খেলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পাণ্ডবেরা সভা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দুর্যোধনের কাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের ঘরে যে 'মিটিং' বসেছে তাতে দেখছি এবার কর্ণও আছেন দুঃশাসন এবং শকুনির সঙ্গে। চারজনই যুক্তি করে বুঝেছেন—এবারে পাণ্ডবেরা ছাড়বেন না। ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁরা সভয়ে জানিয়েছেন যে, অর্জুন যেভাবে বিনা কারণে গাণ্ডীব তুলে নিচ্ছে হাতে আর ভীম যেভাবে এমনি-এমনিই গদা ঘোরাচ্ছে, তাতে এবার কিছুতেই তারা ছেড়ে দেবে না—ন ক্ষংস্যন্তে। তা ছাড়া দ্রৌপদীকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তাতে কিছুতেই পাণ্ডবেরা বসে থাকবে না এবার—দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং কস্তেষাং ক্ষন্তুমর্হতি। পুত্র, শ্যালক এবং কর্ণের কথার সারবত্তা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের ডেকে পাঠিয়েছেন বনবাসের পণ রেখে পাশা খেলার জন্য। কুরুবৃদ্ধেরা ধৃতরাষ্ট্রকে বারণ করেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কোনও যুক্তি মানেননি, কোনও প্রতিযুক্তিও দেননি। কিন্তু গান্ধারী বারণ করার পর ধৃতরাষ্ট্র একটাই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমি কুরুকুলের সর্বনাশ কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারব না—অন্তঃ কামং কুলস্যাস্য ন শক্নোমি নিবারিতুম্।

কুরুকুলের সর্বনাশের ব্যাপারে দুর্যোধনের যতখানি দোষ আছে, কর্ণের দোষ তার চেয়ে কিছু কম নয়। পরে, অনেক পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-শেষে শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে ধর্মদর্শিনী গান্ধারী কৌরবদের ন্যায়-অন্যায়ের একটা পর্যালোচনা করেছিলেন। গান্ধারী বলেছিলেন—মূল অপরাধটা অবশ্যই দুর্যোধন এবং শকুনির কিন্তু তাতে সব সময় ইন্ধন জুগিয়ে গেছে কর্ণ আর

দুঃশাসন—কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তোঽয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ। এই যে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা রূপায়িত হল তার কারণ যতখানি দুর্যোধন, তার চেয়ে অনেক বেশি কর্ণ। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে রাজসভায় নিয়ে আসবার হুকুমটি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাজসভায় তাঁকে নিয়ে আসবার পর কতটা নোংরামি করা যায় এবং সেই নোংরামির মধ্যেও বা কতটা বৈচিত্র্য আনা যায় আবার সেই অশ্লীল বৈচিত্র্যও কতটা সীমাহীন করে তোলা যায়, তার সম্পূর্ণ শিল্পী ছিলেন কর্ণ। বস্তুত কৌরবসভায় অতিথি-শিল্পী হিসেবে এসেও পাশাখেলার পর্বে এমন এক জঘন্য নাটকের প্রস্তাবনা করে গেলেন তিনি, যাতে করে এরপর থেকে নাটকের গতি-প্রকৃতি রাজনীতির সূক্ষ্ম পথ'ত্যাগ করে কুলবধূর ধর্ষণের কলঙ্কে কালিমাখা এক নতুন রূপ নিল। এরপর থেকে পাণ্ডবদের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রত্যেক প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর কথা এসেছে। পাণ্ডবেরা বনে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র যখন মনে মনে ভয় পাচ্ছেন, তখন সঞ্জয় সমস্ত কথা বাদ দিয়ে দ্রৌপদীর প্রতি জঘন্য আচরণের কথা তুলেছেন। ধিক্কার দিয়েছেন দুর্যোধনের সহায় কর্ণকে, যিনি মুখে আনা যায় না এমন কথা বলেছেন দ্রৌপদীকে—দুর্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্। ধৃতরাষ্ট্র নিজে স্বীকার করেছেন, কর্ণের আদেশে দ্রৌপদীর যে বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়েছিল তাতে তৎকালীন সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং তাঁরা কতটা রেগে গিয়েছিলেন—ব্রাহ্মণাঃ কুপিতাশ্চাসন্ দ্রৌপদ্যাঃ পরিকর্ষণে। মূলত দ্রৌপদীর কারণেই কুরুসভা থেকে বেরিয়ে যাবার পথে অর্জুনের মুখে কর্ণবধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হল। ভীম বললেন—সময় আসবে, যখন এই দুর্যোধন আর কর্ণ, শকুনি আর দুঃশাসনের রক্তপান করবে বসুন্ধরা। ঠিক ভীমের এই কথার সূত্র ধরেই অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন—যে আমাদের দেখতে পারে না, যে আমাদের সব সময় বিদ্বেষ করে, খারাপ কথা বলে, সেই কর্ণকে আমি যুদ্ধে নাশ করব, কথা দিলাম—হন্তাহং কর্ণমাহবে।

৬

পাণ্ডবেরা বনে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যে সামান্য একটা প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল। দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের যেভাবে জয় করা হয়েছে এবং যেভাবে কুলবধূ দ্রৌপদীকে অপমান করা হয়েছে, তাতে একটা বিরুদ্ধ জনমত অবশ্য তৈরি হয়েছিল। সেকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজ, যাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই রাজন্য বর্গের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করতেন, তাঁরা যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, সে প্রমাণ তো স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্যেই রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এঁরা বুঝতে পারছিলেন যে, হস্তিনাপুরের রাজ্যশাসন ধৃতরাষ্ট্রের হাতে নয়, সে শাসনের যন্ত্রী হলেন দুর্যোধন, শকুনি এবং কর্ণ। একটা সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্রাহ্মণ্যসমাজের একাংশ কুরুজাঙ্গলের প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং অন্যান্য সাধারণ লোকেরা, যারা সেদিন কাম্যকবনে রীতিমতো বিশাল এক জনসমাগম তৈরি করেছিল—সমবায়ঃ সুমহাদ্ভুতদর্শনঃ—তারা এখন আর কেউ ধৃতরাষ্ট্রকে দোষ দিচ্ছে না, তাদের শ্লোগান ছিল—দুর্যোধন, শকুনি আর কর্ণের অশুভ আঁতাত নিপাত যাক—নিপাত যাক —ধিক্ ধার্ত্তরাষ্ট্রং সুনৃশংসবুদ্ধিং ধিক্ সৌবলং পাপমতিঞ্চ কর্ণম্। শুধু প্রজারা কেন, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী বিদুর পর্যন্ত এক সময় ধৃতরাষ্ট্রকে ছেড়ে পাণ্ডবদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর দোষ ছিল, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—আপনি আপনার ছেলে দুর্যোধন, শালা শকুনি আর ওই সারথির বেটা কর্ণকে বলুন যাতে তারা পাণ্ডবদের অনুগামী হয়ে চলে—দুর্যোধনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রঃ প্রীত্যা রাজন্ পাণ্ডুপুত্রান্ ভজন্তু। দেখুন বিদুরের ক্ষোভ যে তিনজনের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণ-সজ্জন এবং অন্যান্য সাধারণ লোকেরও ক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধেই। অতএব পাণ্ডবেরা যে বনেই থাকুন, কাম্যকবনে কি দ্বৈতবনে, দলে দলে ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ছেড়ে এসে যোগ দিতে থাকলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে—অপেত্য রাষ্ট্রাদ্ বসতাস্তু তেষাম্/ঋষিঃ পুরাণো' তিথিরাজগাম। জিনিসটা কৌরবদের পক্ষে ভাল হচ্ছিল না। সমস্ত বনগুলিতে পাণ্ডবদের ধনুষ্টংকার এবং ব্রাহ্মণদের ওঙ্কার নাদ একসঙ্গে মিশে যেতে

থাকল—জ্যাঘোষশ্চৈব পার্থানাং ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্।

কিন্তু মজা হল, এতে কর্ণের কী আসে যায় ? দুর্যোধনের কাঁধে ভর রেখে তিনি নিজের বৃদ্ধিবাসনা চরিতার্থ করছেন, হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে কিংবা শান্তনু-ভীষ্মের খানদানে ভাল-মন্দ কী হল, তাতে কর্ণের কিছু আসে যায় না। পাঠক-সাধারণ অনেকেই ভাবেন, কর্ণ যা করেছেন, বন্ধু দুর্যোধনের প্রীতির জন্য করেছেন এবং এই কারণেই কর্ণকে মহাভারতের এক করুণ চরিত্রে রূপান্তরিত করতে কখনওই অসুবিধে হয় না। হ্যাঁ, কর্ণ করুণ চরিত্র বটেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের যে বন্ধুত্ব ঘটেছিল সেটা শুধুমাত্র বন্ধুত্বের জন্যই নয়, সেটা যে কোনও ভাবে অর্জুনকে টিট করার জন্য। এই যে উন্মুক্ত রাজসভায় দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করার বিচিত্র কৌশল বার করলেন কর্ণ, সেটা দুর্যোধনের প্রীতির জন্য যতখানি, তার থেকে অনেক বেশি নিজের প্রীতির জন্য। কারণ, দ্রৌপদী হলেন সেই মহিলা যিনি তাঁকেও উন্মুক্ত রাজসভায় 'সূতপুত্র' বলে অপমান করেছিলেন ; সেই মহিলা, যিনি তাঁকে ইচ্ছে করে বিয়ে করেননি ; সেই মহিলা, যিনি উলটে বিয়ে করে বসলেন এমন একজনকে যিনি তাঁর চিহ্নিত শত্রু, চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন একজন মহিলাকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি দুর্যোধনের বন্ধুত্ব-পদ ব্যবহার করেছেন মাত্র। বস্তুত দুর্যোধনের দিক থেকে পাণ্ডবদের প্রতি জ্ঞাতিশত্রুতা থাকার ফলে শত্রুতার অঙ্কে মিল হওয়ায় তিনি কর্ণের দ্বারা বারংবার নিজের অজান্তেই ব্যবহৃত হয়েছেন।

কর্ণ এতকাল দুর্যোধনের সমস্ত ব্যাপারে নাক গলিয়ে দুর্যোধনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, ভাবনা—সব বুঝে নিয়েছেন। এই বোঝাটা তাঁকে কুচুটে-স্বভাবের লোকের মতো কৌশলে ভাবনা করে বুঝতে হয়নি, দুর্যোধন এতটাই মোটা দাগের মানুষ এবং কর্ণ এতটাই উচ্চাভিলাষী যে, এই বোঝাটা ছিল নিতান্তই পারস্পরিক। কর্ণ পাশার আসরে বসে সমস্ত কুরুবৃদ্ধদের অপমান করলেন। ঘরের ছেলে দুর্যোধনের পক্ষে এই অপমান করাটা লৌকিকতা কিংবা চক্ষুলজ্জায় বাধত, কিন্তু কর্ণের সেই দায় নেই, কাজেই দুর্যোধন নিজের মতো করে যেটাকে কুরুকুলপতিদের মুখোস বলে মনে করেন, সে মুখোস খুলে দিতে কর্ণের একটুও বাধে না, কারণ কর্ণ কুরুদের কেউ নন। আবার এই অপমান করার মধ্যেও যে সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব আছে, সেটাও কর্ণ বোঝেন দুর্যোধনের দৌলতেই। কাকে কতটা অপমান করতে হবে অর্থাৎ দুর্যোধন কাকে কতটা অপমান করতে চান, সেটা দুর্যোধনই এত প্রকট করে ফেলেন যে, কর্ণের পক্ষে কোনও অসুবিধেই হয় না সে দায় বহন করার। এই যে বিদুর ফিরে এলেন বনবাসী পাণ্ডবদের কাছ থেকে, আর দুর্যোধন একেবারে মুষড়ে পড়লেন তার কারণ কী ? দুর্যোধন যেখানে নিজেই বলেন যে, এই বিদুরটা হল পাণ্ডবদের বন্ধু, পাণ্ডবদের হিতকামী, তখন কর্ণ আরও বেশি বোঝেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর—এদের সবাইকে যেখানে দুর্যোধন স্বয়ংই পাণ্ডবপক্ষপাতী ঘরের শত্রু বলে মনে করছেন, সেখানে শুধুমাত্র পাণ্ডব-বিদ্বেষের নিরিখেই কর্ণ যে এই মানুষগুলির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, তাতে আশ্চর্য কী ? কিন্তু কর্ণের যেহেতু কোনও সীমাবদ্ধতার দায় নেই, তাই একদিকে তিনি যেমন দুর্যোধনের মানসিকতার মই বেয়ে কুরুসভায় কেউকেটা হয়ে উঠছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর—এঁদের সবার বড় অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

যাই হোক, বিদুর ফিরে আসায় দুর্যোধন খুব মুষড়ে পড়েছেন বটে কিন্তু কর্ণের মনে সে প্রতিক্রিয়া হয়নি। শকুনি, দুঃশাসন সবার সঙ্গে কর্ণও দুর্যোধনকে বুঝিয়েছেন যে, প্রথমত যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফিরে আসার লোক নন। আর যদি ফিরে আসেন তবে ফের পাশাখেলায় তাদের হারিয়ে বনে পাঠাব—পুনর্দ্যূতেন তান্ জয়। কর্ণ এ-কথাটা বলেছিলেন শকুনির মুখ চেয়ে কারণ দুর্যোধন শকুনির পরামর্শেই পাশা খেলে সফল হন। কিন্তু এবার কর্ণ দেখলেন যে, দুর্যোধন এই প্রস্তাবে খুশি হলেন না। কারণ একবার নয়, দুবার পাশা খেলার পর সমস্ত জনসাধারণ এবং সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তাতে আর যে পাশাখেলা সম্ভব নয় সেটা দুর্যোধন বেশ বুঝেছিলেন। অতএব এ প্রস্তাব তাঁর একটুও ভাল লাগল না—নাতিহৃষ্টমনাঃ...পরাঙমুখঃ। কাজেই কর্ণ এবার দ্বিতীয় প্রস্তাব দিলেন—কর্ণ বললেন—পাণ্ডবেরা এখন বনে আছে, এই আমাদের সুযোগ। কর্ণ চোখ

পাকিয়ে বেশ ঝাঁঝালো সুরে বললেন, ঝাঁঝালো এই জন্যে যে তিনি আগেও এ প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু কেউ মানেনি। কর্ণ বললেন—আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনবাসী পাণ্ডবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। পাণ্ডবেরা এখন বিশাল ঝামেলার মধ্যে রয়েছে, মনেও শান্তি নেই, বন্ধুবান্ধব রাজন্যবর্গও তাদের সহায় নেই, এই সময়েই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলব ওদের। বাস্, দুর্যোধনেরও শান্তি, আমাদেরও শান্তি—নির্বিবাদা ভবিষ্যন্তি ধার্তরাষ্ট্রাস্তথা বয়ম্।

'আমাদেরও শান্তি' বলতে কর্ণ নিশ্চয়ই তাঁর নিজের এবং শকুনির কথা বলেছিলেন, যাঁরা দুর্যোধনের বাড়িতে বাইরের মানুষ, কিন্তু তাঁর হিতকামিতার অছিলায় স্বয়ং উচ্চাভিলাষী। কর্ণের কথা দুর্যোধনের মনে ধরল। তাঁরা যুদ্ধযাত্রায় বেরলেন বটে কিন্তু কৌরবসভায় মহামতি বেদব্যাস এসে উপস্থিত হওয়ায় যাওয়াটা তাদের হল না। যদিও এই বাধাটা ছিল নিতান্তই সাময়িক। সুযোগ আবার এল যখন এক ব্রাহ্মণ বনে বনে ঘোরা পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা এসে শোনালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দুর্যোধনও ছিলেন না, কর্ণও ছিলেন না, ছিলেন একমাত্র শকুনি। শকুনি প্রথমেই এসে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন কর্ণকে—অবোধয়ৎ কর্ণমুপেত্য সর্বম্। পাণ্ডবেরা বিপাকে কষ্ট পাচ্ছেন শুনে কর্ণ খুব খুশি হলেন এবং মনের হরষ বাড়ানোর জন্য তিনি দুর্যোধনকে এক নতুন প্রস্তাব দিলেন। শকুনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন বটে কিন্তু সমস্ত 'প্ল্যানটা' যে তাঁরই সেটা বেশ বোঝা যায়। কর্ণ বললেন—মহারাজ দুর্যোধন! এই সমস্ত বসুন্ধরা এখন তোমার হাতের মুঠোয়, সামন্ত রাজারা তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে সব সময়। ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য-প্রতিপত্তি যাই তোমার থাকুক, সেগুলি দেখে যদি পাণ্ডবদের কষ্টই না লাগল তা হলে সে সম্পদের মানে কী। তোমার ভর্তি আছে, তাদের কিচ্ছু নেই—এই অবস্থাটা, এই বাড়বাড়ন্ত তাদের দেখানো দরকার। সত্যি বলতে কি, রাজ্যপাট, ধনসম্পত্তি—এসব থেকে কিছুই সুখ নেই, যদি না তোমার বাড়বাড়ন্ত দেখে বনবাসী এবং দুর্বিপাকগ্রস্ত পাণ্ডবদের চোখ না টাটায়।

কর্ণ বললেন—তুমি এক কাজ কর। পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে যেখানে কুটির বেঁধে রয়েছে, সেইখানেই যাওয়া যাক। তুমি যাবে দারুণ দামি পোশাক পরে, সঙ্গে থাকবে টাকা-পয়সা দাসদাসী। এই অবস্থায় গাছের বাকল-পরা অর্জুন তোমাকে দেখলে, তোমার কী আনন্দই না হবে—কিং নু তস্য সুখং ন স্যাৎ। কুরুবাড়ির বউরা সব ঘটা করে সেজেগুজে বাকল-পরা দ্রৌপদীর সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। রাজসভার মধ্যে বেচারা দ্রৌপদীর যা অপমান হয়েছিল, সুসজ্জিতা কৌরবস্ত্রীদের দেখলে সে দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলবে। ভাববে, পাণ্ডবদের বিয়ে করে কী হল আমার—সা চ নির্বিদ্যতাং পুনঃ।

সেই অর্জুন, সেই দ্রৌপদী। কী উপায়ে, কী কৌশলে অর্জুন কষ্ট পান, দ্রৌপদী কষ্ট পান কর্ণের কেবল সেই চিন্তা। কর্ণের সুবিধে, তাঁর এই পাণ্ডব নিপীড়নের বাসনা দুর্যোধনের সঙ্গে মিলে যায়। বস্তুত এগুলি সবই কর্ণের মনের ইচ্ছে এবং এই ইচ্ছেগুলি তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন দুর্যোধনের ওপর। দুর্যোধন এই কথাগুলি আগে একটুও ভাবেননি, এই মুহূর্তে কর্ণ এত সব বলায়, তাঁরও মনে হল—আরে তাই তো, এভাবে তো পাণ্ডবদের খানিকটা হেনস্থা করা যেতে পারে। সুপ্ত অভিলাষে সুড়সুড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের মনে হয়—এইরকম একটা দারুণ বুদ্ধি তো আমার মাথাতেই আসা উচিত ছিল। অতএব নিজের অপ্রস্তুত ভাব ঢাকতে বেশি সপ্রতিভ হয়ে দুর্যোধন বলেন—ভাই কর্ণ তুমি যা বলেছ, এসব তো আমার মনেও ছিল, কিন্তু নেহাত পিতা ধৃতরাষ্ট্র সেখানে যেতে অনুমতি দেবেন না বলেই যেতে পারছি না। নইলে আমার কি আর ইচ্ছে করে না যে পাণ্ডবদের একটু মেজাজ দেখিয়ে আসি, গাছের বাকল-পরা দ্রৌপদীকে পর্যাপ্তি দেখিয়ে আসতে আমারই কি ইচ্ছে করে না—দ্রৌপদীং কর্ণ পশ্যেয়ং কাষায়বসনাং বনে। কিন্তু কী উপায়ে সেখানে যাব সেইটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তোমরা যদি একটা উপায় বার করতে!

কর্ণ বুদ্ধিমান মানুষ, তাতে পরজীবী। তিনি বেশ জানেন—এসব দুর্যোধনের মাথায় কিছুই ছিল না, তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডব-কৌরবের সেই কাল্পনিক দুঃখসুখের অবস্থা বৈষম্য দুর্যোধনের মনে ধরেছে। পরগাছা হওয়ার দরুন কর্ণ বেশ জানেন—কোন গাছের, কোন জায়গায় তাঁর স্বপ্নবীজ ফলবে, যেমন এক্ষুনি যে দুষ্টবীজ উপ্ত হল দুর্যোধনের মাথায়, তাকে সফল করার দায়িত্বও কর্ণেরই।

তাই পরদিন সকালবেলায় উঠেই তিনি চলে এলেন দুর্যোধনের কাছে। প্রসঙ্গত বলা ভাল, দুর্যোধনের রাজকার্যে কর্ণ এতটাই গুছিয়ে বসেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে কোথায় কী ঘটছে সবই তিনি জানেন। সকালবেলায়—এসেই তিনি বললেন—উপায় পাওয়া গেছে। দ্বৈতবনে যেখানে পাণ্ডবেরা থাকে, সেখানেই রয়েছে হস্তিনাপুরের খাস প্রজা গয়লাদের বাড়ি-ঘর। রাজবাড়ির গরুবাছুরদের পালন করে তারাই। সে গয়লারাও বহুদিন ধরে তোমাকে যেতে বলছে—ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ। আমরা সেই অছিলায় দ্বৈতবনে যাব, পাণ্ডবদেরও মুখোমুখি হব। শকুনিও কর্ণকে সমর্থন করলেন। দুর্যোধন বললেন—বেশ, আমি কালকে যখন রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কুরুবৃদ্ধদের সঙ্গে বসে থাকব তখন তোমরা এই 'প্ল্যান' দেবে। আমি সেই মুহূর্তে যা করার করব।

কর্ণ-শকুনি অত কাঁচা লোক নন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দ্বৈতবনের এক গোয়ালাকে 'ফিট' করে এনেছেন, যার প্রসঙ্গ তুলে কর্ণ গলা মিলিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—ঘোষপল্লীতে একবার যাওয়া দরকার (যেন দ্বৈতবন তাঁরা চেনেন না), গরুবাছুরদের গণনা করে তাদের গায়ে ছাপ মারারও দরকার—স্মরণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাংকনম্। তা ছাড়া দুর্যোধন যদি যান তো একটু মৃগয়া-টৃগয়াও হতে পারে, আপনি অনুমতি দিন মহারাজ। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে খবর ছিল যে, অর্জুন দেবতাদের তুষ্ট করে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও লাভ করেছে, সেখানে ঘোষপল্লীতে গিয়ে যদি কৌরবেরা আবার পাণ্ডবদের বিনা কারণে খোঁচায়, এটা তিনি চাইছিলেন না। শকুনিও অনেক বোঝালেন বটে, তবে নিতান্ত অনিচ্ছায় ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনিকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধন চললেন দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের বাবু-মেজাজ দেখাতে। সঙ্গে থাকল সৈন্য-সামন্ত, রথ, হস্তী। সমস্ত কুলবধূরা সেজেগুজে চলল। গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-পাট, বেশ্যা-দাসী সবাই চলল দুর্যোধনের সঙ্গে। দ্বৈতবনে এলাহি ব্যবস্থা হল থাকা-খাওয়া, নাচা-গানার। ঘোষপল্লীতে প্রাথমিক কাজকর্ম সেরেই মৃগয়া চলল কিছুদিন। তারপরেই দুর্যোধন 'অর্ডার' দিলেন—দ্বৈতবনের যে সরোবরের একধারে পাণ্ডবেরা রয়েছেন তারই আরেক ধারে বেশ কিছু বাড়ি বানিয়ে ফেলতে। কারিগরেরা চলল বটে বাগানবাড়ি বানাতে, কিন্তু সে জায়গা আগেই এসে দখল করেছিলেন—গন্ধর্ব চিত্রসেন। একজনকে দেখাতে এসে আরেকজনের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে গেল। রীতিমতো যুদ্ধ, তুমুল যুদ্ধ। পাণ্ডবেরা পরপারেই রয়েছেন, তাঁদের সামনেই যুদ্ধ হচ্ছে, কাজেই দুর্যোধনের তরফে এটা দারুণ 'প্রেস্টিজে'র ব্যাপার। প্রধান প্রধান সৈনিকদের দিয়ে কিছু হল না, অতএব 'প্রেস্টিজ' বাঁচাতে যুদ্ধ করতে এলেন কর্ণ। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। কর্ণ অনেক গন্ধর্বদের মেরে ফেললেন বটে কিন্তু গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন মায়াযুদ্ধ জানেন। দুর্যোধন, দুঃশাসনেরা সবাই কর্ণের ভরসাতেই যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, চিত্রসেন এমন যুদ্ধ করলেন যে, কর্ণ দেখলেন রণক্ষেত্রে প্রায় তিনি একা। গন্ধর্বরাও বুঝেছে যে, কর্ণই আসল যুদ্ধবাজ, তারা সবাই মিলে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। কেউ কর্ণের রথ ভাঙে, কেউ ধ্বজা কেটে দেয়, কেউ রথের চাকা নিয়ে পালায়, কেউ বা রথের ঘোড়া মারে, কেউ বা শুধুই বাণ মেরে যাচ্ছে কর্ণের গায়ে। শেষে সমস্ত গন্ধর্বরা মিলে কর্ণকে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলল যে, কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণের রথে চড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। সেই সুযোগে দুর্যোধন চিত্রসেনের হাতে সস্ত্রীক ভাইদের সঙ্গে বন্দি হলেন এবং তাঁকে মুক্ত হতে হল ভীম এবং অর্জুনের মধ্যস্থতায়। এর থেকে বড় অপমান দুর্যোধনের আর কী-ই বা হতে পারে। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দুর্যোধনের সমস্ত 'প্ল্যান'টাও বলে দিলেন পাণ্ডবদের।

দুর্যোধন লজ্জায় মাথা নিচু করে হস্তিনাপুরের দিকে চললেন, নিজের ওপর অশ্রদ্ধায় তাঁর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। এরই মধ্যে কর্ণ এসে উপস্থিত হলেন দুর্যোধনের কাছে। অতি আহ্লাদে আটখানা হয়ে কর্ণ বললেন—বাঃ! তোমরা যে গন্ধর্বদের জিতে আবার ফিরে চলেছ, এটা দেখে খুবই ভাল লাগছে। আমাকে তো তোমরা দেখেছ, গন্ধর্বরা কী করল! সবাই মিলে এমন আমার পেছনে লাগল—অহং ত্বভিদ্রুতঃ সর্বৈঃ গন্ধর্বৈঃ পশ্যতস্তব—যে, পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম—ব্যপযাতো'ভিপীড়িতঃ। যেখানে আমারই এই অবস্থা, সেখানে ভাইদের সঙ্গে করে তুমি যে যুদ্ধ জিতে ফিরেছ, এটা তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না।

বলা বাহুল্য, এই কথায় দুর্যোধন আপাতত খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং গম্ভীরভাবে জানালেন—তুমি কিছুই না জেনে এসব কথা বললে বলে আমি কিছু মনে করছি না, নইলে জেনে রেখ আমি কিছুই জিতিনি, বরঞ্চ বউ-ঝি, মন্ত্রী-ভাই—সবাইকে নিয়ে আমি তাদের হাতে বন্দি হয়েছিলাম। দুর্যোধন সব খুলে বললেন। কীভাবে তাঁদের সব কৌশল ফাঁস হয়ে গেছে, কীভাবে নিতান্ত উদাসীনতায় অর্জুন চিত্রসেনের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং কীভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্যন্ত তাঁকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন—মা স্ম তাত পুন কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ। কর্ণ সব শুনলেন, বুঝলেন ভীষণ অপমানবোধে দুর্যোধন জর্জরিত। এই অপমান-পঙ্ক থেকে দুর্যোধনকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়, তাও তিনি জানেন। তবু তিনি দুর্যোধনকে বলতে দিলেন। দুর্যোধন এতই ভেঙে পড়েছেন যে, তিনি কর্ণকে বললেন—তোমরা যাও ভাই সব, দুঃশাসনকে আমি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করছি। দুঃশাসনই কর্ণ এবং শকুনির দ্বারা প্রতিপালিত এই ঋদ্ধা বসুমতীকে শাসন করবে—প্রশাধি পৃথিবীং স্ফীতাং কর্ণসৌবলপালিতাম্।

একটা বিরাট খবর পাওয়া গেল। যে পৃথিবী এইমাত্র দুর্যোধন দিয়ে দিলেন দুঃশাসনকে, দুঃশাসন সেই পৃথিবীর রাজা মাত্র হবেন, বস্তুত সেই পৃথিবী এতদিন সমৃদ্ধ হয়েছে কর্ণ এবং শকুনির চালনা-গুণে, পালনের বুদ্ধিতে—কর্ণসৌবল-পালিতাম্। দুর্যোধন মনে প্রাণে যা বিশ্বাস করেন, আমরাও তাই বিশ্বাস করি। রাজ্যভার নবসেবকের হাতে প্রত্যর্পিত হোক আর নাই হোক, দুর্যোধনের রাজ্য এতকাল কর্ণ আর শকুনির বুদ্ধিতেই চলছে, দুর্যোধন রাজা, কর্ণ রাজ্যপাল। দুর্যোধনের রাজ্যে এত বড় যাঁর সম্মান, সেই কর্ণ জানবেন না কীভাবে দুর্যোধনের অপমান ঘোচাতে হবে ? অনেকক্ষণ দুর্যোধনের কথা শুনে, তাঁর আত্মধিক্কার হজম করে কর্ণ একটা সাধারণ উত্তর দিলেন। আগেই বলেছি কর্ণের ওকালতি বুদ্ধি খুব পরিষ্কার। ভীম, অর্জুন এবং যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের প্রতি যে উদাসীনতা দেখিয়েছেন, ততোধিক উদাসীনতায় কর্ণ জবাব দিলেন—তোমরা এমন বোকার মতো মনোকষ্ট পাচ্ছ যে কী বলব—বালিশ্যাৎ প্রাকৃতাবিব। পাণ্ডবেরা তাদের কর্তব্য করেছে, করাই উচিত। কারণ তারা তোমার রাজ্যের অন্তেবাসী প্রজা, তো প্রজা রাজাকে বাঁচাবে না ? তা ছাড়া জনপদবাসী সাধারণ মানুষেরা সৈনিকদের সাহায্য করবে, রাজার কাজে সহায়তা করবে—এই নিয়ম। পাণ্ডবেরাও তোমার জনপদবাসী। অতএব সাহায্য করেছে, তাতে হয়েছেটা কী ?পাণ্ডবেরা অনেককাল আগেই তোমার দাসে পরিণত হয়েছে—প্রেষ্যতাং পূর্বমাগতাঃ—আমি তো মনে করি তুমি যে সময়ে গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেছ, সেই সময়েই পাণ্ডবদের উচিত ছিল তোমার সেনাবাহিনীর পেছনে এসে যোগ দেওয়া—স্বসেনয়া সম্প্রয়ান্তং নানুযান্তি স্ম পৃষ্ঠতঃ—কারণ সেটাই ছিল তাদের কর্তব্য। কর্ণের কথায় দুর্যোধনের মনে নিশ্চয়ই কাজ হচ্ছিল, তবুও তিনি ওপরে ওপরে ভীষণ অবসন্ন দেখাচ্ছিলেন। এবারে যখন শকুনিও কর্ণের সমস্ত কথা সমর্থন করলেন—সম্যগ্ উক্তং হি কর্ণেন—এবং দুর্যোধনকে খুব একচোট বকা লাগালেন তখনই কর্ণের কাজ সাঙ্গ হল। দুর্যোধন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হস্তিনায় ফিরে এলেন।

গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ যে একেবারে জঘন্যভাবে হেরে গেলেন, এর ফল ফলল দুই তিন-ধারায়। যিনি বাস্তবিক অহঙ্কারী পুরুষ, যেমন কর্ণ, তিনি ভাবলেন তাঁর এই পরাজয়টা নিতান্তই আপাতিক এবং অর্জুন যে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, সেটাও কোনওক্রমে হয়ে গেছে। দুর্যোধনকে তিনি বুঝিয়েছেন—তুমি অর্জুনের বিক্রম দেখে ভয় পেয়ো না, তেরো বছর বাদে যদি যুদ্ধ হয়, তবে অর্জুনকে আমি প্রাণে মারব—এ-কথা নিশ্চয় জেনো—সত্যং তে প্রতিজানামি বধিষ্যামি রণেঽর্জুনম্। দুর্যোধন তো এই কথা বিশ্বাস করতেই চান। যার ওপরে ভরসা করে তিনি এগোচ্ছেন, সে একটা যুদ্ধ হেরে গেলে তার একটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয় বটে। কিন্তু ভরসা করার মতো বশংবদ বীরপুরুষ যদি বিকল্পে না থাকে, তবে তাকেই আবার ভরসা করতে হয়, ভাবতে হয়—পরের বার কর্ণ নিশ্চয় দেখে নেবে অর্জুনকে—এবমাশা দৃঢ়া তস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ। কিন্তু নিরপেক্ষ জন ছাড়বে কেন ? যারা আগে একের পর এক অন্যায় করেছে, তারা যখন হেরে যায়, তখন নিরপেক্ষ জনে কটূক্তি করবেই। কাজেই কর্ণ দুর্যোধন যখন লজ্জার মাথা খেয়ে হস্তিনায় ফিরলেন, তখন ভীষ্ম

বললেন—দ্যাখো বাপু দুর্যোধন আগেই তোমায় বারণ করেছিলাম দ্বৈতবনে না যেতে, এখন শত্রুর হাতের বন্দি-বাঁধন কেমন লাগল ? লজ্জা করল না তোমার যখন পাণ্ডুপুত্রেরা এসে তোমাদের বাঁচাল ? আর এই যে সারথির পো, সে তো ভয়ে পালিয়েই গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তোমরা তো 'কর্ণ কর্ণ' বলে ডাক ছাড়ছিলে, তবু সে পালিয়ে গেল—'ক্রোশতস্তব রাজেন্দ্র সসৈন্যস্য নৃপাত্মজ। সূতপুত্রো'পযাদ্ ভীতঃ...। এই তো অবস্থা, তুমি অর্জুনের ক্ষমতাও দেখলে, কর্ণের ক্ষমতাও দেখলে, এত তো 'কর্ণ' 'কর্ণ' কর, আরে কর্ণ অর্জুনের পায়ের নখের যুগ্যি নয়—ন চাপি পাদভাক্ কর্ণঃ পাণ্ডবানাং নৃপোত্তম। ভীষ্ম বললেন—আমি সারকথা বলি, তুমি সন্ধি করো পাণ্ডবদের সঙ্গে, সেটাই হবে চরম মঙ্গল। দুর্যোধন সপার্ষদ এতক্ষণ ভীষ্মের কথা শুনছিলেন, এবারে সন্ধির কথা শুনে ভীষ্মের মুখের ওপর দারুণ এক অবজ্ঞার হাসি হেসে উত্তরের সৌজন্য না দেখিয়েই হুম হুম করে চলে গেলেন, পেছন পেছন চললেন কর্ণ আর দুঃশাসন।

স্বয়ং কুরুকুলপতি বৃদ্ধ পিতামহের প্রতি একই কুলজাত অধস্তন পুরুষের এই যে ব্যবহার এই ব্যবহারের মধ্যে মন্দবুদ্ধি উচ্চাভিলাষী রাজপুরুষ প্রশ্রয় পাবে। দুর্যোধন সেটা বোঝেন না। আমরা পূর্বেই দেখেছি, দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে কর্ণ এতটাই বেড়ে উঠেছেন যে দ্যূতসভার আসরে তিনি কুরুবৃদ্ধদের বিরুদ্ধেও কটূক্তি করতে ছাড়েননি। এখন এই মুহূর্তে স্বয়ং রাজপুত্রই যখন তাঁর পিতামহের মুখের ওপর অবজ্ঞার হাসি হেসে তাঁর সমস্ত সদুপদেশ উড়িয়ে দিলেন—প্রহস্য সহসা রাজন্ বিপ্রতস্থে সসৌবলঃ—সেখানে কর্ণের কী দায় থাকে ? বাইরের লোকের সামনে এমনি করে অপমানিত হয়ে ভীষ্ম তো কোনওরকমে নিজের ঘরে মুখ লুকিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু আর একটি উচ্চাভিলাষী মুখ তখন দুর্যোধনের দুর্বলতায় ঘা দিয়ে বলল—এই ভীষ্মটা আমাদের একদম দেখতে পারে না। সব সময় ওর মুখে শুনবে পাণ্ডবদের প্রশংসা। বুড়ো তোমাকে দেখতে পারে না, তাই আমাকেও দেখতে পারে না—ত্বদ্-দেষাচ্চ মহাবাহো মমাপি দ্বেষ্টুমর্হতি।

লক্ষ করুন, কর্ণ সব সময় এখানে দুর্যোধনকে জড়িয়ে নিয়ে নিজের কথা বলছেন এবং তিনি যে রেগে যাচ্ছেন, এটা যেন নিজের অপমানে ততটা নয়, যতটা দুর্যোধনের অপমানে। কর্ণ বললেন—দেখবে সব সময় তোমার সামনে আমাকে খাটো করবে। তোমার সামনে আমাকে যে সব কথা বলছে—এ কিন্তু আমি আর সহ্য করব না ; আমাকে তাও যা বলার বলুকগে, কিন্তু সব সময় ওই পাণ্ডবদের প্রশংসা আর তোমার নিন্দা—এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না—ন মৃষ্যামীহ ভারত। তুমি যদি আজকে বল তো সমস্ত পৃথিবী তোমায় আমি জিতে এনে দিতে পারি। যে সমস্ত সামন্ত রাজ্য পাণ্ডবেরা এক সময় জিতেছিল, সে সব আমি চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে একাই জিতে আনব। দেখুক বেটা দুষ্টবুদ্ধি ওই কুরুকুলের কুলাঙ্গার ভীষ্মটা—সংপশ্যতু সুদুর্বুদ্ধি র্ভীষ্মঃ কুরুকুলাধমঃ। কর্ণ বললেন—ভীষ্ম সব সময় যাকে নিন্দে করার নয় তাকে নিন্দে করবে,—যেমন আমাকে, তোমাকে। আর যাকে প্রশংসা করা কখনও উচিত নয় তাকে প্রশংসা করবে যেমনি পাণ্ডবদের। ও এইবার আমার ক্ষমতা দেখবে, আর নিজেই একেবারে কুঁকড়ে যাবে—আত্মানাং তু বিগর্হতু। আমি দিগ্‌বিজয় করে আসব, তুমি অনুমতি দাও।

সত্যি কথা বলতে কি ভীষ্মের প্রতিকূল ব্যবহারে কর্ণ যে আজ হঠাৎ খেপে উঠলেন, তা মোটেই নয় ; ভীষ্ম একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল কথা তিনি নিজে যে গন্ধর্বদের হাতে প্রচণ্ড পিটুনি খেয়ে এলেন এবং তিনি থাকতেও দুর্যোধনকে যে অর্জুনের সহায়তায় মুক্তি পেতে হল, এর একটা প্রতিপূরক ব্যবহার করতে চাইছিলেন কর্ণ। এতে যেমন দুর্যোধনের ক্ষোভও একটু প্রশমিত করা যাবে তেমনি দিগ্‌বিজয়ের সূত্রে বেশ কয়েকটা রাজ্য জিতে এলে দুর্যোধন তাঁর ওপর হৃত বিশ্বাস ফিরে পাবেন। বিশেষত যুদ্ধবিদ্যায় তিনি যে কারও চাইতে কম নন এটা যদি অর্জুন বাদে অন্য রাজাদের ওপর দিয়ে পরীক্ষা হয়ে যায়, তার চাইতে সুবিধেজনক আর কী আছে। কিন্তু এই দিগ্‌বিজয়ের কথাটা হঠাৎ করে পাড়তে কর্ণের অসুবিধে হচ্ছিল। দুর্যোধনের সামনে ভীষ্ম তাই যেদিন কর্ণকে কিঞ্চিৎ খাটো করলেন, ওমনি কর্ণ দিগ্‌বিজয়ের কথাটা পেড়ে ফেললেন এবং সেইসঙ্গে কুরুবৃদ্ধ পিতামহকেও যথেচ্ছ গালাগালি করে নিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য যে মানুষ দুর্যোধনের

দাক্ষিণ্যে এত দূর এসেছেন, তাঁরই মুখে আপন পিতামহের কুৎসা শুনেও দুর্যোধন তাঁকে কিছুই বললেন না। 'ভীষ্ম কুরুকুলের অধম', 'ভীষ্ম দুর্বুদ্ধি'—এ-কথা যদি সত্যও হত, তবু কর্ণের মুখে এ-কথা শুনে দুর্যোধনের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, তা তো তিনি করলেনই না বরং উল্টে বললেন—ধন্য হলাম বন্ধু, ধন্যি আমি! তোমার মত মহাবল পুরুষ যে সব সময় আমার হিত চিন্তা করছে, তাতে আজ আমার জন্ম সফল—হিতেষু বর্ত্ততে নিত্যং সফলং জন্ম চাদ্য মে। যাও বীর, তুমি বিশ্বভুবন জয় করে ফিরে এস।

পাণ্ডবেরা দিগ্‌বিজয় করতে বেরিয়েছিল, সেই দিগ্‌বিজয় কর্ণ করতে যাচ্ছেন দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে—এই গর্বেই দুর্যোধনের বুক ফুলে উঠল। ভীষ্মের অপমান তাঁর মাথাতেই ঢুকল না। বিশ্ব নিখিল জয়ের জন্য কর্ণ জয়রথে উঠলেন এবং অর্জুনের মতো ধনুর্ধরী বীর দ্বিতীয় না থাকার ফলে দিগ্‌বিজয় করে ফিরেও এলেন। কর্ণের সাফল্যে গর্বিত দুর্যোধন, গদগদ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ভাইবন্ধুদের নিয়ে আরতি করে কর্ণকে নামিয়ে আনলেন জয়রথ থেকে এবং সবার সামনে কর্ণকে মাথায় তুলে দিয়ে বললেন—যে সুখ আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—কারও কাছ থেকে পাইনি, আজ তুমি কর্ণ সেই সুখ দিলে—যন্নভীষ্মান্ন চ দ্রোণাৎ... ত্বত্তঃ প্রাপ্তং ময়া হি তৎ। কর্ণ বুঝলেন, তাঁর বুদ্ধি কাজে লেগেছে, দুর্যোধন তাঁর পুরনো দুঃখ ভুলে গেছেন। আজ তিনি ভীষ্ম দ্রোণের থেকেও বড় 'হিরো'। দুর্যোধন বললেন—বেশি কথা কী, তোমার জন্যই আজ আমরা অনাথ নই। বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, তোমার শক্তির তুলনায় পাণ্ডবদের শক্তি এক ফুটো পয়সাও নয়—ন হি তে পাণ্ডবাঃ সর্বে কলামর্হন্তি ষোড়শীম্। কর্ণ তো এইটাই চেয়েছিলেন, এমন একটা ব্যাপার করা যাতে দুর্যোধন আবার বিশ্বাস করবেন যে, অর্জুনকে তিনি ছাড়া আর কেউই জয় করতে পারবেন না। দুর্যোধন বিশ্বাস করেছেন। কর্ণ আজ সফল এবং এতটাই সফল যে কর্ণকে দুর্যোধন রণবিজেতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মর্যাদায় ভূষিত করে বললেন—যাও তুমি আজ দেখা কর পিতা ধৃতরাষ্ট্র, জননী গান্ধারীর সঙ্গে, ঠিক যেমন পুরন্দর ইন্দ্র যুদ্ধ জয় করে এসে দেখা করেন দেবমাতা অদিতির সঙ্গে। কর্ণও বাধ্য ছেলের মতো—পুত্রবচ্চ নরব্যাঘ্র—ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর পাদবন্দনা করলেন। যিনি এতকাল বাইরের লোক ছিলেন সেই কর্ণ আজ দিগ্‌বিজয়ের পর কৌরবকুলে ঘরের ছেলে হয়ে গেলেন। দুর্যোধন আর শকুনি ভাবলেন, কর্ণ বুঝি পাণ্ডবদের জয় করেই ফেলেছেন, শুধু একটা খেলা-খেলা যুদ্ধের অপেক্ষা—জানতে নির্জিতান্ পার্থান্ কর্ণেন যুধি ভারত।

হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে কর্ণের প্রেস্টিজ এখন দারুণ বেড়ে গেছে। দুর্যোধন দেখলেন, দিগ্‌বিজয়ও হয়ে গেল, ভেট হিসেবে টাকাপয়সাও অনেক এসেছে, এখন যুধিষ্ঠিরের মতো একটা রাজসূয় করলেই বেশ জাতে ওঠা যায়। জনসাধারণের কাছে দ্যূতক্রীড়ার পরে তাঁর যে একটা সম্মান-হানি হয়েছিল, কর্ণের দিগ্‌বিজয়ের পর সে গ্লানি খানিকটা ঘুচেছে। জনগণ নিশ্চয়ই সুরক্ষিত বোধ করছে, এখন একটা রাজসূয়যজ্ঞ করলেই দুর্যোধনের ভাবমূর্তি একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সময় বুঝে দুর্যোধন তাঁর রাজসূয়ের বাসনা জানালেন কর্ণকে। দুর্যোধন বললেন—পাণ্ডবদের রাজসূয় দেখা অবধি আমার বড় সাধ হয় কর্ণ যে, রাজসূয়যজ্ঞ করব। তুমিই সে ব্যবস্থা কর—তাং সম্পাদয় সূতজ। কর্ণ বললেন—এ আর বেশি কথা কী? সমস্ত ধরণী তোমার বশগত। এখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলে ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে রাজসূয় করলেই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য! একই বংশের দুই জ্ঞাতি পুরুষ রাজসূয়যজ্ঞ করতে পারে না, সে নিয়ম নেই। যুধিষ্ঠির বেঁচে থাকতে—জীবমানে যুধিষ্ঠিরে—দুর্যোধনের পক্ষে দ্বিতীয়বার রাজসূয় করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণেরা অনেক ভেবে চিন্তে রাজসূয়ের সমতুল্য বৈষ্ণবযজ্ঞ করার অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন ভাবলেন—তাই সই, হাজারো লোকজন তো যজ্ঞের আড়ম্বর দেখে দুর্যোধনের ধন্যধ্বনি দেবে, তাই সই। তা বৈষ্ণবযজ্ঞে ভীষ্ম, দ্রোণ, সবাই সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। তাঁরা ভাবলেন ছেলের বুঝি সুমতি হয়েছে, ধম্ম-কম্ম করছে। কর্ণের বিজয়-ঘোষে দুর্যোধনের উদার যজ্ঞপুণ্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে বৈষ্ণবযজ্ঞ জনগণের মনে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের স্মরণ ঘটাল। কেউ বা ভাল বলল কেউ বা মন্দ। তুলনা-প্রতিতুলনার দ্বন্দ্বশেষে দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ যেদিন সমাপ্ত হল সেদিন পরম আহ্লাদিত মনে জনগণের শেষ

স্তুতি-চন্দনের চূর্ণ গায়ে মেখে তিনি এসে বসলেন নিজের ঘরে আপন গোষ্ঠীর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করলেন—ঘোষণা করলেন এইজন্যে যে, তিনি আজকের কৌরবগোষ্ঠীতে সবচেয়ে বড় 'হিরো' হওয়া সত্ত্বেও বুঝেছেন, দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞের উন্মাদনা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের স্মৃতিলোপ ঘটাতে পারেনি ; বুঝেছেন—তাঁর আপন দিগ্‌বিজয় পাণ্ডবদের বলবীর্য ম্লান করে দিতে পারেনি ; বুঝেছেন—দিগ্‌বিজয় এবং বৈষ্ণবযজ্ঞের সমাপ্তির পরেও অর্জুন এখনও জীবিত। তাই কর্ণ ঘোষণা করলেন—আজকের যজ্ঞ শেষ হল বটে। কিন্তু দারুণ যুদ্ধে পাণ্ডবেরা সবাই মারা যাবার পর যেদিন তুমি রাজসূয়যজ্ঞ করবে—হতেষু যুধি পার্থেষু রাজসূয়ে তথা ত্বয়া—সেদিন আবার আমি তোমার উপযুক্ত সৎকার করব। দুর্যোধন জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। মনে মনে কল্পনা করলেন কেমন করে নিহত পাণ্ডবদের মৃত্যুক্ষেত্রে রাজসূয়ের উদ্বোধন করবেন তিনি। দুর্যোধন বললেন—কবে সেদিন আসবে যেদিন পাণ্ডবদের মৃত্যুর পথে যাত্রা করিয়ে আমি রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করব ? সমস্ত উত্তেজনা একসঙ্গে জড়ো করে কর্ণ জবাব দিলেন—তবে আমার কথা শোন দুর্যোধন ! যতদিন আমি অর্জুনকে না মারতে পারি, ততদিন আমি নিজে নিজের পা ধোব না, খাব না মাংস, পালন করব 'অসুরব্রত', আর এই ব্রতের নিয়ম হিসেবে আজ থেকে কেউ যদি এসে আমার কাছে কিছু চায়, আমি না বলব না। কর্ণ এমনি এক নিশ্চয়তায় অর্জুন বধের প্রতিজ্ঞা করলেন যে দুর্যোধন পুনরায় বিশ্বাস করলেন—পাণ্ডবেরা মরেই গেছে—বিজিতাংশ্চাপ্যমন্যন্ত পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজাঃ।

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন 'অসুরব্রত' মানে অসুরদের কোন ব্রত-ট্রত নয়, সুরা পান না করার ব্রত। কর্ণ মদ, মাংস ত্যাগ করে মলিন হয়ে, দানের পুণ্যে অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা করলেন। যাঁরা ভাবেন কর্ণ সারাজীবন দান-ধ্যান করে 'দাতা কর্ণ' হয়েছেন, তাঁরা মনে রাখবেন পাণ্ডবদের বনবাসপর্বের যখন আর এক বৎসর আটমাস মাত্র বাকি, তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কর্ণ তাঁর দানের ব্রত পালন করেছিলেন। নিখুঁত হিসেব করে দেখলে এই সময়ের অঙ্ক খুব বেশি দিনের নয়, যদিও কর্ণের 'দাতা' সুনামটিও সময়ের হিসেব ধরে আসেনি, এসেছে নিজের মৃত্যু তুচ্ছ করে আপন অঙ্গ-জাত কবচ-কুণ্ডল দানের ফলে। মহাভারতের অন্যত্র যেখানে কর্ণের গৌরব শোনা যাচ্ছে করুণ সুরে, সেখানে অবশ্য বলা আছে যে, মধ্যদিনে দেব দিবাকরের পূজা সমাপন করার পর কর্ণ কোনও ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে ফেরাতেন না। কিন্তু সে-কথা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করলে বিপদ বাড়ে। তাতে বৈষ্ণবযজ্ঞের অন্তে দুর্যোধনের কাছে পুনরায় দানব্রত গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করার অর্থ থাকে না। বিশেষত দুর্যোধনের রাজবাড়িতে কর্ণের দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র আঁকা আছে তাতেও কোনও দানের কথা কোনওদিন পাওয়া যায় না। যাই হোক, কর্ণ প্রথম থেকেই দান করুন কিংবা তাঁর প্রতিজ্ঞারম্ভের পর, সে-কথা অকিঞ্চিৎকর, বস্তুত এই দানের কাহিনী থেকেই কর্ণের জীবনে অতি কারুণ্যের স্পর্শ লেগেছে, নইলে এতদিন কৌরব সভায় বৃদ্ধ সজ্জনের চোখের ওপর যে ব্যবহার তিনি করে যাচ্ছিলেন তাতে তাঁর জন্মলগ্নের অনিশ্চয়তা থেকে পাঠকের হৃদয়ে যে করুণা জন্ম নিয়েছিল তা প্রায় ধুয়ে মুছে যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ যে অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা নিলেন, সেদিন থেকেই কর্ণের জীবনে আরেক অধ্যায় আরম্ভ হল—করুণ অধ্যায়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার রঙ্গভূমিতে দুর্যোধনের কাছ থেকে অঙ্গরাজ্যের রাজমুকুট লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের জীবনে ভাগ্যোত্তরণের শুরু। একে আমরা ভাগ্য বলব কিনা জানি না, তবে রাজার ঘরে জন্মালে একজন রাজপুত্রের যা যা লাভ হতে পারত, কর্ণ সে সবই লাভ করেছিলেন দুর্যোধনের বন্ধুত্বের দৌলতে এবং নিজের ক্ষমতায়, বুদ্ধিবৃত্তিতে তথা কৌশলে। হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে ক্রমে ক্রমে তিনি এমন এক পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন, যা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এইসব পুরাতন ব্যক্তিত্বের কাছে ঈর্ষণীয় ছিল। কর্ণের দিগ্‌বিজয় ছিল এই মর্যাদার চূড়ান্ত বিন্দু। কিন্তু দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ সমাপনের পর যে দানব্রত গ্রহণ করলেন কর্ণ, সেই ব্রত থেকেই তাঁর যত ক্ষয়-ক্ষতি আরম্ভ হয়, যদিও এই ক্ষয়স্থানগুলি যশের গৌরবে মাঝেমাঝেই ভাস্বর।

কর্ণ খুব দান করে চলেছেন। দিনের পর দিন তাঁর দানের পুণ্য বেড়েই চলেছে। এদিকে পাণ্ডবদের বনবাস বারো বচ্ছর পুরে তেরো বচ্ছরে পড়ি পড়ি। বনবাসের দিন যত শেষ হয়ে আসছে, পাণ্ডব-কৌরব দুই পক্ষই মানসিকভাবে ততই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই প্রস্তুতির ছায়া পড়েছিল দেবলোকেও। ইন্দ্র, সূর্য—এঁরা কীরকম দেবতা জানি না, তবে মহাভারতের পটভূমিতে এই দেবতাদের সঙ্গে মর্ত্যলোকের মাখামাখি যথেষ্ট ছিল বলেই মর্ত্য-নারীর গর্ভে উৎপন্ন আপন আপন পুত্রের জন্য দেবসমাজেও কিঞ্চিৎ চিন্তাভাবনা দেখা দিল। অর্জুনকে বাঁচানোর জন্য স্বয়ং দেবরাজের মনোবাসনা টের পেয়ে গেলেন দেব দিবাকর। ভগবান সূর্য বুঝলেন, কর্ণের দানব্রতের সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধরে হরণ করবেন তাঁর সহজাত কবচ এবং কুণ্ডল, যা থাকলে কর্ণের মৃত্যু নেই। দেবরাজের অভিপ্রায় জেনে সূর্য নিজেই ব্রাহ্মণের রূপ ধরে দেখা দিলেন কর্ণের স্বপ্ন-শয়নে। সূর্য বললেন—তোমার ভালর জন্য বলছি বাছা। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসবেন কবচ এবং কুণ্ডল যাচনা করার জন্য। তিনি জানেন যে, দানের সময় তুমি কাউকে ফেরাও না—ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ। কিন্তু তুমি যেন বাপু ইন্দ্র ঠাকুরকে তোমার কবচ আর কুণ্ডল দিয়ে দিয়ো না। তুমি তোমার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে ইন্দ্রকে কবচ আর কুণ্ডলের ব্যাপারে বিমুখ করতে কিংবা তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে।

নিজের ঘরের লোক বলে সূর্য ইন্দ্রের স্বভাব জানেন। সূর্য ভাবলেন ইন্দ্রের ঈপ্সিত বস্তুগুলি যদি পর পর সাজিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে হয়তো বা তিনি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতেও পারেন। সূর্য বললেন—ইন্দ্র যখন ভিক্ষে চাইবেন, তুমি তখন হিরে-জহরতের লোভ দেখাবে, লোভ দেখাবে মদমত্ত যুবতী কামিনীদের। তা ছাড়া ঋগ্‌বেদের প্রথম সারির দেবতা তিনি, গরু-ঘোড়াও তাঁর ঈপ্সিত হতে পারে, তুমি সেগুলোও একবার বলে দেখো—রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্ধনৈ-র্বহুবিধৈরপি। আসল কথা কী জান, তোমার এই কবচ আর কুণ্ডল যদি একবার দিয়ে দাও, তা হলেই তোমার পরমায়ু শেষ। যতদিন ও দুটি তোমার সঙ্গে আছে, ততদিন তুমিও আছ। ও দুটি হারালে যুদ্ধক্ষেত্রে আর তুমি শত্রুর অবধ্য থাকবে না। তাই বলি, যদি বাঁচতে চাও কর্ণ, তা হলে অমৃতের ভাণ্ড থেকে উঠে-আসা ওই কবচ আর কুণ্ডলটি তোমায় বাঁচিয়ে রাখতেই হবে—তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব!

সূর্য ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়েছিলেন কর্ণের স্বপ্নশয্যায়। যে মানুষ সারাজীবন কলঙ্ক বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি এক ব্রাহ্মণবেশীর মুখে তাঁর জীবনের দাম শুনে ভারী পুলকিত হলেন। তাঁর বেঁচে থাকার জন্য, শুধু তাঁর বেঁচে থাকার জন্য এমন মমত্বময় দুশ্চিন্তা তিনি কারও মধ্যে দেখেননি, এমনকী তাঁর মায়ের মধ্যেও নয়, যিনি তাঁকে জন্ম দিয়ে ভুলে গেছেন। এই মমত্বটুকুর জন্য কর্ণ সব দিতে পারেন। বিশ্বসংসারের বিচিত্র বন্ধনের রূপ দেখে ব্যক্তি-মানুষের যেমন ক্বচিৎ এমন কল্পনা আসে যে, এই মুহূর্তে আমি মরে যেতে পারি, ঠিক তেমনি এই মুহূর্তে তাঁরই জীবনের জন্য এক ব্রাহ্মণবেশীর এত ভাবনা জেনে কর্ণেরও বুঝি মনে হল—এই মমতার বিকল্পে আমি মরতেও পারি। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া দরকার কে এই ব্রাহ্মণবেশী। কর্ণ বললেন—কে আপনি ব্রাহ্মণ, আমার ওপর এত মমতা দেখাচ্ছেন—দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্। সূর্য বলতে পারলেন না—আমি তোমার বাবা। তিনি তাঁর দেবলোকের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখে, যেন ভক্তের কাছে ভগবান এসেছেন, এমনি এক অবগুণ্ঠনে কর্ণকে জানালেন—আমি সহস্রাংশু সূর্য। তোমার ওপর করুণাবশত এতক্ষণ যা বলেছি তুমি তাই কোরো।

প্রতিদিন সহস্র মানুষের বৈদিক স্তুতিবাদে যিনি দেবতার পদবী লাভ করেছেন, সেই সূর্যের পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয় তাঁর আপন সন্তানের যাতনা কতখানি। যিনি শৈশব থেকেই পিতৃমাতৃপরিচয়হীন, সূতপুত্র বলে সর্বত্র লাঞ্ছিত তাঁর কাছে মরণের থেকে যশই বেশি প্রার্থনীয়। এতদিন কুরুকুলের রাজবাড়িতে আপন শক্তি এবং প্রতিভায় তিনি যা পেয়েছেন, তা তাঁর প্রাপ্য, কিন্তু প্রার্থনীয় নয়।

বরঞ্চ রাজবাড়ির রাজনীতির কলুষতায় যশের বদলে তাঁর কলঙ্ক জুটেছে। আজ তিনি যশ চান, কারণ যশই হল সেই দুগ্ধশুভ্র বস্তু, যা তাঁর জন্মের গ্লানি, জীবনের সব লাঞ্ছনা সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে দিতে পারে। কর্ণ মরণের ভয় তুচ্ছ করে সূর্যকে বললেন—আপনি আমার ভালর জন্য যা বলেছেন, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমি যদি সত্যি আপনার প্রীতিভাজন হই, তা হলে আমার দাননিষ্ঠায় আপনি আমায় বাধা দেবেন না—ন নিবার্যো ব্রতাদ্ অস্মাদ্ অহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ। আজকে যদি পাণ্ডবদের কারণে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রদেব ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ব্রাহ্মণের বেশ ধরে স্বয়ং আসেন আমার দুয়োরে—হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ভিক্ষিতুম্—তা হলে আমি কবচ এবং কুণ্ডল দুটিই দেব, অবশ্য দেব। আমাকে যে দিতেই হবে।

মহাভারতের এই অংশে, কর্ণের মনের ভাবটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন কালিদাসের পূর্বজন্মা এক মহাকবি—ভাস। তিনি লিখেছেন—কর্ণ একটুও বঞ্চিত বোধ করছেন না। কেননা, সহস্র বৈদিক যজ্ঞে মুনি-ঋষিদের আহুতি আর স্তুতিবাদে যে দেবতাকে মাথায় তুলে রাখা হয়েছে, যিনি স্বয়ং হাজারো দৈত্য-দানবের নিহন্তা বলে চিহ্নিত, ঐরাবতের মতো দেবহস্তী চালনা করতে করতে যাঁর হাতে কড়া পড়ে গেছে, সেই দেবরাজ যদি অর্জুনের মতো ত্রিভুবনজয়ী পুত্রের প্রাণ বাঁচাতে কর্ণের কাছে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে আসতে পারেন, তা হলে তিনি বুঝবেন তিনিই তাঁকে কৃতার্থ করেছেন, কর্ণ একটুও বঞ্চিত নন—ময়া কৃতার্থঃ খলু পাকশাসনঃ। আসল কথা, স্বর্গের দেবতার হুকুম তামিল করে করে যেখানে মর্ত্যের মানুষ কৃতার্থ বোধ করে সেই দেবতা যদি মন্দারগন্ধী স্বর্গপথ ছেড়ে মর্ত্যের ধূলিতে নেমে এসে ভিক্ষা চান মানুষের কাছে, তাঁকে কর্ণ ফেরাবেন কী করে ? তাও কী, অর্জুনের প্রাণের জন্য তাঁর কাছে ভিক্ষা ! এক্ষেত্রে যাচনাবৃত্তি দেবরাজের দেবত্ব হানি করে আর কর্ণের দানবৃত্তি কর্ণের চরিত্র উজ্জ্বল করে—তস্মৈ কীর্ত্তিকরং লোকে তস্যাকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি। এত বড় সুযোগ ছাড়বার বিলাসিতা কর্ণ দেখাতে পারেন না, কেননা কর্ণই অর্জুনকে করুণা করতে চান চিরকাল। অতএব প্রগাঢ় আত্মতৃপ্তিতে, নিরুচ্চার আনন্দে কর্ণ স্বপ্নের অতিথিকে বললেন—আমাকে বারণ কোরো না প্রভু ! আমি ইন্দ্রকে কবচ-কুণ্ডল দুইই দেব। কেননা আমার মতো মানুষ, যে মানুষ প্রাণের গ্লানিতেই ভুগেছে চিরকাল, সেই আমার মতো মানুষের কাছে প্রাণরক্ষার তাগিদ নেই কোনও—মদ্‌বিধস্য যশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্। তা ছাড়া মরণ যখন হবেই, সে মরণ যশের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভিক্ষার জন্য এলে আমি দেবরাজকে ফেরাব না, কারণ এই ভিক্ষাই আমার কীর্ত্তি অক্ষয় করে তুলবে।

কর্ণ তাঁর শিক্ষার শুরু থেকে দিগ্‌বিজয় পর্যন্ত যা করে এসেছেন, তা কীর্তির জন্যই করে এসেছেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর : যে পথে তিনি এতকাল চলছিলেন তাতে কীর্তি আসে না, আসেনি, বরং অকীর্তি এসেছে। আজ সব শুধরে নেবার দিন। দ্বিতীয়ত অর্জুন। ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে, সম্মানে সব ব্যাপারে অর্জুন তাঁর চেয়ে খাটো হোক, এই তো চেয়েছিলেন কর্ণ। আজ যখন পুত্রের প্রাণের জন্য অর্জুনের পিতা নিজের স্বরূপ ভাঁড়িয়ে তাঁর কাছ থেকেই তাঁর জীবন ভিক্ষে চাইবেন, তখন কর্ণ ভাববেন—আমি সব ছলনা জেনেও আমার দেহরক্ষার বর্ম আমার নিজের হাতেই ভিক্ষে দিচ্ছি, নইলে দেবাসুর কারও সাধ্য ছিল না, আমার এই কবচ-কুণ্ডল কোনওভাবে ছিন্ন করতে পারে আমার দেহ থেকে। কর্ণ জানেন, তাঁর অস্ত্রশিক্ষার কৌশল একদিন ব্যর্থ হতে পারে, যাঁর আশ্রয়ে আজ তাঁর এত বাড়বাড়ন্ত, সেই দৃঢ়মূল কৌরবকুলও একদিন ঝড়ে-পড়া গাছের মতো উৎপাটিত হতে পারে, এমনকী কৌরবের রাজনীতিতে তাঁর আজকের যে সুস্থিরতা, সে সুস্থিরতাও নষ্ট হতে পারে যে কোনওদিন। কিন্তু শিশুকাল থেকে যে অর্জুনবধের লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে চলেছেন, সেই অর্জুনের প্রাণের জন্য যদি দেবতাদের রাজা কর্ণের প্রাণ ভিক্ষা চান ভিক্ষুকের মতো, তা হলে কর্ণ তা দেবেন। কারণ, কর্ণ জানেন, এই দানের সুযোগে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়, যা তাঁর জন্ম-কুৎসার ধূলিধূসর অক্ষয় জীবনের চেয়ে অনেক বেশি অক্ষয়। কর্ণ তাই সোজাসুজি সূর্যকে জানালেন—যুদ্ধে আমি জীবন আহুতি দেব, যতটা সম্ভব ঝুঁকি নেব—হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্—কিন্তু এই উত্তমর্ণের ভূমিকায় যশ আমার চাই—যশঃ প্রাপ্‌স্যামি কেবলম্।

হায় ! একমাত্র পিতামাতা ছাড়া আর কে বোঝে যে, ধন-জন-যশ-মাহাত্ম্য—এই সমস্ত কিছুর চেয়েও পিতামাতার কাছে পুত্রের প্রাণই বড়। তার ওপরে ভগবান সূর্যের ওপরে এই ক্ষেত্রে বাড়তি চাপ আছে। জৈবিক চরিতার্থতার মুহূর্তেও তিনি এক শঙ্কিতা কুমারী জননীকে কথা দিয়েছিলেন যে, পুত্রের জীবনের জন্য তার জননীর কোনও চিন্তার কারণ নেই, কেননা সে জীবনরক্ষার উপায় নিয়েই জন্মাবে। সূর্য জানেন—তবু জননী-হৃদয়ে শঙ্কার অন্ত থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই পুত্রের মাতা সূর্যের বাহুবন্ধনে ধরা দেবার আগে এবং পরে সূর্যের ওপর এতটাই বিশ্বাস করেছিলেন যে, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে গিয়েও আজ তিনি পুত্রের কাছেই পরাভূত। এই পুত্রের জননী পেটিকাবদ্ধ পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—তুমি যেখানেই থাক তোমার পিতা যেন তোমাকে রক্ষা করেন, কেননা আমি না চাইলেও তিনিই তোমাকে দিয়েছেন—পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ। যেন দত্তো'সি মে পুত্র—কাজেই পিতার দায়িত্বই এখানে বেশি। মিলনের মুহূর্তে সূর্যদেবের আশ্বাস আর কুন্তীর বিশ্বাসের ওপরেই যাঁর জীবন নির্ভর করছে, সেই পুত্র যদি হঠাৎ এখন বলে—আজ আমি 'সুইসাইড' করব, তা হলে পিতা হিসেবে সূর্যদেবের কেমন লাগে ? বিশেষত যে পিতা আপন প্রাণ বাঁচানোর উপায় বলে দিতে এসেছেন পুত্রকে, সে পুত্র যদি বাঁচার কৌশলকে মরণের কৌশলে রূপান্তরিত করার বায়না করে, তবে পিতার হৃদয় কেঁপে ওঠে। তেমনি কেঁপে উঠেই সূর্য বললেন—না বাছা না, নিজের প্রতি এত অবিচার কোরো না—মাহিতং কর্ণ কার্ষী স্ত্বম্।

সূর্য একবারও বলেননি, তিনি কর্ণের পিতা। তবু তিনি এমন করতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁর গুপ্ত পিতৃসত্তা মাত্রাহীন স্নেহে দ্রবীভূত করল তাঁর ভাষা, যে ভাষা অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করল তাঁর পিতৃত্বের প্রতি। সূর্য বললেন—না বাছা না, শুধু নিজেরই নয়, তোমার বন্ধুজন, তোমার নিজের স্ত্রীপুত্র এবং সবার ওপরে তোমার পিতামাতার এমন সর্বনাশ তুমি কোরো না বাছা—পুত্রাণামথ ভার্যাণামথ মাতুরথো পিতুঃ। তুমি যশ চাইছ, বেশ কথা, কিন্তু সেটা জীবনের বিনিময়ে কেন বাবা। সূর্য বলতে চাইলেন—কর্ণ তুমি এখন সামাজিক সম্পর্কহীন একটি ব্যক্তিমাত্র নও। তুমি কারও পুত্র, কারও পিতা, কারও বা স্বামী। আর এইসব স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি বেঁচে আছ—জীবতাং কুরুতে কার্যং পিতা মাতা সুতাস্তথা। তা ছাড়া যে যশ তুমি এত করে চাইছ, তুমি নিজে মরে গেলে সে যশের স্বাদ তুমি কী পাবে ? ভস্মীভূত মৃত ব্যক্তি যশের কী খবর পায় ? গতপ্রাণ ব্যক্তির গলায় মালা পরালে, সে যেমন তার কিছুই টের পায় না, মৃত ব্যক্তির কাছে যশও সেইরকম—কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে।

সূর্যের ভাবে ভাষায় তাঁর আপন পিতৃত্ব বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেবতা হওয়া সত্ত্বেও এতদিন তিনি পিতৃপরিচয় দেননি, সেই সূর্য যদি এখন বলেন—আমিই তোমার পিতা—তা হলে নতুন কোনও দুর্বাধ আনন্দে কর্ণ যদি মৃত্যুবরণ করে আরও বেশি সুখ পান, সেই ভয়েই তিনি আমতা আমতা করে বললেন—না না আমার আর কী, এতদিন ধরে তুমি সূর্যোপাসনা করছ, তুমি আমায় ভক্তি কর কত। সেইজন্যই ভক্তের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই তোমায় বলতে এলাম যে, দেবলোকে তোমাকে নিয়ে একটা খেলা চলছে, সে খেলায় যেন তুমি বলি হয়ো না। কিন্তু সামান্য এই নির্বিকার, নির্মোহ ভাষ্য দেবার পরমুহূর্তেই সূর্যের মুখ দিয়ে ঝরে পড়ল চিরন্তন পিতার অভ্যাস। সূর্য বললেন—আমি বার বার বলছি কবচ আর কুণ্ডল—এই দুটি জিনিস তুমি যেন দিয়ো না। ওই কবচ আর কুণ্ডল দুটি তোমার শরীরে যেমনটি আছে, তেমনটিই থাকলে কেমন সুন্দরই না দেখতে লাগে তোমায়—শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে। বিশাখা নক্ষত্রের দুই ভাস্বর তারার মাঝখানে চাঁদ যেমনটি, সহজাত ভাস্বর কুণ্ডল দুটির মাঝখানে তোমার মুখখানিও লাগে ঠিক তেমন চাঁদের মতো—বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব।

সব ছেড়ে শেষে ছেলেকে দেখতে কত সুন্দর দেখাবে এই মোহ-ভাবনায় যিনি মগ্ন, তিনি যে যশের চেয়ে পুত্রের জীবন বেশি আকাঙ্ক্ষা করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী ? সূর্য যখন বুঝলেন কর্ণ কিছুতেই শুনবেন না, তখন তিনি কর্ণকে অর্জুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এই সুচিরকাঙ্ক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই যে তাঁর বেঁচে থাকা দরকার, এই কথাটা কর্ণকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন

সূর্যদেব। বললেন—তুমি না অর্জুনের সঙ্গে লড়তে চাও—নিত্যং স্পর্ধসে সব্যসাচিনা, তা তোমার দেহে যদি এই কবচ আর কুণ্ডল থাকে, তা হলে অর্জুন কেন অর্জুনের বাবাও তোমার কিছু করতে পারবে না—ন তু ত্বাম্ অর্জুনঃ শক্তঃ...স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ।

কে শোনে কার কথা ! যার যত অভিমান, সে তত বেপরোয়া। শিশুকাল থেকে ঔরস-পুত্রহীন সূত-পিতা-মাতার অতিরিক্ত আদরে, কুরুবাড়িতে দুর্যোধনের অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে এবং নিজের মধ্যে জমে থাকা হাজারো অভিমানে অভিমানী কর্ণ এমনিই বেপরোয়া এবং গোঁয়ার গোছের লোক। কবচ এবং কুণ্ডলের অলৌকিকতায় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অর্জুনের সমকক্ষ হবেন—এই কথাটাও তাঁর সদা-জাগ্রত পৌরুষে আঘাত করল যেন। সূর্যকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়ে কর্ণ বললেন—অর্জুনের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার ব্যাপারে আমার এই কবচ আর কুণ্ডলের যে কার্যকারিতা, সে-কথা নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি তো জানেন অস্ত্রবল আমার কম নেই। পরশুরাম এবং দ্রোণাচার্যের মতো গুরুর কাছে আমি অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি, কাজেই অর্জুনকে আমি কবজা করবই—বিজেষ্যামি রণেঽর্জুনম্। তবে হ্যাঁ ! আপনি আর বাদ সাধবেন না। ইন্দ্র এসে যদি আমার কাছে ভিক্ষে চান, তা হলে আমি তাঁকে ফেরাব না, জীবন দিতে হলেও, না। আপনি অনুমতি করুন।

সূর্য বুঝলেন, কর্ণ কথা শোনার লোক নন। তিনি বললেন অগত্যা, তুমি কবচ এবং কুণ্ডল হারাবে বুঝতে পারছি। তবু তুমি এক কাজ কোরো। ও দুটি দেওয়ার ব্যাপারে একটা শর্ত আরোপ কোরো। তুমি বলবে—দিয়ে দেব আপনাকে কবচ-কুণ্ডল, কিন্তু তার বদলে আপনি দিন আমায় সেই অমোঘ শক্তি, যা ব্যর্থ হবে না আমার শত্রুর ওপর। এই বিনিময়ের আদেশ দিয়ে স্বপ্ন-সূর্য আর দাঁড়ালেন না। সহসাই স্বপ্ন ভেঙে গেল কর্ণের। সূর্যপূজার কালে কর্ণ যাচাই করে বুঝলেন সূর্যই এসেছিলেন তাঁর কাছে।

তারপর একদিন যখন কর্ণের দানভূমি থেকে একে একে ব্রাহ্মণেরা দান নিয়ে ফিরে গেছেন, সেই সময়ে কর্ণের দুয়ারে গুরু গম্ভীর এক শব্দ শোনা গেল—ভিক্ষাং দেহি। এই গলার স্বর কোনও রুক্ষ-জীর্ণ, উপবাস-ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের হতে পারে না। কর্ণ ঠিক চিনেছেন, ইনি ইন্দ্র—ব্রাহ্মণবেশী। প্রখর সূর্যের সহস্র কিরণ এতক্ষণ যেন আশীর্বাদের মতো বর্ষিত হচ্ছিল কর্ণের মাথার ওপর, হঠাৎই সে সূর্যের গতি অবরুদ্ধ হল, দলে দলে মেঘ এসে সূর্যের সদা জাগ্রত সহস্র চক্ষু ঢেকে দিল যেন। দেবকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সূর্যের চোখের সামনে তাঁরই পুত্রের সর্বনাশ করতে স্বয়ং দেবরাজেরও বাধোবাধো ঠেকে। তাই বুঝি তাঁরই আদেশে অনন্ত মেঘের সারি সূর্যকে ঠিক আড়াল করে রাখল কর্ণের চোখ থেকে। দেবরাজ হাঁকলেন—ভিক্ষাং দেহি। কর্ণ ব্রাহ্মণবেশীকে বললেন—স্বাগত দ্বিজরাজ, আপনাকে প্রণাম।

মহাকবি ভাস মহাভারতের এই অংশ অবলম্বনে নাটক লিখতে গিয়ে ইন্দ্রের মনে বড় দ্বিধা লক্ষ করেছেন। সেকালে কেউ নত হয়ে প্রণাম জানালে সম্মানিত ব্যক্তি তাঁকে আয়ুষ্মত্তার আশীর্বাদ দিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী দেবরাজ যেখানে কর্ণের আয়ু হরণ করতে চান, সেখানে তিনি যদি বলেন 'দীর্ঘায়ু হও', তা হলে তো আর ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আবার আশীর্বচনের মুখে যদি তাঁর শব্দভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, তা হলে প্রণামান্তে নিবেদনকারী কর্ণ ভাববেন—কী মূর্খ এই ব্রাহ্মণ ! কাজেই উভয় পন্থা ত্যাগ করে দেবরাজ বললেন—সূর্যের মতো, সাগরের মতো, হিমালয়ের মতো তোমার যশ অক্ষয় হোক।

আমরা জানি কর্ণও তাই চান। কিন্তু তবু তিনি দেবরাজকে একটু খেলাবার জন্য তাঁর দানের বস্তুগুলির গুণাগুণ শোনাতে লাগলেন। মহাভারতে দেখেছি সূর্যের কথা কর্ণের স্মরণ আছে। তিনি বললেন—বলুন ব্রাহ্মণ কী চাই আপনার, কীই বা আমি দিতে পারি, সোনায় মুড়ে দেওয়া যুবতী মেয়েছেলে নেবেন—হিরণ্যকণ্ঠীঃ প্রমদাঃ—অথবা গ্রাম দিতে পারি, জনপদ দিতে পারি। ইন্দ্র বললেন—ওসব মেয়েছেলে, গ্রাম, জনপদ, আরও যেসব ভাল ভাল জিনিসের নাম তুমি করছ, ওসব অন্যদের দিয়ো, আমি ওসব চাই না বাপু। কর্ণ তবু তাঁর ঋদ্ধির সূচী মাথায় রেখে একবার গজ-বাজি, একবার গোধন, একবার স্ত্রীলোক, একবার গোটা রাজ্য দিতে চাইলেন। কিন্তু দেবরাজ তাতে

ভুললেন না, তিনি চান কর্ণের গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা কবচ এবং কুণ্ডল, যা তাঁকে নিজেরই নিজের দেহ থেকে কেটে দিতে হবে—এতদ্ উৎকৃত্য মে দেহি।

ভাসের নাটিকায় ঘটনাগুলি এমনভাবে সাজানো আছে, যাতে করে দেবরাজকে আস্তে আস্তে সুনিপুণ ভিখারি করে তোলা হয়েছে। কর্ণ একবার সহস্র সোনার শিংওয়ালা গোধন দিতে চান, আর ইন্দ্র বলেন—ও তো দুধ খেলেই শেষ, ও চাই না বাপু চাই না—নেচ্ছামি কর্ণ নেচ্ছামি। এমনিভাবে ঘোড়ার কথা আসে, হাতির কথা আসে, আর দেবরাজ বলেন—ও তো চড়লেই সুখ শেষ—নেচ্ছামি কর্ণ নেচ্ছামি। এইভাবে রাজ্যপাট, যজ্ঞের ফল সব দিতে চেয়েও কর্ণ খালি শোনেন—ও চাই না বাপু চাই না—নেচ্ছামি কর্ণ নেচ্ছামি। শেষে বিরক্ত কর্ণ একবার ক্ষোভে বলে ওঠেন—তা হলে আমার মাথাটা কেটে দিই, নিয়ে যান—তেন হি মচ্ছিরো দদামি। ইন্দ্র বাধা দেন। কিন্তু হতাশ হয়ে আসল কথাটা বলতেও পারেন না, অথচ লোভও ছাড়তে পারেন না। শেষে কর্ণ নিজেই বুঝে আপন কবচ-কুণ্ডলের কথা তোলেন, আর ওমনি মহাকবির আঁকা লুব্ধমুখ ভিখারির মুখে জেগে ওঠে বিকৃত হাসি ; লজ্জা-ঘেন্না ত্যাগ করে সে হাত বাড়ায়—দাও দাও—দদাতু দদাতু।

মহাভারতের ভিখারি আরও লজ্জাহীন। তিনি সবকিছু প্রথমেই নস্যাৎ করে কবচ-কুণ্ডল চান এবং বলেন এই মুহূর্তেই চাই সেটা। খোঁটা দিয়ে বলেন—তুমি না দানের ব্রত নিয়েছ—যদি সত্যব্রতো ভবান্। কর্ণ আরও একবার চেষ্টা করেন কিন্তু ওসব মনভুলানি কথায় দেবরাজ ভুললেন না, কবচ-কুণ্ডল তাঁর চাইই চাই। কর্ণ এবার হেসেই ফেললেন। বললেন—আমি সবই জানি দেবরাজ, কেনই বা এই ব্রাহ্মণবেশ আর কেনই বা এই প্রার্থনা। আপনি দেবরাজ, আপনাকে বর দেওয়া কি আমার সাজে। কোথায় আপনিই আমাকে বর দেবেন, তা না আপনিই বসেছেন প্রার্থীর আসনে। তা ছাড়া আপনি তো জানেন, এই কবল-কুণ্ডল দিলে আমি মৃত্যুর মুখে পড়ব এবং তাতে আপনাকে নিয়ে লোকে হাসবে। তার চেয়ে বিনিময়ের পথে আসুন, আপনি কিছু দিন, আমিও ব্রাহ্মণবেশীকে কবচ-কুণ্ডল দিচ্ছি, নইলে কিছুতেই দেব না—ন দদ্যামহমন্যথা। ইন্দ্র বললেন—আমি এখানে আসবার পথেই বুঝেছি, সূর্যদেব সব বলে দিয়েছেন তোমাকে। তা বেশ, তুমি বাপু আমার নিজের হাতিয়ার বজ্রটা ছেড়ে দিয়ে আর যা চাও তাই দেব।

কর্ণ সূর্যের কথামতো এবার সেই অমোঘ শক্তি চাইলেন। ইন্দ্র বললেন—শক্তি নিচ্ছ নাও, কিন্তু এ শক্তি তোমার ঈপ্সিত একজন প্রধান শত্রুকে বধ করা মাত্রই আমার হাতে ফিরে যাবে, তুমি কিন্তু দ্বিতীয়বার এটি ব্যবহার করতে পারবে না। কর্ণ বললেন—আমি একজনকেই মারতে চাই, একমেবাহম্ ইচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে—দ্বিতীয়বার ব্যবহারের আমার প্রয়োজনই নেই। ইন্দ্র বললেন—একজনকে তো মারতে চাচ্ছ, কিন্তু যে একজনের কথা তুমি ভাবছ, তাকে রক্ষা করছেন স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ। কাজেই কী যে হবে, তা কে জানে! কর্ণ ইন্দ্রের কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন—সে যা ইচ্ছে হোক ভাবনা নেই, আমাকে একবীরঘাতিনী সেই শক্তি দিন, আমি আমার কবচ-কুণ্ডল কেটে দিচ্ছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যের কথা বুঝি কর্ণের মনে পড়ল। দুই সহজাত কুণ্ডলের মাঝে তাঁর মুখটি নাকি চাঁদের মতো দেখায়। দুল-কাটা, রক্ত-ঝরা কানে কর্ণের বিকৃত মুখ যদি সূর্যের মনে ব্যথা দেয়। কর্ণ বললেন—ও ভাল কথা! আমি কবচ-কুণ্ডল গা থেকে কেটে দেব আপনাকে, কিন্তু তাতে যেন কোনও বীভৎসতা না আসে আমার শরীরে, কাটা-ঘা দগদগে হয়ে না থাকে। ইন্দ্র বললেন—না বাপু কিচ্ছু হবে না। তুমি যেমনটি সুন্দর আছ তেমনি সুন্দর থাকবে। ঠিক তোমার বাবা সূয্যিঠাকুরের গায়ের যেমন রং, যেমন তাঁর তেজ—যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর—ঠিক তেমনিই হবে তোমার শরীর।

কর্ণ আপন হাতের তরবারিতে নির্বিকারে নিজের দেহ থেকে তাঁর শরীররক্ষার দৈববর্ম কেটে রক্তমাখা অবস্থাতেই দিলেন দেবরাজের হাতে। কান থেকে কুণ্ডল দুটি ছিন্ন করে দিয়ে নাম নিলেন কর্ণ, প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণাৎ তস্মাৎ কর্মণা তেন কর্ণঃ। এমন দানের মহিমায় স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঝরল, শঙ্খ-দুন্দুভি বাজল আর মহাভারতের কবি সিদ্ধান্ত দিলেন—স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র ভুঁয়ে পা রেখে

কর্ণের সঙ্গে বঞ্চনা করা সত্ত্বেও, কর্ণ যেহেতু তাঁকেই কৃতার্থ করেছেন তাই কর্ণের যশের পথ প্রশস্ত করে দিলেন স্বয়ং ইন্দ্র—ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা, কর্ণং লোকো যশসা যোজয়িত্বা। আসলে কর্ণের প্রতি শিশুকাল থেকে যে বঞ্চনা চলছিল, কর্ণের সত্যব্রত এবং তাঁর আত্মদানের মাধ্যমে সে বঞ্চনার চূড়ান্ত সাধন করে তাঁকে যশ উপহার দিলেন মহাভারতের কবি। এক চূড়ান্ত বঞ্চনার জীবনে কবির হৃদয় যশ ছাড়া আর কীই বা উপহার দিতে পারে! অবশ্য কর্ণের যশোবিস্তারে আমরা পুলকিত হচ্ছি বটে, কিন্তু এই যশের কিছু বাস্তব প্রতিক্রিয়া ঘটল। সমকালে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম—কবচকুণ্ডল আছে, না খোয়া গেছে? খোয়া গেলে যাঁদের খুশি হওয়ার কথা, যেমন পাণ্ডবেরা, তাঁরা বনে বসে এই খবর পেলেন যে, কর্ণের জীবনরক্ষার কবচ-কুণ্ডল হরণ করেছেন দেবরাজ; তাঁরা দারুণ খুশি হলেন। আর যাদের মুষড়ে পড়ার কথা, যেমন কৌরবেরা, তাঁরা একেবারেই ভেঙে পড়লেন, কেউ কেউ এমনও ভাবলেন যে, হয়ে গেল, আর সম্ভব নয়—দীনাঃ সর্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্।

৮

কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দানের মাহাত্ম্যে আমরা আপাতত কিঞ্চিত আপ্লুত বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, যিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ বীর তিনি সাময়িকভাবে ধর্মে-কর্মে মন দিলেও তাঁর মৌলিক চরিত্র একেবারে পালটে যায় না। দেবালয়ে দেবমূর্তির সামনে দাঁড়ালে অতি ক্রূর মানুষেরও যেমন চক্ষুদুটি শিবায়িত হয়, তেমনি এই দানব্রতের সত্যরক্ষার তাগিদে কর্ণের চূড়ান্ত দানও কর্ণকে খানিকটা গম্ভীরতা দিল বটে, কিন্তু এতে তাঁর মূল স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল না। হবেই বা কেন? রাজসভার রাজনীতিও রয়েছে, দুর্যোধনও রয়েছেন, পরম শত্রু অর্জুনেরাও বেঁচে আছেন। বরঞ্চ রাজসভায় 'টেনশন' এখন অনেক বেশি। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে আসছে, অথচ গুপ্তচরেরা এ বন, সে বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে খবর দিল যে পাণ্ডবদের কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্যোধন যদি বা চরদের কথা শুনে, তাদের নিষ্ঠা সত্ত্বেও অসহায়তার কথা বুঝে বিমনা হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থাতেও কর্ণ দমে যাবার পাত্র নন। তেরো বছর পরে পাণ্ডবেরা ফিরে এসে আবার রাজ্য চাইবে এবং তা পেয়েও যেতে পারে—এ যেন কর্ণেরই দুশ্চিন্তা। তাঁর ধারণা, আরও ভাল করে খোঁজা দরকার পাণ্ডবদের। পাঠানো দরকার আরও ধূর্ত গুপ্তচর, যারা নদীর তীর থেকে আরম্ভ করে পর্বতের গুহা, সব একেবারে চষে ফেলবে। কর্ণের মতো যে দুর্যোধনের যুবগোষ্ঠী সম্পূর্ণ মেনে নেবে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণেরা পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনার পক্ষেই রায় দিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে নতুন একটা ঘটনা ঘটল।

দুর্যোধনের চরেরা পাণ্ডবদের খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে 'সুখবর' মনে করে আরও একটা খবর দিয়েছিল। তারা বলেছিল বিরাটরাজার প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি কীচক কোন এক গন্ধর্বদের হাতে মারা গেছে। এই কীচক যেহেতু দুর্যোধনের বন্ধুরাজ্য ত্রিগর্তদেশের রাজাকে বারবার যুদ্ধে নাকাল করেছে, তাই কীচক মারা যেতে বিরাটরাজার ওপর প্রতিশোধ নেওয়াটা এখন সুবিধেজনক। কাজেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যখন পাণ্ডবদের প্রত্যাবর্তনের তর্কে নানা মতামত ব্যক্ত করছেন, তখন ত্রিগর্তের রাজা স্বয়ং সে-কথাগুলি চাপা দিয়ে বিরাটরাজ্য আক্রমণের প্রস্তাব দিলেন। কীচকহীন অসহায় বিরাটরাজাকে আক্রমণ করে কী পরিমাণ ধন-রত্ন, অশ্ব-গজ, গোধন পাওয়া যেতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাই ত্রিগর্তরাজ তুলে ধরলেন। মতামত চাইলেন দুর্যোধন প্রভৃতি ভাইদের এবং কর্ণের—কৌরবানাঞ্চ সর্বেষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ। প্রস্তাবের অনুকূলেও যিনি প্রথম কথা বললেন, তিনি কর্ণ। নতুন এক যুদ্ধোদ্যোগের হঠাৎ সুযোগ আসায় কর্ণ পাণ্ডবদের বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত পালটালেন। বললেন—সেই ভাল, বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে ভালমন্দ ধনরত্ন আহরণ করাই ভাল। পাণ্ডবদের কথা পরে ভাবা যাবে, অথবা এখন অর্থহীন, বলহীন, সহায়হীন পাণ্ডবদের কথা ভেবেই বা আমাদের কী হবে—কিঞ্চ নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ।

কর্ণের কথা শোনা মাত্রই দুর্যোধন বিরাটরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন—বৈকর্ত্তনস্য কর্ণস্য... বাক্যম্ আদায় তস্য তৎ। কর্ণ জানতেন, এটা পাণ্ডবদের ব্যাপার নয় বলেই অন্তত বিরাটরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি বৃদ্ধদের অমত হবে না এবং সেইজন্যই এই বিষয়ে তিনি তাঁদের মতো চেয়েওছেন। একটা গোটা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে—সেই সিদ্ধান্তটা কিন্তু শুধুমাত্র কর্ণের সমর্থনবাক্যেই 'পাস' হয়ে গেল। ত্রিগর্তরাজ প্রথমে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করলেন কিন্তু সে যুদ্ধে ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডব এমন যুদ্ধ করলেন যে তাঁর যুদ্ধবাসনা ঘুচে গেল। কিন্তু তিনি যেতে না যেতেই কৌরবেরা সবাই মিলে আক্রমণ করলেন বিরাটরাজ্য। বিরাটের প্রায় অজ্ঞাতেই কুমার উত্তরের সঙ্গে রণক্ষেত্রে চলে গেলেন বৃহন্নলাবেশী অর্জুন। অর্জুনকে স্পষ্ট চিনে স্বয়ং দ্রোণাচার্য কৌরবদের উন্মাদনায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নানা দুর্লক্ষণ দেখে আজ তিনি অর্জুনের হাতে হার একেবারে অবধারিত মনে করলেন।

কিন্তু এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ—এইসব বৃদ্ধদের সম্বন্ধে সকলের সামনেই অনেক অপমানজনক কটূক্তি করেছেন কর্ণ। বারংবার অপমানে এই বৃদ্ধেরা যেমন একদিকে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে কর্ণের সম্বন্ধে তাঁদের অসন্তোষও বাড়ছিল। কর্ণ মনে করেন, এই বৃদ্ধেরা আসলে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ন খাওয়া সত্ত্বেও এঁরা যে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে দুর্যোধনের সকল ক্রিয়াকলাপ নির্বিচারে প্রশংসা করেন না—এটা তাঁর মনে লাগে। নিরপেক্ষ বিচার, নীতি, যুক্তি—এগুলিও যে কখনও কাউকে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী করে তুলতে পারে—এটা কর্ণের মাথায় আসে না। ফলে কর্ণ বারংবার বৃদ্ধদের অপমান করেছেন এবং খোদ কুরুসভাতেই এই ঘটনা বার বার হওয়ায় কুরুবৃদ্ধদের অসন্তোষ এখন প্রগাঢ় হয়েছে। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল খোয়া যাবার পর থেকে এখন আর সে অসন্তোষ তাঁরা চেপেও রাখেন না। তাঁরা ভাবেন—কর্ণের প্রতিপত্তি দিন দিনই বেড়ে চলেছে স্বয়ং দুর্যোধনের আস্কারায়। তাঁদের যখন এমনিও সম্মান নেই, অমনিও নয়, তখন তাঁরাই বা সুযোগ পেলে এই পুরুষটিকে ছেড়ে দেবেন কেন? বিরাটরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে উন্মুক্ত মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে গুরু দ্রোণ যখন মহাদেবের বর-পাওয়া, স্বর্গ-ফেরত অর্জুন সম্বন্ধে তাঁর আপন শঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন, তখন আবারও একবার অপমানের ভাষা বেরিয়ে এল কর্ণের মুখ থেকে। কর্ণ বললেন—অর্জুনের ওপর আপনার এত সোহাগ যে, সব সময় আমাদের খাটো করে দেখেন—সদা ভবান্ ফাল্গুনস্য গুণৈরস্মান্ বিকত্থসে। আরে! আমার সামনে কিংবা দুর্যোধনের সামনে অর্জুন পুরোপুরি দাঁড়াতেই পারবে না।

দুর্যোধন কিন্তু এইসব শৌর্যবীর্যের তুলনায় না গিয়ে কর্ণের কথার ধুয়া ধরে বললেন—দেখ বাপু! এ যদি অর্জুন হয়, তা হলে আমার পোয়া বারো। অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়নি। আবার বনে পাঠাব পাণ্ডবদের। আচার্য দ্রোণকে উদ্দেশ করে ভীষ্ম, কৃপ সবাইকে শুনিয়ে দুর্যোধন বললেন—আচার্য! আমি আর কর্ণ আগে বার বার বলেছি—ময়া কর্ণেন চাসকৃৎ—যে, অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের খোঁজ পেলে তাদের আবার বনে যেতে হবে। তা ছাড়া এই সময়ে যুদ্ধ করতে যেই আসুন, বিরাটরাজা, কি অর্জুন, যুদ্ধ তো আমাদের করতেই হবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, এঁদের এত ত্রস্ত দেখাচ্ছে কেন? আপনারা খেয়াল রাখবেন যুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই আমাদের। দুর্যোধনের এইটুকু আস্কারাতেই কর্ণ সরাসরি দ্রোণকে উপহাস করতে আরম্ভ করলেন। বললেন—বন্ধু ওই আচার্য দ্রোণকে বাদ দিয়ে যুদ্ধের নীতি-নিয়ম ঠিক কর। তুমি এঁদের মতো জান। এঁদের সবারই অর্জুনের ওপর বড় বেশি সোহাগ, আর সেইজন্যেই আমাদের তখন থেকে ভয় দেখাচ্ছেন—জানাতি হি মতং তেষামতস্ত্রাসয়তীহ নঃ। কীরকম সোহাগ বোঝ যে, অর্জুন সামনে আসতে না আসতেই তার প্রশংসা আরম্ভ হয়ে গেল। যেখানে শত্রুপক্ষের ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক শুনেই—হ্রেষিতং হ্যুপশৃণ্বানে—আচার্যগুরুর সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের সৈন্যদের মনোবল না ভেঙে যায়, সেই ব্যবস্থাটা আগে কর, দুর্যোধন।

কর্ণের বক্রোক্তিতে মনে হল—দ্রোণাচার্য যেন সাধারণ সৈনিকের চেয়েও খারাপ। তাঁর যে

ব্যক্তিগতভাবে উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে, এটা তিনি বোঝেন না। কর্ণ সোজাসুজি দ্রোণকে অভিযুক্ত করে বললেন—এঁরা সবাই, বিশেষত এই আচার্য দ্রোণ, চিরটাকাল পাণ্ডবদের হয়ে গান গেয়ে গেলেন। এঁদের আপন পর বুঝ বলতে কিচ্ছুটি নেই, নইলে, ঘোড়ার ডাক শুনে কেউ শত্রুর প্রশংসায় মেতে ওঠে! আরে, এই যে সব দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে দ্রোণ মন্তব্য করছেন, এর সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক কী, তাকে প্রশংসা করারই বা কী আছে? আসল কথা এই—যে সব দুর্লক্ষণ-ফুর্লক্ষণের কথা তখন থেকে বলে যাচ্ছেন দ্রোণ, এর মূলে আছে ওদের ওপর সোহাগ আর আমাদের ওপর জন্মের রাগ—অন্যত্র কামাদ্ দ্বেষাদ্ বা রোষাদ্ বাস্মাসু কেবলম্। এই মুহূর্তে দ্রোণের ওপর কর্ণের এত রাগ হয়েছে যে, তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে দ্রোণকে কথা শোনালেন, যদিও তাঁর সামনে আছেন দুর্যোধন। কর্ণ বললেন—দুর্যোধন! এই আচার্যদের বড় মায়ার শরীর (ভাবটা এই—ব্যাটা যুদ্ধ-ফুদ্ধ কিস্সু বোঝে না—যুদ্ধধর্মানভিজ্ঞত্বমুক্তম্), এঁদের হিংসাবৃত্তি বলতে কিচ্ছুটি নেই। কাজেই তোমার সামনে যখন ভয় এসে উপস্থিত হবে, তখন অন্তত এই সমস্ত প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যুদ্ধনীতি ঠিক কোরো না—নৈতে মহাভয়ে প্রাপ্তে সংপ্রষ্টব্যাঃ কদাচন।

কর্ণ এবার ঘুরিয়ে দ্রোণাচার্যকে গালাগালিই দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মতে দ্রোণের মতো লোকের যুদ্ধক্ষেত্রে কথা বলাই শোভা পায় না। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুন দ্রোণাচার্যকে এবার সেইসব কথা শুনতে হল, যা তাঁকে এ পর্যন্ত কেউ বলেনি। কর্ণ বললেন—দুর্যোধন! এসব লোকের পণ্ডিতি কথা কোথায় মানায় জান? বড় বড় লোকের বড় বড় বাড়িতে, যেখানে অলসে আড্ডা চলে। সভাস্থলে, যেখানে বড় বড় কূট তর্ক হচ্ছে, নিদেনপক্ষে ধনীদের বাগানবাড়িতে, যেখানে রসের আলোচনা চলছে, সেখানে এই দ্রোণের মতো পণ্ডিত লোকের কথা বললে মানায়—কথা বিচিত্রাঃ কুর্বানাঃ পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ। অথবা জনসমাজে যদি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাতে হয়, এই বামুনগুলোকে মানায় সেখানে। যজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষা, সন্ধি করার নিপুণতা—এসব ব্যাপারে এই বামুন-পণ্ডিতেরা খুব উপযুক্ত। তা ছাড়া পরের দোষ বার করতে দাও, মনুষ্য চরিত্রে কোথায় স্খলন ঘটল, সেটা বার করতে দাও, কোন বামুন কার বাড়িতে ভাত খেয়ে নিজের অন্নদোষ ঘটাল, সেটা বার করতে দাও—এই সব পণ্ডিত খুব পারবে—পরেষাং বিবরজ্ঞানে মনুষ্যচরিতেষু চ। অন্নসংস্কারদোষেষু পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ।

কর্ণের শেষ প্রস্তাব ছিল দ্রোণের মতো লোককে সোজা উপেক্ষা করে—পণ্ডিতান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা—নিজের মতো চাপানো। ব্যাপারটা পুরানো। কর্ণ দুর্যোধনের মনস্তত্ত্ব বোঝেন। যে দ্রোণাচার্য আপন সরসতায় অর্জুনের প্রশংসা করে ফেলেছেন, তাঁকে এই মুহূর্তে গালাগালি দিয়ে নিজের মত, সে মতো যত উদ্ধতই হোক, চাপিয়ে দিতে যে কর্ণের অসুবিধে হবে না, সে তিনি ভালই জানেন এবং জানেন বলেই কর্ণ নিজের মতটা কী সুকৌশলে উপস্থাপন করলেন দেখুন। কর্ণ বললেন—আরে! আমাদের সেনারা সব ভিতুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন—ভীতান্ সন্ত্রস্তান্ ইব লক্ষয়ে। আরে অর্জুনই আসুক আর বিরাটই আসুক—সমুদ্রের ঢেউ এসে যেমন তীরভূমিতে আটকে যায়—তারাও তেমনি আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াবে; আমি একা তাদের সামাল দেব—অহম্ আবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্। সাপের বিষ যেমন ব্যর্থ হয় না, আমার বাণও তেমনি ব্যর্থ হবার নয়, সব সুতীক্ষ্ণ শরগুলি একেবারে ঘিরে ধরবে অর্জুনকে। এই তেরো বচ্ছর ধরে অর্জুন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছে। আমাকে সে মারবারও চেষ্টা করবে প্রচুর। শুনেছি বটে যে তিনি ভুবনের সেরা বীর, কিন্তু আমিও তো কিছু কম যাই না—অহঞ্চাপি নরশ্রেষ্ঠাদ্ অর্জুনান্নাবরঃ ক্বচিৎ। এদিক ওদিক থেকে আমার বাণ যখন অজস্রধারায় চলবে, আর শকুনের পাখার মতো শন শন শব্দ হবে, তখন অর্জুনের বোধ হবে যেন আকাশ ভরে গেছে জোনাকের আলোতে। আরে যুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়াবে এমন পুরুষ এখনও স্বর্গে-মর্ত্যে পয়দা হয়নি। আজকে আমি অর্জুনকে মেরে দুর্যোধনকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেই কথা রাখব এবং ঋণমুক্ত হব।

দুর্যোধনের প্রতি বশ্যতায় কর্ণ এখন নিজেকে এত বড় ভাবছেন যে, অর্জুনের মতো মহাবীরকে তিনি ভাবছেন গরুড়ের কাছে সাপের মতো, প্রবল বারিবর্ষণের মুখে জ্বলন্ত অগ্নির মতো। নিজের

বুক বাজিয়ে কর্ণ বলছেন—আমি সেই পরশুরামের শিষ্য। তাঁর শিক্ষা, আর আমার ক্ষমতা—এই দুটোর জোরে আমি অর্জুন কেন, অর্জুনের বাবাকেও ঠাণ্ডা করে দিতে পারি—যুধ্যেয়মপি বাসবম্। অর্জুনের কপিধ্বজ রথের মাথায়-বসা কপিটি আজকে কাঁদতে কাঁদতে কাটা পড়বে, অর্জুনকে আজ আমি রথ থেকে মাটিতে ফেলে ছাড়ব—বীভৎসুং পাতয়ন্ রথাৎ। কৌরবেরা দেখুক আজকে, কেমন করে সেই অর্জুন তার ভাঙা রথ থেকে নেমে অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম চেষ্টায় শুধু আহত সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে—নিঃশ্বসন্তং যথা নাগমদ্য পশ্যন্তু কৌরবাঃ।

কর্ণ যা বললেন এতক্ষণ, তা নিজেদের সৈন্যদলের মনোবল উত্তেজিত করতে যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি আপন অহমিকা প্রকাশ করতে ; বিশেষত অর্জুন যেখানে প্রতিপক্ষ, সেখানে এইরকম একটা কাল্পনিক মাহাত্ম্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কর্ণের ভাল লাগে। কিন্তু তাঁর এই উত্তেজনা বা অহমিকা অন্যেরা কতদিন সহ্য করবেন ? আগেই বলেছি, সেই পাশাখেলার আসর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ক্রমাগত অপমানিত হতে হতে এখন আর বৃদ্ধেরা কর্ণের সব কথাবার্তা চুপ করে মেনে নিতে পারছেন না। অতএব কর্ণের এই মৌখিক আড়ম্বরের উত্তরে কৃপাচার্য আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বস্তুত কৃপাচার্যের কথাই ছিল কর্ণের বিরুদ্ধে বৃদ্ধদের প্রথম সংহত প্রতিবাদ। কৃপ বললেন—এই যে রাধামায়ের ছেলে কর্ণ! কূটযুদ্ধে তোমার যে খুব বুদ্ধি খেলে সে আমরা বেশ বুঝি। (কৃপ কপট পাশা খেলার দিকে ইঙ্গিত করলেন)। তবে এই ক্রূর যুদ্ধের মূলও তুমি বোঝ না, পরিণামও বোঝ না। তোমার শকুনি মামারা শাস্ত্রমতে যেসব কপট যুদ্ধ করেন, সে কপটতা আরও অনেক কিসিমে করা যায় ; তবে কী জান, ভদ্রলোকেরা ওই ধরনের যুদ্ধকে বড়ই জঘন্য মনে করেন। কোথায় যুদ্ধ করছি, তা বুঝলাম না, কোন সময়ে যুদ্ধ করছি, তা বুঝলাম না, যুদ্ধ করলেই হল ? দেশ-কাল বুঝে যুদ্ধ করলেই তবে না জয় আসে, নইলে উলটো ফল হবে যে! ব্যাপারটা কী জান কর্ণ! যুদ্ধের জন্য যে রথ বানায়, সে যোদ্ধা পুরুষকে অতিশয়োক্তি করে বলে যে, এই রথে চড়ে যুদ্ধ করলে আপনি দেবতাদেরও ঠাণ্ডা করে দিতে পারবেন, কিন্তু রথকারের অতিশয়োক্তির ওপর নির্ভর করে তো আর বুদ্ধিমান লোকেরা কাজ করে না, তেমনি তোমার ওই বড় বড় আত্মম্ভরি 'হ্যান্ করেঙ্গা ত্যান্ করেঙ্গা'র ওপর আস্থা রেখে, দেশ-কাল এবং আপন বলাবল কিছুই না বুঝে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ব, এটা হয় না।

কৃপ কর্ণের আত্মম্ভরি বক্তৃতা অনেকক্ষণ শুনেছেন। এবার তাই তিনি একটা তুলনা-প্রতিতুলনার জায়গায় এসে বলতে থাকলেন—দেখ কর্ণ! তুমি বেশি সাহস দেখিয়ো না—কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, আমরা গুষ্টি-শুদ্ধু একা অর্জুনের সঙ্গে নাও এঁটে উঠতে পারি—পরিচিন্ত্য তু পার্থেন সন্নিপাতো ন নঃ ক্ষমঃ। অর্জুন একসময় একাই সমগ্র কুরুদেশ রক্ষা করেছে, একাই খাণ্ডব বন পুড়িয়েছে, একাই সুভদ্রাকে হরণ করে কৃষ্ণকে পর্যন্ত দ্বৈরথে আহ্বান জানিয়েছে এবং একাই তুষ্ট করেছে কিরাতরূপী মহাদেবকে। তারপরেও একটু ভেবে দেখ। অর্জুন একাই সম্পূর্ণ জয়দ্রথের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে অপহৃতা দ্রৌপদীকে ফিরিয়ে এনেছে। বেশি দূরে নয়, এই বনেই। সমগ্র উত্তর দিকটা অর্জুন একাই দিগ্‌বিজয়ে জিতে এসেছিল। কৃপাচার্য এই কথাটা বলেই ভাবলেন কর্ণ হয়তো এবারে উত্তর দিতে পারেন যে, দিগ্‌বিজয় তো তিনিও করেছেন। তাই কৃপাচার্য এবার কর্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—কর্ণ! গন্ধর্ব চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি পালিয়ে বেঁচেছিলে, সেই চিত্রসেনের সঙ্গে অর্জুন কিন্তু একাই লড়ে গেছেন। তাঁর সেনাবাহিনীকেও অর্জুন একাই পর্যুদস্ত করেছিলেন অথচ সেই সেনাবাহিনীই তোমার রথ ভেঙে, ঘোড়া মেরে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে তাড়িয়ে ছেড়েছিল।

কৃপাচার্য এবার কর্ণের দিকে প্রতিতুলনার আঙুল তুলে বললেন—তুমি কি বলতে পার, কর্ণ, কোন কাজটা তুমি এমন একা একাই করেছ—একেন হি ত্বয়া কর্ণ কিন্নামেহ কৃতং পুরা। একা একা যুদ্ধ করব! এমন আশ কোরো না। এ যেন হাতের আঙুল দিয়ে ক্রুদ্ধ সাপের বিষদাঁতে আক্রমণ করা। পাণ্ডবদের অপমান আর ক্রোধের ঘি মাখা রয়েছে তোমার শরীরে, কাজেই তোমার পক্ষে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে—গায়ে চপচপে করে ঘি মেখে, সূক্ষ্ম কাপড় পরে অর্জুন নামে সেই জ্বলন্ত

আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলা। তুমি আর বেশি সাহস দেখিয়ো না, গলায় পাথর বেঁধে হাত দিয়ে সাঁতার কেটে অর্জুন-সমুদ্র পার হবার চেষ্টা কোরো না। আমাদের দ্বারা এই তেরো বচ্ছর অপমানিত হয়ে অর্জুন এখন বাঁধন-ছাড়া সিংহের মতো ফুঁসছে, সে আমাদের অবশেষ রাখবে না। তাই বলি কি, তুমি আর অর্জুনের সঙ্গে একা একা যুদ্ধ করার সাহস দেখিয়ো না। আমরা সবাই মিলে যুদ্ধ করব, দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, তুমি, আমি—সবাই মিলে সেই যুদ্ধশূর অর্জুনের সঙ্গে লড়াই করি—সহ যুধ্যামহে পার্থম্। তুমি যে বলেছিলে—কৌরবেরা সব গোধন নিয়ে চলে যাক, আর আমার একার যুদ্ধ দেখুক কৌরবেরা—যুদ্ধং পশ্যত মামকম্—ওই বড়াইটা আর না করলে, বেশি সাহস দেখিয়ো না—কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ।

দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামা কৃপের কথাও শুনেছেন, কর্ণের কথাও শুনেছেন। এই অশ্বত্থামাকে আগে আমরা দুর্যোধনের যুবগোষ্ঠীতে কর্ণ, দুঃশাসনের সঙ্গে অনেকবার নানা আলোচনায় অংশ নিতে দেখেছি। কিন্তু পাশাখেলায় পাণ্ডবদের সস্ত্রীক চরম অপমানের পর অশ্বত্থামা বোধহয় দুর্যোধন এবং কর্ণের সব যুক্তি মেনে নিতে পারছিলেন না। বিশেষ করে তাঁর বাবা দ্রোণাচার্য কর্ণের কাছে বারবার যেভাবে অপমানিত হচ্ছিলেন, তাতে মাঝে মাঝেই অশ্বত্থামার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল। অশ্বত্থামা নিজে বড় মাপের বীর, কর্ণও তাই। কিন্তু যে কর্ণ তাঁর পিতাকে অপমান করছেন বারংবার, যে কর্ণ সর্বজনবন্দিত আচার্যগুরুকে অভিযুক্ত করছেন নিমকহারামির দায়ে, তাঁর সঙ্গে অশ্বত্থামা থাকেন কী করে? তিনি তাই কর্ণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। অশ্বত্থামা বললেন—তোমার লজ্জা জিনিসটা বড় কম, কর্ণ! যুদ্ধবীরেরা অনেক যুদ্ধ জিতেও পরের ধন নিজের নগরে নিয়ে গিয়েও এত বকবক করে না, আর এখানে তো তুমি এখনও বিরাটরাজার গরুগুলিও জিতে আননি, তাঁর রাজ্যের সীমাও পেরোওনি, হস্তিনাপুরেও এখনও ফিরে যাওনি, অথচ কী হামবড়াইটাই না তখন থেকে করে যাচ্ছ! দেখ, আগুন মেলা বকবক না করেও শরীর পুড়িয়ে দেয়, সূর্যদেব বিনা বাক্যেই তাপ দান করেন। এঁরা যখন বিনা কথায়, নিশ্চুপে এত বড় বড় কাজ করে ফেলতে পারছেন, সেখানে তুমি কিন্তু বকেই যাচ্ছ, অথচ তুমি এখনও কিছুই করনি। বীর পুরুষেরা ন্যায় অনুসারে, সারা পৃথিবী জয় করে এসে গুণহীন গুরুকেও সৎকার করার চেষ্টা করে, আর তোমরা অন্যায় পাশাখেলায় পাণ্ডবদের জয় করেছ, তাতেও হয়নি, এখন আবার গুরুকেও নিন্দা করছ। পাশাখেলার বাজিতে রাজ্যসম্পদ জয় করে কোনও ভদ্র ক্ষত্রিয় কি সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর তেমনি হয়েছে এই নচ্ছার নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেগুলো, যারা নাকি ব্যাধের মতো শঠতায় শুধু ফাঁদ পাতার জন্য বসে আছে—নিকৃত্যা বঞ্চনাযোগৈশ্চরন্ বৈতংসিকো যথা।

পিতৃনিন্দায় অশ্বত্থামা এতই রেগে গেছেন যে, মাতুল কৃপাচার্যের কথার সূত্র ধরে তিনি কর্ণকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বললেন—একটা, মাত্র একটা যুদ্ধের কথা বলতো, যেখানে অর্জুনকে তুমি একা জয় করেছ—কতমদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং যত্রাজৈষীদ্ ধনঞ্জয়ম্। ওই নকুল, সহদেব—যাদের তুমি একরত্তি পোঁছ না, সেই তাদেরই বা তুমি কী করতে পেরেছ, কী করতে পেরেছ ভীমকে, কি যুধিষ্ঠিরকে? খুব তো দিগবিজয় করেছ বলে বড়াই করে বেড়াও, বলতে পারবে, অর্জুনেরা থাকতে কবে তুমি যুদ্ধ করে তাঁদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করেছ—ইন্দ্রপ্রস্থং ত্বয়া কস্মিন্ সংগ্রামে বিজিতং পুরা? এই যে পঞ্চস্বামীর সোহাগিনী কৃষ্ণা, তাঁকেও কোনওদিন ক্ষাত্রবীর্যে যুদ্ধজয় করে জিতে আনতে পেরেছ? স্বয়ম্বর সভার পর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতেও জেতনি, অন্য কোনও যুদ্ধও জেতনি। মাঝখান থেকে কুলবধূকে রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে রাজসভায় টেনে এনে ন্যায়-ধর্মের মূলটাই দিয়েছ উপড়ে। বেটা সারথির জাত! বদমাশ—দুষ্টকর্মন্—তুই কি ভেবেছিস দ্রৌপদীর সঙ্গে ওই জঘন্য ব্যবহারের পরেও অর্জুন তোকে ছেড়ে দেবে? তুই যে পণ্ডিতের মতো বড় বড় বাত দিয়ে যাচ্ছিস—ত্বং পুনঃ পণ্ডিতো ভূত্বা বাচং বক্তুমিহেচ্ছসি—তোর সঙ্গে কি অর্জুনের তুলনা? দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব—এমন কেউ নেই যাকে অর্জুন ডরায়। দ্রোণ, কৃপ যে এতক্ষণ অর্জুনের প্রশংসা করেছেন, ঠিক করেছেন। সে তোর থেকে অনেক বড় যোদ্ধা—ত্বত্তো বিশিষ্টো বীর্যেণ। সত্যি কথা বলতে কি, অর্জুনের মতো এত বড় যোদ্ধা আর কে আছে—কোঽর্জুনেন সমঃ পুমান্?'

অশ্বত্থামা যে কর্ণকে এতটা গালাগাল করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও অর্জুনের এত প্রশংসা করলেন, এর কারণ আছে কতগুলো। অশ্বত্থামা জানতেন, তাঁর পিতা দ্রোণাচার্য পুত্রের পরেই কিংবা পুত্রাধিক যাকে স্নেহ করেন, তিনি হচ্ছেন ওই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। অশ্বত্থামা সেটা বলেও ফেললেন। বললেন এইজন্যে যে, দ্রোণ যা কিছুই আগে বলে থাকুন সেটা প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে বলেছেন, যুদ্ধের ভয়ে নয়। বস্তুত দ্রোণ, কৃপ এঁরা অনেক আগে থেকেই পাণ্ডবদের ওপর অন্যায় অত্যাচারে দুর্যোধনের পক্ষ থেকে মানসিকভাবে সরে এসেছিলেন। আজকে যে দুর্যোধনের গোষ্ঠীরই একজন, সেই গোষ্ঠীরই অন্যতম আরেকজনকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করলেন, তাঁর কারণ অশ্বত্থামাও কোনওভাবেই পাণ্ডবদের গ্লানি আর সহ্য করতে পারছিলেন না এবং ওই গ্লানির অন্যতম হাতিয়ার যে কর্ণ, এটাও তাঁর বুঝতে দেরি হয়নি। অশ্বত্থামার পক্ষে নিরপেক্ষ ভূমিকায় কর্ণকে গালাগাল দেওয়ার কোনও অসুবিধেও নেই, তার কারণ তিনি কৌরবকুলের কেউ নন, আবার কর্ণের মতো কৌরবকুল আশ্রয় করে আত্মোন্নতির প্রয়োজনও তাঁর নেই। তাই অতি কুটিল পরিহাসে, দ্যূতসভার অসভ্যতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অশ্বত্থামা কর্ণকে বললেন—যেমন করে পাশা খেলা করেছিলে, যে বুদ্ধিতে পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ চুরি করেছিলে, যে অভব্যতায় দ্রৌপদীকে রাজসভায় নিয়ে এসেছিলে, কর্ণ! সেই কায়দায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখ না, কী হয়? কর্ণ! তোমার ক্ষাত্রধর্মের গুরু হল তোমার মামা শকুনি, সেই 'গ্র্যান্ড মাস্টার'কে এখন যুদ্ধ করতে বলো—দুর্দ্যূতদেবী গান্ধারঃ শকুনি র্যুধ্যতামিহ। তবে মনে রেখ, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু থেকে 'কচে বারো', ছয়, চার—পাশার দান পড়ে না, সেখান থেকে ক্ষুরধার বাণের ধারাপাত ঝরে পড়ে। তুমি কুরুরাজের রাজসভায় শকুনির সাহায্যে যে খেলা খেলেছিলে, এখনও সেই শকুনির দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তবে মনে রেখ, এই যুদ্ধে তোমার মতো অন্য যোদ্ধারা যত ইচ্ছে যুদ্ধ করতে যাক, আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, সেটা বলে দিচ্ছি—যুধ্যন্তাং কামতো যোধা নাহং যোৎস্যে ধনঞ্জয়ম্।

কর্ণের বিরুদ্ধে অশ্বত্থামার এই প্রতিবাদও অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভয়ে নয়, প্রতিবাদের জন্যই প্রতিবাদ। বৃদ্ধদের প্রতি কর্ণের অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে শুভ যুবচেতনার প্রতিবাদ। শক্তিধর, আত্মপরায়ণ পরগাছার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ জনের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে ভাঙনের ভয় ছিল, কুরুকুলের চিরন্তন হিতৈষীদের মধ্যে ভাঙনের ভয় ছিল এবং সে ভয় এসেছিল কর্ণের অন্যায় আস্ফালনের দ্বারা। স্বয়ং পিতামহ ভীষ্মকে এইজন্যে সাময়িকভাবে অশ্বত্থামার ক্রোধমুক্তির জন্য চিন্তা করতে হয়েছে, তাঁকে সাময়িকভাবে নামতে হয়েছে কর্ণকে 'জাস্টিফাই' করার জন্য। মধ্যপন্থী হয়ে ভীষ্মকে বলতে হয়েছে—কর্ণ যা বলেছে, তা হয়তো সকলের মনোবল বাড়ানোর জন্য বলেছে। কিন্তু সেই সূত্রে দ্রোণের বিরুদ্ধে যে সব কথা এসেছে, সে জন্য আচার্য তাঁকে ক্ষমা করুন, কৃপাচার্যও ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা—কারণ অর্জুন সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে, এখন নিজেদের মধ্যে বিরোধের সময় নয়—নায়ং কালো বিরোধস্য কৌন্তেয়ে সমুপস্থিতে। ভীষ্ম অশ্বত্থামাকে সানুবন্ধে নিজেদের মধ্যে ভাঙন বাঁচিয়ে চলার কথা বলেছেন। বৃদ্ধ হয়েও যুবক অশ্বত্থামাকে তিনি হাত জোড় করে বলেছেন—আচার্যপুত্র! ক্ষমা করুন, এখন নিজেদের মধ্যে বিরোধের সময় নয়—আচার্যপুত্র ক্ষমতাং নায়ং কালঃ স্বভেদনে।

ভীষ্মের কথার সূত্র ধরে দুর্যোধন এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে, অশ্বত্থামার এই রাগ যতখানি নিজের কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রোণের কারণে। কাজেই সময় বুঝে ভীষ্ম, কৃপ, দুর্যোধন এবং সবার ওপরে কর্ণ—সবাই মিলে আচার্য দ্রোণকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন—সহ কর্ণেণ ভীষ্মেণ কৃপেণ চ মহাত্মানা। অবস্থার গতিকে কর্ণ কিছু অপ্রস্তুত হলেন বটে কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সহজেই ক্ষমাপ্রবণ, অতএব যুদ্ধের তোড়জোড় আরম্ভ হল। যুদ্ধের 'স্ট্র্যাটিজি' ঠিক করার ভার ছিল ভীষ্মের ওপরে। কর্ণকে বাঁচানোর জন্য দ্রোণ-কৃপের সামনে কিঞ্চিৎ ওজর দেবার চেষ্টা করেও ভীষ্ম কিন্তু এমন একটি প্যাঁচ কষলেন যাতে কর্ণকেই বেশিরভাগ অর্জুনের মুখোমুখি হতে হয়। ভীষ্ম বললেন—দ্রোণ থাকুন সেনাবাহিনীর মধ্যভাগে, অশ্বত্থামা বাঁদিকে আর কৃপ ডান দিকে। সামনে থাকুন কর্ণ, আর আমি সবার শেষে থেকে চারিদিক রক্ষা করব। ভীষ্মের কথামতো দুর্যোধন

বিরাটরাজার গোধন হরণ করে পালাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে অর্জুন প্রথমে দুর্যোধনের পিছু নিলে সমস্ত কৌরববাহিনী একযোগে এসে পড়লেন অর্জুনের সামনে। প্রথমে কয়েকজন মধ্যমান বীরের মান হরণ করার পরেই অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। কর্ণ প্রথমে যেভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন এবং অর্জুনের রথ আর তাঁর সারথি উত্তরের যে অবস্থা করেছিলেন, তাতে অর্জুনকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। কর্ণ এবং অর্জুন দুজনেই এমন সমানে সমানে যুদ্ধ করছিলেন যে, মহাভারতের কবিকে প্রশংসা করে বলতে হয়েছে—কেউ কম যান না। সমস্ত ধনুর্ধরদের মধ্যে ইনিও উত্তম, উনিও উত্তম। দুজনেই মহাবল, দুইজনেই সমস্ত শত্রুর পক্ষে বিপজ্জনক—তাবুত্তমৌ সর্বধনুর্ধরাণাং মহাবলৌ সর্বসপত্নসাহৌ। কৌরবেরা সবাই মিলে কর্ণ এবং অর্জুনের এই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখছিলেন।

কৌরবেরা যে দেখছিলেন, তার কারণও আছে। আমাদের ধারণা, কৌরবদের একাংশ, যাঁরা কর্ণের ওপর ভরসা রাখেন, তাঁরা দেখছিলেন যে, কর্ণ কতটা হারেন, কারণ তাঁরা জানতেন তেরো বছরের যুদ্ধ-উপবাসী অর্জুন সেদিন ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। অর্জুন এবং কর্ণ—দুজনেই সেদিন অপূর্ব যুদ্ধ করেছিলেন, এতটাই অপূর্ব যে, কবির বাণীতে নতুন ছন্দ লেগেছে, ভাষা হয়ে উঠেছে দীপ্তিময়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে যতবারই অর্জুনের কেরামতি বানচাল করে দিয়েছেন কর্ণ, ততবারই তিনি কৌরবদের অসংখ্য হাততালি কুড়িয়েছেন—ততস্তু অভূদ্ বৈ তলতালশব্দঃ, কিন্তু অর্জুন এ সুযোগ পাননি। তবু সেদিনকার যুদ্ধে দুজনেই ছিলেন এত উজ্জ্বল, এত ভাস্বর যে, হাজারো বাণবর্ষার মধ্যে দুজনকে দেখাচ্ছিল যেন বৃষ্টির আকাশে চাঁদ আর সূর্যের উদয় হয়েছে—রথে বিলগ্নাবিব চন্দ্রসূর্যৌ, ঘনান্তরেণানুদদর্শ লোকঃ। কিন্তু হায়, শেষমেশ এই দ্বৈরথ যুদ্ধের ফল কর্ণের কপালগুণে এবং অর্জুনের হাতযশে—কর্ণের অনুকূলে যায়নি। হাতে, গলায়, উরুতে, মাথায় বিভিন্ন রকমের চোট-আঘাত নিয়ে কর্ণকে কোনওক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে হল। কিন্তু কবি লিখলেন—বনের মধ্যে এক হাতি যেমন আরেক হাতির কাছে হেরে গিয়ে সাময়িকভাবে পালায়, তেমনি অর্জুনের বাণের আঘাতে কর্ণকেও যুদ্ধ থেকে পালাতে হল। কর্ণ তবু আবার ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেটা এমন একটা সময়ে যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন সবাই প্রায় অর্জুনের হাতে পর্যুদস্ত। সমস্ত আঘাতের ওপর অর্জুনের বাণ কর্ণের দুই কানে গিয়ে লাগল। তাঁর রথ, অশ্ব, সারথি সব গেল। কর্ণ আবার দৌড়লেন নতুন সাজানো রথের জন্য।

এতক্ষণ সবার সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ একজন মাত্র ছিলেন। এবার একক সংগ্রাম আরম্ভ হল। কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্য দুজনেই হেরে গেলে প্রচুর বাগাড়ম্বরের পর আবার অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। মনে রাখা দরকার এই বিরাট-যুদ্ধে প্রথম থেকেই বেশির ভাগ যুদ্ধটা করতে হয়েছে কর্ণকে, তাঁকেই সইতে হয়েছে প্রথম সমরাঘাতগুলি। কাজেই তৃতীয়বার যুদ্ধে এসে তাঁকে অর্জুনের কাছে শুনতেই হল যে, তিনি যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর ভাই মারা পড়েছে এই যুদ্ধে। তবু আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত মহাবীরকে বিরথ অবস্থায় অর্জুনের বাণে মূর্ছিত হয়ে পড়তে হয়েছে, তাঁকে আবারও পালাতে হয়েছে। তেরো বছর পর কর্ণ-জয়ের আনন্দে হাসি ফুটেছে অর্জুনের মুখে।

৯

সত্যিই তো কর্ণ বারবার বলেন—আমি জিতব, তবু বার বার অর্জুনের কাছে হারেন কেন? এর একটা অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাতি ব্যবস্থা কিংবা বর্ণ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করাটা ছিল স্বাভাবিক। নীলকণ্ঠ সেই বিশ্বাস অনুসারেই লিখেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে মদত জুগিয়েছে অশ্বত্থামার 'সূত' বলে কর্ণকে সম্বোধন। নীলকণ্ঠ লিখেছেন—কর্ণকে গালাগালি দেওয়ার সময় অশ্বত্থামা যে তাঁকে 'সূত' বলে সম্বোধন করেছেন তার একটা কারণ আছে। অশ্বত্থামা একের পর এক যুদ্ধের নাম করেছেন আর

বলেছেন—কোন যুদ্ধটায় তুই অর্জুনের সঙ্গে জিতেছিস রে বেটা। প্রায় এই প্রসঙ্গেই 'সূত' সম্বোধন। নীলকণ্ঠ লিখেছেন—কর্ণ যে সূর্যের ঔরসজাত পুত্র সে কথা অশ্বত্থামা জানতেন। কিন্তু সারথি জাতীয় অধিরথের ঘরের পরিবেশে কর্ণ তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়েছেন বলে অশ্বত্থামা মনে করেন। নীলকণ্ঠ লিখেছেন—সমস্ত বর্ণেই মানুষের দুই রকমের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব বর্ণেই। এক জন্ম পিতামাতার শুক্রশোণিত সূত্রে, আর এক জন্মসংস্কারে। ছেলে যে জন্মাল, সে যদি পিতামাতার আপন সংস্কারেই মানুষ হয় তাহলে প্রায় ক্ষেত্রেই সন্তানের প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের ছেলেকে বলে 'একজ'—তত্র য এব যোনিঃ স এব সংস্কর্ত্তা চেৎ স একজো ন প্রকৃতিতশ্চ্যবতে। কিন্তু কর্ণ 'একজ' নন, 'দ্বিজাত'। দেবলোকের ক্ষত্রিয় পুরুষ সূর্যের ঔরসে জন্মালেও কর্ণ মনুষ্যলোকে সমান্তরাল কোনও ক্ষত্রিয় সংস্কারে সংস্কৃত হননি। তিনি মানুষ হয়েছেন সূত অধিরথের বাড়িতে সারথি-জাতের সংস্কারে। ঠিক এই কারণে তাঁর প্রকৃতিতে একটা দো-আঁশলা ব্যাপার ঘটেছে। নীলকণ্ঠের মতে—সূর্যের থেকে জন্মানোর ফলে ঔরসগতভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের কারণে কর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে শত্রুপাতনে সক্ষম, পর-প্রহারেও কুশল। কিন্তু তাঁর মধ্যে যেহেতু সূতের সংস্কারও সম পরিমাণে বর্তমান, তাই অতি বড় শত্রুর প্রহার তিনি শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না এবং এইজন্যই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে মাঝে মাঝেই পালাতে হয়—কর্ণস্তু দৈবক্ষত্রজো'পি অক্ষত্রিয়েণ সূতেন সংস্কৃত ইতি দ্বিজাতত্বাৎ ক্ষত্রিয়ত্বেন প্রহর্তুং কুশলো'পি সূতত্বেন পরকীয়প্রহারং সোঢুমশক্ত ইতি যুদ্ধাৎ পলায়তে।

আমরা আজকের দিনে বর্ণব্যবস্থার নিরিখে পুরো ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে দেখতে চাই না। তবে যা ঘটেছিল, তার একটা উচিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমরা নীলকণ্ঠের মতটা একটু অন্যভাবে বলতে পারি। একটা জিনিস সবাই নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে, অতি নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে যদি কেউ কখনও বিত্তবান হয়, তবে প্রায়শই সেই হঠাৎ বড়লোকের বৃথা বাগাড়ম্বর বৃদ্ধি পায়, এবং অন্য যথাযুক্ত হজমশক্তিশালী বিত্তবানকে সে যথার্থ বিত্তবান বলে গ্রাহ্য করে না। একইভাবে অতি মূর্খ পিতামাতার ঘরে যদি দৈববলে অতি পণ্ডিত পুরুষ জন্মায়, তবে সেই পণ্ডিতের অনেক ক্ষেত্রেই বৃথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, এবং যথোপযুক্ত পণ্ডিত মানুষকে সে গণনার মধ্যেই আনে না। কর্ণের ব্যাপারটাও একই রকম। চিরন্তন সত্য বোঝার জন্য জাতি-বর্ণের প্রসঙ্গ তোলার প্রয়োজন নেই। তবে এও ঠিক যে, সূত অধিরথের বাড়ির পরিবেশে থেকে যে ছেলে দ্রোণাচার্য, পরশুরামের পাঠশালা ঘুরে এসেছে, তার কদর অনেক। এই কদরে কর্ণের আদরও বেড়েছে এবং আদর শুধু অধিরথের ঘরে নয়, এই আদর যেহেতু এসেছে প্রসিদ্ধ ভরত বংশের যুবরাজের কাছ থেকে, তাই কর্ণের পক্ষে বাগাড়ম্বর স্বাভাবিক। কিন্তু বনেদী বড়লোকের যেমন টাকা-পয়সা হজম করার শক্তি থাকে, প্রকৃত বিদ্বানের পক্ষে যেমন বিদ্যাবত্তা হজম করা সম্ভব হয়, কর্ণের এই হজমশক্তি ছিল না। অতিক্রূর দুর্যোধনের বন্ধুত্ব তাঁর এই বদহজম আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে পেটুক যেমন তার শেষ ক্ষমতার দিকে লক্ষ না রেখেই যথেষ্ট খেয়ে যায় এবং অতি গুরুপাক দ্রব্য জীর্ণ করতে অক্ষম হয়, তেমনই কর্ণ পরশুরামের শিষ্য হওয়ার বাবদে দুর্যোধনের বহু শত্রু-পাতনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনের মতো গুরুপাক বস্তু তিনি শেষ পর্যন্ত জীর্ণ করতে পারেন না, তাঁকে পালাতে হয়। অর্জুনের মধ্যে যে নায়কোচিত ধীরোদাত্ততা আছে, যে লঘুগুরু জ্ঞান আছে এবং সর্বোপরি অর্জুনের মধ্যে যে সহনশীলতা আছে, কর্ণের তা নেই এবং সেই জন্যই কর্ণকে হারতে হয়। এ হার শক্তির পরীক্ষায় নয়, এ হার হয় প্রকৃতিতে।

এই যে দেখুন বনবাস—অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা দ্রুপদের পুরোহিত মারফত—যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই—বলে নিজেদের রাজ্যাংশ প্রার্থনা করে পাঠালেন, সেখানে কী হল ? না হয় পুরোহিতের ভাষায় পাণ্ডবের শক্তি-প্রশংসা কিছু ছিল, না হয় তাঁর ভাষায় মিশেছিল পাণ্ডবদের তেরো বছরের গ্লানি—তার জবাব তো ভীষ্মই দিচ্ছিলেন। ভীষ্ম তো ভণিতা করে বলেই দিলেন—ব্রাহ্মণ! পাণ্ডবেরা সন্ধি চায় বটে, তবে আপনার ভাষাটা বেশ কড়া, তবে হ্যাঁ সেটা হয়তো আপনি ব্রাহ্মণ বলেই—অতিতীক্ষ্ণং তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ। কিন্তু ভীষ্ম বলতে পারলেন কই ? ভণিতা করে কথারম্ভের

আগেই তো—'ধ্যাত্তারিকার' বলে রাগ দেখিয়ে ফেললেন কর্ণ—ভীষ্মে ব্রুবতি তদ্‌বাক্যং ধৃষ্টম্ আক্ষিপ্য মন্যুমান্। দুর্যোধনের 'ডিসিশন' কর্ণই তৈরি করে দিচ্ছেন। ভীষ্মের যুক্তিগ্রাহ্য কথা শুনে পাছে দুর্যোধন নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নেন, তাই পূর্বাহ্ণেই তাঁর ইন্ধন জোগাচ্ছেন কর্ণ, পূর্বাহ্ণেই তাঁকে সচেতন করছেন কর্ণ। বৃদ্ধেরা কেউ নন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র নন এমনকী যুবরাজ দুর্যোধনও নন, কুরুদের হয়ে একবার মাত্র দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে, ভীষ্মকে 'ধুত্তোর' বলে, কথা শোনালেন কর্ণ। তেরো বছর বনবাসের পর পাণ্ডবেরা যে প্রস্তাব পাঠালেন, তার উত্তর দিচ্ছেন কর্ণ। কুরুসভায় তাঁর এতই প্রতাপ।

কর্ণ বললেন—বার বার এক কথা বলে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না—কিং তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ। কর্ণের ধারণা, দুর্যোধনের মতোই কর্ণের ধারণা যে, অজ্ঞাতবাসের আগেই অর্জুনকে দেখা গেছে সেই বিরাট যুদ্ধের আসরে। আসলে ওই যুদ্ধে অর্জুনের কাছে হেরে যাওয়ায় কর্ণের সমস্ত অহমিকা যেহেতু মলিন হয়ে গিয়েছিল, তাই কর্ণ কিন্তু ক্ষত্রোচিত ক্ষমতার বদলে আবার কপটতার দিকে মন দিচ্ছিলেন। কর্ণ বললেন—সবাই জানে যে, শকুনির পাশার দানে কী শর্ত ছিল, অজ্ঞাতবাসের সময় তাদের দেখা গেলে আবার তাদের বনে যেতে হবে—এইটেই কথা। এই সত্য প্রতিজ্ঞার বাইরে এসে পাণ্ডবেরা যদি বিরাটরাজা আর দ্রুপদরাজার ওপর নির্ভর করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে আমাদের, তাহলে মনে রেখ, সেই ভয়ে ভীত নয় দুর্যোধন। ভয় দেখালে দুর্যোধন একের চার ভাগ কেন, এক পা জমিও ছাড়বেন না—দুর্যোধনো ভয়োদ্বিগ্নো ন দদ্যাৎ পাদমন্ততঃ। হ্যাঁ যদি ন্যায়ের কথা বলো তা হলে অতি বড় শত্রুকেও আমাদের দুর্যোধন সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারেন এবং সেটা পাণ্ডবদেরও দেবেন, যদি তারা প্রতিজ্ঞাটি ঠিক ঠিক মতো পালন করে। হ্যাঁ, আবার বারো বছরের বনবাস শেষ হোক, তারপর তারা নির্ভয়ে আমাদের দুর্যোধনের কোলে এসে বসুক। কিন্তু তা না করে যদি অন্যায়ভাবে বোকার মত দাবি চালায় পাণ্ডবেরা, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কথা যেন স্মরণে থাকে—স্মরিষ্যন্তি বচো মম।

আবার সেই দম্ভ। দর্পী কর্ণের কথাগুলি শুনলেন ? সাধে কি আর গান্ধারী মাতা সবার শেষে বলেছিলেন যে ভারত যুদ্ধের অনুক্ত কর্তা ছিলেন কর্ণ। কর্ণ যেভাবে যুক্তি সাজিয়ে, ইন্ধন জুগিয়ে দুর্যোধনকে অশুভ পথে প্ররোচিত করলেন, তাতে সাময়িকভাবে যে কোনও ঠাণ্ডা মানুষও প্ররোচিত বোধ করবেন, সেখানে দুর্যোধন শত জটিলতায় দীর্ণ। এর ওপরে আছে সেই দম্ভ, যার ওপর দুর্যোধন বার বার ভরসা করে আশাহত হন, আবারও ভরসা করেন, কেননা কর্ণ ছাড়া আর কোনও শক্তিশালী বীরই তাঁরই মতো করে তাঁরই ছন্দে, তাঁর কথা ভাবেন না। কিন্তু কথার মাঝখানে স্তব্ধ হওয়া ভীষ্ম কর্ণকে ছাড়বেন কেন ; কর্ণের স্পর্ধা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে আর ভীষ্মেরা ছাড়তে পারছিলেন না—আগেই সে কথা বলেছি। কর্ণের মুখরতায়, দাম্ভিকতায় আহত ভীষ্ম বেশ রেগেই বললেন—ওরে রাধার বেটা ! মেলা বকবক কোরো না, তোমার নিজের কাজকর্ম একটু স্মরণ কর তাহলেই হবে। তুমি একা নও, আমরা ছ'জন মহারথ যোদ্ধা ছিলাম বিরাটরাজ্যে গোধন হরণের সময়। আমাদের ছ'জনকেই অর্জুন একা হারিয়ে দিয়েছিল। তুমি যে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেও বার বার বেঁচে গেছ, তার থেকেই বুঝি কী কর্ম তুমি করেছ—বহুশো জীয়মানস্য কর্ম দৃষ্টং তদৈব তৎ—অর্থাৎ পালিয়ে বেঁচেছ। তোমার কথা শুনে যদি এখন এই ব্রাহ্মণের মুখে পাণ্ডবদের সন্ধির প্রস্তাব মেনে না নিই, তা হলে যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়ে শুয়ে আবার আমাদের মাটি খেতে হবে। যেমনটি আগের যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হয়ে খেয়েছিলাম—ধ্রুবং যুধি হতাস্তেন ভক্ষয়িষ্যাম পাংশুকান্।

ভীষ্মের রাগ দেখে মহামতি ধৃতরাষ্ট্র একটু ভয়ই পেলেন, একটু তিরস্কারও করলেন কর্ণকে। পরে সঞ্জয়ের কাছে মন খুলেই বললেন যে, "আমাদের পক্ষে এই দুর্যোধন আর কর্ণ ছাড়া আর কেউই নেই, যারা পাণ্ডবদের এত বিদ্বেষ করে। নিরপেক্ষতার মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বিশেষণ দিয়েছেন পাপমতি, মন্দবুদ্ধি আর কর্ণের বিশেষণ দিয়েছেন ক্ষুদ্রচেতা—অন্যত্র পাপাদ্ বিষমান্‌মন্দবুদ্ধে-র্দুর্যোধনাৎ ক্ষুদ্রতরাচ্চ কর্ণাৎ। সত্যি দুর্যোধনের অসমদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে কী এক পরশ্রীকাতরতা কর্ণকে পেয়ে বসেছিল যে, অতবড় উদার দাতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অতি বিশ্বস্তজনের

চিত্তভূমিতেও ক্ষুদ্রচেতার পদবী লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু এহ বাহ্য, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া বড়ই সাময়িক। সাময়িকভাবে তিনি ভীমার্জুনের শক্তি চিন্তা করে ভয় পেয়েছেন, অতএব আপাতত দুর্যোধন তাঁর কাছে মন্দবুদ্ধি, কর্ণ তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর। লোকে যা বলে, এখন ধৃতরাষ্ট্রও তাই বললেন। কিন্তু কর্ণের বিপদটা তো অন্য জায়গায়। ধৃতরাষ্ট্র কী বলছেন, না বলছেন তাতে কিছু আসে যায় না, স্বয়ং দুর্যোধন তাঁকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—এইসব মহারথীদের সমান মনে করেন—ভীষ্ম দ্রোণকৃপাণাং চ তুল্যঃ কর্ণো মতো মম। শুধু তাই নয়, কখনও বা স্বয়ং পরশুরামের সমান মনে করেন কর্ণকে। অবশ্য এ ধারণা দুর্যোধনের হয়েছে কর্ণের মারফতই, কারণ কর্ণই তাঁকে এসে বলেছেন—পরশুরাম নাকি তাঁকে জানিয়েছেন—আমার মতনই কিংবা আমার সমানই ক্ষমতা তোমার—অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ মৎসমো'সীতি ভারত।

আমরা জানি যে, দুর্যোধনের কাছে কর্ণ পরশুরামের কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়ে বলেছেন এবং কিছু কথা যে তিনি চেপেও গিয়েছিলেন তাও আমরা জানি। এখন যুদ্ধ এগিয়ে আসছে, এখন সবারই সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন যে, তাঁর গুষ্টিতে দুর্যোধন আর কর্ণ ছাড়া তেমন পাণ্ডব-বিদ্বেষী আর কেউ নেই। বস্তুত এঁরাই যুদ্ধ চান। আর চাইবেনই বা না কেন, না চেয়ে উপায়ই নেই, যুদ্ধের কারণ তো এঁরাই। এখন এই যুদ্ধোদ্যোগের মুহূর্তে যখনই দূতেরা একবার পাণ্ডবদের কাছে যাচ্ছে, আরেকবার ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসছে, তখনই কিন্তু পাণ্ডব পক্ষ থেকে বার বার সেই দ্যূতসভায় পাঞ্চালী-কৃষ্ণার অপমানের কথা উঠেছে। বার বার কর্ণের কথা উঠেছে, যিনি পঞ্চপতির সামনেই পঞ্চস্বামিগর্বিতা দ্রৌপদীকে 'বেশ্যা' বলেছিলেন। পাণ্ডবদের প্রতিনিধি হয়ে স্বয়ং বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি-দূত সঞ্জয়কে জানিয়েছেন—মনে রেখ সঞ্জয়! সেই সূতপুত্র কর্ণ দ্রৌপদীর শ্বশুরস্থানীয়দের সামনে তাঁকে কী বলেছিল। বলেছিল—তোমার এখন আর কোনও গতিই নেই দ্রৌপদী, তুমি এখন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের ভোগ্যা দাসী। বলেছিল—দ্রৌপদী! এখন তুমি বরং তোমার পঞ্চস্বামী বাদ দিয়ে নতুন কোনও স্বামী বেছে নাও কৌরবদের মধ্যে থেকে। কৃষ্ণ বললেন—সঞ্জয়! এসব কথা অর্জুনের মনের মধ্যে ছুঁচের মত বিঁধে রয়েছে, কর্ণের কথার ছুঁচ—কর্ণাৎ শরো বাঙ্‌ময়-স্তিগ্মতেজাঃ প্রতিষ্ঠিতো হৃদয়ে ফাল্গুনস্য।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে ফিরে এসে সব বলেছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। তাঁকে বোঝানোও কম হয়নি। স্বয়ং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সহস্র নীতিকথা শুনিয়ে শেষ মন্তব্য করেছেন—মহারাজ! আপনি দুর্যোধন, শকুনি অথবা কর্ণের ওপরে কুরুদের সমস্ত ঐশ্বর্য ন্যস্ত করে কী করে ভাবছেন আপনি মঙ্গল লাভ করবেন—কর্ণে চৈশ্বর্যমাধায় কথং ত্বং ভূতিমিচ্ছসি। কিন্তু একটু আগেই যে বলেছি দুর্যোধন-কর্ণের ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিতান্তই সাময়িক, নইলে স্বয়ং কুরু-কুলপতি ভীষ্মকেও তিনি কীরকম অবজ্ঞাই না করলেন। সঞ্জয়ের কথার সূত্র ধরে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করছিলেন। একই সঙ্গে ভীষ্ম সতর্ক করছিলেন দুর্যোধনকেও। ভীষ্ম বলেছিলেন—বার বার বলছি দুর্যোধন, কৃষ্ণ আর অর্জুনকে যুদ্ধে যদি এক রথে আসতে দেখ, তা হলে কৌরবদের সমূহ বিপদ। এটা মনে রেখ, সমগ্র কৌরবকুল তোমারই সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করে কিন্তু তুমি নিজে চালিত হও তিন জনের বুদ্ধিতে। তাদের মধ্যে একজন হল ওই পরশুরামের অভিশপ্ত শিষ্য, বেজাতে জন্মানো সূতপুত্র কর্ণ—রামেণ চৈব শপ্তস্য কর্ণস্য ভরতর্ষভ। দুর্জাতেঃ সূতপুত্রস্য...। দ্বিতীয় শকুনি, তৃতীয় দুঃশাসন। দুর্যোধনের বুদ্ধিদাতাদের লিস্টিতে প্রথম নাম কর্ণের। কুরুবৃদ্ধেরা যে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট নন, তা তাঁদের আরোপিত বিশেষণগুলি থেকেই বোঝা যায়। কর্ণ 'দুর্জাতি', কর্ণ 'সূতপুত্র'—এইসব বিশেষণ কর্ণের গা-সওয়া, কিন্তু যাঁর ক্ষমতা এবং অস্ত্রবলের ওপর দুর্যোধন সমধিক ভরসা করেন, সেই অস্ত্রবিদ্যাও যে গুরু পরশুরামের অভিশাপে কার্যকালে কাজে লাগবে না সেই কথাটা দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ফলে কর্ণের রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি অবশ্য সুচতুরভাবে ওই শাপ-টাপের প্রসঙ্গে গেলেন না। উল্টে শক্তিমান পুরুষের জাতি নিয়ে যে কোনও আলোচনা ভদ্র সমাজে বিগর্হিত, সেই দিকটা দিয়ে চেপে ধরলেন ভীষ্মকে।

কর্ণ বললেন—যা বলেছেন, বলেছেন। কিন্তু আপনি আর দ্বিতীয়বার এসব বাজে কথা বলবেন না, পিতামহ ! আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করি এবং সেই ধর্ম থেকে আমি একচুলও নড়ি না। তা ছাড়া, আর কী খারাপটা আপনি দেখেছেন আমার মধ্যে, যাতে করে আমাকে এমন করে গালাগালি দিতে পারেন আপনি—কিঞ্চান্যন্ ময়ি দুর্বৃত্তং যেন মাং পরিগর্হসে। কই, আমার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা তো কোনও অন্যায় আচরণ দেখতে পায় না। আর আমিও কোনওদিন তাদের বিরুদ্ধে কাজ করিনি। অর্থাৎ তুমি তা করছ। এই কথাটা ভীষ্মের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে বলা। কর্ণ বলতে চান—ভীষ্ম কৌরবদের যথেষ্ট দোষ দেখতে পান, যা কর্ণ পান না। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাও ভীষ্মকে খুব একটা আপনার বলে মনে করেন না, অথচ তিনি ঠাকুরদাদাগিরি করে নাতিদের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বাঙাল প্রবাদ জানলে কর্ণ এখুনিই বলতেন—মায় মানে না ঝি, আপনাআপনি সোহাগী। প্রায় এতটা বলার পর কর্ণ উদ্ধত হয়ে বললেন—যা বলেছি, বেশ করেছি। হ্যাঁ, আমি পাণ্ডবদের একা শেষ করে ছাড়ব। কর্ণ স্পষ্টতই বলতে চাইলেন—আপনি কে ? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যা প্রিয়, আমি তাই করেছি, তাই করি, আর কাজ করি দুর্যোধনের, রাজ্যের ভার যাঁর ওপরে, আপনি কে—রাজ্ঞো হি ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বং কার্যং প্রিয়ং ময়া। তথা দুর্যোধনস্যাপি স হি রাজ্যে সমাহিতঃ।

এই অপমান ভীষ্মের সহ্য হবার নয়। এতদিন ধরে যিনি এই বিশাল কুরুকুলের সমস্ত তন্তুগুলি রক্ষা করে এসেছেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনের প্রিয় বোঝেন না, বোঝে এই কুরুদের আশ্রয়পুষ্ট কর্ণ। অথবা আশ্রয়পুষ্টের এই স্বভাব, সে শ্রেয় বোঝে না, প্রেয় বোঝে, পরিণামে হিতকারিতা বোঝে না, বিষয়ের আপাতরম্যতা বোঝে। কিন্তু ভীষ্ম যদি এখন সেই সব তর্ক তোলেন, তা হলে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তা মোটেই বুদ্ধিগোচর হবে না—হবে না যে, তা বিদুরের বিরাট বক্তৃতা শেষেই বোঝা গেছে। ভীষ্ম তাই সে ধার দিয়ে গেলেনই না, তিনি বাস্তবতার কথা তুললেন। তিনি কর্ণের সেই আত্মম্ভরিতার কথাটা উদ্ধার করে নিলেন, তাঁর সমস্ত বাক্যগুলি থেকে। ভীষ্ম জানেন, যুদ্ধ যখন লাগবে, তখন সেই বাস্তবতার নিরিখেই কর্ণের কথার উত্তর দেওয়াটা ভাল। ভীষ্ম বললেন—প্রায় প্রতিদিনই একবার এই কর্ণ হামবড়াই করে বলবে—আমি একাই পাণ্ডবদের শেষ করে দেব—হন্তাহং পাণ্ডবানিতি। আরে পাণ্ডবদের তুলনায় এই কর্ণটা একের ষোলো ভাগও নয়—নায়ং কলাপি সম্পূর্ণা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।

বিরাটরাজ্যের যুদ্ধের আসরে, দ্রোণাচার্যের কথার উত্তরে কর্ণ যখন একই কথা বলেছিলেন—পাণ্ডবদের আমিই মারব—তখন এই ভীষ্ম কোনওমতে কর্ণের কথার যৌক্তিকতা স্থাপন করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বন্ধ করেছিলেন ; দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য অশ্বত্থামার মতো বীরকে কোনওমতে তিনি কৌরবপক্ষে পুনরায় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আজ যখন সেই লোক, সেই একই কথা তাঁরই মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁকেই 'নিমকহারাম' বলতে চাইছে, তখন ভীষ্মও লাগামছাড়া কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন। ভীষ্ম বললেন—ধৃতরাষ্ট্র ! আজ তোমার ছেলেদের কপালে যে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে, তার সবটাই জানবে এই বদমাশ সারথির বেটার কাজ—তদস্য কর্ম জানীহি সূতপুত্রস্য দুর্মতেঃ। প্রধানত, এইটার ওপর নির্ভর করেই তোমার দুর্বুদ্ধি ছেলে দুর্যোধন, তার বীর জ্ঞাতিভাইদের অপমান করেছিল। আর এই কর্ণ পাণ্ডবদের মারবে বলছে—তা বেশ—এই কর্ণের একটা সেইরকম সাংঘাতিক কর্মের কথা বলো, যা পাণ্ডবদের কেউ না কেউ করেনি। এই যে বিরাটনগরে এত বড় যুদ্ধটা হয়ে গেল, সেখানে কর্ণটা লড়তে গেছিল অর্জুনের সঙ্গে। কী হল ? কর্ণের নিজের ভাইটাও যখন মরে গেল, তখন এই কর্ণ কী করেছিল—কিমনেন তদা কৃতম্। সেই যুদ্ধে অর্জুন যখন সমস্ত কুরু-প্রধানদের যুদ্ধে মূর্চ্ছিত করে পরনের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে নিয়ে চলে গেল, তখন এই কর্ণটা কোথায়, কোন দূরদেশে লুকিয়েছিল—প্রমথ্য চাচ্ছিনদ্ বাসঃ কিময়ং প্রোষিতস্তদা ? যখন গন্ধর্ব চিত্রসেন তোমার ছেলে দুর্যোধনকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তখন কোথায় ছিল এই সূতের বেটা, যেটা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ করে চেঁচাচ্ছে—ক্ব তদা সূতপুত্রো'ভূদ্ য ইদানীং বৃষায়তে। আরে সেদিন, সেই অর্জুন, সেই ভীম, সেই নকুল-সহদেব—এরাই গিয়ে গন্ধর্বদের হটিয়ে দিয়ে তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনেছিল। এই কর্ণের

মিথ্যা বাগাড়ম্বর অনেক শুনেছি, ওসব ফালতু কথার কোনও মূল্য নেই—এতান্যস্য মৃষোক্তানি বহূনি ভরতর্ষভ।

ভীষ্মের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করলেন দ্রোণাচার্য, কারণ তিনিই কর্ণের কটু অপমানের পূর্বভোগী। দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিলেন এবং বললেন—খবরদার এইসব ধান্দাবাজদের কথা শুনে আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন না—ন কামম্ অর্থলিপ্সূনাং বচনং কর্তুমর্হসি। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ বললে কী হবে, আমরা আগেই বলেছি ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণ বিষয়ক বিরূপ প্রতিক্রিয়া অতি সাময়িক। হিতের কথা তাঁর আর ভাল লাগে না, বরঞ্চ কর্ণের আপাতবশংবদতার কথাই তাঁর ভাল লাগে, কেউ তাঁর প্রিয় সাধন করছে এইটাই তাঁর ভাল লাগে, অন্ধ রাজার গোপন অন্ধ ইচ্ছেগুলি কেউ নির্বিচারে পালন করছে—এইটাই তাঁর ভাল লাগে। ফল হল এই যে, ভীষ্ম-দ্রোণ যা বললেন, সেদিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, যেন কিছু শুনতেই পাননি এমন একটা ভাব করে তাঁর বিস্ফারিত অন্ধ চক্ষু দুটি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন সঞ্জয়কে—অনাদৃত্য তু তদ্‌বাক্যমর্থবদ্ দ্রোণভীষ্ময়োঃ। যেন এই ভীষ্ম-দ্রোণের প্রলাপ বাক্যের কোনও মূল্যই নেই, বরং কর্ণ যা বলেছেন ঠিক বলেছেন, এমনি একটা ভাব করে ধৃতরাষ্ট্র সাবহেলায় জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ সঞ্জয়, কী হল তারপর, পাণ্ডবেরা কী বললেন ?

মহাভারতের কবি আর কিছুতেই কর্ণকে সমব্যথা দেখাতে পারছেন না। কবির ধারণা, ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম, দ্রোণের মত মানুষের সার কথা শুনলেন না, ভদ্রতা করে তাঁদের কথার জবাবও দিলেন না, উল্টে কর্ণের প্রতিই যখন ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ় সমর্থন রয়ে গেল, তখন কুরুকুলের সাধারণ জনেরা নিজের জীবনের আশা বিসর্জন দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সমস্ত কথা শুনলেন, পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠা শুনে তাঁর যে একটু ভয় ভয়ও করছিল না, তা নয়, কিন্তু তাঁকে আপন মতে প্রতিষ্ঠিত করতে দুর্যোধনই ছিলেন যথেষ্ট। ভীষ্ম যেহেতু কর্ণের বীরত্ব নিয়ে কটু সমালোচনা করেছেন, তাই দুর্যোধন সবার সামনেই পুনরায় তাঁকে কাল্পনিক পাণ্ডবহন্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তুলনা দিয়ে বললেন, কর্ণ আপন শক্তিমত্তায় ওই ভীষ্ম, দ্রোণ কি কৃপের থেকে কোনও অংশে কম নয়, বরঞ্চ ভীষ্মের গুরু পরশুরামও নাকি তাঁকে সমযোদ্ধার আসন দিয়েছেন—অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ মৎসমোঽসীতি ভারত। হ্যাঁ, ইন্দ্রদেবের প্রবঞ্চনায় এবং কর্ণের দানশূরতায় কবচ-কুণ্ডলটি খোয়া গেছে বটে, কিন্তু মজুত আছে কর্ণের কাছে সেই ইন্দ্রের দেওয়া এক-বীরঘাতিনী শক্তি—যে শক্তি থেকে অর্জুনের কিছুতেই নিস্তার নেই—কস্মাদ্ জীবেদ্ ধনঞ্জয়ঃ। দুর্যোধন কর্ণের শক্তি দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আপনি একটুও চিন্তা করবেন না মহারাজ, পাকা ফলের মতো জয় আমাদের হাতের মুঠোয়—ফলং পাণৌ ইবাহিতম্।

আমরা আগেই বলেছি মহাভারতের কবি আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত সমব্যথিতা উঠিয়ে নিচ্ছেন কর্ণের ওপর থেকে। যে শক্তি, যে রণনিপুণতা নিয়ে জন্মেছিলেন কর্ণ, সেই শক্তি শুধু অন্যায় বুদ্ধির মোসাহেবি করে এখন একেবারে একা হয়ে গেছে। সহনশীলতা এবং পাত্রাপাত্র বোধ—দুটিই কর্ণের মধ্যে না থাকাতে তিনি শেষ পর্যন্ত কৌরবকুলের ধ্বংসসাধকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এমনকী স্থিতিশীল প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত মনে করেন—দুর্যোধন আমার গোপাল ছেলে, সুবোধ বালক, আসল কাজটা করছে ওই কর্ণ। দুর্যোধনকে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন—দেখ বাপু তুমি তো নিজে ইচ্ছে করে কিছু কর না, ওই কর্ণ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়—ন ত্বং করোষি কামেন কর্ণঃ কারয়িতা তব। দুর্যোধনের গোষ্ঠীতে কর্ণের এই প্রযোজক কর্তার ভূমিকা, এটা খানিকটা সত্যও বটে। কর্ণ নিজে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা—এইসব বড় মাপের মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র যখন সবার চাপে পড়ে দুর্যোধনের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন, তখন দুর্যোধন পরিষ্কার সেই একাকিত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন। অর্থাৎ যুদ্ধ যদি লাগে এবং ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, কেউ যদি যুদ্ধ নাও করেন, তবু তিনি যুদ্ধ করবেন, শুধু তাঁর সঙ্গী হবেন কর্ণ। তিনি বলেছেন—আমি কারও ওপর কোনও ভরসা রাখছি না, শুধু আমি আর কর্ণ—অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ—এ দুজনে মিলেই আমরা যুদ্ধ করব। যুদ্ধটা যদি যজ্ঞের মতো চেহারা নেয়, তাহলে

সেই রণযজ্ঞের পশুবলি হবেন যুধিষ্ঠির, আর সেই যজ্ঞের পুরোহিত হবেন কর্ণ আর দুর্যোধন—অহঞ্চতাত কর্ণশ্চ রণযজ্ঞং বিতত্য বৈ। যুধিষ্ঠিরং পশুং কৃত্বা দীক্ষিতৌ পুরুষর্ষভৌ।

রণযজ্ঞে পাণ্ডব-প্রতিনিধি যুধিষ্ঠিরকে বলি দেওয়ার জন্য দুর্যোধন কারও ওপর নির্ভর করেননি, প্রধানত কর্ণের ওপর ছাড়া। এই নির্ভরতার জন্য কর্ণের মত নিতে হয়নি দুর্যোধনকে, কর্ণের ওপর দুর্যোধনের দখলদারি এতটাই। কর্ণও অবশ্য তাঁর কথার মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে একটা বড় ঘটনাও ঘটে গেল। কুরুসভার বৃদ্ধেরা যে আস্তে আস্তে কর্ণের থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে পড়ছিলেন তারই এক চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল এই সময়। দুর্যোধনের নির্ভরতায় আপ্লুত হয়ে কর্ণ খেয়ালই করলেন না যে, ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে নানা কথা জানতে ব্যস্ত আছেন—বৈচিত্রবীর্যম্ তম্ অচিন্তয়িত্বা। এমনিতেই কর্ণ কথা বলতে উঠলেই কুরুসভায় দুর্যোধনের অনুগতদের মধ্যে 'এনকোর' 'এনকোর' ধ্বনি ওঠে। ঠিক তেমনিভাবেই—প্রহর্ষয়ন্ সংসদি কৌরবাণাম্—কর্ণ নিজের মনে দারুণ আস্থা নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন। কর্ণ বললেন—দুর্যোধন! পাণ্ডবদের ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও, ওদের সঙ্গে আমি বুঝে নেব—পার্থান্ হনিষ্যামি মমৈষ ভারঃ।

কুরুসভায় এখন পাণ্ডব-কৌরবের ক্ষমতা-অক্ষমতা যাচাই চলছে দিন রাত। কে কাকে মারতে পারবে। কার শক্তি কত—এ সব তুলনা, প্রতিতুলনা চলছে। সেই অবস্থায় কর্ণ তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে আবারও বলে ফেললেন—পাণ্ডবদের দণ্ড দেওয়ার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, আমি গুরু পরশুরামের কাছে মিথ্যা কথা বলে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলাম বটে, গুরুও আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন যে, আমার অন্তকালে সেইসব মারণাস্ত্র আমার স্মৃতিগোচর হবে না। কিন্তু তবু বলছি, সে সব অস্ত্রের শেষমেশ এখনও যা আমার মাথায় আছে, তাতেই ওই পাণ্ডবদের বারোটা বেজে যাবে—তস্মাৎ সমর্থোঽস্মি মমৈষ ভারঃ। কর্ণ গুরুর কথাটা তুললেন এই জন্যে যে, বার বার পরশুরামের অভিশাপের কথাটা বলে তাঁকে একটু খাটো করে দেখার একটা প্রবৃত্তি ভীষ্ম-দ্রোণের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। অতএব ভীষ্ম-দ্রোণের মুখ ভোঁতা করে দিয়ে বললেন—আরে! পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য—আপনারা এত কষ্ট করবেন কেন? আপনারা বুড়ো মানুষ, আপনারা মেজাজে বসে থাকুন ওই দুর্যোধনের পাশটিতে। পাণ্ডবদের ব্যাপারে আপনাদের কারও কোনও চিন্তা নেই, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন—পার্থান্ হনিষ্যামি মমৈষ ভারঃ।

আর কত! আর কত সহ্য করতে পারেন ভীষ্ম। ভীষ্ম বললেন—তোমার সময় হয়ে এসেছে বাছা! যথেষ্ট বড় বড় কথা শুনেছি—কিং কত্থসে কালপরীতবুদ্ধে—আর নয়। ওই যে ইন্দ্রের দেওয়া ওই শক্তিটার ওপব অত ভরসা করছ তুমি, ভাবছ একবার ব্যবহার করেই অর্জুনকে সাবাড় করবে তুমি। আরে, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বাসুদেব কৃষ্ণের চক্র চলবে, তখন ইন্দ্রের শক্তি গুঁড়িয়ে যাবে—চক্রাহতাং দ্রক্ষ্যসি কেশবেন। ওই যে সাপের মুখওয়ালা বাণটা, যেটাকে তুমি প্রতিদিন মালা-টালা দিয়ে পুজো কর, তোমার সঙ্গে ওটারও আর চিহ্ন থাকবে না অর্জুনের বাণে। এটা মনে রেখ অর্জুনকে রক্ষা করছেন স্বয়ং বাসুদেব, তোমাদের মতো বিরাট যোদ্ধাকে ওপারে পাঠাতে যাঁর সময় লাগবে না একটুও—যঃ ত্বাদৃশানাঞ্চ বলীয়সাঞ্চ হন্তা রিপূণাং তুমুলে প্রগাঢ়ে।

কর্ণের রাগ হল সাংঘাতিক, অথচ প্রথমে স্বীকারও করে নিলেন কৃষ্ণের বলবত্তার কথাটা। বললেন—হ্যাঁ, স্বীকার করলাম কৃষ্ণ খুব বড় মানুষ কিন্তু তাই বলে আমিও যা বলেছি তাও এমন কিছু বাজে কথা নয়। শুনে রাখুন পিতামহ! এই আমি অস্ত্র ফেলে দিলাম, আপনি বেঁচে থাকতে এই সভাতেও আমি আসব না, এবং যে যুদ্ধে আপনি আছেন, সে যুদ্ধেও নয়। কিন্তু আমি কী করতে পারি আর পারি না, তা সবাই দেখবে আপনি গতায়ু হলে—ত্বয়ি প্রশান্তে তু মম প্রভাবং দ্রক্ষ্যন্তি সর্বে ভুবি ভূমিপালাঃ। এই বলে কর্ণ কুরুসভা ত্যাগ করে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। দুর্যোধন ভীষ্মকে খানিকটা বকাবকি করলেন এবং পরিষ্কার তাঁকে জানালেন—পিতামহ! আপনি কিংবা দ্রোণের ওপর নির্ভর করে আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, পঞ্চপাণ্ডবদের ঠাণ্ডা করতে আমি, কর্ণ আর দুঃশাসনই যথেষ্ট—অহং বৈকর্তনঃ কর্ণো ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে। এ

কথাগুলি সবই কর্ণের কথা। কর্ণ চলে গেলে, কর্ণের কথা বলেই ভীষ্মকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন স্বয়ং দুর্যোধন। দুর্যোধন কর্ণের পুরনো কথাটাও ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—অস্ত্রে, ক্ষমতায়, সৈন্যবলে আমরাও পাণ্ডবদের থেকে কম যাই না, তবু খালি আপনি পাণ্ডবদের জয় দেখতে পান সব জায়গায়, কেন ? আমরা কি এতই ফেলনা—পিতামহ বিজানীষে পার্থেষু বিজয়ং কথম্। বললাম তো পাণ্ডবদের ঠাণ্ডা করতে, আমি, কর্ণ আর দুঃশাসনই যথেষ্ট, আপনাদেরও কাউকে প্রয়োজন নেই—পাণ্ডবান্ সমরে পঞ্চ হনিষ্যামি শিতৈঃ শরৈঃ।

এ হল কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের পারস্পরিক সেই পিঠ-চুলকানি, যাতে করে, কুরুবৃদ্ধেরা সবাই একে একে প্রত্যেকেই আপন কক্ষে গিয়ে পৌঁছেছেন ; আর কেউই দুর্যোধনের সঙ্গে মানসিকভাবে কাছাকাছি নেই। ভীষ্ম, দ্রোণ যতদূর সরেছেন দুর্যোধনের কাছ থেকে, দুর্যোধন তত কাছাকাছি হয়েছেন কর্ণের। দূত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে 'রিপোর্ট' দিয়েছেন যে, তিনি অর্জুন আর কৃষ্ণকে এক আসনে বসে থাকতে দেখে বড়ই ভয় পেয়েছেন—একাসনগতৌ দৃষ্টা ভয়ং মাং মহদাবিশৎ। সেইকালের দিনে দেবপ্রতিম এই দুই প্রবাদ পুরুষের ঘনিষ্ঠতা সঞ্জয়ের মনে যে প্রমাদের সঞ্চার করেছে, অনুরূপ ভয় পাণ্ডব পক্ষেরও হতে পারত—কর্ণ-দুর্যোধনের ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতায়, কারণ তাঁদেরও আমরা একাসনেই বসতে দেখেছি। কৃষ্ণ যখন শান্তির দূত হয়ে এলেন কৌরবদের সভায়, তখন কর্ণ-দুর্যোধনও একাসনেই বসে ছিলেন—কর্ণ-দুর্যোধনাবুভৌ... একাসনে মহাত্মানৌ। কিন্তু তবুও যে তাঁরা কোনও ভয়ের সৃষ্টি করতে পারেননি, তার কারণ হিসেবে না হলেও মহাভারতের কবি তাঁদের একটা বিশেষণ দিয়ে আমাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। কবি লিখেছেন—কৃষ্ণের আসনের অত্যন্ত কাছাকাছি কর্ণ আর দুর্যোধন একাসনে বসেছিলেন, কিন্তু শান্তি-সন্ধির কথা শোনার মতো তাঁদের প্রকৃতি ছিল না, তাঁরা দুজনেই রাগে গুম হয়ে বসেছিলেন—একাসনে মহাত্মানৌ নিষীদতুরমর্ষণৌ। মনের মধ্যে ক্রোধের মতো এত বড় একটা রিপু নিয়ে, পাত্রাপাত্র-বিবেকহীন স্বার্থপরায়ণ এক অহমিকা নিয়ে কখনও মহান ব্যক্তিত্বের দাবি করা যায় না। তাঁদের একাত্মক অহমিকা যেখানে কৌরবদের নিজের ঘরের মধ্যেই ভাঙন ধরে গিয়েছিল সেখানে পাণ্ডবের শিবিরে কৃষ্ণার্জুনের একাত্মতায় তাঁদের শত্রু পক্ষের যে শুধু ভয় উৎপাদিত হচ্ছিল তাই নয়, কৌরব পক্ষের অনেক মান্য পুরুষই তাঁদের হৃদয়-ভরা সম্মান নিবেদন করতে আরম্ভ করেছিলেন পাণ্ডব পক্ষের ওই দুই মহান পুরুষের উদ্দেশ্যে। ভীষ্ম-দ্রোণের মতো পুরুষেরও তাঁদের প্রতি এই সম্মান-বোধ ভয়ে তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে নীতি-যুক্তির বৈধতায়, যে বৈধতা কর্ণ-দুর্যোধনের হৃদয়ে ছিল না। সমস্ত মতে নিরপেক্ষ গান্ধারীর যুক্তিতেও কর্ণ পরিচিত হয়েছেন অত্যন্ত ক্রোধী বলে—সূতপুত্রো দৃঢ়ক্রোধঃ। কর্ণ-দুর্যোধনের যৌথ আস্ফালন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কৌরব পক্ষের স্থিতধী পুরুষেরা শেষ পর্যন্ত পাণ্ডব পক্ষেই যোগ দিয়ে বসেন কি না, এমন আশঙ্কার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। কৃষ্ণের দূতকর্ম যখন প্রায় ব্যর্থ হল, সেই সময় গান্ধারী তো পরিষ্কার দুর্যোধনকে বলেছিলেন—তোমার বন্ধু ওই সূতপুত্র কর্ণ, কিংবা দুঃশাসন জীবনেও পাণ্ডবদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। স্বয়ং কৃষ্ণও দুর্যোধনকে শাসিয়ে গেছেন তাঁর, দুঃশাসনের এবং কর্ণের অভদ্র ভাষা এবং ব্যবহারের জন্য, বিশেষত যে ভাষা কর্ণ ব্যবহার করেছিলেন পাশা খেলার আসরে কুলবধূ দ্রৌপদীর প্রতি। কৃষ্ণ স্পষ্টতই বলেছেন, সে ভাষা ছোটলোকের ভাষা—নৃশংসানাম্ অনার্যানাং পুরুষাণাঞ্চ ভাষণম্।

কিন্তু গান্ধারীর নিরপেক্ষ বাক্য, কৃষ্ণের শাসানি এবং ভীষ্ম-দ্রোণের মতো পুরুষদের বিরুদ্ধতাও দুর্যোধন-কর্ণকে টলাতে পারেনি। তাঁরা এক সময় শান্তির দূতকে বেঁধে রাখার কল্পনাও করেছিলেন—দুর্যোধনস্য কর্ণস্য...ইদমাসীদ্ বিচেষ্টিতম্। কৃষ্ণ বুঝেছিলেন, সব বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন যে, দুর্যোধনের যত মেজাজ, তা বোধহয় সবটাই কর্ণের জন্য। একটা সময় এল যখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ কুরুসভার সমস্ত মানুষগুলিকে আপন ব্যক্তিত্বে বিমূঢ় করে দিয়ে কর্ণকে তুলে নিলেন আপন রথে—আরোপ্য চ রথে কর্ণং প্রায়াৎ সাত্যকিনা সহ। কুরুসভার ছেলে-বুড়ো সবাই জল্পনা কল্পনা করতে লাগল—কী হল, কৃষ্ণ কর্ণকে হঠাৎ তুলে নিয়ে গেলেন কেন—ব্যাপারটা কী ?

দৌত্য সেরে ফিরে যাবার সময় কৃষ্ণ কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বীরমাতার মতো কুন্তী এতকাল ধরে যে অবিচার হয়ে আসছে তাঁর ছেলেদের ওপর, সে সব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কুন্তী কৃষ্ণের মাধ্যমে পুত্রদের উত্তেজিত করার চেষ্টাও করেছেন। পাশা খেলার সময় কুরুসভায় পাঞ্চালীর ওপর যে ধর্ষণাত্মক ব্যবহার চলেছে তার প্রতিকার চেয়েছেন কুন্তী। কিন্তু মজা হল, এই সমস্ত অপমানগুলির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—কৌরব পক্ষের কারও নাম না করে। কারণ নাম করতে গেলেই সেখানে কর্ণের কথা আসবে। এ কী দ্বিধায় পড়েছেন কুন্তী! পুত্রবধূর ওপর যে অপমান হয়েছে তিনি তার প্রতিকার চান, অথচ এই মুহূর্তে তিনি দোষীদের নাম করতে পারছেন না ; অন্যদিকে তিনি এও বুঝতে পারছেন যে, যুদ্ধের সময় এগিয়ে আসছে, কৃষ্ণের শান্তির বাণী ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন কী হয়, কী হয়! কৃষ্ণ কুন্তীর কথা শুনে কী বুঝলেন কে জানে! তিনি হঠাৎ এসে কর্ণকে তুলে নিলেন নিজের রথে। নগরের বাইরে নির্জন প্রান্তে এসে রথ থামালেন। অনুগামী যদুবীরেরা দূরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, শুধু কৃষ্ণ কর্ণকে নিয়ে পৌঁছলেন নগরের বাইরে। কর্ণের সঙ্গে আরম্ভ হল গভীর আলোচনা এবং তাও অনেকক্ষণ ধরে—মন্ত্রয়ামাস চ তদা কর্ণেন সুচিরং সহ।

কৃষ্ণের বলাটা ছিল অদ্ভুত। নরমে, গরমে, স্তুতিবাদে, টোপ ফেলে, সব রকমভাবে কৃষ্ণ কর্ণকে দুর্যোধনের থেকে বিযুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, যে কথাটা আজ পর্যন্ত তাঁকে কেউ বলেনি, সে-কথাটা কৃষ্ণ বললেন কী করে! কৃষ্ণ বললেন—কর্ণ! তুমি বিদ্বান এবং বিচক্ষণ মানুষ। সনাতন ধর্ম, বেদবাদ, ধর্মশাস্ত্র সবই তুমি জান এবং জান বলেই এখন যা বলছি, তা নিজের সঙ্গে মেলাতে তোমার অসুবিধে হবে না। কৃষ্ণ বললেন জান তো কর্ণ! শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করে, সেই মেয়ের যদি অবিবাহিতা কুমারী অবস্থায় কোনও পুত্র থেকে থাকে তাহলে বিবাহিত পুরুষটি সেই পুত্রেরও পিতা হয় অর্থাৎ একই স্ত্রীলোকের কুমারী এবং বিবাহিত অবস্থায় যতগুলি পুত্রই জন্মাক, সবগুলিরই পিতা হবেন পাণিগ্রহণকারী পুরুষটি। এই নিয়মে কর্ণ তুমি কিন্তু মহারাজ পাণ্ডুরই ছেলে—পাণ্ডোঃ পুত্রো'সি ধর্মতঃ—কারণ তুমি তোমার জননী কুন্তীর কুমারী কালের পুত্র।

কর্ণ একটুও চমকালেন না। সারা জীবন যাঁকে জন্মের লাঞ্ছনা ভোগ করে সূতজাতির কলঙ্ক-পঙ্কে তিলক রচনা করে জীবনের পথে চলতে হয়েছে, তাকে আগেই সব জানতে হয়। গ্লানির মধ্যে যে সন্তানকে চলতে হয়, সে সন্তান নিজেই তার জন্ম রহস্য ভেদ করে। কর্ণও তাই সব জানতেন, সব জেনেও পাথর-প্রতিমার মতো স্থির হয়ে কেবলই সংসারের কূটবুদ্ধি যাচাই করতে লাগলেন। ভাবটা এই—আমি ছাড়া অন্যেও তা হলে কেউ জানে এ রহস্য, তবে এতকাল ধরে সূতপুত্রের গালাগালিটা কেমন ন্যাকামো! যাই হোক কৃষ্ণ বলতে থাকলেন—নিয়ম অনুসারে কর্ণ তোমারই কিন্তু রাজা হওয়ার কথা—এহি রাজা ভবিষ্যসি। তা ছাড়া তোমার 'ফ্যামিলি-প্রেস্টিজ' কিছু কম নয়। তোমার পিতৃকুলে আছেন পাণ্ডবেরা, মাতৃকুলে আছি আমরা, বৃষ্ণিবংশের পুরুষেরা। তুমি ভাই আজকে আমার সঙ্গে চল, তোমাকে তোমার পাঁচ ভাই সবার বড় দাদা বলে জানুক—অভিজানন্তু কৌন্তেয়ং পূর্বজাতং যুধিষ্ঠিরাৎ।

কর্ণ যদি ভাবেন এমনি উটকো গিয়ে পাণ্ডবদের ভাই ভাই করলে কেউ যদি ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি করে কৃষ্ণ তাই শত-শতাংশ কথা দিয়ে বললেন—আরে, সবাই তোমার পায়ে পড়ে যাবে, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই তাদের ছেলেপুলেরা, এমনকী আমরাও তোমার পায়ে পড়ে থাকব—পাদৌ তব গ্রহীষ্যন্তি সর্বে চান্ধক-বৃষ্ণয়ঃ। উত্তেজনার আতিশয্যে কৃষ্ণ প্রস্তাব দিলেন—যে রাজারা আজকে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা বরঞ্চ তোমার অভিষেকের জোগাড় করুন, মাঙ্গলিক বিধান করুক রাজকন্যারা, আর দিনের ষষ্ঠভাগে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে প্রেমনত নয়নের দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লবের মতো তখন তিন ভুবনের সেরা সুন্দরী দ্রৌপদী এসে দেখা করুক তোমার সঙ্গে—ষষ্ঠে ত্বাং

চ তথা কালে দ্রৌপদী উপগমিষ্যাতি।

কৃষ্ণ জানেন—দ্রৌপদীর ওপর কর্ণের লোভ ছিল। পরবর্ত্তীকালে দ্রৌপদীর ওপর যত আক্রোশ দেখা গেছে কর্ণের, সেও দ্রৌপদীকে না পাওয়ার কারণেই। তবু যদি কর্ণের মনে এমন ভাবনা আসে যে—এতকাল তাকে পেলুম না, আর এখন এই মাঝ বয়সে এসে, যখন প্রেম প্রায়ই দাম্পত্য অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়, এখন সেই প্রথম যৌবনের স্বপ্ন দেখানো—এতে কি যন্ত্রণা কিছু কমে, যন্ত্রণা আরও বাড়ে। কৃষ্ণ তাই কথা পরিবর্তন করে বললেন—তা হলে কী বল, ধৌম্য পুরোহিত অভিষেকের মন্ত্র পড়ুন, আমরাও সবাই অভিষেকের জোগাড় করি। তোমার যুবরাজ হবেন যুধিষ্ঠির, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন তিনি। তোমার মাথায় রাজচ্ছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন মহাবলী ভীমসেন, তোমার সাদা ঘোড়ার রথ চালাবেন স্বয়ং অর্জুন, আর আমরা সবাই থাকব তোমার অনুগামী হয়ে। সবার শেষে কৃষ্ণ বললেন—তুমি রাজা হও, নিজের রাজ্যপাট সামলাও আর তৃপ্ত কর জননী কুন্তীর পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়খানি—প্রশাধি রাজ্যং কৌন্তেয় কুন্তীঞ্চ প্রতিনন্দয়,—দূর হোক সমস্ত শত্রুতা, ভাই ভাই মিলে যাক।

খট করে কর্ণের কানে বাজল—'কৌন্তেয়'। এতকাল তো কেউ তাঁকে কুন্তীর ছেলে বলে ডাকেনি, সবাই বলেছে রাধেয়—রাধার ছেলে। সারা জীবন লাঞ্ছনা সয়ে আজকে যদি হঠাৎ কুন্তীর ওপর সোহাগে মা মা বলে ডেকে ওঠেন কর্ণ, তবে সে আদিখ্যেতা বুঝি তাঁর নিজেরই সইবে না। কর্ণ বললেন—আজকে তুমি ভালবেসে, আপন সখার মতো আমার ভাল চেয়ে যা কিছু বললে, সে সব আমি জানি—সর্বঞ্চৈব অভিজানামি। আমি জানি, আমি পাণ্ডুর ছেলে—পাণ্ডোঃ পুত্রো'স্মি ধর্মতঃ। আমি জানি আমার জননী কুন্তীর কুমারী কালের গর্ভে ভগবান ভাস্করের ঔরসে আমার জন্ম। আমি জানি, হ্যাঁ জানি যে, সূর্যদেবের কথামতই আমার জননী আমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন—আদিত্যবচনাচ্চৈব জাতং মাং সা ব্যসর্জয়ৎ। কিন্তু আমার মা কী ভেবে আমাকে বিসর্জন দিলেন—যথা ন কুশলং তথা ? কাজেই ধর্মত পাণ্ডুর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, মায়ের প্রথম ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, আমি যদি মায়ের প্রথম সন্তানকামী হৃদয় থেকে মুছে যাই,—কুন্ত্যা ত্বহম্ অপাকীর্ণঃ—সেখানে আজ হঠাৎ তাঁকেই মা মা বলে সোহাগ দেখানো আদিখ্যেতা নয় কি ?

কর্ণের এই অভিমান স্বাভাবিক। আগেই বলেছি কর্ণের জীবনে দুটি নারীর বিশেষ ভূমিকা আছে এবং সে ভূমিকা তাঁর জীবন জটিলতর করার। দ্রৌপদী কর্ণের যৌবনের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন, তাঁর ওপরে আক্রোশ দেখিয়ে। অন্যদিকে সেই দ্রৌপদীকে অপমান করে, কর্ণের আক্রোশ খানিকটা প্রশমিতও হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু জননী কুন্তী, তাঁকে যে অপমানও করা যায় না আবার সওয়াও যায় না। কর্ণ বললেন—সূত অধিরথ আমাকে এনে জননী রাধার হাতে দিয়েছিলেন। আমাকে দেখামাত্র সূতজননীর-স্নেহস্তন্য আপনি ঝরে পড়েছিল—সদ্যঃ ক্ষীরমবাতরৎ। তিনিই শৈশব অবস্থায় আমার গু-মুত কেচে মানুষ করেছেন—সা মে মূত্র পুরীষঞ্চ প্রতিজাগ্রহ মাধব। সব বুঝে-সুঝে আজকে হঠাৎ আমি তাঁর ঋণ মুক্ত হয়ে চলে যাই কী করে ? তা ছাড়া সেই যে সূত অধিরথ, তাঁকেই তো আমি পিতা বলে জানি। তিনি পিতার মতো জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন সব করিয়েছেন, যৌবনে মেয়ে খুঁজে খুঁজে বিয়ে দিয়েছেন। সেই বিবাহিতা স্ত্রীদের গর্ভে আমার তো ছেলে-পিলেও আছে। আমার সেই পরিণীতা স্ত্রীদের আমি ভালবাসি, কৃষ্ণ—তাসু মে হৃদয়ং কৃষ্ণ সঞ্জাতং কামবন্ধনম্। কর্ণের ভাবটা এই যে, এতকালের বিয়ে-করা বউ যাঁরা, যাঁরা এতদিন যৌবনের ভোগ, সুখ, আনন্দ—সব দিয়েছেন হঠাৎ তাঁদেরকে নীচে ঠেলে বড় ঘরের সুন্দরী বউ দ্রৌপদীকে যদি আজকে বড় আপনার বলে মনে করি, তা হলে আমিই আমি থাকি না। সারথির ঘরে আমি লালিত, সারথির ঘরে আমার বিয়ে, সারথির ঘরের নীতি-নিয়ম আমার মজ্জায় মজ্জায়। কাজেই আজ আর ফিরে যাবার পথ নেই।

কর্ণ-চরিত্রের পক্ষে এই সময়টা হল একদিকে ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ অন্যদিকে সঙ্কট মোচনের এক চূড়ান্ত বিন্দু। মহাভারতের কবি এতদিন তাঁকে জন্মের লাঞ্ছনায় ভুগিয়ে, দুর্যোধনের মতো দুঃসঙ্গে পুষ্ট করে, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা আর অহমিকায় বর্ধিত করে সমস্ত নীতি-পরায়ণ মানুষদের কাছ থেকে

একেবারে একাকিত্বে এনে ফেলেছেন। মিথলজিষ্টদের ভাষায় একে 'হেরোইক আইসোলেশন্' বলব কিনা জানি না, তবে 'আইসোলেশন' তো বটেই। এই 'আইসোলেশনে'র বড় প্রয়োজন ছিল কর্ণের চূড়ান্ত মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। হিংসা-প্রতিহিংসার অন্তরে কর্ণ যে কতবড় মানুষ, সেটা বুঝি প্রতিতুলনায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এতদিন কর্ণের গায়ে শত কালিমা লেপন করা হয়েছে। ঠিক এই অংশে এসে মহাভারতের কবি তাঁর কবি-হৃদয়ের সমস্ত সম্মান উজাড় করে দিয়েছেন কর্ণের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি কৃষ্ণের কথায় প্রণয় ছিল, সৌহার্দ্য ছিল, সান্ত্বনাও ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল কিছু প্যাঁচও। ইঙ্গিতজ্ঞ কর্ণ সে প্যাঁচ বুঝেছেন এবং সেইখানেই তাঁর মাহাত্ম্য। অনেক কথার মাঝে কৃষ্ণ বলেছিলেন—তোমায় আমরা সবাই মিলে রাজার আসনে বসাব, যুধিষ্ঠির হবেন তোমার যুবরাজ—যুবরাজস্তু তে রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। কর্ণ বললেন—আমার এই ছোট সংসারের মোহগণ্ডী পেরিয়ে আমার আর ফিরে যাবার উপায় নেই কৃষ্ণ। আমি চাই, তুমিও আমার এই জন্মের রহস্য এতকাল পরে আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সামনে প্রকাশ কোরো না। তাঁকে যতটুকু জানি, তাতে সেই ধর্মভীরু মহাত্মা যদি জানতে পারেন যে, আমিই কুন্তীর বড় ছেলে, তা হলে কিছুতেই তিনি আর রাজা হবেন না। আর আমার দিক থেকে বিপদ হল, আমি রাজা হলে কখনই যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করতে পারব না, রাজা তো তিনি হবেনই না। আমি রাজা হলে এই সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ রাজ্য আমাকে তুলে দিতে হবে দুর্যোধনের হাতে—স্ফীতং দুর্যোধনায় এব সম্প্রদদ্যামরিন্দম। তাই বলি যুধিষ্ঠির রাজা আছেন, তিনিই রাজা থাকুন।

কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ ঘটতে যাচ্ছে কর্ণ তার ফল জানেন। কর্ণ জানেন যে, সে যুদ্ধে জয়ী হবে পাণ্ডব পক্ষই। জীবন মৃত্যুর সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে কর্ণ আজ কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করেছেন—আমি এতকাল পাণ্ডবদের যে জঘন্য কটু কথা শুনিয়েছি, তা সবই দুর্যোধনকে তুষ্ট করার জন্য এবং সে জন্য আমার অনুতাপও আছে—প্রিয়ার্থং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য তেন তপ্যে হ্যকর্মণা। কর্ণ বললেন—যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, সে যুদ্ধ হবেই। এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াটাই আমার আনন্দ। তুমি যাও, কৃষ্ণ। সমস্ত রহস্য যা তুমি জান, চেপে রাখ নিজের মধ্যে। নিয়ে এস কুন্তীপুত্র অর্জুনকে, যার সঙ্গে যুদ্ধ হবে আমার—সমুপানয় কৌন্তেয়ং যুদ্ধায় মম কেশব।

কৃষ্ণ যেন এবার একটু শাসনের সুরে কথা বললেন। যুদ্ধের সময়ে পঞ্চপাণ্ডব যে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর হবেন এবং সে তীক্ষ্ণতা থেকে যে রক্ষা নেই কর্ণের, রক্ষা নেই কুরুকুলের কারও—সে কথাটাও বুঝিয়ে দিলেন বেশ করে। কর্ণ একটুও ভয় পেলেন না, উল্টে রীতিমতো জ্যোতিষ-চর্চা করে বুঝিয়ে দিলেন—জয় হবে পাণ্ডবদেরই, কৌরবদের নয়। কর্ণ দুঃস্বপ্নে দেখেছেন একে একে কৌরবের সব সেনাপতি অর্জুনের গাণ্ডীবের আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। এই স্বপ্ন কর্ণ সত্য বলেই মনে করেন। তিনি একদিকে স্বীকার করেন যে, ভারত যুদ্ধের নিমিত্ত কারণ তিনি নিজে, দুঃশাসন এবং শকুনি এবং অন্য দিকে মরণের মুখে ঝাঁপ দিয়ে কৃষ্ণকে বলেন—অন্তকালে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে স্বর্গভূমিতে—অথ বা সঙ্গমঃ কৃষ্ণ স্বর্গে নো ভবিতা ধ্রুবম্।

আচ্ছা, আমরা যদি এমন একটা কাল্পনিক ব্যবস্থা করি যে, কর্ণ কৃষ্ণের কথা শুনে, পঞ্চপাণ্ডবকে নিজের ভাই বলে মেনে পাণ্ডব শিবিরে রাজা হতে এসেছেন, তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হত। হ্যাঁ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়তো সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞানে তক্ষুনি তাঁকে শাসিতার আসন ছেড়ে দিতেন, কিন্তু ধরুন ভীমের কথা। যে ভীমের খাওয়া নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে, চলা-বলা, সব নিয়ে এতকাল দুঃশাসন-দুর্যোধনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসেছেন, সে নাকি তাঁর আপন ভাই, তাঁকে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে ? যে অর্জুনের সঙ্গে চিরকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন, যে তাঁর বিবাহের প্রথম গ্রাসটি কেড়ে নিয়েছে, যাঁর বিবাহিতা পত্নীকে তিনি সবার মধ্যে উলঙ্গ করার আদেশ দিয়েছেন, সে নাকি তাঁর আপন ভাই, তাঁকে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে ? সবার ওপরে দ্রৌপদী, প্রথম প্রেমেই যে তাঁকে বিবাহ করতে প্রত্যাখ্যান করেছে, যে প্রত্যাখ্যানের আক্রোশে প্রথম সুযোগেই তিনি যাঁকে 'বেশ্যা' বলে চিহ্নিত করেছেন, যাঁর সঙ্গে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে ব্যবহারও করেছেন বেশ্যার মতো, সে নাকি তাঁর স্ত্রী, তাঁকে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে ? তাই আমরা বলি কি—দুর্যোধনের প্রতি

নিষ্ঠাবশত বন্ধুকৃত্য করবার জন্য তো বটেই, এমনিতেও পাণ্ডব শিবিরে দাদা বলে উপস্থিত হওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি কর্ণের ছিল না, কিংবা সেটা বাস্তবসম্মতও ছিল না। বেঁচে থেকে এই রকম বিপ্রতীপ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে, মরণও তাঁর কাছে শ্রেয় ছিল, তাই কর্ণ মরতেও চেয়েছেন, দুর্যোধনের পক্ষে থেকে বিরোধিতার প্রদর্শনী করে মরতে চেয়েছেন।

ওদিকে আরেক বিপদ হল। কুরুসভা থেকে কৃষ্ণ চলে যাবার পর পরই মহামতি বিদুর এসে উপস্থিত হলেন কুন্তীর ঘরে। তিনি এসেই আপন মনে গজরাতে লাগলেন—আর কি, যুদ্ধ লেগে গেল বলে। এই দুর্যোধন কারও কথা শোনে না, ধৃতরাষ্ট্রের আস্কারায় একেবারে মাথায় উঠে গেছে। তার মধ্যে জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি—এরা সবাই কুবুদ্ধি দিয়ে উস্‌কে দিচ্ছে দুর্যোধনকে। ব্যস, বিদুরের সমালোচনায় অনেকগুলো নাম শোনা গেল বটে, তবে কুন্তীর কর্ণশূল উৎপাদন করার জন্য একটা নামই ছিল যথেষ্ট—কর্ণ। তাঁর নিঃশ্বাস দৃঢ়তর হল, দুঃখ গভীরতর। পাঁচটি অভব্য ছেলের মধ্যে নিজের ছেলের অভব্যতাই যেমন জননীর বুকে বাজে, ঠিক সেই ভাবেই কুন্তী মনে মনে বলতে লাগলেন—দুর্যোধনের সঙ্গে থেকে থেকে ছেলেটা আমার বয়ে গেল। যুদ্ধ লাগলে কী অনর্থই না ঘটবে! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—এঁরা সবাই দুর্যোধনের পক্ষ হয়ে লড়বেন বটে কিন্তু আচার্য দ্রোণও তাঁর পরম প্রিয় শিষ্যদের গায়ে হাত তুলবেন না, ভীষ্মও এড়াতে পারবেন না পাণ্ডুর ঘরের নাতিদের ওপর তাঁর স্নেহ। কিন্তু মুশকিল করেছে ওই কর্ণ। দুর্যোধনের সঙ্গে পড়ে তারই মোহে সে নিজের ভাই পাণ্ডবদের সঙ্গে ঝগড়া করে যাচ্ছে। ছেলের ক্ষমতাও আছে যথেষ্ট কিন্তু সেই ক্ষমতার জোরে সে অনর্থে মন দিয়েছে। তা এতদিন যা করেছে, করেছে, কিন্তু সে যে পাণ্ডবদেরই চরম সর্বনাশে মন দিয়েছে, এতেই আমার মন পুড়ে যাচ্ছে।

কুন্তী ঠিক করে ফেললেন। এতদিন যা বলেননি, এবার তা বলতে হবে। কুন্তী ভাবলেন—আমি সব গুছিয়ে বলব। ভগবান ভাস্করের কথা, দুর্বাসার মন্ত্র-কথা, কর্ণের জন্ম, তাকে বিসর্জন—সব গুছিয়ে বলব। সে আমার কুমারী গর্ভের ছেলে, হাজার হোক আমি তো তাকে পেটে ধরেছি। সে আমার মুখ চেয়ে, ভাইদের হিতের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় আমার কথা শুনবে—কস্মান্ন কুর্যাদ্‌ বচনং পশ্যন্‌ ভ্রাতৃহিতং তথা। মনে মনে সব ঠিক করে কুন্তী যখন কর্ণের কাছে পৌঁছলেন, তখন অপরাহ্ণ হয়ে এসেছে প্রায়। কর্ণ তখনও বেদ মন্ত্রে স্তুতি করে যাচ্ছেন সূর্যদেবকে। সূর্যের তাপ আজ বড় প্রখর। জননী কুন্তীকে প্রখর মধ্যাহ্নসূর্য মাথায় বয়ে আসতে হয়েছে। শুষ্ক পদ্মমালার মতো মুখ-চোখ শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁর। ভাগীরথীর তীরে পুবমুখী কর্ণের সূর্যবন্দনা দেখে কুন্তী অপেক্ষা করতে লাগলেন। শ্বেতশুভ্র আঁচলখানি দিয়ে সূর্যের কিরণ থেকে কেবলই তিনি আড়াল করে রাখছিলেন নিজেকে—অতিষ্ঠদ...উত্তরবাসসি। হয়তো কন্যাবস্থার এই নায়ককে অতি তাপযুক্ত দেখলে এখনও কুন্তীর বড় লজ্জা করে। সূর্য কিরণের স্পর্শ অন্য কোনও গভীর অনুভূতি বয়ে নিয়ে আসে বুঝি। তাই হয়তো উত্তরীয়ের আড়াল খোঁজা। মধ্যাহ্ন কেটে গিয়ে যেই সূর্য পুবমুখী বসা কর্ণের পিঠের ওপর পড়ল, ওমনি বুঝি অপরাহ্ণের ঘণ্টা বেজে কর্ণের সূর্য-পূজা শেষ হল—আপৃষ্ঠতাপাদ্‌ জপ্‌ত্বা সঃ। তিনি পশ্চিম দিকে ঘুরে বসতেই দেখেন—কুন্তী। বিস্ময়ে, আনন্দে, অভিভূত কর্ণ অভিবাদন জানালেন কুন্তীকে। কর্ণ এই চেয়েছিলেন। তিনি মায়ের পরিচয় জানা সত্ত্বেও আপনা আপনি গিয়ে সোহাগী হবেন না, মাকেই একদিন আসতে হবে তাঁর কাছে। মা এসেছেন। কর্ণ বললেন—আমি রাধা মায়ের ছেলে, অধিরথের ছেলে, কর্ণ। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ভদ্রে—রাধেয়ো'হম্‌ আধিরথিঃ কর্ণস্ত্বাম্‌ অভিবাদয়ে। বলুন আপনার জন্য আমি কী করতে পারি—ব্রূহি কিং করবাণি তে।

একেবারে 'অফিসিয়াল' কথা, এতটাই 'অফিসিয়াল' যে কুন্তী আর কোনও ভণিতা করার সময় পেলেন না। একেবারে প্রথম আক্ষেপেই তাঁকে বলতে হল—না, বাবা, না। তুমি রাধার ছেলে নও, কুন্তীর ছেলে—আমার ছেলে। অধিরথ তোমার বাবা নন, তুমি মোটেই সারথি ঘরের ছেলে সূতপুত্র নও। তুই আমার কোল-ছেঁচা ধন, আমার প্রথম ছেলে। আমার বিয়ে হয়নি, তখন তুই জন্মেছিলি। তাও এখানে নয়, সেই কুন্তিভোজ রাজার ঘরে। এই যে সূর্যদেব, সব কিছু প্রকাশ

করাই যাঁর কাজ, তিনিই তুই হয়ে আমার পেটে এসেছিলি। সহজাত কবচ-কুণ্ডল ধারণ করে তুই আমার বাবার ঘরে থাকতেই জন্মেছিলি আমার কোলে। আর আজ নিজের ভাইদেরই তুই চিনিস না। ভাইদের ছেড়ে যে মোহে তুই দুর্যোধনের সেবা করছিস, সে ঠিক হচ্ছে না বাছা। বাপ-মাকে সন্তুষ্ট করা ছেলের কাজ। তুই বাবা ফিরে আয় পাণ্ডবের ঘরে। যে বিপুল সম্পত্তি একদিন অর্জুন দিগবিজয়ে জিতে এনেছিল, সে সম্পত্তি এখন ছলনার গ্রাসে দুর্যোধনের ঘরে। তুই সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে ভাইদের সঙ্গে ভোগ কর। পৃথিবী আজ দেখুক, দুই বিরোধী গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ দুই বীর কর্ণ আর অর্জুন আজ এক জায়গায়। ঠিক যেমনটি যাদবদের ঘরে বলরাম আর কৃষ্ণ, তেমনি আমাদের ঘরে কর্ণ আর অর্জুন—কর্ণার্জুনৌ বৈ ভবেতাং যথা রামজনার্দনৌ। তুই আমার সবার বড় ছেলে, সমস্ত গুণে গুণী। এতকাল যে সূতপুত্র বলে তোকে ধিক্কার করেছে লোকে, দূরে যাক সেই শব্দ—তুই পার্থ। পৃথার ছেলে—সূতপুত্রেতি মা শব্দঃ পার্থস্ত্বমসি বীর্যবান্।

সহৃদয় পাঠক ! আমাদের কর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণের এই অংশে কবিগুরুর কর্ণ-কুন্তী সংবাদ স্মরণ করিয়ে দিলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মহাভারতের কমলকলি থেকে এক মহাকবির হৃদয়ের মধু সঞ্চিত করে যে মধুকর বাংলা কবিতায় তা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে সহজ, সরল কর্ণ গেছেন হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যেমন মহাভারতের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ থেকে তাঁর কাব্যতথ্য সঞ্চয় করেছেন, তেমনি কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদের অনেক জিনিসও এসে গেছে বাংলায় কর্ণ-কুন্তী সংবাদের মধ্যে। তার ওপর আছে কবির আপন মনের মাধুরী। মহাভারতের কর্ণ কুটিল ব্যঞ্জনায়, গূঢ় ভাবের অভিব্যক্তিতে কুন্তীকে জর্জরিত করেননি, বরঞ্চ তাঁর মর্মে আঘাত করেছেন একেবারে সোজাসুজি। এমনকী কুন্তী আপন সচেতন বক্তব্য বুঝিয়ে বলার পর ভগবান ভাস্কর সেই আকাশ থেকেই কুন্তীকে সমর্থন জানিয়ে কর্ণকে মায়ের কথা শুনতে বলেছিলেন, কিন্তু কর্ণের অবস্থা তাতে কিছু পালটায়নি। পিতার দ্বিতীয়া বিবাহিতা পত্নীকে মাতৃহীন বয়স্ক যুবক যেমন অদ্ভুত চোখে দেখে, যেমন চাঁচাছোলা কথা বলে, ঠিক তেমনিভাবে কর্ণ উত্তর দিলেন কুন্তীকে।

কর্ণ বললেন—আমি আপনার কথায় একটুও পাত্তা দিই না—ন চৈতৎ শ্রদ্দধে বাক্যম্। আপনার কথামত কাজ করলে ধর্ম তো দূরের কথা, অধর্ম হবে আমার। আপনি যে অন্যায় পাপ আমার জন্মলগ্নেই আমার ওপর করেছিলেন, তার জন্যেই আজকে আমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে পারি না। আপনি সেদিন আমাকে বিসর্জন দিয়ে, সমস্ত দুর্নামের ভাগী করেছেন আমাকে—অপাকীর্ণোঽস্মি যন্মাতস্তদ্ যশঃ কীর্তিনাশনম্। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেছিলাম, কিন্তু আপনার জন্যেই আমি কোনও ক্ষত্রিয়ের সংস্কার লাভ করতে পারিনি, আপনি ছাড়া অতি বড় কোনও শত্রুও আমার এত বড় ক্ষতি করত না—ত্বৎকৃতে কিন্নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যান্ মমাহিতম্। যে সময়ে আমার ক্ষত্রিয়োচিত জাতকর্মাদি সংস্কার করা উচিত ছিল, সে সময় আপনি কিচ্ছুটি করেননি, এখন আপনি আপনার নিজের কাজের জন্য আমাকে অনুরোধ করছেন। কই, আগে তো আপনি মায়ের মতো কোনও স্নেহ-ব্যবহার করেননি, আর আজকে নিজের কাজ গুছোনোর জন্য খুব ভালভালাই করে 'ছেলে ছেলে' বলে ডাকছেন—সা মাং সম্বোধয়সি অদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী।

কুন্তী ভাবতেও পারেননি, এতটা ফিরে পাবেন। তিনি ভেবেছিলেন—কর্ণকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে, পুত্রের কর্তব্য স্মরণ করালেই সে তাঁর শূন্য বুকে ফিরে আসবে। কিন্তু জন্ম-না-জানা পুত্রের দুঃখটা যে কী, তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। বস্তুত কর্ণের কথা এখনও শেষ হয়নি। তিনি বললেন—অর্জুন আর কৃষ্ণ এক জায়গায় হলে কে না ভয় পায় ? কিন্তু আজকে যদি আমি অর্জুন-কৃষ্ণের গুষ্টিতে যোগ দিই, তা হলে লোকে আমাকেও ভিতু ভাববে। তা ছাড়া বাপের জন্মে যার ভাই-বেরাদর বলে কিছু ছিল না, হঠাৎ যুদ্ধের সময় তার পাঁচ পাঁচটা পাণ্ডব ভাই ভুঁইফোড়ের মতো উদয় হল, আর আমিও 'ভাই ভাই' করে হামলে পড়লাম—এ-কথা শুনে ক্ষত্রিয়-সুধীজনেরা বলবেটা কী—অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ। পাণ্ডবান্ যদি গচ্ছামি কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি ॥

কর্ণের আর একটা 'পয়েন্ট' আছে, সেটা হল বাস্তবতার কথা। তাঁর কথা হল পাণ্ডবপক্ষে গেলে

তাঁর বাড়-বাড়ন্তটা নতুন করে কী হবে ? একথা তিনি কৃষ্ণকেও বলেছেন, কুন্তীকেও বললেন। তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন—ধৃতরাষ্ট্রের কুলে দুর্যোধনের ছত্র-ছায়ায় থেকে এই তেরোটা বছর আমি রাজার মতো নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের সুখই পেয়েছি—ময়া ত্রয়োদশ সমা ভুক্তং রাজ্যম্ অকণ্টকম্,—সেই দুর্যোধন যখন এই যুদ্ধে আমার ওপরেই ভরসা করছে, তখন তাঁকে আমি বঞ্চনা করতে পারি না—অনৃতং নোৎসহে কর্তুম্। আজকে কর্ণ কুন্তীকে একই কথা বললেন—ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে, যে সম্মান কেউ দেয়নি সেই সম্মান দিয়েছে, আমার কোনও ইচ্ছেই তারা না পুরিয়ে রাখেনি—সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পূজিতশ্চ যথাসুখম্। সেই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা, যারা এখন আমার ওপর ভরসা করে যুদ্ধে নেমেছে, তাদের আমি ফেরাব কী করে ? এ হয় না, হতে পারে না। বরঞ্চ সময় এসেছে, যতটা তারা করেছে, তার কিছুটা ফিরিয়ে দেবার।

ইঙ্গিতটা কুন্তীর দিকেই। তুমি কিছু করনি, তোমাকে ফিরিয়ে দেবারও কিছু নেই। বস্তুত পিতা-মাতা যে বাল্যকালে অসহায় শিশুর মূত্র-পুরীষ ঘেঁটে পুত্রকে মানুষ করেন, সেই সময়েই নিজের কাছে তাঁরা পুত্রের ঋণ তৈরি করে দেন। পুত্র বড় হয়ে পিতামাতার কাছে তাঁর জন্ম-ঋণ শোধ করতে না পারলেও, কিছুটা শোধ করতে পারে—তাঁদের সেবা করে, তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে কুন্তী সে দাবি তো করতে পারেনই না এবং সেই সব বড় বড় কথা বলার তাঁর এক্তিয়ারই নেই, যা অন্য সাধারণ মা-বাবাও বলতে পারে। বিশেষত তিনি যে বলেছিলেন, পিতা-মাতার কথা পুত্রের শোনা উচিত—সে কথার যথার্থতা নস্যাৎ হয়ে যায় কর্ণের যুক্তিতে। কর্ণ বললেন—যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। আপনার কথাগুলি খুব যথার্থ, খুব মিষ্টি বাণীর মতো শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু আপনি যা বলছেন তা আমি কিছুতেই করব না—ন করোম্যদ্য তে বচঃ।

কর্ণের জেদ চেপে গেল। কৃষ্ণও তাঁকে একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গির জন্যই হোক কিংবা তিনি অন্য লোক বলেই হোক, কর্ণ তাঁর সঙ্গে অতি মধুর ব্যবহার করেছিলেন। আলোচনা চলেছিল সৌহার্দ্যের সূত্র ধরে। কিন্তু এতদিন পরে নিজের মাকে সামনে পেয়েও তাঁকে তিনি ভালবাসতে পারলেন না ! উল্টে ফেটে পড়লেন ক্রোধে। ক্রোধের কারণও বুঝি ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, কুন্তী যে এখনও কর্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, সেও যে বড় জননীর মমতা-রসে, তা নয়। এখানেও তাঁর স্বার্থবুদ্ধি কিছু ছিল। তা ছাড়া একেবারে জন্মলগ্নেই যে ছেলেকে বিসর্জন দিয়েছেন, তার প্রতি মমত্বও তাঁর সেইভাবে জন্মায়নি, যা দিন-প্রতিদিনের অভ্যাসে, ব্যবহারে জন্মায়। এখানে তাঁর শুধু এই স্বার্থবোধ কাজ করছে যে, কৌরবপক্ষের সাধারণ অন্য কারও পক্ষে ভীম-অর্জুনদের মারাই সম্ভব নয়। ভীষ্ম এবং দ্রোণ, পুত্র কিংবা শিষ্য-স্নেহের কারণে খানিকটা হাত গুটিয়ে থাকবেন। যদিও তাঁদের হত্যা করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কর্ণের তো সে সব বালাই নেই, সে সুযোগ পেলেই অর্জুন কিংবা ভীমকে হত্যা করবে, বিশেষত অর্জুনের সঙ্গে তাঁর চিরকালের টক্কর। এই অবস্থায় আপন পাঁচ পুত্রকে খানিকটা বিপন্মুক্ত করতেই কর্ণের কাছে কুন্তীর আসা। এই স্বার্থবুদ্ধি অতি কূটস্থ হলেও কুন্তীর অন্তরে তা ছিল এবং কর্ণ বুঝি তা বুঝতেও পেরেছিলেন। কর্ণ হাজার হলেও বীর, হাজার হলেও দাতা, অতএব এতকাল পরে ফিরে-পাওয়া মাকে তিনি খালি হাতে ফিরে যেতে দেননি। বললেন—তোমার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, অর্জুন ছাড়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব—এদের কাউকেই আমি মারব না, অসহ্য হলেও না। কিন্তু অর্জুনকে হয় আমি মারব, নইলে তার মতো বীরের হাতে মৃত্যুবরণ করে যশের ভাগী হব। তবে হ্যাঁ তোমার পাঁচ ছেলে, পাঁচটাই থাকল—হয় অর্জুন থাকবে না, আমি থাকব। নয়তো আমি থাকব না, অর্জুন থাকবে—নিরর্জুনা সকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি।

এই এতক্ষণে বোধহয় কুন্তীর স্বার্থবুদ্ধি কিছুটা লুপ্ত হল। আপন পুত্রের পরুষ-পৌরুষ বাক্যে এবার হয়তো তিনি খানিকটা বুঝলেন যে, শুধু বাক্য দিয়ে জননীত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সারা জীবন লাঞ্ছিত পুত্রের অভিমান বুঝে এবারে তাঁর বুক ভেঙে কান্না এল। ভাবী যুদ্ধফল প্রত্যক্ষ করে তিনি দুঃখে কাঁপতে থাকলেন—কুন্তী দুঃখাৎ প্রবেপতী। মনে মনে পুত্রস্থানে অর্জুন-কর্ণের ব্যক্তি পরিবর্তন করে কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—সবই আমার কপাল—দৈবন্তু বলবত্তরম্। চার

ভাইয়ের জীবন সম্বন্ধে অভয় পেলাম তোর কাছে, এখন তোদের দুজনের মধ্যে কে থাকে, কে জানে ! তোর ভাল হোক বাবা, তোর মঙ্গল হোক। মাতা-পুত্রের একবার মাত্র আলিঙ্গনের পর দুজনে দুজনের পথ ধরলেন। যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠল।

কর্ণ-কুন্তী সমাগম সংবাদ কেউ জানল না। যুদ্ধের সাজ-সাজ রবে পাণ্ডব-কৌরব সকলেই ব্যস্ত। এরই মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম সেনাপতির পদে বৃত হলেন। কিন্তু সেনাপতি হলে হবে কী, কুরুপক্ষে ভীষ্ম আর কর্ণের পুরনো ঝগড়াটা মোটেই মেটেনি। ভীষ্ম কিছুতেই কর্ণের সঙ্গে এক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল—হয় কর্ণ আগে যুদ্ধ করুন, নয়তো আমি—কর্ণো বা যুধ্যতাং পূর্বমহং বা পৃথিবীপতে। এরই মধ্যে একদিন কুরুকুলের রাজবাড়িতে বসে সমস্ত যোদ্ধারা কৌরবকুলের প্রধান যোদ্ধাদের বলাবল নির্ধারণ করছিলেন। সেনাপতি হিসেবে এ ক্ষেত্রে ভীষ্মকেই প্রশ্ন করে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। ভীষ্ম হিসেব-নিকেশ ভালই করেছিলেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য কে কত ক্ষয় করতে পারে, এই নিয়মে কৌরবপক্ষের প্রধান পুরুষদের কাউকে 'রথ', কাউকে 'অতিরথ', কাউকে বা 'মহারথ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন ভীষ্ম। ক্রম অনুসারে ভীষ্ম দুর্যোধনের দুটি নাম-না-জানা ভাইকেও 'রথ' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কর্ণের কথা উঠতেই ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন,—বললেন এইজন্যে যে, এখন তাঁর মওকা, তিনি সেনাপতি,—ভীষ্ম বললেন—তবে, তোমার যে পরাণের বন্ধু কর্ণ—সখা তে দয়িতো নিত্যং, সে কিন্তু 'রথ'ও নয়, 'অতিরথ'ও নয়। সে তোমাকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সব সময় উসকে দিচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে ও মানুষটা বাক্যি দেয় বেশি এবং তার স্বভাবও অত্যন্ত নীচ। এই বৈকর্ত্তন কর্ণ তোমাকে চালনা করে। তোমার বুদ্ধিদাতা মন্ত্রীও সে বটে। কিন্তু মনে রেখ সে 'রথ'ও নয়, 'অতিরথ'ও নয়—এষ নৈব রথঃ কর্ণো ন চাপ্যতিরথো রণে।

বৈকর্ত্তন কর্ণ। কথাটার মধ্যে ইঙ্গিত আছে। সহজাত কবচ আর কুণ্ডল নিজের গা থেকে কেটে দিয়েছিলেন বলেই, কর্ত্তন করে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর বিশেষণ বৈকর্ত্তন। কিন্তু ভীষ্ম যেটা ইঙ্গিত করলেন, সেটা তাঁর নিজের ভাষায়—কবচ আর কুণ্ডল হারানোর ফলে কর্ণের অর্ধেক শক্তি গেছে কমে। তার ওপরে আছে পরশুরামের অভিশাপ, হোম-ধেনু-হারানো সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপ—সময়কালে কোনও দিব্যাস্ত্র তাঁর স্মৃতিতে আসবে না—এ অবস্থায় সেই মূর্খ, পরনিন্দুক কর্ণের কী বাকি থাকল ? তবু যদি 'রথ', 'অতিরথ' বলে মার্কা মারতে চাও তার গায়ে, তবে কর্ণ শুধু 'অর্ধরথ' ছাড়া আর কিছুই নয়। মহামতি দ্রোণ কর্ণের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন পূর্বে। তিনি ভীষ্মের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করে উদাহরণ দিয়ে বললেন—যা বলেছেন ভীষ্ম। প্রত্যেক যুদ্ধেই এর হুঙ্কার শোনা যাবে—ওই নাকি সবাইকে শেষ করে দেবে, কিন্তু প্রত্যেকটা বড় যুদ্ধ থেকে ও সরে পড়েছে—রণে রণে'ভিমানী চ বিমুখশ্চাপি দৃশ্যতে। কাজেই ভীষ্ম যে বলেছেন—'অর্ধরথ'—ঠিকই বলেছেন তিনি। ভীষ্ম-দ্রোণের কথা থেকে বোঝা যায় যে, যুদ্ধের মুখে সেনাপ্রধানদের অন্তঃকলহ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কর্ণ নিজে। রাগের চোটে চোখদুটি বড় করে কর্ণ ভীষ্মকে বলতে লাগলেন যেন ঘোড়ার ওপর চাবুক কষাচ্ছেন—তুদন্ বাগ্‌ভিঃ প্রতোদবৎ। কর্ণ বললেন—যথেষ্ট হয়েছে পিতামহ, যথেষ্ট। আমি নিজের মনে আছি, আপনি যখন তখন, আমাকে যে এইভাবে পদে পদে অপমান করছেন, এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং আমার ওপর রাগে—সদা দ্বেষাদ্ এবমেব পদে পদে। শুধু দুর্যোধনের মুখ চেয়ে আমি এতকাল সব ক্ষমা করেছি কিন্তু আর নয়। আরে ! আপনি আমাকে কাপুরুষ, খারাপ লোক, কত কিছুই না বলছেন, কিন্তু আমি বলছি—আপনি কোন মহারথ ? আপনিই 'অর্ধরথ'—ভবান্ অর্ধরথো মহ্যম্—অন্তত আমার কাছে তাই। সবাই বলে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মিথ্যা কথা বলেন না, কিন্তু আমার মতে আপনার প্রতিটি ব্যবহার মিথ্যাচার, কেননা চিরটা কাল আপনি কুরুকুলের বিরোধিতা করে গেলেন, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র বুঝলেন না। নইলে, এই যুদ্ধের সময় কি কেউ কারও হীনতা প্রমাণ করে, কিংবা কেউ কি এমনভাবে মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে ? আরে, বয়েসের ভার আর পাকা চুল দেখে—ন হায়নৈ র্ন পলিতৈঃ—রথ, মহারথ ঠিক হয় না, ওসব ঠিক হয় ক্ষমতায়, আপন ক্ষমতায়। ব্যক্তিগত রাগ আর ব্যক্তিগত মোহে, আপনি

আপনার যেমন ইচ্ছে—কাউকে রথ সাজাচ্ছেন, কাউকে মহারথ সাজাচ্ছেন, বকেও যাচ্ছেন তখন থেকে, যা ইচ্ছে বকে যাচ্ছেন।

ভীষ্মকে অনেকক্ষণ গালমন্দ করার পর কর্ণ দেখলেন, বলাটা বৃথা যাচ্ছে। তিনি তখন দুর্যোধনকে বলতে থাকলেন—দেখ দুর্যোধন সাফ কথা বলে দিচ্ছি—তাড়িয়ে দাও এই বদমাশটাকে—ত্যজ্যতাং দুষ্টভাবো'য়ম্—তোমার যত গণ্ডগোলের মূলে হল এইটা, নইলে এ সময়ে কেউ এমনিভাবে সামনাসামনি মনোবল ভেঙে দেয়? কোথায় রথ, অতিরথের বোধ আর কোথায় এই মাথামোটা ভীষ্ম—রথানাং ক্ক চ বিজ্ঞানং ক্ক চ ভীষ্মো'ল্পচেতনঃ। তাড়াও এটাকে, আমি একা তোমার পাণ্ডবসেনা সামাল দেব। এ বেটা বুড়ো ভাম, বয়স চলে গেছে—গতবয়া মন্দাত্মা—অথচ একা একাই লড়বে বলে ফুটুনি কচ্ছে—একাকী স্পর্ধতে নিত্যম্। হ্যাঁ, বুড়ো মানুষের কথা শোনা উচিত, ঠিক আছে। কিন্তু সে বুড়ো, এইরকম বুড়ো নয়। এরকম ধেড়ে বুড়োর কথা শোনা, আর বাচ্চা ছেলের কথা শোনা একই রকম। আমি বলে দিচ্ছি দুর্যোধন আমি কিছুতেই ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করব না। আমি যুদ্ধ করে মরব, আর সমস্ত 'ক্রেডিট'টা হজম করবেন সেনাপতি ভীষ্ম—যশো ভীষ্মং গমিষ্যতি,—তা হবে না। এই ভীষ্ম বেঁচে থাকতে আমি যুদ্ধ করছি না। ভীষ্ম মরবে, তারপর থেকে আমি যুদ্ধে নামব—হতে ভীষ্মে তু যোদ্ধাস্মি।

দুর্যোধন কিছুতেই ভীষ্ম আর কর্ণের উতোর চাপান থামাতে পারেন না। কিন্তু ক্ষতিটা তাঁরই হল। বস্তুত ভীষ্ম যদি পাণ্ডবদের গায়ে হাত না দিয়েও শুধুই অসংখ্য সৈন্য মেরে যেতেন, তা হলে সেই অবসরে কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের বিপদ ঘটাতে পারতেন অনেকটাই। কিন্তু তা হল না, দশদিনের সম্পূর্ণ যুদ্ধের পর ভীষ্ম মারা গেলেন এবং মহাভারতের ভীষ্মপর্বের শেষ অধ্যায়ে 'জন্মশয্যা'র মতো মৃত্যুশয্যায় শয়ান ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন কর্ণ। অত গালাগালি দিয়েছিলেন, তাই কর্ণের মনে আছে সংকোচ, সাশ্রুমুখে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের পায়ে এসে পড়লেন। বললেন—আমি রাধেয় কর্ণ, আপনার চোখের শত্রু। কথাটা শোনামাত্রই পক্ককেশ বৃদ্ধ, কুটিল বলিরেখায় আবৃত চক্ষুদুটি উঁচু করে একখানা হাতেই কর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন—জড়িয়ে ধরলেন আপন পুত্রের মতো—পিতেব পুত্রং গাঙ্গেয়ঃ পরিরভ্যৈকপাণিনা। বললেন—এস বাবা, এস। চিরটা কাল তুমি আমার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে প্রতিস্পর্ধিতা করে গেলে। এখন যদি এই মরণের সময়েও তুমি না আসতে আমার কাছে, ভাল হত না তোমার। ভীষ্ম এবার স্পষ্ট করে বললেন—আমি জানি, তুমি কুন্তীর ছেলে, সূর্যের তেজে তোমার জন্ম। তুমি রাধা কিংবা অধিরথ কারওই ছেলে নও। আমি এ সব কথা ব্যাসের মুখে শুনেছি। সত্যি কথা বলতে কী আমি কোনওদিন তোমার ওপর বিদ্বেষ পোষণ করিনি—ন চ দ্বেষো'স্তি মে তাত। কিন্তু তবু যে আমি তোমার মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তার কারণ হল—তুমি যে সব সময় পাণ্ডবদের নিন্দা করতে, এটা আমার সহ্য হত না। ব্যাপারটা কী হয়েছে জান—গুণী মানুষদের ওপর সব সময় যে তোমার একটা বিদ্বেষ আছে, এক ধরনের ঈর্ষা আছে, এর কারণ হল, স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক নিয়মে তোমার জন্ম হয়নি—জাতো'সি ধর্মলোপেন। এর ওপরে তুমি যাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছ সে নীচ লোক। এই সব কারণেই কুরুসভার নানা জায়গায় তোমাকে আমি বিস্তর বাজে কথা বলেছি—রুক্ষং শ্রাবিতঃ কুরুসংসদি।

একমাত্র এই বৃদ্ধ মানুষটি, যিনি চিরকাল কর্ণকে গালমন্দ করে এসেছেন, তিনিই কিন্তু কর্ণচরিত্রের আসল মনস্তত্ত্বটি ধরতে পেরেছেন। সমাজের নিয়মের বাইরে কুমারী গর্ভে যার জন্ম হয়, সেই মানুষ যদি আবার স্বার্থপরায়ণ অহঙ্কারী বন্ধুর সাহচর্যে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠে, তবে তার মধ্যে নানান জটিলতা আসবে, পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে জাত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে সে সহ্য করতে পারবে না—এটা মেনে নিতেই হবে। এদিক দিয়ে ভীষ্মের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। কর্ণের বুদ্ধি-বিপর্যয়ের কারণ বলেই ভীষ্ম কিন্তু স্বীকার করলেন—আমি জানি, আমি জানি তুমি কতটা ক্ষমতা রাখ। তোমার মতো শক্তিমান পুরুষ দেবলোকেই বা কটা আছে? কিন্তু আসলে কী জান, এই বিরাট কুলের পিতামহ হিসেবে এসব কথা আমার বলার উপায় ছিল না, বললে—পাণ্ডবেরা আমাকে ভুল বুঝত, ভুল বুঝত কৌরবেরাও, কুলভেদ গভীরতর হত। বস্তুত অস্ত্রচালনায় তুমি অর্জুন, কি কৃষ্ণের

সমকক্ষ। এই স্বল্প-পরিসর জীবনে তুমি কতগুলো বড় যুদ্ধ একা জিতেছ, সেও আমি জানি। আমি বলি কি কর্ণ, তুমি আপন ভাইদের সঙ্গে আর বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে যেয়ো না। আমি মরেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধ শেষ হোক, তুমি ফিরে যাও ভাইদের কাছে।

এতদিন যাকে শত্রু বলে জেনে এসেছেন, তাঁর কাছে আপন জীবনের একটা ব্যাখ্যা পেয়ে, মরণোন্মুখ বীরের কাছে আপন অস্ত্র-নৈপুণ্যের জয়ঘোষ শুনে কর্ণ বড় খুশি হলেন বটে, কিন্তু সত্যিই তো, তাঁর কি আর ফিরে যাবার উপায় আছে ? খুব অল্প কথায় কর্ণ তাই তাঁর পুরনো যুক্তি প্রকাশ করলেন ভীষ্মের কাছে—সেই জন্মমাত্রেই কুন্তীমাতার পুত্রত্যাগের কথা, সূত পিতা-মাতার স্নেহমমতার কথা এবং সর্বশেষে এতকাল দুর্যোধনের খেয়ে-পরে, ভোগ করে, এই মুহূর্তে তাঁকে ত্যাগ করে কৃতজ্ঞতা ভঙ্গের কথা। কর্ণ তা পারেন না। সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরের যুক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম বুঝলেন। কর্ণ যেহেতু ভীষ্মকে অকথ্য গালাগাল দিয়েছিলেন, আজ তাই তাঁর কাছেই অনুমতি চাইতে এসেছেন—অনুজানীহি মাং তাত যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ম্। ভীষ্ম অনুমতি দিলেন এবং দুজনেই বুঝলেন যে, সমস্ত পুরুষকার, সমস্ত শৌর্য-বীর্যের ওপরেও আরও এক শক্তি মানুষের অন্তর্গত ললাটের রেখায় চিহ্নিত থাকে—তার নাম দৈব। কর্ণের পুরুষকার কর্ণের স্বায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও, এই দৈববলেই তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু। দুইই পরেচ্ছায় সম্পন্ন—জন্ম, কুন্তী-সূর্যের আপন সম্ভোগবাসনার চরিতার্থতায়। মৃত্যু, দুর্যোধনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে, তাঁরই কেটে যাওয়া পথ ধরে। অথচ কর্ণ দৈব মানেন না।

আমরা যুদ্ধের কথা বেশি বলতে চাই না। তবে এটুকু বলা দরকার যে, দশদিন যুদ্ধ করে ভীষ্ম রণক্ষেত্রে শায়িত হবার পর কর্ণ কিন্তু দারুণ বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। মজা হল, ভীষ্ম শরশয্যার পর কৌরবপক্ষের সমস্ত রাজপুরুষেরা এবং কৌরবেরা সবাই কিন্তু কর্ণকেই একমাত্র ভীষ্মের সমান বলে মনে করেছিলেন। এমনকী সেনাপতি হিসেবে দ্রোণের কথাও কারও মনে আসেনি। উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজপুরুষই তখন 'কর্ণ' 'কর্ণ' বলে ডাকছিলেন কারণ ভীষ্মের নৌকো ডুবে যাবার পর কর্ণই ছিলেন রণ-সাগর পাড়ি দেবার ভেলা। তা ছাড়া অনেকেই এটা ভাবছিলেন যে, দশদিন এই মহাযুদ্ধে কিছুই না করায় কর্ণ শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে অনেক 'ফিট' আছেন, অতএব ভীষ্মের পর তিনিই একমাত্র লোক যাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করা যেতে পারে। কৌরবদের সেই বিপন্ন মুহূর্তে শরশয্যায় শায়িত স্বয়ং ভীষ্ম পর্যন্ত কর্ণকে কৌরববন্ধুদের আশ্রয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উপমা দিয়ে বলেছেন, সমস্ত নদীর কাছে কর্ণ যেন সমুদ্রের মতো, সমস্ত আলোর মধ্যে কর্ণ যেন সূর্যের মতো অবলম্বন—জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ।

কিন্তু বললে হবে কী, কর্ণ কিন্তু এতদিনে বাস্তব অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছেন, বিশেষত ভীষ্মের পতনের পর তাঁর এই উপলব্ধি গভীরতর হয়েছে। হ্যাঁ, একদিকে তিনি তাঁর স্বভাবমতই বলে যাচ্ছিলেন যে, পাণ্ডবযোদ্ধাদের তিনি রণক্ষেত্রে হত্যা করবেন। কিন্তু অন্যদিকে সম্পূর্ণ বাস্তববোধে কর্ণ স্বীকার করেছিলেন যে, ভীষ্ম ছাড়া কৌরবযোদ্ধাদের মধ্যে আর কেউই তেমন নেই যে রণক্ষেত্রে অর্জুনের বাণ রোধ করতে পারে—কো হ্যর্জুনং যোধয়িতুং ত্বদন্যঃ। কর্ণ বুঝতে পেরেছেন যে, ভীষ্মহীন কৌরবসৈন্যকে এবং স্বয়ং কৌরবদেরও অর্জুন একেবারে ছারখার করে দেবেন—ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রধক্ষ্যন্তি তথা বাণাঃ কিরীটিনঃ। তবু কর্ণের মতো ক্ষত্রিয় বীর যে যুদ্ধে পিছুপা হবেন না, এ তো সবাই জানে। তার ওপরে কৌরবশিবিরে সমস্ত যোদ্ধারা যেখানে 'কর্ণ' 'কর্ণ' বলে তারস্বরে চিৎকার করছেন, সেখানে কর্ণের মতো মহাবীর যে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সোজাই উপস্থিত হবেন, এতেও আশ্চর্য নেই কিছু। কর্ণের ব্যাপারে অনুগত রাজাদের উচ্চকিত আহ্বান শুনে দুর্যোধনই বা কী করেন ! আমাদের ধারণা, দুর্যোধনের মধ্যে এই বোধ সম্পূর্ণ ছিল যে, ভীষ্মের পরে দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিত। কিন্তু সবাই এমন 'কর্ণ', 'কর্ণ' বলে চেঁচাচ্ছে যে তিনি শেষ পর্যন্ত কর্ণের ওপরেই ছেড়ে দিলেন সেনাপতি চয়নের ভার। কর্ণ বন্ধুর মন বোঝেন, উপযুক্ত বাস্তববোধও তাঁর আছে। তিনি বললেন—দুর্যোধন ! তোমার পক্ষে অনেকেই আছেন যাঁরা সেনাপতি হবার উপযুক্ত, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সবাই সমান মাপের যোদ্ধা, তাই একজনকে সেনাপতি করলে আরেকজন মনে

মনে আহত হবেন এবং মনেপ্রাণে তোমার জন্য যুদ্ধ করবেন না—শেষা বিমনসো ব্যক্তং ন যোৎস্যন্তি হিতাস্তব। কিন্তু দেখ, এঁদের সবার মধ্যে সবচেয়ে গুণী মানুষ এবং গুরুজন হলেন দ্রোণ। অস্ত্রবিদ্যায় তিনি সবারই প্রায় গুরুস্থানীয়, তাঁকে সেনাপতি করলে কারওই কিছু বলার থাকে না। অতএব আচার্য দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিত।

বাস্তব অবস্থার বিচারে দেখা যেত দ্রোণকে বাদ দিয়ে কর্ণকে সেনাপতি করলে, দ্রোণ অবশ্যই আহত হতেন এবং তাঁর অহংবোধেও লাগত। কাজেই এক্ষেত্রে কর্ণের বুদ্ধি-কৌশল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আচার্যের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে কর্ণ বারবার পাণ্ডবদের পর্যুদস্ত করেছেন। অবশ্য শুধুই পর্যুদস্ত করেছেন বললে যুদ্ধের মূল কথাটাই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, দ্রোণপর্বের যুদ্ধে কর্ণ তো শুধুই জেতেননি অনেকবার পরাস্তও হয়েছেন, তাও অর্জুনের কাছে নয়, ভীমের কাছেই। জেতার মুহূর্তে ভীম নেচে কুঁদে কর্ণকে অনেক গালাগালি দিয়েছেন, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেও অন্যান্য পাণ্ডবদের ব্যাপারে কর্ণের সাধারণ নীতি ছিল 'ডিফেনসিভ্'। ব্যাসের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে সেটা দাঁড়ায়—মৃদুপূর্বঞ্চ রাধেয়ো দৃঢ়পূর্বঞ্চ পাণ্ডবঃ। বেশি 'ডিফেনসিভ্' যুদ্ধ করতে গেলে কখনও বা পরপক্ষের হাতে নাকালও হতে হয়, কর্ণ তা হয়েছেন, এমনকী তাঁকে পালাতেও হয়েছে। আবার কখনও বা একটু শিক্ষা দেওয়ার তাগিদে যখন ভীমের মতো বিরাট যোদ্ধাকে বিরথ এবং নিরস্ত্র করে দেন কর্ণ তখন অন্য এক অনভূতি তৈরি হয়। কর্ণ বলেন—ভীম! তুমি হলে গিয়ে লোভী মানুষ—ঔদরিক। যেখানে ভাল খাবার দাবার আছে, ভাল ভাল পানীয় আছে—যত্র ভোজ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ পাণ্ডব—সেইখানেই তুমি আদর্শ লোক, এই যুদ্ধক্ষেত্র তোমার উপযুক্ত নয়। কর্ণ এখানেই শেষ করলেন না, খোঁচা দিয়ে বললেন—তুমি আরেক কাজ করতে পার, ভীম! তুমি বনে চলে যাও। সেখানে যুদ্ধটুদ্ধর ঝামেলা নেই, বেশ ভাল থাকবে মুনিদের মতো, তুমি বনে চলে যাও—বনং গচ্ছ বৃকোদর।

এসব কটূক্তি, খোঁচা যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় চলে। কিন্তু সুযোগ পেলে এবং না পেলেও ভীম যাঁকে 'সূতপুত্র' ছাড়া ডাকতেন না, সেই ভীমের প্রতি এই মুহূর্তে কর্ণের কটূক্তিগুলি কিন্তু প্রচ্ছন্ন মমতাও বহন করে, যদিও এ মমতা সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যাই হোক জয়ে, পরাজয়ে, অন্যায়-আচরণে কর্ণ দ্রোণের সেনাপতিত্বে ভালই যুদ্ধ করলেন। অন্যায়ের কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, যিনি কুরুপাণ্ডবের একমাত্র যোগ্য বংশধর হতে পারতেন, সেই অভিমন্যুবধে কর্ণের অবদান ছিল বিরাট। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কর্ণের রথের চাকা যখন আটকে গেছে মাটিতে, সেই সময় কর্ণ ধর্মের কথা তুলেছিলেন—অর্থাৎ সেই অবস্থায় তাঁকে হত্যা করাটা যে অর্জুনের মতো বীরের পক্ষে অধর্ম হবে, সেই কথাটা তুললেন। এর উত্তরে কর্ণের জীবনে হাজারো অন্যায় আচরণের মধ্যে সপ্তরথী মিলে বালক অভিমন্যুকে হত্যা করার কথাটাও বলেছিলেন কৃষ্ণ। বলেছিলেন—সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল—ক্ক তে ধর্মস্তদা গতঃ। দ্রোণপর্বে এই অভিমন্যুবধের পর পরই কৌরবপক্ষের জয়দ্রথ বধের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বড় ঘটনা ঘটে, কিন্তু সে ঘটনার একটা পূর্বপট আছে, সেটা আগে বলি।

সোজা কথা, পঞ্চপাণ্ডব, বিশেষত ভীম এবং অর্জুনকে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছিল না। তার মধ্যে কৌরবদের কাছে আরেক নতুন উৎপাত এসে দাঁড়াল। ভীমপুত্র ঘটোৎকচের উদয় হল কোথা থেকে, আর সমস্ত কৌরবসৈন্যের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে গেল। এমনকী দ্রোণ, অশ্বত্থামার মতো বড় বড় বীরেরাও তাকে কিছু করতে পারছেন না। কৌরবপক্ষের হাল যখন খুবই খারাপ, এই সময়ে কুরুরাজ দুর্যোধন যেন আর দ্রোণের সেনাপতিত্বে বিশ্বাস রাখতে পারছিলেন না। পাণ্ডবদের যুদ্ধোন্মাদ দুর্যোধনের মনে এমন শঙ্কা জাগিয়েছিল যে, দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত দ্রোণের সেনাপতিত্বকালেই কর্ণকে ত্রাণকর্তা হিসেবে ধরে নিলেন। অনেকের সামনেই তিনি কর্ণকে বলে বসলেন—আমাদের বাঁচাও কর্ণ! কৌরব যোদ্ধাদের তুমি বাঁচাও। পাণ্ডবেরা সবাই মিলে আমাদের একেবারে বিষাক্ত সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে, আমাদের তুমি বাঁচাও—ত্রায়স্ব সমরে কর্ণ সর্বান্ যোধান্ মহারথান্।

শুনেছি, মরণকাল এগিয়ে আসলেও স্বভাব পরিবর্তিত হয় না। কর্ণ তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দুর্যোধনকে হামবড়াই করে বলতে আরম্ভ করলেন। এটা ভাবলেন না যে, দিন প্রতিদিনের যুদ্ধে বৃদ্ধ গুরু দ্রোণাচার্য পর্যন্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। এই অবস্থায় নিজের ক্ষমতা বীরত্ব সম্বন্ধে বেশি বলা মানে সেই পুরনো ঝগড়া চেতিয়ে তোলা। আমরা বেশ বুঝি কর্ণের কবচ-কুণ্ডল খোয়া গেলেও তিনি অতিমাত্রায় নির্ভর করছিলেন ইন্দ্রের দেওয়া সেই একাঘ্নী বাণটির ওপর। কিন্তু তাই বলে—অহম্—আমি একা অর্জুনকে মেরে ফেলব কোনও চিন্তা নেই, অর্জুনের বাবা আসলেও আমাকে রুখতে পারবে না—এই কথাগুলি মাত্রাছাড়া। কর্ণ বললেন—পাণ্ডবদের মেরে, পাঞ্চালদের শেষ করে তোমাকে জয় এনে দেব আমি। জান তো সেই একাঘ্নী বাণটির কথা। সব পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে অর্জুনই যা একটু ক্ষমতা রাখে—তার ওপরে সেই একাঘ্নী বাণটি ছাড়ব। অর্জুন মরে গেলে অন্য পাণ্ডবেরা হয় বনে চলে যাবে নয়তো তোমার বান্দা হয়ে থাকবে। চিন্তা নেই—সমাশ্বসিহি ভারত—আমি একা সমস্ত পাণ্ডবদের ঠাণ্ডা করে দেব—অহং জেষ্যামি সমরে সহিতান্ সর্বপাণ্ডবান্। আমি বেঁচে থাকতে—ময়ি জীবতি কৌরব্য—তোমার দুঃখ কিসের, দুর্যোধন?

যেখানে বিভিন্ন ব্যূহ-প্রতিব্যূহ সাজিয়ে, নিজে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের কিছু করতে পারছেন না, সেখানে কর্ণের এই দম্ভোক্তি যে দ্রোণাচার্য এবং তাঁর প্রিয়জনদের ক্রুদ্ধ করে তুলবে, এতে আশ্চর্য কী! বিশেষত দ্রোণের শ্যালক বয়োবৃদ্ধ কৃপাচার্য এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, যিনি নিজে কর্ণের থেকে কম বীর নন, তাঁরা কর্ণের এই সাহঙ্কার আত্মম্ভরিতা সহ্য করবেন কেন! কৃপাচার্য তো কর্ণের কথা শুনে প্রায় হাততালি দিয়ে উঠলেন। বললেন—দারুণ বলেছ, কর্ণ, দারুণ, দারুণ—শোভনং শোভনং কর্ণ—বুঝতে পারছি দুর্যোধন আর অনাথ নয়। তবে হ্যাঁ কথা দিয়ে আর বাক্যি মেরেই যদি পৃথিবী জয় হয়ে যেত, তা হলে তো ভালই হত—বচসা যদি সিধ্যতি। এই দুর্যোধনের সামনে তোমার এমনিধারা বচন-গর্জন অনেক শুনেছি কিন্তু তোমার বিক্রমও কোথাও দেখিনি কিংবা এই বচনের ফলও কিছু হয়নি। কৃপাচার্য আবার সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে তুললেন, কারণ রাগটা তাঁর রয়েই গেছে। কৃপ বললেন—এমনতো নয় যে, অর্জুনের সঙ্গে তোমার কোনওদিন সামনাসামনি যুদ্ধ হয়নি। যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই তুমি হেরেছ। তুমি একা অর্জুনকেই সামলাতে পার না, সেখানে ভাবছ কৃষ্ণসহায় সমস্ত পাণ্ডবদের তুমি মারবে।

কৃপাচার্য এবার একটু রেগেই উঠলেন। বললেন—দেখ কর্ণ! যুদ্ধ করতে হয় কর, তবে মুখে এত বেশি ফটর-ফটর কোর না—অব্রুবন্ কর্ণ যুধ্যস্ব কত্থসে বহু সূতজ। তোমার সমস্ত তর্জন-গর্জন শরৎকালের মেঘের মতো আড়ম্বর-সার মৌখিকতা। তা বেশ, অর্জুনকে যতক্ষণ না দেখছ, ততক্ষণ তোমার এই চিল্লানি চালিয়ে যাও—তাবদ গর্জস্ব রাধেয় যাবৎ পার্থং ন পশ্যসি—অর্জুনকে যখন সামনে দেখবে তখন আর তোমার গলা দিয়ে শব্দ বেরবে না। দেখ কর্ণ—ক্ষত্রিয়রা বাহুবলে নিজের বীরত্ব দেখায়, আর মুখে বীরত্ব দেখায় বামুনেরা—বাগ্‌ভিঃ শূরা দ্বিজাতয়ঃ,—তেমনি অর্জুন তার ক্ষমতা দেখায় ধনুকের মুখে, আর কর্ণ! তোমার মতো স্ব-প্রতিষ্ঠিত বীর মনে মনেই সেই ক্ষমতা দেখায়—কর্ণঃ শূরো মনোরথৈঃ।

কর্ণ আর থাকতে পারলেন না। বললেন—আমি গর্জাচ্ছি তো তাতে তোর কী হয়েছে রে, বিটলে বামুন—তব কিং তত্র নশ্যতি। যা বলেছি, ঠিক বলেছি, পাণ্ডবদের মেরে এই পৃথিবী আমি অবশ্যই দুর্যোধনকে দেব। কৃপ আবার প্রতিবাদ করলেন। পাণ্ডবদের নানা ক্ষমতা এবং জনবল, অস্ত্রবলের পরিচয় দিলেন। কিন্তু কর্ণ তাতে মোটেই দমবার পাত্র নন। এবার তিনি একাঘ্নী বাণের কথাটা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এবং আরও জানিয়ে দিলেন যে, ওই অমোঘ বাণই হবে অর্জুনের কাল। বাস! এটুকু বললেই হত, কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে কর্ণ মাথা গরম করে কৃপকে 'চ্যালেঞ্জ' করে বললেন—আমার এলেম বুঝেই আমি চেঁচিয়েছি, তুই বেটা বামুন, বুড়ো-হাবড়া, যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই—ত্বন্তু বিপ্রশ্চ বৃদ্ধশ্চ অশক্তশ্চাপি সংযুগে—ফের যদি আবার উল্টোপাল্টা কথা শুনি—বক্ষ্যসে ভূয়ো মমাপ্রিয়মিহ—তা হলে তোর জিব কেটে দেব মাথামোটা—জিহ্বাং ছেৎস্যামি দুর্মতে।

আমরা জানি—যে একবীরঘাতিনী শক্তিটির ওপর এত নির্ভর করছিলেন কর্ণ, সেটি তাঁকে খোয়াতে হয়েছে ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধেই। ঘটোৎকচ এমন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলেন যে, সমস্ত কৌরবেরা সেদিনকার রাত্রিযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত সৈন্যেরা পালিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে যাচ্ছিলেন বড় বড় যোদ্ধারা। কৌরবেরা সবাই মিলে সমস্বরে সেদিন কর্ণকে ইন্দ্রদত্ত শক্তি প্রয়োগ করতে বলেছিলেন, না হলে সেদিন তাঁরা মারা পড়তেন—শক্ত্যা রক্ষো জহি কর্ণাদ্য তূর্ণং নশ্যন্ত্যেতে কুরবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ। কর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, ঘটোৎকচও মারা পড়েছিল, কিন্তু কর্ণের কঠিন কথাগুলি কৃপাচার্যকে যেভাবে বিদ্ধ করেছিল, তার মূল্য ছিল আরও বেশি। কর্ণ যেভাবে কুলগুরু কৃপাচার্যের জিব ছিঁড়ে নিতে চেয়েছেন, তাতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা থেমে থাকেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খড়্গ নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন কর্ণের দিকে—খড়্গমুদ্যম্য বেগেন দ্রৌণিরভ্যপতদ্ ভৃশম্। নিজেদের মধ্যে বিশেষ করে কৃপাচার্য-অশ্বত্থামা এবং কর্ণের মধ্যে যে সম্বন্ধটা মোটেই ভাল ছিল না, সেটা তো অশ্বত্থামার ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। তিনি কর্ণের ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—শিরঃ কায়াদ্ উদ্ধরামি সুদুর্মতে। নেহাত দুর্যোধন কোনওমতে সব ব্যাপারটা চাপাচুপি দিয়ে দেন। নিজেদের মধ্যে এই যে গণ্ডগোল, তার ফলভোক্তা দুর্যোধন। বস্তুত তিনিই কর্ণকে এত দূর বাড়তে দিয়েছেন। দুর্যোধনের নিজের ভাষার লাগাম ছিল না, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যে তবু তাঁকে মেনে চলতেন, সে যুবরাজ বলে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে। কিন্তু কর্ণ যদি দুর্যোধনের মতোই দুর্বিষহ কথা বলেন, সেখানে কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামার কী দায় আছে তা শোনবার? কুরুগৃহে এঁরা যদি বাইরের লোক হন, তবে কর্ণও তাই। কাজেই দুর্যোধন যা বলতে পারেন, কর্ণ তা বলতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবে কর্ণ তাই বলতেন। এর ফল ভাল হয়নি। নিজেদের মধ্যে এই ঝগড়া কতটা বেড়ে গিয়েছিল, তার একটা চিত্র পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টনারায়ণ দিয়েছেন তাঁর বেণীসংহার নাটকে। কর্ণের সঙ্গে অশ্বত্থামার ঝগড়ার সময়টা যদিও নাট্যকার পালটে দিয়েছেন, তবু ঝগড়াটা চলেছে মহাভারতের সুরে এবং এই ঝগড়াটা সচেতন নাট্যকারের চোখ এড়িয়ে যায়নি বলেই বলতে পারি যে, এটা ছিল পরিণামে দুর্যোধনের পক্ষে ক্ষতিকর।

বেণীসংহার নাটকে অশ্বত্থামার সঙ্গে কর্ণের বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে দ্রোণবধের পরে। নাট্যকার একটা দারুণ যুক্তিসই কথাও এখানে কৃপের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। কৃপের মতে এখানে দ্রোণাচার্যের পর সেনাপতি হওয়া উচিত ছিল অশ্বত্থামার, কর্ণের নয়। পিতার মৃত্যুর পর স্বভাবতই তিনি রাগে টগবগ করে ফুটছিলেন, তা ছাড়া বীরত্বেও তিনি কর্ণের থেকে কম ছিলেন না এবং লোকান্তক ব্রহ্মশিরা অস্ত্রটিও ছিল তাঁর দখলে। কৃপাচার্য এই বীর যুবকটির পিতৃবধজনিত ক্রোধ এবং ক্ষোভ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়ে তাঁকে সেনাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে আসছিলেন দুর্যোধনের কাছে। কিন্তু দুর্যোধন এবং কর্ণ সেখানে পূর্বাহ্নেই ব্যস্ত ছিলেন আচার্য দ্রোণের সমালোচনায়। দ্রোণ কতটা বীর, কতটা স্বার্থপর, পাণ্ডবদের প্রতি তিনি উদাসীন কেন—এইসব কথা দুর্যোধনের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন কর্ণ। ঠিক এই সময়ে কৃপ এবং অশ্বত্থামার প্রবেশ। কর্ণের মতে, রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার বধ সংবাদ শুনেও আচার্য দ্রোণের অস্ত্রত্যাগ করা উচিত হয়নি। কর্ণ বললেন—তিনি নিজেই যেখানে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন, সেখানে অশ্বত্থামা! আপনি কী করবেন?

এ-কথা শুনে অশ্বত্থামা ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং কী কী তিনি করতে পারেন তার একটা কাল্পনিক চিত্র দিলেন। প্রায় এই রকম একটা অবস্থায় কৃপাচার্য প্রস্তাব করলেন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করতে। কিন্তু বেণীসংহারের নাট্যকার জানেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণের নিরিখে দুর্যোধন আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কাজেই দুর্যোধন যখন বললেন যে, কর্ণকে তিনিই আগেই সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করেছেন তখন কৃপের যুক্তি আমরা বুঝি। কৃপ বলেছিলেন—কর্ণের জন্য, শুধুমাত্র কর্ণকে তোয়াজ করার জন্য অশ্বত্থামাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না, কারণ শোকসন্তপ্ত অবস্থায় তাঁকে সেনাপতি করলে তাঁর পিতৃশোকের ভারও কিছু লঘু হত, অন্যদিকে তাঁর পিতৃশোকজনিত ক্রোধও ব্যবহার করা যেত পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে।

মহাভারতে কৃপাচার্যের এসব যুক্তিজাল বর্ণিত হয়নি, কিন্তু মহাকবির অন্তরে হয়তো বা তা কিছু ছিল, নইলে কর্ণকে সেনাপতি করার প্রস্তাব সেখানে অশ্বত্থামার মুখ দিয়েই এসেছে কেন ? যাই হোক বেণীসংহার নাটকেও অশ্বত্থামা শেষ পর্যন্ত সেনাপতিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। শুধু দুর্যোধনকে তিনি বলেছিলেন—আজ সকালের যুদ্ধে আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবেন—পৃথিবী অর্জুনহীন এবং কৃষ্ণহীন হয়ে গেছে—অকেশবম্ অপাণ্ডবং ভুবনম্। আজ থেকে আর যুদ্ধের কথা থাকবে না। বেণীসংহারের কর্ণ এবার ফুট কাটলেন—এসব কথা মুখে বলা সহজ, কাজে করা কঠিন, তা ছাড়া কৌরবশিবিরে অনেকেই এ কাজ করতে পারে। 'অনেকেই' বলতে কর্ণ নিজেকে অবশ্যই মনে করছেন। কারণ যে কথা তিনিই সচরাচর বলে থাকেন, সে কথা অন্যে বললে তাঁর পরশ্রীকাতরতা আসে। অশ্বত্থামা কর্ণের কথাটা মেনে নিয়ে বললেন, হয়তো শোকাবেগে তিনি এমন গর্বোক্তি করে ফেলেছেন, কোনও বীরের নিন্দা করাটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এতেও কর্ণ আবার উপদেশ দিয়ে বসলেন। বললেন—শোকার্তের কাজ চোখের জল ফেলা আর বীরের কাজ হল যুদ্ধে যাওয়া। তুমি আর প্রলাপ বোকো না—নৈবংবিধাঃ প্রলাপাঃ।

একে তো পিতৃশোক, তাতে সেনাপতিত্বও জুটল না, তার ওপরে এখন থেকেই কর্ণের কাছ থেকে সেনাপতির মতো উপদেশ। অশ্বত্থামা আর থাকতে পারলেন না। বললেন—ওরে রাধামায়ের গর্ভের ভার, সারথির বেটা—রাধাগর্ভভারভূত, সূতাপশদ। আমার নাম অশ্বত্থামা, দুঃখ হলে চোখের জলের উপদেশ দিচ্ছিস আমাকে। কেন, আমার এই অস্ত্রগুলো কি গুরুর অভিশাপে নির্বীর্য হয়ে গেছে, যেমনটি তোর হয়েছে। আমি কি তোর মতো এইমাত্র রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি ? আমি কি তোর মতো অপরের বংশ-স্তাবক সারথির ঘরে জন্মেছি।

এসব কথা শুনে কর্ণই বা আর থাকেন কী করে ? প্রথমতঃ বংশের কলঙ্কটা এড়াতে চেয়ে তিনি একটি কালজয়ী উক্তি করলেন। বললেন—আমি সূতই হই, আর সূতপুত্রই হই, কিংবা যাই হই না কেন—যো বা কো বা ভবাম্যহম্,—মানুষ কোন ঘরে জন্মাবে সেটা একেবারেই দৈবায়ত্ত, কিন্তু পৌরুষ জিনিসটা মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, আমি সেটাই করেছি—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্। কর্ণ যখন দেখলেন, তাঁর জাত তুলে কথা বলেছেন অশ্বত্থামা, তখন তিনিও তাঁর জাত তুলেই কথা আরম্ভ করলেন, কারণ জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণেরও তো কিছু দোষ আছে। কর্ণ বললেন—ওরে বেটা বাচাল বামুন, বৃথাই তুই অস্ত্র ধরেছিস। ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, আমি তো অস্ত্রত্যাগ করিনি, কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তোর বাপ পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল কেন হাত থেকে ? কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, কিন্তু ঝগড়ার সময় অনেক ঘটনাই এমন বিকৃত করে দেখা হয়। কিন্তু তাতে অশ্বত্থামা চুপ থাকবেন কেন ? সদ্য পিতৃশোক পাওয়া হৃদয়ে পিতার সম্বন্ধে এই উলটো কথা তাঁর ক্রোধ আরও বাড়িয়ে তুলল। আবার খুব খানিকটা জাত তুলে গালাগালি দিয়ে অশ্বত্থামা বললেন—আমার বাবা ভিতু ছিল, নাকি বীর ছিল, কিংবা এই যুদ্ধে তিনি কী করেছেন না করেছেন তা দুনিয়ার লোক জানে। আর সেই চরম যুদ্ধের সময়ে তিনি অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন কেন, তা জানেন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। কিন্তু সে যাই হোক, আমার বাবা যখন অস্ত্রত্যাগ করলেন, তখন তুই ছিলি কোথায়, কাপুরুষ কোথাকার।

সত্যি কথা বলতে কি, বেণীসংহারের কর্ণ দ্রোণকে বিশ্বাস করেন না। মহাভারতের কর্ণও প্রায় তাই। তবে মহাভারতে যদি বা কোথাও দ্রোণের প্রতি কর্ণের শ্রদ্ধাও আছে, বেণীসংহারের কর্ণের সে শ্রদ্ধা নেই। এই কর্ণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, দ্রোণ ভীষণ স্বার্থপর। তিনি অশ্বত্থামাকে পৃথিবীর রাজা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন এবং সেইজন্যেই আচমকা পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে হতাশ হয়ে অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন। কর্ণ দুর্যোধনের মাথাতেও তাঁর এই যুক্তি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, কেননা দুর্যোধন দ্রোণের অস্ত্রত্যাগের ব্যাপারে ব্রাহ্মণোচিত নরম স্বভাবকেই কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধনের ধারণা পালটাল এবং কর্ণ বললেন—পুত্র বিষয়ে দ্রোণাচার্যের এই উচ্চাশার কারণেই পাণ্ডবসৈন্য বধে তাঁর উপেক্ষা ছিল এবং জয়দ্রথ বধেও তিনি ছিলেন উদাসীন। এমনকী বেণীসংহারে কর্ণ দ্রোণের ব্যাপারে এতটাই সন্দেহপ্রবণ যে তিনি দ্রুপদ

এবং দ্রোণাচার্যের বাল্যকালের ঝগড়াকেও অন্যভাবে চিন্তা করেছেন। কর্ণ দুর্যোধনকে বুঝিয়েছেন যে, মহারাজ দ্রুপদ যে কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের রাজ্যে তাঁর বাসস্থান দেননি, তার কারণ হল দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের ওই কু-অভিপ্রায় জানতেন।

মহাভারত পড়ে অবশ্য কর্ণকে আমরা এইভাবে চিনব না। কিন্তু দ্রোণের সম্বন্ধে কর্ণের যে অনেক বক্তব্য ছিল এবং সে বক্তব্য যে দ্রোণ-চরিত্রের অনুকূল নয়, সেটা আমরা আগেই খানিকটা বুঝেছি। যাই হোক বেণীসংহারে অশ্বত্থামার মুখে কাপুরুষতার অভিযোগ শোনামাত্র কর্ণ একেবারে জ্বলে উঠলেন। বললেন—আমি কাপুরুষ, তাই না? আর তুমি খুব বীর, তোর বাপের কথা মনে হলে তোর বলবিক্রম সম্বন্ধে আমার খুব সন্দেহ হয় রে মূর্খ! নইলে শত্রু এসে তাঁর চুল টেনে ধরল আর তিনি মেয়েছেলের মত সবার সামনে চুপ করে বসে থাকলেন—সুচিরং স্ত্রিয়েব নৃপচক্রসন্নিধৌ। অশ্বত্থামা রাগে কাঁপতে কাঁপতে এবার দুর্যোধনের সামনেই সত্য কথাটা বলে ফেললেন। বললেন—ওরে সারথির বেটা, দুর্যোধনের প্রিয়পাত্র বলে এত বড় কথা! যে কোনও কারণেই হোক আমার বাবা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাধা দেননি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমি তোর মাথায় এই আমার বাঁ পা রাখছি, তোর ক্ষমতা থাকে তো সরিয়ে দে—শিরসি চরণ এষ ন্যস্যতে বারয়ৈনম্। অশ্বত্থামা এই কথা বলে মাটিতে বাঁ পাখানি দাপিয়ে বেড়ালেন বারবার অর্থাৎ কর্ণের মাথায় পা রাখার প্রতীকী অভিনয় করলেন। কর্ণ এবার সোজা শাণিত তরবারি বার করে নিলেন কোষ থেকে। তারপর ব্রাহ্মণত্বের মুখে ছাই দিয়ে বললেন—বেটা বাচাল বামুন, যদি তুই ব্রাহ্মণ না হতিস তা হলে আজ এতক্ষণে দেখতিস তোর বাঁ 'পা'টা কাটা পড়ে রয়েছে মাটিতে। বিবাদের চরম সীমায় অশ্বত্থামাও সব ভুলে বললেন—ও তুই বামুন বলে আমায় মারতে পারছিস না, তো নে এই আমি ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করলাম। বলেই অশ্বত্থামা নিজের পৈতে-টৈতে ছিঁড়ে ফেললেন—ইতি যজ্ঞোপবীতং ছিনত্তি। দুজনেই খড়্গ হাতে তেড়ে গেলেন দুজনের দিকে।

মহাভারতে কর্ণ কৃপর দিকে ধেয়ে গিয়েছিলেন খড়্গ হাতে, আর অশ্বত্থামা কর্ণের দিকে ধেয়ে গেলেন খড়্গ হাতে। এই অবস্থায় দুর্যোধনের অনুনয়ে বিনয়ে শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষই শান্ত হল। বেণীসংহারেও তাই। কর্ণ সেনাপতি হলেন, অনেক যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তিনি এমনই ভাগ্যহত যে, যা তিনি মুখে বলেছেন এতদিন, তা তিনি কিছুই করতে পারেননি। আজকে তাঁর দেবদত্ত কবচ-কুণ্ডল নেই, ইন্দ্রের অমোঘ শক্তি নেই, মাথার ওপরে খাঁড়ার মতো ঝুলছে গুরু পরশুরামের অভিশাপ, হোমধেনু হারানো ব্রাহ্মণের অভিশাপ—এত কিছু বিরুদ্ধতা নিয়েও কর্ণ ভাবলেন—তিনি অর্জুনের বিরুদ্ধে জয়ী হবেন। অভিমানই কর্ণকে চিরকাল স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলিয়েছে, এই আত্মম্ভরিতার ওপরে দাঁড়িয়েই মহাবীর কর্ণ আজ কৌরবের সেনাপতি। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধের আনুক্রমিক ধারা বিবরণী দিতে দিতে সঞ্জয় পর্যন্ত একটুখানি বক্রোক্তির আভাস দিয়ে বলেছেন—আপনার ছেলে দুর্যোধন মনে মনে এই আশা করে আশ্বস্ত হয়েছেন যে, ভীষ্ম গেছে, দ্রোণ গেছে, তো কী হয়েছে, কর্ণ অবশ্যই পাণ্ডবদের জয় করবে—হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে' চ কর্ণো জেষ্যতি পাণ্ডবান্। কর্ণকে সেনাপতিত্ব দান করার সময় দুর্যোধন পরিষ্কার তাঁকে জানিয়েছেন যে, ভীষ্ম এবং দ্রোণের ওপর তিনি কোনওদিনই আস্থা রাখতে পারেননি। একে তো তাঁরা বৃদ্ধ, তার ওপরে অর্জুনের ওপরে তাঁদের পক্ষপাত ছিল—বৃদ্ধৌ হি তৌ মহেষ্বাসৌ সাপেক্ষৌ চ ধনঞ্জয়ে। এখন তো আর সেসব বালাই নেই, কাজেই দুর্যোধন কর্ণকে অপার প্রশংসা করে সেনাপতিত্বে বরণ করলেন। কর্ণের মধ্যে দুর্যোধন দেবসেনাপতি কার্তিককে দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন অসুর নিহন্তা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য, দেখতে পেয়েছেন দেবসহায় বিষ্ণুর পরাক্রম।

কিন্তু এত বিশ্বাস যেখানে, সেখানে বিশ্বস্ত জনের দায়িত্বও বড় বেশি বেড়ে যায়। অনেক গুণ, অনেক পরাক্রম এবং দুর্যোধনের অনন্ত বিশ্বাস নিয়েও কর্ণ দুর্যোধনের প্রাণপ্রিয় দুঃশাসনকে বাঁচাতে পারলেন না। বাঁচাতে পারলেন না নিজের ছেলেকেও। অনেক যুদ্ধ হল, অনেক লোকক্ষয় হল, কর্ণ অনেক যুদ্ধ করলেন কিন্তু দুর্যোধনের অনেক বিশ্বাসই তিনি পূর্ণ করতে পারলেন না, রাখতে পারলেন না আত্মবিশ্বাসও। অর্জুনের সঙ্গে শেষ এবং চরম যুদ্ধের আগে তিনি আরও একটা ভুল

করে ফেললেন মদ্ররাজ শল্যকে নিজের রথের সারথি নির্বাচন করে। শল্য নিঃসন্দেহে খুব ভাল সারথি ছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দেবার পরপরই তিনি কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, কর্ণের সারথ্য করার সময় তিনি কর্ণের মনোবল ভেঙে দেবেন। তাই হল। দুর্যোধনের মাধ্যমে কর্ণ শল্যকে সারথি পেলেন বটে। কিন্তু সারাটা কর্ণপর্ব জুড়ে কর্ণের চরম সমাপতন পর্যন্ত শল্য কেবলই কর্ণের কাছে ভ্যানভ্যান করে অর্জুনের প্রশংসা করে গেছেন, আর ক্রমাগতই কর্ণের মনঃস্থিতি নষ্ট হয়েছে। যুদ্ধকালে অথবা রথস্থ বীরকে যদি ক্রমাগতই ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, তবে অল্পসত্ত্ব ব্যক্তির পতন ঘটে, আর মহাসত্ত্ব ব্যক্তি, তিনি যতই যুদ্ধক্ষম হোন না কেন, তাঁর মনঃসংযোগ ব্যাহত হয়। প্রথম প্রথম যখন শল্য বলে যেতেন, তখন কর্ণ উদাসীনভাবে খানিকটা ধরে খানিকটা ছেড়ে দিয়ে শল্যকে বলতেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন চল দেখি—যাহি যাহীতি। কিন্তু শেষে তাঁর ধৈর্য চলে গেল এবং শল্যকে তাঁর দেশ তুলে, ব্যক্তিত্ব তুলে, অশ্লীল কথা বলে মাথা গরম করতে থাকলেন কর্ণ। মনঃসংযোগ ক্রমেই নষ্ট হতে থাকল। তিনি বাইরে যতই ভয়কে অস্বীকার করুন না কেন তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই এক অজানা, অনামা আশঙ্কা ছায়া ফেলতে লাগল।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কর্ণের সেনাপতিত্বকালে তাঁর ন্যায়নীতির দিকটা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। দেখুন, সারা জীবন ধরে যিনি দুর্যোধনের দুঃশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কত শত অন্যায় আচরণ করেছেন, পাণ্ডবদের প্রতি অসহ্য অত্যাচার করেছেন, তাঁদের প্রিয়তমা কুলবধূকে পর্যন্ত আপন বিকার থেকে রেহাই দেননি, সেই কর্ণ কিন্তু নিজের সেনাপতিত্বকালে কোনও অন্যায় করেননি, এমনকী সামান্য নীতিভঙ্গও নয়। অর্জুনের খাণ্ডবদহনের কালে যে সাপটি প্রতিশোধস্পৃহায় এসে কর্ণের তূণে আশ্রয় করেছিল, সেই সর্পমুখ বাণ কর্ণ অর্জুনের বিরুদ্ধে ছুঁড়েছিলেন নিজের অজান্তে—ন চাপি তং বুবুধে সূতপুত্রঃ। সেই সর্পবাণে অর্জুনের রেহাই ছিল না, তিনি বাঁচলেন শুধু কৃষ্ণের সারথ্যকৌশলে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সাপ আবার এসে কর্ণের তূণে প্রবেশ করতে চাইল এবং কর্ণকে সে অনুরোধ করল দেখেশুনে যাতে তাকে ঠিকমত অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়, কারণ ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে এই সর্পমুখ বাণ থেকে অর্জুনের রেহাই নেই। কিন্তু কর্ণ রাজি হননি, তার সেই চিরাচরিত বলদর্পিতাই কিন্তু এখানে তাঁর গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্ণ বললেন—অন্যের শক্তি আশ্রয় করে কর্ণ কোনওদিন কারও ওপরে জয়ী হতে চায় না—ন নাম কর্ণোঽদ্য রণে পরস্য বলং সমাস্থায় জয়ং বুভূষেৎ। একশোটা অর্জুনকে মেরে ফেলতে পারলেও কর্ণ কোনওদিন এক শর দুবার ধনুকে যোজনা করে না। কথাটা আরও একটু ঘটা করে একেবারে গুরু পরশুরামের নাম জড়িয়ে কর্ণ বলেছেন পরবর্তীকালের এক কবির লেখনীতে। কর্ণ বলেছেন—সারা গায়ে যেন জল পিছলে পড়ছে এমনিতর কর্ণ-বধির সাপ তুমি কর্ণকে চেননা—ন বেৎস্যপকর্ণ কর্ণম্—তুমি জান না যে পরশুরামের শিষ্য কর্ণ কখনও দু'বার একই শর সন্ধান করে না—দ্বিঃ সন্দধাতি ন শরং হরশিষ্য-শিষ্যঃ। সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে তুমিও বরং তাকিয়ে দেখ কী করে এই মানুষের উপযুক্ত শরপ্রহারেই কিরীটী অর্জুনের কিরীট-পরা মাথাটা আমি ধড় থেকে নামিয়ে দিই—মর্ত্যৈঃ শরৈরপি কিরীটি-কিরীটমাথম্।

পরবর্তী কবির লেখনীতে কর্ণের এই দম্ভোক্তির মধ্যেই কর্ণের চরিত্রটি মহাভারতের মতো করে পাব। এই যে কর্ণ বললেন—'মানুষের উপযুক্ত শর'—এই কথাটাই প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত কর্ণপর্বে কর্ণ একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছেন, যা তিনি হতে চেয়েছেন। যে মুহূর্তে কর্ণ কুন্তীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে হীনকুলে লালিত হতে লাগলেন, সেই মুহূর্তেই দৈবায়ত্ত জন্মের ওপরে কর্ণের ঘৃণা ধরে গেছে। দৈববশে নিজের জন্মের জন্যই যে মানুষ কলঙ্কিত, মহামতি ব্যাস একটু একটু করে সেই মানুষের সমস্ত দৈবাধীনতা হরণ করেছেন। সূর্যের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সেই পরিচয় থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন, তাঁর সহজাত দৈব কবচ-কুণ্ডল কেটে দিয়েছেন ইন্দ্রের হাতে, অমোঘ দৈব-শক্তি প্রয়োগ করিয়েছেন রাক্ষসের ওপর। এখন একমাত্র দৈবসম্পদ যে সর্পমুখ বাণ, সেটিকেও তিনি দ্বিতীয়বার কর্ণের তূণে ঢুকতে দিলেন না। মহাকবি যেন একে একে কর্ণের সমস্ত দৈবসজ্জা মুক্ত

করে, তাঁকে রণদর্পে, আত্মশ্লাঘায় নিতান্ত মাটির মানুষটি করে তুলেছেন। ঠিক এমন একটা মানুষের রথের চাকা মাটিতেই দেবে যায়, অন্তকালে সে চাকা আর মাটি থেকে তোলা যায় না। ভাগ্যহত পুরুষের ভাগ্যচক্র বার বার মাটিতেই প্রোথিত হয় আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে ঝলসে ওঠে অগ্নিবাণ, বায়ুবাণ, ব্রহ্মাস্ত্র—মানুষ কর্ণের ছিন্ন মুণ্ড তখন মাটিতে গড়াগড়ি যায়।

আমরা আগেই বলেছি কর্ণের উচ্চাভিলাষ ছিল অসম্ভব রকমের এবং সেই উচ্চাভিলাষ তিনি পূর্ণ করতে চেয়েছেন দুর্যোধনের কাঁধে ভর রেখে। বাস্তবে পাণ্ডবদের প্রতি অতি কঠিন দুর্যোধন কর্ণের এতটাই বন্ধু যে সময়ে অসময়ে কর্ণের আজ্ঞাবাহী হতেও দুর্যোধনের বাধে না। এই বন্ধুত্বের সুবাদে কর্ণ দুর্যোধনের বকলমে পুরো হস্তিনাপুরের রাজনীতি চালনা করেছিলেন—এতটাই বলা যায়। ঠিক এই কারণেই কুরুসভার যত অন্যায়, তার সমস্ত দায় এসে পড়েছে কর্ণের ঘাড়েই। অন্তিমলগ্নে যখন কর্ণের রথচক্র গ্রাস করেছে পৃথিবী, তখন কর্ণ অর্জুনকে ধর্মের কথা তুলে থামতে বলেছিলেন, নিরস্ত্রের ওপর শর যোজনা করতে বারণ করেছিলেন। উত্তরটা দিয়েছিলেন স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ। কর্ণ মুখ ফসকে বলেছিলেন—দৈববশে এই মুহূর্তে আমার রথের চাকা আটকে গেছে মাটিতে। অন্তত এই সময়টাতে তুমি বাণের অভিসন্ধি ত্যাগ কর অর্জুন। 'দৈব', কর্ণের মুখে 'দৈব'—কথাটা মহাভারতের কবির কানে লেগেছে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং পুরুষোত্তম কৃষ্ণের মুখ দিয়ে মহাকবি বলিয়েছেন—বদমাশ লোকেরা যখন বিপদে পড়ে, তখনই দৈবের দোষ দেয়, নিজের বদমায়েশির কথা মনে করে না—প্রায়েন নীচা ব্যসনে নিমগ্না নিন্দন্তি দৈবং কুকৃতং ন তু স্বম্।

অর্থাৎ কবি বলছেন—না দৈব নয়, যিনি দৈবকে এতকাল ঘৃণা করে এসেছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য দৈব দায়ী হবে কেন, তার মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি কর্ণের অসহায় মৃত্যুর সমস্ত মানুষোচিত কারণগুলি একে একে কৃষ্ণের মুখে আবার স্মরণ করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—যেদিন একটি মাত্র কাপড় পরা দ্রৌপদীকে তুমি আর দুর্যোধনের দল সবাই মিলে কুরুসভায় নিয়ে এসেছিলে সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন পাশাখেলায় অজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে অক্ষশৌণ্ড শকুনি জিতে নিল, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল—ক্ক তে ধর্মস্তদা গতঃ? যেদিন তোমার মত অনুসারে দুর্যোধন ভীমকে বিষ খাইয়েছিল—আচরত্তন্মতে রাজা ক্ক তে ধর্ম স্তদা গতঃ—সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তেরো বচ্ছর বনবাসে কাটিয়ে যেদিন পাণ্ডবেরা এসে তাঁদের রাজ্য-ভাগ চেয়েছিলেন এবং তোমরা এক টুকরো জমি দাওনি সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন বারণাবতের জতুগৃহে সমস্ত পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার মতলব করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন রজস্বলা পাণ্ডববধূকে দুঃশাসনের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি হাঃ হাঃ করে হেসেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল কর্ণ—সভায়াং প্রাহসঃ কর্ণ ক্ক তে ধর্ম স্তদা গতঃ? যেদিন সমস্ত নারীসমাজের মধ্যে থেকে টেনে এনে গজগামিনী কৃষ্ণাকে তুমি বলেছিলে—পাণ্ডবদের হয়ে গেছে দ্রৌপদী, তুমি অন্য কোনও স্বামী খুঁজে নাও, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল, কর্ণ? রাজ্যের লোভে যেদিন শকুনি পাশাখেলায় পাণ্ডবদের হারিয়েছিল, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন সমস্ত মহারথীরা একসঙ্গে মিলে একটি বাচ্চা ছেলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল, কর্ণ? এত শত সব ঘটনার মধ্যে যদি তুমি এতকাল ধর্মানুষ্ঠান না করে থাক, তা হলে এখন আর 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে গলার তালু শুকিয়ে কী হবে—কিং সর্বথা তালুবিশোষণেন? আর এখন এই মুহূর্তে যদি তুমি খুব ধর্মপরায়ণও হয়ে ওঠ, তবু এখন আর তোমার রক্ষা নেই।

দেখা যাচ্ছে, সারা জীবন ধরে দুর্যোধন যত অপকর্ম করেছেন, তার সবকিছুরই দায় এসেছে কর্ণের ওপর। কৃষ্ণের আক্ষেপোক্তি শুনে এই প্রথম এবং এই শেষবারের মতো কর্ণের মাথাটা লজ্জায় নত হয়ে গেল, এক পংক্তি উত্তর পর্যন্ত তাঁর মুখে জোগাল না—লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্। মহাভারতের কবি বলতে চাইলেন—দৈব নয়, এতগুলি স্বকৃত অন্যায়ের জন্যই কর্ণ আজ এত অসহায়। তিনি যা করেছেন এবং করেননি, তা সবই তিনি চুকিয়ে দিয়েছেন নিজের অসহায় মৃত্যু দিয়ে। কর্ণ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে কৌরবদের যশ, দর্প এবং জয়াশা একসঙ্গে উবে

গেল। যুদ্ধশেষের অপরাহ্নে কর্ণের ছিন্ন মুণ্ডটি পড়ে রইল মাটিতে, তার ওপরে সন্ধ্যাসূর্যের শেষ অস্তরাগের ছোঁয়া এসে লাগল, ছিন্ন মুণ্ডটি মনে হল যেন অস্তসূর্যের সম্পূর্ণ বিম্ব বুঝি—অস্তঙ্গতং ভাস্করস্যেব বিম্বম্। কর্ণ মারা যাবার পর কর্ণকে নিয়ে যত উপমা দিয়েছেন ব্যাস, তা সবই প্রায় সূর্যকে নিয়ে। ভাবে বুঝি সূর্য যে অন্যায় করেছিলেন কর্ণের জন্ম দিয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর মহাকবি যেন সূর্যের উপমায় তাঁর পুত্রতর্পণ সমাপ্ত করছেন এখন। ব্যাস লিখলেন—অস্ত যাবার সময় সূর্য যেমন তাঁর সমস্ত প্রভা প্রত্যাহার করে নিয়ে যান, তেমনি কর্ণের জীবন-জ্যোতিও তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন পৃথিবী থেকে। এতদিন যাঁর শর-কিরণজালে শত্রুসেনা তপ্ত হয়ে উঠেছিল, সেই কর্ণসূর্য গ্রস্ত হল অর্জুনের রাহুগ্রাসে। দিনের শেষে যখন অপরাহ্ন ঘনিয়ে আসছিল যুদ্ধভূমিতে, ঠিক সেই সময় কর্ণেরও জীবন-অপরাহ্ন ঘনিয়ে এল। সহস্রনেত্র ইন্দ্রের মতো যাঁর ক্রিয়াকলাপ, সহস্রদল পদ্মের মতো যাঁর মুখ, সেই কর্ণের ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে পড়ে থাকল যেন দিনশেষের অস্তরাগে রাঙানো সহস্ররশ্মি সূর্যটি।

১১

আমরা যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম, এখন আবার সেইখানে ফিরে যেতে চাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রণদুন্দুভির আওয়াজ, শিঙা, মাদল, শঙ্খ, কাড়ানাকাড়া সব স্তব্ধ। মাত্র একদিন আগেও যেখানে ধনুকের টংকার, দুই দুই প্রতিস্পর্ধী বীরের পরস্পর আক্ষেপ, বাণ কিংবা গদার ঝনঝনি শোনা গেছে, আজ সেখানে রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। এই গতকালও যেখানে অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা আর অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রের সংঘাতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছিল, আজ সেখানে অরণ্যের স্তব্ধতা। ছিন্নশাখ বৃক্ষের মতো জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র অশ্রুমলিন চোখে শুধু রাজসভায় বসে আছেন আর সঞ্জয় তাঁকে শুধু শত প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আর বলছেন—কেঁদে কী করবেন মহারাজ! এই বসুমতী এখন বড় নির্জন—নির্জনেয়ং বসুমতী শূন্যা সম্প্রতি কেবলা। সঞ্জয়ের ভাবটা এই যে, কাঁদারও যেন একটা লোকাপেক্ষা আছে। যিনি কাঁদছেন, তাঁর কাঁদা যদি লোকে না দেখে, না শোনে, তা হলে সে কাঁদার যেন জোর কমে যায়। এরই মধ্যে জননী গান্ধারী, পুত্রশোকে দীর্ণা গান্ধারী, কুরুকুলের সমস্ত কুলবধূদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। দিকে দিকে শুধু শব, ভগ্ন রথ-চক্র, ছিন্ন-উষ্ণীষ মৃত সৈনিক এবং সেনানায়কের ভিড়। একজন আরেকজনের শরীরের ওপর মরে পড়ে আছে, কারও দেহ শেয়ালে ছিঁড়ে খাচ্ছে, কারও চোখ উপড়ে নিয়েছে শকুনে, কেউ বা আলসে শত্রুর উৎক্ষিপ্ত গদাকে প্রিয়ার মতো জড়িয়ে ধরে মৃত্যুর শৃঙ্গার রচনা করেছে ভুঁয়ে—মুখটি নুয়ে পড়েছে চুম্বনের ভঙ্গিতে—শেরতে বিমুখাঃ শূরা দয়িতা ইব যোষিতঃ।

গান্ধারী একটি একটি করে তাঁর পুত্রদের স্পর্শ করছিলেন আর ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। অথচ মনে মনে তিনি জানেন যে, প্রধান দোষটা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনেরই। একটার পর একটা মরা ছেলের মুখ দেখে গান্ধারী এতই শোকাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে, একসময় তিনি শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন পাণ্ডবদের। শেষ পর্যন্ত ব্যাসদেবের অনুশাসনে গান্ধারী নিজের মধ্যে ফিরে আসেন এবং কুরুকুল ধ্বংস হল কেন, তার একটা অনবদ্য ব্যাখ্যা দেন তিনি। গান্ধারী বললেন—দুর্যোধন আর শকুনির অপরাধেই সমস্ত কুরুকুল ক্ষয় হয়ে গেল, আর এই ক্ষয়সাধনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হল কর্ণ আর দুঃশাসন—কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তোऽয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ। গান্ধারীর ভাবটা এই যে, কুরুকুল যদি একটা গাছের মতো হয়, তা হলে সেই গাছটা কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্যোধন আর শকুনি কিন্তু গাছ-কাটার ব্যাপারে কুড়ুলের কাজটি করেছেন কর্ণ আর দুঃশাসন। গান্ধারী যখন এইসব তত্ত্বকথা বুঝতে পারেন তখন তিনি কুরুবংশের যোগ্যতমা কুলবধূ, কিন্তু নিমেষে তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে জননী আর তখনই যুদ্ধক্ষেত্রের এক একটি শব তাঁর কাছে শত পুত্রের শত ইতিহাস রচনা করে। দুর্যোধনকে তিনি এক একবার দেখেন আর মনে হয় এই আমার সেই অভিমানী ছেলে, যার জন্য পৃথিবীর সমস্ত বীরপুরুষেরা একসঙ্গে কোমর বেঁধেছিল। বিস্ময়ে গান্ধারী কৃষ্ণকে ডেকে বলেন—কৃষ্ণ দেখেছ

এঁদের, সব যেন আমার দুর্যোধনের পোষ-মানা বাঘ, আজকে কেমন নিবোনো আগুনের মতো দেখাচ্ছে। আর এই যে জয়দ্রথ, কর্ণ—এরা কোনওদিন মারা যাবে—এ কেউ ভাবতে পেরেছিল—বিনাশঞ্চ কশ্চিন্তয়িতুমর্হতি ?

গান্ধারী ছিন্ন-ভিন্ন দুর্যোধনের দেহ জড়িয়ে ধরে স্নেহ-তর্পণ করলেন মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের। দেখলেন দুঃশাসনকে, বিকর্ণকে, একে একে সব পুত্রকে। দেখলেন পাণ্ডবকুলের অঙ্কুর অভিমন্যুকেও, দেখলেন দুর্যোধনের ঘরে নিজের নাতি—লক্ষ্মণকেও। এবারে আস্তে আস্তে তিনি এসে পৌঁছেছেন কর্ণের কাছে, তাঁর ছেলের আবাল্য বন্ধু, দুর্যোধনের সুখে সুখী, তাঁরই দুঃখে দুঃখী—সেই কর্ণ। কর্ণ যেখানে মৃত পড়ে আছেন সেখানে প্রচুর রক্ত জমে আছে। অন্যান্য বীরের মতো রথে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভূমিতে, এইজন্য যুদ্ধরথ তাঁর রক্তের প্রাপ্য অংশ না পেয়ে অভিমানে রণক্ষেত্রে ছেড়ে চলে গেছে আর রক্তপিপাসু কুরুক্ষেত্রের মাটি জমাট হয়ে গেছে কর্ণের দেহ থেকে গড়ানো চাপ চাপ রক্তে।

চাপ চাপ রক্তের মধ্যেই মৃত কর্ণ শুয়ে আছেন, শান্ত সমাহিত—শোণিতৌঘপরীতাঙ্গং শয়ানং পতিতং ভুবি। কর্ণের শরীর থেকে তাঁর ছিন্ন মুণ্ডটি আলাদা অন্য এক জায়গায় পড়ে আছে, কারণ অর্জুন যখন মাটিতে দাঁড়ানো কর্ণের মাথাটি 'অঞ্জলিক' বাণ দিয়ে কেটে ফেলেছিলেন তখন সেটা আগে ছিটকে মাটিতে পড়েছিল, তারপর পড়েছিল কর্ণের শরীর—তৎ প্রাপতচ্চাঞ্জলিকেন ছিন্নম্/অথাস্য কায়ো নিপপাত পশ্চাৎ। জননী গান্ধারী এসে নিশ্চয় তাঁর ছিন্ন মুণ্ডটি এনে কর্ণের ধড়ের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেন, ঠিক যেমন ভেঙে-যাওয়া মাটির পুতুল জোড়া দেবার চেষ্টা করি আমরা। নিশ্চয়ই জোড়া লাগল না এবং তার কারণও আছে। পরিত্যক্ত রণক্ষেত্র জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু শেয়াল, শকুন আর অন্যান্য মাংসাশীর দল। এইসব প্রাণীরা কর্ণের দেহটা ছিঁড়ে-কুড়ে খেয়ে অল্পই অবশিষ্ট রেখেছে—অল্পাবশেষো'পি কৃতো মহাত্মা। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীর চাঁদের যতখানি ক্ষয় যায় কর্ণের শরীরের এখানে ওখানে ততটাই খেয়ে ফেলেছে শেয়ালে শকুনে। এই বীভৎস চেহারা দেখে গান্ধারীরও যেন আর দেখতে ইচ্ছে করছে না। মুখে বলছেন—চতুর্দশীর ক্ষীণ চাঁদ যেমন চোখে একটুও ভাল লাগে না, তেমনি শেয়ালে-খাওয়া শরীর দেখতে একটু ভাল লাগছে না আমার—ন নঃ প্রীতিকরঃ শশীব/কৃষ্ণস্য পক্ষস্য চতুর্দশাহে। তবু গান্ধারী কর্ণের কাটা মুণ্ডটি নিশ্চয় এনে রাখলেন তাঁর কর্তিত স্কন্ধের কাছে। আলুলায়িতা জননী এবার আনত হলেন ভূমিতে। সস্নেহে কর্ণের শিরশ্চুম্বন করলেন, মস্তক আঘ্রাণ করলেন—কর্ণস্য বক্ত্রং পরিজিঘ্রমানা। এই আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন কর্ণের ওপর পুত্র দুর্যোধনের সখ্যগন্ধ ভেসে এল গান্ধারীর নাকে। আবারও কেঁদে উঠলেন গান্ধারী। কর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে দুর্যোধনের মৃত্যু একাকার হয়ে গেল শোকের কান্নায়—কর্ণস্য বক্ত্রং পরিজিঘ্রমানা-রোরূয়তে পুত্রবধাভিতপ্তা। শৈশবের অজ্ঞানে এক মায়ের অননুভূত চুম্বনে যাঁর জীবন আরম্ভ হয়েছিল, মৃত্যুর অজ্ঞানে আরেক মায়ের অননুভূত চুম্বনে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। শুধু যে চুম্বন কর্ণের জীবনে সত্যি হয়ে রইল, সে সূতমাতা রাধার চুম্বন। কর্ণ তাই পাণ্ডব হয়েও পাণ্ডব নন, কৌন্তেয় হয়েও কৌন্তেয় নন। কৌরবদের আশ্রয়স্থল হওয়া সত্ত্বেও কর্ণ কৌরব নন। তিনি নিতান্তই রাধেয়।